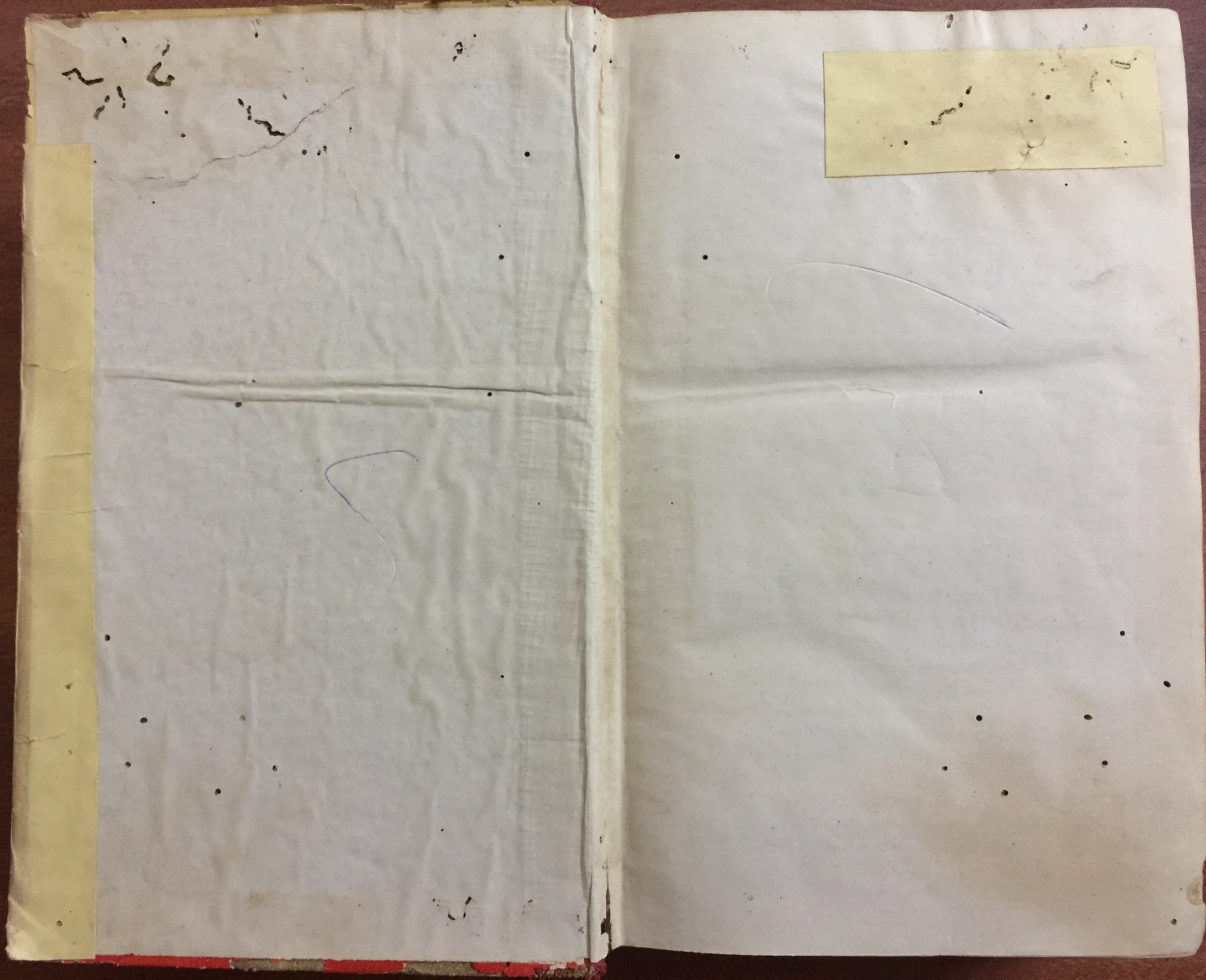
বাল গঙ্গাধর তিলক

গীতারহস্য



সম্পাদনায়

ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী



The Hindu Philosophy of Life, Ethics and Religion.

ওঁতৎসৎ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রহস্য

অথবা

কর্ম্মযোগশাস্ত্র

গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা, মূলসংস্কৃত শ্লোক, ভাষা অনুবাদ, অর্থনির্ণায়ক
রহস্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের তুলনা, ইত্যাদি সহিত

লেখক

বাল-গঙ্গাধর তিলক

অনুবাদ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা, তিলক ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীরচনা এবং সম্পাদনা

ডক্টর ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এম্‌-এ, ডি-ফিল্‌, শাস্ত্রী, বাচস্পতি,
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥
গীতাসূ. ৩. ১৯.



প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৩৩ কলেজ রো • কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীনিতাই চন্দ্র ভক্ত
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ—সংবৎ ১৯৮১, ১৯২৪ খৃঃ, ৭ই পৌষ
পরিবর্ধিত অভিনব সংস্করণ—২০৩৫ সংবৎ, ১৯৭৮ খৃঃ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ১৪ই আশ্বিন, মহালয়া

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

বাইন্ডার ঃ
ব্রজানন্দ বুক বাইন্ডার
১৪৭ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ
নিউ সর্বমঙ্গলা প্রেস
১/১ বি, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন
কলিকাতা—৬

SRIMADBHAGAVADGITARAHASYA

[New Commentary on Gita]

By

Bal Gangadhar Tilak

Translated from original Marathi in Bengali

By

Jyotirindra Nath Tagore

Edited with the life sketch of the author and the translator

By

Prof. Dr. Dhyanesh Narayan Chakrabarti

M. A., D. Phil., Shastri, Vachaspati

[Rabindra Bharati University, Calcutta]

Published by

PROGRESSIVE BOOK FORUM

33, College Row, Calcutta-9

1978

Pages—58+742=800

নিবেদনম্

পরমারাধ্য মদীয় গুরু শ্রীমৎ সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণতি জানিয়ে ভুবনতিলক, গীতাপ্রাণ লোকমান্যকে জানাই নমস্কার। বঙ্গপ্রান্তে মধুরচরিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে করি স্তুতি। ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সংগ্রামের দধীচিকল্প বিপ্লবীদের করকমলে গীতাভাষ্যের এই সুসজ্জিত অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হলাম।

সীতারামং মম গুরুবরং শ্রদ্ধয়া সংপ্রণম্য
গীতাপ্রাণং ভুবনতিলকং নৌমি তং লোকমান্যম্।
বঙ্গপ্রান্তে মধুরচরিতং স্তৌমি তং জ্যোতিরিন্দ্রং
যচ্ছাম্যঘ্যং সুবিহিতমিদং বিপ্লবীনাং করেষু॥

ইতি

চক্রবর্তিকুলোপাধিক শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ দেবশর্মা

॥ অথ সমর্পণম্ ॥

শ্রীগীতার্থঃ ক্ব গম্ভীরঃ ব্যাখ্যাতঃ কবিভিঃ পুরা ।
আচার্য্যৈর্যশ্চ বহুধা ক্ব মেহল্পবিষয়া মতিঃ ॥
তথাপি চাপলাদস্মি বক্তুং তং পুনরুদ্যতঃ ।
শাস্ত্রার্থান্ সম্মুখীকৃত্য প্রত্নান্ নব্যৈঃ সহোচিতৈঃ ॥
তমার্য্যাঃ শ্রোতুমর্হন্তি কার্য্যাকার্য্য—দিদৃক্ষবঃ ।
এবং বিজ্ঞাপ্য সুজনান্ কালিদাসাক্ষরৈঃ প্রিয়ৈঃ ॥
বালো গাঙ্গাধরিশ্চাহং তিলকান্বয়জো দ্বিজঃ ।
মহারাষ্ট্রে পুণ্যপুরে বসন্ শাণ্ডিল্যগোত্রভৃৎ ॥
শাকে মুন্যগ্নিবসুভূ-সম্মিতে শালিবাহনে ।
অনুসৃত্য সতাং মার্গং স্মরংশ্চাপি বচো * হরেঃ ॥
সমর্পয়ে গ্রন্থমিমং শ্রীশায় জনতাত্মনে ।
অনেন প্রীয়তাং দেবো ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ॥

---

* যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
গীতাসু ৯, ২৭.

বিষয় সূচী

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

প্রাক্-কথন

ওঁ

বিশাল-বিশ্বস্য বিধান-বীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে ॥

কালিন্দী-কুঞ্জচারী নবঘনরুচিরঃ শ্যামলঃ শান্তমূর্তির্-
যঃ কংসধ্বংসকারী কুরুকুলসমরে দিব্যগীতাপ্রচারী।
প্রাণানন্দঃ প্রমূর্তো দনুজবিদলনো লোককল্যাণকারী
সোঽয়ং পায়াচ্চিরং বস্ত্রিনভুবন-শরণং পাপহারী মুরারিঃ ॥

বিশ্বমনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির নির্যাস। জগতের সারস্বত সমাজে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এই সদ্‌গ্রন্থ। বহুদিন পূর্বে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল মার্কিণ মনীষী এমারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গীতা উপহারের মাধ্যমে সৌহৃদ্যকে সুদৃঢ় করেছেন। বিশ্বের সমুন্নতষট্‌ত্রিংশৎটিভাষায় এই গ্রন্থের প্রায় তিন সহস্র সংস্করণ হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে যথার্থ গণসাহিত্য এই গীতা। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষক-সৈনিক, কর্মী-ব্যবসায়ী, ছাত্র-শ্রমিক, ত্যাগী-ভোগী সকলের কাছেই এই গ্রন্থের আবেদন। নির্জনগুহাবাসী নিষ্কিঞ্চন তপস্বী হতে রাজপ্রাসাদবাসী ধনী, সর্বকর্মত্যাগী সাধু হতে সদা কর্মনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত সকলেই জীবন-পথের পাথেয় এই গীতা হতে পেয়ে থাকেন। গীতা মানব-সমাজে জ্ঞান-কল্পতরু। তাই যুগে যুগে গীতার উপর রচিত হয়েছে অসংখ্য ভাষ্য। মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাকে বলেছেন ভারতের কুটীরে বিনা তৈলের প্রদীপ। মহাত্মাগান্ধীর মতে গীতা হচ্ছে শান্তি ও শক্তিপ্রদায়িনী মাতা। অধ্যাত্ম জগতে গীতার সাধনা সুবিদিত। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীসাধনায় গীতার অনন্যসাধারণ ভূমিকা অবিস্মরণীয়। গীতা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, আত্মসমর্পণ যোগ, আত্মতত্ত্ব এবং স্থিতপ্রজ্ঞত্বের আদর্শের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতের প্রায় সকল বিপ্লবীরই [?] অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ছিল এই গীতা। আবার অহিংস সংগ্রামীরাও গীতার বাণীতেই পেয়েছেন আদর্শের প্রেরণা। সহিংস এবং অহিংস ভারতে মুক্তিসংগ্রামের উভয় পথের [?] পথিকদের পথের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য যেমন ছিল এক, তেমনি পাথেয়ও ছিল এক —আর তা হ'ল শ্রীমদভগবদ্‌গীতা! তাই বিপ্লবী যোগী ঋষি অরবিন্দ, চরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলক, আবার অহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী, ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তক নিরীহ বিনোবাভাবে গীতাপ্রবচনে সমুৎসুক, রচনাও করেছেন স্ব স্ব আদর্শের আলোকে গীতার বিশাল ভাষ্য। আবাল্য এঁরা গীতাধ্যায়ী। মহাসংগ্রামী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতা হিসেবে কারাগার হতে সহকর্ম্মী তরুণদের নিত্য গীতাপাঠের প্রবর্তনা দিচ্ছেন। আবার আজাদ হিন্দ ফৌজের মহানায়ক রূপে রণক্ষেত্রের বোমাবর্ষণের মধ্যেও বুকপকেটে রেখেছেন ছোট্ট গীতা, আলেখ্যধৃতা মাতা কালিকা এবং তুলসীমালিকা। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-বিনয়-বাদল-দিনেশ-প্রফুল্ল প্রভৃতি দধীচির দলে এবং জেলে গীতা ছিল নিত্যপাঠ্য। অবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ ত্রিপিটক এই রকম প্রত্যক্ষভাবে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তিসংগ্রামে মরণপণ সৈনিকদের প্রবুদ্ধ করেছিল কিনা জানা নেই। তাই বলি গীতা শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ, তথা চতুবর্গের তথা সামগ্রিক জীবনপথের সময়সারণী তথা টাইমটেব্‌ল, সকল পথের যাত্রীরই অপরিহার্য গ্রন্থ। শুধু ব্যক্তির বা রাষ্ট্রবিশেষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সংকট নিরসনেও গীতা অপরিহার্য গ্রন্থ। বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বকল্যাণের প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসংঘ বা U. N. O এর প্রতিষ্ঠা। তারও পন্থা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল স্বর্গত দ্যাগ্‌ হ্যামারশিল্ড্‌ বল্‌ছেন—"ফলাকাংক্ষা করে কর্ম করা অপেক্ষা ফলাশা ত্যাগ করে কর্ম করা অনেক ভাল। এই উপদেশ সকল যুগের সকল দর্শনের চূড়ান্ত কথা। রাষ্ট্রসংঘের সকল প্রচেষ্টায় আমরা যদি গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করে চলতে পারি, তবেই আমরা সুখী হব"। —"The Bhagavad Gita echoes an experience of all ages and all Philosophies when it says—work with anxiety about results is far inferior to work without such anxiety, in calm self-surrender. These words expressed deep faith and we will be happy if we can make that faith ours in all our efforts, জার্মেনিতে আণবিক বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার গীতার শ্লোক পাঠ করে লব্ধ আণবিক গবেষণার ঘোষণা করেন। নোবেল পুরষ্কারপ্রাপ্ত জীববিজ্ঞানী অলডাস্‌ হ্যাক্‌সলী গীতার অনুবাদ করেন, স্বদেশেও গণিতজ্ঞ নারলিকার কণ্ঠস্থ করেন গীতা। প্রতিটি মানুষই জীবনসংগ্রামে রণক্লান্ত সৈনিক, অর্জ্জুনের ন্যায় বিষাদগ্রস্ত। বিষাদ হতে মুক্তি সবারই কাম্য। অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে শাশ্বতকালের নিখিল মানবের বিষাদ হতে মুক্তি তথা মোক্ষের যোগমার্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রদর্শন করেছেন।

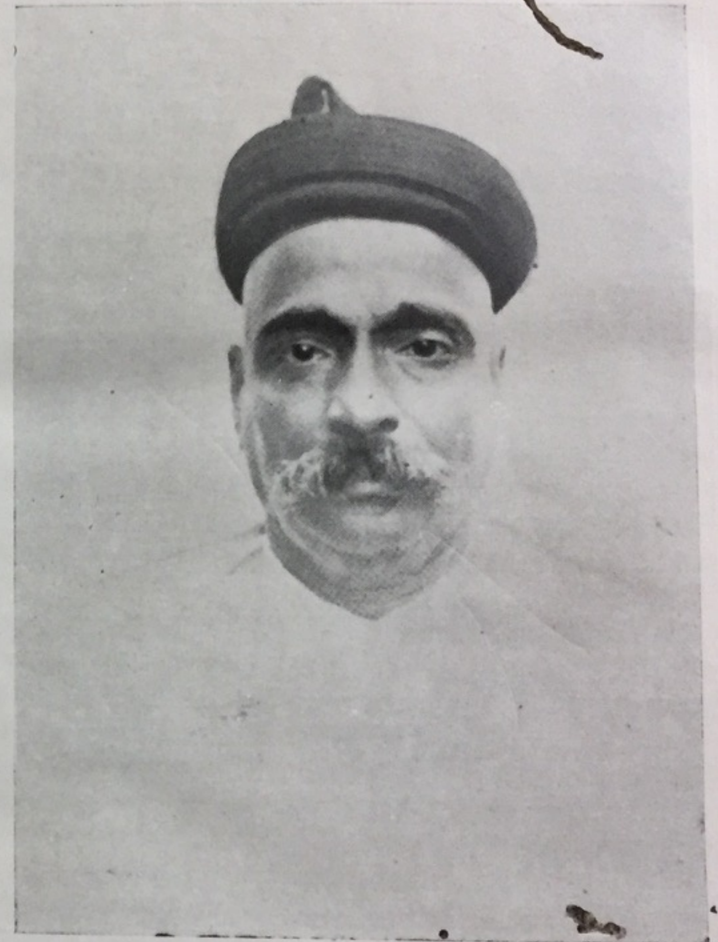
এহেন গ্রন্থের বিবিধ ভাষায় বহুবিধ ভাষ্যের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের "গীতারহস্য" বা কর্মযোগশাস্ত্র স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল। মূল গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের দাদা মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বঙ্গানুবাদ করেন বহুদিন পূর্বে। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল বলে বহতা নদীর ন্যায় বহতা সাধনার ধারাধারক, পরম পূজ্যপাদ মনীষী, শ্রীসুদর্শন-সম্পাদক শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মচারী শিশির কুমার গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশের জন্য কল্যাণীর সন্ত আশ্রমে দুচারবার অধমকে বলেন। নিষ্কাম জননেতা মনীষী স্বর্গত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমায় এ নিয়ে তাগাদা দিয়েছিলেন। সাত বৎসর বয়স থেকে নিত্য গীতাপাঠে প্রবৃত্ত হই কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে। বাল্যকাল হতেই গীতাপাঠে অভ্যস্ত থাকায় যৌবনের চৌমাথায় এসে গীতাসংক্রান্ত নানা গ্রন্থ এবং ভাষ্যপাঠে কৌতূহলী হই। সম সাময়িক কালে পূজনীয়

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার, জগদীশচন্দ্র ঘোষ এবং আরো বহু মনীষীর গীতা-আলোচনা পাঠে উদ্দীপ্ত হই। বৎসরকাল পূর্ব্বে লোকমান্য তিলকের পৌত্র কেশরীর বর্তমান সম্পাদক, প্রাক্তন সংসদ্‌সদস্য শ্রীযুক্ত জে, এস, তিলক লণ্ডন হতে প্রকাশিত তিলক মহারাজের সুবিস্তৃত প্রামাণ্য জীবনী স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে উপহার দিয়ে কৃতার্থ করেন। তখন হতেই বঙ্গভাষী জনগণের কাছে ঐ মহাত্মার জীবনী এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি গীতারহস্য তুলে ধরার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে থাকি। অসংখ্য কর্ম্মের তাড়নায় এবং গীতারহস্যের মূল গ্রন্থের অভাবে সংকল্প সত্য হয়ে উঠ্‌ছেনা দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। এমন সময়ে আমার একান্ত প্রীতিভাজন সারস্বতকল্প গ্রন্থপ্রকাশক পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রিত ভক্ত শ্রীনিতাই চন্দ্র ভক্ত একটি দুর্লভ গ্রন্থ তাঁকে প্রকাশের জন্য দিতে অনুরোধ করেন। ফলে লোকমান্যের আকর্ষণীয় জীবনী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় সহ গীতাভাষ্য সম্পাদনায় প্রবৃত্ত হই। আদর্শ শিক্ষাবিদ্‌ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত মূল গ্রন্থটি দিয়ে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে আমায় সচেতন রেখেছেন। "জিজ্ঞাসা" হতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় সারস্বতাগ্রজ ডঃ সুশীল রায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওপর আলোকপাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার অধ্যক্ষ শিল্পী সুহৃদ্‌ শ্রীযুক্ত সমর ভৌমিক-এর আনুকূল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের আলেখ্যটি পেয়েছি। সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান সংকটলগ্নে নিরন্তর সংগ্রাম, পরিজনবর্গের দীর্ঘ অসুস্থতা, এবং নানা প্রতিকূলতায় বিব্রত থাকার মধ্যেও শ্রীভগবানের অপার করুণায় এই দুর্লভ গ্রন্থ প্রকাশিত হল। পূর্বতন ভাষ্যের সঙ্গে কোথাও কোথাও বর্তমান সম্পাদকের ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। তিলক ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীও সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। পূজনীয় পিতৃদেব ঋষিকল্প মনীষী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ এবং করুণাময়ী মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবীর নিরন্তর উৎসাহ স্মরণীয়। সহধর্মিণী শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি, টি রোগশয্যা হতে এবং পুত্র শ্রীমান নির্মাল্য নারায়ণ এই সম্পাদনায় নানাভাবে সাহায্য করেছে।

সর্বোপরি গুরুদেব শ্রীভগবন্মূর্তি **অনন্ত শ্রীবিভূষিত সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের** অকৃপণ আশিষ্‌ নেপথ্যে নিয়তই অনুভব করে ধন্য। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সম্পাদনা অত্যন্ত দুরূহ কার্য। তদুপরি বর্তমানে অভূতপূর্ব বন্যা এবং কাগজের দুষ্প্রাপ্যতায় পদে পদে প্রকাশকর্ম ব্যাহত হয়েছে। ভুলত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকের নিকটে পূর্বেই মার্জনা প্রার্থনা করি। সংস্কৃত বিশুদ্ধ [illegible]ন রাখার চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভগবান পার্থসারথির উদ্দেশ্যেই বলি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ইতি—

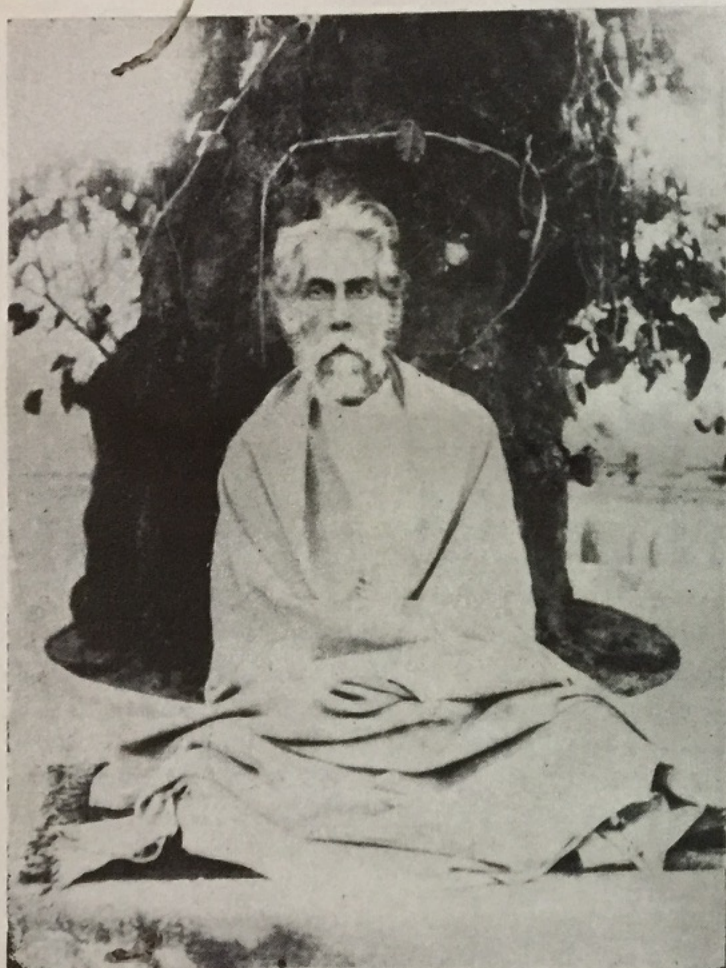
শুভ মহালয়া—১৩৮৫ বঙ্গাব্দ
ঋষিধাম
পোঃ—দত্তপুকুর
জিলা—২৪ পরগণা

বিনীত—
শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৫০



লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

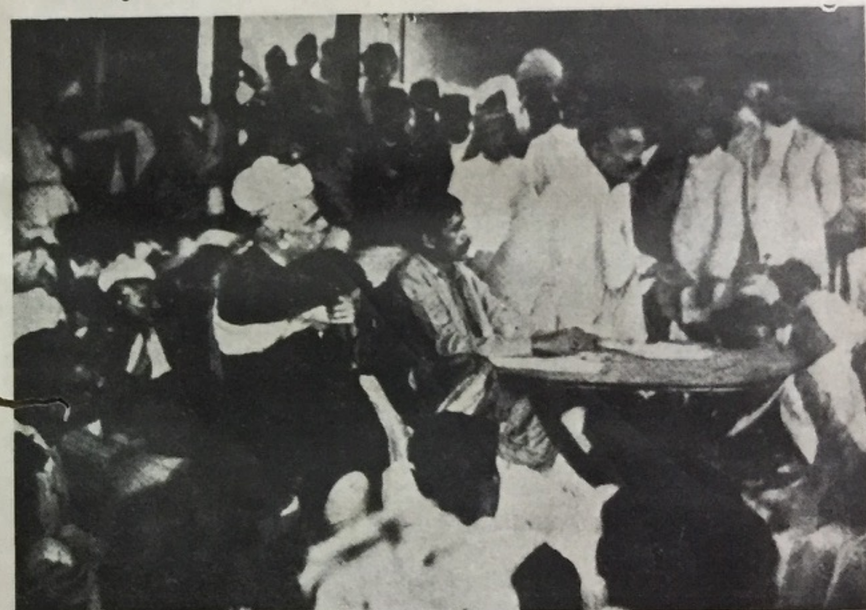
জন্ম—২৩শে জুলাই, ১৮৫৬ মৃত্যু—১লা আগস্ট, ১৯২০



জীবনসায়াহ্নে রাঁচীর শান্তিধামে

মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম—৪ঠা মে, ১৮৪৯ মৃত্যু—৪ঠা মার্চ, ১৯২৫



১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর ভাষণরত **লোকমান্য তিলক**, পার্শ্বে উপবিষ্ট **শ্রীঅরবিন্দ**



১৯১৮তে হোমরুল লীগের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডন যাত্রাকালে
উপবিষ্ট—বিপিন চন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক এবং জি. এস্. খাপার্দে
পশ্চাতে দণ্ডায়মান—আর. পি. করণ্ডির এবং এন. সি. কেলকার

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

১৮৫৬-১৯২০

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ পুরোনায়ক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এক অসামান্য মনীষী। আমাদের সার্বিক জাতীয় জাগরণের তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণপুরুষ। মহারাষ্ট্রের সমর্থ গুরু রামদাস স্বামীর জ্ঞানসাধনা, ভক্ত সাধক একনাথের ভক্তিপ্রবাহ এবং ছত্রপতি শিবজীর কর্মধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম রচিত হ'য়েছিল যুগান্তরে এই মহাত্মার জীবনে। আপোষহীন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে গভীর সারস্বত সাধনার দুর্লভ সংযোগে তাঁর জীবন অনন্য। একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে চরমপন্থীদের মুখ্য পুরুষ, আর একদিকে জাতীয় জাগরণে অগ্নিক্ষরা বাণী-বর্ষণকারী সাংবাদিক এবং অন্যদিকে জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং ভক্তিশাস্ত্রের যুগন্ধর পণ্ডিতরূপে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা-দর্শনে বিস্মিত হতে হয়। আগারকর, রাণাডে এবং নওরোজী প্রমুখ মনীষীর প্রভাবে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমসাময়িক কুসংস্কার দূরীকরণার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। যুগের প্রয়োজনে আধুনিক শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আধুনিক অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার কাটাখালে যে প্রতীচ্যের ভোগবাদী, জড়বাদী, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা কুমীরের বেশে ভারতের অন্তঃপুরে হানা দিয়েছিল, তা'র বিতাড়নেও যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন তা' তিনি অনুভব করেছিলেন। সেইজন্য আধুনিক আদর্শ ইংরেজী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় পথিকৃৎ রূপে তিনি পুণাতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে New English School এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Fergusson College স্থাপিত করেন। ঊনবিংশ শতকে ভারতের নবজাগরণে হিন্দু কলেজ-এর ন্যায় পুণার এই ফার্গুসন কলেজের অবদানও অনস্বীকরণীয়। "কেশরী" ও "মারহাট্টা" নামে দুটি সংবাদপত্রের প্রকাশনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি বহির্বিসারী ভাষায় গণচেতনাকে জাগ্রত করেন। বহু গোহত্যা নিষেধ সমিতি, আখাড়া এবং লাঠিখেলা সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। "গণপতি উৎসব" এবং "শিবাজী উৎসবের" তিনিই ছিলেন মুখ্য প্রবর্তক। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা এবং স্বরাজের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানে এগিয়ে এলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে তিনিই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—স্বাধীনতায় আমার জন্মগত অধিকার—"Swaraj is my birth right." এই চরমপন্থী মহানায়ক আবার ব্যক্তিগত আচরণে ছিলেন কারুণ্য-মূর্তি, সৌন্দর্য্য-সাধক। তাঁর লোকোত্তর চরিত-মহিমাকে বিশ্লেষণ করলে মনে পড়ে মহাকবি ভবভূতির রামচরিত বর্ণনা—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

ইটালীর জাতীয় জাগরণে Josef Mazzini-র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তি সংগ্রামে George Washington-এর ন্যায় ভারতেও শক্তিশালী জাতিগঠনে লোকমান্য তিলকের ছিল অনন্যসাধারণ ভূমিকা। নব জাগ্রত ভারতের মুকুটহীন সম্রাট্ রূপে তিনি সেদিন সর্ব্বত্র বন্দিত হয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব এবং বৈপ্লবিক কর্মধারা। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯২০ পর্য্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সঙ্গে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিষ্কাম কর্মসাধনার দর্শনকে অবলম্বন করে আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা স্বরাজের নামে জনগণকে তিনি প্রবুদ্ধ করেন। প্রতীচ্য সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়াক্ষেত্র এশিয়া ভূখণ্ডে অন্যান্য জাতিরও নবাভ্যুদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বিরাজিত ছিল তিলক মহারাজের দার্শনিক প্রত্যয় ও সংগ্রামী কর্মৈষণা। বৃটিশ লেখক Sir Valentine Chirol এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁকে যথাক্রমে "Father of Indian Unrest" এবং "Maker of Modern India" বলে যথার্থই চিহ্নিত করেছেন।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপরিবারে এই অগ্নিশিশুর জন্ম। ১৭৫৭তে বাংলায় পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইবের জয়লাভের সঙ্গে ভারতে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হল। শতবর্ষ পরে ১৮৫৭তে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে আবার স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু হল ভারতে। শিবজীর স্মৃতিবিজড়িত মহারাষ্ট্রের নানা সাহেব ছিলেন তার অন্যতম নায়ক। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরা চিরকালই স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করতে ছিলেন অগ্রণী। পৌরাণিক কাহিনী হল পরশুরাম চিতার পবিত্র ভস্মের দ্বারা যে ব্রাহ্মণদের সঞ্জীবিত করেছিলেন তাঁরাই হলেন চিৎপাবন। এমনি একজন চিৎপাবন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন রত্নগিরির স্কুলশিক্ষক গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক। তাঁর সহধর্মিণী পার্বতী বাঈও ছিলেন ধর্মপরায়ণা শুচিব্রতা আর্যনারী। পর পর তিন কন্যার জন্মদান ক'রে, অপুত্রক এই দম্পতী মনের দুঃখে পুত্রলাভের জন্য সূর্যদেবতার উপাসনায় ব্রতী হন। সূর্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা পরে তাঁদের ঘর আলো ক'রে এই শিশুসূর্যের তিমিরবিদারী উদার আবির্ভাব। মনে হল—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"। বালগঙ্গাধরের প্রপিতামহ কেশব রাও ছিলেন অসাধারণ তেজস্বী, স্বাধীনতাপ্রিয়, দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। পেশোয়ার অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রূপে তিনি রাজ্যশাসনে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু, ১৮১৮তে বৃটিশের হস্তে পেশোয়া পরাজিত হলে তিনি বৈদেশিকের নিকট দাসত্ব স্বীকার করবেন না বলে রাজকর্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র রামচন্দ্র পন্থ পরিণত জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। এই পিতামহ রামচন্দ্র পন্থের নিকটেই বালগঙ্গাধরের শৈশব-শিক্ষা। সিপাহী বিদ্রোহের রোমহর্ষক ঘটনাবলী এবং প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনী পিতামহের কাছে শুনে শুনে শিশু বালগঙ্গাধর ধর্ম ও বীর্য ভাবনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতেন। আদর্শনিষ্ঠ পিতার প্রেরণায় নিয়মিত ভাবে

প্রত্যহ কয়েকটি গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ করা সুরু করে অচিরেই সমগ্র গীতা তিনি শৈশবেই হৃদ্‌গত করেন। তাঁর পিতৃদেব সংস্কৃত, গণিত এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও অত্যাচারী বৃটিশের অধীনতা গ্রহণ করবেন না বলেই মাসিক মাত্র ২৫ টাকা বেতনে সারা জীবন শিক্ষকতা করে গেছেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে মাতৃহারা এবং ১৫ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতৃবিয়োগের পূর্বে পিতৃদেবের আদেশে তিনি মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তপীবাঈ নাম্নী সৎকুলপ্রসূতা ধর্মনিষ্ঠা এক নারীরত্নকে বিবাহ করেন। বাল্যকালেই আদর্শনিষ্ঠ এই কিশোর অধ্যয়নে ছিলেন গভীর মনোযোগী। ১৮৭২এ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুণার বিখ্যাত ডেকান কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৬এ মাত্র ৭ জন ছাত্র বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক হন এবং তিলক তাঁদের অন্যতম। ১৮৮০তে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মনীষী Benjamin Disraeli বলেছিলেন—"The youth of a nation are the trustees of posterity"। সেদিনের তিলক প্রভৃতি তরুণেরা বিদেশের ভোগবিলাসের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রমত্ত বা জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্যারিয়ার তৈরীর নেশায় মশগুল না হয়ে দেশের সমুন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগের সংকল্প ঘোষণা করেন। দেশের সার্বিক দুর্গতির মূলীভূত কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব বলে মনে করে তিলক যৌবনের প্রারম্ভে সুহৃদ্ আগরকরকে বলেছিলেন—"We were men whose plans were at fever heat, whose thoughts were of the degraded condition of our Country, and after long thought we came to the conclusion that the salvation of our motherland lay in the education and only in the education of the people." আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলংকরের নেতৃত্বে তিলক এবং আরো কয়েকজন সহকর্মী তরুণ ১৮৮০তে একটি আদর্শ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মানুষ তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ আবশ্যিক ব্যবস্থা ছিল ঐ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের শ্রমে এবং আদর্শে তাঁরা এই বিদ্যালয়টিকে এমনভাবে উন্নীত করেছিলেন যে শিক্ষা কমিশনের সভাপতি Sir William Hunter ১৮৮২-এর সেপ্টেম্বরে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন—

"Throughout the whole of India I have not yet witnessed a single institution of this nature which can be compared with this establihishment. This institution, though not receiving any aid from the Government, can rival and compete with success, not only with the Govt. High Schools in this country, but may compare favourably with the Schools of other countries also." এই বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের জীবনে জ্বলন্ত দেশপ্রেম, প্রকৃত জ্ঞান, সুদৃঢ় চরিত্র এবং গভীর কর্মনিষ্ঠা জাগ্রত করার সাধনা তাঁরা করে চললেন। আবার বয়স্ক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য

মারাঠী ভাষায় "কেশরী" এবং ইংরেজীতে "Marhatta" নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করার সংকল্প তাঁরা ১৮৮০র অক্টোবরে ঘোষণা করলেন। "কেশরী"তে ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির বিশেষ সংবাদও পরিবেশনের ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। তৎকালীন অন্য পত্রিকাগুলি নিরপেক্ষভাবে সত্য সংবাদ নানা কারণে পরিবেশন করতে পারতো না বলে ১৮৮১র ৪ঠা জানুয়ারী শীর্ষ অর্থবহ সংস্কৃত শ্লোকে ভূষিত করে তিলক মারাঠী ভাষায় "কেশরী" পত্রিকা প্রথমে প্রকাশ করেন। ভারতে গণসংযোগের এবং গণচেতনা জাগরণের প্রথম মাসিক-পত্রিকা রূপে "কেশরী"র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোষিত হল—"The mass of ignorant population, who have generally no idea of what passes around them and who therefore must be given the Knowledge of such topics as concern their everyday life by writings on literary, social, political, moral & economic subjects." লোকশিক্ষা ও গণজাগরণই ছিল কেশরীর লক্ষ্য। ইংরেজী "Marhatta'র লক্ষ্য ছিল উচ্চ শ্রেণীর জনগণকে স্বদেশীচিন্তায় প্রবুদ্ধ করা—"the more advanced portion of the Community, who require to be provided with material for thinking intelligently on the important topics of the day"। এই দুইটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি অগ্নিক্ষরা বাণীতে জনচিত্তকে জাগ্রত করেছিলেন। কয়েকবার রাজরোষে পড়ে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। ১৮৮২ এর ১৭ই জুলাই তিনি প্রথমে চারমাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৮৮৩ তে তাঁরই নেতৃত্বে উচ্চতর এবং প্রসারিত শিক্ষার জন্য Deccan Education Society প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তিনি তাতে আকৃষ্ট করেন। এই সোসাইটির প্রাস্তাবিক সভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা Sir William Wedderburn, পরবর্তী কালে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ও সমাজসংস্কারক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, বিশ্ব-বিখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববেত্তা, সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এম, এম্ কুন্তে, বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার কে. পি. গ্যাডগিল প্রমুখ মনস্বিবর্গ যোগদান করেন। তৎকালীন বোম্বে প্রদেশের গবর্নর Sir James Fergusson ১২৫০ টাকা দান করে তার প্রথম পৃষ্ঠপোষক হন। ১৮৮৪ তে অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল Marquis of Riponও স্বেচ্ছায় এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টায় তিলক পঁচাত্তর হাজার টাকা স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করেন। এইভাবে মহারাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার আদর্শ মহাবিদ্যালয় ফার্গুসন কলেজ এবং মারাঠী ভাষায় "কেশরী" ও ইংরেজীতে "Marhatta" পত্রিকা দুইটি ঐ Deccan Education Societyর দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলো। সংস্কৃতের অধ্যাপক বামন শিবরাম আপ্তে অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। কেলকার ইংরেজী, আগারকর ইতিহাস এবং ন্যায়শাস্ত্র ও তিলক গণিতের অধ্যাপনায় নিরত হন। তবে তিলকই ছিলেন সোসাইটি কলজের প্রাণপুরুষ। পরে আর একজন আদর্শস্থানীয় পুরুষ মহামতি গোখেল এই সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধাতৃবিধানে গোখেল এবং তিলকের মধ্যে নানা বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা যেতে লাগল। আপোষপন্থী গোখেল এবং চরম-

পন্থী জননেতা তিলকের সহাবস্থান সম্ভব হল না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী তিলক ফার্গুসন কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পত্রিকা দুইটির এবং আরো নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রজ্ঞাবান নায়কের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে তিনি সেদিন এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনশিক্ষার্থীদের জন্য তিনি একটি শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করে স্বয়ং তাতে Law of Evidence, Contract Law, Hindu Law এবং Law of Equity প্রভৃতি বিষয় অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করলেন। বিখ্যাত ব্যবহারজীবীরাও অনেক সময় তাঁর হিন্দু আইনের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ শ্রবণে দলে দলে পাঠদানকালে সমবেত হতেন। তাঁর সাংবাদিকতা ছিল অর্থোপার্জনের জন্য নয়, ছিল গণজাগরণের তপস্যা। ক্ষুরধার মেধা, বলিষ্ঠ লেখনী, দুর্লভ সত্যনিষ্ঠা, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, সমুন্নত চারিত্র্য এবং উত্তপ্ত দেশপ্রেম নিয়ে তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁর সাংবাদিকতা নিয়ে শ্রীযুক্ত D. V. Tahmankar লণ্ডন হতে প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে লিখেছেন—"It is not too much to say that his editorship forms a landmark in the development of true Indian nationalism.…His style was always direct and his sentences short and crisp. His writings were crystal clear and went straight to the heart of his readers. They were full of quotations from the ancient Sanskrit works, popular sayings, historical parallels, apt metaphors and above all pregnant with forceful and original ideas.… **Kesari was produced not to enterain the people but to instruct and guide them.** It was a newspaper for the people and it's purpose was to make them think and act. Tilak was an Editor-Philosopher who had a message to give to his readers and he gave it with fire and imagination. There was nothing mealy mouthed about his writing. In a downright, frank and robust style week after week Tilak poured out his soul on day to day problems, economic questions, philosophical ideas, historical researches, literature and art." সাংবাদিকতার মাধ্যমে মারাঠী ভাষায় তিনি যুগান্তরের সৃষ্টি করেন। যোগ্য সংবাদ-পত্রের কী দূরপ্রসারী এবং বৈদ্যুতিকশক্তিসঞ্চারী প্রভাব রয়েছে তিলক তা কেশরীর মাধ্যমে প্রমাণিত করলেন। কেশরীর প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত অথর্বহ সংস্কৃত শ্লোকটি প্রথম সংখ্যা হতেই মুদ্রিত থাকতো—

স্থিতিং নো রে দধ্যাঃ ক্ষণমপি মদান্ধেক্ষণসখে
গজশ্রেণীনাথ ত্বমিহ জটিলায়াং বনভুবি।
অসৌ কুম্ভিভ্রান্ত্যা খরনখরবিদ্রাবিতমহা
গুরুগ্রাবগ্রামঃ স্বপিতি গিরিগর্ভে হরিপতিঃ॥

সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর গবেষণারও তিনি অনন্য সাধারণ পথিকৃৎ। সফল সাংবাদিকের জীবনে একনিষ্ঠ জ্ঞানানুশীলনেরও যে প্রয়োজন, তা তিনি নিজের

জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। বিদ্যার সামান্য মূলধন নিয়ে সমসাময়িক ঘটনার চটকদারী বিশ্লেষণে তাঁর সাংবাদিকতা পর্যবসিত হয়নি। বিশ্বের ইতিহাসে এমন পণ্ডিত সাংবাদিক আর বিশেষ দেখা যায় নি। ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র, গণিত এবং ইতিহাসে তাঁর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর লেখনীপ্রসূত গ্রন্থরাজিতে। Orion, এবং Arctic Home in the Vedas নামক দুটি গ্রন্থে অত্যন্ত দুরূহ বিষয়কে মৌলিক এবং সাবলীল পদ্ধতিতে তিনি পরিবেশন করেন। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার শতাব্দীতে বেদের রচনা এবং উত্তরমেরু হতে আর্যদের আগমন তিনি ঐ গ্রন্থদ্বয়ে অকাট্য যুক্তি, জ্যোতিষিক বিচার এবং গভীর মনীষার দ্বারা প্রমাণিত করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "গীতারহস্য" নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

যোগবাশিষ্ঠে আছে—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্ ॥"

দুটি ডানায় ভর করেই যেমন পাখী আকাশে উড়তে পারে তেমনি জ্ঞান এবং কর্ম দুইই সমভাবে অবলম্বন করেই মানুষকে পরম পদ পেতে হয়। তিলকের জীবনেও তাই দেখি জ্ঞান এবং কর্মের সম-সমাবেশ। ভারতে মিশনারী শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং পরিণামে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও বৃটিশের রাজনৈতিক আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দূরপ্রসারী দৃষ্টি সম্বন্ধে তিলক সর্বদাই সচেতন ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞা বালবিধবা দারিদ্র্য হতে মুক্তির জন্য ইংরেজীবিদ্যায় নিষ্ণাতা হয়ে খৃষ্টধর্ম অবলম্বনকারিণী, বিদুষী, পণ্ডিতা রমাবাঈ পুণাতে সারদাসদন নামে স্ত্রী-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে যখন সুকৌশলে তার ছাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করছিলেন, তার বিরুদ্ধে তিলক বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে জনগণকে সচেতন করেন। সমাজ-সংস্কার তাঁর যথেষ্ট অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু আমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারে বিদেশী বিধর্মী শাসনের স্থূলহস্তাবলেপ তিনি একান্ত অবাঞ্ছনীয় মনে করতেন। পরে তাই সহবাস সম্মতি আইন মুক্তচেতা সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সমর্থন করেননি। বিদেশী শাসকের দ্বারা আইন প্রণয়ণের পরিবর্তে সুশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সমাজসংস্কার প্রকৃত ফলপ্রসূ হবে মনে করে তিনি লিখেছিলেন—"Education and not legislation is the proper method for eradicating the evil"। তাঁর কথা ছিল—"Indian problems must be solved by Indians." মদ্যপান বিরোধী এবং গোহত্যানিরোধের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। পুণাতে এবং পরে সর্বভারতে "গণপতি উৎসব" এবং "শিবাজী উৎসব" প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে সংঘবদ্ধ এবং স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার বীর্যবত্তার পথে উদ্বুদ্ধ তিনি করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী উৎসব" নামক বিখ্যাত কবিতা রচনা। ১৮৯৩ হতে ১৯০৫ পর্যন্ত এই উৎসব দুটির মাধ্যমে তিনি সমাজের সর্বশ্রেণীর নর-নারীকে স্বরাজসাধনায় একত্রিত করেন। তৎকালীন অন্য নেতৃবৃন্দের আবেদন ছিল শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রতি। তাই তাঁরা তিলককে অনেক সময় উপহাস করে বলতেন—"A leader of oilmen and betelnutsellers."

এই উৎসব দুটির প্রেরণা ভারতে ১৯০৫ এর সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করেছিল। ১৮৯৬-৯৭ তে বৃটিশের নির্মম শোষণ এবং নির্দয় উপেক্ষায় দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মহারাষ্ট্রে করালগ্রাসে পতিত হয়। সরকারী অপশাসনের ফলে ১৮৭৬ হতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ১৮ বার দুর্ভিক্ষে ১ কোটি ৯০ লক্ষ নরনারী মৃত্যু বরণ করে বলে সরকারী তথ্যেই জানা যায়। কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে সরকারী নির্মমতার বিরুদ্ধে তিনি সেদিন ঐতিহাসিক আন্দোলনের দ্বারা স্বদেশে ও বিদেশে জনমত সংগঠিত করেন। সেই সময় দুইজন বৃটিশ কর্মচারী Mr. Rand এবং Lt. Ayerst দামোদর চাপেকার নামক তরুণ বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। বিচারে দামোদরের প্রাণদণ্ড হয়। সরকার এই কর্মের পশ্চাতে প্রকৃত নায়করূপে তিলককে প্রমাণিত করার বহু চেষ্টা করে মামলায় জড়িয়ে শেষে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তিলক তাঁর "কেশরীতে" লেখনীমুখে কেশরীর ন্যায় গর্জন করেই চলেছেন। আর সেই গর্জনে সরকার ও তাঁর সমর্থকবৃন্দের হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাঁর বিরুদ্ধে নিরন্তর বিষোদ্গার করে চলেছে। পরাধীন দেশে শাসকের অপশাসনই পরম্পরাক্রমে বিদ্রোহের মূল কারণ বলে তিনি ঘোষণা করে লিখলেন—

"Such crimes are natural consequences of the oppressive measuers adopted by govt. offiicials and so the ultimate responsibility for them must be placed at the door of the Government. To create or lead peaceful opposition to foreign rule and to rouse a spirit of resistance is not sedition. ...The responsibility of avoiding an armed revolution is on the public leaders ; so also is it on the Govt. officials, but if the latter do not do their duty and the people take to violence, it is sheer injustice to hold the leaders responsible for the violence, because they preach patriotism, devotion to religion and resistance to injustice which is not incitement..."

আর এক প্রবন্ধে শিবজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সুহৃদ্বর্গ তাঁর উদ্দীপনাময়ী বীর্যময়ী লেখনীকে সংযত করার পরামর্শ দিলে এই তেজস্বী সাংবাদিক সেদিন যা বলেছিলেন তা বিশ্বের নির্ভীক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য স্মরণীয়—"Doctors must not be afraid of any disease. If they show signs of fear the ordinary people become more frightened. How can a diver work if he is afraid of water ? The same is true of journalists who fight for the people's rights. They must not be afraid of going to gaol, but regard it as vocational risk which they must be prepared to accept without hesitation."

১৮৯৭ এর ৮ই সেপ্টেম্বর তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে বোম্বে হাইকোর্টে সরকার মামলা রুজু করলেন। বিচারপতি Strachey, ৬ জন ইউরোপীয় এবং ৩ জন ভারতীয় জুরী বিচারে অংশ গ্রহণ করলেন। সমগ্র ভারত তিলকের

বিরুদ্ধে এই মামলার সংবাদে সচকিত হয়ে উঠলো। কয়েক দিনের মধ্যেই চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হল তাঁর মামলায় সহায়তার জন্য। কংগ্রেস-সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার-সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সমিতি গঠন করে ১৬৭৬৮ টাকা আট আনা এবং তিন কৃতী ব্যারিষ্টারকে তিলকের মামলার জন্য বোম্বেতে প্রেরণ করেন। ভারতীয় জুরী তিনজনের আপত্তি সত্ত্বেও বিচারক তিলককে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এই পাবকোপম নির্মলচরিত্র মনস্বীকে সরকারের C. I. D. রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে—"Mr. Tilak though legally convicted, has been morally acquitted and has risen ten times higher in public estimation by the bold stand he took during the trial. It was an ennobling sight, when he was standing at the Bar and reiterating his innocense in spite of the verdict of the jury. A pure conscience and a fixed resolution seemed to endow the man at the time with iron nerves and the people at once recognized in him a hero standing in defence of a national cause." এই কারাদণ্ড তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুকুটহীন সম্রাট্ রূপে অভিষিক্ত করল। লণ্ডনে প্রিভি-কাউন্সিলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হল। তাতে ১৮ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের জন্য তাঁর কারাবাস সংক্ষিপ্ত করা হল। কারাগারে তিনি সানন্দে নারকেলের ছোবড়া বের করা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজ অন্যান্য অশিক্ষিত দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের সঙ্গে সমান ভাবেই করতেন। তিনি নিরামিশ ভোজী ছিলেন বলে রশুন পেঁয়াজ দিয়ে আলুর ডালনা ও রুটি তাঁকে খেতে দেওয়া হত। তিনি রশুন পেঁয়াজ খান্‌না বলা হলেও ঐ দুটি উত্তেজক উগ্রগন্ধযুক্ত অশাস্ত্রীয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন ব্যঞ্জন তাঁকে দেওয়া হত না। তিনিও কোন বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আবেদন করতেন না। ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে শুধু রুটি লবণ দিয়ে সানন্দে গ্রহণ করে তিনি ঐ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কাজই করে যেতেন। বর্তমানের জনগণনেতাদের খাদ্য আন্দোলনেও কারারুদ্ধ হয়ে কারাগারে মাছের টুক্‌রোর আয়তন বড় করার আবেদন নিবেদনের কথা মনে পড়ে। তিনি যখন কারারুদ্ধ হন, তখনো তিনি গবর্ণরের আইন পরিষদের সদস্য, পুণা পৌরসভার সদস্য, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। সম্পাদক, পণ্ডিত, জননেতাতো ছিলেনই। একমাত্র গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ও আত্মসমর্পণযোগ অনুসরণের ফলেই এই মহাত্মাকে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর মহিমায় তখনো মণ্ডিত দেখি। এই কারাবাসে শেষের দিকে রাত্রে ৩ ঘণ্টা করে তাঁকে পড়াশুনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সাময়িক সংবাদপত্রাদি নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়েই তিনি কারাগারে বসে "The Arctic Home in the Vedas" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভিত্তিতে গবেষণার ফলে প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদ এবং আর্যজাতির ইতিহাস নিয়ে পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁর "Orion" গ্রন্থ পাশ্চাত্ত্যের বিবুধমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেছিল। তিলকের এই কারাদণ্ডের সংবাদে তাঁরা মর্মাহত হলেন। মনীষী

ম্যাক্‌স্‌মুলার বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্য Sir William Hunter এবং Mr. Willam Cain এর মাধ্যমে তিলকের মুক্তির জন্য বহু বিশিষ্ট ইংরেজের স্বাক্ষরিত আবেদন মহারাণীর কাছে উপস্থাপিত করেন। ফলে তাঁকে কারাগারে লেখাপড়ার নিশ্চিত সুযোগ দেওয়া হল। ৬ মাস পূর্ব্বে ১৮৯৮ এর ৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করলেন তিনি। "বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে"—সদুক্তি অনেকটা সত্য হল। মুক্তিলাভের পর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় শিবজীর স্মৃতিবিজড়িত সিংহগড় দুর্গে মাস দুই কাটিয়ে তারপর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানান্তে কলম্বো ভ্রমণে যান। ১৮৯০তে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনান্তে তিনি ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে গমন করেন। সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নানা স্মৃতি এবং লিপি দর্শনে তিনি আনন্দিত হন। জুলাই হতে তিনি আবার পত্রিকা দুটির দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "শিবাজী উৎসব" ও "গণপতি উৎসব" পুনঃসঞ্জীবিত হল। ১৯০৩ এ একজন মৃত বন্ধুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক "তাই মহারাজ" মামলায় আবার জড়িয়ে তাঁকে ১ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড ও ৬ মাসের কারাদণ্ডে বৃটিশ সরকার দণ্ডিত করে। কারাগার থেকেই তিনি লণ্ডনে প্রিভি-কাউন্‌সিলে আপীল করলে ইচ্ছা করে নানা ছলে দীর্ঘসূত্রিতার দ্বারা সরকার মামলার বিচারে বিলম্ব করে। ১৯১৫ তে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯০৫ হতে ১৯০৮ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্যাহ্ন। ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে অবলম্বন করে আসমুদ্র হিমাচল যে অত্যদ্‌ভূত গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তার নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন এই বলিষ্ঠ মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ। স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং স্বরাজ্য এই চারটি স্তম্ভের উপর তিনি জাতীয় আন্দোলনের সৌধকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর "National Boycott" প্রবন্ধ কলকাতা, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, এবং মাদ্রাজে বিভিন্ন পত্রে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনের মুক্তিবাণী রূপে সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। শ্রীঅরবিন্দ, লালা লাজপত রায় এবং বিপিন চন্দ্র পাল এই আন্দোলনে তিলকের পতাকাতলে সমবেত হলেন। ১৯০৫ এ গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বারাণসী কংগ্রেসে তিলক আবেদন নিবেদনের পক্ষ পরিহার করে চরম সংগ্রামের পথে কংগ্রেসকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। লাল-বাল-পালের ত্রেতাগ্নিতে দেশে জাতীয় মুক্তি যজ্ঞ প্রজ্বলিত হল। তিলকের সেদিন অগ্নিগর্ভ ঘোষণা—"Militancy—not mendicancy।" মুক্তিসংগ্রামে "Passive resistance" বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থাকেই সেদিন তিনি গণ-আন্দোলনের পন্থারূপে ঘোষণা করলেন। পরবর্ত্তী কালে এই নীতিকেই গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ভিন্ন নামে অনুসরণ করেন। ১৮৭৫এ তিলক খাদি, চরকা এবং স্বদেশী শিল্প গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে বলেন—"Swadeshi is the only means for the salvation in India"। তিলকের চরমপন্থা কংগ্রেসের নরমপন্থীদের বিভীষিকা উৎপাদন করতে লাগ্‌লো। তারই চরম পরিণতি ১৯০৭ এর ২৭শে ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে তিলক তাঁর অগ্নিগর্ভ প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে গেলে সভাপতি ডঃ রাসবিহারী ঘোষ আপত্তি

জানান। এমন সময়ে চরম এবং নরম উভয় দলের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের দ্বারা সংঘটিত দক্ষযজ্ঞে অধিবেশন পণ্ড হ'য়ে গেল। সর্মচিত্ত সুহৃদ শ্রীঅরবিন্দ তিলকের পার্শ্বে উপবিষ্ট। কংগ্রেসের নরম পন্থীরা সংস্কারে এবং চরম পন্থীরা ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। তিলক ছিলেন তাঁদের নায়ক। জবাহরলাল নেহেরু The Discovery of India-তে লিখেছেন—

"The powerful agitation against the partition of Bengal had thrown up many able and aggressive leaders of this type in Bengal, but the real symbol of the new age was Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra."

সুরাট হ'তে ফিরে বোম্বেতে তিনি চরমপন্থী মতবাদ প্রচারের জন্য National Publishing Company প্রতিষ্ঠা করে "রাষ্ট্রমাতা" নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করলেন। পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি কারারুদ্ধ হলেন। ইতোমধ্যে ৩০ শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় সরকারের এই ব্যবস্থা। তখন তিনি সমর্থ বিদ্যালয় নামে আর একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি সরকার বন্ধ করে দিলো। সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তিনি এমনই স্বয়ংসেবকদের তৈরী করেছিলেন যে তাতে পুলিশ রিপোর্টে বলা হচ্ছে—"The British Raj has ceased to operate in Poona. The man whose authority rules the District is Mr. Tilak." সরকারী বিস্ফোরক আইনের বিরুদ্ধে "কেশরীতে" ধারাবাহিক প্রবন্ধের জন্য ১৯০৮ এর ২৪ শে জুন তিলককে আবার কারারুদ্ধ করা হয়। সরকারের ধারণা হল দেশব্যাপী বিপ্লব আন্দোলনের মস্তিষ্ক হচ্ছেন তিনি। এইবারের মামলায় তিলকের পক্ষের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। ৬ বৎসরের জন্য নির্বাসনে যখন দণ্ডিত হলেন তখন শান্ত চিত্তে তিলক বিচারালয়ে বলে গেলেন—

"All I wish to say is that in spite of the verdict of the jury I maintian that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of things and it may be the will of providence that the cause which I represent is to prosper more by my suffering than by my remaining free." এইতো গীতার শিক্ষার ফল। দেশের নানা প্রান্তে এর প্রতিবাদে সভা, বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট হল। রাশিয়ার জননেতা লেনিন এই ঘটনাকে উল্লেখ করে "Inflammable Material in World Politics" গ্রন্থে লিখেছেন—

"The despicable sentence passed on the Indian Democrat, Tilak, gave rise to street demonstrations and a strike in Bombay. The class conscious workers in Europe now have Asian comrades and their number will grow by leaps and bounds."

২৩শে জুলাই তাঁর ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে সাবরমতী জেলে নীত তিনি হলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে বোম্বের শ্রমিকেরা প্রতি বৎসরের জন্য একদিন করে ছয়দিন ধর্মঘট পালন করলেন। সমস্ত জনজীবন স্তব্ধ, হাট বাজার বন্ধ। দেশে এবং বিদেশে পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে অসংখ্য প্রতিবাদ ছাপা হতে লাগলো। ১৯০৮ এর ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁকে সাবরমতী জেল হতে মান্দালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করানো হল। মান্দালয় জেল ছিল স্যাঁৎসেতে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং গুমোট। শীত এবং গ্রীষ্মের দুঃসহ তীব্রতায় অসহ্য কষ্ট ঐ কারাগারের খাঁচার মতো কাঠের তৈরী ঘরে সহ্য করতে হয়। গ্রীষ্মে ধূলির ঝড়ে বিপর্যস্ত হতে হয়। এই কারাগারে বসেই তিনি গীতার যুগান্তকারী ভাষ্য "গীতারহস্য" রচনায় নিমগ্ন হলেন। প্রথমে কোন বই বা কাগজ তাঁকে দেওয়া হত না। পরে অনেক বলা কওয়ার পর তাঁকে প্রাচীন পুস্তকাবলী দেওয়া হতে লাগলো। বিচ্ছিন্ন কাগজ এবং কালি ও কলম তাঁকে দেওয়া হত না। বাঁধানো খাতার প্রতি পৃষ্ঠা চিহ্নিত করে এবং একটি পেনসিল তাঁকে লেখার সরঞ্জাম রূপে দেওয়া হত। মান্দালয়ে আসার পূর্বেই তিনি গীতা নিয়ে কিছু রচনা করেছিলেন। কিন্তু সরকার তা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে দেয়নি। শৈশব থেকেই গীতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাল্যকালে পিতৃনির্দেশে গীতা কণ্ঠস্থ করার তাঁর প্রয়াসের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মান্দালয়ে এসে তাঁরই ভাষায় তাঁর অবস্থা—"I do not know what would have happened to me if I had not been allowed to have books,···Even before I was imprisoned, a conviction was growing on me that the meaning of the Gita, adumbrated by all the many commentaries and expositions, was not the correct one. I had long Wanted to give a concrete shape to my ideas on the meaning of the Gita, together with a comparative study of the Eastern and western philosophies. I could do that only at Mandalay. I have now written a book on this subject in Marathi. It took me four to six months to write but much time was spent in thinking out its plan and then again in reviving it. The manuscript is with the Government—they did not give it to me at the time of my release."

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃকৃত্যের পর ১½ ঘণ্টা তিনি নিমীলিত নয়নে ধ্যানাবিষ্ট থাকতেন। তারপর সংস্কৃত স্তবস্তুতি পাঠান্তে গীতার রহস্য উন্মোচনে নিরত হতেন। সূর্যার্ঘ্য দান এবং গায়ত্রী পাঠান্তে আহারে বসতেন। তাঁর ব্রাহ্মণ পাচককেও এই ভাবে অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত করিয়েছিলেন। বিকেলে জার্মাণ, ফরাসী এবং পালি ভাষা অধ্যয়নে নিরত হতেন। ১৯১১এর ২রা মার্চ "গীতারহস্য" রচনা সমাপ্ত করে তিনি লিখছেন—"I have just finished writing my book on the Gita and have given it the title "Gita-rahasya". In it I have expounded some original ideas, which, in many ways, will be presented to the people for the first time. I have shown in this book how

the Hindu religious philosophy helps to solve the moral issues (involved in everyday life.) To a certain extent my line of argument runs parallel to the line of thinking followed by Green in his book on Ethics. However I do not accept the basis of morality is the greatest good of the greatest number on the human inspiration. What I have done in Gita Rahasya is to prove, by comparing the philosophy of Gita and the philosophy of the West, that to put it at the lowest, is in no way inferior to theirs. I had been thinking about the Gita for the last twenty years, and the ideas which I propose to expound are challenging—So far no one has dared to put them forward. I have yet to cite quite a few supporting arguments from books which are not with me at present, which I can do only after my release." যখন এই মহাগ্রন্থ তিনি কারাগারে বসে রচনা করছেন, তখন সংবাদ পেলেন তাঁর সহধর্ম্মিণী পরলোকে প্রয়াণ করেছেন। তখন ভ্রাতুষ্পুত্রকে লেখা তাঁর মর্মস্পর্শী পত্রে তাঁর গীতালব্ধ জ্ঞানই পরিস্ফুট হয়েছে। গীতার প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব অত্যাচারী কংসের কারাগারে। যুগান্তরে অত্যাচারী বৃটিশের কারাগারে তার অভিনব রহস্য উন্মোচিত হ'ল তিলকের ন্যায় মনস্বীর নিকটে। পরবর্ত্তী কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই মান্দালয় কারাগারেই অবস্থান কালে এই কারাবাসকে তীর্থবাস রূপে বর্ণনা করে পত্র লিখছেন তাঁর মাতৃদেবীকে। কারণ, তিলক মহারাজের গীতাভাষ্য রচনায় এই কারাগার আজ তীর্থভূমি হয়ে গেছে। কারামুক্ত হয়ে ১৯১৪এর ১৭ই জুন তিনি পুণাতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সমগ্র দেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। ৫২ বৎসর বয়সে মান্দালয়ে তিনি নীত হন। ৫৮ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশে ঐ বয়সে কারাগারে বসে তিনি রচনা করলেন এই মহাগ্রন্থ।

কারামুক্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেই পুনরায় তিনি কর্মান্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কংগ্রেসের সংগঠন, প্রসার এবং চরম ও নরমপন্থীদের একত্রিত করার প্রয়াসে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। হোমরুল আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"Home Rule is my birthright and I will have it." বস্তুতঃ তাঁরই অসাধারণ বাগ্মিতায় হোমরুল আন্দোলনের প্রসার। ১৯১৬তে তাঁর একষষ্টিতম জন্মদিনে তাঁরই অজ্ঞাতে দেশবাসী তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন ক'রে যজ্ঞ, দরিদ্রনারায়ণ-ভোজনাদি সম্পন্ন করে তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার তোড়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। অভিভূত হয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব কিছু অর্থ ঐ অর্থসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে সমুদয় হোমরুল আন্দোলনের অর্থ ভাণ্ডারে দান করেন। ঠিক সেই দিনই বৃটিশ সরকার তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য চল্লিশ হাজার টাকা জামানত জমা দেবার জন্য আদেশ দেন। হাইকোর্টে মামলা করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তারপর লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব ও ভাষণ সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। ১৯১৭তে সারা ভারতে হোমরুল লীগের জন্য তিনি

বিদ্যুদ্‌গতিতে ঘুরে বেড়ান। তারপর মণ্টেগুর ঘোষণান্তে নূতনভাবে জাতীয় আন্দোলনের ধারা তিনি সুরু করেন। কার্যতঃ লণ্ডনে হোমরুল আন্দোলনের প্রসারের জন্য প্রকাশ্যে সিরোল মানহানি মামলার জন্য ১৯১৮ এর ৩০শে অক্টোবর তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন। Sir Valentine Chirol নামক জনৈক ইংরেজ "Indian Unrest" নামক পুস্তকে তিলকের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা কুৎসা রটনা করেন। "কেশরীর" কেশরি-সদৃশ সম্পাদক মানহানি মামলা এনে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। বৃটিশের মূল ভূখণ্ডে তিলকের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় সুহৃদ্‌ মাধব দাস শ্রীহরি আপে দুশ্চিন্তিত হলে অকুতোভয় তিলক উত্তরে বললেন—"Don't worry about me. I have no fear of death. I carry the destiny of my country in my hands and I have full faith in the future." সরকারী কূটনীতি তাঁকে যতই বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে, তিনিও ততই মাতৃভূমির মুক্তি সাধনের জন্য উদগ্র হয়ে উঠেছেন। Gottfried von Strassburg এর কথাগুলি তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই প্রযুক্ত হতে পারে—"The honest man must endure hatred and envy. It adds to a man's worth when hatred pursues him." অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে তিনি সর্বদাই অনুসরণ করেছেন তাঁরই প্রিয় বন্ধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহতী বাণী—

"ক্ষমা যথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র,
নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে।
যেন রসনায় মম সত্য বাক্য ঝলি' উঠে
খরখড়্গসম তোমার ইংগিতে। যেন রাখি
তব মান তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে॥"

মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরাই বৃটিশবিরোধী বিপ্লবী। তিলকও চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তাই, তিনিই ভারতে রাজদ্রোহের মুখ্য মস্তিষ্ক বলে নানা কল্পিত অভিযোগে তিলককে সিরোল অভিযুক্ত করেন। তিলক সিরোলের বিরুদ্ধে লণ্ডনে মানহানির মামলা আনলেন। যথাযথভাবে বৃটিশ সরকার সিরোলকে অভিযোগ হতে মুক্তি দিলেন। দেশে বিদেশে সকলেই ভেবেছিলেন যে তিলক এই আঘাতে ভেঙে পড়বেন। কিন্তু, তিনি নবোদ্যমে লণ্ডনে হোমরুল আন্দোলনের প্রচার এবং বেদবিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তখন বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং গ্রন্থাদি নিয়ে গবেষণা, বিদ্বান্‌মণ্ডলীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান এবং স্বগৃহে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নিয়মিত পাঠদান করছেন। পার্লামেন্টের শ্রমিকদলের সদস্যদের দিয়ে হোমরুলের সপক্ষে জনমত তৈরীর জন্যও অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময়েই ১৯১৯এর এপ্রিলে ভারতে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই মর্মান্তিক এবং আসুরিক আচরণের সংবাদ লণ্ডনে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তত্রস্থ জনগণকে এই বিষয়ে জাগ্রত করেন। দেশের এই দুর্দশায়

তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। দেশবাসীর সঙ্গে দুঃখের ভাগ গ্রহণ করার জন্য তিনি ১৯১৯এর ২৭শে নভেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর লণ্ডনে বৎসরাধিককাল বাসের সময়ে শ্রমিকদলকে তিনি এমন ভাবে অনুকূল করেছিলেন, যে তারই ফলে ১৯৪৭এ ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকারই মিঃ এ্যাটলীর নেতৃত্বে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অদূরদর্শিতা এবং বৃটিশ সরকারকে বিশ্বাস করার ভুল সম্বন্ধে তিনি সকলকে অবহিত করেন। অমৃতসর কংগ্রেসেই তাঁর শেষ বারের মতো যোগদান। এরই মধ্যে তিনি সাঙ্গুলিতে জ্যোতির্বিদ্ সম্মেলনে যোগ দিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় গণনার সামঞ্জস্য স্থাপন করে পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হন। তারপরই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষণ পরিক্রমায় নিরত হয়ে এক একটি সভায় বজ্রকণ্ঠে সিংহের ন্যায় গর্জন করে একসঙ্গে অন্যূন দশ হাজার শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতেন। বিখ্যাত সিন্ধী নেতা ডঃ ছোটীরাম গিদোয়ানী তাঁর ভাষণের প্রভাব নিয়ে বলেছেন—"Lokamanya Tilak brought new life and dignity to our politically backward people. Now they will proudly march side by side with their fellow Indians, with their heads erect and their faces unabashed." অতিরিক্ত শ্রমে জুলাই মাসে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসহযোগ আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ২১শে জুলাই তিনি জ্বর নিয়েই দেওয়ান চমনলালের সঙ্গে গাড়ীতে করে বের হন। ২২শে জুলাই তাঁর জ্বর অত্যন্ত বেড়ে গেল। শুক্রবার ২৩শে জুলাই তাঁর পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিনে তিনি অস্বাভাবিকভাবে ভালো হয়ে উঠে দর্শনার্থীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে সময় কাটালেন। এ যেন নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের শেষ ঔজ্জ্বল্য। ২৬শে জুলাই হতে তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত হলেন। ফুসফুস আক্রান্ত হল। মহাত্মা গান্ধী, মোহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও অগণিত মানুষ তাঁর অবস্থা জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাঁর আবাসস্থলে সমবেত হয়েছেন। ১৯২০এর ১লা আগষ্ট, রবিবার, মধ্যরাত্রে ১২টা ৪০ মিনিটে এই অক্লান্ত সংগ্রামী কর্মবীরের আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃত-লোকে প্রয়াণ করলেন। মহাত্মা গান্ধী, ডঃ কিচ্‌লু, মৌলানা শওকত আলি, কেল্‌কার এবং লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁর শবদেহ বহন করে আরব সাগরের তীরে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। মিল শ্রমিক, ডক শ্রমিক হতে আরম্ভ করে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র লক্ষ লক্ষ আপামর জনসাধারণ তাঁর শবানুগমন করে। চন্দন কাষ্ঠের চিতায় বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হল। নির্বাপিত হল স্বাধীনতা সংগ্রামের পূত যজ্ঞাগ্নি, অবসিত হল ইতিহাসের একটি গৌরবময় যুগ। চলে গেলেন বিপ্লবের বহ্নিশিখা-বহনকারী স্বনামধন্য অগ্নিহোত্রী নায়ক। তিলকের পরলোক-প্রয়াণে শাশ্বত ভারতের বাণী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

কায়-মনো-বাক্যে ঐক্য রক্ষা করে চিন্তা ও চর্যায়, সংকল্পে ও সাধনায় তিনি যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন, তা ভাবী কালে মানুষকে মহত্তর জীবনের পথে পরিচালিত করবে। সমসাময়িক কালে তাঁকে অনেকে অবতার পুরুষ বলে মনে করতেন। পরবর্ত্তীকালের রাজনৈতিক সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়—"A great worker and creator is not to be judged only by

the work he himself did, but also by the greater work he made possible." জীবনের প্রথম থেকেই রাজনীতিকে ধর্ম্মের নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বৈদেশিক ভোগবাদী দর্শনের আনুগত্যে পাওয়া এবং পাইয়ে দেবার রাজনীতিকে অনুসরণ করার ফলেই নেতৃবৃন্দের অধঃপতন ও দেশের দুর্গতি। ব্যক্তিচরিত্রের বিশুদ্ধি, স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে গৌরববোধ, স্বদেশীয় রীতি-নীতির সশ্রদ্ধ অনুসরণ নেতৃবৃন্দের জীবনে একান্ত অপেক্ষিত বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর প্রত্যয় সম্বন্ধে শ্রী ডি-সি-তামানকারের বিশ্লেষণ উল্লেখনীয়—

"Very early in his public career Tilak discovered the need for bringing a spiritual element to the politics of the country by infusing into them a religious fervour. He had seen how the Congress leaders of his time had failed to create a missionary enthusiasm for the national cause because of their spiritual surrender to an alien power and their ignorance of the true source of popular inspiration. He realised that no nation can hope to build a great and powerful movement without giving it a secure foundation in the spiritual life of the people. He achieved this vital taste through the festivals of Ganapati and Shivaji which helped India to shake off her inferiority-complex and reassert her personality. He knew that once the spiritual and religious springs of India's great past were revitalized the greatness and glory of her future were assured. To him India seemed to have a character, at radition, a personatily—as distinct as the characterisics and qualities of individual men and women what mattred to him was the preservation of those ways of living which are peculiar to India through which alone, he said, she could rediscover her soul, her strength and attain her emancipation."

মনীষী রাষ্ট্রপতি আচার্য রাধাকৃষ্ণন্ তিলকের চরিত্র বিশ্লেষণে বলেছেন—The field of politics to which Mr. Tilak devoted the best years of his life was not the one for which he was made. He was by nature a scholar and only by necessity a politician." জীবনের প্রথমে তাঁর "A missing Verse in the Samkhyakarika" যেমন দার্শনিক জগৎকে বিমুগ্ধ করেছিল, তেমনি পরবর্তী কালে Orion, The Arctic Home in the Vedas এবং সর্বশেষে গীতারহস্য তাঁকে সারস্বত জগতে অমর করে রেখেছে। গীতা ছিল তাঁর জীবনবেদ। আধুনিক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দর্শনের নিরিখে গীতার বিচার করে লোক-সংগ্রহার্থে নিষ্কাম কর্মযোগ,শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ এবং স্থিতপ্রজ্ঞতার মাধ্যমে জীবন সাধনাই জগতের সকল সমস্যার সমাধানে সর্বোত্তম পন্থারূপে তিনি

ঘোষণা করেন। জগতের বহু মানুষকে তাঁর এই কর্মমুখীন গীতাব্যাখ্যা অনুপ্রাণিত করেছে। সূত্রাকারে গীতার মূল বক্তব্য নিয়ে তিনি বল্‌ছেন—"The Gita asks us to work in imitation of the Lord for the purpose of Lokasaṁgaha or the greatest good of the greatest number—the unification of humanity in universal sympathy. The Gita is designed to provide a solution to all human problems. It reconciles and harmonizes spiritual freedom with work in the world." বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ গীতার ভিত্তিতে তাঁর কর্মাদর্শ গ্রহণ করলে সার্থক হবে গীতার সর্বশেষ মহতী বাণী—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রী র্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি র্মতির্মম ॥"

শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী

———

মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম—৪ঠা মে, ১৮৪৯, মৃত্যু—৪ঠা মার্চ, ১৯২৫

বঙ্গ ভারতের নবজাগরণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অপরিমেয় অবদান ঐতিহাসিক সত্য। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ হ'তে আরম্ভ করে সদ্যঃস্বর্গত সৌম্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই পরিবারে মনীষার ধারা ছিল অব্যাহত। এতগুলি প্রতিভাধরের একই পরিবারে জন্মগ্রহণের দ্বিতীয় কোন নিদর্শন বিশ্বের ইতিহাসে কোন দেশে দেখা যায়নি। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে ঐ পরিবারস্থ অন্য মনস্বীদের যথার্থ মূল্যায়নে অনেকেই কুণ্ঠিত এবং বিস্মৃত। তাঁরা যদি পৃথগ্‌ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে আবির্ভূত হতেন তাহলে তাঁদের মনীষার দীপ্তিচ্ছটা সকলকে সফলভাবে আকর্ষণ করতো। এমনই এক স্বল্প-আলোচিত অথচ অসাধারণ মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুমুখী প্রতিভার অনন্যসাধারণ অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশে ছিলেন সদাজাগ্রত সহায়ক। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবক্তা, অশ্বারোহী, বহুভাষাবিদ্, সার্থক নাট্যকার, সফল অনুবাদক, আদর্শ জমিদার, নিপুণ চিত্রশিল্পী, শিরোমিতিবিদ্যায় নিষ্ণাত, অভিনেতা, গীতকার, সুরশিল্পী, দেশপ্রেমিক, ধর্ম্মনেতা, দার্শনিক, স্বদেশী শিল্প ও দেশীয় বাণিজ্যের পথিকৃৎ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, কল্পনা ও উদ্ভাবনাশক্তির অনন্য সাধারণ অধিকারী এমন বিস্ময়কর চরিত্রের বিস্মৃতি আমাদের জাতীয় অপরাধ।

১৮৪৯-এর ৪ঠা মে, ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, মধ্য রাত্রের তিমিররাশি বিদারণ করে এই জ্যোতির আবির্ভাব। ব্রহ্মনিষ্ঠ মনীষী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রত্নগর্ভা সারদাদেবীর তিনি পঞ্চমপুত্র, সপ্তম সন্তান। রবীন্দ্রনাথ বারো বৎসরের বড়ো এই অগ্রজকে নতুন দাদা বলে ডাকতেন। প্রথমে বাড়ীর ঠাকুরদালানে গুরুমহাশয়ের কাছে, পরে সেজদা সংস্কৃতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হেমেন্দ্রনাথের কঠোর তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষকের কাছে, ক্রমে সেণ্টপল্‌স্ স্কুল, মণ্টেগু একাডেমী, হিন্দু স্কুল, কলকাতা কলেজে একের পর এক ঘুরে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্-এ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। সেখানে নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁর সহাধ্যায়ী। ১৮৬৭-তে আসন্ন পরীক্ষা উপেক্ষা করে তিনি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই চলে গেলেন। সেখানে তিনি বিবিধ ভাষা, শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও সেতারবাজানো শিক্ষায় নিরত হলেন। কিছুদিন পরে কলকাতায় যখন অসুস্থ দাদার সঙ্গে ফিরে এলেন, তখন হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন চলেছে। ন্যাশনাল পত্রিকা সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ছিলেন তার প্রাণপুরুষ, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, পৃষ্ঠপোষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। নব গোপাল মিত্রের উৎসাহে আঠারো বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ মেলাই

উপলক্ষ্যে রচনা করলেন জীবনের প্রথম কবিতা—"উদ্বোধন"। তার কিছুদিন পরেই ৫ই জুলাই ১৮৬৮-তে কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এর পর থেকে কর্ম্মে ও কল্পনায় তাঁর জীবনে এলো গভীরতা। বাবা ও দাদাদের উৎসাহে আরম্ভ করলেন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা। ১৮৬৯ হ'তে ১৮৮৪-তে স্ত্রী বিয়োগের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অবিচ্ছিন্নভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাজ করে গেলেন। ১৮৭২-এ ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা স্থাপিত হলে তার এবং ১৮৭৫-এ আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তারও সম্পাদক পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন। ১৮৭৪-৭৫ এ হিন্দু মেলার সংশ্লিষ্ট সম্পাদকরূপেও তাঁকে দেখা যায়। ইতোমধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে নব্যপন্থীদের কটাক্ষ করে তিনি রচনা করলেন—"কিঞ্চিৎ জলযোগ"। তারপর কটকে গেলেন জমিদারী পরিচালনায়। সেখানে রচনা করলেন "পুরু-বিক্রম" নাটক। ফিরেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন "বিদ্বজ্জনসমাগম", "সঞ্জীবনী সভা," "সারস্বত সমাজ," প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও "ভারতী" পত্রিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্ম্ম সাধনার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যেও দেশকে সমুন্নত করার স্বপ্ন তাঁর। আরম্ভ করলেন পাট ও নীলের চাষ ও ব্যবসা। স্বদেশীয়দের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করাবার জন্য "সরোজিনী" নামে একটি ষ্টীমার কিনে বরিশালে চালাতে লাগলেন। বিলাতী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বিনা ভাড়ায় এবং যাত্রীদের রসগোল্লা খাইয়ে জাহাজ চালিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলেন। সর্ব্বজনীন জাতীয় পোষাক প্রবর্ত্তন ও একমাত্র নিজেই তার ব্যবহার করে জনসাধারণের পরিহাসকে উপেক্ষা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তখনি করছেন বাংলা গানে নূতন নূতন সুর-যোজনা এবং স্বরলিপির আকার-মাত্রিক রূপায়ণ। ১৮৯৯ তে "বীণাবাদিনী" এবং ১৯০১-এ "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীত পত্রিকা প্রকাশ করলেন। "বীণাবাদিনী" পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় শীর্ষে মুদ্রিত হয়—"সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ"। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শোভা পেতো—

"বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যাবিশারদঃ।
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি ॥"

আর, "সঙ্গীত প্রকাশিকার" শিরোদেশে শোভা পেতো—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

১৮৯৪-৯৭ পুণাতে মেজদাদার কাছে থেকে মারাঠীভাষা উত্তম করে শিখে এলেন। ১৮৯৯-১৯০৪-এর মধ্যে সতেরোটি সংস্কৃত নাটক অনবদ্য বাংলায় তিনি অনুবাদ করলেন। ইংরেজী এবং ফরাসী শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীও আকর্ষণীয় বাংলায় তিনি অনুবাদ করলেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে অদম্য উৎসাহ নিয়ে এই সব দুরূহ অনুবাদ তিনি ক'রে চলেছেন। জীবনের ষাট বৎসর এইভাবে কাটিয়ে পরে লোকলোচনের অন্তরালে রাঁচীতে মোরাবাদী পাহাড়ে "শান্তিধামে" তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৯২৫-এর ৪ঠা মার্চ্চ শান্তচিত্তে জীবনের পরম পরিণামকে তিনি বরণ করে নিলেন।

স্বদেশের মুক্তি সাধনে ছিল তাঁর তীব্র আগ্রহ। মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে অধ্যাত্ম রহস্যে বেদ সাক্ষী ক'রে স্বদেশ চিন্তায় একদল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৮৭৭-এ তাঁর "সঞ্জীবনী" সভা স্থাপন। এর মধ্যে রয়েছে পরবর্তীকালের বিপ্লবী সমিতিসমূহের পূর্ব্ব ছায়া। এই সভার নিয়ম ছিল এই সভার সদস্য ব্যতীত আর কারো কাছে সভার আলোচিত বিষয় বলা যাবে না। সভার অধিবেশনের সময় টেবিলের দুই পাশে দুইটি কঙ্কালের মস্তক রক্ষিত হত। তাদের নেত্রকোটরে বসান হত দুটি মোমবাতি। ব্যঞ্জনা হ'ল—কঙ্কালের মস্তক হৃতসর্ব্বস্ব ভারত। বাতি দুটির দ্বারা সূচিত হ'চ্ছে মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার এবং জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সভার কাজ সুরু হত। রক্তবর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করে বেদগ্রন্থ সভা স্থলে রক্ষিত হত। নূতন সদস্যের দীক্ষাকালে সভার অধ্যক্ষ রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে আসতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নব দীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।" শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসুকে করা হয় সভাপতি। কিশোর বালক রবীন্দ্রনাথ ৭০ বৎসর বয়সে বলছেন—"সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম"। পরিণত বয়সে তিনি বলছেন যে তাঁর মহর্ষি পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সময় নিষ্ঠা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগ, অতিথিপরায়ণতা, দানশীলতা, অর্থের প্রতি অনাসক্তি, গীতা এবং উপনিষদের শ্লোকাভ্যাস। গীতা এবং উপনিষদ্ ঠাকুর বাড়ীর সকলেরই জীবন গঠনের ভিত্তি। জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ "গীতাপাঠ" নামক অনবদ্য গ্রন্থে গীতার তত্ত্বালোচনা করেন প্রাণস্পর্শী করে। মধ্যমাগ্রজ, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ করেন গীতার পদ্যানুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করলেন তিলকের নবীন গীতা ভাষ্যের অনুবাদ। শেষ জীবনে তিনি গীতার চর্চাতেই নিমগ্ন থাকতেন। ১৯০৩- এ ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর জীবনী মারাঠী হতে বাংলায় তিনি অনুবাদ করেন। পরিণত জীবনে পরিশীলিত প্রজ্ঞা নিয়ে অনুবাদ করলেন তিনি গীতারহস্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গীতারহস্যের উপক্রমণিকার কিয়দংশ অনুবাদ করে মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন এবং লোকমান্য তিলককে অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র দেন। ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য তিলক স্বয়ং প্রভূত অর্থ ব্যয়ে হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু ও কর্ণাটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষাতেও এর অনুবাদ প্রকাশ করাবেন। তাই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লিখলেন—

বোম্বাই
২০শে অকটোবর ১৯১৭।

মহাশয়,

ইহার বহুপূর্ব্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। উহার কারণ এই যে, আমি গত দেড় মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিলাম এবং আপনার পত্রের উত্তর দিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ ওজর কিছুই নহে তাহা জানি, কিন্তু ইহাই যথার্থ কারণ।

বাঙ্গলা ভাষায় আমার গীতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত আমি ব্যগ্র। কিন্তু বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়বিধ ভাষাতে ব্যুৎপত্তি আছে এতাবৎকাল এরূপ কোনও পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই। গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং তখন শুনিয়াছিলাম যে আপনার এক ভ্রাতা গীতারহস্যের উপক্রমণিকার একটি একটি বঙ্গানুবাদ মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি তখন শুনিয়াছিলাম যে তিনি সমগ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আমি আর ঐ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করি নাই; আমি মনে করিতেছিলাম আর কাহাকেও এই কার্যের ভার প্রদান করিব। এখন দেখিতেছি, আপনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন। এখন আমার আর কোনও ভাবনা নাই, এবং অনুবাদ যে ঠিক মূলানুযায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

আমি যে অনুবাদককে তিন হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিব এ সংবাদ সত্য নহে। তবে প্রয়োজনে হইলে অনুবাদের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে এবং অনুবাদের স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। হিন্দী ও গুজরাটী সংস্করণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও আমি ইহাই করিয়াছি এবং অধুনা যন্ত্রস্থ তামিল, তেলেগু ও কর্ণাটী সংস্করণের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।

আমার অভিপ্রায় এই যে অনুবাদটি মূল মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বিষয়ের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হয়। আমি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিষয়টির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে আমাদের মেয়েরাও অনায়াসে সকল কথা বুঝিতে পারেন। অনুবাদটিও এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, আমার ইচ্ছা অনুবাদের ছাপাই বাঁধাই ঠিক মূলের অনুরূপ হয় এবং উহার মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্য হয়।

এই সকল শর্তে কার্য করিলে আমি অনুবাদ হইতে কিছুই লাভ করিতে চাই না, বরঞ্চ অনুবাদককে সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। যদি তিনি অনুবাদ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ না করেন, আমি অনুবাদককে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া নিজে অনুবাদ প্রকাশের সমস্ত ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্য্যন্ত যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সমস্ত কথাবার্তা স্থির করিবার পূর্বে উপরি লিখিত প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আগামী সপ্তাহে আমি পুণায় যাইব। পত্রাদি পুণার ঠিকানায় (কেশরী অফিস, পুণা সিটি) পাঠাইবেন।

পত্রোত্তর প্রদানের বিলম্বের জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভবদীয়
বালগঙ্গাধর তিলক

বালগঙ্গাধর তিলকের আর একটি পত্র

পুণা
২০শে ডিসেম্বর ১৯১৭

মহাশয়,

আগামী কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে আমি অবস্থান করিব। কংগ্রেস অনুসন্ধান কার্যালয়ে কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে আমার ঠিকানা অবগত হইতে পারিবেন। আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয়
বালগঙ্গাধর তিলক

(মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ থেকে পত্রগুলি সংকলিত।)

অনুবাদকের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত গীতারহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে বঙ্গবাসীর কল্যাণকামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।"

এই গ্রন্থ তিলক ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উভয়েরই প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। শক্তিশালী লেখকের দ্বারা ভাষান্তরে ও যে মূলের বক্তব্য সরল ও আকর্ষণীয় করা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে গেলেন। বিশ্বের অনুবাদ সাহিত্যে এ এক দুর্লভ সংযোজন। বঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের চৈতন্যশক্তির সংযোজক এই সদ্‌গ্রন্থ নিয়ে বলি—

"গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ?"

• শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী

———

অনুবাদকের ভূমিকা

লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাঁহার প্রণীত "গীতারহস্য" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও—আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিনের পর উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন।

ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা বাহুল্য। এমন উদার ধর্ম্মগ্রন্থ পৃথিবীতে আর একখানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা এত উদার যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে আপনার করিয়া লইয়াছে। কতটা উদার, নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥"

অর্থাৎ—"যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।"

এমন গ্রন্থের ভাষ্যকার হওয়াও গৌরবের বিষয়। এইরূপ গ্রন্থের যে বহুতর ভাষ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়সাধনের মুখ্য তাৎপর্য্যটা কি, তাহারই তিলক তাঁহার গীতারহস্যে আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ম্মই গীতার মধ্য-বিন্দু—মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্মের পরিপন্থী নহে, পরন্তু কর্ম্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এইভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্ম্মই যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ নাই,—কেননা, অর্জ্জুনকে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু "কর্ম্ম করিবে" বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম্ম অনুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্ম্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই শ্রেয়। এইরূপ কথা বলাতেই

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সম্যক্‌রূপে সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথগ্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইলেও, জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই যে গূঢ়ভাবে গীতাতে সূচিত হইয়াছে, ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের পোষকতায় সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের এত কথা আনুষঙ্গিকক্রমে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, একজন যদি মনোযোগসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই গ্রন্থ রচনায় মহাত্মা তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া যখন এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতের কাছে স্মৃতি-সাহায্যকারী কোন গ্রন্থই ছিল না—তিনি ইহার সমস্ত উপকরণই স্বকীয় পূর্ব্বসঞ্চিত স্মৃতিভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার স্মৃতিশক্তি! ধন্য তাঁহার প্রতিভা!

এই অনুবাদগ্রন্থ মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমরা জানি, অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। নানা অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

আর একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। আমার স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাহায্য না পাইলে—তিনি "গীতারহস্যের" পরিশিষ্টাংশ টীকাসমেত মূল ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ না করিয়া দিলে এবং যত্নসহকারে সমস্ত মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের তত্ত্বাবধান না করিলে, এই অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। এইজন্য শ্রীমানকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, "গীতারহস্যের" এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যের দিনে, যদি কাহারও স্থিরপ্রজ্ঞা লাভ হয়, যদি কাহারও অন্তরে অচলা ধর্ম্মবুদ্ধি নিষ্কাম কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

রাঁচি
শান্তিধাম
৭ই পৌষ ১৩৩০।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবনা

সাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্তি আমার বাণী।
জানি উহার ভেদ সত্য কি, আমি অজ্ঞানী। *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর অনেক সংস্কৃত ভাষ্য, টীকা এবং দেশী ভাষায় সর্ব্বমান্য ব্যাখ্যা আছে। এইরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থ কেন প্রকাশ করিলাম? যদিও ইহার কারণ গ্রন্থের আরম্ভেই বলা হইয়াছে, তথাপি এমন কতকগুলি বিষয় রহিয়া গিয়াছে, যেগুলির, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে, উল্লেখ হইতে পারে নাই। ঐ বিষয়গুলি প্রকট করিবার জন্য প্রস্তাবনা ব্যতীত দ্বিতীয় স্থান নাই। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিষয় স্বয়ং গ্রন্থকারসম্বন্ধীয়। প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর হইল, আমার ভগবদ্গীতার সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। সন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমার পূজনীয় পিতৃদেব অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে ভগবদ্গীতার ভাষাবিবৃতি নামক মহারাষ্ট্রীয় টীকা শুনাইবার কার্য্য আমি পাইয়াছিলাম। তখন, অর্থাৎ আমার ষোল বৎসর বয়সে, গীতার ভাবার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। আরও, অল্প বয়সে মনে যে সংস্কার হয়, তাহা দৃঢ় হইয়া যায়, এই কারণে সেই সময়ে ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে যে অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইয়াছিল। যখন সংস্কৃত ও ইংরাজী অধিক অভ্যস্ত হইল, তখন আমি গীতার সংস্কৃত ভাষ্য, অন্যান্য টীকা এবং মারাঠী ও ইংরাজীতে লিখিত অনেক পণ্ডিতের আলোচনা সময়ে সময়ে পড়ি। কিন্তু এখন, মনে এক সংশয় উৎপন্ন হইল, এবং তাহা দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। সেই সংশয় এই যে, যে অর্জ্জুন নিজের স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর কুকর্ম্ম বুঝিয়া খিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে গীতা বলা হইয়াছিল সেই গীতাতে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বা ভক্তি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির বিধির—শুদ্ধ মোক্ষমার্গের—বিচার কেন করা হইল? গীতার কোনও টীকাতে এই বিষয়ের যোগ্য উত্তর সন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না, এইজন্য এই সংশয় আরও দৃঢ় হইতে চলিল। কে জানে যে আমারই মত অপর লোকদেরও এই সংশয়ই হয় নাই। কিন্তু টীকাগুলির উপরেই নির্ভর করিলে, টীকাকারদিগের প্রদত্ত উত্তর সমাধানকারক মনে না করিলেও উহাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় উত্তর মনেই আসে না। এই জন্যই আমি গীতার সমস্ত টীকা ও ভাষ্য সরাইয়া দূরে রাখিয়া দিয়াছি; এবং কেবল গীতারই স্বতন্ত্র বিচার পূর্ব্বক অনেকবার পাঠ করিয়াছি। এইরূপ করিলে পর টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত হইলাম এবং এই জ্ঞান হইল যে গীতা নিবৃত্তিপ্রধান নহে; উহা কর্ম্ম-প্রধানই। অধিক আর বলিব কি, গীতাতে একা 'যোগ' শব্দই 'কর্ম্মযোগ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহাভারত, বেদান্তসূত্র, উপনিষৎ এবং বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক অন্যান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও এই মতই দৃঢ় হইতে চলিয়াছিল; এবং সাধারণ্যে এই বিষয় প্রকাশ করিলে অধিক চর্চ্চা হইবে এবং সত্য তত্ত্ব নির্ণয়ে আরও সুবিধা হইবে, এই

* সাধু তুকারামের এক অভঙ্গের ভাব।

অভিপ্রায়ে চারপাঁচ স্থানে এই বিষয়েরই উপর ব্যাখ্যান দিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যান নাগপুরে জানুয়ারি সন ১৯০২তে হয়, এবং দ্বিতীয় সন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে, করবীর ও সংকেশ্বর মঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আজ্ঞাতে, তাঁহারই উপস্থিতিতে, সংকেশ্বর মঠে হইয়াছিল। সে সময়ে নাগপুরের ব্যাখ্যানের বিবরণও সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, এই বিবেচনাতেই, যখন যখন সময় পাইতাম, তখন তখন কোন বিদ্বান বন্ধুর সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদ-বিবাদও করিয়াছি। এই বন্ধুগণের মধ্যে স্বর্গীয় শ্রীপতি বুবা ভিঙ্গারকর ছিলেন। ইঁহার সহবাসে ভাগবত সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এবং গীতারহস্যে বর্ণিত কোন কোন বিষয় তো তাঁহার ও আমার বাদ-বিবাদেই পূর্ব্বে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না। থাক্‌; এই প্রকারে এই মত স্থির হইয়াছে যে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রবৃত্তিপ্রধান, এবং ইহা লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বিচার করিতেও অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ভাষ্য, টীকা ও অনুবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে যে গীতাতাৎপর্য্য স্বীকৃত হয় নাই, কেবল তাহাই যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি, এবং প্রাচীন টীকাকারদিগের স্থিরীকৃত তাৎপর্য্য কেন আমার গ্রাহ্য নহে, তাহার কারণ না বলি, তাহা হইলে খুবই সম্ভব ছিল যে লোকেরা যাহা একটা কিছু বুঝিতে থাকিবে—উহাদের ভ্রম হইবে। এবং সমস্ত টীকাকারদিগের মত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কারণসহ অপূর্ণতা দেখাইয়া দেওয়া, এবং অন্য ধর্ম্ম ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে গীতাধর্ম্মের তুলনা করা এরূপ কোন সাধারণ কার্য্য ছিল না যে, শীঘ্র শীঘ্র চটপট হইতে পারে। অতএব যদিও আমার বন্ধু শ্রীযুত দাজী সাহেব খরে এবং দাদাসাহেব খাপর্ডে কিছু পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি গীতার উপর এক নূতন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করিব। তথাপি গ্রন্থ লিখিবার কার্য্য এই মনে করিয়া বিলম্ব করিয়াছিলাম যে, আমার নিকট যে সামগ্রী আছে, তাহা এখনও অসম্পূর্ণ। যখন সন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাস্তি দিয়া আমাকে মাণ্ডালেতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, তখন এই গ্রন্থ লিখিবার আশা অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল বাদে গ্রন্থ লিখিবার জন্য আবশ্যক পুস্তক প্রভৃতি সামগ্রী পুণা হইতে আনাইবার অনুমতি যখন গভর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় পাওয়া গেল তখন সন ১৯১০-১১র শীতকালে (সম্বৎ ১৯৬৭ কার্ত্তিক শুক্ল ১লা হইতে চৈত্র কৃষ্ণ ৩০শের ভিতরে) এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (মুসাবিদা) মাণ্ডালের জেলখানায় সর্ব্বপ্রথম লিখিত হইয়াছিল। আবার সময়ানুসারে যেমন যেমন বিচার করিতে লাগিলাম তেমনি তেমনি উহাতে কাটছাট হইতে লাগিল। সেই সময়ে, সমগ্র পুস্তক সেখানে না থাকিবার কারণে, কয়েক স্থানে অপূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছিল। এই অপূর্ণতা সেখান হইতে মুক্তিলাভের পর পূর্ণ তো করিয়া লইয়াছিই, পরন্তু এখনও বলা যায় না যে এই গ্রন্থ সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারণ মোক্ষ ও নীতিধর্ম্মের তত্ত্ব গহন তো আছেই; তৎসঙ্গেই উহার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিত এত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন যে, ব্যর্থ বিস্তার হইতে বাঁচিয়া, ইহা নির্ণয় করা অনেকবার কঠিন হইয়া উঠে যে, এই ছোট গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের সমাবেশ করা যায়। কিন্তু এখন আমার অবস্থা কবির এই উক্তির অনুযায়ী হইয়া গিয়াছে—

যম-সেনার বিমল ধ্বজা এখন 'জরা' দৃষ্টিতে আসিছে।
করিতে করিতে যুদ্ধ রোগেতে দেহ হারিতে চলিছে॥*

এবং আমার সাংসারিক সহচরীও পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন এই গ্রন্থ ইহা মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম যে, আমার যে বিষয় উপলব্ধ হইয়াছে, এবং যে বিচারসকল আমি করিয়াছি সেই সমস্ত লোকদিগেরও জ্ঞাত হইয়া যাউক; আবার কোন-না-কোন 'সমানধর্ম্মা' এখন বা পরে উৎপন্ন হইয়া উহা পূর্ণ করিয়াই লইবে।

আরম্ভেই বলা আবশ্যক যে, যদিও আমার এই মত মান্য নহে যে, সাংসারিক কর্ম্মকে গৌণ অথবা ত্যাজ্য ধরিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি শুদ্ধ নিবৃত্তিপ্রধান মোক্ষ-মার্গেরই নিরূপণ গীতাতে আছে; তথাপি আমি এমন বলি না যে, মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গের আলোচনা ভগবদ্গীতাতে মোটেই নাই। আমিও এই গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, গীতাশাস্ত্র অনুসারে এই জগতে প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্যই এই যে, সে পরমেশ্বরের শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উহা দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে যতদূর পারে ততদূর, নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া লইবে। কিন্তু ইহা কিছু গীতার মুখ্য বিষয় নহে। যুদ্ধের আরম্ভে অর্জ্জুন এই কর্ত্তব্যমোহে বাঁধা পড়িয়াছিলেন যে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইলই বা, কিন্তু কুলক্ষয় আদি ঘোর পাতক হইলে যে যুদ্ধ মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ আত্মকল্যাণের নাশ করিবে, সেই যুদ্ধ করা উচিত বা অনুচিত। অতএব আমার এই অভিপ্রায় যে ঐ মোহ দূর করিবার জন্য শুদ্ধ বেদান্তের ভিত্তিতে কর্ম্ম-অকর্ম্মের এবং সঙ্গেসঙ্গেই মোক্ষের উপায়সমূহেরও পূর্ণ বিচার করিয়া এই প্রকার স্থির করা হইয়াছে যে, এক তো কর্ম্ম কখনও দূরই হয় না এবং দ্বিতীয় উহা ছাড়াও উচিত নহে, এবং যাহা দ্বারা কর্ম্ম করিলেও কোনও পাপ লাগে না এবং অন্তে উহা দ্বারাই মোক্ষও লাভ হয়, গীতাতে সেই যুক্তিরই—জ্ঞানমূলক, ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগেরই—প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কর্ম্ম-অকর্ম্মের বা ধর্ম্ম-অধর্ম্মের এই বিচারকেই আধুনিক নিছক আধিভৌতিক পণ্ডিত নীতি-শাস্ত্র বলেন। সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে গীতার শ্লোকসমূহের যথাক্রমে টীকা লিখিয়াও দেখানো যায় যে, এই বিচার গীতাতে কি প্রকার করা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, কর্ম্মবিপাক, অথবা ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের যে অনেক বাদ অথবা প্রমেয়ের ভিত্তিতে গীতার কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং যাহার উল্লেখ কখনও কখনও খুবই সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের পূর্ব্বাবধিই জ্ঞান হওয়া ব্যতীত গীতার বিচারের সম্পূর্ণ মর্ম্ম সহসা ধ্যানে জন্মে না। এই জন্যই গীতাতে যে যে বিষয় অথবা সিদ্ধান্ত আসিয়াছে, সেগুলির শাস্ত্রীয় রীতিতে প্রকরণে বিভক্ত করিয়া, প্রধান প্রধান যুক্তিগুলির সহিত গীতারহস্যে উহাদের প্রথমে সংক্ষেপে নিরূপণ করা হইয়াছে; আবার বর্ত্তমান যুগের আলোচনাত্মক পদ্ধতি অনুসারে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্তসমূহের তুলনা অন্যান্য ধর্ম্মের ও তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে প্রসঙ্গা-

---

* মহারাষ্ট্র কবিবর্য্য মোরোপন্তের আর্য্যার ভাব। ইহার হিন্দী নিম্নে দিলাম—
যম সেনা কী বিমল ধ্বজা অব জরা দৃষ্টিমে আতী হৈ।
করতী হুঈ যুদ্ধ রোগোঁ সে দেহ হারতী জাতী হৈ॥

নুসারে সংক্ষেপে করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই পুস্তকের পূর্ব্বার্দ্ধে গীতারহস্য নামক যে নিবন্ধ আছে, তাহা এই রীতিতে কর্ম্মযোগবিষয়ক এক ক্ষুদ্র কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থই বলা যাইতে পারে। যাহা হৌক, এই প্রকার সাধারণ নিরূপণে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারে নাই। অতএব শেষে, গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছি; এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে যথেষ্ট রহস্যও জুড়িয়া দিয়াছি, যাহাতে পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ পাঠকের বুদ্ধিতে ভালরূপ আসিয়া যায় অথবা প্রাচীন রহস্যকারগণ নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধির জন্য গীতার শ্লোকগুলির যে টানাবুনা করিয়াছেন তাহা পাঠক বুঝিতে পারেন (গী. ৩. ১৭-১৯; ৬. ৩; ও ১৮. ২); বা গীতারহস্যে যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, তাহা সহজেই জ্ঞাত হইয়া যায়; এবং ইহাও জ্ঞাত হইয়া যায় যে ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত গীতার সম্বাদাত্মক প্রণালী অনুসারে কোথায় কোথায় কি প্রকারে আসিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এরূপ করিবার ফলে কোন কোন বিচার অবশ্য পুনরুক্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতারহস্যের বিচার গীতার অনুবাদ হইতে পৃথক, এইজন্য রাখিতে হইয়াছে যে গীতারহস্যের তাৎপর্য্যের বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের যে ভ্রম আসিয়াছে, সেই ভ্রম অন্য রীতিতে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারিত না। এই পদ্ধতিতে পূর্ব ইতিহাস ও ভিত্তিসহ ইহা দেখাইবার সুবিধা হইয়া গিয়াছে যে, বেদান্ত, মীমাংসা ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গীতার সিদ্ধান্ত ভারত, সাংখ্যশাস্ত্র, বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, এবং মীমাংসা প্রভৃতি মূলগ্রন্থে কিরূপে এবং কোথায় আসিয়াছে। ইহা হইতে বলা সহজ হইয়াছে যে, সন্ন্যাসমার্গ ও কর্ম্মযোগমার্গে কি কি প্রভেদ আছে; এবং আন্যান্য ধর্ম্মমত ও তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে গীতার তুলনা করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম-দৃষ্টিতে গীতার মহত্ত্বের উপযুক্ত নিরূপণ করা সরল হইয়া গিয়াছে। যদি গীতার উপর অনেক প্রকার রহস্য না লিখিত হইত, এবং নানা ব্যক্তি নানাপ্রকারে গীতার নানা তাৎপর্য্যের প্রতিপাদন না করিতেন, তবে আমার নিজের গ্রন্থেও সিদ্ধান্তের পোষাক ও ভিত্তিভূত মূল সংস্কৃত ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান সময় অন্য হইতেছে; লোকদের মনে এই সংশয় হইতে পারিত যে আমি গীতার্থ অথবা সিদ্ধান্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বা ঠিক নহে। এইজন্যই আমি সর্ব্বত্র স্থলনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়া দিয়াছি যে, আমার প্রমাণ কি; এবং প্রধান প্রধান স্থলে তো মূল সংস্কৃত বচনই অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। তাহা এই যে, ইহাদের মধ্যে অনেক বচন, বেদান্তগ্রন্থে সাধারণভাবে প্রমাণার্থ লওয়া হয়, অতএব এখানে পাঠকদের ঐগুলির সহজেই জ্ঞান হইয়া যাইবে এবং ইহা দ্বারা পাঠক সিদ্ধান্তগুলিও ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে সকল পাঠকই সংস্কৃতজ্ঞ হইবে। এইজন্য সমস্ত গ্রন্থ এই ধরণে রচিত হইয়াছে যে, যদি সংস্কৃতে অজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িয়া, কেবল ভাষাই পড়িয়া যায়, তবু অর্থে কোনও গোলমাল হইবে না। এই কারণে সংস্কৃত শ্লোকগুলির শব্দশ অনুবাদ না লিখিয়া অনেক স্থলে উহাদের কেবল সারাংশ দিয়াই চালাইতে হইয়াছে। কিন্তু মূল শ্লোক সর্ব্বদাই উপরে রাখা হইয়াছে, এই কারণে এই প্রণালীতে ভ্রম হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

বলা হয় যে, কোহিনূর হীরা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পৌঁছিল, তখন

উহাতে নূতন "পলকাটার" উহার জন্য পুনরায় পালিস করা হইয়াছিল; এবং দুইবার পালিস হইবার পর উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া গেল। হীরার পক্ষে উপযুক্ত এই ন্যায় সত্যরূপ রত্নের পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। গীতার ধর্ম্ম সত্য ও অভয় বটে; কিন্তু উহা যে সময়ে এবং যে স্বরূপে বলা হইয়াছিল, সেই দেশকাল প্রভৃতি পরিস্থিতির সঙ্গে বর্ত্তমানের অনেক পার্থক্য হইয়া গিয়াছে; এই কারণে এখন উহার তেজ পূর্ব্বের ন্যায় অনেকেরই দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না। কোনও কর্ম্মের ভালমন্দ মানিবার পূর্ব্বে, যে সময়ে 'কর্ম্ম করা চাই, অথবা না করা চাই' এই সাধারণ প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ মনে হইয়াছিল, সেই সময়ে গীতা বলা হইয়াছে; এই কারণে উহার অনেক অংশ এখন কোন কোন লোকের নিকট অনাবশ্যক প্রতীত হয়। এবং ইহার উপরেও নিবৃত্তিমার্গীয় টীকাকারদিগের প্রলেপ গীতার কর্ম্মযোগের বিচারকে আজকাল অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন নবীন বিদ্বান ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া গিয়াছেন যে, আধুনিক কালে আধিভৌতিক জ্ঞানের পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই বৃদ্ধির কারণে অধ্যাত্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত প্রাচীন কর্ম্মযোগের বিচার বর্ত্তমান কালের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা মনে করা ঠিক নহে; এই বুদ্ধির শূন্যগর্ভতা দেখাইবার জন্য গীতারহস্যের বিচারে, গীতার সিদ্ধান্তসমূহের অনুরূপই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তও স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিয়াছি। বস্তুতঃ গীতার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিচার এই তুলনা দ্বারা কিছু বেশী সুদৃঢ় হয় না; তথাপি আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব বৃদ্ধি দ্বারা যাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া পড়িয়া গিয়াছে; অথবা আজকালকার একদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির কারণে আধিভৌতিক অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতেই নীতিশাস্ত্রের বিচার করা যাঁহাদের অভ্যাস পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই তুলনা দ্বারা এইটুকুতো স্পষ্ট জ্ঞাত হইবেন যে মোক্ষধর্ম্ম ও নীতি দুই বিষয় আধিভৌতিক জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং তাঁহারা ইহাও জানিতে পারিবেন যে, এই কারণেই প্রাচীন কালে আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহার পরে মানবের জ্ঞানের গতি এখন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই; কেবল ইহাই নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার এখন পর্য্যন্ত চলিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক গ্রন্থকারদের বিচার গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ হইতে বেশী ভিন্ন নহে। গীতারহস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে যে তুলনাত্মক বিচার আছে, তাহা হইতে এই বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক হইতেছে, এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের যে সারাংশ বিভিন্ন স্থলে আমি দিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখানে এটুকু বলা আবশ্যক যে, গীতার্থ প্রতিপাদন করাই আমার মুখ্য কাজ, অতএব গীতার সিদ্ধান্তসমূহকে প্রমাণ মানিয়া পাশ্চাত্য মতগুলির উল্লেখ আমি কেবল ইহাই দেখাইবার জন্য করিয়াছি যে, এই সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের অথবা পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্তের কোন্ পর্য্যন্ত মিল আছে। এবং, এই কাজ আমি এই প্রণালীতে করিয়াছি যে, সাধারণ মারাঠী পাঠকদিগের নিকট উহার অর্থ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। এখন ইহা নির্ব্বিবাদ যে, এই দুইয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে,—এবং আছেও অনেক—অথবা এই সিদ্ধান্তগুলির যে পূর্ণ উপপাদন বা বিস্তার আছে, তাহা জানিবার জন্য মূল পাশ্চাত্য গ্রন্থই দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিদ্বান বলেন যে, কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিবেক অথবা নীতি-

শাস্ত্রের উপর নিয়মবদ্ধ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে গ্রীক তত্ত্ববেত্তা আরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন ; কিন্তু আমার মত এই যে, আরিষ্টটলেরও পূর্ব্বে, তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, এই সকল প্রশ্নের বিচার মহাভারত ও গীতায় হইয়া গিয়াছিল ; এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গীতায় যে নীতিতত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কোনও নীতিতত্ত্ব এপর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। 'সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় শান্তিতে দিন কাটানো ভাল, অথবা নানাবিধ রাজকীয় জল্পনা-কল্পনা করা ভাল'—এই বিষয়ের যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আরিষ্টটল্ করিয়াছেন, তাহা গীতাতে আছে ; এবং সক্রেটিসের এই মতেরও গীতায় একপ্রকার সমাবেশ হইয়া গিয়াছে যে, 'মনুষ্য যাহা কিছু পাপ করে, তাহা অজ্ঞান হইতেই করে'। কারণ গীতার তো ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি সম হইলে পর, মনুষ্যের দ্বারা কোনও পাপ হইতে পারে না। এপিক্যুরিয়ন এবং ষ্টোয়িক পন্থার গ্রীক পণ্ডিতদিগের এই কথাও গীতায় গ্রাহ্য যে, পূর্ণ অবস্থায় উপনীত জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহারই নীতিদৃষ্টিতে সকলের পক্ষে আদর্শস্বরূপে প্রমাণ ; এবং এই পন্থাবলম্বীগণ পরম জ্ঞানী পুরুষের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার বর্ণনার অনুরূপ। মিল, স্পেন্সর এবং কোঁৎ প্রভৃতি আধিভৌতিকবাদীরা বলেন যে, নীতির পরাকাষ্ঠা অথবা কষ্টি ইহাই যে, প্রত্যেক মনুষ্যকে সমগ্র মানবজাতির হিতার্থ উদ্যোগ করিতে হইবে ; গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ এই বাহ্য লক্ষণে উক্ত কষ্টিরও সমাবেশ হইয়া গিয়াছে। কান্ট্ এবং গ্রীনের, নীতিশাস্ত্রের উপপত্তিবিষয়ক এবং ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তও, উপনিষদের জ্ঞানের ভিত্তিতে গীতাতে আসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা যদি গীতাতে আর বেশী কিছু না থাকিত, তাহা হইলেও উহা সর্ব্বমান্য হইয়া যাইত। কিন্তু গীতা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হন নাই ; প্রত্যুত গীতা দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষ, ভক্তি ও নীতিধর্ম্মের মধ্যে আধিভৌতিক গ্রন্থকারদের নিকট যে বিরোধের আভাস প্রতীত হয়, সে বিরোধ প্রকৃত নহে ; এবং ইহাও দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান ও কর্ম্মে সন্ন্যাসমার্গীদের বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রতিকূলে আসে, তাহাও ঠিক নহে। গীতা দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যার এবং ভক্তির যাহা মূল তত্ত্ব তাহাই নীতির ও সৎকর্ম্মেরও ভিত্তি ; এবং এই বিষয়েরও নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, জ্ঞান, সন্ন্যাস, কর্ম্ম ও ভক্তির যথাযথ মিলনে, ইহলোকে জীবনযাপনের কোন্ মার্গ মনুষ্য স্বীকার করিবে। এই প্রকারে গীতাগ্রন্থ প্রধানত কর্ম্মযোগবিষয়ক হইতেছে, এবং এই জন্যই "ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত (কর্ম্ম) যোগশাস্ত্র" এই নামে সমস্ত বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে উহা অগ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। গীতার বিষয়ে বলা হয় যে, "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবস্তরৈঃ"—এক গীতারই সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট ; অবশিষ্ট শাস্ত্রসমূহের বৃথা আলোচনায় ফল কি ?' এ কথা কিছু মিথ্যা নহে। অতএব যে লোকের হিন্দুধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের প্রতি আমি সবিনয় কিন্তু আগ্রহসহ বলিতেছি যে, সর্ব্বপ্রথম আপনি এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। ইহার কারণ এই যে, ক্ষর-অক্ষর সৃষ্টির এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারকারী ন্যায়, মীমাংসা, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র সে সময়ে, যতদূর সম্ভব ততটা,

পূর্ণ অবস্থায় আসিয়াছিল ; এবং ইহার পরেই বৈদিক ধর্ম্ম জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান এবং কর্ম্মযোগবিষয়ক চরম স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; এবং বর্তমান কালে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্মের মূলই গীতাতে প্রতিপাদিত হইবার কারণে আমি বলিতে পারি যে, সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধরূপে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গীতার তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্যেই নাই।

উল্লিখিত বক্তব্য হইতে পাঠক সাধারণতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা রহস্যের বিচারে কি প্রকারের কোন্ ধরণ হইতেছে। গীতার উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে, তাহার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে পুরাতন টীকাকারদের অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, গীতার উপর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কর্ম্মযোগপ্রধান টীকা ছিল। কিন্তু এ সময়ে এই টীকা উপলব্ধ নাই ; অতএব ইহা বলিতে কোনই ক্ষতি নাই যে, গীতার কর্ম্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক বিচার ইহাই প্রথম। ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আজ্কালকার, টীকাতে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ভিন্ন ; এবং এমন অনেক বিষয়ও বলা হইয়াছে যে, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রাকৃত টীকাতে সবিস্তার কোথাও ছিল না। এই সকল বিষয় এবং ইহাদের উপপত্তি সকল যদিও আমি সংক্ষেপেই বলিয়াছি, তথাপি যথাশক্তি সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য রীতিতে বলিবার উদ্যোগে আমি কোনও বিষয় উঠাইয়া রাখি নাই। এরূপ করিতে গিয়া যদিও কোথাও কোথাও দ্বিরুক্তি হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি উহার কোনই পরোয়া করি নাই ; এবং যে সকল শব্দের অর্থ এ পর্য্যন্ত ভাষাতে প্রচলিত পাই নাই, তাহাদের পর্য্যায় শব্দ উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থলে দিয়াছি। ইহা ব্যতীত, এই বিষয়ে প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত সারাংশরূপে স্থানে স্থানে, উপপাদন হইতে পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে। আরও, শাস্ত্রীয় ও গহনবিষয়সমূহের বিচার, অল্প শব্দে করা সর্ব্বদাই কঠিন এবং এ বিষয়ের ভাষাও এখনও স্থির হয় নাই। অতএব আমি জানি যে, ভ্রমবশতঃ দৃষ্টিদোষে অথবা অন্যান্য কারণে আমার এই নূতন ধরণের আলোচনায় কাঠিন্য, দুর্ব্বোধ্যতা, অপূর্ণতা এবং অন্য কোন দোষ হয়তো থাকিয়া গিয়াছে। পরন্তু ভগবদ্গীতা পাঠকদের কিছু অপরিচিত নহে—উহা হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু নহে, যাহা উহারা কখনও দেখে নাই শুনে নাই। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিত্য নিয়মপূর্ব্বক ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, এবং এরূপ ব্যক্তিও অল্প নাই, যাঁহারা ইহা শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিয়াছেন অথবা করিবেন। এইরূপ অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট আমার এক প্রার্থনা এই যে, যখন তাঁহাদের হাতে এই গ্রন্থ পৌঁছিবে এবং যদি তাঁহারা এই প্রকার কোন দোষ দেখেন, তবে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে তাহা জানাইবেন। এইরূপ করিলে আমি উহার বিচার করিব, এবং যদি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার অবসর আসে, তবে তাহাতে যথাযোগ্য সংশোধন করা যাইবে। সম্ভবতঃ কেহ কেহ মনে করেন যে, আমার কোন বিশেষ সম্প্রদায় আছে এবং সেই সম্প্রদায়ের সিদ্ধির জন্যই আমি গীতার, এক প্রকার বিশেষ অর্থ করিতেছি। এইজন্য এস্থলে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এই গীতারহস্য গ্রন্থ কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লেখা হয় নাই। আমার বিবেচনায় গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোকের যাহা সরল অর্থ হয়,

তাহাই আমি লিখিয়াছি। এইরূপে সরল অর্থ করিয়া দিলে—এবং আজকাল সংস্কৃতের কিছু বহুল প্রচার হইবার কারণে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, অর্থ সরল কি না—যদি ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক গন্ধ আসিয়া যায়, তবে তাহা গীতার, আমার নহে। অর্জুন ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে "আমাকে দুই চার মার্গ বলিয়া ধাঁধায় ফেলিও না, নিশ্চয়পূর্ব্বক এমন একই মার্গ বল যাহা শ্রেয়স্কর" (গী. ৩. ২; ৫. ১); ইহা হইতে সুস্পষ্ট যে, গীতাতে কোন-না-কোন একই বিশেষ মত প্রতিপন্ন হওয়া চাই। মূল গীতারই অর্থ করিয়া, নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে আমার দেখিতে হইবে যে, ঐ একই বিশেষ মত কি প্রকার; প্রথমাবধিই কোনও মত স্থির করিয়া আমার সেই মতের সঙ্গে গীতার মিল হয় না, এইজন্য আমাকে গীতার অর্থের টানাবুনা করিতে হয় নাই। সার কথা, গীতার প্রকৃত রহস্যের—চাই সেই রহস্য কোনও সম্প্রদায়ের অথবা পন্থার হউক—গীতা-ভক্তদের মধ্যে প্রসার করিয়া, ভগবানেরই উক্তি অনুসারে এই জ্ঞানযজ্ঞ করিবার জন্য আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার আশা এই যে, এই জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণ সিদ্ধির জন্য, উপরে যে জ্ঞানভিক্ষা প্রার্থনা করা হইয়াছে, আমার দেশবন্ধু ও ধর্ম্মবন্ধু খুব আনন্দের সহিত সেই ভিক্ষা দিবেন।

প্রাচীন টীকাকারেরা গীতার যে তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন, তাহাতে এবং আমার মতানুযায়ী গীতারহস্যে ভেদ কেন হয়? এই ভেদের কারণ গীতারহস্যে সবিস্তার বলা হইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যদিও এই প্রকার মতভেদ হয়, তথাপি গীতার উপর যে নানা ভাষ্য ও রহস্য আছে এবং পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানকালে গীতার যে ভাষানুবাদ হইয়াছে, সেই সকল হইতে আমি এই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বদাই প্রসঙ্গানুসারে ন্যূনাধিক সহায়তা পাইয়াছি; এই জন্য আমি সে সকলের নিকট অত্যন্ত ঋণী। এই প্রকারই যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থের সিদ্ধান্ত আমি স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদেরও উপকার স্বীকার করা চাই। অধিক কি, যদি এই সকল গ্রন্থের সাহায্য না পাইতাম, তবে এই গ্রন্থ লেখা যাইত কিনা—তাহাতে সন্দেহ আছে। এই জন্যই আমি প্রস্তাবনার আরম্ভেই সাধু তুকারামের এই বাক্য লিখিয়া দিয়াছি—"সাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্তি হইতেছে আমার বাণী;" সদাসর্ব্বদা একভাবের উপযোগী অর্থাৎ ত্রিকাল অবাধিত যে জ্ঞান, তাহার নির্ণয়কারী গীতার ন্যায় গ্রন্থ হইতে কালভেদে মনুষ্য যে নূতন নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কারণ এইরূপ ব্যাপক গ্রন্থের তো ইহাই ধর্ম্ম। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থের উপর এতটা যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কিছু ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার যে অনুবাদ ইংরাজী এবং জর্ম্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও এই ন্যায়ই উপযোগী হইতেছে। এই অনুবাদ গীতার প্রায় প্রাচীন টীকাসমূহের ভিত্তিতেই করা হয়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পন্ডিত স্বতন্ত্র রীতিতে গীতার অর্থ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু খাঁটি (কর্ম্ম, যোগের তত্ত্ব অথবা বৈদিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ভালরূপে বুঝিতে না পারিবার কারণে বা বহিরঙ্গ-পরীক্ষার উপরই ইহাদের বিশেষ রুচি থাকিবার কারণে অথবা এই প্রকারই অন্য কোন কারণে এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই বিচার অধিকতর অপূর্ণ এবং কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও ভ্রমে

পরিপূর্ণ। এখানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গীতাবিষয়ক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিচার করিবার অথবা তাহাদের যাচাই করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যে মুখ্য প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট প্রকরণে আছে। কিন্তু এখানে গীতাবিষয়ক যে সকল ইংরাজী লেখা ইদানীং আমার দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করা উচিত মনে হয়। প্রথম লেখা মিঃ ব্রুক্সের। ব্রুক্স থিয়সফিষ্টপন্থী, ইনি নিজের গীতাবিষয়ক গ্রন্থে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতা কর্ম্মযোগ প্রধান—এবং ইনি নিজের ব্যাখ্যাতেও এই মতই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এস্, রাধাকৃষ্ণম্‌এর; ইহা ক্ষুদ্র নিবন্ধরূপে আমেরিকার 'সার্ব্বরাষ্ট্রীয় নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিকে' প্রকাশিত হয় (জুলাই ১৯১১)। ইহাতে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও নীতিধর্ম্ম, এই দুই বিষয়সম্বন্ধে গীতা ও ক্যাণ্টের সাম্য দেখানো হইয়াছে। আমার মতে এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও কোথাও অধিক ব্যাপক; এবং ক্যাণ্ট অপেক্ষা গ্রীনের নৈতিক উপপত্তি গীতার সহিত কোথাও অধিক মিলে-জুলে। পরন্তু এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা যখন এই গ্রন্থে করাই হইয়াছে, তখন এখানে সেগুলির পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। এই প্রকারই পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণ ও গীতা' নামক এক ইংরাজী গ্রন্থও ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত পণ্ডিতজীর গীতার উপর প্রদত্ত বারো ব্যাখ্যান আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ পড়িলে যে কেহ জানিবে যে, তত্ত্বভূষণজীর অথবা মিঃ ব্রুক্সের প্রতিপাদনে এবং আমার প্রতিপাদনে অনেক প্রভেদ আছে। আরও এই সকল লেখা হইতে জ্ঞাত হয় যে, গীতার কর্ম্মযোগের দিকে লোকদের দৃষ্টি অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব এখানে আমি এই সকল আধুনিক লেখকদিগকে অভিনন্দন করিতেছি।

এই গ্রন্থ মাণ্ডালেতে লিখিয়া তো লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পেন্সিলে লেখা হইয়াছিল; এবং কাটা ছাঁটা ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক নূতন সংশোধন করা হইয়াছিল। এইজন্য সরকারের এখান হইতে ইহা ফিরিয়া আসিলে প্রেসে দিবার জন্য শুদ্ধ নকল করিবার প্রয়োজন হয়। এবং যদি এই কাজ আমারই উপর নির্ভর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তবে ইহার প্রকাশে আরও না জানি কত সময় লাগিয়া যাইত। পরন্তু শ্রীযুক্ত বামনগোপাল জোশী, নারায়ণকৃষ্ণ গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয় পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব পিম্পুটকর, অপ্পাজী বিষ্ণু কুলকর্ণী প্রভৃতি সজ্জনগণ এই কার্য্যে খুব উৎসাহের সহিত সহায়তা করেন; এইজন্য ইঁহাদের উপকার স্বীকার করা চাই। এইরূপই শ্রীযুত কৃষ্ণাজী প্রভাকর খাড়িলকর, এবং বিশেষতঃ বেদশাস্ত্রসম্পন্ন দীক্ষিত কাশীনাথ শাস্ত্রী লেলে বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি পড়িবার কষ্ট স্বীকার করেন এবং অনেক উপযুক্ত ও মর্ম্মার্থসূচক ইঙ্গিত দেন যাহার জন্য আমি ইহাঁদের নিকট ঋণী। আরও স্মরণ থাকে যেন, এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত মত সম্বন্ধে দায়িত্ব আমারই। এই প্রকারে গ্রন্থ ছাপিবার যোগ্য তো হইয়া গেল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে কাগজের অভাবের সম্ভাবনা হইল; বোম্বাইয়ের স্বদেশী কাগজের কারখানার মালিক মেসার্স 'ডি, পদমজী এণ্ড সন্,' আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাল কাগজ যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া, এই অভাব, দূর করিলেন। এই কারণে গীতাগ্রন্থ ছাপিবার জন্য ভাল স্বদেশী কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু

গ্রন্থ আন্দাজ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল, এইজন্য আবার কাগজের অভাব পড়িল। এই অভাব পুনরায় পেপর মিলের মালিকগণ যদি দূর না করিতেন তবে আরও কয়েক মাস পর্য্যন্ত পাঠকদিগের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইত। অতএব উক্ত দুই কারখানার মালিকদিগকে কেবল আমি নহে পাঠকও ধন্যবাদ দিবেন। এখন শেষে প্রুফ সংশোধনের কাজ বাকী রহিল; ইহা শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয় পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব পিম্পুটকর এবং শ্রীযুত হরি রঘুনাথ ভাগবত স্বীকার করেন। ইহাতেও, স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, মূল গ্রন্থের সহিত সে সকল ঠিক ঠিক মিল করা এবং যদি কোন অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল, তাহা দেখাইবার কাজ শ্রীযুত রঘুনাথ ভাগবত একাকীই গ্রহণ করেন। ইহাঁদের সহায়তা ভিন্ন এই গ্রন্থ আমি এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিতাম না। অতএব আমি ইহাঁদের সকলকে হৃদয় হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। এখন রহিল ছাপানো যাহা চিত্রশালা ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী সাবধানে সত্বর ছাপিতে স্বীকার করিয়া তদনুসারে এই কার্য্য পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; এই নিমিত্ত শেষে ইঁহারও উপকার স্বীকার করা আবশ্যক। ক্ষেত্রে ফসল হইয়া গেলেও ফসল হইতে আনাজ প্রস্তুত করা, এবং ভোজনার্থীর মুখে পৌঁছানো পর্য্যন্ত, যে প্রকার অনেক লোকের সহায়তা অপেক্ষা করে, সেইরূপই কতক অংশে গ্রন্থকারের—অন্তত আমার অবস্থা। অতএব উক্ত প্রকারে যাঁহারা আমার সহায়তা করিয়াছেন—চাই তাঁহাদের নাম এখানে আসুক, অথবা নাই আসুক—তাঁহাদিগকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়া আমি এই প্রস্তাবনা সমাপ্ত করিতেছি।

প্রস্তাবনা সমাপ্ত হইল। এখন যে বিষয়ের বিচারে অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং যাহার নিত্য সহবাস ও চিন্তনে মনের সমাধান হইয়া আনন্দ হইত, সেই বিষয় আজ গ্রন্থরূপে হাত-ছাড়া হইবে—ইহা মনে করিয়া যদিও খারাপ লাগিতেছে, তথাপি এইটুকুই সন্তোষ যে, এই বিচার—শোধ হয় তো ব্যাজ সহিত, অন্যথা যেমনটি তেমনি—পরবর্ত্তী বংশের লোকদিগকে দিবার জন্যই আমি পাইয়াছিলাম। অতএব বৈদিক ধর্ম্মের, রজগুহ্যের এই পরশপাথর কঠোপনিষদের "উত্তিষ্ঠত! প্রাপ্য বরান নিবোধত!" (ক. ৩. ১৪)—ওঠ! জাগ! এবং (ভগবৎপ্রদত্ত) এই বর বুঝিয়া লও—এই মন্ত্র দ্বারা আশাস্থল পাঠকদিগকে প্রেম পূর্ব্বক সমর্পণ করিতেছি। প্রত্যক্ষ ভগবানেরই ইহা সুনিশ্চিত আশ্বাসবাক্য যে, ইহাতেই কর্ম্ম-অকর্ম্মের সমস্ত বীজ আছে; এবং এই ধর্ম্মের স্বল্প আচরণও বড় বড় সঙ্কট হইতে বাঁচায়। ইহার অধিক আর কি চাই? সৃষ্টির "না করিলে কিছু হয় না", এই নিয়মের উপর দৃষ্টি দিয়া, তোমার নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্মকর্ত্তা হওয়া চাই, বস্ আর যাহা কিছু সমস্ত হইয়া গেল। কেবল স্বার্থপর বুদ্ধিতে যে গৃহস্থ চলিতে চলিতে হারিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার সময় কাটাইবার জন্য, অথবা সংসারত্যাগী প্রস্তুত করিবার জন্য, গীতা বলা হয় নাই। মোক্ষদৃষ্টিতে সংসার-কর্ম্ম কি প্রকারে করিবে তাহারই বিধান দিবার জন্য, সংসারে মনুষ্যমাত্রের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সেই বিষয়ের উপদেশ দিবার জন্যই তো গীতাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আমার এইটুকুই মিনতি যে, পূর্ব্ব অবস্থাতেই—উঠ্তি বয়সেই—প্রত্যেক মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমের অথবা সংসারের এই প্রাচীনশাস্ত্র যত শীঘ্র সম্ভব, না বুঝিয়া যেন নীরব না থাকেন।

পুণা, অধিক বৈশাখ
সম্বৎ ১৯৭২ বিং
} বাল গঙ্গাধর তিলক

গীতারহস্যের প্রত্যেক প্রকরণে বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা

প্রথম প্রকরণ—বিষয়প্রবেশ

দ্বিতীয় প্রকরণ—কর্ম্মজিজ্ঞাসা

তৃতীয় প্রকরণ—কর্ম্মযোগশাস্ত্র

ত্রয়োদশ প্রকরণ—ভক্তিমার্গ

অল্পবুদ্ধি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের দুর্বোধ্যতা—জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধন, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি—উভয়ের পরস্পরাপেক্ষা—শ্রদ্ধা দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধি—শ্রদ্ধা দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলেও নির্ব্বাহ হয় না—মনে উহা প্রতিফলিত হইবার জন্য নিরতিশয় ও নির্হেতুক প্রেমে পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে হয়—ইহাকেই ভক্তি কহে—সগুণ অব্যক্তের চিন্তা কষ্টকর ও দুঃসাধ্য—অতএব উপাসনার জন্য প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়া চাই—জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ পরিণামে একই—তথাপি জ্ঞানের সদৃশ ভক্তি নিষ্ঠা হইতে পারে না—ভক্তি করিবার জন্য গৃহীত পরমেশ্বরের প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ রূপ—প্রতীক শব্দের অর্থ—রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য শব্দের অর্থ—গীতার প্রেমরস (পৃ. ১২১)—পরমেশ্বরের অনেক বিভূতির মধ্যে যে কোনটী প্রতীক হইতে পারে—অনেকের অনেক প্রতীক এবং তৎসম্ভূত অনর্থ—উহা পরিত্যাগের উপায়—প্রতীক ও তৎসম্বন্ধীয় ভাবনার প্রভেদ—প্রতীক যাহাই হউক, ভাবনা অনুসারে ফল মিলে—বিভিন্ন দেবতার উপাসনা—ইহাতেও ফলদাতা একই পরমেশ্বর, দেবতা নহে—যে কোন দেবতাকে ভজনা কর, তাহাতে পরমেশ্বরেরই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা হয়—এই দৃষ্টিতে গীতার ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা—শ্রদ্ধা ও প্রেমের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা—ক্রমশ উদ্যোগ করিলে সংশোধন এবং অনেক জন্মের পরে সিদ্ধি—যাহার শ্রদ্ধা নাই বুদ্ধি নাই, সে ডুবিয়াছে—বুদ্ধি দ্বারা ও ভক্তি দ্বারা শেষে একই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হয় (পৃ. ৪৩৩)—কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার এবং অধ্যাত্মের সকল সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গেও স্থির থাকে—উদাহরণার্থ গীতার জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ—তথাপি এই সিদ্ধান্তে কখন কখন শব্দ-ভেদ হইয়া যায়—কর্ম্মই এখন পরমেশ্বর হইয়া গিয়াছে—ব্রহ্মার্পণ ও কৃষ্ণার্পণ—কিন্তু অর্থের অনর্থ হইলেও শব্দভেদেও করা যায় না—গীতাধর্ম্মে প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মিলন—ভক্তি-মার্গে সন্ন্যাসধর্ম্মের অপেক্ষা নাই—ভক্তি ও কর্ম্মে বিরোধ নাই ভগবদ্ভক্ত ও লোকসংগ্রহ—স্বকর্ম্ম দ্বারাই ভগবানের যজন-পূজন—জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণের জন্য, ভক্তিমার্গ স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি সকলের জন্য খোলা আছে—অনন্তকালেও অনন্য ভাবে পরমেশ্বরের শরণাগত হইলে মুক্তি—অন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গীতাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ... পৃ. ৩৪৯-৩৮০

চতুর্দ্দশ প্রকরণ—গীতাধ্যায়সঙ্গতি

বিষয়-প্রতিপাদনের দুই রীতি—শাস্ত্রীয় ও সম্বাদাত্মক—সম্বাদাত্মক পদ্ধতির গুণ-দোষ—গীতার প্রারম্ভ—প্রথমাধ্যায়—দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাংখ্য' 'যোগ' এই দুই মার্গ হইতেই আরম্ভ—তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের বিচার—কর্ম্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা—কর্ম্ম দূর হইতে পারে না—সাংখ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেয়স্কর—সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রয়োজন—ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সাধন—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই প্রকার গীতার তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা উচিত নহে—জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্মযোগের সাম্যবুদ্ধির সাধন—অতএব ত্বম্, তৎ, অসি এইপ্রকার ষড়ধ্যায়ী হয় না—সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞান-

বিচার কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্যই, উহা স্বতন্ত্র নহে—সপ্তম অবধি শেষ অধ্যায় পর্য্যন্তের তাৎপর্য—এই অধ্যায়গুলিতেও ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক পৃথক বর্ণিত নাই, পরস্পর একটী অপরে গ্রথিত, উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান এই একই নাম—ত্রয়োদশ অবধি সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্তের সারাংশ—অষ্টাদশের উপসংহার কর্ম্মযোগপ্রধানই—অতএব উপক্রম-উপসংহার আদি মীমাংসকদের দৃষ্টিতে গীতাতে কর্ম্মযোগেই প্রতিপাদ্য নিশ্চিত হইতেছে—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ—অর্থ ও কাম ধর্ম্মানুকূল হওয়া চাই—কিন্তু মোক্ষ ও ধর্ম্মের বিরোধ নাই—গীতার সন্ন্যাসপ্রধান অর্থ কি প্রকারে করা গিয়াছে—সাংখ্য+নিষ্কাম কর্ম্ম=কর্ম্মযোগ—গীতাতে কি নাই?—তথাপি শেষে কর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য—সন্ন্যাস-মার্গীদের নিকটে প্রার্থনা। ... পৃ. ৩৮১-৪০৫

পঞ্চদশ প্রকরণ—উপসংহার

কর্ম্মযোগশাস্ত্র ও আচার-সংগ্রহের ভেদ—ইহা ভ্রান্ত ধারণা যে, বেদান্তের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের উপপত্তি লাগে না—গীতা উপপত্তিই বলিতেছেন—কেবল নীতিদৃষ্টিতে গীতাধর্ম্মের বিচার—কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা—নকুলোপাখ্যান—খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত—'অধিকাংশ লোকের অধিক 'হিত' এবং 'মনোদৈবত' এই দুই পাশ্চাত্য পক্ষের সহিত গীতায় প্রতিপাদিত সাম্যবুদ্ধির তুলনা—পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক পক্ষের সহিত গীতার উপপত্তির সাম্য—কাণ্ট ও গ্রীনের সিদ্ধান্ত—বেদান্ত ও নীতি (পৃ. ৪৭০)—নীতিশাস্ত্রে অনেক পন্থা হইবার কারণ—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনাবিষয়ে মতভেদ। গীতার আধ্যাত্মিক উপপাদনে মহত্ত্বপূর্ণ বিশেষত্ব—মোক্ষ, নীতিধর্ম্ম, এবং ব্যবহারের একবাক্যতা—খৃষ্টানদের সন্ন্যাসমার্গ—সুখহেতুক পাশ্চাত্য কর্ম্মমার্গ—গীতার কর্ম্ম-মার্গের সহিত উহার তুলনা—চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা ও নীতিধর্ম্মের মধ্যে ভেদ—দুঃখনিবারক পাশ্চাত্য কর্ম্মমার্গ ও নিষ্কাম গীতাধর্ম্ম (পৃ. ৫০৩)—কর্ম্মযোগের কলিযুগীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—জৈন ও বৌদ্ধ যতি—শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসী—মুসলমান রাজ্য—ভগবদ্ভক্ত, সন্তমণ্ডলী ও রামদাস—গীতাধর্ম্মের জীবন—গীতাধর্ম্মের অভয়তা, নিত্যতা ও সমতা—ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা। ... পৃ. ৪০৬-৫১৫

পরিশিষ্ট প্রকরণ—গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা

মহাভারতে, যোগ্য কারণে উচিত স্থানে গীতা উক্ত হইয়াছে : উহা প্রক্ষিপ্ত নহে।—ভাগ ১, গীতা ও মহাভারতের কর্ত্তৃত্ব—গীতার বর্ত্তমান স্বরূপ—মহাভারতের বর্ত্তমান স্বরূপ—মহাভারতে গীতাবিষয়ক সাত উল্লেখ—উভয়ের একপ্রকার মিলা-জুলা শ্লোক ও ভাষাসাদৃশ্য—এই প্রকারই অর্থসাদৃশ্য—ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতা ও মহাভারত উভয়ের প্রণেতা একই। ভাগ ২, গীতা ও উপনিষদের তুলনা—শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য—গীতার অধ্যাত্ম জ্ঞান উপনিষদেরই—উপনিষদের এবং গীতার মায়াবাদ—উপনিষদ অপেক্ষা গীতার বিশেষত্ব—সাংখ্যশাস্ত্র ও বেদান্তের একবাক্যতা—ব্যক্তোপাসনা অথবা ভক্তি-মার্গ—কিন্তু কর্ম্ম-যোগমার্গের প্রতিপাদনই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ বিশেষত্ব—গীতায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্য ব্যাখ্যাত যোগ, পাতঞ্জল যোগ ও উপনিষদ।—ভাগ ৩. গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য

—গীতাতে ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ—ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দে গীতার অনেকবার উল্লেখ—উভয়গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার—ব্রহ্মসূত্র, বর্ত্তমান গীতার সমকালীন বা আরও পুরাতন, পরবর্ত্তী নহে—গীতাতে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখের এক প্রবল কারণ।—ভাগ ৪. **ভগবতধর্ম্মের উদয় ও গীতা**—গীতার ভক্তিমার্গ বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ লইয়া হইয়াছে—বেদান্তের মত গীতাতে পূর্ব্বে হইতে মিলানো হয় নাই—বৈদিক ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্ম্মপ্রধান—তদনন্তর জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্ত, সাংখ্য ও বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হয়-উভয়ের একবাক্যতা প্রাচীনকালেই হইয়া গিয়াছিল—আবার ভক্তির প্রাদুর্ভাব—অতএব পূর্ব্বোক্ত মার্গগুলির সঙ্গে ভক্তির একবাক্যতা করা প্রথমেই আবশ্যক—ইহাই ভাগবত-ধর্ম্মের অতএব গীতারও দৃষ্টি—গীতার জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয় উপনিষদের, পরন্তু ভক্তির মিলন অধিক—ভাগবত ধর্ম্মবিষয়ক প্রাচীন 'গ্রন্থ', গীতা ও নারায়ণীয় উপাখ্যান—শ্রীকৃষ্ণের এবং সাত্বত অথবা ভাগবত-ধর্ম্মের উদয়কাল একই—বুদ্ধ হইতে আন্দাজ সাত-আট শত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে—এইরূপ মানিবার কারণ—না মানিলে অনবস্থার উৎপত্তি—ভাগবতধর্ম্মের মূল স্বরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রধান ছিল, পরে ভক্তিপ্রধান হয়, এবং শেষে বিশিষ্টাদ্বৈত প্রধান হয়—মূল গীতা খৃষ্ট হইতে প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বের।—**ভাগ ৫. বর্ত্তমান গীতার কাল**—বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্ত্তমান গীতার সময় একই—তন্মধ্যে বর্ত্তমান মহাভারত ভাসের, অশ্বঘোষের, আশ্বলায়নের, আলেকজাণ্ডারের, এবং মেষাদিগণনার পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু বুদ্ধের পরবর্ত্তী—অতএব শকের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী—বর্ত্তমান গীতা কালিদাসের, বাণভট্টের, পুরাণ ও বৌধায়নের, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান পন্থারও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ শক হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।—**ভাগ ৬, গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ**—গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের এবং বৌদ্ধ অর্হতের বর্ণনা-সাদৃশ্য—বৌদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে উহার উৎপত্তি—উপনিষদের আত্মবাদ ছাড়িয়া কেবল নিবৃত্তিপ্রধান আচারকেই বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন—বৌদ্ধমতানুসারে এই আচারের দৃশ্য কারণ, অথবা চার আর্য্য সত্য—বৌদ্ধ গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও বৈদিক স্মার্তধর্ম্মের সাদৃশ্য—এই সমস্ত বিচার মূল বৈদিক ধর্ম্মেরই—তথাপি মহাভারত ও গীতাবিষয়ক পৃথক বিচার করিবার প্রয়োজন—মূল অনাত্মবাদী ও নিবৃত্তি-প্রধান ধর্ম্ম হইতেই সম্মুখে চলিয়া ভক্তিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব—উহার প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিধর্ম্ম গীতা হইতেই গৃহীত, ইহা মানিবার পক্ষে মহাযান পন্থার উৎপত্তিপ্রমাণ—ইহা হইতে নির্ণীত গীতার সময়।—**ভাগ ৭. গীতা ও খৃষ্টানদের বাইবেল**—খৃষ্টধর্ম্ম হইতে গীতায় কোনও তত্ত্ব গৃহীত হওয়া অসম্ভব—খৃষ্টধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্ম হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র রীতিতে বাহির হয় নাই—উহা কিরূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে প্রাচীন খৃষ্টীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত—এসীন পন্থা ও গ্রীক তত্ত্ব-জ্ঞান—বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বিবাদ প্রাচীনতা—এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে, ইহুদীদিগের দেশে বৌদ্ধ যতিদের প্রবেশ প্রাচীনকালে হইয়া গিয়াছিল—অতএব খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই অথবা গীতা হইতেই গৃহীত হওয়া অত্যন্ত সম্ভব—ইহা হইতে গীতার নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীনতা সিদ্ধ হয়। ... পৃ. ৫১৬-৬০২

সংকেত

অথর্ব. অথর্ব্ব বেদ। কাণ্ড, সূক্ত ও ঋকের যথাক্রমে নম্বর আছে।

অষ্টা. অষ্টাবক্রগীতা। অধ্যায় ও শ্লোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহের সংস্করণ।

ঈশ. ঈশাবাস্যোপনিষৎ। আনন্দাশ্রমের সংস্করণ।

ঋ. ঋগ্বেদ। মণ্ডল, সূক্ত ও ঋক্।

ঐ. অথবা ঐ. উ. ঐতরেয়োপনিষৎ। অধ্যায়, খণ্ড ও শ্লোক। পুণার আনন্দাশ্রমের সংস্করণ।

ঐ. ব্রা. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। পঞ্চিকা ও খণ্ড। ডা. হোগের সংস্করণ।

ক. অথবা কঠ. কঠোপনিষৎ। বল্লী ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রমের সংস্করণ।

কেন. কেনোপনিষৎ (—তলবকারোপনিষৎ)। খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।

কৈ. কৈবল্যোপনিষৎ। খণ্ড ও মন্ত্র। ২৮ উপনিষদ, নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

কৌষী. কৌষীতক্যুপনিষৎ অথবা কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ। অধ্যায় ও খণ্ড। কোথাও কোথাও এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়কেই ব্রাহ্মণানু-ক্রমে তৃতীয় অধ্যায় বলে। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।

গী. ভগবদ্গীতা। অধ্যায় ও শ্লোক। গী, শাংভা. গীতা শাঙ্করভাষ্য। গী. রাভা. গীতা রামানুজভাষ্য। আনন্দাশ্রমের গীতা ও শাঙ্করভাষ্যের পুঁথির শেষে শব্দসূচী আছে। আমি নিম্নলিখিত টীকাগুলির উপযোগ করিয়াছি:—শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসের রামানুজভাষ্য ; কুম্ভকোণের কৃষ্ণাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত মাধ্বভাষ্য ; আনন্দগিরির টীকা এবং জগদ্‌হিতেচ্ছু ছাপাখানাতে (পুণা) মুদ্রিত পরমার্থপ্রপা টীকা ; নেটিব ওপিনিয়ন ছাপাখানায় (বোম্বাই) মুদ্রিত মধুসূদনী টীকা ; নির্ণয়সাগরে মুদ্রিত শ্রীধরী ও বামনী (মরাঠী) টীকা ; আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পৈশাচভাষ্য ; গুজরাটী প্রিণ্টিং প্রেসের বল্লভসম্প্রদায়ী তত্ত্বদীপিকা ; বোম্বাইয়ে মুদ্রিত মহাভারতের নীলকণ্ঠী এবং মান্দ্রাজে মুদ্রিত ব্রহ্মানন্দী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পৈশাচ-ভাষ্য ও ব্রহ্মানন্দীকে ছাড়িয়া অবশিষ্ট টীকা এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের এবং আরও কতকগুলি অন্য টীকা—মোট পনেরো সংস্কৃত টীকা গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস এখন ছাপাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন এই একই গ্রন্থে সমস্ত কাজ হইয়া যায়।

গী. র, অথবা গীতার. গীতারহস্য। আমার পুস্তকের প্রথম নিবন্ধ।

ছাং, ছান্দোগ্যোপনিষৎ। অধ্যায়, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।

জৈ, সূ, জৈমিনির মীমাংসাসূত্র। অধ্যায়, পাদ ও সূত্র। কলিকাতা সংস্করণ।

তৈ, অথবা তৈ, উ, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। বল্লী, অনুবাক ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।

তৈ, ব্রা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
তৈ, সং, তৈত্তিরীয় সংহিতা। কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক ও মন্ত্র।
দা, অথবা দাস, শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীকৃত দাসবোধ। ধুলিয়া-সৎকার্য্যোত্তেজক সভার পুঁথির, চিত্রশালা প্রেসে মুদ্রিত হিন্দী অনুবাদ।
না. পং. নারদপঞ্চরাত্র। কলিকাতা সংস্করণ।
না. সূ, নারদসূত্র। বোম্বাই সংস্করণ।
নৃসিংহ উ. নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ।
পাতঞ্জলসূ, পাতঞ্জলযোগসূত্র। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ।
পঞ্চ, পঞ্চদশী। নির্ণয়সাগরের সটীক সংস্করণ।
প্রশ্ন. প্রশ্নোপনিষৎ। প্রশ্ন ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
বৃ. অথবা বৃহ, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। অধ্যায়, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ। সাধারণ পাঠ কাণ্ব, কেবল একস্থানে মাধ্যন্দিন শাখার পাঠের উল্লেখ আছে।
ব্র. সূ. পরে বেসূ দেখুন।
ভাগ. শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। নির্ণয়সাগর সংস্করণ।
ভা. জ্যো ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র। স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতকৃত।
মৎস্য. মৎস্যপুরাণ। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
মনু. মনুস্মৃতি। অধ্যায় ও শ্লোক। ডাঃ জলির সংস্করণ। মণ্ডলীকের অথবা অন্য যে কোনও সংস্করণে এই শ্লোকই প্রায় একই স্থানে মিলিবে। মনুর উপর যে টীকা আছে, তাহা মণ্ডলীকের সংস্করণের।
মভা. শ্রীমন্মহাভারত। ইহাই পরবর্ত্তী অক্ষর বিভিন্ন পর্ব্বনির্দ্দেশক, নম্বর অধ্যায়ের ও শ্লোকের। কলিকাতায় বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথিরই আমি সর্ব্বত্র উপযোগ করিয়াছি। বোম্বাই সংস্করণে এই শ্লোক কিছু আগে পরে মিলিবে।
মি. প্র. মিলিন্দ প্রশ্ন। পালী গ্রন্থ। ইংরাজী অনুবাদ। S. B. E.
মু. অথবা মুণ্ড, মুণ্ডকোপনিষৎ। মুণ্ডক, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
মৈত্র্য, মৈত্র্যুপনিষৎ অথবা মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ। প্রপাঠক ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
যাজ্ঞ, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি। অধ্যায় ও শ্লোক। বোম্বাইয়ে মুদ্রিত। ইহার অপরার্ক টীকারও (আনন্দাশ্রম সংস্করণ) দুএক স্থানে উল্লেখ আছে।
যো. অথবা যোগ. যোগবাসিষ্ঠ। প্রকরণ, সর্গ ও শ্লোক। ষষ্ঠ প্রকরণের দুই ভাগ, (পূ) পূর্ব্বার্দ্ধ, এবং (উ.) উত্তরার্দ্ধ। নির্ণয়সাগরের সটীক সংস্করণ।
রামপূ. রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
বাজসং. বাজসনেয়িসংহিতা। অধ্যায় ও মন্ত্র। বেবরের সংস্করণ।

বাল্মীকিরা. অথবা বা. রা. বাল্মীকিরামায়ণ। কাণ্ড অধ্যায় ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ।
বিষ্ণু. বিষ্ণুপুরাণ। অংশ, অধ্যায় ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ।
বে. সূ. বেদান্তসূত্র অথবা ব্রহ্মসূত্র। অধ্যায়, পাদ ও সূত্র।
বে. সূ. শাংভা, বেদান্তসূত্র-শাঙ্করভাষ্য। আনন্দাশ্রম সংস্করণেরই সর্ব্বত্র উপযোগ করিয়াছি।
শাংসূ. শাণ্ডিল্যসূত্র। বোম্বাই সংস্করণ।
শিব শিবগীতা। অধ্যায় ও শ্লোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহ সংস্করণ।
শ্বে. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। অধ্যায় ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ।
S. B. E. Sacred Books of the East Series
সাং. কা. সাংখ্যকারিকা। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ।
সূর্য্যগী. সূর্য্যগীতা। অধ্যায় ও শ্লোক। মান্দ্রাজ সংস্করণ।
হরি. হরিবংশ। পর্ব্ব, অধ্যায় ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ।

নোট—ইহা ব্যতীত আরও অনেক সংস্কৃত, ইংরাজী মরাঠী এবং পালী গ্রন্থের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। কিন্তু উহাদের নাম যথাস্থানে প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত হইয়াছে, অথবা তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য উহাদের নাম এই ফিরিস্তিতে সামিল করা হয় নাই।

———

শ্রীগণেশায় নমঃ

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারহস্য

অথবা

কর্ম্মযোগশাস্ত্র

প্রথম প্রকরণ

বিষয়প্রবেশ

—০—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥*

মহাভারত, প্রথম শ্লোক।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নির্ম্মল হীরকখণ্ড। জড়ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানের সহিত আত্মবিদ্যার গূঢ় ও পবিত্র তত্ত্ব সংক্ষেপে এবং অসংদিগ্ধরূপে বিবৃত করে, সেই সকল তত্ত্বের উপর মনুষ্যমাত্রেরই পুরুষার্থ বা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থার পরিচয় করিয়া দেয়, জ্ঞান ও ভক্তিকে মিলাইয়া উভয়কে শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের সহিত সংযুক্ত করে এবং ইহার দ্বারা সংসারের দুঃখক্লিষ্ট মনুষ্যকে শান্তি প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ত্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে, গীতার ন্যায় এরূপ সরল দ্বিতীয় গ্রন্থ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যেও দুর্লভ। কেবল কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহাকে উত্তম কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে; কারণ, ইহাতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ইহা জ্ঞানসমন্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ। যে গ্রন্থে শ্রীভগবানের বাণী হইতে সকল বৈদিক ধর্ম্মের সার গৃহীত হইয়াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করিব? ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন প্রীতিভরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্জ্জুনের পুনরায় গীতা শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ বিনয়পূর্ব্বক এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে "ভগবন্, যুদ্ধারম্ভে তুমি যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে আর একবার তাহা বল।" তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উত্তর দিলেন যে, "সে সময়ে আমি অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে উপদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন পুনর্ব্বার ঐ প্রকার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।" তাহাই অনুগীতার আরম্ভে বলা হইয়াছে (সভা, অশ্বমেধ অ ১৬, শ্লো ১০-১৩)। বাস্তবিক দেখিতে

* "নারায়ণকে, নরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে, সরস্বতীদেবীকে, এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া তাহার পর 'জয়' অর্থাৎ মহাভারত বলিতে শুরু করিবে" ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। মহাভারতে নর ও নারায় এই

গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে ; কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে গীতার মাহাত্ম্য কত অধিক তাহাই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইতেছে। বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর সকলের নিকটেই বেদের ন্যায় সমানরূপে মান্য ও প্রামাণ্য হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থের মহত্ত্বই ইহার মূল কারণ। এই কারণে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ ; গোপালনন্দন স্বয়ং দোগ্ধাস্বরূপ, সুধী পার্থ অর্জ্জুন ভোক্তা বৎসস্বরূপ এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ—গীতাধ্যানে এই স্মৃতি-কালীন গ্রন্থের এইরূপ অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রাকৃত ভাষায় যে ইহার অনেক ভাষান্তর, টীকা অথবা ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশে সংস্কৃতের পরিচয় হইবার পর অবধি গ্রীক, ল্যাটিন, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষাতেও গীতার নানা ভাষান্তর হওয়াতে আজ সমস্ত জগতময় এই অপ্রতিম গ্রন্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

সমস্ত উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছে শুধু তাহা নহে, ইহার পুরা নামও—"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষৎ"। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তিজ্ঞাপক যে সঙ্কল্প আছে তাহাতে "ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" ইত্যাদি শব্দ আছে। এই সংকল্প মূল ভারতে দেওয়া না হইলেও গীতাগ্রন্থের সকল সংস্করণেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু অনুমান হয় যে, নিত্যপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত হইতে গীতাকে পৃথক্ করিয়া বাহির করা হয় তখন হইতে অর্থাৎ গীতার কোনপ্রকার টীকা হইবার পূর্ব্বাবধি উক্ত সংকল্প প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই হিসাবে গীতার তাৎপর্য্যনির্দ্ধারণে উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পরে বলা যাইবে। আপাতত সংকল্পবাক্যের মধ্যে "ভগবদ্গীতাসু" এবং "উপনিষৎসু" এই দুই পদের বিচার করা কর্ত্তব্য। "উপনিষৎ" শব্দ মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ; সুতরাং "শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষৎ" এই অর্থ প্রকাশ করিবার কারণে সংস্কৃতভাষায় "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ" এই দুই বিশেষণ বিশেষ্যরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং গ্রন্থ এক হইলেও সম্মানার্থে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই বহুবচনান্ত সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যেই "ইতি গীতাসু" এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু নামের সংক্ষেপ করিবার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয়, পদ, এমন কি শেষের 'উপনিষৎ' এই জাতিবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যক্ত হইয়া 'কেন', 'কঠ',

---

* দুই ঋষি দুই স্বরূপে দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ পরমাত্মাই ; এবং ইঁহারাই দুই জনে পরে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই অবতার হইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে বর্ণিত আছে (মং ভাং উ. ৪৮।৭-৯ ও ২০-২২ ; এবং বন. ১২।৪৪-৪৬)। ইঁহারাই নিষ্কামকর্ম্মপর নারায়ণীয় ও ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত করায় সকল ভাগবত-ধর্ম্মীয় গ্রন্থের আরম্ভে ইঁহাদিগকেই নমস্কার করা হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকে "ব্যাস"-এর পরিবর্ত্তে 'চৈব', এইরূপ পাঠ প্রদত্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু ওরূপ করা আমার যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ, ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের ন্যায় এই ধর্ম্মের দুই মুখ্য গ্রন্থ ভারত ও গীতা যিনি লিখিয়াছেন, সেই ব্যাসও আমার মতে নমস্য। মহাভারতের প্রাচীন নাম 'জয়' (মং ভাং আ. ৬২।২০)।

'ছান্দোগ্য' এই প্রকার সংক্ষিপ্ত নামের অনুসরণ করিয়া "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎ" এই দুই একবচনান্ত প্রথমা বিভক্তিবিশিষ্ট শব্দের প্রথমে "ভগবদ্গীতা", পরে কেবল 'গীতা' এই স্ত্রীলিঙ্গী অতি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে। 'উপনিষৎ' এই শব্দ যদি মূল নামে না থাকিত তাহা হইলে 'ভাগবতম্' 'ভারতম্' 'গোপীগীতম্' এই সকল শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থেরও নাম 'ভগবদ্গীতম্' কিংবা শুধু 'গীতম্' এইরূপ ক্লীবলিঙ্গী হইত। তাহা না হইয়া 'ভগবদ্গীতা' কিংবা 'গীতা' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গী শব্দই আজ পর্য্যন্ত বজায় থাকাতেই তাহার সহিত 'উপনিষৎ' এই শব্দ নিত্য অধ্যাহৃত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অনুগীতার উপর অর্জ্জুন মিশ্রের টীকাতে 'অনুগীতা' এই শব্দের অর্থও এইরূপেই করা হইয়াছে।

কিন্তু 'গীতা' এই শব্দ কেবল সপ্তশতশ্লোকী ভগবদ্গীতাতেই প্রযুক্ত হয় নাই, উহা আরো অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত মোক্ষপর্ব্বের কোন কোন বিচ্ছিন্ন প্রকরণের 'পিঙ্গলগীতা' 'শম্পাকগীতা' 'মঙ্কিগীতা', 'বোধ্যগীতা', 'বিচখ্নুগীতা', 'হারীতগীতা', 'বৃত্রগীতা', 'পরাশরগীতা' এবং 'হংসগীতা' এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুগীতার এক ভাগ 'ব্রাহ্মণগীতা' এই বিশিষ্ট নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'অবধূতগীতা', 'অষ্টাবক্রগীতা', 'ঈশ্বরগীতা', 'উত্তরগীতা', 'কপিলগীতা', 'গণেশগীতা', দেবীগীতা', 'পাণ্ডবগীতা', 'ব্রহ্মগীতা', 'ভিক্ষুগীতা', 'যমগীতা', 'রামগীতা', 'ব্যাসগীতা', 'শিবগীতা', 'সূতগীতা', 'সূর্য্যগীতা' প্রভৃতি আরো অনেক গীতা প্রসিদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—গণেশগীতা গণেশপুরাণের শেষে ক্রীড়াখণ্ডের ১৩৮ হইতে ১৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে। এই গণেশগীতা অল্পাধিক পরিবর্তন সহকারে ভগবদ্গীতারই অবিকল নকল, এরূপ বলিলে কোন ক্ষতি নাই। 'ঈশ্বরগীতা' কূর্ম্মপুরাণের উত্তরভাগের প্রথম এগার অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'ব্যাসগীতার' আরম্ভ হইয়াছে। এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতার চতুর্থ অর্থাৎ যজ্ঞবৈভব খণ্ডের উপরিভাগের প্রারম্ভে (১ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত) 'ব্রহ্মগীতা' এবং ব্রহ্মগীতার পরবর্ত্তী আট অধ্যায়ে 'সূতগীতা' আছে। স্কন্দপুরাণের এই ব্রহ্মগীতা হইতে স্বতন্ত্র আর এক ব্রহ্মগীতা, যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণপ্রকরণের উত্তরার্দ্ধে (১৭৩ হইতে ১৮১ সর্গ পর্য্যন্ত) প্রদত্ত হইয়াছে। 'যমগীতা' তিন প্রকারের—প্রথমটি বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি অগ্নিপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের ৩৮১ অধ্যায়ে, এবং তৃতীয়টি নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। 'রামগীতার' কথাও এইরূপ। এখানে মহারাষ্ট্রদেশে যে রামগীতা প্রচলিত আছে তাহা অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অধ্যাত্মরামায়ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একভাগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীত আর এক রামগীতা মাদ্রাস অঞ্চলে প্রসিদ্ধ 'গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠতত্ত্বসারায়ণ' নামক গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বেদান্ত-মূলক গ্রন্থ। ইহাতে জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্ম এই তিনটি কাণ্ড আছে। তন্মধ্যে উপাসনাকাণ্ডের দ্বিতীয় পাদের

প্রথম ১৮ অধ্যায়ে রামগীতা এবং কর্ম্মকাণ্ডের তৃতীয় পাদের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে 'সূর্য্যগীতা' বিবৃত হইয়াছে। কথিত আছে যে, 'শিবগীতা' পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আছে। কিন্তু এই পুরাণের পুনাস্থিত আনন্দাশ্রমে যে সংস্করণ ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পদ্মোত্তর পুরাণে উহা পাওয়া যায় এই কথা পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ স্বরচিত "অষ্টাদশপুরাণদর্শন" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। নারদপুরাণে, অন্য পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুরাণেরও যে বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের ১১শ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে হংসগীতা এবং ২৩শ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতা বিবৃত হইয়াছে*। তৃতীয় স্কন্ধের কপিলোপাখ্যানের (২৩—৩৩) "কপিলগীতা" এই নামও কেহ কেহ দিয়া থাকেন। কিন্তু কপিলগীতা বলিয়া এক স্বতন্ত্র মুদ্রিত গ্রন্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই কপিলগীতায় হঠযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পদ্মপুরাণে এই গীতা পাওয়াই যায় নাই। ইহার এক স্থলে (৪।৭) জৈন, জঙ্গম (লিঙ্গায়ৎ) এবং সূফী (মুসলমান সাধু), ইহাদেরও উল্লেখ থাকায় এই গীতা মুসলমানী আমলের হইবে, এইরূপ বলিতে হয়। ভাগবত পুরাণের ন্যায় দেবীভাগবতেও সপ্তম স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪০ অধ্যায় পর্য্যন্ত এক গীতা আছে, দেবীকর্ত্তৃক কথিত বলিয়া তাহার নাম দেবীগীতা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, স্বয়ং ভগবদ্গীতার সার অগ্নিপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের ৩৮০ অধ্যায়ে এবং গরুড় পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ আবার, বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই যোগবাসিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। পরন্তু এই গ্রন্থের শেষ (অর্থাৎ নির্ব্বাণ) প্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট কথিত ভগবদ্গীতার সার, এমন কি, ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোক যেমনটি তেমনিই বজায় রাখিয়া গ্রথিত করা হইয়াছে (যোগ ৬ পূ. ৫২-৫৮ দেখ)। উপরে বলিয়াছি যে, পুনায় মুদ্রিত পদ্মপুরাণে শিবগীতা পাওয়া যায় না; কিন্তু শিবগীতা না পাওয়া গেলেও এই সংস্করণের উত্তর খণ্ডের ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায় ধরিয়া এই মাহাত্ম্যের এক এক অধ্যায় রচিত হইয়াছে, এবং উহাতে এই সম্বন্ধীয় কথাও বিবৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বরাহপুরাণে এক গীতামাহাত্ম্য আছে। শিবপুরাণে এবং বায়ুপুরাণেও গীতামাহাত্ম্য আছে বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কলিকাতায় মুদ্রিত বায়ুপুরাণে আমি তাহা পাই নাই। ভগবদ্গীতার মুদ্রিত সংস্করণের আরম্ভে 'গীতাধ্যান' নামক এক নূতন শ্লোকপ্রকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহার "ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা" এই শ্লোক অল্প শব্দভেদে সম্প্রতি প্রকাশিত ভাস কবির "উরুভঙ্গ" নামক নাটকের আরম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই ধ্যান ভাসকবির সময়ের পরে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কারণ, ভাসের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি এই শ্লোক গীতাধ্যান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার করা অপেক্ষা, গীতাধ্যানই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ও কতকগুলি নূতন শ্লোক রচনা করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। ভাসকবি কালিদাসের

পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার কাল অন্তত তিনশত শকের (৪৩৫ সংবৎ) অধিক অর্ব্বাচীন হইতে পারে না।

ভগবদ্গীতার কোন্ কোন্ অনুবাদ ও কতগুলি অনুবাদ, এবং অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত নকল, তাৎপর্য্য কিংবা মাহাত্ম্য পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধ হইবে। 'অবধূত', 'অষ্টাবক্র' প্রভৃতি দুই চারিটি গীতা স্বতন্ত্রভাবে কাহার কর্ত্তৃক রচিত হয় অথবা কবে কোন্ পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তথাপি এই সমস্ত গীতার রচনা এবং তদন্তর্গত বিষয় বিবেচনা দেখিলে অনুমান হয় যে, এই সকল গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়া লোকমান্য হইবার পর রচিত হইয়া থাকিবে। এই সকল গীতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেও কোনই ক্ষতি নাই যে, ভগবদ্গীতার ন্যায় দুই একটি গীতা কোন বিশিষ্ট পন্থায় বা পুরাণে না থাকিলে সেই পন্থা বা পুরাণের পূর্ণতা হয় না এই ধারণাতেই সেই গীতাগুলি রচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় যেরূপ ভগবান অর্জ্জুনে বিশ্বরূপ দেখাইয়া জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, শিব-গীতা, দেবী-গীতা, গণেশগীতাতেও সেই প্রকার বর্ণনা আছে। শিবগীতা ঈশ্বরগীতা প্রভৃতির মধ্যে ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে, এই সকল গীতায় ভগবদ্গীতা হইতে কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না; বরঞ্চ, অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে মিলন সাধনে ভগবদ্গীতায় যে একটা অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখা যায়, সেরূপ নৈপুণ্য আর কোন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবদ্গীতায় পাতঞ্জল-যোগ বা হঠযোগ এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের, যথোচিত বর্ণন না দেখিয়া উহার পূর্ণতাসাধনের হিসাবে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনচ্ছলে কোন ব্যক্তি পরে উত্তরগীতা রচনা করিয়াছেন। 'অবধূত', 'অষ্টাবক্র' প্রভৃতি গীতা নিছক একদেশীয়—সেগুলিতে কেবল সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যমগীতা, পাণ্ডবগীতা কেবল ভক্তিবিষয়ক সংক্ষিপ্ত স্তোত্রমাত্র। শিবগীতা, গণেশগীতা এবং সূর্য্যগীতা এ প্রকার নহে। যদিও উহাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন সম্বন্ধে সযৌক্তিক সমর্থন আছে সত্য, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার অনেকাংশ ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত, সুতরাং উহাতে কোন নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সকল কারণে ভগবদ্গীতার গম্ভীর ও ব্যাপক তেজের সম্মুখে, পরবর্ত্তীকালে রচিত এই সকল পৌরাণিক গীতা দাঁড়াইতে পারে নাই, বরঞ্চ এই সকল নকল গীতার কারণেই ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য অধিকতর ব্যক্ত ও স্থাপিত হইয়াছে। এই কারণেই "গীতা" শব্দের অর্থে "ভগবদ্গীতাই" মুখ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছে। "অধ্যাত্মরামায়ণ" ও "যোগবাসিষ্ঠ" এই দুই গ্রন্থ বিস্তৃত হইলেও উহা যে ভগবদ্গীতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা হইতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের "গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠ-তত্ত্বসারায়ণ" কাহারও কাহারও মতে অতীব প্রাচীন; কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। তাহাতে যে ১০৮ উপনিষদের উল্লেখ আছে তাহাদের প্রাচীনতা সিদ্ধ হইতে পারে না। সূর্য্যগীতায় বিশিষ্টাদ্বৈত মতের উল্লেখ পাওয়া যায় (৩.৩০) এবং কোন কোন স্থানের যুক্তিক্রমও যেন ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়

* উপরি-উক্ত অনেক গীতা এবং ভগবদ্গীতা শ্রীযুক্ত হরি রঘুনাথ ভাগবত সম্প্রতি পুনা হইতে বাহির করিতেছেন।

(১৬৮)। সুতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবর্ত্তী কালে, এমন কি, শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান হয়।

গীতা অনেকগুলি থাকিলেও ভগবদ্‌গীতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বিবাদ বলিয়া এইরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় উত্তরকালীন বৈদিক পণ্ডিতেরা অন্যান্য গীতার প্রতি বেশী মনোযোগ না দিয়া কেবল ঐ ভগবদ্‌গীতার পর্য্যালোচনা করিয়াই তদন্তর্গত তাৎপর্য্য স্বকীয় ধর্ম্মশ্রোতাদিগকে বলার সার্থকতা আছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের পর্য্যালোচনা দুই প্রকারে হইতে পারে; এক অন্তরঙ্গ-পর্য্যালোচনা, আর দ্বিতীয় বহিরঙ্গপর্য্যালোচনা। সমগ্র গ্রন্থ দেখিয়া তাহার মর্ম্ম, রহস্য, মথিতার্থ ও প্রমেয় প্রভৃতি বাহির করার নাম অন্তরঙ্গ পর্য্যালোচনা। গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ–কাব্য-দৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ষপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গ্রন্থের কালনির্ণয় করা যাইতে পারে কিনা, অথবা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কোন নির্ণয় হইতে পারে কিনা, গ্রন্থান্তর্গত বিচার-আলোচনা স্বতন্ত্র বা অন্যের নিকট হইতে গৃহীত, যদি অপরের নিকটে হইতে গৃহীত হয় তবে কোথা হইতে কোন্‌টা গৃহীত, এই সকল বাহ্যাঙ্গের বিচার-আলোচনাকেই বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনা বলে। গীতা সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভাষ্য ও টীকা আছে, তাঁহারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে ভগবদ্‌গীতার ন্যায় অলৌকিক গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিবার সময় ঐ সকল বহিরঙ্গের আলোচনা করা, আর কোন উত্তম পুষ্প পাইয়া তাহার সুগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দর্য্যে কৌতুহলাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল তাহার পাপড়ী গণনা করা অথবা মধুভরা মৌচাক হস্তে পাইয়া তাহার কতগুলি মধুচ্ছিদ্র আছে তাহার অনুসন্ধান করা, উভয়ই সমান—কেবল বৃথা সময় ক্ষেপণ মাত্র। পরন্তু, এক্ষণে পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতদিগের অনুকরণে এদেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন। গীতার মধ্যে আর্ষপ্রয়োগ সকল দেখিয়া এক ব্যক্তি এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বিশুখৃষ্ট জন্মিবার কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা হইতে গীতার অন্তর্ভূত ভক্তিমার্গ তদুত্তরকালে প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম হইতে গৃহীত কি না এই সংশয় নির্মূল হইয়া যায়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে যে নাস্তিক মতের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় বৌদ্ধ-ধর্ম হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া, অপর এক ব্যক্তি বুদ্ধানন্তর গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ বলিয়াছেন। তৃতীয় আর এক ব্যক্তি এইরূপ বলেন যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব' এই শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ থাকায় গীতা ব্রহ্মসূত্রের পরে হইয়া থাকিবে। উল্টা পক্ষে একথাও কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মসূত্রের অনেক স্থানে গীতার প্রমাণ মীমাংসারূপে গৃহীত হওয়ায় গীতা তদুত্তরকালীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আরও কতকগুলি লোক এইরূপ বলেন যে, ভারতীয় যুদ্ধে রণভূমির উপর সাতশত-শ্লোকী গীতা অর্জ্জুনকে বলার অবকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, যখন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দশ কুড়িটি শ্লোক এবং তাহার অর্থ বলিয়াছিলেন এবং

ঐ সকল শ্লোক বিস্তৃতভাবে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে, ব্যাস শুককে, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে, এবং পরে সূত শৌনককে বলিয়াছিলেন; অথবা সর্ব্বশেষে যাঁহা কর্তৃক মূল ভারত 'মহাভারতে' পরিণত হয় তাঁহা কর্তৃক উহা লিখিত হইয়া থাকিবে। গীতাগ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে মনের এইরূপ ধারণা হইবার পর, গীতাসাগরে ডুব দিয়া গীতার মূল শ্লোক কেহ সাত, * কেহ আঠাইশ, কেহ ছত্রিশ, কেহ বা একশত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, রণভূমির উপর অর্জ্জুনকে গীতান্তর্ভূত ব্রহ্মজ্ঞান বলিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না; বেদান্তসম্বন্ধীয় এই উত্তম গ্রন্থ পরে কেহ মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনার এই সকল কথা যে সর্বথা নিরর্থক তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে উপরে কথিত ফুলের পাপড়ীর কথা কিংবা মৌচাকের ছিদ্রের কথা ধরা যাক্। বৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় অবশ্য তাহাদের ফুলের পাপড়ীরও বিচার নিশ্চয়ই করিতে হয়। সেইরূপ গণিতের সাহায্যে এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধুর পরিমাণ (ঘনফল) কম হইবে না, অথচ পরিবেষ্টনের পরিমাণ (পৃষ্ঠফল) যাহাতে খুব কম হইয়া মোমের খরচ কম হয় এইরূপ আকারের মধু ধারণ করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে এবং তাহার দরুণ মৌমাছিদিগের দৈহিক কারুকার্য্য পরিব্যক্ত হয়। এই প্রকারের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে গীতার বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং উহার মাহাত্ম্য বিষয়ক সিদ্ধান্তেরও কিছু কিছু বিচার করিয়াছি। কিন্তু গ্রন্থের রহস্য যিনি বুঝিতে চাহিবেন, বহিরঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ায় তাঁহার কোন লাভ নাই। বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ সেবক—এই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আ-পাতালনিমগ্নপীবরতনুর্জানাতি মন্থাচলঃ॥

অর্থাৎ সমুদ্রের অগাধ গভীরতা জানিতে চাহিলে কাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবে? রামরাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গে শত শত সাহসী ও চপল বড় বড় বানরবীর অক্লেশে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের কয়জন সমুদ্রের গভীরতার পরিচয় পাইয়াছিল? সমুদ্রমন্থনের সময় দেবতারা যে প্রকাণ্ড পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্রতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যে পর্ব্বত সমুদ্রের নীচে পাতাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, সেই মন্দরপর্ব্বতই সমুদ্রের গভীরতা জানিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুরারি কবির এই যুক্তি অনুসারে গীতার রহস্য জানিতে হইলে, যে সকল পণ্ডিত ও আচার্য্য গীতাসাগর মন্থন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহেরই প্রতি অগ্রসর হওয়া উচিত। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহাভারতকারই অগ্রগণ্য। অধিক কি, তিনি অধুনাতন প্রসিদ্ধ গীতার একপ্রকার রচয়িতা বলিলেও হয়। তাই সেই মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য কি প্রথমে তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

* সম্প্রতি এক সপ্তশ্লোকী গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে কেবল এই সাতটি শ্লোক আছে—(১) ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি (গী. ৮. ১৩); (২) স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা ইত্যাদি (গী. ১১. ৩৬); (৩) সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ ইত্যাদি (গী. ১৩, ১৩); (৪) কবিং পুরাণমনুশাসিতারং ইত্যাদি (গী. ৮. ৯); (৫) উর্দ্ধমূলমধঃশাখং ইত্যাদি (গী. ১৫.১); (৬) সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টম্ ইত্যাদি (গী. ১৫. ১৫); (৭) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো ইত্যাদি (গী. ১৮.৬৫)। এই প্রকার আরো অনেক সংক্ষিপ্ত গীতা আছে।

'ভগবদ্গীতা' কিংবা 'ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষৎ' এই নাম হইতেই, গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ, অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রীভগবান' এই নাম ভাগবত ধর্ম্মেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই উপদেশ কিছু নূতন নহে; পূর্ব্বে এই উপদেশই ভগবান কর্তৃক বিবস্বানকে, বিবস্বান কর্তৃক মনুকে এবং মনু কর্তৃক ইক্ষ্বাকুকে দেওয়া হয়, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভেই (গী. ৪ অ. ১-৩) এইরূপ বলা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় বা ভাগবত-ধর্ম্মের যে সবিস্তার বিবৃতি আছে তাহাতে ব্রহ্মদেবের অনেক জন্ম অর্থাৎ কল্পান্তরে, ভাগবত-ধর্ম্মের পারম্পর্য্য বর্ণনা করিবার পর, পরিশেষে ব্রহ্মদেবের বর্তমান জন্মের অন্তর্ভূত ত্রেতাযুগে "এই ভাগবত ধর্ম্ম বিবস্বান-মনু-ইক্ষ্বাকুর পরম্পরায় প্রসৃত হইয়াছে" এইরূপ বলা হইয়াছে—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ।
ইক্ষ্বাকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ॥

(ম ভা, শা, ৩৪৮, ৫১, ৫২)।

এই দুই পরম্পরারই পরস্পর মিল আছে (গীতা ৪. ১ এর উপরে আমার টীকা দেখুন)। দুই ভিন্ন ধর্ম্মের পারম্পর্য্য এক হইতে পারে না; তাই পারম্পর্য্যের ঐক্যের কারণে গীতাধর্ম্ম ও ভাগবত-ধর্ম্ম যে এক তাহাই অনুমান করা সহজ হয়। কিন্তু এই বিষয়টা কেবল অনুমান অবলম্বন করিয়াই আছে এরূপ নহে। নারায়ণীয় বা ভাগবত-ধর্ম্মের নিরূপণ বিষয়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন—

এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই ভাগবত-ধর্ম্ম বিধিযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে হরিগীতাতে অর্থাৎ ভগবদ্গীতাতে পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি" (ম ভা. শা. ৩৪৬. ১০)। ইহার পর এক অধ্যায় ছাড়িয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (মভা, শা ৩৪৮, ৮) নারায়ণীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে আরও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে—

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং॥

"কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈন্য সজ্জিত থাকিলে অর্জ্জুন যখন বিমনস্ক অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, তখন তাঁহাকে ভগবান্ স্বয়ং এই উপদেশ দিয়াছিলেন"। ইহা হইতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'হরিগীতা' শব্দে 'ভগবদ্ গীতা'ই এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে। গুরুপরম্পরার ঐক্য ব্যতীত ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যে ভাগবতধর্ম্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের বিষয়ে দুইবার বলা হইয়াছে, উহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উহাকেই "শাশ্বত" ও ঐকান্তিক ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ইহার বিচারকালে দুই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

নারায়ণপরো ধর্ম্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ॥ (শা, ৩৪৭, ৮০-১)

"এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং প্রবৃত্তিপরও বটে"। ইহার পর এই ধর্ম্ম কিরূপে প্রবৃত্তিপর মহাভারতে তাহারপুনরায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ চাতুর্বর্ণ্যবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মেই রত থাকা—এই অর্থে প্রবৃত্তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাগবত ধর্ম্মেরই উপদেশ, এবং উপরি উক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিপর হওয়া প্রযুক্ত ঐ উপদেশ প্রবৃত্তিপর বলিয়াই যে মহাভারতকার বুঝিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তথাপি যদি ইহা বলা যায় যে গীতাতে কেবল প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্মই আছে তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে পুনরায় বলিয়াছেন—

যতীনাং চাপি যো ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বম্ নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

"যতির অর্থাৎ সন্ন্যাসীর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও, হে রাজন! তোমাকে পূর্বে ভগবদ্গীতাতে যথাবিধি ও সংক্ষেপে বলিয়াছি"। (ম ভা. শাং. ৩৪৮ ৫৩)। কিন্তু যদিও প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মের সঙ্গেই যতির নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও গীতাতে বলা হইয়াছে তথাপি মনু ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি গীতাধর্ম্মের যে পারম্পর্য্য গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে, যতিধর্ম্মের সহিত তাহার একেবারেই মিল হয় না; কেবল ভাগবত ধর্ম্মেরই পারম্পর্য্যের সহিত তাহার মিল হয়। উপরি উক্ত বচন হইতে মহাভারতকারেরও এই অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা মুখ্যরূপে মনু, ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি পরম্পরায় আগত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্মেরই উপদেশ; এবং উহাতে আনুষঙ্গিক ক্রমে নিবৃত্তিপর যতিধর্ম্মের বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারতের এই প্রবৃত্তিপর নারায়ণীয় ধর্ম্ম এবং ভাগবত পুরাণের ভাগবত ধর্ম্ম মূলে যে একই, তাহা পৃথু, প্রিয়ব্রত, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তদিগের কথা হইতে এবং ভাগবতে বর্ণিত নিষ্কাম কর্ম্মের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় (ভাগবত ৪. ২১. ৫১, ৫২; ৭. ১০. ২৩ ও ১১. ৪.৬ দেখ)। কিন্তু ভাগবত ধর্ম্মের কর্ম্মপর প্রবৃত্তিতত্ত্বের সমর্থন ভাগবতপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এই সমর্থন মহাভারতে এবং বিশেষভাবে গীতাতে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমর্থনের সময় ভাগবত ধর্ম্মের ভক্তি-রহস্য যথোচিত দেখাইতে ব্যাস ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে ভাগবতের প্রথম অধ্যায়-গুলিতে (ভাগ. ১. ৫. ১২) লিখিত হইয়াছে যে, ভক্তি বিনা কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যর্থ ইহা বিবেচনা করিয়া এবং ভারতের এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ভাগবত পুরাণ পরে রচিত হইয়াছে ইহাতেই ভাগবত পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। সেই উদ্দেশ্য এই যে, ভাগবতে অনেক প্রকারের হরিকথা বলিয়া ভাগবত ধর্ম্মের ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য যেরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, ভাগবত ধর্ম্মের কর্ম্মপর অঙ্গের আলোচনা সে প্রকার করা হয় নাই। অধিক কি, ভাগবতকার ইহাই বলিতে চাহেন যে সমস্ত কর্ম্মযোগ ভক্তি ব্যতীত নিষ্ফল (ভাগ ১ ৫. ৩৪)। তাই গীতার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে যে মহাভারতে গীতা উক্ত হইয়াছে তাহাতে নারায়ণীয় উপাখ্যান যেমন উপযোগী দেখা যায়, ভাগবত পুরাণ ভাগবত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় হইলেও কেবল ভক্তিপ্রধান বলিয়া উহা সেরূপ উপযোগী হইতে পারে না। আর, যদিবা উহার কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায়, তথাপি এ কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে,

ভারত ও ভাগবত এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং রচনাকাল বিভিন্ন। নিবৃত্তিপর যতিধর্ম্ম এবং প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্ম ইহাদের মূল স্বরূপ কি, ইহাদের এই ভেদ ঘটিবার কারণ কি, মূল ভাগবত ধর্ম্মের এই সময়ে কি ভাবে রূপান্তর হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার পরে করা যাইবে।

ইহা বুঝা গিয়াছে যে স্বয়ং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য কি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ গীতার কি তাৎপর্য্য স্থির করিয়াছেন। এই ভাষ্য ও টীকাসমূহের মধ্যে আজকাল শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গীতা-ভাষ্য অতি প্রাচীন বলিয়া সকলের স্বীকৃত। যদিও ইহার পূর্ব্বে গীতার অনেক ভাষ্য ও টীকা যে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু সে সকল টীকা এক্ষণে পাওয়া যায় না; এবং সেই কারণে জানিবার উপায় নাই যে, মহাভারতের রচনাকাল অবধি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত গীতার অর্থ কি ভাবে করা হইত। তথাপি শঙ্কর-ভাষ্যেতেই এই প্রাচীন টীকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে (গী, শাংগা. অ. ২ ও ৩ এর উপোদ্‌ঘাত দেখুন), তাহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাভারতকারের ন্যায় আচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারেরা গীতার অর্থ জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়াত্মক বলিয়াই ধরিতেন, অর্থাৎ উহার এই প্রবৃত্তিপর অর্থ করা হইত যে, জ্ঞানী মনুষ্যের জ্ঞান অনুসারেই আমরণ স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মযোগের এই সিদ্ধান্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট মান্য না হওয়ায় তিনি তাহা খণ্ডন করিয়া নিজের মতে গীতার তাৎপর্য্য বুঝাইবার অভিপ্রায়েই গীতা-ভাষ্য লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের আরম্ভের উপোদ্‌ঘাতে এই কথা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন। 'ভাষ্য' শব্দের অর্থ ইহাই। 'ভাষ্য' ও 'টীকা', এই দুই শব্দ অনেক সময়ে সমান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু সাধারণতঃ 'টীকা'তে মূল গ্রন্থের সরল অন্বয় করিয়া শব্দের অর্থ সুগম করা হয়। ভাষ্যকার এইটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া, ন্যায্যভাবে সমস্ত গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করেন এবং তাঁহার মতে গ্রন্থের তাৎপর্য্য কি ও তদনুসারে গ্রন্থের কিরূপ অর্থ করা হইবে, তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গীতার শাঙ্কর-ভাষ্যের স্বরূপও এই প্রকার। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্যবিচারে আচার্য্য যে ভেদ করিয়াছেন তাহার বীজ-সূত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ইতিহাস এখানে একটু বলা আবশ্যক। বৈদিক ধর্ম্ম কেবল তান্ত্রিক ধর্ম্ম নহে; উহাতে যে গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহার সূক্ষ্ম বিচার প্রাচীন কালেই উপনিষদ্‌সমূহের ভিতরেই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সকল উপনিষদ্ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিচার-বিভিন্নতাও আসিয়া পড়িয়াছে। এই সকল বিচার-বিরোধ মিটাইবার জন্যই বাদরায়ণ আচার্য্য নিজ বেদান্তসূত্রে সমস্ত উপনিষদেরই একবাক্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং এই কারণে বেদান্তসূত্রও উপনিষদ্‌সমূহকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। এই বেদান্ত সূত্রের অন্য নাম হইতেছে 'ব্রহ্মসূত্র, বা 'শারীরক সূত্র'। তথাপি বৈদিকধর্ম্মান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ বিচার এইটুকুতেই হইতে পারে না। কারণ, উপনিষদের উপদিষ্ট জ্ঞান প্রায়ই বৈরাগ্যপর অর্থাৎ নিবৃত্তিপর; এবং উপনিষদের একবাক্যতা সম্পাদন করিবার জন্যই বেদান্তসূত্র রচিত হওয়ায়, উহাতে কোথাও প্রবৃত্তিমার্গের সবিস্তার বিচার করা হয় নাই। তাই, প্রবৃত্তিমার্গপ্রতিপাদক ভগবদ্‌গীতা বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানের এই অভাব যখন

সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ করিলেন, তখন উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতাসম্পাদক গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা এই হিসাবেই উহাদের সহিত সমানরূপে সর্ব্বমান্য ও প্রমাণভূত হইল। এবং পরিণামে উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্‌গীতা এই তিন গ্রন্থ "প্রস্থানত্রয়ী" এই নাম প্রাপ্ত হইল। "প্রস্থানত্রয়ী"র অর্থ এই যে উহাতে বৈদিক ধর্ম্মের আধারভূত তিন মুখ্য বা স্তম্ভ গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থগুলিতে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই দুই মার্গেরই যথাপদ্ধতি তাত্ত্বিক বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ীতে ভগবদ্‌গীতার সমাবেশ এবং প্রস্থানত্রয়ীর সাম্রাজ্য অধিকাধিক বিস্তৃত হইবার পর, যে ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায় এই তিন গ্রন্থকে অবলম্বন করিত না, কিংবা এই তিনের মধ্যে যাহার সমাবেশ হইতে পারিত না, সেই মত ও সম্প্রদায়কে বৈদিক ধর্ম্মের লোকেরা গৌণ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম হইল এই যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি এবং তদবলম্বিত সন্ন্যাস বা ভক্তিমূলক বৈদিক ধর্ম্মের যে যে সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর হিন্দুস্থানে প্রচলিত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যেরা প্রস্থানত্রয়ীর তিন ভাগের উপরেই (ভগবদ্‌গীতাসহ) ভাষ্য লিখিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন ছিল এই যে, তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে এই সকল সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই যে তিন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত, সেই তিন গ্রন্থেরই উপর তাঁহাদের নিজের নিজের সম্প্রদায় দাঁড়াইয়া আছে, অপর সম্প্রদায় ঐ সকল গ্রন্থকে মানিয়া চলেন না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, যদি কোন আচার্য্য ইহা স্বীকার করেন যে অন্য সম্প্রদায়ও প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের উপর সংপ্রতিষ্ঠিত, তবে তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যের কতকটা লাঘব হয়; এবং এরূপ মাহাত্ম্যের লাঘব করা কোন সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট নহে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে প্রস্থানত্রয় সম্বন্ধে ভাষ্য লিখিবার এই প্রথা আরম্ভ হইলে, বিভিন্ন পণ্ডিত নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের উপরেই নিজ নিজ টীকা লিখিয়া গীতার্থ প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক টীকাই অধিক মান্য হইয়া পড়িল। গীতা সম্বন্ধে এক্ষণে যে সকল ভাষ্য কিংবা টীকা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় সকলগুলিই এই প্রকার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য্য বা পণ্ডিতের রচিত। ইহার পরিণাম হইয়াছে এই যে, মূল ভগবদ্‌গীতাতে একই অর্থ সহজভাবে প্রতিপাদিত হইলেও, ঐ গীতাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমর্থক বলিয়া উপলব্ধ হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ই প্রাচীনতম সম্প্রদায় এবং তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে ঐ সম্প্রদায়ই হিন্দুস্থানে মান্যতম হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ৭১০ শালিবাহন শকে (৮৪৫ সম্বৎ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ বৎসরে তিনি গুহা-প্রবেশ করেন (৭১০-৭৪২), * বর্ত্তমানে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য একজন অলৌকিক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বকীয় দিব্যশক্তির দ্বারা সেই সময় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিলেন; এবং তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত বৈদিক ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দাঁড় করাইয়া নিবৃত্তিপর বৈদিক সন্ন্যাস ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় কলিযুগে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেন, একথা

* আমাদের মতে, শঙ্করাচার্য্যের কাল আরও ১০০ বৎসর পিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিশিষ্ট ভাগে তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ববিশ্রুত। যে কোন সম্প্রদায়কেই ধর না কেন, স্বভাবতঃই তাহার দুই ভাগ আছে —প্রথম, তত্ত্বজ্ঞানের ভাগ ; দ্বিতীয়, আচরণের ভাগ। প্রথম ভাগে জড় ব্রহ্মাণ্ডের বিচারের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ নিষ্পন্নপূর্ব্বক শাস্ত্ররীতি-অনুসারে মোক্ষসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তও নির্ণয় করা হয় ; এবং দ্বিতীয় ভাগে, ঐ মোক্ষলাভের সাধন বা উপায় কি অর্থাৎ এই জগতে মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, তাহার নিরূপণ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথাটি এই যে, (১) আমি, তুমি, কিংবা মনুষ্যের চক্ষুগোচর দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নানাত্ব আসলে সত্য নহে। একই শুদ্ধ ও নিত্য পরব্রহ্ম এই সমস্ত ভরিয়া আছেন, এবং তাঁহার মায়াতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হয়। (২) মনুষ্যের আত্মাও মূলতঃ পরব্রহ্মরূপই ; এবং (৩) আত্মা ও পরব্রহ্মের একতার পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু নাই ; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহা মানবী দৃষ্টির ভ্রম বা মায়িক উপাধিমূলক অবভাস মাত্র। মায়াও সত্য বস্তু বা স্বতন্ত্র বস্তু নহে ; উহাও মিথ্যা। এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তাৎপর্য্য। কেবল তত্ত্বজ্ঞানের বিচার করিতে হইলে শাঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা অধিক আলোচনা করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু শাঙ্করসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের আর এক সিদ্ধান্ত আছে, যাহা আচারদৃষ্টিতে প্রথমের সহিত সমান মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য স্মৃতিগ্রন্থাদির উক্তি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মসকল করা অত্যন্ত আবশ্যক, তথাপি এই সকল কর্ম্মের আচরণ চিরকাল কর্ত্তব্য নহে, কারণ, পরিশেষে সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমস্ত বাসনা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতাই হয় না। পরিশেষে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই মগ্ন থাকা হয় বলিয়া, এই সিদ্ধান্তটিকে 'নিবৃত্তিমার্গ', 'সন্ন্যাসনিষ্ঠা' বা 'জ্ঞাননিষ্ঠা' বলা হয়। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ঐ উভয়ে শুধু অদ্বৈতজ্ঞানই আছে এরূপ নহে, সন্ন্যাসমার্গও আছে অর্থাৎ শাঙ্করসম্প্রদায়ের উপরি-উক্ত দুই ভাগেরই উপদেশ আছে। গীতার উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে নিরূপিত হইয়াছে যে ভগবদ্গীতারও তাৎপর্য্য তাহাই (গী. শাংভা. উপোদ্ঘাত ও ব্রহ্মসূ. শাং ভা. ২. ১. ১৪ দেখ)। ইহার প্রমাণ স্বরূপে গীতার কোন কোন বাক্যও প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বং কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"—জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সকল কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় (গী. ৪. ৩৭), "সর্ব্বংকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" জ্ঞানেতেই সর্ব্বকর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় (গী. ৪. ৩৩)। সারকথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর, প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে বিশিষ্ট মার্গের স্থাপনা করিয়াছেন, গীতার তাৎপর্য্য তাহারই অনুকূল ; পূর্ব্ব টীকাকারদিগের কথাপ্রমাণে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় গীতার প্রতিপাদ্য নহে, প্রত্যুত

কর্ম্মই জ্ঞানপ্রাপ্তির গৌণ সাধন এবং সর্ব্বকর্ম্মঃ সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানেতেই মোক্ষ লাভ হয়, শাঙ্করসম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তই গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহা দেখাইবার জন্যই শাঙ্করভাষ্য লিখিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে যদি সন্ন্যাসপর কোন টীকা লিখিত হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে পাওয়া যায় না। এইজন্য গীতার প্রবৃত্তিপর রূপটি উঠাইয়া দিয়া নিবৃত্তিপর সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করা—উক্ত ভাষ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরে তাঁহার সম্প্রদায়ের অনুযায়ী, মধুসূদনাদি যে সকল অনেক টীকাকার হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে অনেকটা শঙ্করাচার্য্যেরই অনুকরণ করিয়াছেন। ইহার পরে, এক অদ্ভুত বিচার উঠিয়াছে যে, অদ্বৈতমতের মূলীভূত মহাবাক্যসমূহের মধ্যে "তত্ত্বমসি"—[সেই (পরব্রহ্ম) তুমি (শ্বেতকেতু)] ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মহাবাক্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই মহাবাক্যের পদসকলের ক্রম বদলাইয়া প্রথমে "ত্বং" ও তাহার পর "তৎ" এবং পরে "অসি" এই পদগুলিকে লইয়া, এই নূতন ক্রম অনুসারে প্রত্যেক পদের উপর গীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, শ্রীভগবান অপক্ষপাতে সমান সমান বাঁটিয়া দিয়াছেন। গীতা সম্বন্ধে পৈশাচ ভাষ্য কোন সম্প্রদায়েরই নহে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং হনুমান্ অর্থাৎ মারুতি কর্ত্তৃক লিখিত এইরূপ কাহারো কাহারো ধারণা। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। ভাগবতের টীকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহা সন্ন্যাস মার্গের। ইহার কয়েক স্থানে শাঙ্কর ভাষ্যেরই অর্থ শব্দশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ পূর্ব্বে ও অধুনা মারাঠীতে গীতার যে ভাষান্তর কিংবা আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে সে সমস্ত প্রায়ই শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তক-মালায়" পরলোকগত কাশীনাথ পন্ত তৈলঙ্গকৃত ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদও আছে। তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে, এই অনুবাদে অনেকটা শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর সম্প্রদায়ী টীকাকারদিগের অনুসরণ করা হইয়াছে।

গীতা ও প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্ভূত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাষ্য লিখিবার রীতি প্রচলিত হইলে পর, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐরূপ অনুকরণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্ন্যাস প্রতিপাদনকারী শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পরে, শ্রীরামানুজাচার্য্য (জন্ম শক ৯৩৮, সম্বৎ ১০৭৩) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় রামানুজাচার্য্যও প্রস্থানত্রয়ীর উপর (সুতরাং তদন্তর্গত গীতারও উপর) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এ দুইটী সত্য নহে ; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব ভিন্ন হইলেও, জীব (চিৎ) ও জগৎ (অচিৎ) এই দুইটী একই ঈশ্বরের শরীর ; সুতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং ঈশ্বর-শরীরান্তর্ভূত এই সূক্ষ্ম চিৎ-অচিৎ হইতেই পরে স্থূল চিৎ ও স্থূল অচিৎ বা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয়। এই মতই উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে,—তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে ইহাই রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। (গী রা. ভা. ২. ১২ ; ১৩. ২)। ইঁহারই গ্রন্থসমূহের কারণে ভাগবত ধর্ম্মের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবেশলাভ করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ,

ইহার পূর্ব্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবত ধর্ম্মের যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত দৃষ্ট হয়। রামানুজাচার্য্য ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী থাকা প্রযুক্ত, গীতাতে, প্রবৃত্তিপর কর্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই কথাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রামানুজাচার্য্যের সময়ে মূল ভাগবত-ধর্ম্মের অন্তর্ভূত কর্ম্মযোগ অনেকটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে গীতাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি বর্ণিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈত ও আচার-দৃষ্টিতে বাসুদেবভক্তিই গীতার সারতত্ত্ব; কর্ম্মনিষ্ঠা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, জ্ঞাননিষ্ঠার উৎপাদক মাত্র, ইহাই রামানুজাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (গী. রা-ভা, ১৮. ১ ও ৩, ১ দেখ)। অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সন্ন্যাসের স্থানে ভক্তি—যদিও রামানুজাচার্য্য শংকরসম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রভেদ করিয়াছেন, তথাপি তিনি আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিই শেষ কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করায়, বর্ণাশ্রমবিহিত সাংসারিক কর্ম্ম আমরণ সম্পাদন করা—তাঁহার মতে গৌণ হইয়াছে। এবং সেইজন্য গীতার রামানুজীয় তাৎপর্য্যও একপ্রকার কর্ম্ম-সন্ন্যাসপরই বলা যাইতে পারে। কারণ, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন থাকা অথবা প্রেমযোগে অপরিসীম বাসুদেব ভক্তিতে ডুবিয়া থাকা—এই দুই মার্গই কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে একই—উভয়ই নিবৃত্তি পর। রামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ের উপরেও এই আপত্তি হইতে পারে। মায়ামিথ্যাতত্ত্ববাদ অসত্য এবং বাসুদেবভক্তিই প্রকৃত মোক্ষসাধক, রামানুজ-সম্প্রদায়ের পরে এই মতপ্রচারক এক তৃতীয় সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরব্রহ্ম ও জীব কিয়দংশে এক ও কিয়দংশে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করা পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এইরূপ স্বীকার করিতেই হয়; পূর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে না। এই তৃতীয় সম্প্রদায়কে "দ্বৈতী সম্প্রদায়" বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের মতে ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্য (শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ)। ইনি ১১২০ শকে ১২৫৫ সম্বতে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর ছিল। কিন্তু ডাক্তার ভাণ্ডারকর "বৈষ্ণব, শৈব ও অন্য পন্থী" নামে যে ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে (৫৯ পৃঃ) তিনি শিলালেখাদি প্রমাণের বলে, মধ্বাচার্য্যের কাল ১১১৯ হইতে ১১৯৮ শক পর্য্যন্ত (১২৫৪-১৩৩৩ সম্বৎ) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে—সুতরাং গীতাসম্বন্ধেও—যে ভাষ্য আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বৈতমতেরই প্রতিপাদক—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ বলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য যদিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি সেই নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনমাত্র, ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্ম কিছু করিলে বা না করিলে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ"—পরমেশ্বরের ধ্যান বা ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ বা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কতকগুলি গীতাবচন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ; কিন্তু গীতার মাধ্বভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, ঐ সকল বচন অক্ষরশঃ সত্য বলিয়া ধরিবার পরিবর্তে অর্থবাদাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে (গী, মা ভা, ১২. ১৩)। চতুর্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রবর্ত্তিত

(জন্ম শক ১৪০১, সম্বৎ ১৫৩৬)। রামানুজ ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়ও বৈষ্ণবপন্থী। কিন্তু জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মত বিশিষ্টাদ্বৈত কিংবা দ্বৈত মত হইতে স্বতন্ত্র। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ জীব ও পরব্রহ্ম একই, দুই নহে, এই সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন। এই জন্যই এই মতকে 'শুদ্ধাদ্বৈত' বলে। এই সম্প্রদায় শ্রীশংকরাচার্য্যের ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম এক বলিয়া স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন যে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র; মায়াত্মক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মায়াপরতন্ত্র জীবের মোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য সাধন। এই সিদ্ধান্তের কারণেই শাঙ্কর-সম্প্রদায় হইতেও এই সম্প্রদায় ভিন্ন হইয়াছে। এই মার্গের লোকেরা পরমেশ্বরের এই অনুগ্রহকে "পুষ্টি, পোষণ" নামেও অভিহিত করেন, তাই এই সম্প্রদায়কে "পুষ্টিমার্গ"ও বলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বদীপিকাদি গীতাসম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া কৃতকৃত্য করিয়াছেন; সেই কারণে ভগবদ্-ভক্তি এবং বিশেষ-ভাবে নিবৃত্তিপর পুষ্টিমার্গীয় ভক্তিই সমস্ত গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য। কারণ এই যে, ভগবান গীতার শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গী, ১৮. ৬৬)—সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। উপরি উক্ত সম্প্রদায়সমূহের অতিরিক্ত নিম্বার্কেরও রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিপর আর এক সম্প্রদায় আছে। এই আচার্য্য, রামানুজাচার্য্যের পর ও মাধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে, আনুমানিক ১০৮৪ শকে (১২১৯ সম্বৎ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ডাক্তার ভাণ্ডারকর এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্য্যের মত এই যে, এই তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও জগতের ব্যাপার ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না হইয়া উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্তর্ভূত রহিয়াছে। এই মত সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্বার্ক বেদান্তসূত্র সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য গীতার 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে এক টীকা লিখিয়া তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনুকূল। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 'দ্বৈতাদ্বৈতী' সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদ স্বীকার না করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কারণ, চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি নিরাধার বা কিয়দংশে মিথ্যাও হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতেই হইবে এমন কোনই কথা নাই। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্রদেশীয় এবং অন্যান্য সাধু-সন্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অতএব এই পন্থা শ্রীশংকরাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ অনুমান হয়। অদ্বৈত, মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা, এই সকল শাঙ্করসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, উক্ত পন্থাতেও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পন্থার ইহাও মত যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির সর্ব্বাপেক্ষা

সুগম সাধন হইতেছে ভক্তি। "তুজ হবাবা আহে দেব। তরি হা সুলভ উপায়" (তুকা, গা, ৩০০২-২) অর্থাৎ —তোমার যদি দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপায়। তুকারাম বাবাজীর কথা অনুসারে এই পন্থাবলম্বীর ইহাই উপদেশ। গীতাতেও ভগবান প্রথমে এই কারণ বলিয়াছেন যে, "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (গী. ১২. ৫) অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা অধিক ক্লেশকর। পরে, অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ" (গী. ১২. ২০) অর্থাৎ আমার ভক্তই আমার অতীব প্রিয়। অতএব ইহাই প্রকট হইতেছে যে, অদ্বৈত পর্য্যবসায়ী ভক্তিমার্গই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীধর স্বামীও গীতার স্বকৃত টীকাতে (গী. ১৮. ৭৮) গীতার এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। মারাঠী ভাষাতে এই সম্প্রদায়ের গীতাসম্বন্ধীয় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ হইতেছে "জ্ঞানেশ্বরী"। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম,মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ং জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে, "ভাষ্যকারাঁ তেঁ (শঙ্করাচার্য্যকে) বাট পুসত"—অর্থাৎ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া —অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসরণ করিয়া আমি নিজের টীকা রচনা করিয়াছি। কিন্তু "জ্ঞানেশ্বরী"কে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ ইহাতে গীতার মূল অর্থ অনেক বাড়াইয়া অনেক সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্গের ও কিয়দংশে নিষ্কাম কর্ম্মেরও শ্রীশঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা উত্তম বিচার করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে যোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের যে শ্লোকে পাতঞ্জল-যোগাভ্যাসের বিষয় আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি এক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষে "তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন" অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও (গী. ৬. ৪৬), অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া সমস্ত মোক্ষপন্থার মধ্যে পাতঞ্জলযোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং এই কারণে নিজে উহাকে 'পন্থরাজ' বলিয়াছেন। সার কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ গীতার অর্থ আপনাপন মতের অনুকূল স্থির করিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই কথা যে, গীতায় উপদিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্ম্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; গীতাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বীকৃত তত্ত্বজ্ঞানই পাওয়া যায় ; আপন সম্প্রদায়ের মোক্ষদৃষ্টিতে শেষের কর্তব্য বলিয়া যে সকল আচার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকলই গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, মায়াসত্যত্ব-প্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত ও বাসুদেবভক্তি, দ্বৈত ও বিষ্ণুভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, শাঙ্করাদ্বৈত ও ভক্তি, পাতঞ্জল-যোগ ও ভক্তি, কেবল যোগ, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান, এইরূপ অনেক প্রকারের কেবলমাত্র নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্ম্মই গীতার প্রধান ও প্রতিপাদ্য বিষয়। * ইহা শুধু আমাদেরই মত নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র কবি বামন পণ্ডিতেরও

* ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের গীতাসম্বন্ধীয় ভাষ্য ও সেই সেই সম্প্রদায়ের ছোট বড় সমস্ত মিলিয়া ১৫টি প্রধান প্রধান টীকা, বোম্বাইয়ে "গুজরাটী প্রিণ্টিং প্রেসের" কর্ত্তা সম্প্রতি একত্র ছাপাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের অভিপ্রায় একযোগে অবগত হইবার পক্ষে এই গ্রন্থটি বড়ই সুবিধাজনক

মত এইরূপ। গীতাসম্বন্ধীয় তাঁহার "যথার্থদীপিকা" নামক বিস্তৃত মারাঠী টীকার উপোদ্‌ঘাতে তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন—

পরী অজ্ঞী ভগবন্তজী। য়া কলিযুগে মাজী ॥
জো জো গীতার্থ যোজী। মতানুরূপ ॥

"হে ভগবান, এই কলিযুগে যে যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা নিজ নিজ মতানুরূপ। এবং পুনরায় আক্ষেপ পূর্ব্বক লিখিতেছেন যে,

কোণ্যা মিসেঁ তরী কোণী। গীতার্থ অন্যান্য বাখাণী ॥
যজনাবডে তো থোরামতীহি করণী। কায় করুঁ জী ভগবন্তা ॥

"কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান।" অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত মোক্ষসম্প্রদায় পরস্পরবিরোধী, এবং গীতায় কী প্রতিপাদিত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলিতে পারে নাই, অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে এই সকল মোক্ষসাধনের, বিশেষতঃ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের বর্ণন স্বতন্ত্র প্রণালীতে সংক্ষেপে ও পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরম্ভে, অনেক প্রকার মোক্ষোপায়ের গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রান্তচিত্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, মোক্ষের অনেক উপায়ের এই সকল বর্ণনা পৃথক্ পৃথক্ নহে, কিন্তু এই সকলের একতাই গীতায় দেখান হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে কেহ কেহ একথাও বলেন যে, গীতার প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা উপরি উপরি যদিও সুলভ বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অতীব গূঢ়, গুরুমুখ ব্যতীত তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী ৪. ৩৪) এবং গীতার টীকা যদিও অনেক হইয়াছে তথাপি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিবার পক্ষে গুরুদীক্ষা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

এক্ষণে ইহা সুস্পষ্ট যে, গীতার অনেক প্রকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথমেই তো স্বয়ং মহাভারতকার ভাগবতধর্ম্মানুসারী অর্থাৎ প্রবৃত্তিপর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর আবির্ভূত অনেক পণ্ডিত, আচার্য্য, কবি, যোগী ও ভগবদ্ভক্তগণ নিজনিজ সম্প্রদায়ানুরূপ শুদ্ধ নিবৃত্তিপর তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এই পরস্পর-বিরোধী নানাবিধ তাৎপর্য্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? বাহির করা যাইতে পারে শুধু নয়, উহাতে ইষ্টও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আচার্য্য বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মহাতত্ত্বজ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত জগতে আবির্ভূত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে আবার তাঁহার সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের এতটা মতভেদ কেন? গীতাতো একটা ভোজবাজী নহে যে, তাহা হইতে যে যাহা খুশি একটা অর্থ বাহির করিবে। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়সমূহের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের ভ্রম বাড়াইবার জন্য নহে

পরন্তু তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা অর্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। গীতাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাৎপর্য্যের উপদেশ করা হইয়াছে, এবং অর্জুনের উপর তাহার অভীষ্ট পরিণামফলও হইয়াছে। ইহার পরেও গীতার তাৎপর্য্য লইয়া এতটা গোলযোগ কেন হইয়া চলিয়াছে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য। কিন্তু উহার উত্তর উত্তম দৃষ্টিতে যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয়, আসলে ততটা কঠিন নহে। মনে কর, কোন সুমিষ্ট ও সুরস পক্কান্ন দেখিয়া নিজ নিজ রুচি অনুসারে যদি বা কেহ তাহাকে গমের, কেহ বা ঘৃতের এবং কেহ বা চিনির পক্কান্ন বলে, তাহা হইলে আমরা কোন্‌টা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিব? তিনই আপন আপন হিসাবে সত্য। কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না যে পক্কান্নটি কোন্ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। গম, ঘৃত ও চিনি এই তিন পদার্থই একত্র মিলিত হইয়া তাহা হইতে লাড্ডু, জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার পক্কান্ন প্রস্তুত হইতে পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে পক্কান্নটী কোন্ পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, উহা গোধূমপ্রধান, ঘৃতপ্রধান কিংবা শর্করাপ্রধান, শুদ্ধ এইরূপ বলিলেই চলিবে না। সমুদ্রমন্থনের সময় কেহ বা অমৃত, কেহ বা বিষ, আবার কেহ কেহ বা ঐরাবত, কৌস্তুভ, পারিজাত প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তবু তাহা দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণয় হয় নাই। সাম্প্রদায়িকভাবে গীতাসাগরের মন্থনকারী টীকাকারদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আর একটি উদাহরণ দিই। কংসবধের সময় রঙ্গমণ্ডপে অবতীর্ণ একই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক দর্শকের নিকট বিভিন্ন স্বরূপে অর্থাৎ মল্লের নিকট বজ্রসদৃশ, স্ত্রীলোকের নিকট কামদেবসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদ্গীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, সে সম্প্রদায় একটা সাধারণত প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্য হইবে। এইজন্য বৈদিক ধর্ম্মের যত সম্প্রদায়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ বিষয়, যথা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধ বাদ দিলে বাকী বিষয়ে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই মিল হয়। সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বা টীকা আছে, সেগুলিতে মূল গ্রন্থের শতকরা নব্বুইয়ের অধিক বচন বা শ্লোকের ভাবার্থ একই। যাহা কিছু ভেদ, তাহা অবশিষ্ট বচন বা শ্লোক সম্বন্ধেই দেখা যায়। ঐ সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান অনুকূল হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল সেইগুলিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া, অথবা প্রতিকুল বচনগুলির অর্থ যে কোন যুক্তির দ্বারা অন্যথা করিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও সরল বচনাদি হইতেও নিজ নিজ অনুকূল শ্লেষার্থ ও অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্রদায় যাহাতে সেই সকল প্রমাণের বলে সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ গীতা, (২.১২ ও ১৬; ৩.১৯; ৬.৩ এবং ১৮.২) শ্লোকগুলির উপর

আমার টীকা দেখুন। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা, আর নিজ সম্প্রদায় গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ কিংবা অন্য কোনরূপ অভিমান না রাখিয়া স্বতন্ত্র রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়া কেবল তাহা হইতে সার অর্থ বাহির করা—এই দুই বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সদোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; এখন তবে গীতার তাৎপর্য্য বাহির করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্যক। গ্রন্থ, প্রকরণ ও বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণয় কার্য্যে অত্যন্ত কুশল মীমাংসকদিগের এই সম্বন্ধে সর্ব্বমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায়-স্বরূপ (লিঙ্গ) হওয়ায় ঐ সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিচার্য্য 'উপক্রমোপসংহারৌ' অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ এই দুই বিষয়। প্রত্যেক মনুষ্যই মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং উক্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এইজন্য, গ্রন্থতাৎপর্য্য-নির্ণয়কার্য্যে প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। সরল রেখা ব্যাখ্যা করিবার সময় ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, আরম্ভের বিন্দু হইতে যে রেখা দক্ষিণে-বামে কিংবা উপরে-নীচে না বাঁকিয়া শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান যায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎপর্য্যনির্ণয়েও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য্য গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্য্য। প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অন্য অন্য পথ থাকিলেও সে সব বাঁকা পথ বা আড় পথ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপে আদ্যন্ত দেখিয়া গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পর সেই গ্রন্থে 'অভ্যাস' বা পুনরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে। কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া প্রত্যেকবার "অতএব এই বিষয় সিদ্ধ হইল" কিংবা "অতএব ইহা করা আবশ্যক" এইরূপ একই সিদ্ধান্ত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন। গ্রন্থতাৎপর্য্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাধন 'অপূর্ব্বতা' ও 'ফল'। 'অপূর্ব্বতা অর্থাৎ নূতনত্ব।' যে কোন গ্রন্থকার হউন, একটা কিছু নূতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রায়ই তিনি নূতন গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন না। অন্তত যে সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এরূপ হইত না। এইজন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, সেই গ্রন্থে অপূর্ব্বতা, বৈশিষ্ট্য, কিংবা নূতনত্ব কি আছে তাহাও দেখা আবশ্যক। এই প্রকারে সেই লেখা বা গ্রন্থের কোন ফল অর্থাৎ উক্ত লেখা বা গ্রন্থের দরুণ কোন পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ এই ফল মিলিবে কিংবা হইবে মনে করিয়াই যখন কোন গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে, তখন সংঘটিত পরিণামের উপর

মনোযোগ দিলেই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে। ষষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি? না,—'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'। 'অর্থবাদ' এই শব্দটি মীমাংসকদিগের পারিভাষিক শব্দ (জৈ সূ. ১.২.১.১৮)। মুখ্যত কোন্ বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইলেও গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রতিপাদনের মুখে দৃষ্টান্ত দিবার জন্য, তুলনা করিয়া একবাক্যতা সম্পাদনার্থ অথবা সাম্য ও ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতিপক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, অলংকারার্থ, অতিশয়োক্তির ভাবে এবং যুক্তিবিন্যাসের পরিপোষক কোন বিষয়ের পূর্ব্ব ইতিহাসের সম্বন্ধসূত্রে অন্য বিষয় বর্ণিত হয়। উক্ত কারণ বা প্রসঙ্গসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, এবং কখনো কখনো বিশেষ কোনই কারণ থাকেও না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যাহা বর্ণনা করেন, তাহা মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত না হইলেও গৌরবার্থ বা স্পষ্টীকরণার্থ কিংবা পূর্ণতা সম্পাদনার্থ করা হয় বলিয়া তাহা সকল সময়ে যে অক্ষরশঃ সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। * কিং বহুনা, এই অপ্রধান বর্ণনা অক্ষরশঃ সত্য কি সত্য নহে ইহা দেখিবার জন্য কখন কখন গ্রন্থকার স্বয়ংও সাবধানতা অবলম্বন করেন না। এইজন্য ঐ সকল কথার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ ইহা স্বীকার করা যায় না যে, গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তপক্ষের সঙ্গে এই বিভিন্ন বিষয়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ শূন্যোগর্ভ, আগন্তুক বা স্তুতিবাচক, এইভাবে গ্রহণ করিয়া মীমাংসকগণ উহাকে 'অর্থবাদ' এই নাম দিয়া থাকেন, এবং এই অর্থবাদাত্মক কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার পর, উৎপত্তির প্রতি মন দিতে হইবে। কোন বিশিষ্ট বিষয়কে সিদ্ধরূপে দেখাইবার জন্য তর্কশাস্ত্রানুসারে বাধক প্রমাণের খণ্ডন করা এবং সাধক প্রমাণের অনুকূল বিন্যাস করাকে 'উৎপত্তি' বা 'উপপাদন' বলে। উপক্রম ও উপসংহাররূপ দুই সীমান্তে প্রথমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ ও উপপত্তির সহায়তায় সুনিশ্চিত করিতে পারা যায়। কোন্ বিষয়টি অপ্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক (অপ্রধান) ইহা অর্থবাদের সাহায্যে বুঝা যায়। অর্থবাদের একবার নির্ণয় হইলে পর, যে ব্যক্তি গ্রন্থতাৎপর্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি সমস্ত বাঁকা পথ ছাড়িয়া দেন। পাঠক যখন এইরূপে বাঁকা পথ ছাড়িয়া সরল ও প্রধান রাস্তায় আসেন তখন উপপত্তির সরল পথ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা গ্রন্থসমালোচককে প্রথম হইতেই সম্মুখে ক্রমশ ধাক্কা দিতে দিতে শেষের তাৎপর্য্য সোজা আনিয়া তবে ছাড়ে। আমাদের প্রাচীন মীমাংসকদিগের স্থিরীকৃত গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্ব্বদেশীয় বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার প্রয়োজন নাই।**

---

* অর্থবাদান্তর্ভূত বর্ণনা, বস্তুস্থিতিমূলক বর্ণনা হইলে তাহাকে 'অনুবাদ', বস্তুস্থিতির বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে 'গুণবাদ' এবং পূর্ব্ব বস্তুস্থিতি ধরিয়া কিন্তু আপাতত বস্তুস্থিতি ছাড়িয়া দিয়া যে বর্ণনা তাহাকে 'ভূতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ' এই সামান্য শব্দের অন্তর্গত নিবন্ধাদির সত্যাসত্য অনুসারে এই তিন ভেদ।

** গ্রন্থতাৎপর্য্যের এই নিয়ম ইংরেজী আদালতেও পালিত হইয়া থাকে। যেমন মনে কর, কোন বিচারনিষ্পত্তির অর্থ ঠিক বোঝা না গেলে, ঐ বিচারনিষ্পত্তির ফল যে হুকুমনামায় আছে তাহ দেখিয়া

এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, মীমাংসকদিগের এই নিয়ম কি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যদিগের জানা ছিল না? এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদির মধ্যেও যদি এই সকল নিয়ম পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের উপদিষ্ট গীতাতাৎপর্য্য একদেশীয়তা-দোষে দুষ্ট মনে করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, কাহারো দৃষ্টি একবার সাম্প্রদায়িক (সংকুচিত) হইয়া পড়িলে আর তিনি ব্যাপকতা স্বীকার করিতে পারেন না। তখন তিনি কোন-না-কোন প্রকারে ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়েরই বর্ণনা আছে। নিজ সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অন্য অর্থ হইলেও উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না-কোন স্বতন্ত্র হেতু আছে, এই সকল গ্রন্থের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের পূর্ব্ব হইতেই এই দৃঢ় ধারণা হইয়া থাকে। নিজ মতানুযায়ী যে অর্থ পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের কোন নিয়মের বাধা আসিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টীকাকারেরা ঐ সকল নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রান্তর্গত মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত স্মৃতি-বচনসমূহের ব্যবস্থা বা একবাক্যতা এই তত্ত্বানুসারে করা হয়। কিন্তু কেবল হিন্দুধর্মগ্রন্থাদিতেই যে এই প্রকার পাওয়া যায় তাহা নহে। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ বাইবেল ও কোরাণেরও পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত শতশত সাম্প্রদায়িক গ্রন্থকারগণ এইরূপেই উহাদের অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন এবং এই বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতকগুলি বাক্যের অর্থ ইহুদি লোকদিগের অর্থ হইতে খৃষ্টভক্তেরা ভিন্নরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ কিংবা লেখা কোন্‌টি ইহা যে যে স্থলে পূর্ব্ব হইতেই স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যেখানে এই নির্দ্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ বলে পরবর্ত্তী সমস্ত বিষয়ের নির্ণয় করা হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে গ্রন্থার্থনির্ণয়ের উপরোক্ত পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পণ্ডিত, উকীল ও বিচারপতি, ইঁহারা পূর্বেকার প্রামাণিক আইনগ্রন্থাদিকে কিংবা বিচারনিষ্পত্তির সম্বন্ধে আপন আপন দিকে যেরূপভাবে টানিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে এই রহস্য নিহিত আছে। যদি শুধু লৌকিক বিষয়ের সম্বন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতা সম্বন্ধেও যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিবার কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক ভাষ্য ও টীকা হইয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপর্যুক্ত মীমাংসকদিগের পদ্ধতি অনুসারে ভগবদ্গীতার উপক্রম, উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যখন কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্য যুদ্ধে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের উপর শস্ত্রসম্পাতে উদ্যত, এবং সেই অবসরে একাদিক্রমে অর্জ্জুন ব্রহ্মজ্ঞানের বড় বড় কথা বিবৃত করিয়া 'বিমনস্ক' হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত

নিষ্পত্তির অর্থ নির্ণয় করা হয় এবং কোন নিষ্পত্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা নাই এইরূপ কোন বিধান থাকিলে উহা পরবর্তী মোকদ্দমায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ বিধানকে (Obiter dicta) কিংবা 'বহিঃ বিধান' বলে এবং বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে ইহা অর্থবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র।

হইয়াছিলেন, তখনই অর্জ্জুনকে স্বীয় ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। যখন অর্জ্জুন দেখিতে লাগিলেন যে দুষ্ট দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কে কে আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থমা, প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয় কৌরব এবং অন্যান্য সুহৃদ্ আত্মজন, মামা, কাকা, ভগ্নীপতি, শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। কেবল এক ক্ষুদ্র হস্তিনাপুরের রাজ্যলাভার্থ ইঁহাদিগকে বধ করিয়া নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ করিতে হইবে এই বিচার তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ক্ষুব্ধ হইল। একদিকে ক্ষাত্রধর্ম্ম "যুদ্ধ কর" বলিতেছিল, এবং অন্যদিকে পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রেম, সুহৃৎপ্রীতি তাঁহাকে পিছনে টানিতেছিল। যদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে পিতামহ, গুরু ও আত্মীয়দিগকে হত্যা করিয়া ঘোর পাতকে পতিত হইতে হইবে, আর যদি না করি তবে ক্ষাত্রধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হইবে। এইরূপ একদিকে গর্ত্ত আর একদিকে কূপ দেখা দিলে পর, দুই ম্যাড়ার গুঁতার মধ্যে পড়িয়া কোন নিরুপায় প্রাণীর যে অবস্থা হয়, অর্জ্জুনেরও সে অবস্থা হইয়াছিল! অর্জ্জুন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই নৈতিক সংকটে অকস্মাৎ পতিত হওয়ায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, হাতের ধনু খসিয়া পড়িল এবং "আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। শেষে মনুষ্যের যাহা স্বভাবতই বেশী প্রিয়, সেই মমতা অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী বন্ধুস্নেহ, দূরবর্ত্তী ক্ষাত্রধর্ম্মের স্থান অধিকার করায়, মোহবশে তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে "পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহৃদ্বধ, অধিক কি সমগ্র কুলক্ষয় প্রভৃতি ঘোরতর পাপ করিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষা উদরপূর্ত্তির জন্য ভিক্ষা করা কি মন্দ? শত্রু এ সময় আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গলা কাটিয়া ফেলে, সেও ভাল; কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিয়া তাঁহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও অভিশাপগ্রস্ত হইয়া আমি সুখভোগ ইচ্ছা করি না। ক্ষাত্রধর্ম্ম হইল ত কি হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধরূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদি করিতে হয় তবে পুড়ে যাক সে ক্ষাত্রধর্ম্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে! প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, তাহারা দুর্জ্জন হইলেও এইরূপ আচরণ আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাই আমার দেখা আবশ্যক। আমার যখন মনে হইতেছে এইরূপ ঘোর পাতক করা শ্রেয়স্কর নহে, তখন ক্ষাত্রধর্ম্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহা আমার কি কাজে আসিবে? এইরূপে তাঁহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় ধর্ম্মসম্মূঢ় হইয়া অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান গীতা-উপদেশ দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য হওয়ায়, ভীষ্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভয়ে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। গীতা-উপদেশের রহস্য যদি উদ্ঘাটন করিতে হয় তবে তাহার উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল আলোচনা করা আবশ্যক। ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়, কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিবৃত্তিপর মার্গ কিংবা কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের কেবলমাত্র আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া বৈরাগ্য

অবলম্বনে ভিক্ষা করিবার জন্য বনে পাঠানো কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়া ও নিম্বপত্র খাইয়া আমরণ যোগাভ্যাস করিবার জন্য হিমালয়ে প্রেরণ করা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভি-প্রায় ছিল না। অথবা ধনুর্ব্বাণের বদলে হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণা লইয়া সেই সকল বাদ্য-সহযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় ক্ষাত্রসমাজের সম্মুখে বৃহন্নলার ন্যায় আবার অর্জ্জুনকে নৃত্যে প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তো অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কুরুক্ষেত্রের উপর অর্জ্জুনের অন্যপ্রকার কঠোর নৃত্যের প্রয়োজন ছিল। গীতা বিবৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে অনেক প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া এবং শেষে 'তস্মাৎ' অর্থাৎ 'অতএব' এই পদ—অনুমানবাচক গৌরবাত্মক পদ প্রয়োগপূর্ব্বক "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত"—হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি যুদ্ধ কর (গী ২. ১৮), "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—অতএব তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর (গী. ২. ৩৭:) "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—অতএব তুমি আসক্তি ছাড়িয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর (গী. ৩. ১৯), "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং"—অতএব তুমি কর্ম্মই কর (গী. ৪.১৫), "মামনুস্মর যুধ্য চ"—আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর (গী. ৮. ৭) "সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা আমি, তুমি নিমিত্তমাত্র, অতএব যুদ্ধ কর ও শত্রুকে জয় কর" (গী. ১১ ৩৩) "শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য করা তোমার উচিত" (গী. ১৬.২৪) ;—এইরূপ অর্জ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্ম্মপর উপদেশ করিয়া, অষ্টাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে পুনর্ব্বার 'এই সমস্ত কর্ম্ম করা উচিত" (গী. ১৮. ৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে, "অর্জ্জুন! তোমার অজ্ঞানমোহ এখন নষ্ট হইল কি না"? (গী. ১৮.৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

"হে অচ্যুত! আমার কর্ত্তব্যমোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে, এখন আমি তোমার কথামত কাজ করিব।" ইহা অর্জ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর অর্জ্জুন সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভীষ্ম কর্ণ জয়দ্রথাদির বধসাধন করিলেন। এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, 'অর্জ্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞান, যোগ কিংবা ভক্তিমাত্রেরই উপদেশ এবং তাহাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মধ্যে মধ্যে কর্ম্মের অল্পস্বল্প প্রশংসা করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে ঐ যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সম্পূর্ণতা-সাধনকে মুখ্য বিষয় না ধরিয়া আনুষঙ্গিক কিংবা অর্থবাদাত্মক বলিয়াই ধরিতে হইবে।' কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার উপক্রম, উপসংহার ও পরিণাম ফল ঠিক দাঁড়াইতে পারে না। স্বধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য অনেক কষ্ট ও বাধা সহিয়াও আমরণ সাধন করিবার মহত্ত্ব দেখানই এই স্থলে আবশ্যক ছিল। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তরূপ আপত্তিকারীদিগের শূন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই; কথিত হইলেও, অর্জ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও চৌকোস পুরুষ উহা কি প্রকারে গ্রহণ করিতেন? তাঁহার মনে মুখ্য প্রশ্ন ইহাই ছিল যে, ভয়ঙ্কর কুলক্ষয়

প্রত্যক্ষ করিলেও আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে কি না, এবং যুদ্ধ করিতে হইলেও কি প্রকারে পাপে পড়িতে হয়। "নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর" কিংবা "কর্ম্ম কর" ঐ প্রশ্নের অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্যের এইরূপ উত্তরকে অর্থবাদ বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। সেরূপ করা, আর নিজ যজমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া থাকা একই কথা! বেদান্ত, ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমস্ত গীতায় যে একেবারেই উপদিষ্ট হয় নাই, একথা আমি বলি না। কিন্তু গীতায় এই যে তিন বিষয়ের সম্মিলন করা হইয়াছে, তাহা কেবল এইরূপ হওয়া চাই যে, তাহার ফলে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমূহের কঠিন সমস্যায় পড়িয়া "এটা করিব, কি ওটা করিব" এই প্রকারকর্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনের যাহাতে নিজ কর্ত্তব্যের নিষ্পাপ পন্থা লাভ হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্বকীয় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রবৃত্তিধর্ম্মেরই জ্ঞান গীতার মূল বিষয় এবং অন্যান্য কথা তৎসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কথিত ও আনুষঙ্গিক, সুতরাং গীতাধর্মের যে রহস্য তাহাও প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্ম্মপরই হইবে, ইহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিপর রহস্যটি কি এবং তাহা বেদান্তশাস্ত্র হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টীকাকারই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। গীতার আদ্যন্ত উপক্রম ও উপসংহারের দিকে ঠিক লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ব্রহ্মজ্ঞান বা ভক্তি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিরূপে অনুকূল হয়, নিবৃত্তিদৃষ্টিতে তাহাতেই টীকাকারগণ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন দেখা যায়। যেন কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা একটা মহা পাপ! আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা একজনের হওয়ায় তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া ভগবদ্গীতার অর্থ করা উচিত। শ্রীক্ষেত্র কাশীর সম্প্রতি সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতী* পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, 'গীতা-পরামর্শ" নামে ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র সংস্কৃত নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে "তস্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামূলং নীতিশাস্ত্রম্"— গীতা এই কারণে ব্রহ্মবিদ্যামূলক কর্ত্তব্যধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ** জার্মন্ পণ্ডিত অধ্যাপক ডয়সন্ও স্বকীয় "উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান" গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আরো কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য গীতাসমালোচকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মপর দৃষ্টিতে তদন্তর্ভূত সমস্ত বিষয় ও অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রযত্ন করেন নাই; অধিকন্তু এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ডায়সন্ স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন। ‡ এইজন্য উক্ত প্রণালী অবলম্বনে গীতা

* এই টীকাকারের নাম এবং তাঁহার টীকা হইতে উদ্ধৃত কিয়দংশ বহু বৎসর পূর্বে একটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্র আমার গোলযোগের সময় কোথায় যে গেল তাহা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এবং ঐ পত্র যদি কখন ঐ ভদ্রলোকটির চোখে পড়ে তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি যেন আমাকে আবার জানান তাঁহার নিকট আমার এই মিনতি।

** শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর শ্রীগীতা-রহস্য, গীতার্থ-প্রকাশ, গীতাপরামর্শ এবং গীতাসারোদ্ধার এইরূপ এই বিষয়ে চারটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে। সেগুলি সমস্ত একত্র করিয়া রাজকোটে ছাপান হইয়াছে। উপরিপ্রদত্ত বাক্য তাঁহার গীতার্থপ্রকাশে আছে।

‡ Prof. Deussen's philosophy of the Upanishads (p. 362) English Translation— 1906.

পর্য্যালোচনা করিয়া উহার বিষয়সমূহের সঙ্গতি প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে, গীতার প্রারম্ভে পরস্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ম্মসমূহের কঠিন সমস্যা দেখিয়া অর্জ্জুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আরো বেশী খোলসা করিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নচেৎ গীতান্তর্গত বিষয়ের মর্ম্ম ভাল করিয়া পাঠকের ধারণায় আসিবে না। অতএব, এই কর্ম্ম-অকর্ম্মের বিচারসঙ্কট কিরূপে বিকট হয় এবং অনেক প্রসঙ্গে, "ইহা করি, কি উহা করি" এইরূপ সংশয়-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্ বুঝিবার জন্য, এই প্রসঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা শাস্ত্রে, বিশেষত মহাভারতে, পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত

দ্বিতীয় প্রকরণ

কর্ম্মজিজ্ঞাসা

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।"*
গীতা ৩.১৬।

ভগবদ্গীতার আরম্ভে, পরস্পরবিরুদ্ধ দুই ধর্ম্মের কাঁইচীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনের মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যে সকল অসমর্থ ও আত্মম্ভরী ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করে, অথবা যাহারা শক্তির অভাবে জগতের অনেক অন্যায় নীরবে সহ্য করে, সে সকল লোকের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজে থাকিয়া যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ধীর কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষদিগের স্বকীয় সাংসারিক কর্ত্তব্যসকল যথাধর্ম্ম ও যথানীতি সম্পাদন করিতে হয়, তাঁহাদেরও মনে এইরূপ চিন্তা অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের আরম্ভেই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরেরও এইরূপ মোহ আসিয়াছিল। সেই মোহ নিবৃত্তি করিবার জন্যই 'শান্তিপর্ব্ব' কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মাকর্ম্ম-সংশয়ের এই প্রকার অনেক প্রসঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করিয়া কল্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড় কবিরা সুরস কাব্য ও উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার শেক্‌সপীয়রের হ্যাম্‌লেট নামক নাটক। ডেন্‌মার্ক দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হ্যাম্‌লেটের খুল্লতাত, আপন ভাইকে—ডেন্‌মার্কের রাজাকে অর্থাৎ হ্যাম্‌লেটের পিতাকে—খুন করিয়া ও হ্যামলেটের মাতাকে পুনর্বিবাহ করিয়া সিংহাসন পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইরূপ পাপাচারী খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া পুত্রধর্ম্মানুসারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকারী রাজা বলিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে, এই সংশয়মোহে পড়িয়া কোমলান্তঃকরণ হ্যাম্‌লেটের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপযুক্ত কোন হিতৈষী পথ প্রদর্শক না থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে "বাঁচিয়া থাকা, কি না থাকা" এইরূপ বিচার-বিবেচনার পর হ্যাম্‌লেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে তাহার চিত্র উৎকৃষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। 'কোরায়লেনস্‌' নামক আর এক নাটকেও এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্‌সপীয়র বর্ণনা করিয়াছেন। কোরায়লেনস্‌ নামক বীরপুরুষ এক রোমক সর্দ্দারকে রোম নগরের লোকেরা নগর হইতে নির্ব্বাসিত করায় সেই রোমক বীর রোমনগরের শত্রুদিগের সহিত গিয়া মিলিয়াছিলেন, এবং 'তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না' এইরূপ

* "কর্ম্ম কোন্‌টি এবং অকর্ম্ম কোন্‌টি এই সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মোহ হইয়া থাকে।" এই স্থলে অকর্ম্ম শব্দ 'কর্ম্মের অভাব' ও 'মন্দ কর্ম্ম' এই দুই অর্থেই যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে। মূল শ্লোক সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ।

তিনি তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি সেই শত্রুদিগের সাহায্যে রোমান লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে সবশেষে একেবারে রোমনগরের দরজার সামনে তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন। তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে সম্মুখে রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কি, সেই বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, এবং রোমান লোকদিগের শত্রুপক্ষের সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়া দিলেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয় মোহে পতিত হইবার এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা অর্ব্বাচীন ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এত দূরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। গ্রন্থারম্ভে (আ, ২) ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস 'সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্ত', 'অনেকসময়ান্বিত', প্রভৃতি তাহার বিশেষণ দিয়াছেন। উহাতে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র আছে। (শুদ্ধ তাহাই নয়,—'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'—ইহাতে যাহা আছে তাহা অন্যত্রও আছে এবং ইহাতে যাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই (আ, ৬২.৫৩)—এইরূপ মহাভারতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাত্মা পুরুষেরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সুবোধ্য কাহিনীর আকারে, সামান্য লোকদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থে ভারত 'মহাভারতে' পরিণত হইয়াছে। নতুবা কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংবা 'জয়' নামক ইতিহাসের বর্ণনা করিবার জন্য আঠারো পর্ব্ব বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনের কথা ছাড়িয়া দাও; কিন্তু তোমার আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা আপন আপন গ্রন্থে, মনুষ্যেরা সংসারে কিরূপভাবে চলিবে এই বিষয়ে কি স্পষ্ট নিয়ম নির্দেশ করিয়া দেন নাই? কাহারো হিংসা করিবে না, প্রাণনাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজনদিগকে সম্মান করিবে, চুরি কিংবা ব্যভিচার করিবে না প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ নিয়মগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহা হইলে তোমার এই গোলযোগের মধ্যে পড়িবার কারণ কি? কিন্তু উল্টা এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে যে, জগতের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত না এই নিয়মানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সজ্জনেরা সদাচরণের দ্বারা দুষ্টলোকদিগের ছেলে আপনাদিগকে জড়াইয়া ফেলিবেন না, তাহারা প্রতিকারার্থ যে প্রকারেই হউক আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন? ইহা ব্যতীত এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলেও, অনেক সময় কর্ত্তাপুরুষের সম্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে, যে স্থলে এই সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে দুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে আমরা প্রাপ্ত হই। তখন "এ-টা করিব কি ও-টা করিব" এইরূপ বিচারের মধ্যে পড়িয়া মানুষ পাগলা হইয়া যায়। অর্জ্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্ম্মস্পর্শী বিচার

আলোচনা আছে। তাহার দৃষ্টান্ত—মনু সর্ব্ববর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়া যাহা বলিয়াছেন "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ"—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কায়মনো-বাক্যের শুদ্ধতা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (মনু ১০. ৬৩)—এই সনাতন নীতিধর্ম্মগুলির মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" (মভা. আ. ১১. ১৩) এই তত্ত্বটি কেবল আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে নাই, কিন্তু অন্য সকল ধর্ম্মের মধ্যেই ইহা মুখ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল আদেশ আছে তন্মধ্যে "হিংসা করিবে না", এই আদেশ-বচনটিকে মনুর মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা শুধু জীব-হত্যা নহে, অন্য প্রাণীদের মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। সুতরাং অহিংসা অর্থে, কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার দুঃখ না দেওয়া বুঝাই। পিতৃ-হত্যা মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের হিংসা হওয়ায়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্নী বা কন্যার উপর বলাৎকার করিবার জন্য অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত ; নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই নাই, তখন এইরূপ 'আততায়ী' মনুষ্যকে আমরা কি "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব ? না—এই দুষ্ট লোক সাম উপচারের কথা যদি না শুনে তবে উহাকে যথাশক্তি শাসন করিব ? মনু বলেন—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥

"এইরূপে আততায়ী বা দুষ্ট মনুষ্যকে—সে গুরুই হউক, বৃদ্ধই হউক, ছেলেই হউক, বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিশ্চয়ই বধ করিবে।" কারণ, এরূপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততায়ী নিজের অধর্ম্মাচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শাস্ত্রকারেরা বলেন (মনু ৮. ৩৫০)। শুধু মনু নহে, অর্ব্বাচীন ফৌজদারী আইনও একটা সীমার ভিতর আত্মরক্ষার এই অধিকার স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে, অহিংসা অপেক্ষা আত্মসংরক্ষণের ঔচিত্যই অধিকতর বুঝিতে হইবে। ভ্রূণ-হত্যা সকলেই অতি গর্হিত বলিয়া স্বীকার করে ; কিন্তু গর্ভে আটকাইয়া গেলে উহা কাটিয়া বাহির করা হয় না কি ? যজ্ঞে পশুবধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মনু ৫. ৩১) ; তথাপি পিষ্টপশু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা যায় (মভা, শাং, ৩৩৭, অনু. ১১৫. ৫৬) কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্ব্বস্থান ছোট ছোট ক্ষুদ্র জীবে যে ভরিয়া আছে, তাহাদের হত্যা কিরূপে বন্ধ হইবে ? মহাভারতে (শাং ১৫. ২৬) অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্য্যয়ঃ ॥

"চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইরূপ সূক্ষ্ম জীবে জগৎ এতটা ভরিয়া আছে যে, আমরা আমাদের চোখের পাতা ফেলিলেও এই

সকল জীবের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় !" অতএব হিংসা করিবে না, এই কথা শুধু মুখে বলিলে কি ফল হইবে ? এইরূপ সারাসার বিচার করিয়া অনুশাসন পর্ব্বে (অনু. ১১৬) মৃগয়ার সমর্থন করা হইয়াছে। বনপর্ব্বে এইরূপ কাহিনী আছে যে, এক ব্রাহ্মণ ক্রোধের দ্বারা কোন পতিব্রতা রমণীকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়া যখন নিষ্ফল-প্রযত্ন হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন ; তাহার পর, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য ঐ রমণী উক্ত ব্রাহ্মণকে এক ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। ঐ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃভক্ত ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিল। জগতের মধ্যে কে কাহাকে না খায় ? "জীবো জীবস্য জীবনম্" (ভাগ, ১. ১৩. ৪৬) এই ব্যবহার নিত্য চলিতেছে। আপৎকালে "প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বম্"—ইহা শুধু স্মৃতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মনু ৫. ২৮, মভা, শাং ১৫. ২১), ইহা উপনিষদের মধ্যেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (বেসূ, ৩ ৪. ২৮ ; ছাং ৫. ২. ১ ; বৃ, ৬. ১. ১৪)। সকলেই হিংসা ছাড়িয়া দিলে ক্ষাত্রধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে ? এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম চলিয়া গেলে প্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ ঘটিয়া, যে যাহাকে ইচ্ছা বিনাশ করিবে, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে। সার কথা, নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সকল সময়ে ধর্ম্মের বিচার চলে না, নীতিশাস্ত্রের মুখ্য নিয়ম যে অহিংসা, সেই অহিংসার নিয়মেতেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক হয়।

যেমন অহিংসা ধর্ম্ম, তেমনি ক্ষমা, শান্তি, দয়া—এই সকল গুণও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব সময়ে এই শান্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে ? নিয়ত যাহারা শান্তি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্যভাবে নিশ্চয় হরণ করে—এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন নাতি বলিরাজকে এইরূপ বলিতেছেন—

ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।

*　　*　　*

তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা ॥

নিয়ত তেজস্বিতা ও নিয়ত ক্ষমা শ্রেয়স্কর হয় না ; এইজন্যই হে বৎস জ্ঞানীরা ক্ষমারও অপবাদ করিয়াছেন (মভা. বন. ২৮. ৬, ৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগ্যস্থলরূপে কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহ্লাদ বিবৃত করিলেন। তথাপি প্রহ্লাদ ক্ষমার যোগ্যস্থল বুঝিবার তত্ত্ব বা নিয়ম কি তাহা বলেন নাই। যোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অপবাদেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্বটি বুঝিয়া লওয়া খুবই আবশ্যক।

সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্ত্বটিকে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করে—সেটি 'সত্য'। সত্যের মাহাত্ম্য কি আর বর্ণনা করিব ? সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে 'ঋত' ও 'সত্য' উৎপন্ন হয়। সেই সত্যেতেই আকাশ পৃথ্বী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত আবৃত ও ধৃত হইয়া আছে—এইরূপ

দেবতারা সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত" (ঋ, ১০. ১৯০. ১), "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ" (ঋ, ১০. ৮৫. ১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখুন। 'সত্য' এই শব্দের ধাত্বর্থও 'হওয়া' অর্থাৎ "কখনই বিনাশ হইবার নহে" অথবা যাহা ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে"; সুতরাং "সত্যপরতা নাহি ধর্ম্ম। সত্য তেঁচি পরব্রহ্ম।" (সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সত্যই পরব্রহ্ম) এইরূপ সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। "নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ" (শাং, ১৬২. ২৪), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে যে—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

"সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়" (আ, ৭৪. ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। সত্য সম্বন্ধে মনু বিশেষ করিয়া আর এক কথা এই বলেন—

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ॥

"মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়স্থান ও বাক্যের যে মূল উৎস, তাহাকে যে ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে, অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বচোর ব্যতীত আর কিছুই নহে।" অতএব "সত্যপূতাং বদেদ্বাচং" (মনু ৬. ৪৬) সত্যপূত বাক্যই বলিবে—এইরূপ মনু বলিয়াছেন। উপনিষদেও "সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর।" (তৈ, ১. ১১. ১) এইরূপে অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে "সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলং" এই বাক্যকে সকল ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া এক সত্যকেই পালন করিতে বলিয়াছেন (মভা, অনু, ১৬৮.৫০)। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মেও এই ধর্ম্মেরই অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকারে সর্ব্বোপরি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের কোন অপবাদ হইতে পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু দুষ্টলোকে পূর্ণ এই জগতের ব্যবহার বড়ই কঠিন! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্যুহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়া আছে; পরে তরবার হস্তে সেই ডাকাত "সেই ব্যক্তি কোথায়" বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ বাঁচাইবে? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা নিবারণ করা, ইহা শাস্ত্রানুসারে সত্যেরই ন্যায় মহৎ ধর্ম্ম। মনু বলেন, "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ (মনু. ২. ১১০; মভা, শাং ২৮৭. ৩৪)—জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত কথা কহিবে না এবং অন্যায়পূর্ব্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার উত্তর দিবে না। জানা থাকিলেও পাগলের মত কেবল হুঁ হুঁ করিয়াই কালক্ষেপ করিবে—"জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।" ঠিক্ কথা। কিন্তু

'হুঁ' 'হুঁ' বলা ও মিথ্যা বলা পর্য্যায়ক্রমে একই নহে কি? "ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মং",—ধর্ম্মের সহিত প্রতারণা করিয়া মনকে বুঝাইও না—তাহাতে ধর্ম্ম প্রতারিত হয় না, তুমিই প্রতারিত হইবে; মহাভারতের অনেক স্থানে এইরূপ কথিত হইয়াছে। (মভা, আ, ২১৫.৩৪)। কিন্তু হুঁ হুঁ করিয়া কালক্ষেপ করিবার মতও যদি অবস্থা না হয়? দস্যু হাতে তরবারি লইয়া তোমার বুকের উপর বসিয়া, ধন রত্ন কোথায় আছে বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং উত্তর না দিলে তোমার প্রাণ যাইবে,—এই অবস্থায় তুমি কি বলিবে? সকল ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার দস্যুর দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ণপর্ব্বে অর্জ্জুনকে (কর্ণ. ৬৯. ৬১) এবং পরে, শান্তিপর্ব্বে, সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯.১৫.১৬) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছেন:—

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথংচন।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্বাপ্যকূজনাৎ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্॥

"না বলিলে যদি মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই বলিবে না; বলা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন বিপদের আশংকা থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বলা অধিক প্রশস্ত, বিচারে এইরূপ স্থির হইয়াছে।" কারণ, সত্য-ধর্ম্ম কেবল শব্দোচ্চারণ-নিঃসৃত বাক্য নহে, কিন্তু যে ব্যবহারে সকলের কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অযথার্থ হইয়াছে বলিয়া গর্হিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে সকলের ক্ষতি হয় তাহা সত্যও নহে অহিংসাও নহে:—

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং এতৎ সত্যং মতং মম॥

"সত্য বলা প্রশস্ত বটে; কিন্তু সত্য অপেক্ষাও সর্ব্বভূতের যাহাতে হিত হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে কারণ, সর্ব্বভূতের যাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমার মতে প্রকৃত সত্য"—এইরূপ শান্তিপর্ব্বে (শাং, ৩২৯.১৩; ২৮৭.১৯) সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ শুককে বলিয়াছেন। "যদ্ভূতহিতং" এই পদটি দেখিয়া আধুনিক ইংরাজী উপযোগিতাবাদী স্মরণে আসায় যদি কোন ব্যক্তি এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তবে তাঁর ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, এই বচনটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধ-সম্বাদে, দুই তিনবার আসিয়াছে। তন্মধ্যে একস্থানে "অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরং (বন, ২০৬. ৭৩) এবং আর এক স্থানে "যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎসত্যমিতি ধারণা" (বন, ২০৮. ৪), এইরূপে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যকে "নরো বা কুঞ্জরো বা"—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—এইরূপ উত্তর দিয়া যে সংশয়-মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন,—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। এই প্রকারে অন্যান্য বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। হত্যাকারী মনুষ্যের প্রাণ মিথ্যা বলিয়া বাঁচাইবে, আমাদের শাস্ত্র একথা বলে না। কারণ, শাস্ত্রেই হত্যাকারী মনুষ্যের দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বধদণ্ড কথিত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত মনুষ্য দণ্ডার্হ কিংবা বধ্য। এই অবস্থায় কিংবা ইহার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় মিথ্যা-সাক্ষ্য দাতা মনুষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্ব্বপুরুষ ও সে ব্যক্তি স্বয়ং নরকগামী হয়,—ইহা সকল শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মনু ৮. ৮৯—৯৯; মভা. আ. ৭. ৩)। কিন্তু

বর্ণপর্ব্বে উপরি-উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত অনুসারে, যদি সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বিনা কারণে নষ্ট হয়—তখন কি করা যাইবে ? গ্রীণ নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় "নীতিশাস্ত্রের উপোদ্ঘাত" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপ স্থলে সমস্ত নীতিশাস্ত্র নিরুত্তর ও নীরব হইয়া যায়। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রসঙ্গকে সত্যাপবাদের মধ্যে পরিগণিত করেন সত্য ; কিন্তু এইরূপ গণনা তাঁহাদের মতে সাধারণতঃ গৌণ—তাই তাঁহারা শেষে এরূপ অপবাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তেরও উপদেশ দিয়াছেন

তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥

(যাজ্ঞ, ২. ৮৩ , মনু, ৮. ১০৪-১০৬)।

অহিংসার অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগকে নীচে নামাইয়া রাখিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। তাই, প্রামাণিক খৃষ্টান ধর্ম্মোপদেশক ও নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এইখানে বলিতেছি। "আমি মিথ্যা বলিলে, প্রভুর সত্যের মহিমা যদি অধিক বর্দ্ধিত হয় (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের অধিক প্রচার হয়) তাহা হইলে আমাকে কিরূপে পাপী বলিয়া স্থির করিবে ? (রোম, ৩. ৭) এইরূপ খৃষ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের নূতন অঙ্গীকারের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসকার মিলম্যান বলিয়াছেন যে প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক কয়েকবার এই অনুসারে কাজ করিয়াছেন। কাহাকে ভোগা দেওয়া কিংবা ভুল বুঝানো—ইহা বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্যনীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রায়ই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাপি, সত্যধর্ম্মনীতি যে একেবারে নিরপবাদ এ কথাও তাঁহারা বলেন না। যে সিজিক্‌ নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। সিজিক্‌ এই কর্ম্মাকর্ম্ম সংশয় স্থলে, "অধিকতম লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং ঐ কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াই, তিনি শেষে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, "ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি (সত্য বলিলে যদি তাহার শরীর খারাপ হয়), নিজের শত্রু, চোর—ইহাদের নিকট এবং অন্যায়পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, কিংবা উকিলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,—মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নহে।" * মিলের নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থেও এই অপবাদের কথা অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথা আছে। † এই অপবাদ ব্যতীত সিজিক্‌ নিজ গ্রন্থে আরও এই কথা লিখিয়াছেন যে, "সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এরূপ যদিও আমরা বলি, তথাপি যে রাজকীয় পুরুষকে নিজ কাজকর্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন একথা আমরা বলিতে পারি না।" ‡ আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রকার নিজের সুবিধামত কাজ করা পাদ্রি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা

* Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. I XI § 6. p. 355 (7th Ed.) Also see Pp. 315-317 (Same ed.)

† Mill's Utilitarianism, Chap II. Pp. 33-34. (15th Ed. Longmans 1907.)

‡ Sidgwick's Methods of Ethics Book IV. Chap III. § 7 p. 454 (7th Ed.) nd Book II Chap V § 3. P. 169.

যায়। আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যিনি নীতিশাস্ত্রের বিচার আলোচনা করিয়াছেন সেই লেস্‌লি-ষ্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ দিয়া শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "আমার মতে, কোন কার্য্যের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার নীতিমত্তা স্থির করা আবশ্যক। মিথ্যা বলিলে যদি সর্ব্বসমেত অধিক কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য বলিবার জন্য আমি কখনও প্রস্তুত থাকিব না। এবং এই প্রকার বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ আমি বুঝিব।" * যিনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নীতিশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্রীন সাহেব † এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশাস্ত্র মনুষ্যের সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারে না, এইরূপ স্পষ্ট বলিয়াছেন ; এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিয়াই পালন করিতে হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই ; 'সাধারণতঃ' তাহার পালনে আমার শ্রেয় হইবে এইটুকুই নীতিশাস্ত্রের কথা। কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখিয়া থাকি। নীতিশাস্ত্রবেত্তা বেন্‌, হেবেল্‌ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগের মত এইরূপ।

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলির তুলনা করিলে সত্য সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য—

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

"ঠাট্টা করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, এবং সঞ্চিত ধন বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বসমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বলায় পাতক নাই"। (মভা, আ, ৮২. ১৬ , শাং, ১০৯ ও মনু ৮. ১১০ দেখ)। কিন্তু তাহার অর্থ, স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্যা বলিবে, এরূপ নহে। সিজিক সাহেব যে অর্থে "ছোট ছেলে, পাগল কিংবা রুগ্ন" ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহিয়াছেন সেই অর্থই মহাভারতের অভিপ্রেত। কিন্তু পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে যাঁহারা গুটাইয়া রাখিয়াছেন, সেই ইংরেজ গ্রন্থকারেরা আরো বেশী দূর গিয়া, ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত নিজের লাভের জন্য মিথ্যা বলিতে পারে —এই যে কথা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এ কথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা কখনই স্বীকার করেন নাই। কেবল সত্যশব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ শুদ্ধ বাচিক সত্য এবং সর্ব্বভূতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই দুয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হয় এবং যে স্থলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে অসত্য বলা অপরিহার্য্য হয়, সেই সেই স্থলেই ইহারা কার্য্য সিদ্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন। সত্যাদি নীতিধর্ম্ম তাঁহাদিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বকালে সমান অবাধিত ; সুতরাং পারলৌকিক দৃষ্টিতে সাধারণতঃ ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিয়া তজ্জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান

* Leslie Stephen's Science of Ethics. Chap IX § 29. p. 369 (2nd. Ed.) "And the certainty may be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

† Green's Prolegomena to Ethics. § 315. p. 379 (5th cheaper Edition.)

‡ Bain's Mental and Moral Science. p. 445 (Ed 1875) ; and Whewell's Elements of Morality Book II. Chaps XIII and XIV (4th Ed 1864.)

করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শূন্যগর্ভ, এই কথা বর্ত্তমানের আধিভৌতিক শাস্ত্রকারেরা বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধারণা কিংবা যাহাদের জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে তাহাদের ধারণা সেইরূপ না হওয়ায়, উভয়েই উক্ত সত্যাপবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—যুধিষ্ঠির "নরো বা কুঞ্জরো বা" এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার দরুণ, পূর্ব্বে তাঁহার যে রথ জমি হইতে চারি আঙ্গুল উপরে অন্তরীক্ষে চলিত, সেই রথ পরে অন্য লোকের রথের ন্যায় জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ ঘণ্টাখানেকের জন্যও নরকলোকে তাঁহাকে বাস করিতে হইল—এইরূপ মহাভারতেই কথিত হইয়াছে (দ্রোণ, ১৯১. ৫৭. ৫৮ ও স্বর্গ ৩. ১৫)। সেইরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে, কিন্তু শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া ভীষ্মের বধসাধন করিবার দরুণ, অর্জ্জুন আপন পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, অশ্ব, ৮১. ১০)। এই সকল কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি-উক্ত অপবাদ মুখ্য বা প্রামাণিক স্বীকার করা যায় না। আমাদের শাস্ত্রকারগণের যাহা অন্তিম ও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তাহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন

আত্মহেতোঃ পরার্থে বা নর্মহাস্যাশ্রয়াত্তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

"স্বার্থের জন্য, পরহিতের জন্য কিংবা ঠাট্টা করিয়া যে সকল ব্যক্তি এই জগতে কখনো মিথ্যা বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয়" (মভা, অনু, ১৪৪. ১৯)।

আপন বাক্য বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অন্তর্ভূত। "হিমাচল বিচলিত হইতে পারে, কিংবা অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্তু আমার মুখের কথা অন্যথা হইবার নহে" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বলিয়াছেন (মভা, আ, ১০৩ ও উ. ৮১. ৪৮)। ভর্ত্তৃহরিও সৎপুরুষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তেজস্বিনঃ সুখমসূনপি সন্ত্যজন্তি
সত্যব্রতব্যসনিনো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্॥

"সত্যব্রত তেজস্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন না" (নীতিশ, ১১০)। সেইরূপ, দাশরথি রামচন্দ্রের এক পত্নীব্রতের মতই তাঁহার একবাণ ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি আছে—"দ্বিঃ শরং নাভিসন্ধত্তে রামো দ্বির্নাভিভাষতে"। হরিশ্চন্দ্র স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য করিবার জন্য ডোমের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কথা আছে। কিন্তু উল্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদি দেবতারাও বৃত্রাসুরের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহার বধসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছে। হিরণ্যকশিপুবধ সম্বন্ধে ঐ ধরণের কথা আছে। তদ্ব্যতীত আইনের ভিতরেও এমন কতকগুলি কড়ার দেখা যায় যাহা ন্যায়বিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্জ্জুনসম্বন্ধে এইরূপ একটা বিষয় মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (কর্ণ, ৬৯)। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, 'তুমি আপন হাতের গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দেও' এই কথা যে কেহ

আমাকে বলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেদ করিব।" অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিলে পর, যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে অর্জ্জুনকে উদ্দেশ্য করিয়া যখন নৈরাশ্য-জনিত স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইল যে "তোমার গাণ্ডীবে আমাদের কি কাজ হইল? উহা হাত হইতে ফেলিয়া দেও" তখন অর্জ্জুন হাতে তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় নিকটে থাকায়, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, তত্ত্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহার মার্ম্মিক বিচার করিয়া, "তুমি মূঢ়, সূক্ষ্মধর্ম্ম এখনও তুমি জান না, বৃদ্ধদের নিকট তোমার উহা শিক্ষা করা আবশ্যক, "ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া—তুমি বৃদ্ধদের সেবা কর নাই, তোমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখিতে হয় তবে তুমি যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা কর, কারণ মানী ব্যক্তির পক্ষে ভর্ৎসনা বধেরই তুল্য," ইত্যাদি প্রকারে তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এবং নির্ব্বিচারে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপ পাতক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে সত্যানৃতের বিচার করিয়া অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, পরে শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকেও সেই উপদেশ দিয়াছিলেন (শাং, ১০৯)। ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। দেখ, এই স্থলে ভ্রাতৃধর্ম্ম সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহার বিপরীতে গীতায় ভ্রাতৃপ্রেম অপেক্ষা ক্ষত্রধর্ম্ম তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে।

অহিংসা ও সত্য—ইহাদের সম্বন্ধে যদি এত বাদানুবাদ তখন তৃতীয় সাধারণ তত্ত্ব অস্তেয় সম্বন্ধেও যে এই প্রকার বাদানুবাদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? একজনের ন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি অন্যেরা যদি অবাধে চুরি বা লুট করিতে পায়, তবে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়া সকলেরই ক্ষতি হইবে, ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ, মূল্য দিয়া, মজুরী করিয়া, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না, এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে পর, যদি কেহ চুরি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি পাপী ঠাওরাইবে? বারো বৎসর ধরিয়া অকাল পড়ায়, বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুকুর মাংসের ঠ্যাং চুরি করিয়া সেই অভক্ষ্য অন্নে স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" (মনু, ৫. ১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিয়া

* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর পাঁচটি করিয়া নখ আছে, সেই সকল প্রাণীর মধ্যে (যাদের গায়ে কণ্টক আছে সেই) সজারু, শল্লক, (সজারুর এক জাত) গোধা, কূর্ম্ম, শশক, এই পাঁচ প্রাণীর মাংস ভক্ষ্য—এইরূপ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (মনু, ৫. ১৮; যাজ্ঞ, ১. ১৭৭)। ইহা ব্যতীত মনু খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারেরও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিকল্প আছে—এইরূপ টীকাকার বলেন। এই বিকল্প ছাড়িয়া দিলে, পাঁচ প্রাণীই থাকিয়া যায়, এবং তাহাদের মাংসই ভক্ষ্য—এইরূপ 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ'র—অর্থ। তথাপি মাংস খাইবার যাহার প্রতি অনুমতি আছে, সে উল্লিখিত প্রাণীর মাংস ছাড়া অপর পাঁচনখী প্রাণীর মাংস খাইবে না, এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, উহাদের মাংস খাইবেই এরূপ বিধান নাই,—মীমাংসক ইহার এইরূপ অর্থ করেন; এই পারিভাষিক অর্থকে তিনি 'পরিসংখ্যা' এই নাম দিয়াছেন। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ'—ইহাই এই পরিসংখ্যার মুখ্য উদাহরণ। মাংস খাওয়াটাই যদি নিষিদ্ধ বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে।

অভক্ষ্য ভক্ষণ, আর তাহাও চুরি করিয়া ভক্ষণ না করিবার জন্য, শাস্ত্র প্রমাণের উপর ভর করিয়া অনেক উপদেশ উক্ত চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিল। কিন্তু—

পিবন্ত্যেবোদকং গাবো মণ্ডূকেষু রুবৎস্বপি।
ন তেঽধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ॥

"ওরে! ভেকেরা ডাকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপ কর! আমাকে ধর্ম্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে" এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন—"জীবিতং মরণাৎ শ্রেয়ো জীবন্ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ"—"বাঁচিলে তবে ধর্ম্ম লাভ হয়, অতএব জীবন মরণাপেক্ষা শ্রেয়ঃ"। কেবল বিশ্বামিত্র নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ত্ত, বামদেব প্রভৃতি অপর অনেক ঋষিও এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনু উদাহরণ দিয়াছেন (মনু, ১০. ১০৫-১০৮) হব্‌স্‌ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ বলেন যে, "দুর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরি বা ডাকাতি করে তবে তাহার সে অপরাধ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" * মিল্‌ও লিখিয়াছেন যে এই প্রকার অবস্থায় চুরি করিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য! †

"মরণঅপেক্ষা জীবন শ্রেয়ঃ" বিশ্বামিত্রের এই তত্ত্বটি কি সর্ব্বথা অব্যভিচারী নহে? এই জগতে কেবল বাঁচিয়া থাকাটাই কিছু পুরুষার্থ নহে। বলি খাইয়া কাকেরাও অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তাই, বীরপত্নী বিদুলা আপন পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, শয্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, মুহূর্ত্তকালের জন্য জ্বলিয়া উঠাও শ্রেয়ঃ—"মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরং" (মভা, উ, ১৩২. ১৫)। আজ নহে কাল, অনন্ত শত বৎসরের পরে মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাই যদি সত্য হয় (ভাগ, ১০. ১৩৮; গী, ২.২৭) তাহার জন্য ভয় বা কান্না কেন? অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে আত্মা নিত্য ও অমর। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত যে শরীর সেই শরীরের কি হয়—এই প্রশ্নটার মীমাংসা বাকী থাকিয়া যায়। চলা-বলা করিতেছে এই যে শরীর ইহা নশ্বর, কিন্তু আত্মার কল্যাণার্থ যাহা কিছু এ জগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার একমাত্র সাধন; তাই মনুও বলিয়াছেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ধন, দারা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত রক্ষা করিবে (মনু ৭. ২১৩)। এই মানবদেহ দুর্লভ ও নশ্বর হইলেও তাহা অপেক্ষা অধিক শাশ্বত কোন বস্তু কখন লাভ করিতে হয়, তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, কিংবা দাবী বজায় রাখিবার জন্য; মানের জন্য, যশের জন্য অথবা সর্ব্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহাত্মাই অনেক সময়ে এই তীব্র কর্ত্তব্যবহ্নিতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত আহুতি দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেনুকে সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন দেহকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত দিলীপ—"আমার ন্যায় পুরুষদিগের

* Hobbes' Leviathan Part II Chap XXVII. P, 139 (Morley's Universal Library Edition) Mill's Utilitariamism. Chap. V. P. 95 (15th ed,) † "Thus to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal & c."

পাঞ্চভৌতিক শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়া থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ্‌" (রঘু. ২. ৫৭), এই কথা সিংহকে বলিয়াছিলেন, রঘুবংশে আছে; সর্পের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গরুড়কে জীমূতবাহনের স্বীয় দেহ অর্পণ করিবার কথা কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০. ২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন—

ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ।
বিশুদ্ধস্য হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমঃ কিল॥

"আমি মরণে ভীত নহি; কেবল যশ দূষিত হইয়াছে এই জন্যই আমি দুঃখিত। বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুত্রজন্মজন্য উৎসবের তুল্য।" এই তত্ত্বের উপরে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের রক্ষণার্থ, শ্যেন পক্ষীর রূপধারী উক্ত কপোতের অনুধাবক ধর্ম্মকে নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শত্রু যে বৃত্রাসুর, তাহাকে মারিবার জন্য দধীচি ঋষির অস্থি হইতে বজ্র করিবার কথা হইল। তখন সকল দেবতারা উক্ত ঋষির নিকট গিয়া "শরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্‌ কর্ত্তুম্‌ অর্হতি"—"মহর্ষি, সর্ব্বলোকের কল্যাণার্থ আপনার দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পর, দধীচি ঋষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং দেবতাদিগকে আপন অস্থি দান করিলেন। এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (বন. ১০০, ১৩১; শাং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের সঙ্গে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হরণ করিবার জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দানশূর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুণ্ডল কাহাকে দান না করা হয়, সূর্য্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর কীর্ত্তি আছে, তথাপি কবচ-কুণ্ডল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহা কাহাকেও দিবি না।" কারণ মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি কাজে লাগিবে? মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং? সূর্য্যের এই কথা শুনিয়া—"জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তদ্বিদ্ধি মে ব্রতম্‌"—প্রাণ গেলেও কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে, কর্ণ তাঁহাকে এইরূপ স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন (মভা বন. ২৯৯. ৩৮)। সারকথা এই যে মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি ক্ষাত্রধর্ম্ম (গী. ২. ৩৭) এবং "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" (গী. ৩. ৩৮) এই সিদ্ধান্ত ঐ তত্ত্বকেই অবলম্বন করিয়া আছে; এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলিয়াছেন—"কীর্ত্তি পাহেঁ জাতাঁ সুখ নাহি। সুখ পাহ তাঁ কীর্ত্তি নাহি॥" "কীর্ত্তি দেখিয়া চলিলে সুখ নাই, সুখ দেখিলে কীর্ত্তি নাই"। (দাস. ১২. ১০. ১৯, ১৮. ১০. ২৫)। আরও বলিয়াছেন—"দেহ ত্যাগিতাঁ কীর্ত্তি মাগে উরাবী। মনা সজ্জনা হেচি ক্রিয়া করাবী"॥ "দেহ ত্যাগ করিবার সময় কীর্ত্তি সম্মুখে রাখিবে, রে মন! সজ্জনদিগের এইরূপই আচরণ জানিবে।" কিন্তু পরোপকারের দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জিত হয় এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি কাজে লাগিবে? অথবা মানী পুরুষের অপকীর্ত্তি অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা (গী. ২. ৩৪), কিংবা জীবন অপেক্ষা পরোপকার করা অধিকতর প্রিয়—কেন মনে করিবে? এই

প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে হইলে, আত্ম-অনাত্মবিচারক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। এবং ইহারই সঙ্গে কর্ম্ম-অকর্ম্ম শাস্ত্রেরও বিচার করিয়া জানা উচিত যে, কোন্ প্রসঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং কোন্ প্রসঙ্গে অনুচিত। নচেৎ, প্রাণ বিসর্জ্জনের কারণে যশোলাভ দূরের কথা, মূর্খতা করিয়া আত্মহত্যা-করিবার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আসে।

মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি বন্দ্য ও পূজ্য পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সেবা করা—ইহাও সাধারণ ও সর্ব্বমান্য ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুম্বদিগের, গুরুকুলের কিংবা সমস্ত সমাজেরও ঠিক ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই, শুদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে, উপনিষদেও "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" এইরূপ বলিয়া তাহার পর আছে "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।" অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিবার মুখে প্রত্যেক গুরু শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ করিতেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ১. ১১. ১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাহ্মণব্যাধ আখ্যানেরও ইহাই তাৎপর্য্য (বন. অ. ২১৩)। কিন্তু এই ধর্ম্মেও কতকগুলি অকল্পিত, কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে—

উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্যঃ আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রং তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ "দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা ও সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক" এইরূপ মনু বলেন (২.১৪৫)। তথাপি মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে (বন. ১১৬. ১৪); এবং শান্তিপর্ব্বে চিরকারিকোপাখ্যানে (শাং. ২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা শ্রেয়স্কর কিংবা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা শ্রেয়স্কর—অনেক সাধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ-সমূহের নীতিশাস্ত্রদৃষ্টিতে মীমাংসা করিবার প্রথা মহাভারতের-কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। পিতার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাঁহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্তু উপরে মাতা সম্বন্ধে যে নীতি কথিত হইল, তাহা পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন প্রযুক্ত হইবার অবসর আসিতে পারে। তাহার উদাহরণ যথা—পুত্র আপন পরাক্রমে রাজা হইলে পর, তাহার পিতা অপরাধী হইয়া বিচার-নিষ্পত্তির জন্য তাহার সম্মুখে উপনীত হইল; তখন রাজা এই সূত্রে তাহার বাপকে শাসন করিবে কিংবা বাপ বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? মনু বলেন :—

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ—"পিতা, আচার্য্য, মিত্র, মাতা, পত্নী, পুত্র কিংবা পুরোহিত যেই হউক না কেন, যদি সে আপন ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে অদণ্ড্য নহে, অর্থাৎ উচিত শাসন করা রাজার কর্ত্তব্য" (মনু, ৮. ৩৩৫; মভা, শাং, ১২১. ৬০)। কারণ, এইস্থলে

পুত্রধর্ম্মাপেক্ষা রাজধর্ম্মের ঔচিত্য অধিক। এই নীতি অনুসারে মহাপরাক্রমী সূর্য্য-বংশীয় সগর রাজা, আপন দুরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতেছে দেখিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, ব. ১০৭, রামা, ১৩৮)। মনুস্মৃতিতেও এইরূপ এক কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক ঋষির অল্প বয়সে উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মামা প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গুরু প্রায়ই যে ভাবে বলিয়া থাকেন সেইভাবে কোন এক প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে, তাহাদিগের উদ্দেশে "পুত্রগণ" এই শব্দটা সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্।" কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল বৃদ্ধেরা অতিশয় রুষ্ট হইয়া, "ছোঁড়াটার ভারী দেমাক্ হইয়াছে" ঠাওরাইলেন; এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতা-দিগের নিকট নালিশ করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া "আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে তাহা ন্যায্য'—এইরূপ বিচারনিষ্পত্তি করিলেন। কারণ—

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

অর্থাৎ চুল পাকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুবা হইয়াও যে অধীয়ান্ তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন" (মনু, ২. ১৫৬; সেইরূপ মভা, বন. ১৩৩. ১১, শল্য ৫১. ৪৭ দেখ)। শুদ্ধ মনু ও ব্যাস নহে, বুদ্ধদেবও এই তত্ত্ব মান্য করিয়াছিলেন। কারণ মনুসংহিতার উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ 'ধম্মপদ' * নামে প্রসিদ্ধ নীতিবিষয়ক বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে আছে (ধম্মপদ ২৬০)। পরে ঐ গ্রন্থে,—"কেবল বয়সেই যে পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন ব্যর্থ এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংসা ইত্যাদি সদ্গুণ থাকা নিতান্তই আবশ্যক" এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং 'চুল্লবগ্গ' নামক অপর গ্রন্থে, ধর্ম্মনিদর্শনকারী ভিক্ষু তরুণবয়স্ক হইলেও স্বয়ং উচ্চ আসনে বসিয়া, আপনার পূর্ব্বে দীক্ষিত বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এইরূপ বুদ্ধেরা অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্গ ৬. ১৩. ১ দেখ)। প্রহ্লাদ আপন পিতা হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, সেই পৌরাণিক কথা সর্ব্ববিশ্রুত আছে। এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে যখন পিতাপুত্রের সর্ব্বমান্য সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরুতর অপর কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তখন পিতাপুত্রেরও সম্বন্ধ ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাইতে

* "ধম্মপদ" গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তর Sacred Books of the East (প্রাচ্য, ধর্ম্মপুস্তকমালা) Vol X-এ করা হইয়াছে; চুল্লবগ্গের ইংরেজী ভাষান্তর ঐ মালার Vol XVII ও XX-এ প্রকাশিত হইয়াছে। মারাঠীতেও, রা, রা, বাদব রাও বার্বাকর ধর্ম্মপদের ভাষান্তর করিয়াছেন—তাহা কোহ্লাপুরের গ্রন্থমালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। ধম্মপদের পালি শ্লোকটি নিম্নে দিতেছি :—

ন তেন থেরো হোতি যেনস্স পলিতং সিরো।
পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিণ্ণো তি বুচ্চতি॥

"থের" এই শব্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, উহা সংস্কৃত 'স্থবিরের' অপভ্রংশ।

হয়। কিন্তু এইরূপ অবসর উপস্থিত না হইলেও, এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া কোন ছোট ছেলে আপন বাপকে যদি গালি দেয়, তবে আমরা সেই ছেলেকে পশুর মধ্যে গণনা করি না কি? "গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ' (শাং, ১০৮. ১৭) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্তু "মরুত্ত" রাজার গুরু লোভবশ হইয়া স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিলে পর—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনম্ ॥

"কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায়সঙ্গত" এইরূপ উচ্ছ্বাসবাক্য মরুত্ত বাহির করিয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে (মভা, আ. ১৪২. ৫২. ৩; উ. ১৭৯. ২৪, ৫৭. ৭; ১৪০. ৪৮)। তন্মধ্যে প্রথম স্থলের পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থলে চতুর্থ চরণের পরিবর্ত্তে "দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ" কিংবা "পরিত্যাগো বিধীয়তে"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের যে স্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একই অর্থাৎ উপরিউক্ত পাঠই পাওয়া যায় বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছি। ভীষ্ম পরশুরামের সহিত এবং অর্জ্জুন দ্রোণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই তত্ত্বেরই বনিয়াদে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রহ্লাদের গুরু যখন প্রহ্লাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন তখন এই তত্ত্বের বনিয়াদেই প্রহ্লাদ তাঁহাকে নিষেধ করেন। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, গুরুলোক পূজ্য সত্য, কিন্তু তাঁহাদেরও নীতির মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ—

সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ঃ স হি ধর্ম্মবিৎ ॥

"হে কেশব, মর্য্যাদা, নীতি, কিংবা শিষ্টাচার যাহারা পালন করে না সেই লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করে সে ধর্ম্মজ্ঞ।" (শাং, ৫৫. ১৬)। সেইরূপ, তৈত্তিরীয়োপনিষদেও "আচার্য্যদেবো ভব" এইরূপ প্রথম বলিয়া তাহারই ঠিক পরে "আমাদের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ করিবে"—"যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ, ১. ১১. ২)। ইহা হইতে পিতা কিংবা আচার্য্য দেবতার সমান পূজনীয় হইলেও, যদি তাঁহারা সুরা পান করেন তথাপি তুমি সুরা পান করিবে না, কারণ নীতির মর্য্যাদার ও ধর্ম্মের অধিকার, পিতামাতা, গুরু প্রভৃতির অপেক্ষা অধিকতর বলবান, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। "ধর্ম্ম পালন কর, ধর্ম্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, ধর্ম্ম তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না", মনু এইরূপ যে বিধান করিয়াছেন, তাহারও অন্তর্নিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮. ১৪. ১৬)। রাজা তো গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—একরূপ দেবতা (মনু, ৭. ৮ ও মভা, শাং, ৬৮. ৪০)। কিন্তু তাঁহাকেও ধর্ম্ম ছাড়ে না,

ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হন এইরূপ মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে বেন ও খনীনেত্র এই দুই রাজার আখ্যানে এই অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭. ৪১ ও ৮. ১২৮; মভা, শাং, ৫৯. ৯২-১০০, ও অশ্ব, ৪ দেখ)।

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়—ইহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহও সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে (মনু, ১০. ৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মনুষ্যের শত্রু হওয়ায়, মানব উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে তাহার কিংবা সমাজের কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ সকল শাস্ত্রেই আছে। বিদুর নীতি এবং ভগবদ্‌গীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

"কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় উহাদিগকে ত্যাগ করিবেক" (গীতা, ১৬. ২১, মভা, উ, ৩২. ৭০)। কিন্তু গীতাতেই ভগবান্ "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ"—হে অর্জ্জুন, প্রাণীদিগের মধ্যে, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭. ১১) এইরূপে আপন স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে কাম তাহাই নরকের দ্বার, উহা ব্যতীত অন্য প্রকারের কাম ভগবানের নিকট মান্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মনুও বলিয়াছেন যে "পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ"—অর্থাৎ ধর্ম্মবর্জ্জিত যে অর্থ-কাম তাহাই পরিত্যাগ করিবে (মনু, ৪. ১৭৬)। সকল প্রাণী যদি কল্য অবধি কাম-মহারাজকে একেবারে ছুটি দিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সংকল্প করে, তাহা হইলে ৫০ বৎসর কিংবা খুব-বেশী ১০০ বৎসরের মধ্যেই জীবসৃষ্টির লয় হইয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে। এবং যে সৃষ্টি উৎসন্ন না হয় বলিয়া বারবার ভগবান্ অবতার ধারণ করেন, স্বল্পকালের মধ্যেই সেই সৃষ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কাম ও ক্রোধ এ দুই শত্রু বটে, কিন্তু কখন্? যখন সংযত না থাকে তখনই। সৃষ্টির ক্রমগতির উচিত সীমার মধ্যে উহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগেরও সম্মত (মনু, ৫. ৫৬)। এই প্রবল দুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে রাখিলে, ইহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না। ভাগবতে আছে—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

"এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না; উহা মনুষ্যের স্বাভাবিক। এই তিনের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহাদিগকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংযত করিয়া, সুব্যবস্থিত করিবে; এই কারণেই, বিবাহ, সোমযাগ ও সৌত্রামণী যজ্ঞ—শাস্ত্রকারেরা যথানুক্রমে ইহাদের যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম আচরণেই ইষ্ট হয়"—এইরূপ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১৫. ১১)। 'নিবৃত্তি' এই শব্দের, পঞ্চমী-অন্ত পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে "অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করা" এইরূপ অর্থ হয়; তথাপি কর্ম্মযোগে 'নিবৃত্তি' এই বিশেষণ কর্ম্মের সম্বন্ধই প্রযুক্ত হওয়ায় 'নিবৃত্তকর্ম্ম' অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম—এইরূপ এই পদের অর্থ ইহা যেন এখানে

মনে রাখা হয়। ঐরূপ অর্থ মনুস্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ১২.৮৯, ভাগ, ১১.১৮, ১ ও ৭. ১৫.৪৭ দেখ)। ক্রোধসম্বন্ধে ভারবি কিরাত-কাব্যে এইরূপ বলিতেছেন—

অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ ॥

অর্থাৎ— অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই বা কি, দ্বেষই বা কি—দুই সমান! ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে দেখিতে গেলে—

এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী।
ক্ষমাবান্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্ ॥

অর্থাৎ—"অন্যায় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহ্য হয় সেই পুরুষ; যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে" এইরূপ বিদুলা বিবৃত করিয়াছেন (মভা, উ, ১৩২. ৩৩)। উপরে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের ব্যবহারে সকল সময়ে ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সকল সময়ে ক্ষমাও উপযোগী নহে। লোভের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে; কারণ সন্ন্যাসী হইলেও মোক্ষের বাসনা সে ত্যাগ করিতে পারে না।

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ পরস্পর বিরোধের অতিরিক্ত দেশকালাদির দ্বারা মর্য্যাদাবদ্ধ হয়, ইহা ব্যাসদেব মহাভারতের অনেক স্থানে বিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপ্রদান করিয়াছেন। যে কোন সদ্‌গুণই হউক না কেন, উহা সর্ব্বপ্রসঙ্গেই উপযোগী হইবে এইরূপ নহে। ভর্তৃহরি বলেন—

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ

অর্থাৎ "বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার সময়) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌর্য্য—এই সকল সদ্‌গুণ" (নীতি, ৬৩)। শান্তির সময় উত্তরের মত বড় বড় বকিয়া বকিবার লোকের অভাব নাই। ঘরে বসিয়া স্ত্রীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অনেক আছে, তাহাদের মধ্যে রণাঙ্গনে প্রকৃত ধনুর্দ্ধর বীর দুই একজনই বাহির হয়। ধৈর্য্যাদি গুণ উপরি-উক্ত সময়েই শোভা পায়। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। ক্ষণেকের নর্ম্মসুহৃৎ অনেক থাকে; কিন্তু "নিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ"—সংকটকালই তাহাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টিপাথর! 'প্রসঙ্গ' এই শব্দের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রাদি বিষয়েরও সমাবেশ হয়। সমতা অপেক্ষা অন্য কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নহে। ভগবদ্গীতা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—ইহা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ। কিন্তু সমতার অর্থ কি? কোন ব্যক্তি যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া সকলকেই সমান দান করিতে থাকিলে আমরা তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্ব্বোধ বলিব? ভগবদ্গীতাতেই এই প্রকার নির্ণয় করা হইয়াছে যে, "দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ"—দেশ-কাল বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান (গীতা ১৭. ২০)। কালের সীমা শুধু বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তই, এরূপ নহে। কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্ম্মেতেও পার্থক্য আসিয়া পড়ে, এবং

তাহার দরুণ কোন প্রাচীনকালের বিষয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে হইলে, তৎকালীন ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ধারণার বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক হয়।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগমানানুরূপতঃ ॥

"যুগ-মান অনুসারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, ইহাদের ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে," এইরূপ মনু (১.৮৫) ও ব্যাস বলিয়াছেন (মভা, শাং, ২.৫৯, ৮)। পূর্ব্ব-কালে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সীমা না থাকায় তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও অসংযত ছিল, কিন্তু পরে এই আচারের দুষ্পরিণাম নজরে আসিলে পর, শ্বেতকেতু বিবাহের সীমা স্থাপন করিলেন (মভা, আ, ১২২), এবং সুরাপান সম্বন্ধে নিষেধ শুক্রাচার্য্য প্রথম প্রবর্তিত করেন, এইরূপ কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, আ, ৭৬)। সুতরাং এই নিয়ম যে সময়ে আমলে আসে নাই সেই সময়কার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীতিতে করা আবশ্যক। সেই প্রকার বর্ত্তমানকালের ধর্ম্ম যদি পরে বদল হয় তবে সেই অনুসারে ভবিষ্যৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনাও বিভিন্ন ধরণে করা যাইবে। কালমান অনুসারে দেশাচার, কুলাচার ও জাতিধর্ম্মেরও বিচার করা আবশ্যক, কারণ আচারই সর্ব্বধর্ম্মের মূল। তথাপি আচার-বিচারাদির মধ্যেও মিল থাকে না। পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন—

ন হি সর্ব্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
তেনৈবান্যঃ প্রভবতি সোঽপরং বাধতে পুনঃ ॥

"সকলের সকল সময়ে সমান হিতকর, এরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। এক আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে দেখা যায় এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তবে তাহা আবার তৃতীয় কোন আচারের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে" (শাং, ২৫৮, ১৭, ১৮)। যখন আচারসমূহের মধ্যে এত পার্থক্য, তখন ভীষ্মের উক্তি অনুসারে আচার-অনাচারও তারতম্য অথবা সার-অসার দৃষ্টিতে বিচার করা আবশ্যক।

সে যাক্। কর্ম্মাকর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত সংসারের সমস্ত সমস্যা এইরূপে সমাধান করিতে বসিলে দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে হয়। গীতার আরম্ভ ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই দুয়ের মধ্যে যুঝাযুঝি করিয়া অর্জ্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা অ-লোকসাধারণ অবস্থা নহে; ঐরূপ অবস্থা সংসারে কর্ত্তৃপুরুষদিগের ও মহাত্মা ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা আসিলে পর যখন অহিংসা ও আত্মরক্ষণ, সত্য ও সর্ব্বভূতহিত, দেহসংরক্ষণ ও যশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ সূত্রে উপস্থিত কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ও সর্ব্বমান্য নীতিনিয়মের দ্বারা ধর্ম্মের বিভাগ না হওয়ায়, উহাদিগের অনেক অপবাদ বা ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়; এবং এইরূপ সংকটকালে সাধারণ মনুষ্যের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি, অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিবার কোন স্থায়ী পদ্ধতি কিংবা যুক্তি আছে কি নাই, ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য উপরিলিখিত বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের মত সংকটকালে 'আপদ্ধর্ম্ম' বলিয়া শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথা বলা হইয়াছে সত্য। দৃষ্টান্ত যথা—আপৎকালে ব্রাহ্মণ যে-কোন স্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে দোষ বর্ত্তে না এইরূপ স্মৃতিকারেরা বলিয়াছেন। উষস্তি-চাক্রায়ণ এই প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ৩, ৪১, ছাং ১. ১০)। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ ও উপরোক্ত প্রসঙ্গ, এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। দুর্ভিক্ষের মত আপৎকালে শাস্ত্রধর্ম্ম ও ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া ইন্দ্রিয়গণ একদিকে ও শাস্ত্রধর্ম্ম অন্যদিকে টানিয়া থাকে। কিন্তু উপরে যে সকল সমস্যা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই। কিন্তু দুই ধর্ম্মের এরূপ পরস্পর-বিরোধ হয়, যাহার প্রসঙ্গে শাস্ত্রে কর্ত্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এবং সেই সময় ইহা করিব কি উহা করিব—তাহার সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু পুরুষেরা এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কোন কোন ব্যক্তি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোন বিষয় নিজ বুদ্ধিমত নির্ণয় করিতে পারিলেও এমন অনেক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় যেখানে অনেক বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। কারণ, যতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হইয়া শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হইয়া পড়ে। যথাযুক্ত নির্ণয় না হইলেও আমাদের দ্বারা অধর্ম্ম কিংবা অপরাধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বা কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার-আলোচনা এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র—উহা ন্যায় ও ব্যাকরণ অপেক্ষাও গভীর। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'নীতিশাস্ত্র' এই শব্দ প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয়; এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শাস্ত্রকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলাই প্রাচীন পদ্ধতি। কিন্তু আজকাল 'নীতি' এই শব্দেই কর্ত্তব্য ও সদাচরণের সমাবেশ হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে আমি এই গ্রন্থে ধর্ম্মাধর্ম্মের বা কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার-আলোচনাকেই 'নীতিশাস্ত্র' বলিয়াছি। নীতি, কর্ম্মাকর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সংক্রান্ত এই শাস্ত্র অতি গভীর, ইহা দেখাইবার জন্যই 'সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য"—ধর্ম্মের বা ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের স্বরূপ অতি-সূক্ষ্ম—এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পঞ্চপাণ্ডব কেমন করিয়া এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীষ্ম-দ্রোণাদি শূন্যহৃদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বসিয়া রহিলেন? কিংবা দুষ্ট দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময় ভীষ্মদ্রোণাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ"—পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে (মভা. ভীষ্ম, ৪৩. ৩৫), এই তত্ত্বটি ঠিক না ভুল? যখনই হোক্ না কেন, "সেবা শ্ববৃত্তি-রাখ্যাতা" (মনু, ৪০৬) সেবাধর্ম্ম যদি কুক্কুরবৃত্তির ন্যায় গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে অর্থের দাস না হইয়া ভীষ্মাদি কৌরবেরা দুর্য্যোধনের সেবা কেন পরিত্যাগ করেন নাই? এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কারণ, এরূপ স্থলে ভিন্ন

ভিন্ন মনুষ্য প্রসঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান বা নির্ণয় করিয়া থাকে। "সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য" (মভা, অনু, ১০. ৭০.) ধর্ম্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম, শুধু ইহাই বলিতে হইবে না; কিন্তু "বহুশাখা হ্যনন্তিকা" (বন, ২০৮. ২) উহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হওয়ায়, তাহা হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। তুলাধার—জাজলি সংবাদে তুলাধারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্মত্বান্ন স বিজ্ঞাতুং শক্যতে বহুনিহ্নবঃ"—ধর্ম্ম সূক্ষ্ম ও অতীব জটিল হওয়ায় অনেক সময় বুঝা যায় না, (শাং. ২৬১, ৩৭)। মহাভারত-কার এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকায়, এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাচীন মহাত্মারা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্যই তিনি মহাভারতে নানা উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্ররীতি অনুসারে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া তাহার সাধারণ মর্ম্ম মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থে কোথাও না কোথাও বলা আবশ্যক হইয়াছিল। এই মর্ম্ম, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যমূঢ়তা অপসারিত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাহার দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে। মহাভারতও গীতা-প্রতিপাদিত মূলভূত কর্ম্মতত্ত্বসমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। গীতাগ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাঁহারা করেন, তাঁহারা আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। অধিক কি, গীতাগ্রন্থের যদি কিছু অপূর্ব্বতা বা বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই। কারণ, শুধু মোক্ষশাস্ত্রের অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদক উপনিষদাদি এবং অহিংসাদি সদাচরণের শুধু নিয়ম-উপদেষ্টা স্মৃতিশাস্ত্রাদি অনেক থাকিলেও বেদান্তের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বনিয়াদে, 'কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি'-প্রবর্ত্তক গীতার ন্যায় অপর প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্ত্তমানে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে (সাহিত্য) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি' এই শব্দ আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহা গীতাতেই আছে (গীতা, ১৬. ২৪),—এ কথা গীতাভক্ত-দিগকে বলা বাহুল্য। ভগবদ্গীতার ন্যায় যোগবাসিষ্ঠেও, বসিষ্ঠ রামচন্দ্রকে জ্ঞান-মূলক প্রবৃত্তিমার্গেরই চরম উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠের ন্যায় যে সকল গ্রন্থ গীতার পরে বা তাহার অনুকরণে রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার উপরোক্ত অপূর্ব্বতা বা বিশেষত্ব বিষয়ে কোনই বাধা হয় না। ইতি

কর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রকরণ

কর্ম্মযোগশাস্ত্র

তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ । *

কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ যদি কোন ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতে না থাকে, তবে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের সে অনধিকারী হয়। এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আর উল্টানো কলসে জল ভরা—একই কথা। শিষ্যের তাহা হইতে কোন ফল হয় না,—শুধু তাহা নহে, গুরুরও অকারণ শ্রম হয়; উভয়েরই সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। জৈমিনি এবং বাদরায়ণের সূত্রের আরম্ভে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ও "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র এই কারণেই স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপদেশ যেরূপ মুমুক্ষুকে, ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসুকে দেওয়া উচিত, সেইরূপ, সংসারে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা কিংবা জিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে, তাহাকেই কর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ দেওয়া উচিত; এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে 'অথাতো' করিয়া, দ্বিতীয় প্রকরণে কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। অমুক স্থানে আমার আট্‌কাইতেছে এইরূপ প্রথমেই অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতটা গুরুত্ব তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, কেবল মুখে আওড়ানো শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য সদ্‌গুরু শিষ্যের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহাই দেখেন, যদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। গীতার কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার আলোচনা এই পদ্ধতি অনুসারেই করা হইয়াছে। যে যুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হইয়া সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগেরও ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই সংশয় অর্জ্জুনের মনে উদয় হওয়ায় অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে যখন প্রস্তুত হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া পাগলামি ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, উল্টা শুধু দুষ্কীর্ত্তিই লাভ হইবে, এইরূপ সাধারণ ধরণের যুক্তিবাদেও যখন তাহার সমাধান হইল না, তখন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—তুমি অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বড়বড় কথা আমাকে বলিতেছ—শ্রীকৃষ্ণ একটু উপহাসের ভাবে ইহা বলিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ায়, বড় বড় পণ্ডিতেরাও প্রসঙ্গবিশেষে "কি করিবে কি করিবে না" এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা আমি পূর্ব্ব

* অতএব তুমি যোগ অবলম্বন কর। কর্ম্ম করিবার যে শৈলী, চাতুর্য, কিংবা কুশলতা তাহাকেই যোগ বলে।

প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; যাহাতে জাগতিক কর্ম্মের লোপ না হইয়া, কেবলমাত্র কর্ম্মজনিত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই প্রকারের 'যোগ' অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব "হে অর্জ্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর"—তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব—ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বক্তব্য। এই 'যোগই "কর্ম্মযোগশাস্ত্র"। অর্জ্জুন যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সেই সমস্যা-প্রসঙ্গ কিছু অলৌকিক ছিল না—সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত হয়। তাই ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মযোগশাস্ত্রের যে বিচার করা হইয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কোন শাস্ত্র হউক না, তাহার প্রতিপাদন কল্পে কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গূঢ়ার্থ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ঐ শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝিবার জন্য, সেই সকল শব্দের প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে জানা আবশ্যক। নচেৎ পরে উহা বুঝিবার পক্ষে অনেক প্রকার ভুল ও গণ্ডগোল উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে।

তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শব্দ 'কর্ম্ম'। 'কর্ম্ম' শব্দ কৃ-ধাতু হইতে বাহির হওয়ায় তাহা অর্থ 'করা', 'ব্যাপার', 'আচরণ'—এইরূপ, এবং এই সাধারণ অর্থে ঐ শব্দ ভগবদ্গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বলিবার কারণ এই যে, মীমাংসাশাস্ত্রে কিংবা অন্যত্র এই শব্দের যে সংকুচিত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মনে আনিয়া পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না হন। যে কোন ধর্ম্মই ধর না কেন, তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কোন না কোন কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম অনুসারে বলিতে হইলে, যজ্ঞ-যাগই সেই কর্ম্ম। বৈদিকগ্রন্থে এই যজ্ঞযাগেরই বিধি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থাদির স্থানে স্থানে কখন কখন বিরোধী বচনও পাওয়া যায়; তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে তাহা জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জৈমিনীয় মতানুসারে, এই বৈদিক ও শ্রৌত যজ্ঞযাগের অনুষ্ঠান করাই মুখ্য প্রাচীন ধর্ম্ম। মানুষ যাহা কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন পাইতে হইলে, যজ্ঞের জন্যই পাওয়া চাই, এবং ধান্য সংগ্রহ করিলেও তাহা যজ্ঞেরই জন্য বুঝিতে হইবে (মভা, শাং. ২৬, ২৫)। যখন, যজ্ঞ করিবে—ইহাই বেদের দেবতাদিগের আদেশ, তখন যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে কোন মনুষ্যের বন্ধক ফলদায়ক হয় না; তাহা যজ্ঞের সাধন, স্বতন্ত্র সাধ্য নহে। তাই যজ্ঞ হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত; উহার অন্য পৃথক্ ফল নাই। কিন্তু যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত এই সকল কর্ম্ম স্বতন্ত্র ফলদায়ক না হইলেও শুধু যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গ প্রাপ্তি (অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের সুখপ্রাপ্তি) হয় এবং সেই স্বর্গ প্রাপ্তির জন্যই যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষ অনুরাগের সহিত যজ্ঞ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্মই পুরুষার্থ ইহা

স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যে বস্তু সম্বন্ধে মানুষের প্রীতি থাকে ও পাইবার ইচ্ছা হয় তাহাকেই পুরুষার্থ বলে (জৈ, সূ, ৪. ১. ১ ও ২)। যজ্ঞের এক পর্য্যায় শব্দ 'ক্রতু'; তাই যজ্ঞার্থের বদলে "ক্রত্বর্থ" এই শব্দও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম দুই বর্গে বিভক্ত হইয়া থাকে—এক, 'যজ্ঞার্থ' (ক্রত্বর্থ) কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা স্বতন্ত্ররূপে ফলদায়ক নহে বলিয়া অবন্ধক; এবং দ্বিতীয়, 'পুরুষার্থ' কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা পুরুষের ফলদায়ক বলিয়া বন্ধক। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে যাগযজ্ঞাদিরই বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তুতিপর সূক্ত আছে, সত্য, কিন্তু মীমাংসক বলেন যে তাহাদের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্ত্তব্য হওয়ায় সমস্ত শ্রুতিগ্রন্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই প্রতিপাদক। বেদের অন্তভূর্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, নতুবা হয় না; অতএব ঐ যাগযজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ব্বক কর, একই ফল—এইরূপ এই কর্ম্মনিষ্ঠ, যাজ্ঞিক ও নিছক কর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন। উপনিষদে এই যজ্ঞ গ্রাহ্য বলিয়া ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা কম বলিয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" (গী. ২. ৪২) প্রভৃতি বাক্যে যে যাগযজ্ঞাদি কাম্যকার্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানে অনুষ্ঠিত উপরিউক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম। সেইরূপ "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ—যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কর্ম্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গী, ৩. ৯), ইহাই মীমাংসকদিগের মতের অনুবাদ। এই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অর্থাৎ শ্রৌত কর্ম্ম ব্যতীত, ধর্ম্মদৃষ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্ম্মও চাতুর্বর্ণ্যভেদে মনুস্মৃত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি। এই সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ স্মৃতিগ্রন্থাদিতেই পদ্ধতিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহাদিগকে 'স্মার্ত্ত' কিংবা 'স্মার্ত্ত যজ্ঞ' এমনও বলা হইয়া থাকে। এই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম ব্যতীত অপর কতকগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম—তথা, ব্রত উপবাস প্রভৃতি—কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই প্রথমে সবিস্তার প্রতিপাদিত হওয়াও উহাদিগকে 'পৌরাণিক কর্ম্ম' বলিতে পারিব। এই সমস্ত কর্ম্মেও আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই তিন ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। নিত্য আবশ্যক স্নান-সন্ধ্যাদি কর্ম্মই নিত্য কর্ম্ম। ইহা করিলে কোন বিশেষ ফল কিংবা অর্থসিদ্ধি হয় না; কিন্তু না করিলেই দোষ হয়। কোন কারণ উপস্থিত হওয়ায় যাহা করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যথা, অনিষ্ট-গ্রহ-শান্তি, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। যে নিমিত্ত আমরা শান্তিস্বস্ত্যয়ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করি সেই ঘটনা পূর্ব্বে না ঘটিলে এই সকল নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ব্যতীত, কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা অনেক সময় শাস্ত্রানুসারে যে সকল কাজ করি, তাহই কাম্যকর্ম্ম যথা—বৃষ্টির জন্য কিংবা পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করা। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—ইহা ব্যতীত অন্য কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে, যথা—সুরাপান শাস্ত্রে একেবারেই ত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত

হইয়াছে। কোন্‌টা নিত্যকর্ম্ম, কোন্‌টা নৈমিত্তিক, কোন্‌টা কাম্য এবং কোন্‌টাই বা নিষিদ্ধ, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম্ম পাপজনক না পুণ্যপ্রদ, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রীকে যদি এইরূপ প্রশ্ন করা যায়, তবে তিনি সেই শাস্ত্র অনুসারে উক্ত কর্ম্ম যজ্ঞার্থ বা পুরুষার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি বিচার করিয়া পরে তাঁহার নিজের নির্ণয়টা বলিবেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক—অধিক কি, উহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। মনে কর, শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, অধিক কি, উহা বিহিত বলিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে; উদাহরণ, যথা—উপস্থিত প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্জ্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু ইহা হইতে এটুকু সিদ্ধ হইতেছে না যে ঐ সকল কর্ম্ম আমরা সর্ব্বদা করিব, অথবা ঐরূপ কর্ম্ম করিলে তাহা সর্ব্বদাই শ্রেয়স্কর হইবে। তাছাড়া, শাস্ত্রের আদেশও যে কোন কোন প্রসঙ্গে পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এরূপ অবস্থায়, মানুষ কোন্‌ মার্গ স্বীকার করিবে, তাহা স্থির করিবার কোন যুক্তি আছে কিনা এবং যদি থাকে তো সে যুক্তিটি কি,—ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়ে কর্ম্মের যে নানা ভেদ উপরে বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা চাতুর্বর্ণ্যের অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গীতা-প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য, মীমাংসকের উক্তিসকলও গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বিচার করা হইয়াছে এবং শেষ অধ্যায়ে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য কি কর্ত্তব্য নহে, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ১৮. ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতাতে 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম, এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থে না বুঝিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সার কথা, মানুষ যে-যে কাজ করে—খাওয়া, পরা, খেলা, বসা, ওঠা, থাকা, নিশ্বাস গ্রহণ করা, হাসা, কাঁদা, আঘ্রাণ করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, লওয়া, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, মরা, লড়াই করা, মনন বা ধ্যান করা, আজ্ঞা বা নিষেধ করা, দান করা, যাগযজ্ঞ করা, চাষ কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্ম কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, মানসিকই হউক সকল কর্ম্মই এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত (গীতা, ৫. ৮. ৯)। অধিক কি, বাঁচা মরা পর্য্যন্ত সমস্তই কর্ম্মের অন্তভূর্ত; এবং প্রসঙ্গ অনুসারে "বাঁচা কিংবা মরা" এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার করা আবশ্যক হয়। এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, 'কর্ম্ম' শব্দের 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' অথবা 'বিহিত কর্ম্ম' এই অর্থ হইয়া থাকে (গী, ৪. ১৬)। মনুষ্যের কর্ম্ম-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল। ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার সম্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিচার পরে কর্ম্মবিপাক প্রকরণে করা যাইবে।

কর্ম্মাপেক্ষাও অধিক 'গোলমেলে' শব্দ হইতেছে—'যোগ'। এই শব্দের বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ "প্রাণায়ামাদির সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ করা" অথবা "পাতঞ্জল সূত্রোক্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ"। এই অর্থে এই শব্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ. ৬. ১১)। কিন্তু এই সংকুচিত অর্থ ভগবদ্গীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। 'যোগ' এই শব্দ 'যুজ্' অর্থাৎ যুড়িয়া দেওয়া এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে, সুতরাং উহার ধাত্বর্থ 'যোড়া,' যোড়া' মিলন সঙ্গতি একত্রাবস্থিতি ইত্যাদি; এবং ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার 'উপায়, সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল'-রূপ যে কর্ম্ম তাহাকেও যোগ বলা হয়। এই সকল অর্থ অমরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে, "যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু", (৩.৩. ২২)। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা অনিষ্টজনক হইলে সেই গ্রহের 'যোগ' ইষ্ট বা অনিষ্টজনক এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি; এবং 'যোগক্ষেম' এই পদে 'যোগ' শব্দের অর্থে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া ধরা গিয়াছে (গী. ৯. ২২)। মহাভারতীয় যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবার জন্য একই 'যোগ' (সাধন বা যুক্তি)—একোহি যোগঽস্য ভবেদ্বধায়—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (মভা, দ্রো, ৮১.৩১); এবং পরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, 'আমি জরাসন্ধাদি রাজাদিগকে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মরক্ষণার্থ 'যোগের দ্বারাই' কি করিয়া বধ করিয়াছিলাম'। অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ভীষ্ম হরণ করিলে পর অন্য রাজগণ 'যোগ, যোগ' বলিয়া তাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্ব্বে (আ, ১৭২) উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মহাভারতের অনেক স্থানে এই অর্থেই 'যোগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গীতাতে 'যোগ', 'যোগী' কিংবা 'যোগ' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন.সামাসিক শব্দ প্রায় ৮০ বার প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু, খুব বেশী হয়, চারি পাঁচ (গী, ৬. ১২. ২৩) স্থল ছাড়া 'যোগ' শব্দের 'পাতঞ্জল যোগ' এই অর্থ কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। 'যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া, মেলা' এই অর্থই স্বল্পাধিক ভেদ গীতায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গীতাশাস্ত্রান্তর্ভূত ব্যাপক শব্দগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। তথাপি যোগ অর্থে সাধন কৌশল বা যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিলেও চলে না। কারণ, বক্তার ইচ্ছানুসারে এই সাধন সন্ন্যাসের, কর্ম্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা—গীতাতেই দুই চারি স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার ঐশ্বরিক কৌশল বা অদ্ভুত সামর্থ্যের সম্বন্ধে যোগ প্রযুক্ত হইয়াছে (গী, ২৫; ৯. ৫, ১০. ৭, ১১.৮)। এই অর্থেই ভগবানকে 'যোগেশ্বর' বলা হইয়াছে (গী ১৮. ৭৫)। কিন্তু গীতান্তর্ভূত যোগশব্দের ইহা কিছু মুখ্যার্থ নহে। তাই গীতায় 'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায়, ইহা বলিবার জন্য "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২.৫০) অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার কোন বিশেষ প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্য্য বা শৈলী—এইরূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে। শঙ্করভাষ্যেও "কর্ম্মসু কৌশলম্" এই পদের "কর্ম্মের যে

স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহা বিনষ্ট করিবার যুক্তি"—এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্ম্মের অনেক 'যোগ' বা উপায় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সম্বন্ধেই 'যোগ' শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—ধনলাভ করিতে হইলে তাহা চুরি করিয়া, ঠকাইয়া ভিক্ষা করিয়া, সেবা করিয়া, কর্জ্জ করিয়া মেহনৎ করিয়া ইত্যাদি নানাবিধ সাধনের দ্বারা করা যাইতে পারে; এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক সাধন সম্বন্ধে 'যোগ শব্দ' ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও "আপনার স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া, মেহনৎ করিয়া পয়সা রোজগার করা" এই উপায়ই মুখ্যরূপে 'ধনপ্রাপ্তি যোগ' এইরূপ বলা প্রচলিত আছে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—কর্ম্ম করিবার এক প্রকার বিশেষ যুক্তি অর্থাৎ যোগ, যখন স্বয়ং ভগবান গীতায় যোগ শব্দের এই প্রকার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, তখন বস্তুত গীতায় এই শব্দের মুখ্য অর্থ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু ভগবানকৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গীতার অনেক টীকাকার এই শব্দকে টানিয়া বুনিয়া নানাপ্রকারে গীতার মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন; তাই, ভুল-বুঝা দূর করিবার জন্য এইখানে 'যোগ' শব্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং সেই স্থানেই উহার অর্থ কি তাহাও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ করা কেন কর্ত্তব্য, সাংখ্যমার্গানুসারে ইহার যুক্তি বিবৃত করিবার পর "এক্ষণে তোমাকে যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতেছি" (গী, ২. ৩৯) এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন। আবার, যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেতে নিমগ্ন লোকদিগের বুদ্ধি ফলপ্রত্যাশার দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হইয়া থাকে তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন (গী, ২. ৪১-৪৬)। তাহার পর, তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে, বুদ্ধিকে এরূপ ব্যগ্র হইতে না দিয়া "আসক্তি ছাড়, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না" এবং "যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর" (গী, ২. ৪৮)। এইখানেই "সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ে সমত্ববুদ্ধি" 'যোগ' শব্দের এই অর্থ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার পর, "ফলপ্রত্যাশায় কর্ম্ম করা অপেক্ষা সমত্ববুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ" (গী, ২০. ৪৮), "বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মের পাপ-পুণ্য-বাধা কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না অতএব তুমি এই 'যোগ' সম্পাদনা কর", এইরূপ বলিয়া তখনই আবার "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২. ৫০) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মের পাপপুণ্যে লিপ্ত না থাকিয়া কর্ম্ম করিবার সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম 'কৌশল' এবং এই কৌশলের দ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 'যোগ' বলা হইয়াছে। এই অর্থই পরে "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন" (গী ৬. ৩৩) 'সমতার অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে বলিয়াছ',—এই শ্লোকে অর্জ্জুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে কিরূপভাবে চলিবেন তাহার সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব অবধি প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া দুই মার্গ আছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে সর্ব্ব

কর্ম্মের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা—এই এক মার্গ ; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, কর্ম্মের পাপপুণ্য-বাধা স্পর্শ না করে সেইরূপ যুক্তি অনুসারে আমরণ কর্ম্ম করতে থাকা—এই দ্বিতীয় মার্গ। এই দুই মার্গ গীতাতে (গী, ৫. ২) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সন্ন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং যোগ অর্থাৎ জোড়া ; সুতরাং কর্ম্মের ছাড়া ও জোড়াই এই দুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। এই দুই ভিন্ন মার্গ লক্ষ্য করিয়াই পরে "সাংখ্য ও যোগ" (সাংখ্যযোগৌ) এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও (গী, ৫. ১৪) প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য পাতঞ্জল যোগান্তর্ভূত আসনাদির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য ; কিন্তু তাহা কাহার জন্য ? তপস্বীর জন্য নহে, পরন্তু কর্ম্মযোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্মশীল মনুষ্যের এই সমতারূপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। নচেৎ "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী" এই বাক্যের কোনই অর্থ হয় না। সেইরূপ আবার "তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন" (৬. ৪৬) বলিয়া যে উপদেশ অধ্যায়ের শেষে আছে, তাহার অর্থ "পাতঞ্জল" যোগের অভ্যাস করিতে থাক" এইরূপ হইতে পারে না। এই কারণে উক্ত উপদেশের অর্থ "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" (২. ৪৮), অথবা পরে "তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্," (গী, ২. ৫০) কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" (৪. ৪২) ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক হওয়া উচিত ; অর্থাৎ "যুক্তির দ্বারা কর্ম্মকারী যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও"—এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, "পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে দাঁড়াও" এ কথা বলা কখনই সম্ভব হইতে পারেনা। ইতঃপূর্ব্বে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" (গী, ৩. ৩) অর্থাৎ যোগী পুরুষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্ম কিংবা ভাগবতধর্ম্মের বিচার-আলোচনাতেও উক্ত হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক আপনার কর্ম্ম না ছাড়িয়াই যুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মসাধনের দ্বারা (সুপ্রযুক্তেন কর্ম্মণা) পরমেশ্বরকে লাভ করে। (মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৬)। ইহাতে যোগী ও কর্ম্মযোগী এই দুই শব্দ গীতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 'যুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মকারী' এইরূপ অর্থই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তথাপি 'কর্ম্মযোগ' এই ঈষৎ দীর্ঘ শব্দের পরিবর্তে 'যোগ' এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গীতাতে ও মহাভারতে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। "আমি তোমাকে এই যে যোগের কথা বলিলাম তাহা পূর্ব্বে বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম (গী, ৪. ১) ; বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন : কিন্তু ঐ যোগ ইতঃপূর্ব্বে নষ্ট হওয়ায় আজ নূতন করিয়া ঐ যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল," ভগবান 'যোগ' শব্দের এই যে তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে পাতঞ্জল যোগ বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,—"কর্ম্ম করিবার কোন এক প্রকারের বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন বা মার্গ" এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা-অন্তর্গত কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন 'যোগ' শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন (গী, ১৮. ৭৫), তখনও ঐ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজে সন্ন্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্যের আরম্ভে বৈদিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও

প্রবৃত্তি এইরূপ দুই ভেদ বলিয়া, 'যোগ' শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে কখন 'সম্যগ্‌দর্শনোপায়কর্ম্মানুষ্ঠানম্' (গী, ৪. ৪২), আবার কখন 'যোগঃ যুক্তিঃ' (গী, ১০. ৭) এইরূপ করিয়াছেন। সেইপ্রকার মহাভারতেও যোগ ও জ্ঞান, এই দুই শব্দের অর্থ অনুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্"—যোগ প্রবৃত্তিলক্ষণ এবং জ্ঞান সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিলক্ষণ (মভা, অশ্ব, ৪৩. ২৫)। শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীর উপাখ্যানে সাংখ্য ও যোগ শব্দ এই অর্থেই অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই দুই শব্দ সৃষ্টির আরম্ভেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে (মভা, শাং, ২৪০. ও ৩৪৮ দেখ)। এই নারায়ণী কিংবা ভাগবত ধর্ম্ম ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য, তাহা প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের বচনাদি হইতে স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাই, সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, এই দুই শব্দের যে প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারায়ণী ধর্ম্মে আছে, তাহাই গীতাতেও বিবক্ষিত এরূপ বলা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিলে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" বা "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" গীতোক্ত এই ব্যাখ্যা দ্বারা এবং "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি উপরি-উক্ত গীতোক্ত বচনাদি দ্বারা ঐ সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। এই সকল হইতে ইহাই নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইবে যে, গীতাতে যোগশব্দ প্রবৃত্তি-মার্গ অর্থাৎ 'কর্ম্মযোগ' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শুধু বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থে নহে, পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—প্রায় ২০০ শকে (৩৩৫ সংবৎ) লিখিত মিলিন্দপ্রশ্ন নামক পালিগ্রন্থে 'পুব্বযোগো' (পূর্ব্বযোগ) এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার অর্থ 'পুব্বকম্ম' (পূর্ব্বকর্ম্ম) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ১.৪) সেইরূপ শালিবাহন শকের আরম্ভে আবির্ভূত অশ্বঘোষ কবির 'বুদ্ধচরিত' নামক সংস্কৃত কাব্যের প্রথম সর্গের ৫০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

"আচার্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানামপ্রাপ্তমন্যৈর্জনকো জগাম।"

"ব্রাহ্মণদিগকে যোগবিধি শিক্ষাদানে জনকরাজা আচার্য্য (উপদেষ্টা) হইয়াছিলেন, জনকের পূর্ব্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই"। এইস্থানে যোগবিধির অর্থ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বিধি করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের ইহাই রহস্য এইরূপ গীতাদি গ্রন্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন ; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও (৯. ১৯ ও ২০) "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষসাধন কিরূপে করা যাইতে পারে" ইহা দেখাইবার জন্যই জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জনকপ্রদর্শিত মার্গের নামও 'যোগ' ছিল। এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থাদিতেও যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন গীতার যোগ শব্দেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয় ; কারণ, জনকের মার্গ গীতারও প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন (গী, ৩. ২০)। সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনা পরে করা যাইবে। কোন্ অর্থে গীতায় যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন।

যোগ অর্থে কর্ম্মযোগ এবং যোগী অর্থে কর্ম্মযোগী, গীতার এই দুই শব্দের মুখ্য অর্থ এই অনুসারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্‌টি ইহা আর স্বতন্ত্ররূপে বলিতে হইবে না। ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে 'যোগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪. ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন (গী, ৬. ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গী, ১৮. ৭৫) সঞ্জয়ও গীতোক্ত উপদেশের নাম 'যোগ' দিয়াছেন। এইরূপে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়-সমাপ্তি প্রদর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে 'যোগশাস্ত্র'ই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই সংকল্পের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি বর্ত্তমানের টীকাকারদিগের মধ্যে কেহই মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আরম্ভের "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই দুই পদের পর, সঙ্কল্পে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই দুই শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই শব্দের অর্থ হইতেছে "ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে"; এবং পরবর্তী দুই শব্দের অর্থ হইতেছে "ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রে" অর্থাৎ কর্ম্মযোগশাস্ত্রে", যাহা এই গীতার বিষয়।

ব্রহ্মবিদ্যার অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান; ঐ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী পুরুষের নিকট দুই মার্গ-উন্মুক্ত হয় (গী, ৩. ৩)—এক, সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গ—যে মার্গে জ্ঞানলাভের পর, জাগতিক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিরাগীর মত থাকিতে হয়। দ্বিতীয় যোগ কিংবা কর্ম্মমার্গ—যে মার্গে কর্ম্ম না ছাড়িয়া এরূপ যুক্তিপূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম করিতে হয় যাহার ফলে মোক্ষপ্রাপ্তির কোন বাধা না হয়। এই দুই মার্গের মধ্যে প্রথমটির 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক ঋষি ও অপর গ্রন্থকারেরাও উহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগের বা যোগ-শাস্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনা ভগবদ্গীতা ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। প্রথমেই ইহা বলা যাইতেছে যে, অধ্যায়-সমাপ্তিদর্শক সংকল্প গীতার সকল সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া গীতার সকল টীকা লিখিত হইবার পূর্ব্বেই উহা রচিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়। এই সংকল্পের রচয়িতা এই সংকল্পে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই দুই পদ বৃথা জুড়িয়া দেন নাই; কিন্তু তিনি গীতাশাস্ত্রান্তর্গত বিষয়ের অপূর্ব্বতা দেখাইবার জন্যই ঐ পদগুলি সেই সঙ্কল্পের মধ্যে ভিত্তির উপরে যুক্তিপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন। এখন ইহাও সহজে উপলব্ধি হইবে যে, গীতাসম্বন্ধে বিস্তর সাম্প্রদায়িক টীকা হইবার পূর্ব্বে গীতার তাৎপর্য্য লোকে কি উপায়ে ও কি ভাবে বুঝিত। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগমার্গের প্রবর্ত্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর (যোগেশ্বর = যোগ + ঈশ্বর) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই কর্ম্মযোগ প্রতিপাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বলোকের হিতার্থ অর্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'যোগ' ও 'যোগশাস্ত্র'—গীতার এই দুইটি শব্দ অপেক্ষা 'কর্ম্মযোগ' ও 'কর্ম্মযোগশাস্ত্র' এই দুই শব্দ একটু দীর্ঘ সত্য কিন্তু গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে, এইজন্য এই গ্রন্থে ও প্রকরণে এই ঈষৎ দীর্ঘ ধরনের নাম দেওয়া আমি পছন্দ করিয়াছি।

একই কর্ম্ম করিবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা মার্গ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শুদ্ধ মার্গ কোন্‌টি; তাহা সর্ব্বদা আচরিত হইতে পারে কি না; না পারিলে তাহার অপবাদ বা ব্যতিক্রমস্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমরা ভাল মনে করি, তাহা কেন ভাল, কিংবা যাহাকে মন্দ বলি তাহা কেন মন্দ এবং ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়া স্থির করিবে কিংবা তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে পারে তাহাকে 'কর্ম্মযোগশাস্ত্র' কিংবা গীতান্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে 'যোগশাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। ভাল ও মন্দ এই দুই শব্দ "সামান্য" শব্দ; এই দুই শব্দেরই সদৃশ্য অর্থে কখনও শুভ ও অশুভ, কখনো হিতকর ও অহিতকর, কখনো শ্রেয়স্কর ও অশ্রেয়স্কর, কখনো পাপ পুণ্য, কখনো ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ঐ সকল শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্য্য-অকার্য্য কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, ন্যায্য-অন্যায্য ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ ঐ প্রকার। তথাপি এই শব্দব্যবহারকারীদিগের সৃষ্টিরচনা সম্বন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ায় 'কর্ম্মযোগ' শাস্ত্রের নিরূপণ-পন্থাও বিভিন্ন হইয়াছে। যে কোন শাস্ত্রই ধর না কেন তদন্তর্ভূত বিষয়ের চর্চ্চা সাধারণতঃ তিন প্রকারে করা যাইতে পারে—(১) জড়সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে আর কিছুই, নাই,—এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; ইহাকে আধিভৌতিক বিচার বলা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া না মানিয়া, কেবল পঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের এক গোলা বলিয়া মানিয়া উহার উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, দূরত্ব আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্ম্মেরই যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন সূর্য্য সম্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা করা হইতেছে বলিব। আর একটা গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ডালা গজাইয়া উঠা প্রভৃতি ক্রিয়া কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে ইহার বিচার না করিয়া, জমিতে বীজ লাগাইলে অঙ্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহ্যদৃষ্টিতে বিচার করিলে, ঐ গাছের আধিভৌতিক আলোচনা করা হয় বলিতে পারি। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, তড়িৎশাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা এই ঢঙ্গেরই হইয়া থাকে। অধিক কি, এই প্রকারে কোন বস্তুর পরিদৃশ্যমান গুণের বিচার করিলেই আমাদের কাজ শেষ হইল ইহা অপেক্ষা সৃষ্টির পদার্থের বেশী বিচার আলোচনা করা নিষ্ফল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। (২) উক্ত দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল তাহাদের গুণধর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে কিংবা তাহাদের পশ্চাতে অন্য কোন্ তত্ত্ব ভিত্তিস্বরূপে আছে ইহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক বিচারকে ছাড়াইয়া সম্মুখে পা বাড়াইতে হয়। উদাহরণ যথা—এই পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সূর্য নামে এক দেবতা আছেন এবং তাঁহা দ্বারাই জড় সূর্য্যের ব্যাপার বা ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ যখন মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বলা যায়। এই মতানুসারে মানিতে

হয় যে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বিভিন্ন দেবতা আছেন এবং তাহারা উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাজ চালাইয়া থাকেন। (৩) কিন্তু যখন ইহা মানা যায় যে জড় সৃষ্টির অন্তর্গত সহস্র সহস্র জড়পদার্থের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র স্বতন্ত্র দেবতা নাই, কিন্তু বাহ্যসৃষ্টির সর্ব্বকার্য্যপরিচালক, মনুষ্যের শরীরে আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং মনুষ্যের সকল সৃষ্টিসম্বন্ধীয় জ্ঞানবিধায়ক ইন্দ্রিয়াতীত একমাত্র চিৎশক্তি এই জগতে অধিষ্ঠিত আছেন, যে শক্তির দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে, তখন তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার বলা যায়। উদাহরণ যথা—সূর্য্য চন্দ্রাদির ক্রিয়া, অধিক কি, গাছের পাতাটি নড়া পর্য্যন্ত এই অচিন্ত্য শক্তিরই প্রেরণায় হইয়া থাকে, সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতিতে বা অন্যস্থানে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যে কোন বিষয়েরই বিচার করা হউক না কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং উপনিষদ্‌গ্রন্থাদিতেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকল ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ইহার বিচারকালে একবার ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি-আদি দেবতাগণকে, আর একবার তাঁহাদের সূক্ষ্মস্বরূপ (অধ্যাত্ম) লইয়া উহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে (বৃ. ১.৫.২১. ও ২২, ছাং ১.২ ও ৩; কৌষী ২.৮)। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে ঈশ্বর-স্বরূপের যে বিচার আলোচনা করা হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্'' (গী, ১০ ৩২) এই বাক্য অনুসারে আমাদের শাস্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক আলোচনাকেই উপরোক্ত তিন মার্গের মধ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক কালে, উপরি-উক্ত তিন শব্দের অর্থ একটু বদলাইয়া প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত "কোঁৎ আধিভৌতিক প্রতিপাদনকেই সর্ব্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে সৃষ্টির মূলে কি তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় কোন লাভ নাই; এই তত্ত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জানা সম্ভব নহে সুতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করা উচিত বা সাধ্যায়ত্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর জ্বালামুখী প্রভৃতি নড়াচড়া পদার্থ যখন প্রথম দেখিল তখন তাহারা ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ এই সমস্তই দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কোঁতের মতে ইহাই আধিদৈবিক

* ফ্রান্সদেশে গত শতাব্দীতে অগস্ত কোঁৎ এক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর এক বড় গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্ত্রীয় রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখাইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার আলোচনা প্রথম theological, তাহার পর metaphysical পদ্ধতিতে হইয়া থাকে এবং শেষে তাহার positive স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়—অনেক শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ইহা স্থির করিয়াছেন। এই তিন পদ্ধতির অনুক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই প্রাচীন নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি; কোঁৎ এই পদ্ধতি নূতন বাহির করেন নাই, উহা পুরাতনই। কিন্তু উহাদিগের ঐতিহাসিক ক্রমটি তাঁহার নূতন রচনা। সর্ব্বাপেক্ষা positive (আধিভৌতিক) পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ ইহাই তাঁহার নূতন কথা। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার প্রধান গ্রন্থের ভাষান্তর হইয়াছে।

বিচার। কিন্তু মানুষ শীঘ্রই এই কল্পনাটি ছাড়িয়া দিয়া সকল পদার্থের মধ্যে কোন-না-কোন প্রকার আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় পূর্ণ হইয়া আছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল। কোঁতের মতে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতির ইহাই দ্বিতীয় সোপান। এই ভিত্তিকে তিনি 'আধ্যাত্মিক' এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই মার্গ ধরিয়া সৃষ্টির বিচার করিয়াও প্রত্যক্ষ-উপযোগী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের যখন কোন বৃদ্ধি হয় না, তখন মানুষ শেষে সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মেরই আরও বেশী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার ফলেই এক্ষণে আগগাড়ী, তার প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বাহ্য সৃষ্টির উপর মানুষ স্বীয় আধিপত্য অধিকতর স্থাপিত করিল। কোঁৎ ইহার আধিভৌতিক মার্গ নাম দিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, যে-কোন শাস্ত্রের কিংবা বিষয়ের বিচার আলোচনা করিবার সময় এই মার্গই অন্যান্য মার্গ অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ। কোঁতের মতে, সমাজশাস্ত্রসম্বন্ধে কিংবা কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রসম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিভূমিকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই মার্গ স্বীকার করিয়া এই পণ্ডিত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এবং সকল ব্যবহারশাস্ত্রের এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপর প্রেম স্থাপন করিয়া সতত সর্ব্বলোকের কল্যাণ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্ম্ম। মিল, স্পেনসর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত এই মতের অগ্রণী বলিলেও চলে। উল্টাপক্ষে, কাণ্ট, হেগেল, শোপেনহোর প্রভৃতি জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি নীতিশাস্ত্রের বিচারপক্ষে অপূর্ণ স্থির করিয়া আজকাল ইউরোপে আমাদের বেদান্তীদিগের ন্যায় অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারাই নীতিসমর্থক মার্গ পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা পরে বলা যাইবে।

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও 'ভাল ও মন্দের' পর্য্যায়বাচী 'কার্য্য ও অকার্য্য, 'ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার কারণ এই যে, বিষয়প্রতিপাদনবিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ বা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। যে যুদ্ধে ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর কিংবা শ্রেয়স্কর নহে, অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২.৭)। কোন আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুনের নিজের লাভালাভ কতটুকু এবং সমস্ত সমাজের উপর তাহার পরিণামই বা কি ঘটিতে পারে, তাহার সরাসরি বিচার করিয়া, যুদ্ধ করা 'ন্যায্য' কি 'অন্যায্য' এই বিষয়ে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। ইহার কারণ এই যে, কোন কর্ম্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার সময় আধিভৌতিক পণ্ডিত চিন্তা করেন যে, এই সংসারে ঐ কর্ম্মের আধি-ভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাহ্য পরিণাম কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে। উহা ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন বা কষ্টিপাথর এই সকল আধি-ভৌতিক পণ্ডিতের অভিমত নহে। কিন্তু এইরূপ উত্তরে অর্জ্জুনের সমস্যার সমাধান হয় না। যাঁহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল। শুধু এই জগতের নহে, কিন্তু পারলৌকিক দৃষ্টিতেও এই যুদ্ধের পরিণামে আপন আত্মার শ্রেয় হইবে কি হইবে না,

তাঁহার নিকট ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক ছিল। যুদ্ধে ভীষ্ম-দ্রোণাদি নিহত হইলে, আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া সুখ লাভ হইবে কি না, কিংবা যুধিষ্ঠিরাদির শাসনকাল, দুর্য্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর সুখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি যাহা করিতেছি তাহা 'ধর্ম্ম্য' বা অধর্ম্ম্য', 'পুণ্য' কি 'পাপ', ইহাই তাঁহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচার-আলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। শুধু গীতায় নহে, মহাভারতের অন্যান্য কয়েক স্থানেও যে বিচার-আলোচনা আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে করা হইয়াছে। সেই সকল স্থলে কোন কর্ম্মের 'ভালমন্দ' দেখাইবার সময় 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' এই দুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম" ও তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ উল্টা 'অধর্ম্ম" এই দুই শব্দ ব্যাপক অর্থে কখনো কখনো ভ্রম উৎপাদন করায় কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রে মুখ্যরূপে কোন্ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইতেছে তৎসম্বন্ধে এইখানে কিছু বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করা আবশ্যক।

নিত্যব্যবহার অনেক সময় "ধর্ম্ম" শব্দ নিছক্ "পারলৌকিক সুখের মার্গ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা যখন কাহাকেও প্রশ্ন করি যে "তোমার কোন্ ধর্ম্ম," তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্ মার্গ অনুসরণ করিতেছ—বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় বা পার্সী— ইহাই আমাদের প্রশ্নের হেতু; এবং উত্তরদাতাও তদনুসারে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। সেই প্রকার স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত যাগযজ্ঞাদি বৈদিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়, "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সূত্রেতেও ধর্ম্মশব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত হইয়াছে। কিন্তু "ধর্ম্ম" শব্দের এইমাত্র সংকুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতীত রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, মিত্রধর্ম্ম প্রভৃতি সাংসারিক নীতিবন্ধনেও ধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশব্দের এই দুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে পারলৌকিক ধর্ম্মকে "মোক্ষধর্ম্ম" বা কেবল 'মোক্ষ', ব্যবহারিক ধর্ম্ম বা নীতিকে ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা— চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের গণনা করিবার সময় আমরা 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ' বলি। ইহাদের প্রথম শব্দ ধর্ম্মের ভিতর মোক্ষের সমাবেশ হইলে, শেষে মোক্ষকে পৃথক পুরুষার্থ বলিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এইস্থানে ধর্ম্মশব্দে জগতের বা সংসারের শতশত নীতি-ধর্ম্মই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হয়। ইহাকেই আমরা আজকাল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নীতি, নীতিধর্ম্ম কিংবা সদাচরণ বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে 'নীতি' কিংবা 'নীতিশাস্ত্র' শব্দ বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত বলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিংবা সদাচার সম্বন্ধীয় সাধারণ আলোচনাকে 'নীতিপ্রবচন' না বলিয়া 'ধর্ম্মপ্রবচন' নাম দেওয়া হইত। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম এই দুই শব্দের এই পারিভাষিক ভেদ সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নহে। তাই আমিও এই গ্রন্থে 'নীতি', 'কর্ত্তব্য' ও 'ধর্ম্ম" এই সকল শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; এবং মোক্ষের বিচার যেখানে করা হইয়াছে, সেই প্রকরণকে আমি 'অধ্যাত্ম ও ভক্তিমার্গ" এইরূপ স্বতন্ত্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধর্ম্ম শব্দ অনেক স্থানেই পাওয়া

যায়। এবং যে স্থানে বলা হইয়াছে যে, 'কাহারও কোন কার্য্য ধর্ম্মসংগত হইয়াছে," সেই স্থানে ধর্ম্ম শব্দে কর্ত্তব্যশাস্ত্র কিংবা তৎকালীন সমাজব্যবস্থাশাস্ত্র অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে; এবং যে স্থানে পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত করিবার প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেই স্থানে অর্থাৎ শান্তিপর্ব্বের উত্তরার্দ্ধে "মোক্ষধর্ম্ম" এই বিশিষ্ট শব্দের যোজনা করা হইয়াছে। সেইরূপ আবার মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের বিশিষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্ম বিবৃত করিবার সময় অনেকবার অনেক স্থানে কেবল ধর্ম্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবদ্গীতাতেও যখন অর্জ্জুনকে ভগবান 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" (গী, ২. ৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম্ম কি তাহা দেখিয়া যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, তখন এবং তৎপূর্ব্বে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' (গী, ৩. ৩৫), সেই স্থলেও 'ধর্ম্ম', শব্দ "ইহলৌকিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম" এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাজের সমস্ত ব্যবহার যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত ভার না পড়ে এবং সমাজের সকল পক্ষেরই ভালরূপে সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা পুরাকালীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। ইহা পৃথক কথা যে কিছুকাল পরে চতুর্ব্বর্ণের লোক কেবল জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ প্রকৃত স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া পড়িল। ইহা নিঃসন্দেহ যে গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ করা হইয়াছিল; এবং চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে, কিংবা যদি কোন বর্ণ সমূলে বিনষ্ট হয় ও তাহার স্থান অন্য লোক আসিয়া পূর্ণ না করে, তাহা হইলে সমস্ত সমাজ সেই পরিমাণেই পঙ্গু হইয়া ধীরে ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা উহা নিকৃষ্ট অবস্থাতে তো নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছে। যদিও এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্য খণ্ডে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ব্যতীত অনেক সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা না থাকিলেও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম্ম, জাতিরূপে না হউক, গুণবিভাগরূপে জাগ্রত রহিয়াছে। সারকথা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করি তখন সর্ব্বসমাজের ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই আমরা দেখি। মনু বলিয়াছেন—'অসুখোদর্ক" অর্থাৎ যাহার পরিণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে (মনু, ৪. ১৭৬), এবং শান্তি-পর্ব্বের সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯. ১২) ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকালে ভীষ্ম ও তৎপূর্ব্বে কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন যে—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়॥

অর্থাৎ 'ধর্ম্ম' শব্দ ধৃ ধাতু (ধারণ করা) হইতে বাহির হইয়াছে। ধর্ম্মের দ্বারাই সমস্ত প্রজা বাঁধা রহিয়াছে। ইহাই স্থির হইয়াছে যে যাহার দ্বারা (সকল প্রজার) ধারণ হয় তাহাই ধর্ম্ম" (মভা, কর্ণ, ৬৯. ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম্ম চলিয়া গেলে সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে; এবং সমাজের বন্ধন ছিন্ন হইলে আকর্ষণ শক্তি

ব্যতীত আকাশস্থ সূর্য্যাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, সেই কারণে ব্যাসদেব কয়েকস্থানে বলিয়াছেন যে, যদি অর্থ বা দ্রব্য লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহা ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়া না যায়, এইরূপ ভাবে করিবে, এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে হইলে তাহাও ধর্ম্মতই করিবে। মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে—

উর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষঃ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্‌।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মঃ কিং ন সেব্যতে ॥

"ওরে! বাহু তুলিয়া আমি চীৎকার করিতেছি, (কিন্তু) আমার কথা কেহই শুনে না! ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও কাম উভয়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়; (তথাপি) এইরূপ ধর্ম্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না?" ইহা হইতে পাঠকের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে মহাভারতকে যে ধর্ম্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্ম্মসংহিতা বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই 'ধর্ম্মসংহিতা' শব্দের মধ্যে 'ধর্ম্ম' এই শব্দের মুখ্য অর্থ কি। ইহাই কারণ যে, "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই প্রতীক শব্দগুলির দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই দুই পারলৌকিক অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থরূপে মহাভারতেরও সমাবেশ করা হইয়াছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি 'সমাজধারণ,' এবং দ্বিতীয় প্রকরণের সত্যানৃতবিবেক প্রসঙ্গে কথিত সর্ব্বভূতহিত এই দুই তত্ত্ব যদি তুমি স্বীকার কর তবে তোমার দৃষ্টিতে ও আধিভৌতিক দৃষ্টিতে প্রভেদ কি? কারণ এই দুই তত্ত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক ও আধিভৌতিক দৃষ্টিতে প্রশ্নের সবিস্তার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা হইয়াছে। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজধারণই ধর্ম্মের প্রধান বাহ্য উপযোগ; এই তত্ত্ব স্বীকার করিলেও আমার মতের বিশেষত্ব এই যে, বৈদিক কিংবা অন্য সমস্ত ধর্ম্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যাণ কিংবা মোক্ষ তাহা হইতেও আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হইতে দিই নাই। 'সমাজধারণ'ই বল আর সর্ব্বভূতহিত'ই বল এই বাহ্যোপযোগী তত্ত্ব যদি আমাদের আত্মকল্যাণের পথের অন্তরায় হয় তবে তাহা আমরা চাহি না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ যদি ইহাই প্রতিপাদন করে যে বৈদ্যকশাস্ত্রও শরীররক্ষণ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়, তবে ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, এই জগতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এই গুরুতর বিষয়ের যে শাস্ত্র বিচার-আলোচনা করে, সেই কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রকে আমাদের শাস্ত্রকার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান হইতে পৃথক্‌রূপ ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব আমি মনে করি যে মোক্ষের অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল যে কর্ম্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম্ম কিংবা শুভ; এবং যে কর্ম্ম তাহার প্রতিকূল তাহাই পাপ অধর্ম্ম কিংবা অশুভ। কর্ত্তব্য ও কার্য্য এবং অকর্ত্তব্য ও অকার্য্য এই সকল শব্দের পরিবর্ত্তে একই অর্থ, (একটু সন্দিগ্ধ হইলেও) আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই শব্দের ব্যবহার যে অধিক পছন্দ করি, তাহারও মর্ম্ম ইহাই। বাহ্যসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম ব্যাপার, মুখ্যরূপে আমাদের বিচারের বিষয়

হইলেও উক্ত কর্ম্মসমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারেরই ন্যায় এই সকল ব্যাপার আমাদের আত্মারও কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল সে বিচারও আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত কেন করিব আধিভৌতিকবাদীকে এইরূপ কোন প্রশ্ন করিলে, "সাধারণতঃ ইহাই মানব-স্বভাব"—ইহা ব্যতীত আর কি উত্তর তিনি দিতে পারেন? আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি ইহার অগ্রে পৌঁছিয়াছে; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই মহাভারতে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; এইজন্যে ভগবদ্‌গীতাতেও বেদান্তের নিরূপণও করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগেরও এই মত যে মনুষ্যের 'অত্যন্ত হিত' কিংবা সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা' এরূপ কোন কিছু পরম সাধ্য কল্পনা করিয়া পরে সেই অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনা করিতে হইবে; এবং আরিষ্টটল স্বরচিত নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন (১. ৭. ৮) যে, আত্মার কল্যাণের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে। তথাপি আত্মার হিত সম্বন্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল ততটা প্রাধান্য দেন নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয়; অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া তদনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করা আবশ্যক; আধ্যাত্মবিদ্যাকে ছাড়িয়া কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়াছেন দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—জার্ম্মান তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে "শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মিক) বুদ্ধির মীমাংসা" নামক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ লিখিয়া পরে তাহার পূরণস্বরূপে ব্যবহারিক (বাসনাত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা" নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন; * এবং ইংলণ্ডেও গ্রীন আপন 'নীতিশাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাত † সৃষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ত্ব হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থসমূহের পরিবর্ত্তে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রন্থ আজকাল আমাদের দেশে ইংরেজি পাঠশালায় পড়ান হয়; তাহারই পরিণামে দেখা যায় যে গীতোক্ত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আমাদের মধ্যে অনেক ইংরেজিশিক্ষিত পণ্ডিতেরাও ভাল বুঝিতে পারেন না।

'ধর্ম্ম" এই সাধারণ শব্দ ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে। মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে এবং ভাষাগ্রন্থেও ব্যবহারিক কর্ত্তব্য কিংবা নিয়ম অর্থে ধর্ম্মশব্দ সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। কুলধর্ম্ম ও কুলাচার এই দুই শব্দ আমরা সমানার্থক বলিয়া বুঝি। মহাভারতীয় যুদ্ধে একবার

* কাণ্ট জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী; ইনি অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রের জনক বলিয়া খ্যাত। ইঁহার ritique of Pure Reason (শুদ্ধ বুদ্ধির মীমাংসা) এবং Critique of Practical Reason (বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংসা) এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

† গ্রীন এই গ্রন্থের নাম Prolegomena to Ethics এই নাম দিয়াছেন।

কর্ণের রথের চাকা পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল ; সেই চাকা উঠাইয়া উপরে আনিবার জন্য কর্ণ আপন রথ হইতে নীচে নামিলে পর, অর্জুন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন—"শত্রু নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মারা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে"। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সকলে মিলিয়া একাকী অভিমন্যুর বধসাধন প্রভৃতি পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যেক প্রসঙ্গে কর্ণকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে "হে কর্ণ, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল?" মহারাষ্ট্র কবি মোরোপন্ত এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মহাভারতে এই প্রসঙ্গে "ক্বতে ধর্ম্মস্তদা গতঃ" এই প্রশ্নে ধর্ম্ম শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেইরূপে শেষে বলা হইয়াছে যে, যে এই প্রকার অধর্ম্ম করে তাহার সহিত ঐ প্রকারের ব্যবহার করাই তাহার উচিত দণ্ড। সার কথা, কি সংস্কৃত, কি ভাষাগ্রন্থ, সকল গ্রন্থেই, শিষ্টেরা নানা বিষয় সম্বন্ধে আধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমাজ-বিধরণের জন্য যে নীতি-নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকলেতেই ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ আছে। এই কারণে ঐ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে বজায় রাখিয়াছি। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া সমাজবিধনার্থ শিষ্টগণ-স্থাপিত ও সর্ব্ববাদসম্মত নীতির ঐ সকল নিয়ম বা 'শিষ্টাচার'কে ধর্ম্মের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে। এবং সেই কারণে, মহাভারতে (অনু, ১০৪. ১৫৭) ও স্মৃতিগ্রন্থে "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ" অথবা "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ" (মনুঃ, ১. ১০৮) কিংবা ধর্ম্মের মূল বুঝাইবার সময় "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ'; (মনু, ২. ১২), এই আচার প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ কি, তাহার পূর্ণ ও মার্মিক বিচার করা আবশ্যক।

ধর্ম্মশব্দের আর এক যে ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারাও কিছু বিচার করা এইখানে আবশ্যক। মীমাংসকেরা "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ বলিয়া থাকেন (জৈ, সূ, ১. ১. ২)। কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক "তুমি অমুক কাজ "করিও না" এইরূপ বলা কিংবা আদেশ করার নাম চোদনা বা প্রেরণা। যে পর্য্যন্ত এই রকমের বিধান স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় যে কোন ব্যক্তির করিবার অধিকার আছে। ইহার ভাব এই যে, ধর্ম্ম প্রথমতঃ নিয়মবিধানের হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার হবস্ এর মতের সঙ্গে, ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশ মিল আছে। অসভ্য ও বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তদনুসারে কাজ করে। কিন্তু পরে, ধীরে ধীরে এই প্রকারের স্বৈরাচার শ্রেয়স্কর নহে এইরূপ বুঝা যায় ; এবং ইহা বিশ্বাস হয় যে, ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক ব্যাপারে একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয় ; তখন শিষ্টাচার কিংবা অন্য কোন রীতির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠা এই সীমা-মর্যাদা প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং এই প্রকারের সীমামর্য্যাদার সংখ্যা বেশী হইলে সেই সমস্ত লইয়াই এক শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে। বিবাহব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম আমলে আনিয়াছিলেন। সুরাপান শুক্রাচার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন—ইহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। শ্বেতকেতুর কিংবা শুক্রাচার্য্যের এই সীমামর্য্যাদা স্থাপনে হেতু কি ছিল তাহা না

দেখিয়া এই প্রকার সীমামর্য্যাদা স্থাপনের পক্ষে কেবল তাঁহাদের কর্ত্তব্যকেই লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া ধর্ম্মশব্দের "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ত্ব কাহারও লক্ষ্যের মধ্যে আসে এবং তখনই তাহাতে উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 'খাও, পিয়ো, মজা লোটো' একথা কাহাকেও শিখাইতে হয় না ; কারণ, উহা ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন—"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে' (মনু, ৫. ৫৬) মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে কোন দোষ নাই, ইহাই উহার তাৎপর্য্য। এই সব বিষয় শুধু মনুষ্যের নহে, কিন্তু প্রাণীমাত্রেই স্বাভাবিক—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্ সমাজধারণের জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জন্য প্রবৃত্তি-সূত্রে প্রথিত এই স্বৈরাচারকে যথোচিত সংযত করাই ধর্ম্ম। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে (শান্তি ২৯৪ ২৯)—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভি সামানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পশু উভয়েরই সমান স্বাভাবিক। ধর্ম্মেই "অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীমা স্থাপনে") মনুষ্য ও পশুতে ভেদ বুঝিতে হইবে। আহারবিহারের সংযম সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্ব্বপ্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও যখন অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন (গী, ৩. ৩৪)—

ইন্দিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে আপনাপন উপভোগ্য বা ত্যাজ্য পদার্থে প্রীতি ও দ্বেষ স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে ; কারণ, রাগ ও দ্বেষ উভয়ই আমাদের শত্রু", তখন ভগবান স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে সংযত করা যে ধর্ম্মের লক্ষণ, তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে পশুর ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবং তাহার বুদ্ধি তাহাকে উল্টাদিকে আকর্ষণ করে। কলহানলে যে ব্যক্তি দেহের মধ্যে বিচরণকারী এই পশুত্বকে আহুতি দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্ঞিক ও সেই ধন্য হয়।

ধর্ম্ম 'আচার-মূলকই' বল, 'ধারণাৎ' ধর্ম্মই বল বা 'চোদনালক্ষণ' ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মের বা ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত তিন লক্ষণের কোন উপযোগ হয় না। ধর্ম্মের মূল স্বরূপ কি তাহাই শুধু প্রথম ব্যাখ্যাটিতে বুঝা যায় : উহার বাহ্য উপযোগ কি, তাহা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দ্বারা জানা যায় ; এবং ধর্ম্মের সীমামর্য্যাদা প্রথমে কোন এক ব্যক্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তৃতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আচারে আচারে ভেদ দেখা যায় ; একই কর্ম্মের অনেক পরিণাম হয় ; এবং অনেক ঋষির আদেশ অর্থাৎ 'চোদনা'ও ভিন্ন ভিন্ন

হয়। এই সকল কারণে সংশয়স্থলে ধর্ম্মনির্ণয়ের অন্য মার্গ দেখা আবশ্যক। এই মার্গটা কি, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নৈকো ঋষির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ।।

অর্থাৎ—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠ যাহার বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ্ন তদনুসারে অনেক প্রকারের অনেক অনুমান তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও আদেশ ভিন্ন ভিন্ন; এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কথা যদি বল, এমন এক ঋষিও নাই যাঁহার বচন আমরা অন্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। ভাল, (এই ব্যবহারিক) ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যদি দেখা যায় তবে তাহাও অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। এই জন্য মহাজন যে পথ দিয়া গিয়াছেন, সেই পথই পথ" (মভা, বন, ৩১২. ১১৫)। ঠিক্ কথা। কিন্তু 'মহাজন' কাহাকে বলে? উহার অর্থ "অধিক কিংবা বহু জনসমূহ" হইতে পারে না। কারণ, যে, সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়ও কখন উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা কি রকম?—না যেমন, কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিম্বরের ন্যায় ("অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ) অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ। মহাজনের অর্থ যদি "বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি" ধরা যায় এবং এই অর্থই যদি উপরি-উক্ত শ্লোকের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও ঐ সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায়? নিষ্পাপ রামচন্দ্র আপন পত্নীকে অগ্নি হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্গত হইবার পরেও কেবল লোকাপবাদের জন্যই ত্যাগ করিলেন; এবং সুগ্রীবকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র' অর্থাৎ তোমার শত্রু আমার শত্রু এবং তোমার মিত্র আমার মিত্র এই প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র বিনা অপরাধে বালিকে বধ করিলেন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন। পাণ্ডবদিগের আচরণ দেখ—পাঁচজনের এক স্ত্রী। স্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—কেহবা অহল্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছেন, কেহ বা মৃগরূপ ধরিয়া আপন কন্যার প্রতি অভিলাষ করায় রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হইয়া আকাশে পড়িয়া আছেন (ঐ, ব্রা, ৩. ৩৩)। এই কথা মনে করিয়াই 'উত্তররামচরিত' নাটকে ভবভূতি লবের মুখ দিয়া "বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাঃ"—অর্থাৎ এই বৃদ্ধদের চরিত্র বেশী বিচার করিয়া কাজ নাই—এই কথা বলাইয়াছেন। ইংরাজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক এক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সয়তানের অনুচর ও দেবদূত ইহাদের যুদ্ধ বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যদিগকে কপটতা দ্বারা ঠকাইয়াছেন। সেইপ্রকার কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (কৌষী, ৩. ১ ও ঐ. ব্রা. ৭. ২৮ দেখ) ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন যে, 'আমি বৃত্রকে (যদিও সে ব্রাহ্মণ ছিল) বধ করিয়াছি। অরুন্মুখ সন্ন্যাসীদিগকে আমি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বৃকদিগের নিকট ফেলিয়া দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহ্লাদের আত্মীয় ও গোত্রজদিগকে এবং পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছি, তথাপি আমার এক গাছা চুলও বাঁকে নাই—"তস্য

মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে"। যদি কেহ বলেন "তোমাদের এই মহাপুরুষদিগের মন্দ কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্তি অনুসারে (তৈত্তি ১. ১১. ২) তাঁহাদের যে সকল কর্ম্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ কর, বাকী ছাড়িয়া দেও; উদাহরণ যথা—পরশুরামের মতোই পিতার আজ্ঞা পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ করিও না", তাহা হইলে ঐ প্রথম প্রশ্ন পুনরায় উঠে যে ভালমন্দ কর্ম্ম বুঝিবার উপায় কি? তাই, উপরি-উক্ত আপন কৃত্যাদি বর্ণনা করিয়া ইন্দ্র প্রতর্দনকে পুনরায় বলিতেছেন যে, "যে পূর্ণ আত্মজ্ঞানী হইয়াছে, তাহাকে মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা বা স্তেয় (চৌর্য্য) ইত্যাদি কোন কর্ম্মেরই দোষ স্পর্শ করে না—এই কথাটি ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং আত্মা কাহাকে বলে তাহাও তুমি বুঝিয়া লও; তাহা হইলে তোমার সকল সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে"। তাহার পর, ইন্দ্র প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। সারকথা এই যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ", এই যুক্তি সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সহজ হইলেও সকল কথার ইহা দ্বারা সমাধান হয় না; এবং শেষে মহাজনদিগের আচরণের প্রকৃত তত্ত্ব যতই গূঢ় হউক না কেন, বিচারক ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বাধ্য হন। "ন দেবচরিতং চরেৎ" অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র অনুসারে কাজ করিবেন না—এই উপদেশেরও ইহাই রহস্য। কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ ইহা ব্যতীত আর এক সরল যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কোন সদ্‌গুণ হউক না কেন, তাহার আধিক্য যাহাতে না হয় তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, এইরূপ আধিক্যের কারণেই সদ্‌গুণও শেষে দুর্গুণ হইয়া পড়ে। দান করা একটা সদ্‌গুণ সত্য, কিন্তু "অতি দানাদ্ বলির্বদ্ধঃ"—অর্থাৎ অতি দানে বলি রাজা বাঁধা পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ের এই যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক সদ্‌গুণ 'অতি' হইলে কিরূপে 'মাটি' হয়। কালিদাসও রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন, যে নিছক্ শৌর্য্য ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র জন্তুদিগের ক্রূর কর্ম্ম এবং নিছক্ নীতি ভীরুতা, ইহা স্থির করিয়া অতিথি রাজা, তরবারি ও রাজনীতি এই উভয়ের যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন (রঘু ১৭.৪৭)। ভর্তৃহরিও কতকগুলি গুণদোষের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বেশী কথা বলা 'বাচালতার লক্ষণ এবং অল্প কথা বলা মূকের লক্ষণ; বেশী খরচ করা উড়োনচণ্ডীর লক্ষণ এবং কম খরচ করা কঞ্জুষের লক্ষণ, সম্মুখে অগ্রসর হইলে 'প্রগল্‌ভতা এবং পিছাইয়া পড়িলে শিথিলতা; অতিশয় আগ্রহ করিলে জেদী এবং না করিলে চঞ্চল, বেশী তোষামোদ করিলে নীচ এবং চুপ করিয়া থাকিলে গর্ব্বিত; কিন্তু এইরূপ স্থূল-রকমের কষ্টিপাথরে শেষ পর্যন্ত কাজ হয় না। কারণ, 'অতি'ই বা কি, আর 'নিয়মিত'ই বা কি—ইহার তো কোন প্রকার নির্ণয় হওয়া আবশ্যক; আর সেই নির্ণয় কে করিবে, এবং কেমন করিয়াই বা করিবে? একজনের নিকট কিংবা এক প্রসঙ্গে যাহা 'অতি', তাহাই আর একজনের নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি' বা ন্যূন হইতে পারে। হনুমানজী জন্মগ্রহণ করিতেই সূর্য্যকে ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করা

কঠিন কার্য্য মনে করেন নাই (বা. রামা. ৭. ৩৫) ; কিন্তু ইহা অন্যের পক্ষে কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এইজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের শিবি রাজার প্রতি শ্যেনের উপদেশমত নির্ণয় করা উচিত—

অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম।
বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ॥

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের তারতম্য কিংবা লাঘব-গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মের নির্ণয় করা উচিত (মভা. বন. ১৩১. ১১. ১২ ও মনু. ৯. ২৯৯ দেখ)। কিন্তু এরূপও বলা যাইতে পারে না যে, ইহা দ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের সারাসার বিচার করাই সংশয়স্থলে ধর্ম্মনির্ণয়ের এক প্রকৃত কষ্টিপাথর। কারণ, ব্যবহার অনেকবার দেখা যায় যে, অনেক পণ্ডিত লোক আপনাপন বুদ্ধি অনুসারে সারাসারের বিচারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমত্তার নির্ণয়ও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করিয়া থাকেন। এই অর্থই উপরি-উক্ত "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" বচনে বলা হইয়াছে। তাই, এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মসংশয়ের এই প্রশ্নের নির্ভুল মীমাংসা করিবার অন্য কোন উপায় আছে কি নাই ; যদি থাকে সেটী কি ; আর যদি অনেক উপায় থাকে তবে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোনটি। এই বিষয়ের নির্দ্ধারণ করাই হইল শাস্ত্রের কার্য্য। শাস্ত্রের লক্ষণও এই যে, "অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্"—অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন হইলে পর, সর্ব্বপ্রথম ঐ সকল বিষয়ের পাকগুলি পৃথক পৃথক করিয়া দেয় ; যে সকল বিষয় বুঝা যায় না সেই সকল বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট ও সুগম করিয়া দেয় এবং যে বিষয় প্রত্যক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এরূপবিষয়সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন করে। জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা ভাবী গ্রহণও গণনা করিতে পারেন। আলোচনা করিলে, উক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে "পরোক্ষার্থস্য দর্শকং" এই অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু অনেক সংশয়ের সমাধান করিতে হইলে প্রথমে জানা আবশ্যক যে উহা কোন্ প্রকারের সংশয়। তাই, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থকারদিগের এই পদ্ধতি প্রচলিত যে, কোন শাস্ত্রান্তর্গত সিদ্ধান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, সেই বিষয়ে যতগুলি পক্ষ বাহির হইয়াছে সেগুলির বিচার করিয়া, তাহাদের দোষ ও ন্যূনতা প্রদর্শন করা হয়। এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লইয়া গীতাতে কর্ম্মাকর্ম্মনির্ণয়ার্থ প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তপক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, এই কাজের জন্যই অন্য যে কিছু যুক্তি পণ্ডিতলোকেরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি সেগুলিরও বিচার করিব। এ কথা সত্য যে, এই সকল যুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না ; বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল যুক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার দরুণ উহার বিচার এই গ্রন্থে করা উচিত নহে, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, কেবল তুলনার জন্য নহে, কিন্তু গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যও এই সকল যুক্তি—যতই সংক্ষেপে হউক না কেন—অবগত হওয়া আবশ্যক।

ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত

চতুর্থ প্রকরণ

আধিভৌতিক সুখবাদ

দুঃখাদুদ্বিজতে সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য সুখমীপ্সিতম্।[1]

—মহাভারত, শান্তি, ১৩৯.৬১

মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের 'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং' ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করিবার কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিত্য, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, উহাদের মূল তত্ত্বটি কি, এবং উহাদের মধ্যে কোনো দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম একই সময়ে আসিয়া পড়িলে, কোন্ মার্গ স্বীকার করা যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' কিংবা 'অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ' এইরূপ সাধারণ যুক্তিদ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে না। এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় কি প্রকারে হয় এবং শ্রেয়স্কর মার্গ কোন্‌টি তাহা স্থির করিবার জন্য নির্ভুল যুক্তি কি, তাহা এতক্ষণে দেখিতে হইবে ; অর্থাৎ জানা চাই যে, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমূহের লাঘব ও গৌরব, ন্যূনাধিক মহত্ত্ব কোন্ দৃষ্টিতে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। অন্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন মার্গ আছে। এই মার্গত্রয়ের ভেদ কি, তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য দুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক, তাই প্রথমে এই প্রকরণে কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আধিভৌতিক মূলতত্ত্বের চর্চা করা হইয়াছে। যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের আজকাল অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্থসমূহের বাহ্য ও দৃশ্য গুণেরই বিচার বিশেষভাবে করা হয়। এই জন্য আধিভৌতিক শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে যাহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে, এবং এই সকল শাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিমান আছে, তাঁহারা বাহ্য পরিণামের বিচারেই অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহার পরিণামে তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিও অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হয় এবং তাঁহারা কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক, অব্যক্ত বা অদৃশ্য কারণ সমূহের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না, কিন্তু যদিও তাঁহারা এইরূপ কারণে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করেন, তথাপি তাঁহাদের ইহা মানিতে হয় যে মনুষ্যদিগের সাংসারিক ব্যবহার সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার এবং লোক সংগ্রহ করিবার নীতি নিয়মের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। আমি দেখিতেছি যে, পরলোক সম্বন্ধে যাঁহাদিগের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর (অর্থাৎ পরমেশ্বরেতেও) যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এইরূপ পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতেরাও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এই সকল পণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশে এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও এই তর্কবিতর্ক চলিতেছে যে, কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্ররীতি অনুসারে অর্থাৎ নিছক ঐহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেই কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের উপপত্তি দেখানো যাইতে পারে কি না।

১। দুঃখ সকলকেই উদ্বেজিত করে, সুখ সকলেরই অভীপ্সিত।

এই তর্কবিতর্কের ফলে ঐ সকল পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, নীতিশাস্ত্রের বিচার করিবার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের কোনই প্রয়োজন নাই। কোন কর্ম্মের ভালমন্দ উক্ত কর্ম্মের আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্য পরিণাম হইতেই করা আবশ্যক; এবং এইভাবে করাও হয়। কারণ, মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে তাহা সমস্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া থাকে। অধিক কি, 'সকল মনুষ্যের সুখই ঐহিক পরমসাধ্য বিষয়; এবং যদি সকল কর্ম্মের শেষ দৃশ্যফল এই প্রকার নিশ্চিত হয়, তবে সুখপ্রাপ্তির কিংবা দুঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়া সকল কর্ম্মের নীতিমত্তা নির্দ্ধারণ করা নীতিনির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু ক্ষুদ্রশৃঙ্গী ও শান্ত কিন্তু অধিক পরিমাণে দুধ দেয় সেই গরু যেমন ভাল বলা যায়, সেইরূপ যদি ব্যবহারে কোন বিষয়ের ভালমন্দ বাহ্য উপযোগের হিসাবেই স্থির করা যায়, তবে ঐ নীতি অনুসারেই যে কর্ম্ম হইতে সুখপ্রাপ্তি দুঃখনিবারণাত্মক বাহ্য ফল অধিক, তাহাই নীতিদৃষ্টিতেও শ্রেয়স্কর বুঝিতে হইবে। আমরা যখন কেবল বাহ্য ও দৃশ্য পরিণাম-সমূহের লাঘবগৌরব দেখিয়া নীতিমত্তার নির্ণয় করিবার এই সকল ও শাস্ত্রীয় কষ্টিপাথর পাইলাম, তখন তাহার জন্য আত্ম-অনাত্ম বিচারের গভীর সাগরে প্রবেশ করিয়া "দ্রাবিড়ী প্রাণায়াম" করা উচিত নহে। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"* অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য কিজন্য পর্ব্বতে যাইবে? কোন কর্ম্মের কেবল বাহ্যফল দেখিয়া নীতি ও অনীতির নির্ণয়কারীর পক্ষকে আমি "আধিভৌতিক সুখবাদ" এই নাম দিয়াছি। কারণ নীতিমত্তার নির্ণয়ার্থ এই মত অনুসারে যে সুখদুঃখের বিচার করা হয়, সে সমস্ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং কেবল বাহ্য অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইবার পর উৎপন্ন বা আধিভৌতিক। এবং এই পন্থাও সর্ব্বজগতের কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকারী পণ্ডিতেরাই প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদের সবিস্তার বিবরণ এই গ্রন্থে বলা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের মতের সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাই 'ভগবদ্গীতান্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রের এই আধিভৌতিক মার্গের যতটা বিবরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক সেইটুকু স্থূল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া আমি দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মূল গ্রন্থ তাঁহার দেখা আবশ্যক। উপরে বলা হইয়াছে যে, আধিভৌতিকবাদী পরলোক সম্বন্ধে কিংবা আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন; একথার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, এই মার্গের সকল বিদ্বানই স্বার্থসাধক আত্মম্ভরী কিংবা অনীতিমান। এই সকল লোকের পারলৌকিক দৃষ্টি যদি না থাকে তো নাই রহিল। ইঁহারা মনুষ্যের কর্ত্তব্য বিষয়ে ইহাই বলেন যে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় ঐহিক দৃষ্টিকেই, যতদূর সম্ভব ব্যাপক করিয়া সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। আন্তরিক পূর্ণ উৎসাহের সহিত যাঁহারা এই

* এই শ্লোকে 'অর্ক' শব্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইরূপ কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ৩.৪.৩ উপর-উক্ত শাঙ্কর ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি 'অর্ক' এই শব্দের অর্থ 'সমীপ' এইরূপ করিয়াছেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই—"সিদ্ধস্যার্থস্য সংপ্রাপ্তৌ কো বিদ্বান যত্নমাচরেৎ"।

ভাবের উপদেশ করিয়াছেন, সেই কোঁৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি সাত্ত্বিকবৃত্তির অনেক পণ্ডিতও এই মার্গে আছেন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্ভ বিচারের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের গ্রন্থ সকলেরই পঠনীয়। যদিও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের পন্থা ভিন্ন, তথাপি যে পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণ, এই বাহ্য সাধ্য উহা হইতে বাদ না পড়ে সে পর্য্যন্ত ভিন্ন রীতিতে নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদক কোনও মার্গ বা পন্থাকে উপহাস করা উচিত নহে। সে যাই হোক; নৈতিক কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ার্থ যে আধিভৌতিক বাহ্যসুখের বিচার করিতে হইবে, সে কাহার সুখ? নিজের, না, পরের; একজনের, না, বহুলোকের? এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদীদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। এক্ষণে সংক্ষেপে বিচারকরিবার যে নব্য ও প্রাচীন সমস্ত আধিভৌতিকবাদীদিগকে মুখ্যত কতকগুলি বর্গের অন্তর্ভুক্তি করা যাইতে পারে, এবং তাঁহাদের এই মার্গ কতদূর উচিত বা নির্দ্দোষ।

তন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক স্বার্থসুখবাদীদিগের। এই মার্গের বক্তব্য এই যে, পরলোক ও পরোপকার সমস্তই মিথ্যা, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছে, এই জগতে স্বার্থই একমাত্র সত্য, এবং যে উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে অথবা যাহার দ্বারা নিজের আধিভৌতিক সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাই ন্যায্য, প্রশস্ত বা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে চার্ব্বাক উৎসাহ সহকারে এই মত প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; এবং রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে, জাবালি রামকে যে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাহা এবং মহাভারতে বর্ণিত কণিক নীতিও (মভা. আ. ১৪২) এই মার্গেরই অন্তর্ভূত। চার্ব্বাকের মত এই যে, পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া তাহার মিশ্রণ হইতে আত্মারূপ এক গুণ উৎপন্ন হয় এবং দেহ দগ্ধ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দগ্ধ হইয়া যায়; তাই পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য এই যে, আত্ম-বিচারের গণ্ডগোলের মধ্যে না পড়িয়া শরীর যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন "ঋণ করিয়াও উৎসব করিবে"—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—কারণ মরিবার পর আর কিছুই থাকে না। চার্ব্বাক ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঘৃতের উপরে তাঁহার লোভটা বেশী ছিল। নতুবা "ঋণং কৃত্বা সুরাং পিবেৎ" এইরূপ সূত্রটির রূপান্তর দেখা যাইত। কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা পরোপকার! এজগতে যত পদার্থ পরমেশ্বর—শিব শিব! ভুল হইয়াছে! পরমেশ্বর আসিল কোথা হইতে?—এই জগতে যে কিছু বস্তু আমি দেখিতেছি সে সমস্তই আমারই উপভোগের জন্য। সে সকলের অন্য কোন ব্যবহার দেখা যায় না,—নাই-ই! আমি মরিলেই জগৎ অন্তর্হিত হইল! তাই যতদিন বাঁচি তত দিন আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহা কিছু সমস্ত আমার আয়ত্ত করিয়া লইয়া আমার সমস্ত বাসনা কামনা আমি পরিতৃপ্ত করিব। আমি যদি তপস্যা করি কিংবা দান করি, সে সমস্তই আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধির জন্যই করিব। এবং আমি যদি রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, তাহা কেবল আমার অধিকার সর্ব্বত্র অবাধিত প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। সারাংশ,—এই জগতের 'আমিই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমস্ত নীতিশাস্ত্রের রহস্য; বাকী সব মিথ্যা। "ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী (গী. ১৬. ১৪) আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আর আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্ ও সুখী"—

এই প্রকারের আসুরী মতাভিমানীদিগের বিষয় গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে জাবালির ন্যায় এই মার্গের কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের পাশে বসিয়া অর্জ্জুনকে যদি উপদেশ দিতেন তাহা হইলে তিনি প্রথমেই অর্জ্জুনকে মুখথাবড়া দিয়া বলিতেন—"ওরে তুই কি মূর্খ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়া অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাস উপভোগের এই উত্তম সুযোগ পাইয়াও 'ইহা করিব কি উহা করিব' এইরূপ ব্যর্থ প্রলাপ কেন করিতেছিস্? এরূপ সুযোগ আর আসিবে না। কোথাকার আত্মা, আর কোথাকার আত্মকুটুম্বের জন্য বসে আছিস্। ভারী ভুল! তুই হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্য সুখে ও নিষ্কণ্টকে ভোগ কর্! ইহাতেই তোর পরম কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আর আছে কি?" কিন্তু অর্জ্জুন এই জঘন্য স্বার্থসাধক ও নিছক্ আত্মম্ভরী রাক্ষসী উপদেশও অপেক্ষা না করিয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।।

"শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ত্রৈলোক্যের রাজ্যও (এ বড় বিষয়সুখ) যদি (এই যুদ্ধে) আমি পাই, তবু, আমি কৌরবদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার যদি গলা কাটা যায় তাহাও স্বীকার।" (গী. ১. ৩৪)। অর্জ্জুন প্রথমেই যে আত্মমংলবী নিছক্ স্বার্থপরায়ণ ও আধিভৌতিক সুখবাদের এই প্রকারে নিষেধ করিলেন, সেই আসুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার খণ্ডন হয় বলা যাইতে পারে। লোকের যাই হোক না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়োপভোগ সুখকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া নীতি ও ধর্ম্মবিসর্জ্জনকারী আধিভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ শ্রেণী, কর্ম্মযোগশাস্ত্রসংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকার এবং সাধারণ লোকেরও নিকটে এক্ষণে অত্যন্ত অনীতিমূলক, ত্যাজ্য ও গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অধিক কি, এই পন্থাটি নীতিশাস্ত্র কিংবা নীতিবিচার নামেরও যোগ্য নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিয়া আধিভৌতিক সুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্।

সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসর্ব্বস্বতা জগতে চলে না। কারণ, আধিভৌতিক-বিষয়সুখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের সুখ অন্য লোকের সুখ-ভোগের যখন অন্তরায় হয়, তখন অন্য লোকেরা আমার নিজের সুখের বিঘ্ন না জন্মাইয়া নিরস্ত হয় না, ইহা প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় জানে। তাই, আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ বা স্বার্থসাধন আমার সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদিগকে নিজের মতো সাহায্য করা ব্যতীত নিজেরও সুখ লাভ হইতে পারে না, তাই নিজের সুখের জন্য, দূরদর্শিতাসহকারে অন্যেরও সুখের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই আধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করি; কিন্তু নীতিই আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইখান হইতেই হয় বলিলেই চলে। কারণ ইঁহারা চার্ব্বাকের ন্যায় সমাজ বিধরণের জন্য নীতির বন্ধন নিষ্প্রয়োজন, সে কথা বলেন না; কিন্তু ঐ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, ইঁহারা স্বীয় বিচারদৃষ্টিতে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা

বলেন যে, জগতে অহিংসাধর্ম্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা লোকেরা তাহা কেন পালন করে তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিলে, "আমি অন্যকে মারিলে অন্যেরাও আমাকে মারিবে ও পরে আমার সুখ চলিয়া যাইবে" এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য কোন গভীর কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়। অহিংসাধর্ম্মের ন্যায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মই এই প্রকার স্বার্থমূলক কারণেই প্রচলিত হইয়াছে। আমার দুঃখ হইলে আমি কাঁদি এবং অন্যের দুঃখে আমাদের দয়া হয়। কেন? আমারও কখনো ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী দুঃখ, মনে আইসে—এই কারণেই কি নহে? পরোপকার, ঔদার্য্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের সুখের নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সে সমস্তই মূলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই সুখের জন্য কিংবা নিজেরই দুঃখনিবারণের জন্য। কেহ কাহাকে সাহায্য করে বা দান করে—কেন? ইহাই কি তাহার কারণ নহে যে, আমার নিজের সংকট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও আমাকে সাহায্য করিবে? আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়া আমিও তাহাদের উপর দয়া করি। নিদানপক্ষে, লোকেরা ভাল বলিবে, অন্তত এই স্বার্থমূলক হেতুটিও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। পরোপকার ও পরার্থ এই দুই শব্দ নিছক ভ্রান্তিমূলক। একমাত্র স্বার্থই সত্য; এবং স্বার্থ অর্থে নিজের সুখলাভ কিংবা দুঃখনিবারণ। মাতা সন্তানকে স্তন্য দেন, তাহার কারণ মাতার প্রেম নহে; ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, মাতার স্তনের স্ফীতি তাহাকে কষ্ট দেয় বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য, কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা করিয়া তাহাকে সুখ দিবে এই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে এই স্বার্থসাধক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রেম বাৎসল্যাদির ইহাই মূল কারণ! দ্বিতীয় বর্গের আধিভৌতিক বাদী স্বীকার করেন যে, আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক না, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এমন নীতিধর্ম্ম পালন করা উচিত, যাহাতে অন্যেরও সুখ হইতে পারে—ব্যস্, এইখানেই এই মতের সহিত চার্ব্বাকমতের প্রভেদ! তথাপি চার্ব্বাকমত-অনুসারে এই মতেও স্বীকার করা হয় যে, মনুষ্য নিছক বিষয়সুখরূপ স্বার্থের ছাঁচে ঢালা এক পুতুল। ইংলণ্ডে হবস্ এবং ফ্রান্সে হেলবেশিয়স্ এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এই মতের অনুগামী এক্ষণে না ইংলণ্ডে না অন্যত্র বেশী পাওয়া যায়। হবসের নীতিধর্ম্মের এই উপপত্তি বহুলপ্রচার হইলে পর বটলরের * ন্যায় বিদ্বানেরা উহার খণ্ডন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, মানবস্বভাব নিছক স্বার্থপর নহে, স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণও ন্যূনাধিক পরিমাণে মনুষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে। এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার বা কর্ম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময়, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না দেখিয়া, স্বার্থ ও পরার্থ মানবস্বভাবের এই দুই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বাঘিনীর ন্যায় ক্রূর জানোয়ার পর্য্যন্ত আপন বাচ্ছাদের রক্ষণার্থ যখন প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তখন সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও পরোপকার বুদ্ধি

* হবসের মত তাঁহার Leviathan গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বটলের মত তাঁহার Sermons on Human nature এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। হেলভেশিয়সের পুস্তকের সারাংশ মরলি স্বীয় Diderot বিষয়ক গ্রন্থে দিয়াছেন। (Vol. II, Chap. V.)

নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বলিতে পারি না। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা করা শাস্ত্র দৃষ্টিতেও উচিত নহে। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় নাই এরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক সময় নিজের হিতের জন্যই করিয়া থাকে; এই কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরও মনে আসিয়াছিল। মহারাষ্ট্রে তুকারাম বড় ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। শ্বাশুড়ীর তরে কাঁদে বৌ; কিন্তু মনের ভাব ভিন্ন রূপ (গা. ২৫৮. ৩. ২.) এইরূপ তুকারাম বলিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত হেল্‌বেসিয়সকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। উদাহরণ যথা—

মনুষ্যের সমস্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দোষময় হইয়া থাকে—প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ—এই গৌতম-ন্যায়সূত্রের (১. ১. ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাহা কিছু বলিয়াছেন (বে. সূ. শাং-ভা. ২. ২. ৩), তাহার উপর টীকা করিবার সময় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে, "আমার হৃদয়ে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হইলে, তাহা হইতে আমাদের যে দুঃখ হয় তাহা দূর করিবার জন্য আমরা লোকের উপর দয়া কিংবা পরোপকার করিয়া থাকি।" আনন্দগিরির এই যুক্তি প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসমার্গীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার দ্বারা মুখ্যরূপে ইহাই সিদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখা যায় যে, সব কর্ম্মই স্বার্থপর অতএব ত্যাজ্য। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ী ইঁহাদের যে কথোপকথন দুইস্থানে আছে, (বৃ, ২. ৪; ৪. ৫) তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই যুক্তিবাদের উপযোগ করা হয়য়াছে। "আমার অমৃতত্ব কিসে লাভ হইবে?" মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিলেন যে, "মৈত্রেয়ী! স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে; আত্মপ্রীত্যর্থই ভালবাসে। সেইরূপ পুত্রকে পুত্র বলিয়া আমরা ভালবাসি না, আমার নিজের জন্য পুত্রকে ভালবাসি। * ধনসম্পত্তি, পশু ও অন্য সমস্ত পদার্থেই এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি'— আত্মপ্রীত্যর্থ সমস্ত পদার্থ আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে। এবং সমস্ত প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে আত্মাকে (আমি) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে কি?" এইরূপ বলিয়া শেষে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—"আত্মা কে (প্রথমে) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাঁহার মনন ও ধ্যান কর"। এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার পর সমস্ত জগতই আত্মময় দৃষ্ট হয়, এবং স্বার্থ ও পরার্থের ভেদও মন হইতে বিলুপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই যুক্তিবাদ আপাতত হব্‌সের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহা জানা কথা যে, এই উভয় হইতে উৎপন্ন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ। হব্‌স্ স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন এবং সমস্ত পরার্থকে দূরদর্শী স্বার্থেরই এক আকার ভাবিয়া বলেন যে,

* "What say you of natural affection? Is that also a species of self-love? Yes, All is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And Your country engages you only so far as it has a connection with Your-self" হিউমও স্বকীয় "of the Dignity or Meanness of Human nature" নামক প্রবন্ধে এই যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। হিউমের নিজের মত ইহা হইতে ভিন্ন।

স্বার্থ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু নাই। যাজ্ঞবল্ক্য 'স্বার্থ' এই শব্দান্তর্ভূত 'স্ব' (আপনি) এই পদের বনিয়াদে দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমার এক আত্মাতেই সমস্ত ভূতের ও সমস্ত ভূতেতেই আমার আত্মার অবিরোধে কিরূপে সমাবেশ হয়। ইহা দেখাইয়া স্বার্থ ও পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে অবভাসমান দ্বৈতের বিরোধও ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত মত এবং সন্ন্যাসমার্গ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার করা যাইবে। "সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মসুখপর হইয়া থাকে" এই একই বিষয়ের ন্যূনাধিক গৌরব প্রদান করিয়া কিংবা উহাকে সর্ব্বথা অপবাদরহিত বা অব্যভিচারী স্বীকার করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারেরা উহা হইতেই হব্‌সের বিপরীত অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই এইস্থানে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উল্লেখ করিয়াছি।

একথা যখন সিদ্ধ হইল যে, ইংরেজ গ্রন্থকার হব্‌স্ ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌-ভেসিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্যস্বভাব নিছক স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী রাক্ষসী নহে; কিন্তু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিও মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে; অর্থাৎ যখন ইহা স্থির হইল যে, পরোপকার শুদ্ধ দূরদর্শী স্বার্থ নহে, তখন স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-সুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ অন্যের সুখ এই দুই তত্ত্বের উপরে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতিশাস্ত্রের রচনা করিবার প্রয়োজন প্রতীত হইতেছে। ইহাই আধিভৌতিকবাদীদিগের তৃতীয় বর্গ। তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ, উভয়ই ঐহিক সুখবাচক, ঐহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এইটুকু প্রভেদ যে, এই পন্থার লোকেরা স্বার্থবুদ্ধির ন্যায় পরার্থবুদ্ধিকেও নৈসর্গিক স্বীকার করিয়া বলেন যে, নীতির বিচার করিবার সময় স্বার্থের ন্যায় পরার্থকেও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয় না, তাই মনুষ্য যে কোন কর্ম্ম করে তাহা প্রায়ই সমাজের হিতকর হয়। একজন ধন সঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজেরও হিত সাধিত হয়; কারণ, সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ এবং যদি ঐ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি না করিয়া আপনাপন লাভ করে, তাহাতে সমাজের কল্যাণই হয়। এইজন্য এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে নিজের সুখের প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিতসাধন করিতে পারে তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না, এবং বলেন যে, সকল সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিবে। ইহার পরিণাম এই হয় যে, যখন স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন অনেকে লোকের সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জ্জন করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযোগে পড়িয়া অনেক সময় স্বার্থেরই দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। উদাহরণ যথা,—স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই সমান প্রবল বলিয়া মানিলে সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া কিংবা রাজ্য হারানো দূরের কথা, ধনের ক্ষতি অধিক হইলেও উহা সহ্য করিবে কিনা, ইহা এই মার্গের মতানুসারে নির্ণয় হয় না। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের জন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলম্বী লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা করিবে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই নৌকায় যে সকল পণ্ডিত

সর্ব্বদাই পা দেন তাঁহারা স্বার্থের দিকেই।যে অধিক ঝুঁকিবেন তাহা আর বলিতে হইবে না। হব্‌সের ন্যায় ইঁহারা পরার্থকে স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারভেদ বলিয়া মানেন না; কিন্তু ইহা মনে করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থ উভয়কে তৌলে স্থাপন পূর্ব্বক উহাদের তারতম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিক বিচার করিয়া খুব চতুরতার সহিত তাঁহারা নিজের নিজের স্বার্থের নির্ণয় করিয়া থাকেন; এইজন্য এই পন্থার লোকেরা আপন মার্গকে "উদাত্ত" বা "উচ্চ" বা "জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ" (কিন্তু স্বার্থ বটে) নাম দিয়া তাহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।* কিন্তু ভর্ত্তৃহরি কি বলিতেছেন দেখ—

> একে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে
> সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমবতঃ স্বার্থাহবিরোধেন যে।
> তেঽমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
> যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

"নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ; স্বার্থ না ছাড়িয়া লোকের হিতের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণ পুরুষ; এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি যাহারা করে তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস; কিন্তু ইহাদের পরেও, যাহারা নিরর্থক লোকহিত নষ্ট করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি না" (নী, শ, ৭৪)। রাজধর্ম্মের উত্তম অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া কালিদাসও বলিয়াছেন—

> স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ।
> প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবম্বিধৈব॥

"নিজ সুখের অভিলাষ না করিয়া তুমি প্রতিদিন লোকহিতের জন্য কষ্ট করিয়া থাক। অথবা তোমার বৃত্তি বা ব্যবসায়ই এইরূপ" (শকুং, ৫. ৭)। ভর্ত্তৃহরি কিংবা কালিদাস দেখেন নাই যে, কর্ম্মযোগশাস্ত্র স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই স্বীকার করিয়া উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বা কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয় কেমন করিয়া করিতে হইবে; তথাপি পরার্থের জন্য যাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন সেই সব পুরুষকে তাঁহারা যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তাহা নীতিদৃষ্টিতেও ন্যায্য। এই মার্গের লোকেরা এই সম্বন্ধে বলেন যে, "তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে পরার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, তাহা না দেখিয়া, সাধারণ ব্যবহারে 'সামান্য' মনুষ্য কি ভাবে কাজ করিবে তাহাই স্থির করিতে হইবে; এবং সেই কারণে জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে আমরা যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে সমুচিত।"† কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তিবাদে কোন লাভ নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন মাপে সর্ব্বদাই কিছু কম বেশী হইয়া থাকে, ব্যস্—এই কারণে যদি রাজদরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত ওজনমাপেও ন্যূনাধিক্য রাখা হয়, তবে কি আমরা সেই সম্বন্ধে অধিকারীদিগের উপর দোষারোপ করি না?

* ইংরাজীতে ইহাকে Enlightened self-interest বলে। আমি ইহার ভাবান্তরে "উদাত্ত" কিংবা "উচ্চ স্বার্থ" করিয়াছি।

† Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2. pp. 18-29, also Book IV. Chap. IV. § 3 p. 474 এই তৃতীয় পন্থা Sidgwick বাহির করিয়াছেন এরূপ নহে; কিন্তু সাধারণ

কর্ম্মযোগশাস্ত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতিধর্ম্মের পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপ কি,—ইহার শাস্ত্রীয় নির্ণয় সম্পাদনার্থই নীতিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং এই কাজ নীতিশাস্ত্র যদি না করে তবে নীতিশাস্ত্র নিষ্ফল বলিতে হইবে। 'জ্ঞানালোকিত স্বার্থ সাধারণ মানুষের মার্গ'—সিজ্‌বিক্ যে ইহা বলেন, তাহা কিছু মিথ্যা নহে। ভর্ত্তৃহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদিগেরই পরাকাষ্ঠা-নীতিমত্তা সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সিজ্‌বিক্ "জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ স্বার্থে" যে মহত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক, কারণ সাধারণ লোকেরও ধারণা এই যে, নিষ্কলঙ্ক নীতির মার্গ কিংবা সৎপুরুষদিগের অনুসৃত আচরণের মার্গ—ইহা সাধারণ স্বোদর-পূরণ মার্গ হইতে শ্রেয়স্কর। উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি ইহাই বিবৃত করিয়াছেন।

আধিভৌতিক সুখবাদের নিছক স্বার্থী, দূরদর্শী স্বার্থী ও উভয়বাদী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থী,—এই যে তিন মার্গ আছে, সেই তিন মার্গ সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখ্য দোষগুলি কি তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও সমস্ত আধিভৌতিক মার্গ শেষ হয় নাই। সাত্ত্বিক আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা* প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে "একই মনুষ্যের সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মনুষ্যেরই আধিভৌতিক সুখ-দুঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করা আবশ্যক"। এইরূপ মার্গই শ্রেষ্ঠতম মার্গ। একই কার্য্যে একই সময়ে সমাজের কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হইতে পারে না। একজন যাহা সুখ বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক। কিন্তু পেচকের আলোক ভাল লাগে না বলিয়া আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ বলে না, সেইরূপ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন কথা লাভজনক মনে না হইলেও তাহা যে সকলের পক্ষেই হিতাবহ নহে—একথা কর্ম্মযোগশাস্ত্রও বলিতে পারে না। এবং এই কারণেই "সকল লোকের সুখ" এই শব্দগুলির "অধিক লোকের অধিক সুখ"—এই অর্থও করিতে হয়। সারকথা,—"যাহাতে অধিক লোকের অধিক সুখ হয়—তাহাই নীতিদৃষ্টিতে ন্যায্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে"—এই মার্গের এইরূপ মত। আধিভৌতিক সুখবাদের এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও স্বীকার করিয়া থাকে। অধিক কি, এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিকবাদীরা অতি প্রাচীনকালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন; প্রভেদ এইটুকু যে, আধিভৌতিকবাদীরা এক্ষণে একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ করিয়াছে মাত্র। তুকারামের কথা অনুসারে "জগতের কল্যাণেরই জন্য সাধুদিগের বিভূতি। পরোপকারের জন্য তাঁহারা দেহকে কষ্ট দেন।" ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদ্গীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগযুক্ত জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার

সুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রায় এই পন্থারই অনুগামী; ইহার Common sense morality এইরূপ নামও আছে।

* বেন্থাম, মিল প্রভৃতি পণ্ডিত এই মার্গের অগ্রণী। Greatest good of the greatest number, ইহার অনুবাদ করিয়াছি—"অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ"।

সময় "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধণেই তাঁহারা নিমগ্ন, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে (গী, ৫. ২৫ ; ১২. ৪)। ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ার্থেও আমাদিগের শাস্ত্রকার যে এই তত্ত্বের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখেন তাহা দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত "যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা" এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারদিগের উক্তি অনুসারে, "সর্ব্বভূতহিত"কে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের আচরণের বাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ, প্রসঙ্গ বিশেষে স্থূলভাবে উহার উপযোগ করা এক কথা ; এবং উহাকে নীতিমত্তার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্রের সমস্ত ইমারত খাড়া করা পৃথক কথা। এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আধিভৌতিক পণ্ডিত অন্য মার্গ স্বীকার করিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন যে, অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। তাই, তাঁহার এই কথা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা আমাদিগের এখন দেখিতে হইবে। 'সুখ' ও 'হিত' এই দুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে ; কিন্তু আপাতত ঐ ভেদ যদি একপাশে সরাইয়া রাখা হয় এবং 'সর্ব্বভূতহিত' অর্থে "অধিক লোকের অধিক সুখ" ধরিয়াই কাজ চালানো হয়, তথাপি কার্য্যাকার্য্য-নির্ণয়ের কাজে কেবল এই তত্ত্বেরই উপযোগ করিলে দেখা যায় যে, অনেক গুরুতর বাধাবিঘ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনে কর, এই তত্ত্বের কোন আধিভৌতিক উপদেষ্টা অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গেছেন ; তিনি তাঁহাকে কি উপদেশ দিতেন ? ইহাই না কি যে, ভারতীয় যুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইলে, যদি অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীষ্মকে বধ করিয়াও যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য" ? বাহ্যদৃষ্টিতে এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ ও সরল বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, উহার অপূর্ণতা ও বাধা বুঝা যায়। অধিক অর্থে কত লোক ? পাণ্ডবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লোক ; পাণ্ডবদিগের পরাজয় হইলে এই এগারো অক্ষৌহিণী সুখ হইত,—এই যুক্তিবাদে, পাণ্ডবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে কি ? শুধু ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতিমত্তার নির্ণয় করা ভুল। লক্ষ দুর্জ্জনের সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন সজ্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্য্য,—ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল লোকই এইরূপ বুঝিয়া থাকে। এই ধারণা সত্য হইলে, এক সজ্জনের সুখকে লক্ষ দুর্জ্জনের সুখাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয় ; এবং ঐরূপ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখই" নীতিমত্তার পরীক্ষার একমাত্র সাধন, এই প্রথম সিদ্ধান্তটি ঐ পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে যে বিষয়কে কখন কখন সুখাবহ বলিয়া মনে করে, তাহাই দূরদর্শী ব্যক্তি পরিণামে সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক মনে করেন দেখা যায়। উদাহরণ যথা—সক্রেটিস্ ও যীশুখৃষ্ট। দুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত কল্যাণজনক জানিয়া তদনুসারে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশভাইরা তাঁহাদিগকে "সমাজের শত্রু" মনে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য "দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত"

ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ের জনসাধারণ ও জননায়ক উভয়েই মিলিতভাবে "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্ব ধরিয়াই কাজ করিয়াছিল ; কিন্তু এখন আমরা বলিতে পারি না যে, সাধারণ লোকের আচরণ ন্যায্য হইয়াছিল। সারকথা, "অধিক লোকের অধিক সুখ"ই নীতির মূলতত্ত্ব—ইহা যদি মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করা যায় তথাপি, তাহা দ্বারা লক্ষকোটী লোকের সুখ কিসে হয় এবং কি করিয়া তাহা স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। সাধারণতঃ, যে সকল লোকের সুখদুঃখসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই সকল লোকের হস্তেই ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রসঙ্গে, এতটা হ্যাঙ্গাম হুজ্জত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না ; এবং যখন কোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তখন নিজের সুখ কিসে হয় ইহার নির্ভুল বিচার করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত হয় না। এই অবস্থায় ভূতের হাতে জ্বলন্ত কাঠ দিলে যে পরিণাম হয়, "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই নীতিতত্ত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে ঐরূপ পরিণামই হইয়া থাকে। ইহা উপরি-উক্ত দুই উদাহরণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। "আমাদের এই নীতিধর্ম্মের তত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা যদি তাহার অপব্যবহার করে, আমরা তাহার কি করিব ?" এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন তত্ত্ব সত্য হইলেও তাহার উপযোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী ইহার উপযোগ কখন্ ও কিরূপে করিবে,—ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মও ঐ তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ, সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থ মনে করিয়া আমাদের অর্থকে অনর্থে পরিণত করাই সম্ভব।

কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয় না, এবং অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিবার কোনো বাহ্য সাধন নাই। এই দুই আপত্তি ছাড়া, এই মার্গ সম্বন্ধে আরও গুরুতর আপত্তি আনা যাইতে পারে। উদাহরণ যথা, বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, কোন কার্য্যের শুধু বাহ্য পরিণাম ধরিয়া সেই কার্য্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসা অনেক সময় করিতে পারা যায় না। কোন ঘড়ি ঠিক্ সময় রাখে কি না, তাহা ধরিয়াই ঐ ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণয় করি সত্য ; কিন্তু মনুষ্যের কার্য্যে এই ন্যায় প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। সজ্জনমাত্রেই জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু উল্টাপক্ষে, যে কোন লোক লোকহিতের চেষ্টা করিবে সে-ই যে সাধু হইবে এরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক। যন্ত্র ও মনুষ্যের মধ্যে যদি কোন ভেদ থাকে, তাহা এই যে, যন্ত্র হৃদয়হীন ও মনুষ্য হৃদয়যুক্ত ; এবং সেই জন্যই, অজ্ঞান কিংবা ভুলক্রমে যদি কাহারো অপরাধ হয় আইনে তাহা মার্জ্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাৎপর্য্য,—কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, নীতিমূলক কি অনীতিমূলক, শুধু বাহ্য ফল বা পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক সুখ হইবে কি না এই মাত্র দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না ; উক্ত কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, বা হেতু কিরূপ সে সম্বন্ধেও দেখিতে

হইবে। একবার আমেরিকার কোন বড় সহরে সকল লোকের সুখ ও সুবিধার জন্য ট্রামওয়ে করা সম্ভব ছিল না। সরকারী মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল। তখন ট্রামওয়ের ব্যবস্থাপক, অধিকারীদিগকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়া শীঘ্র মঞ্জুরী বাহির করিয়া লইলেন। ট্রামওয়ে হইয়া গেল এবং তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সুবিধা ও উপকার হইল। কিছুদিন পরে ঘুষ দিবার কথা প্রকাশ হওয়ায় ব্যবস্থাপকের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হইল। প্রথম "জুরি একমত না হওয়ায়, অন্য "জুরি" নির্ব্বাচিত হইল ; এবং সেই জুরি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করায় ট্রামওয়ে ব্যবস্থাপকের দণ্ড হইল। এই স্থলে, অধিক লোকের অধিক সুখ এই নীতিতত্ত্ব ধরিয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে না ; ঘুষ দিবার দরুণ ট্রামওয়ে হইল—এই বাহ্য পরিণামে অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার কথা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইরূপ ঘুষ দিয়া কার্য্য উদ্ধার করাটা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই।* আমাদের কর্তব্য মনে করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করা, এবং কীর্ত্তির জন্য বা অন্য কোন ফল-কামনায় দান করা—এই দুই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম হইলেও প্রথম প্রকারের দান সাত্ত্বিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক—ভগবদ্‌গীতায় এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে (গী, ১৭. ২০. ২১)। এবং ঐ দান কুপাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা তামসিক বা গর্হিত বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। কোন গরীব লোক কোন ধর্ম্মকার্য্যে চারি পয়সা দিলে এবং সেই একই কার্য্যে কোন ধনবান ব্যক্তি একশো টাকা দিলে, উভয়েরই নৈতিক যোগ্যতা জনসাধারণের নিকট সমান বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু কেবল "অধিক লোকের অধিক হিত" এই বাহ্য সাধনের দ্বারা যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে এই দুই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান যোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয়। "অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক নীতিতত্ত্বের একটি মস্ত দোষ এই যে, কর্ত্তার মনোগত অভিপ্রায় বা ভাবের কোন বিচার উহাতে হয় না ; এবং মনোগত অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বাহ্য সুখই নীতিমত্তার কষ্টিপাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক ব্যক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্ত্তৃক প্রণীত আইন বা নিয়ম উচিত কি অনুচিত বিচার করিবার সময় সভাসদ্‌দিগের অন্তঃকরণ কিরূপ ছিল তাহা দেখিবার কোন হেতু থাকে না ; তাহাদের কৃত আইন হইতে, অধিক লোকের সুখ হইবে কি না, এই বাহ্য বিচার করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু অন্য স্থলে ঐ ন্যায় খাটে না, তাহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে। "অধিক লোকের অধিক হিত বা সুখ" একেবারেই অনুপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ্য পরিণামের বিচার করিতে হইলে, এই বাহ্য তত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া অনেক প্রসঙ্গে অন্য বিষয়েও বিচার করা আবশ্যক হয়। সুতরাং নীতিতত্ত্বনির্ণয় শুধু এই তত্ত্বের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিত ও নির্দ্দোষ তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। "কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" (গী.২. ৪৯) এই যে কথা গীতার আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে, তাহারও ইহাই অভিপ্রায়। শুধু বাহ্য কর্ম্মের উপর দৃষ্টি রাখিলে অনেক সময় ভ্রমে পড়িতে হয়। "স্নান, সন্ধ্যা, তিলক,

* পল্‌ কেরসের "The Ethical Problem" গ্রন্থ হইতে এই উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে।

মালা" ইত্যাদি বাহ্য কর্ম্ম স্থির রাখিলেও "অন্তরে ক্রোধের জ্বালা" জ্বলিতে থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু উল্টাপক্ষে অন্তরের ভাব শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্ম্মের কোন গুরুত্বই থাকে না ; সাধারণ লোকের নিকট সুদামের প্রদত্ত একমুষ্ঠি চাউল দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প বাহ্য কর্ম্মের ধর্ম্মসংগত ও নীতিসংগত যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক সুখদায়ী বিশ মণ অন্নের সমান। তাই, জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট, *কর্ম্মের বাহ্য ও প্রত্যক্ষ পরিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি-শাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক সুখবাদের এই প্রধান ত্রুটি আধিভৌতিকবাদীদিগের যে নজরে পড়ে নাই তাহা নহে। হিউম স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যখন মনুষ্যের কর্ম্ম তাহার স্বভাবের দ্যোতক হয়, এবং সেই কারণে যখন লোকেরা উহাই নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করে, তখন কেবল বাহ্য পরিণাম ধরিয়া ঐ কর্ম্ম স্তুত্য বা নিন্দনীয় তাহা স্থির করা অসম্ভব।† "কর্ত্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের নীতিমত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নির্ভর করে" এই কথা মিল সাহেবেরও অভিমত। কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনার্থ মিল এই সম্বন্ধে এইরূপ কূটতর্ক করেন যে, "যে পর্য্যন্ত বাহ্য কর্ম্মের মধ্যে কোন ভেদ না হয় সে পর্য্যন্ত কর্ত্তার উহা করিবার যে কোন বাসনা হউক না কেন তাহার দ্বারা কর্ম্মের নীতিমত্তার কোন ইতর বিশেষ হয় না।"‡ মিলের এই তর্কে সাম্প্রদায়িক আগ্রহ দেখা যায় ; কারণ, বুদ্ধি পৃথক হওয়া প্রযুক্ত, দুই কর্ম্ম দেখিতে এক হইলেও, তত্ত্বতঃ উহা একই মূল্যের কখনই হইতে পারে না। তাই "যে পর্য্যন্ত (বাহ্য) কর্ম্মের মধ্যে ভেদ না হয়" ইত্যাদি মিলের নিয়মটিও নির্ম্মূল হইয়া পড়ে, ইহা গ্রীনসাহেব উত্তরে বলিয়াছেন। ‡‡ গীতার অভি-প্রায়ও তাহাই। কারণ, দুই ব্যক্তি একই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য একই রকমের দান করিলেও, উভয়ের বুদ্ধিভেদমূলে এক দান সাত্ত্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে, ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলনা করিবার সময় পরে করিব। এক্ষণে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, কর্ম্মের নিছক বাহ্য পরিণামের উপর নির্ভরকারী আধিভৌতিক সুখবাদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীও নীতি-নির্ণয়কার্য্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ হইতেছে ; এবং ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য মিলের উপরি-উক্ত স্বীকৃতিই আমাদের মতে যথেষ্ট।

* Kant's Theory of Ethics (Tran. by Abbott) 6th Ed. p. 6

† "For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that thay can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects",—Human's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII, Part II. (P. 368 of Hume's Essay, the World Library Edition.)

‡ "Morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent wills to do. But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality" Mill's Utlitarianism P. 27.

‡‡ Green's Prolegomena to Ethics § 202 note. P. 348, 5th Cheaper Edition.

"অধিক লোকের অধিক সুখ" এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্ত্তার বুদ্ধির বা ভাবের কোন বিচারই হয় না, ইহাই সবচেয়ে বড় দোষ। মিলের উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে যে, তাঁহার যুক্তিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও সব সময়ে তাঁহার একইপ্রকার উপযোগ করা যাইতে পারে না ; কারণ উহা কেবল বাহ্য ফল ধরিয়া নীতিনির্ণয় করে, অর্থাৎ তাহার উপযোগ একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ, সুতরাং একদেশদর্শী। কিন্তু ইহা ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা আপত্তি আছে যে, 'স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ কেন এবং কিসে শ্রেষ্ঠ তাহার কোন যুক্তি না বলিয়া ইহারা এই তত্ত্বকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়েন। ফলে দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের অপ্রতিহত বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়, তবে স্বার্থ অপেক্ষা "অধিক লোকের সুখ" এই তত্ত্বের অধিকতর গুরুত্ব আমি কেন মানিব? তুমি অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ দেখিয়া এইরূপ কর, ঐ প্রশ্নের ইহা সন্তোষজনক উত্তর হইতেই পারে না ; কারণ "অধিক লোকের অধিক সুখ" আমরা কেন করিব, ইহাই হইল মূল প্রশ্ন। লোকের হিত করিলে প্রায় আপনারও হিত হয় বলিয়া এই প্রশ্ন সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় বর্গ হইতে এই শেষের অর্থাৎ চতুর্থ বর্গের বিশেষত্ব এই যে এই আধিভৌতিক মার্গের লোকেরা মনে করে যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞাতদীপ্ত স্বার্থের মার্গ অনুসরণ না করিয়া, উচ্চ স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ সাধনেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই আধিভৌতিক মার্গের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন যুক্তি দেখানো হয় নাই। এই অভাব এই মার্গের এক আধিভৌতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ে। তিনি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন আপনার মতোই আপনার সন্তানসন্ততি ও জাতিকে পরিপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট না দিয়া আপন বন্ধুদিগকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা—এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত আকারে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বলা যাইতে পারে যে, সজীব সৃষ্টির আচরণের এই পরস্পরকে সাহায্য করা একটি মুখ্য ভাব। সজীব সৃষ্টির এই ভাবটি প্রথমতঃ সন্তানোৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ-পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতি-সূক্ষ্ম কীটজগতের মধ্যেও দেখা যায় যে, কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া গিয়া উহা দুই কীটে পরিণত হয়। সন্ততির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসর্জ্জন করে বলিলেও চলে। সেইরূপ আবার, সজীব সৃষ্টির মধ্যে এই কীটের উপর-উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরুষাত্মক প্রাণীও আপন সন্ততি রক্ষণার্থ স্বার্থত্যাগের আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে ; এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া মনুষ্যজাতির নিতান্ত বন্য অসভ্য সমাজের মধ্যেও দেখা যায় যে, শুধু আপন সন্ততিকে নহে, আপন জাতভাই-দিগকেও আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, পরার্থের কাজেও স্বার্থের মতোই সুখ অনুভব করা, সমস্ত-সৃষ্টির এই যে মুখ্য ভাব, এই ভাবটিকে আরও সম্মুখে

অগ্রসর করিয়া দিয়া স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধটি একেবারে বহিষ্কৃত করিবার প্রযত্ন সজীব সৃষ্টির শিরোমণি মনুষ্যের কর্ত্তব্য। * ব্যস্, ইহাতেই উহার কর্ত্তব্যের শেষ। এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক। পরোপকার করিবার সদ্গুণ, মূক-সৃষ্টির মধ্যেও সন্ততিরক্ষণব্যাপারে পাওয়া যায়, অতএব উহার পরমোৎকর্ষ সাধন করাই জ্ঞানবান মনুষ্যের পুরুষার্থ, এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। এই তত্ত্বের বিশেষত্ব কেবল এইটুকু যে, আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান অধুনা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় এই তত্ত্বের আধিভৌতিক উপপত্তি ভাল করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কথিত হইয়াছে যে,—

অষ্টাদশপুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

"পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ—ইহাই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা"। ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন যে, "স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমান্ একঃ সতাং অগ্রণীঃ" পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই সমস্ত সজ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভাল, এখন ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে আনিলে আর একটি প্রশ্ন বাহির হয় যে, মনুষ্যে কেবল পরোপকারবুদ্ধিরই কি উৎকর্ষ হইয়াছে, অথবা তাহার সঙ্গে ন্যায়বুদ্ধি, দয়া, উদারতা, দূরদৃষ্টি, তর্ক, শৌর্য, ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি অন্য সাত্ত্বিক গুণেরও বৃদ্ধি হইয়াছে? এই বিষয়ে বিচার করিলে পর বলিতে হয় যে, অন্য সমস্ত সজীব প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্গুণের উৎকর্ষ হইয়াছে। এই সমস্ত সাত্ত্বিক গুণসমূহের সমুচ্চয়কে আমরা মনুষ্যত্ব নামে অভিহিত করি। এক্ষণে ইহা সিদ্ধ হইলে যে পরোপকার অপেক্ষা "মনুষ্যত্ব"কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি ; এ অবস্থাতে কোনো কর্ম্মের ঔচিত্য অনৌচিত্য বা নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্ম্মের পরীক্ষা কেবল পরোপকারের দিক দিয়া করা যায় না— "মনুষ্যত্বের" দৃষ্টিতে, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে অন্য প্রাণী অপেক্ষা যে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখা যায়, সেই সমস্ত গুণের দৃষ্টিতে উক্ত কর্ম্মের পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কেবল এক পরোপকারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পরিবর্তে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, সমস্ত মনুষ্যেরা "মনুষ্যপণা" বা "মনুষ্যত্ব" যে কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা "মনুষ্যত্ব" যে কর্ম্মের দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাই সৎকার্য্য, তাহাই নীতিধর্ম্ম। এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অনুসরণ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখ" উক্ত দৃষ্টির একটা স্বল্প অংশ হইয়া যাইবে—কেবল এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই সমস্ত কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা নীতিমত্তার বিচার করিতে হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর করা যায় না ; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ের জন্য মনুষ্যত্বেরই বিচার করা আবশ্যক হইবে। "মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যপণা"র যথার্থ স্বরূপ কি, তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে যাজ্ঞবল্ক্যের

* এই মতবাদ স্পেনসারের Data of Ethics গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের মত ও মিলের মতের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের মধ্যে বিবৃত হওয়ায়, ঐ পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। PP. 57, 123, Also see Pain's Mental and Moral Science PP. 721, 722, (1875).

উক্তি অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই বিষয় স্বভাবতই উপস্থিত হয়। নীতিশাস্ত্রের বিচারক এক মার্কিন গ্রন্থকার এই সমুচ্চয়াত্মক মনুষ্যধর্ম্মকেই 'আত্মা' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

নিছক স্বার্থ বা নিজের বিষয়-সুখের কনিষ্ঠ শ্রেণী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে আধিভৌতিক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মনুষ্যত্বের শ্রেণী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছেন তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব-বিষয়েও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের বাহ্য বিষয়সুখেরই কল্পনা মুখ্য হয়; অতএব যাহাতে অন্তঃশুদ্ধি ও অন্তঃসুখের বিচার আমলে না আসে, আধিভৌতিকবাদীদিগের সেই শেষের শ্রেণীও আমাদিগের অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রকারের মতে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। মনুষ্যের সমস্ত চেষ্টা-প্রযত্ন, সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবারণার্থ হইয়া থাকে, ইহা সাধারণতঃ স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্যসুখ আধিভৌতিক অর্থাৎ ঐহিক বিষয়োপভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণয় ব্যতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষই গ্রাহ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, ইহা আধিভৌতিক-বাদীও স্বীকার করেন। পশুরা যে-যে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ সেই সমস্ত সুখ কোন মনুষ্যকে দিয়া, তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুই পশু হইতে রাজি আছিস্ কি?" —একজন মনুষ্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না। সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানের গভীর বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে এক প্রকার শান্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, ঐহিক সম্পত্তি কিংবা বাহ্য উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক, একথা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিতে হইবে না। ভাল; লোকমতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীতিমত্তা-নির্ণয় শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না; মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা কেবল আধিভৌতিক সুখের জন্যই করে না, আধিভৌতিক সুখকেই পরম সাধ্য বলিয়া মানে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু বাহ্য সুখ কেন, প্রসঙ্গবিশেষ আসিলে জীবনেও পরোয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ সেই সময়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সত্যাদি যে সকল নীতিধর্ম্মের যোগ্যতা নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক, সেই সকল পালন করিবার জন্য মনোনিগ্রহেতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। অর্জ্জুনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অর্জ্জুনেরও প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, যুদ্ধ করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার এই প্রশ্ন ছিল যে, "আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহা আমাকে বল" (গী. ২. ৭; ৩. ২)। আত্মার এই নিত্যকালের শ্রেয় ও সুখ, আত্মার শান্তিতে আছে। তাই ঐহিক সুখ কিংবা সম্পত্তি যতই পাওয়া যাক না কেন, শুধু তাহাতে এই আত্মসুখ কিংবা শান্তিলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (বৃ, ২. ৪. ২)। এই প্রকার কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, মৃত্যু নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পশু ধান্য দ্রব্য প্রভৃতি বহু প্রকার ঐহিক সম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট জবাব দিলেন—"আমি আত্মবিদ্যা চাই, আমি সম্পত্তি চাই না; এবং প্রেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক ঐহিক সুখ এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত কল্যাণ এই দুয়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়া বলিলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে॥

"প্রেয় (ক্ষণিক বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখ) এবং শ্রেয় (প্রকৃত চিরন্তন কল্যাণ) এই দুই মনুষ্যের সম্মুখে আসিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য ঐ দুয়ের মধ্যে একটিকে বাছাই করিয়া লয়েন। সুবুদ্ধি যিনি, তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে অধিক পছন্দ করেন; কিন্তু মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট আত্মকল্যাণ অপেক্ষা প্রেয় অর্থাৎ বাহ্য সুখই অধিক প্রিয়," (কঠ, ১. ২. ২)। তাই, সংসারের ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়সুখই এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য, এবং মনুষ্য যাহা কিছু করে সে সকলই কেবল বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক সুখের জন্য অথবা নিজের দুঃখনিবারণার্থই করিয়া থাকে এরূপ মনে করা ঠিক নহে।

ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অন্তঃসুখের যোগ্যতা অধিক তো আছেই; কিন্তু তাহার সঙ্গে একটি কথা এই যে, বিষয়সুখ আজ আছে, কাল নাই, অর্থাৎ বিষয়সুখ অনিত্য। নীতিধর্ম্মে, একথা খাটে না। সকল লোকেই মানিয়া থাকে যে, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম কোন বাহ্য উপাধির উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বাহ্য সুখদুঃখকে অবলম্বন করিয়া নাই; সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপ্রসঙ্গে তাহা একই প্রকার, সুতরাং নিত্য। বাহ্য বিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে না সেই নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার কারণ কি? আধিভৌতিকবাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, বাহ্য সৃষ্টির সুখদুঃখ অবলোকন করিয়া কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখদুঃখ স্বভাবতই অনিত্য হওয়ায়, উহাদের অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত নীতিসিদ্ধান্তও ঐরূপ কাঁচা অর্থাৎ অনিত্য হইবে। এবং এই অবস্থাতে সুখদুঃখের কোনও পরোয়া না করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল—ত্রিকালে অবাধিত এই সত্যধর্ম্মের যে নিত্যতা তাহা "অধিক লোকের সুখ"—এই তত্ত্বের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে এই আপত্তি করা যায় যে, যখন সাধারণ ব্যবহারে সত্যের জন্য প্রাণ দিবার সময় উপস্থিত হইলে ভাল ভাল লোকও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সংকোচ করেন না, এবং শাস্ত্রকারেরাও এরূপ সময়ে খুব টানিয়া ধরেন না, তখন সত্যাদি ধর্ম্মের নিত্যতা কেন স্বীকার করি? কিন্তু এই আপত্তি ঠিক নহে। কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যাহার সাহস হয় না সেও এই নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব নিজ মুখে স্বীকার করিয়াই থাকে। এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুষার্থ যাহা দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই সকল ব্যবহারিক ধর্ম্মের বিচার আলোচনা করিয়া শেষে ভারত-সাবিত্রীতে (এবং বিদুরনীতিতেও) ব্যাসদেব সকল লোককে এই উপদেশ দিয়াছেন—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

"সুখদুঃখ অনিত্য, কিন্তু (নীতি-) ধর্ম্ম নিত্য; অতএব, সুখেচ্ছায়, ভয়ে, লোভে, অথবা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও, ধর্ম্মকে কখনই ছাড়িবে না। জীব নিত্য, তাহার হেতু অর্থাৎ সুখদুঃখাদি বিষয় অনিত্য"। অতএব; ব্যাসদেব উপদেশ দিতেছেন যে, অনিত্য সুখদুঃখের বিচার করিতে না বসিয়া, নিত্য ধর্ম্মের সঙ্গেই নিত্য জীবকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য (মভা, স্ব, ৫. ৬০; উ, ৩৯. ১২. ১৩)। ব্যাসের এই উপদেশ কতটা যোগ্য ইহা দেখিবার জন্য, সুখদুঃখের প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং নিত্য সুখ কাহাকে বলে,—এক্ষণে তাহার বিচার করা আবশ্যক।

ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

———

পঞ্চম প্রকরণ

সুখদুঃখবিবেক

সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।*

গীতা ৬. ২১ ।

সুখ পাইবার জন্য কিংবা প্রাপ্ত সুখের বৃদ্ধির জন্য, দুঃখ নিবারণ বা লাঘব করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে ; এই সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। "ইহ খলু অমুষ্মিংশ্চ লোকে বস্তুপ্রবৃত্তয়ঃ সুখার্থমভিধীয়ন্তে। ন হ্যতঃপরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্টতরমস্তি।" (মভা. শা. ১৯০.৯)। ইহলোকে কিংবা পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত ; ইহার অতিরিক্ত ধর্ম্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, ইহা শান্তিপর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রকৃত সুখ কিসে হয় ইহা না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বাঁধিয়া তাহাই খাঁটি মনে করিয়া মিথ্যা সুখকেই সত্য সুখ মনে করে ; এবং আজ না হয় কাল সুখ নিশ্চয়ই মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, জীবন কাটাইতে থাকে। ইহাতেই তাহাকে একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়। তথাপি সে সাবধান না হইয়া পুনর্ব্বার তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই ভাবে এই ভবচক্র চলিতেছে, কেহই প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, তাহার বিচার করে না। সংসার কেবল দুঃখময়, কিংবা সুখপ্রধান বা দুঃখপ্রধান, এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই সকল মতবাদীদিগের সকলেরই ইহা স্বীকৃত যে, দুঃখের অত্যন্ত নিবারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত সুখ প্রাপ্তির কার্য্যেই মনুষ্যের কল্যাণ।

'সুখ' শব্দের পরিবর্তে প্রায় 'হিত', 'শ্রেয়', 'কল্যাণ' এই সকল শব্দ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। 'সুখ' শব্দের ভিতর সর্ব্বপ্রকারের সুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, সুখের নিমিত্ত প্রত্যেকের প্রযত্ন হইয়া থাকে, এ কথা সাধারণত বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার মূলে "যদিষ্টং তৎসুখং প্রাহুঃ দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে"—আপনার যাহা কিছু ইষ্ট তাহাই সুখ এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা চাহি না তাহাই দুঃখ—এইরূপ সুখদুঃখের যে লক্ষণ মহাভারতের অন্তর্গত পরাশরগীতায় বিবৃত হইয়াছে (মভা. শাং ২৯৫.২৭), শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ ইষ্ট বস্তু বা পদার্থ হইলেও হইতে পারে ; এবং এইরূপ অর্থ ধরিলে, ইষ্ট পদার্থকেও সুখ বলিতে হয়। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, 'জল' এই বাহ্য পদার্থকে 'সুখ' নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা মানুষের বলিতে হয় যে, সে সুখেতে ডুবিতেছে। ইহাই সত্য যে, জলপানে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় তাহাই সুখ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মনুষ্য এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে বা সুখকেই চাহে ; কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ যাহা চাহিবে তাহাই যে সমস্ত সুখ হইবে, এরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। এই কারণে নৈয়ায়িকেরা "অনুকূল-বেদনীয়ং সুখং", যে

* "যাহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় তাহাই আত্যন্তিক সুখ।"

বেদনা আমাদের অনুকূল তাহাই সুখ এবং "প্রতিকূল-বেদনীয়ং দুঃখং"—যে বেদনা আমাদের প্রতিকূল তাহাই দুঃখ, এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়ই একপ্রকার বেদনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং অনুভবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা সুখদুঃখের কোন সুন্দরতর লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। এই বেদনারূপ সুখদুঃখ, কেবল মনুষ্যের ব্যাপারাদিতেই সমুদ্ভূত হয়, ইহা বলা ঠিক নহে ; কারণ, কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্তও কঠিন রোগ উৎপন্ন হইবার ফলে মনুষ্যকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই, বেদান্তগ্রন্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—সুখদুঃখের এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে যে সুখদুঃখ অনুভূত হয় তাহাকে "আধিদৈবিক" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয় ; বাহ্য জগতের পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাত্মক পদার্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে শীতোষ্ণাদিমূলক যে সুখ-দুঃখ হয় তাহাকে "আধিভৌতিক" নাম দেওয়া হয় ; এবং এই প্রকারের বাহ্য সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত সুখ-দুঃখ "আধ্যাত্মিক" নামে অভিহিত হয়। সুখদুঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে শরীরান্তর্ভূত বাতপিত্তাদি দোষের পরিণাম বিকৃত হইয়া যে জ্বরাদি দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম ঠিক্ থাকিলে শরীরপ্রকৃতির যে স্বাস্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যাত্মিক সুখদুঃখের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, এই সুখ দুঃখ পঞ্চভূতাত্মা শরীরান্তর্ভূত হইলেও অর্থাৎ শারীরিক হইলেও, শরীরের বাহিরের পদার্থসংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা সব সময়ে বলা যাইতে পারে না, এবং সেই জন্য, বেদান্তদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুখদুঃখেরও পুনরায় কায়িক ও মানসিক এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এইপ্রকার সুখদুঃখের কায়িক ও মানসিক এই দুই ভেদ করিলে, আবার আধিদৈবিক সুখদুঃখকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, দেবতার প্রসাদে কিংবা কোপে সমুৎপন্ন সুখদুঃখকেও, মনুষ্যের নিজের শরীরে কিংবা মনে ভোগ করিতে হয়, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। তাই আমি এই গ্রন্থে বেদান্ত গ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে সুখদুঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়া উহাদের বাহ্য বা কায়িক এবং আভ্যন্তর বা মানসিক এই দুই বর্গই কল্পনা করিয়া, প্রথম অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কায়িক সুখদুঃখকে "আধিভৌতিক" এবং সমস্ত মানসিক সুখদুঃখকে "আধ্যাত্মিক" এই নামে অভিহিত করিয়াছি। বেদান্তগ্রন্থের 'আধিদৈবিক' বলিয়া স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাই। কারণ, আমার মতে সুখদুঃখের শাস্ত্রীয় বিচার করিবার পক্ষে এই দ্বিবিধ বর্গীকরণই অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ। সুখদুঃখের পরবর্তী বিচার পড়িবার সময়, বেদান্তগ্রন্থের ও আমার পরিভাষার ভেদ সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক।

সুখদুঃখে দ্বিবিধই স্বীকার কর, বা ত্রিবিধই স্বীকার কর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, দুঃখ কেহই চাহে না। তাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং আত্যন্তিক ও নিত্য সুখ অর্জ্জন করাই মনুষ্যের পুরুষার্থ, এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১ ; গী. ৬. ২১, ২২)। এইরূপ আত্যন্তিক সুখই মনুষ্যের পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে যে, অত্যন্ত সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ করা সাধ্যায়ত্ত কি না, সাধ্যায়ত্ত হইলে কিরূপে ও কখন লাভ

হইতে পারে ইত্যাদি। এবং এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, নৈয়ায়িকদিগের প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সুখ ও দুঃখ কি দুই বিভিন্ন স্বতন্ত্র বেদনা, অনুভূতি বা বস্তু, অথবা "আলোক না হইলেই অন্ধকার" এই ন্যায় অনুসারে এই দুই বেদনার মধ্যে একের অভাব হইলেই কি দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপযোগ করা হয়? ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—"তৃষ্ণায় ঠোঁট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ নিবারণার্থ আমরা মিষ্ট জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে সুগ্রাস অন্ন খাইয়া সেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসনা প্রদীপ্ত হইয়া দুঃসহ হইলে স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা তাহা তৃপ্ত করি"; এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—

"প্রতীকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ।"

কোন ব্যাধি বা দুঃখ হইলে, তাহার নিবারণ বা প্রতীকারকেই লোকে ভ্রমক্রমে সুখ বলে। দুঃখনিবারণের অতিরিক্ত সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। উক্ত সিদ্ধান্ত মনুষ্যের স্বার্থমূলক ব্যবহারসমূহের বিষয়েই যে কেবল খাটে তাহা নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার দুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরে জাগ্রত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইয়া থাকে, এবং সেই দুঃসহত্বের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আমরা পরোপকার করি,—ইহা যে আনন্দগিরির মত, তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার করিলে মহাভারতের অনুসরণে মানিতে হয় যে,—

"তৃষ্ণার্ত্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্ত্তিপ্রভবং সুখং।"

প্রথমে কোন বিষয়ের তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্ণার পীড়া হইতে দুঃখ হয় এবং সেই দুঃখের পীড়া হইতে পুনরায় সুখ উদ্ভূত হয় (শাং, ২৫. ২২; ১৭৪. ১৯)। সংক্ষেপে এই মার্গের উক্তি এই যে, মনুষ্যের মনে প্রথমত কোন আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, উক্ত দুঃখের নিবারণই সুখ; সুখ বলিয়া স্বতন্ত্র পৃথক কোন বস্তু নাই। অধিক কি, এই মার্গের লোকেরা এই অনুমানও বাহির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সাংসারিক সমস্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক ও তৃষ্ণাত্মক; যে পর্য্যন্ত সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মের ত্যাগ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত বাসনা বা তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয় না; তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকে (বৃ, ৪. ৪. ২২; বেসূ ৩. ৪. ১৫) বিকল্পভাবে এবং জাবালসন্ন্যাসাদি উপনিষদে মুখ্যভাবে এই মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেইরূপ অষ্টাবক্রগীতাতে (৯. ৮; ১০. ৩৮) এবং অবধূতগীতাতে (৩. ৪৬) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। এই মার্গের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখ বা মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যক। স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিযুগে স্থাপিত শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ এই তত্ত্বের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। সত্য; সুখ বলিয়া যদি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে, যাহা কিছু আছে তাহা যদি শুধু দুঃখই হয় এবং তাহাও তৃষ্ণামূলক হয়, তাহা হইলে এই তৃষ্ণাদিরই বিকারই প্রথমতঃ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে স্বার্থের ও পরার্থের সমস্ত কচকচি আপনিই বিলুপ্ত হইবে, এবং মনের মূল সাম্যাবস্থা ও শান্তি থাকিয়া যাইবে। এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত পিঙ্গলগীতায় এবং মঙ্কিগীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে,—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

"ইহলোকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃপ্তিতে যে সুখ হয় এবং স্বর্গের যে মহৎ সুখ—এই দুই সুখের যোগ্যতা তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোল কলারও সমান নহে" (শাং, ১৭৪. ৪৮; ১৭৭. ৪৯)। পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে বৈদিক সন্ন্যাস মার্গেরই অনুকরণ করা হইয়াছে। তাই, এই দুই ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহে তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ও ত্যাজ্যতা উপরি উক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্থানে স্থানে একটু বেশী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ, ধর্ম্মপদের অন্তর্ভূত তৃষ্ণাবর্গ দেখ)। তিব্বতদেশস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতের উক্ত শ্লোক, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর গৌতম বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। *

উপরি-উক্ত তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হয় নাই এরূপ নহে। তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, গীতার এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায়, সুখদুঃখের উক্ত উপপত্তি সম্বন্ধে একটু সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। তৃষ্ণাদি দুঃখের নিবারণ হইতেই সমস্ত সুখ উৎপন্ন হয়, সন্ন্যাসমার্গের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। একবার অনুভূত (দৃষ্ট শ্রুত প্রভৃতি) কোন বস্তু পুনর্ব্বার চাহিলেই তাহাকে 'কাম,' 'বাসনা' বা 'ইচ্ছা' বলা হইয়া থাকে। ঈপ্সিত বস্তু শীঘ্র না পাইলে দুঃখ হয়; এবং এই ইচ্ছা আরও তীব্র হইতে থাকিলে, কিংবা প্রাপ্ত সুখ পূর্ণ মাত্রায় না হওয়ায় উহার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাকিলে সেই ইচ্ছাকে তৃষ্ণা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল ইচ্ছা এইরূপে তৃষ্ণার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তজ্জনিত সুখ তৃষ্ণাদুঃখের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমি বলিতে পারি না। উদাহরণ যথা—প্রতিদিন আহার যথা সময়ে প্রাপ্ত হইলে, আহারের পূর্ব্বে দুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের অনুভব হয় না। সময়মত আহার না মিলিলে প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ হইবে না। ভাল; যদি স্বীকার করা যায় যে, তৃষ্ণা বা ইচ্ছা একই অর্থবাচক শব্দ, তাহা হইলেও সমস্ত সুখই তৃষ্ণামূলক, এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। উদাহরণ যথা—একটি ছোট ছেলের মুখে অকস্মাৎ মিছরির এক টুক্‌রো দিলে তাহার যে সুখ হয়, সে সুখ তাহার পূর্ব্বতৃষ্ণার ক্ষয়প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। সেইরূপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীয় উদ্যান হইতে কোকিলের মধুর ডাক কানে আসিলে এ কথা বলা যায় না যে, সেই মধুর ধ্বনি শোনা প্রযুক্ত যে সুখ, সেই সুখ আমি পূর্ব্বেই ইচ্ছা করিয়া বসিয়াছিলাম। এই কথাই ঠিক যে, সুখের ইচ্ছা না করিলেও ঐ সময় আমি সুখ পাইয়াছিলাম। এই উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে এইরূপ বলিতে হয় যে, সন্ন্যাসমার্গের অবলম্বিত সুখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং ইহাও বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়সমূহের ভাল-মন্দ পদার্থের উপভোগ করিবার স্বাভাবিক শক্তি থাকাতে ইন্দ্রিয়গণ যখন আপনাপন ব্যাপার সম্পাদন করে, এবং যদি কোন সময়ে তাহাদের অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্তি হয়, তখন গোড়ায়

* Rockhill's Life of Budha P. 33, উদান নামক পালি গ্রন্থে (২, ২) এই শ্লোকটি আছে। কিন্তু উহাতে এরূপ বলা হয় নাই যে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সময়, বুদ্ধের মুখ হইতে এই শ্লোক বাহির হইয়াছে ইহা হইতে এই শ্লোক সর্ব্বপ্রথম যে বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হয় নাই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

তৃষ্ণা বা ইচ্ছা না থাকিলেও, আমাদের সুখদুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই, "মাত্রাস্পর্শের" দ্বারা শীতোষ্ণাদির অনুভব ঘটিলে সুখদুঃখ হয়, গীতাতে এইরূপ কথিত হইয়াছে (গী. ২. ১৪)। সৃষ্টির অন্তর্গত বাহ্য পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে 'মাত্রা'। গীতার উক্ত পদের অর্থ এই যে, যখন ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ্য পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখন সুখদুঃখের বেদনা উৎপন্ন হয়। কর্ম্মযোগশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। কর্কশ আওয়াজ কানের কেন অপ্রিয় এবং জিহ্বার মধুর রস কেন প্রিয়, কিংবা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না নয়নের কেন আনন্দদায়ক মনে হয়, এ সকলের কারণ কেহই বলিতে পারে না। মধুর রস পাইলে জিহ্বা পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে আধিভৌতিক সুখের স্বরূপ কেবল ইন্দ্রিয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় এই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার চালাইতে থাকিলেই সুখ অনুভূত হয়, পরে তাহার পরিণাম যাহাই হোক্ না কেন। উদাহরণ যথা—কখনো কখনো এমন হয় যে, কোন চিন্তা মনে আসিলে ঐ বিচারসূচক শব্দ আপনিই মুখ দিয়া বাহির হয়। এই শব্দ কাহাকে জানাইবার জন্য বাহির হয় না; উল্টা, কত সময় এই সকল স্বাভাবিক ব্যাপারে মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা মৎলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা হয়। ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন অকারণ যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ এই যে, চলন ক্রিয়াতেই সেই সময় তাহাদের আনন্দ বোধ হয়। তাই, দুঃখের অভাবই সমস্ত সুখ এইরূপ না বলিয়া, 'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ' (গী. ৩. ৩৪) ইন্দ্রিয়সমূহে ও তাহাদের শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে যে রাগ (প্রেম) ও দ্বেষ থাকে, এই দুই প্রথম হইতেই 'ব্যবস্থিত' অর্থাৎ স্বতন্ত্রসিদ্ধ বলা হইয়াছে। এবং এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কল্যাণদায়ক হয় কিংবা সেগুলিকে আত্মার কল্যাণদায়ক করা যাইতে পারে। এই কারণে ভগবানের এই উপদেশ যে, ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিসমূহকে একেবারে বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে আমাদের আত্মার উপকারে আনিবার জন্য আপনার অধীনে রাখিবে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না। ভগবানের এই উপদেশ এবং তৃষ্ণা কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা, এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জগতের সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে, গীতার তাহা তাৎপর্য্য নহে; বরং উহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২৬) বলা হইয়াছে যে, কার্য্যকর্তাতে সম-বুদ্ধির সহিত ধৃতি ও উৎসাহ গুণও থাকা আবশ্যক। এই বিষয়ে অধিক বিচার আলোচনা পরে করিব। এখানে কেবল ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, 'সুখ' ও 'দুঃখ' দুই ভিন্ন বৃত্তি, কিংবা তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার অভিপ্রায় কি, তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইয়াছে। 'ক্ষেত্র' বস্তুটি কি তাহা বলিবার সময় সুখ ও দুঃখের পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে (গী ১৩. ৬)। শুধু তাহা নহে, 'সুখ' সত্ত্বগুণের লক্ষণ এবং 'তৃষ্ণা' রজোগুণের লক্ষণ (গী. ১৪. ৬, ৭), ইহাও উক্ত হইয়াছে; এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ দুই পৃথক্ পৃথক্। এই অনুসারেও ভগবদ্গীতার এইমত স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ উভয়ে পরস্পরের প্রতিযোগী এবং দুই পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে "কোন কর্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া ত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ হয় না, কিন্তু এই প্রকার ত্যাগ

রাজসিক উক্ত হয়" (গী. ১৮. ৮) এইরূপে যে রাজসিক ত্যাগের ন্যূনতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও "সমস্ত সুখই তৃষ্ণাক্ষয়মূলক", এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ।

সমস্ত সুখ তৃষ্ণাক্ষয়রূপ কিংবা দুঃখ-অভাবরূপ নহে এবং সুখ ও দুঃখ স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করিলেও এই দুই বেদনা পরস্পরবিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত আর একটি প্রশ্ন এই উঠে যে, যাহার দুঃখের একটুও অনুভব নাই, সে সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে কি না? কেহ কেহ বলেন যে দুঃখানুভব না হইলে সুখের মধুরতা উপলব্ধি করা যায় না। উল্টাপক্ষে, স্বর্গস্থ দেবতাদিগের নিত্য সুখের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখের পূর্ব্বানুভব অত্যাবশ্যক নহে। লবণাক্ত পদার্থের আস্বাদন না হইলেও যেমন মধু, গুড়, চিনি, আম, কলা ইত্যাদি পদার্থের পৃথক পৃথক মিষ্টত্ব অনুভব করা যায়, সেইরূপ সুখেরও অনেক প্রকার ভেদ থাকার কারণে পূর্ব্বদুঃখানুভব ব্যতীতও সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন দুঃখের—যথা তুলার গদির পর পালঙ্কের গদিতে বসা বা পাল্কীর পর তাঞ্জামে চড়া ইত্যাদি সুখের পর্য্যায়ে বিরক্তি না জন্মিয়া—অনুভব হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্ক নিরর্থক বলিয়া বুঝা যাইবে। পুরাণে দেবতাদিগেরও সংকটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে; এবং পুণ্যাংশ চলিয়া গেলে স্বর্গসুখও কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব স্বর্গসুখের দৃষ্টান্ত আমাদের উপযোগী নহে; এবং উপযোগী হইলেও স্বর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী? "নিত্যমেব সুখং স্বর্গে" এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার পরেই "সুখং দুঃখমিহোভয়ম্" (মভা, শা, ১৯০. ১৪)—এই সংসারে সুখ ও দুঃখ দুই মিশ্রিত হইয়া থাকে—ইহাও কথিত আছে। এই কথা অনুসরণ করিয়াই সমর্থ শ্রীরামদাস স্বামী বলিয়াছেন যে, "জগতে সর্ব্বসুখী কোন জন, বিচারিয়া দেখরে মন"। তা ছাড়া দ্রৌপদী সত্যভামাকে উপদেশ দিয়াছেন যে,—

"সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং। দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।"

অর্থাৎ সুখের দ্বারা সুখ কখনও মেলে না; সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়" (মভা, বন, ২৩৩. ৪)। ইহা লোকের অনুভূতি অনুসারে সত্য, এইরূপ বলিতে হয়। কারণ, জাম ঠোঁটেতে পড়িলেও মুখের ভিতর দিতে হয়, এবং মুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া চিবাইতে হয়। অন্ততঃ এইটুকু নির্ব্বিবাদ যে, দুঃখের পর প্রাপ্ত সুখের মিষ্টতা এবং সকল সময়ে বিষয়ভোগে নিমগ্ন ব্যক্তির দুঃখের মিষ্টতা, এই দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য সুখভোগে সুখানুভব করিবার ইন্দ্রিয়শক্তি মন্দীভূত হয়। কথিত আছে যে,—

"প্রায়েন শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্য্যন্তে দরিদ্রাণাং চ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ—শ্রীমন্তদিগের সুস্বাদু অন্ন সেবনেরও প্রায় শক্তি থাকে না এবং দরিদ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া যায়—(মভা, শা, ২৮. ২৯)। তাই, ইহলোকের ব্যবহারের বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, দুঃখ ব্যতীত সুখ সব সময়ে অনুভূত হয় কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়া বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল নাই। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্" (বন, ২৬০. ৪৯; শা, ২৫. ২৩) সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ

লাগিয়াই আছে। মহাকবি কালিদাসও মেঘদূতে (মে, ১১৪) বর্ণনা করিয়াছেন—

"কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥"

"কাহারই নিয়ত সুখে কিংবা নিয়ত দুঃখের অবস্থা হয় না। সুখদুঃখের দশা চক্রগতির ন্যায় একবার নীচের দিকে, একবার উপর দিকে হইয়া থাকে।" এই ক্রম সর্ব্বদাই চলিতে থাকে। এখন এই দুঃখ আমাদের সুখের মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য উৎপন্ন হউক কিংবা প্রকৃতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ থাকুক, উক্ত অনুভবসিদ্ধ ক্রমবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। হাঁ, একথা কখনো অসম্ভব নহে যে কেহ সর্ব্বদাই বিষয়সুখ উপভোগ করিবে, আর উহার ফলে তাহার প্রাণে বিরক্তি আসিবে না। কিন্তু এই কর্ম্মভূমিতে (মৃত্যুলোক বা সংসারে) এ কথা অবশ্য অসম্ভব যে, দুঃখ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে এবং সর্ব্বদা সুখেরই অনুভব হইবে।

যদি এ কথা সিদ্ধ হয় যে, সংসার নিছক সুখময় নহে, কিন্তু সুখদুঃখাত্মক, তবে এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হয় যে সংসারে সুখ অধিক বা দুঃখ অধিক? আধিভৌতিক সুখকেই যাঁহারা পরম সাধ্য বলিয়া মানেন সেই সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগেরমধ্যে অনেকে এই কথা বলেন যে, সংসারে সুখাপেক্ষা যদি দুঃখই অধিক হইত, তবে সংসারের গোলযোগের মধ্যে না থাকিয়া, সকলে না হৌক অধিকাংশ লোকই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যখন মনুষ্য নিজের জীবনে বিরক্ত হইয়াছে দেখা যায় না, তখন এই অনুমান ঠিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে যে, সংসারে দুঃখাপেক্ষা সুখভোগই অধিক হয়; এবং মানুষ সুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ও সেই মাপকাঠীতে করিয়া থাকে। এখন উপরি-উক্ত মতকে ভালরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে সংসারসুখেরসহিত আত্মহত্যার যে সম্বন্ধ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য নহে। একথা সত্য যে, কোন কোন প্রসঙ্গে কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া আত্মহত্যা করে; কিন্তু লোকে তাকে অপবাদ বা পাগলামির মধ্যে গণনা করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সর্ব্বসাধারণ লোকও আত্মহত্যা করা বা না করার সহিত সংসার-সুখের কোনও সম্বন্ধ রাখে না, উহাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া মনে করে। সুসভ্য মনুষ্য যে অসভ্য সমাজকে অত্যন্ত কষ্টময় বলিয়া মনে করে, সেই অসভ্য মনুষ্য সমাজের বিষয় বিচার করিয়া দেখিলেও এই অনুমানই নিষ্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ চার্লস ডার্বিন আপন প্রবাস-গ্রন্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যে সব অসভ্য লোক দেখিয়া আসিয়াছিলেন সেই অসভ্য লোকদিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ লিখিতেছেন যে, এই অসভ্য লোক—পুরুষ স্ত্রী সকলেই অত্যন্ত শীতের সময়েও বিনা বস্ত্রে উলঙ্গ অবস্থাতেই বেড়ায়; এবং ইহাদের নিকটে অন্নের সংগ্রহ না থাকিলে, কখনো কখনো তাহাদিগকে বিনা অন্নেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মরিতে হয়; তথাপি তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি বাড়িয়াই চলিয়াছে! * এই অসভ্য মনুষ্যও নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা কি ঠিক্ যে, তাহাদের সংসার বা জীবন সুখময়? তাহারা আত্মহত্যা করে না, একথা ঠিক্; কিন্তু তাহার কারণের বিষয়ে সূক্ষ্মবিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সভ্য বা অসভ্য প্রত্যেক মনুষ্যই "আমি পশু নহি, আমি পশু নহি,

* Darwins Naturalist's Voyage round the world. Chap X

আমি মনুষ্য" এই কথাতেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে; এবং অন্য সমস্ত সুখ অপেক্ষা মনুষ্য হওয়ারূপ সুখকে এত বেশী মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে যে, এই সংসার যতই কষ্টময় হোক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ আনন্দ হারাইতে সে কখনই প্রস্তুত থাকে না। মনুষ্য কেন, পশুপক্ষীও আত্মহত্যা করে না। তাই তাহাদের সংসারও সুখময় তাহা কি বলিতে পারি? তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য কিংবা পশুপক্ষী আত্মহত্যা করে না, তাই বলিয়া তাহাদের সংসার সুখময় এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই হউক, তাহার কোন অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক অচেতনের সচেতনে পরিণত হওয়াতেই অনুপম আনন্দ আছে, এবং তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সিদ্ধান্ত করাই ঠিক্। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন:—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।,
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, বুদ্ধিসম্পন্ন জীবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (যাহার সুসংস্কৃত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্ত্তা এবং কর্ত্তাদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ। এইরূপ, শাস্ত্রে যে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণনা আছে তাহা এইভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে (মনু, ১, ৯৬, ৯৭, মভা, উদ্যো, ৫. ১ ও ২); এবং এই নীতি অনুসারে ৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যে নরদেহ শ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে মুমুক্ষু, মুমুক্ষুর মধ্যে সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ—প্রাকৃত গ্রন্থাদিতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে। "সবসে জীব্ প্যারা" এই যে চলিত কথা আছে তাহারও তাৎপর্য্য এই; এবং এই কারণেই সংসার দুঃখময় হইলেও, কেহ আত্মহত্যা করিলে, লোকে তাহাকে পাগল বলে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তাহাকে পাপী বলা হয় (মভা, কর্ণ, ৭০. ১৮); এবং আত্মহত্যার চেষ্টাও আইনে অপরাধ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, মনুষ্য আত্মহত্যা করে না, এই কথা ধরিয়া সংসারের সুখময়ত্বের সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। এই অবস্থাতে 'এই সংসার সুখময় বা দুঃখময়', আমার এই প্রশ্নের নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কোন বিশেষ পদবীতেপতিত নরদেহ প্রাপ্তিরূপ নিজের নৈসর্গিক ভাগ্যের কথা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, তদুত্তরকালীন অর্থাৎ সংসার-ঘটিত বিষয়েরই আমাদের বিচার করা আবশ্যক। 'মনুষ্য আত্মহত্যা করে না, বরঞ্চ বাঁচিবার ইচ্ছা করে' ইহাই তো কেবল সংসার-প্রবৃত্তির কারণ; আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মতানুসারে সংসারের সুখময় হইবার পক্ষে ইহা কোন প্রমাণ নহে। এই কথা অন্য প্রকারে ব্যক্ত করিতে চাহিলে বলিতে হয় যে, আত্মহত্যা না করিবার বুদ্ধি স্বাভাবিক, তাহা সাংসারিক সুখদুঃখের কোন প্রকার তারতম্য হইতে উৎপন্ন নহে, এবং সেই জন্যই ইহা হইতে এই কথা সিদ্ধ হইতে পারে না যে, সংসার সুখময়।

কেবলমাত্র মনুষ্যজন্ম পাইবার মহদ্ভাগ্য এবং তৎপরে মনুষ্যের সংসার এই উভয়কে ভ্রমবশত অভিন্ন মনে করিবে না; মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যের সংসার অর্থাৎ নিত্য ব্যবহার, এই উভয় পৃথক্, এই পার্থক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে যে, এই সংসারে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারী প্রাণীর সুখ অধিক, কি দুঃখ অধিক? এই প্রশ্নের যথার্থ

সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যেক মনুষ্যের "উপস্থিত" বাসনার মধ্যে কত বাসনা সফল ও কত বাসনা নিষ্ফল হয়, ইহা দেখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 'উপস্থিত' বলিবার কারণ এই যে, যে সব জিনিস সভ্য অবস্থায় সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা নিত্য ব্যবহারে আসায় তদুৎপন্ন সুখ আমরা ভুলিয়া যাই, এবং যে বস্তুর গরজ নূতন উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কোন্‌টা পাওয়া গেল তাহা দেখিয়া এবং কেবল তাহা ধরিয়াই আমরা সংসারের সুখদুঃখের নির্ণয় করিয়া থাকি। বর্ত্তমানকালে আমরা কত সুখসাধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার তুলনা করা এবং শতবর্ষ পূর্ব্বে এই সকলের মধ্যে কতকগুলি সুখসাধন পাওয়া গিয়াছিল; এবং আজিকার মুহূর্ত্তে আমি সুখী কি সুখী নই তাহার বিচার করা—এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। উদাহরণ যথা—শত বৎসর পূর্ব্বের গরুর গাড়ীতে ভ্রমণ করা অপেক্ষা এখনকার আগ্‌গাড়ীতে ভ্রমণ করা অধিকতর সুখদায়ক, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু এখন 'আগ্‌গাড়ী'তে ভ্রমণ সুখের এই সুখত্ব আমরা ভুলিয়া গিয়া কোনদিন গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকে চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে আমাদের বড় খারাপ লাগে। তাই, মনুষ্যের উপস্থিত সুখদুঃখের বিচারে উপলব্ধ সুখ-সাধন কর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া, মনুষ্য উপস্থিত 'গরজ' অনুসারে সুখদুঃখের বিচার করিয়া থাকে। এবং, এই গরজ সম্বন্ধে বিচার করিলে, তাহার আর শেষ দেখা যায় না,—উহা অনন্ত ও সীমাহীন দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এক ইচ্ছা সফল হইলে কাল আর এক নূতন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং এই নূতন ইচ্ছা সফল করিতে হইবে, এইরূপ মনে হইতে থাকে। যখন যখন মানুষের ইচ্ছা বা বাসনা সফল হইতে থাকে, তখন তখনই তাহার দৌড় এক পা সম্মুখে বাড়িয়া চলে, এবং যখন ইহা অনুভবসিদ্ধ হয় যে, সকল ইচ্ছা বা বাসনা সফল হওয়া সম্ভব নহে, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, মানুষের অদৃষ্টে দুঃখ ছাড়িতে চাহে না। সমস্ত সুখই কেবল তৃষ্ণাক্ষয়রূপ এবং যতই সুখলাভ হোক না কেন, মনুষ্য অসন্তুষ্ট থাকে; এই দুই বিষয়ের ভেদের প্রতি এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক সুখ দুঃখাভাবরূপ নহে, কিন্তু সুখ ও দুঃখ ইন্দ্রিয়সমূহের দুই স্বতন্ত্র বেদনা, ইহা এক কথা, এবং মনুষ্য কোন এক সময়ে প্রাপ্ত সুখকে ভুল করিয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া এবং অধিকাধিক সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট থাকে, ইহা পূর্ব্বোক্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ইহাদের মধ্যে প্রথম তর্ক সুখের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া; এবং দ্বিতীয় তর্ক এই যে, প্রাপ্ত সুখে মনুষ্যের পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কি হয় না। বিষয়বাসনা সর্ব্বদাই সমান বাড়িয়া যায় বলিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন সুখ লাভ না হইলেও পূর্ব্ব সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিব এই-রূপ মনে করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। বিটেলিয়স্ নামে এক রোমক সম্রাটের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, জিহ্বার সুখ পুনঃ পুনঃ পাইবার উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবন করিয়া উদরস্থ অন্ন বাহির করিয়া ফেলিতেন এবং প্রতিদিন তিনি অনেকবার ভোজন করিতেন! কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যযাতি রাজার কথা ইহা অপেক্ষা আরও জ্ঞানপ্রদ। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলে, সেই জরা অন্যকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তির তারুণ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া শুক্রাচার্য্য কৃপা করিয়া তাঁহার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন পুরু নামক নিজ পুত্রের যৌবন লইয়া, যযাতি এক হাজার বৎসর সমান বিষয়সুখ উপভোগ করিলেও পরিণামে তাঁহার উপলব্ধি হইল

যে, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ একজন মনুষ্যেরও সুখবাসনা তৃপ্ত করিতে অসমর্থ। তখন তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল ঃ—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

অর্থাৎ "সুখের উপভোগে বিষয়বাসনার তৃপ্তি না হইয়া হবন দ্রব্যের দ্বারা অগ্নির ন্যায় বিষয়ের উপভোগ বিষয়বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়" (মভা. আ. ৭৫. ৪৯)। এই শ্লোকই মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ২. ৯৪)। সুখসাধন যতই উপলব্ধ হউক না কেন, ইন্দ্রিয়ের লালসা সতত বর্দ্ধিতই থাকে; তাই কেবল সুখভোগের দ্বারা সুখেচ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না, উহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয়, ইহাই হইল তাৎপর্য্য। এই তত্ত্ব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সকল গ্রন্থকারদিগের অভিমত হওয়ায়, তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের কামোপভোগে সংযম অবলম্বন করা আবশ্যক। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা এই অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রতি একটুও লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের মতের অসারতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। বৈদিক ধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্মেও স্বীকৃত এবং যযাতির পরিবর্ত্তে মান্ধাতা নামক পৌরাণিক রাজা মৃত্যুকালে বলিয়াছেন ঃ

ন কহাপণবস্সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি।
অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি॥

"কার্ষাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও কামের তৃপ্তি হয় না, এবং স্বর্গসুখ মিলিলেও কামী পুরুষের কামের নিবৃত্তি হয় না" ইহা ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত লইয়াছে (১৮৬, ১৮৭)। ইহা হইতে বলা যায় যে, বিষয়োপভোগসুখের পূর্ণতা কখনই হয় না, তাই প্রত্যেক মানুষ মনে করে—"আমি দুঃখী। মনুষ্যমাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতে কথিত সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় যে ঃ—

সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ "এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক" (শা, ২০৫. ৬; ৩৩০. ১৬)। এই সিদ্ধান্ত সাধু তুকারাম এই প্রকারে বলিয়াছেন—

"সুখপাহতা জবাপাডে। দুঃখ পর্ব্বতাএবঢে॥

"সুখ যব প্রমাণ, দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ" (তুকা. গা, ২৯৮৮)। উপনিষৎকারদিগেরও ইহাই সিদ্ধান্ত (মৈত্র্য, ১.২-৪)। গীতাতেও মনুষ্যের জন্ম অ-শাশ্বত ও 'দুঃখের ঘর' এবং এই সংসার অনিত্য ও "সুখহীন" (গী. ৮. ১৫; ৯. ৩৩) কথিত হইয়াছে। জর্ম্মন পণ্ডিত, শোপেনহোয়েরেরও এই মত, এবং তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনুষ্যের সমস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত সুখের ইচ্ছা সফল হয় সেই পরিমাণে আমরা তাহাকে সুখী মনে করি; এবং সুখো-পভোগ সুখেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই মনুষ্যকে পরিণামে দুঃখী বলি। ইহা গণিতের রীতিতে দেখাইতে হইলে, সুখোপভোগকে সুখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া ভগ্নাংশরূপে এইরূপ লিখিতে হয় যথা—$\frac{\text{সুখোপভোগ}}{\text{সুখেচ্ছা}}$। কিন্তু এই ভগ্নাংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার বিভাজক অর্থাৎ সুখেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা বরাবরই অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে। যদি এই ভগ্নাংশ প্রথমে $\frac{১}{২}$ হয়, পরে উহার

বিভাজ্য ১ হইতে ৩ হয়, তবে উহার বিভাজক ২ হইতে ১০ হইবে—অর্থাৎ ঐ ভগ্নাংশ ৩ হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যদি বিভাজ্য তিন গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে বিভাজক পাঁচ গুণ বাড়িয়া যায়। তাহার ফল এই যে, ঐ ভগ্নাংশ পূর্ণতার দিকে না যাইয়া অধিকাধিক অপূর্ণতার দিকেই চলিয়া যায়। অতএব মনুষ্যের পূর্ণ সুখ আশা করা বৃথা। প্রাচীন-কালে সুখ কি পরিমাণ ছিল তাহার বিচার করিবার সময় এই ভগ্নাংশের বিভাজ্যের প্রতি আমরা পূর্ণ লক্ষ্য রাখি, কিন্তু বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়া গিয়াছে সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু যখন সুখদুঃখের মাত্রারই নির্ণয় করিতে হইবে, তখন কোন কালের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, উক্ত ভগ্নাংশের বিভাজ্য ও বিভাজক এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ। আবার ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই অপূর্ণাঙ্গ কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। "ন জাতু কামঃ কামানাম্" এই মনুবচনের (২. ৯৪) অর্থই এই। সুখদুঃখ মাপিবার উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ সুখ-দুঃখের তারতম্য-বিন্যাস অনেকের পছন্দ না হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই যুক্তিবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসারে মনুষ্যের সুখ অধিক ইহা প্রমাণ করিবারও কোন নিশ্চিত উপায় নাই। এই আপত্তি উভয়পক্ষের নিকটেই সমান, তাই উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা সুখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে উহা কোনও বাধা আনিতে পারে না। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে এবং জগতের ইতিহাসে এই ইতিহাসের পোষক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। স্পেন দেশে যখন মুসলমান রাজ্য ছিল সেই সময় তৃতীয় আবদুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমী সম্রাট, নিজের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনাম্চা রাখিতেন এবং সেই রোজনাম্চা অনুসারে তাঁহার রাজত্বের ৫০ বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র পূর্ণ সুখে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইরূপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত হইয়াছে। একজন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে, বিশেষতঃ য়ুরোপখণ্ডে, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞানীদের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধেক "সংসার সুখময়" প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অপর অর্দ্ধেক "সংসার দুঃখময়" প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ সংসারকে সুখময় ও দুঃখময় প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা প্রায় সমান। † এই সংখ্যার উপর হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানীর মতের ভার চাপাইলে, তৌল কোনদিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে হইবে না।

সাংসারিক সুখদুঃখের উপরি-উক্ত বিচার শুনিয়া কোন সন্ন্যাসমার্গী ব্যক্তি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "সুখ বাস্তবিক পদার্থ না হওয়ায় তৃষ্ণাত্মক সমস্ত কর্ম্ম না ছাড়িলে শান্তি নাই, এই কথা তুমি স্বীকার না করিলেও, তোমার কথা অনুসারেই তৃষ্ণা হইতে অসন্তোষ এবং অসন্তোষ হইতে পরে দুঃখ হয়; তাহা হইলে নিদেন এই অসন্তোষ দূর করিবার জন্য মনুষ্য, নিজের সমস্ত তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণার সহিত সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম—তাহা পরোপকারের জন্যই হোক বা স্বার্থের জন্যই হোক—ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবে এইরূপ বলিতে বাধা কি?" মহাভারতেও আছে—"অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্" অসন্তোষের অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ (মভা, বন, ২১৫ ২২)। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিও এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং পাশ্চাত্য দেশে শোপেনহৌর অর্ব্বাচীন কালে এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। * কিন্তু ইহার বিপরীতে এইরূপ প্রশ্নও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া জিহ্বার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? অগ্নির দ্বারা কখন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি সমগ্র অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকে রাঁধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে? অগ্নির কথা কি, বিদ্যুৎশক্তিকেও যোগ্য সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা যেমন তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, সেইরূপ তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষেরও সুব্যবস্থিত কোন সীমা বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। হাঁ, অসন্তোষ যদি সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বপ্রসঙ্গে হানিজনক হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিচারান্তে তাহা দেখা যায় না। অসন্তোষ অর্থে নিছক আকাঙ্ক্ষা বা হাহুতাশ নহে। এই অসন্তোষ শাস্ত্রকারেরাও গর্হিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে কেবলই আক্ষেপ করিতে না থাকিয়া শান্ত ও সমচিত্ততার সহিত যথাশক্তি ঐ অবস্থার উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার মূলভূত যে অসন্তোষ তাহা গর্হিত বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। চাতুর্ব্বর্ণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের, ক্ষত্রিয় যদি ঐশ্বর্য্যের এবং বৈশ্য যদি ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইতে সমাজ যে শীঘ্রই অধোগতিপ্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায় মনেতে আনিয়া ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, "যজ্ঞো বিদ্যা সমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি" (শাং ২৩. ৯) অর্থাৎ "যজ্ঞ, বিদ্যা, উদ্যোগ ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অসন্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ"। সেইরূপ বিদুলাও আপন পুত্রকে উপদেশ করিবার সময় বলিয়াছেন যে "সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি" (মভা, উ, ১৩২. ৩৩) অর্থাৎ সন্তোষে ঐশ্বর্য্য নাশ হয়। অন্য এক প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে "অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং" (মভা, সভা, ৫৫. ১১)। ব্রাহ্মণধর্ম্মে সন্তোষকে গুণ বলা হইয়াছে; তথাপি তাহার অর্থ চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা ঐহিক ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে সন্তোষ ইহাই অভিপ্রেত। আমি যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট এইরূপ যদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিবে। সেইরূপ বৈশ্য কিংবা শূদ্র আপন আপন ধর্ম্মানুসারে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহারও ঐরূপ দশা হইবে। সারাংশ, অসন্তোষেই সকল ভাবী উৎকর্ষ, প্রযত্ন, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষেরও বীজ। ‡ এই অসন্তোষ যদি আমরা সমূলে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের দুর্গতি হইবে, ইহা আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিবার সময় অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, "ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্" (গী. ১০.১৮)

* Moors in Spain, P. 128 (Story of the Nation Series)

† Macmillan's Promotion of Happiness, P. 26.

* Schopenhauer's World as Will and Representation, Vol II. Chap. 46 শোপেনহৌর কৃত সংসারের দুঃখময়ত্ব বর্ণনা অত্যন্ত সরস। মূলগ্রন্থ জর্ম্মন ভাষায় লিখিত এবং ইংরেজীতে উহার অনুবাদ আছে।

‡ Cf, 'Unhappiness is the cause of Progress' Dr. Paul carus' the Ethical Problem, p·251 (2nd Ed).

অর্থাৎ "তোমার অমৃতবাণী শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব তোমার বিভূতির কথা পুনঃ পুনঃ আমাকে বল"। এই কথা অর্জ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার স্বীয় বিভূতির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি এরূপ উপদেশ করেন নাই যে, "তুমি আপন ইচ্ছা সম্বরণ কর। অতৃপ্তি বা অসন্তোষ ভাল নহে"। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, ভাল কিংবা কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসন্তোষ হওয়া ভগবানের অভীষ্ট॥ 'যশোঽপি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ' অর্থাৎ অভিরুচি হওয়া চাই—যশের অভিরুচি, ব্যসন হওয়া চাই—বিদ্যার ব্যসন; তাহা গর্হিত নহে। ভর্ত্তৃহরিও এক শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। কামক্রোধাদির বিকারের মতো অসন্তোষকেও অসংযত হইতে দেওয়া ঠিক নহে। অসংযত হইলে, তাহা সর্ব্বস্ব নাশ করিবে নিঃসন্দেহে। এই হেতু কেবল বিষয়ভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর তৃষ্ণা কিংবা আশার উপর আশা চাপাইয়া ঐহিক সুখের পশ্চাতে সর্ব্বদাই ছুটিয়া চলে যে ব্যক্তি, তাহার সম্পদকে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে 'আসুরী সম্পদ্' বলা হইয়াছে। এইরূপ অসংযত লালসার দরুণ মানব মনের সাত্ত্বিক বৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া মনুষ্য শুধু যে অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণার ও পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব হওয়ায় কামোপভোগবাসনা অধিকাধিক বাড়িয়া গিয়া তাহাতেই শেষে মনুষ্যের বিনাশ হয়, কিন্তু উল্টাপক্ষে, তৃষ্ণা ও অসন্তোষের এই দুষ্পরিণাম পরিহার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করাও সাত্ত্বিক মার্গ নহে, উপরি-উক্ত কথা অনুসারে, তৃষ্ণা বা অসন্তোষই ভাবী উৎকর্ষের বীজ, তাই চোরের ভয়ে নির্দোষকে মারিবার প্রযত্ন না করিয়া কোন্ তৃষ্ণা হইতে বা অসন্তোষ হইতে দুঃখ হয়, তাহার ঠিক বিচার করিয়া সেই দুঃখ জনক আশা, তৃষ্ণা বা অসন্তোষ ত্যাগ করাই উচিত মার্গ স্বীকার করিতে হইবে। তাহার জন্য সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। দুঃখজনক আশা ছাড়িয়া দিয়া স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিবার এই যে যুক্তি বা কৌশল, তাহাকেই 'যোগ' বা 'কর্ম্মযোগ' বলে (গী. ২৫০), এবং তাহাই গীতার মুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য হওয়া গীতাতে কোন্ প্রকারের আশা দুঃখজনক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার আলোচনা করিব।

মনুষ্য কানে শোনে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে ও নাকের দ্বারা আঘ্রাণ করে, ইন্দ্রিয় সমূহের এই ব্যাপার স্বাভাবিক বৃত্তির যেরূপ অনুকূল প্রতিকূল হয়, সেই অনুসারে মনুষ্যের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে। সুখদুঃখের বস্তু-স্বরূপের এই লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুখ-দুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিভৌতিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্য পদার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও সুখ দুঃখের অনুভব মনুষ্যের নিকট পরে কি প্রকারে আসিয়া থাকে তাহার বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক ব্যাপার নিষ্পন্ন এই সুখ দুঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ নিজের জন্য তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, 'চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা' দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক হয় (মভা, শা, ৩১১. ১৭) এবং, সেই মন যদি ব্যাকুল থাকে, তবে চোখে দেখিলেও, না দেখিবার মতো হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১.৫.৩) উক্তি দেখা

যায় যে, "আমার মন অন্যদিকে থাকার দরুন আমি দেখিতে পাই নাই, (অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্)," আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়া আমি শুনিতে পাই নাই (অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্)। ইহা হইতে আধি-ভৌতিক সুখদুঃখ তো মানসিক হইয়াই থাকে। এই সমস্ত হইতে দেখা যায় সর্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতি শেষে মনকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং যদি সত্য হয়; তবে মনোনিগ্রহের দ্বারা সুখদুঃখানুভূতির নিগ্রহ অসাধ্য নহে, ইহা স্বতই উপলব্ধি হইবে। ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনু সুখদুঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন, তিনি বলেন—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

অর্থাৎ "যাহাকিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আয়ত্ত তাহাই সুখ—ইহাই সুখদুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ" (মনু, ৪. ১৬০)। নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণের অন্তর্ভূত 'বেদনা' শব্দে শারীরিক ও মানসিক উভয় বেদনারই সমাবেশ হয় এবং তাহা দ্বারা সুখ-দুঃখের বাহ্যবস্তুস্বরূপও দেখান হয়; মনু সুখদুঃখের কেবল আভ্যন্তরিক অনুভূতির উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, সুখদুঃখের উক্ত দুই লক্ষণের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে না। সুখদুঃখানুভূতির ইন্দ্রিয়াবলম্বিতা এইরূপে বিলুপ্ত হইলে বলিতে হয় যে—

"ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।"

অর্থাৎ—"দুঃখের চিন্তা না করাই দুঃখনিবারণের মহৌষধ" (মভা, শা. ২০৫. ২); এবং এই নীতি অনুসারে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য আহ্লাদের সহিত অগ্নিকাষ্ঠভক্ষণের অনেক উদাহরণ ইতিহাসেও আছে। অতএব গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু করিবে, তাহা মনোনিগ্রহপূর্ব্বক এবং তাহার ফলাশা ছাড়িয়া সুখদুঃখ সম্বন্ধে সম-বুদ্ধি রাখিয়া করিবে; এইভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে আমাদের কর্ম্ম ছাড়িতেও হইবে না কিম্বা সেই কর্ম্ম হইতে আমাদের দুঃখরূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকিবে না। ফলাশাত্যাগের অর্থ ইহা নহে যে, ফল লাভ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, কিংবা সেই ফল কেহ কখনও না পায় এইরূপ ইচ্ছা করিবে। সেই প্রকার ফলাশা এবং কর্ম্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু কিংবা ফলে অন্য কোন বিষয়ের যোজনা করা, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কেবল হাত পা নাড়ানোর ইচ্ছা হওয়া, আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা অমুককে লাথি মারিবার জন্য হাত পা না নাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল কর্ম্ম করিবারই ইচ্ছা, উহাতে অন্য কোন হেতু থাকে না; এবং এই ইচ্ছা, চলিয়া গেলে সমস্ত কর্ম্মই বন্ধ হয়। এই ইচ্ছার অতিরিক্ত প্রত্যেক মনুষ্যের এই জ্ঞানটি হওয়া চাই যে, প্রত্যেক কর্ম্মের কোন-না-কোন পরিমাণ বা ফল অবশ্যই হইবে। জ্ঞান হওয়া চাই শুধু নহে, এই প্রকার ইচ্ছাও হওয়া চাই যে, অমুক ফলের জন্য অমুক প্রকার যোজনা করিয়া অমুক কর্ম্ম করিতে হইবে; নতুবা তাহার সমস্ত ক্রিয়া পাগলের মতো নিরর্থক হইবে। এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু বা যোজনা পরিণামে দুঃখজনক হয় না; এবং তাহা যে ছাড়িতে হইবে সে কথা গীতাও বলে নাই। কিন্তু মনে রাখিয়ো যে, ইহাকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যখন মনুষ্যের মনে এই ভাব হয় যে, "আমি কর্ম্ম করিতেছি আমার সেই

কর্ম্মের অমুক ফল অবশ্যই আমার পাওয়া উচিত" অর্থাৎ যখন কর্ম্মফলের প্রতি কর্ত্তার বুদ্ধিতে মমত্বের এই আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, অভিনিবেশ বা আগ্রহ উৎপন্ন হয় এবং তাহা দ্বারা মন অধিকৃত হয়, এবং যখন বাঞ্ছিত ফল মিলিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়, তখনই দুঃখপরম্পরার সূত্রপাত হয়। এই বাধা অনিবার্য্য বা দৈবকৃত হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; কিন্তু উহা মনুষ্যকৃত হইলে ক্রোধ ও দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া তাহার ফলে কুকর্ম্ম ঘটে এবং কুকর্ম্মের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত হয়। কর্ম্মপরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্তি আসক্তি, উহার 'ফলাশা' 'সঙ্গ', 'অহঙ্কার বুদ্ধি ও কাম', এইরূপ ভিন্নভিন্ননাম আছে, এবং এখান হইতেই সাংসারিক দুঃখপরম্পরার আরম্ভ, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, বিষয়সঙ্গ হইতে কাম, কামহইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ এবং শেষে মনুষ্যের বিনাশও হইয়া থাকে (গী ২. ৬২, ৬৩)। এক্ষণে ইহা সিদ্ধ হইল যে, জড় জগতের অচেতন কর্ম্ম স্বয়ং দুঃখের মূল কারণ নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশা, কাম বা আসক্তি বা ইচ্ছা স্থাপন করে, তাহাই প্রকৃত দুঃখের মূল। এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায় এই যে, বিষয়ের ফলাশা, আসক্তি বা কাম মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে, সন্ন্যাসমার্গে যাহা বলা হয়, তদনুসারে সমস্ত বিষয় ও কর্ম্ম অথবা সর্ব্বপ্রকারের ইচ্ছাই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ; ইহা পরে গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী. ২. ৬৪)। জগতের কর্ম্মব্যবহার কখনই বন্ধ হইতে পারে না। মনুষ্য এই জগতে থাকুক আর নাই থাকুক, প্রকৃতি নিজ গুণধর্ম্মানুসারে সততই নিজের কার্য্য করিতে থাকিবে। জড় প্রকৃতির ইহাতে সুখও নাই দুঃখও নাই। মনুষ্য নিজের মহত্ত্বকে ব্যর্থ জানিয়া প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রযুক্ত সুখদুঃখভাগী হইয়া পড়ে। যদি সে এই আসক্তিবুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করিয়া "গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে"—প্রকৃতির গুণধর্ম্মানুসারে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে (গী. ৩. ২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যবহার করে, তাহা হইলে অসন্তোষ-জন্য তাহার কোন দুঃখই হইতে পারে না। তাই প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছেনই ইহা বুঝিয়া তাহার জন্য সংসারকে দুঃখপ্রধান বলিয়া কাঁদিতে বসা কিংবা তাহা ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা করা উচিত নয়। মহাভারতে (শান্তি, ২৫. ২৬) ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে,—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাহপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥

অর্থাৎ—সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যখন যাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবে। সংসারে অনেক কর্ত্তব্য দুঃখ সহিয়াও করিতে হয়—এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই উপদেশের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইবে। ভগবদ্‌গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে যে, "যঃ সর্ব্বত্রানভি-স্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্" (২. ৫৭) অর্থাৎ শুভ অথবা অশুভ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিয়া তাহার অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সে-ই স্থিত প্রজ্ঞ। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" (৫. ২০) সুখ পাইয়া উল্লসিত হইবে না, এবং দুঃখে মুহ্যমানও হইবে না; এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সুখদুঃখ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভোগ করিবার উপদেশ দেওয়া

হইয়াছে (২. ১৪. ১৫)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশই বারম্বার পুনরুক্ত করিয়াছেন (গী. ৫. ৯; ১৩. ৯)। বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় ইহাকে "সকল কর্ম্মের ব্রহ্মার্পণ করা" এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গে 'ব্রহ্মার্পণের' স্থলে 'শ্রীকৃষ্ণার্পণ' এই শব্দ সংযোজিত হইয়া থাকে ইহাই সমস্ত গীতার সারতত্ত্ব।

কর্ম্ম যে প্রকারেরই হউক না, উহা করিবার ইচ্ছা ও উদ্যোগ না ছাড়িয়া এবং ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া (অর্থাৎ নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে) ইহা করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ভবিষ্যতে পরিণামপ্রাপ্ত সুখ-দুঃখকে একই সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এইভাবে কর্ম্ম করিয়া গেলে অমর্য্যাদিত তৃষ্ণা ও অসন্তোষজনিত দুষ্পরিণাম শুধু যে নিবারিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তৃষ্ণা বা অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেরও নাশ করিলে জীবন ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারিত তাহাও আসিতে পারিবে না; এবং আমার মনোবৃত্তি শুদ্ধহইয়া সর্ব্বভূতহিতপ্রদ হইয়া যাইবে। ইহা নির্ব্বিবাদ যে, এইরূপে ফলাশা ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু মনে রেখো যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখিয়া, স্বার্থের বদলে বৈরাগ্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি হইতেই লোকসংগ্রহার্থ তাহাদিগকে আপন আপন কর্ম্ম করিতে দেওয়া এক কথা; এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সমূলে নাশ করা পৃথক্ কথা—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গীতায় যে বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপদেশ করা হইয়াছে তাহা প্রথম প্রকারের, দ্বিতীয় প্রকারের নহে; এবং সেই অনুসারেই অনুগীতাতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে (মভা, অশ্ব, ৩২. ১৭-২৩) জনকরাজা ব্রাহ্মণের রূপধারী ধর্ম্মকে এইরূপ বলিতেছেন যে—

শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বত্র বিষয়ো মম।
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্ ঘ্রাণগতানপি ॥

* * *

নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোহন্তরে।
মনো মে নির্জ্জিতং তস্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥

অর্থাৎ—"যে (বৈরাগ্য) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিয়া থাকি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শোন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আঘ্রাণ করি না (চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ আপন লাভের জন্য ব্যবহার করি না; অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি) ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাঁহারা আমার বশে আছে"। গীতারও বচনের (গী. ৩, ৬. ৭) ইহাই তাৎপর্য্য যে, যে মনুষ্য কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিকে দমন করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সমূহের চিন্তা করিতে থাকে সে পুরো ভণ্ড, এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহের দ্বারা কাম্য বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। বাহ্যজগতে কিংবা ইন্দ্রিয়ব্যাপার আমরা উৎপন্ন করি নাই, তাহারা স্বভাবসিদ্ধ; আমি দেখি যে, কোন সন্ন্যাসী যতই নিগ্রহী হউক না কেন, ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিলে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেই (গী. ৩. ৩৩): কিংবা অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে, কখন বা দাঁড়াইয়া উঠে। তাৎপর্য্য এই যে, নিগ্রহ যতই হউক না কেন, ইন্দ্রিয়ের এই স্বভাবসিদ্ধ

ব্যাপার কখনো রহিত হইতে পারে না ; আর যদি একথা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম এবং সর্ব্ব প্রকারের ইচ্ছা বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার দুরাগ্রহে না পড়িয়া (গী, ২. ৪৭ ; ১৮. ৫৯), মনোনিগ্রহের দ্বারা ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং সুখদুঃখকে সমান জ্ঞানপূর্ব্বক (গী, ২. ৩৮) নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোকহিতার্থ সকল-কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিতে থাকাই হইল শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মার্গ। তাই—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

এই শ্লোকে (গী, ২. ৪৭) ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, তুমি এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব "তোমার কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে"; কিন্তু তোমার এই অধিকার কেবল (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম করিবারই অধিকার, ইহা মনে রেখো। 'এব' পদের অর্থ 'কেবল' ; এই পদটির দ্বারা সহজেই জানা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে—অর্থাৎ কর্ম্মফলে—মনুষ্যের অধিকার নাই। এই গুরুতর বিষয় কেবল অনুমানের উপর অবলম্বিত না রাখিয়া দ্বিতীয় চরণে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, "কর্ম্মফলে তোমার কোনই অধিকার নাই", অর্থাৎ কোন কর্ম্মের ফল পাওয়া, কি না পাওয়া তোমার অধিকারের কথা নহে, উহা পরমেশ্বরের উপর কিংবা সৃষ্টির কর্ম্মবিপাকের উপর অবলম্বিত আছে। যে বিষয়ে আমার অধিকার নাই, তাহার সম্বন্ধে আশা করা যে, উহা অমুক প্রকারে হউক, মূঢ়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীয় বিষয়টিও অনুমানের উপর অবলম্বিত নহে। তৃতীয় চরণে উক্ত হইয়াছে যে, "অতএব তুমি কর্ম্মফলের আশংকা মনেতে রাখিয়া কোন কর্ম্মই করিবে না" ; কর্ম্মবিপাক অনুসারে তোমার কর্ম্মের যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছায় তাহা ন্যূনাধিক হওয়া অথবা শীঘ্র বা বিলম্বে হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু যদি তুমি এইরূপ আশা রাখো বা আগ্রহ কর, তাহা হইলে তোমার কেবল ব্যর্থ দুঃখ ও কষ্ট হইবে মাত্র। এই স্থলে কোন কোন ব্যক্তি—বিশেষতঃ সন্ন্যাসমার্গী—প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কর্ম্ম করিয়া ফলের আশা ছাড়িবার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা একেবারেই কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল নহে কি? এইজন্য ভগবান শেষে নিজের নিশ্চিত মতও বলিয়া দিয়াছেন যে, 'কর্ম্ম না করিবার (অকর্ম্মের) আগ্রহ রাখিবে না", তোমার যে অধিকার আছে তদনুসারে—কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া—কর্ম্মই করিতে থাক। কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এত গুরুতর যে উপরি-উক্ত শ্লোকের চারি চরণ কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বা গীতাধর্ম্মের চতুঃসূত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ইহা বোঝা গিয়াছে যে, সংসারে সুখ দুঃখ সর্ব্বদাই পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এখানে সুখ অপেক্ষা দুঃখেরই পরিমাণ অধিক। ইহা সিদ্ধ হইলেও যদি সাংসারিক কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য হয়, তবে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির এবং অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তির জন্য মনুষ্যের সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া সম্ভব। এবং কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগরূপ সুখেরই দিকে দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের ধারণা অসঙ্গত বলা যায় না। সত্য, চাঁদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে মুঠির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপ আত্যন্তিক সুখের আশায় কেবল আধিভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি দুর্ঘট

হয়। কিন্তু মনে রেখো, আধিভৌতিক সুখই সর্ব্বপ্রকার সুখের ভাণ্ডার নহে, সেই কারণ উপরি-উক্ত বাধার ভিতরেও অত্যন্ত ও নিত্য সুখপ্রাপ্তির একটা পথ বাহির করা যাইতে পারে। উপরে বলা হইয়াছে যে, শারীরিক ও মানসিক—সুখের এই দুই ভেদ। শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক (অর্থাৎ আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, এই যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, তাহা আপন জ্ঞানের অহংকার বশতঃ তাঁহারা করেন না। এই সিদ্ধান্তেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের যে প্রকৃত মহত্ত্ব ও সার্থকতা, তাহা আধিভৌতিকবাদী 'মিল্' আপন উপযোগবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন।* কুকুর, শূকর, বলদ প্রভৃতিরও ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ যদি মনুষ্যেরই সমানই হইত ; এবং বিষয়োপভোগই এই জগতে প্রকৃত সুখ, মনুষ্যের যদি ইহাই ধারণা হইত, তাহা হইলে মনুষ্য পশু হইতেও রাজি হইত। কিন্তু পশুর সমস্ত বিষয়সুখ নিত্য পাইবার অবসর আসিলেও কোন মনুষ্য পশু হইতে রাজি হয় না ; ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, পশু ও মনুষ্যের মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটি কি, তাহা বুঝিতে গেলে মন ও বুদ্ধির দ্বারা আপনার ও বাহ্যজগতের জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, সেই আত্মার স্বরূপের বিচার করা আবশ্যক ; এবং একবার এই বিচার সুরু হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের বিষয়োপভোগজনিত সুখ একই কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শুদ্ধাবস্থাতে যে সুখ, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ও আত্যন্তিক সুখ। এই সুখ আত্মবশ ; ইহার প্রাপ্তি কোন বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা করে না ; ইহার প্রাপ্তির জন্য অন্যের সুখ হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় না ; এই সুখ, আপনারই প্রযত্নে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যেমন যেমন আমার উন্নতি হইতে থাকে, তেমনি তেমনি এই সুখের স্বরূপও অধিকাধিক শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে থাকে। ভর্ত্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন যে, "মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ"—মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবানই বা কে, দুই-ই সমান। প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ত্ববেত্তাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, শারীরিক (অর্থাৎ বাহ্য বা আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মনের সুখ শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধিগ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক) সুখ শ্রেষ্ঠ।** তাই যদি আমি এখন মোক্ষের বিচার ছাড়িয়া দিই, তথাপিইহাই সিদ্ধ হয় যে আত্মবিচার-নিমগ্ন বুদ্ধি হইতেই পরম সুখ লাভ হইতে পারে। সেই কারণে ভগবদ্গীতাতে সুখের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে, এবং ইহাদের লক্ষণও বলা হইয়াছে, যথা—আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই আত্মাকে জানিয়া আত্মার ঐ প্রকৃত স্বরূপে রত বুদ্ধির) প্রসন্নতা হইতে যে আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক ও শ্রেষ্ঠ সুখ "তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্" (গী, ১৮. ৩৭.), যে আধিভৌতিক সুখ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়প্রসূত, তাহা সাত্ত্বিক সুখের নিম্ন পদবীস্থ

* "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied ; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opiniou, it is because they only know their own side of the question.—Utilitarianism, p. 14. (Longman 1907.)

** Republic book IX.

এবং তাহাকে রাজসিক বলা যায় (গীতা, ১৮.৩৮) ; এবং যে সুখ হইতে চিত্তমোহ হয় এবং যে সুখ নিদ্রা বা আলস্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার যোগ্যতা তামসিক অর্থাৎ কনিষ্ঠ শ্রেণীর। এই প্রকরণের আরম্ভে গীতার যে শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই তাৎপর্য্য; এবং গীতাও বলিয়াছেন (গী, ৬.২২) যে, এই পরম সুখের উপলব্ধি একবার হইলে পরে যত বড় দুঃখ আসুক না কেন, তাহাতেও মনুষ্যের সুখময় স্থৈর্য্য কখনই বিচলিত হয় না। এই আত্যন্তিক সুখ স্বর্গেরও বিষয়োপভোগজনিত সুখে পাওয়া যায় না ; ইহা লাভ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধি প্রথমে প্রসন্ন হওয়া চাই। বুদ্ধিকে কেমন করিয়া প্রসন্ন রাখিবে তাহা না দেখিয়া, যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপভোগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য। কেবল ইহাই নহে ; কিন্তু যাহা আজ ইন্দ্রিয়ের সুখজনক প্রতীত হইতেছে, তাহাই কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য দুঃখজনক হইতে পারে। উদাহরণ, যথা—গ্রীষ্মকালে যে ঠাণ্ডা জল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা যায় না। ভাল ; এত করিয়াও তাহা হইতে সুখেচ্ছার পূর্ণ তৃপ্তি হইতেই পারে না। তাই, ‘সুখ’ শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া যদি আমি ঐ শব্দের উপযোগ সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধেই করি, তাহা হইলে সুখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে সুখের অর্থে মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়সুখই বুঝায়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়াতীত ও নিছক আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির উপলব্ধ সুখ হইতে বিষয়োপভোগরূপ সুখের ভেদ প্রদর্শন করিতে হইবে, তখন বিষয়োপভোগের আধিভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র সুখ বা প্রেয় এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, আনন্দ অথবা শান্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্ব্ব প্রকরণের শেষে প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেয় ও শ্রেয় এই দুয়ের মধ্যে নচিকেতা যে ভেদ করিয়াছেন তাহাও এই মর্ম্মেই করা হইয়াছে। মৃত্যু তাঁহাকে অগ্নির রহস্য প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রাপ্ত হইবার পরেই যখন নচিকেতা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির বর চাহিলেন, তখন তাহার বদলে মৃত্যু তাঁহাকে অন্য অনেক ঐহিক সুখের লোভ দেখাইলেন। কিন্তু নচিকেতা অনিত্য আধিভৌতিক সুখে কিংবা আপাতদৃষ্টে মধুর (প্রেয়) বস্তুতে না ভুলিয়া, দূর-দৃষ্টিপূর্ব্বক, যাহাতে আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকেই আগ্রহের সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সারকথা—আত্ম-বুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগম্য সুখকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দকেই আমাদের শাস্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানেন ; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত সকলেই পাইতে পারে এবং সকলেরই তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। পশুধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত সুখ এবং মানবীয় সুখের মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই; এবং এই আত্মানন্দ কেবল বাহ্য উপাধিসমূহের উপর কখন নির্ভর না করিবার কারণে সমস্ত সুখের মধ্যে উহাই নিত্য, স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে—“নির্ব্বাণের শান্তি” (গী, ৬. ১৫) অর্থাৎ পরমশান্তি এবং ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের ব্রাহ্মী অবস্থার চরম সুখ (গী, ২. ৭১ ; ৬ ২৮ ; ১২. ১২ ; ১৮. ৬২ দেখ)।

এখন স্থির হইল যে, আত্মার শান্তি বা সুখই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সুখ; উহা আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত উহা লাভ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, সকল ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও কেবল সুবর্ণ হইতেই লৌহ প্রভৃতি অন্য ধাতু বিনা যেমন

সংসারের কাজ চলে না, কিংবা চিনি অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও, লবণ বিনা যেমন কাজ চলে না ; সেইরূপ আত্মসুখ বা শান্তির বিষয়েও বুঝিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই শান্তির সহিত অন্তত শরীর-ধারণার্থও কোন কোন ঐহিক পদার্থের প্রয়োজন আছে ; এবং এই অভিপ্রায়েই আশীর্ব্বাদের সংকল্পে কেবল ‘শান্তিরস্তু’ বলিয়া “শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু” অর্থাৎ শান্তির সঙ্গে পুষ্টি ও তুষ্টিও চাই—এইরূপ বলিবার রীতি আছে। কেবল শান্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া যায় ইহা যদি শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে এই সংকল্পের মধ্যে ‘পুষ্টি’ শব্দের বৃথা সন্নিবেশ করিবার কোন হেতু থাকিত না। ইহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, পুষ্টির অর্থাৎ ঐহিক সুখবৃদ্ধির জন্য দিনরাত হায় হায় করিতে হইবে। উক্ত সংকল্পের ভাবার্থ এই যে, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি (সন্তোষ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, এবং এই তিনই পাইবার জন্য তোমার যত্ন করা কর্ত্তব্য। কঠোপনিষদেরও ইহাই তাৎপর্য্য। নচিকেতা যম-লোকে গমন করিলে পর যম তাহাকে কোন তিনটি বর চাহিতে বলিলেন। তদনুসারে প্রার্থিত বর তাঁহাকে দিলেন, এই কথাই এই উপনিষদে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় নচিকেতা একেবারে প্রথম হইতে আমাকে “ব্রহ্মজ্ঞান দান কর” এইরূপ বর না চাহিয়া “আমার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন আমার উপর প্রসন্ন হন,” এই বর চাহিলেন। পরে তিনি দ্বিতীয় বর চাহিলেন যে, “অগ্নি অর্থাৎ ঐহিক সমৃদ্ধি-উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর”। এই দুই বর প্রাপ্ত হইলে পর, শেষে তিনি যমের নিকট তৃতীয় বর চাহিলেন যে, “আমাকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দেও”। কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অনেক সম্পদ দিতেছি—এই কথা যমযখন বলিলেন, তখন—অর্থাৎ প্রেয় (সুখ) প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক যজ্ঞাদি কর্ম্মের লাভ হইলে পর, তাহার সম্বন্ধে অধিক আশা না করিয়া নচিকেতা এই বিষয়েই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, “এক্ষণে, যাহাতে শ্রেয় (আত্যন্তিক সুখ) লাভ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমাকে বল।” সারকথা এই যে, এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ এবং ‘যোগবিধি’ অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি—এই দুই-ই লাভ করিয়া নচিকেতা মুক্ত হইয়াছিলেন (কঠ, ৬.১৮)। ইহা হইতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের সমুচ্চয়ই উপনিষদের তাৎপর্য্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইন্দ্রেরও এই প্রকারের একটা কথা আছে। ইন্দ্র তো স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেনই, কিন্তু আবার তিনি প্রতর্দ্দনকেও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন, কৌষীতকী উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত আছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্যে গিয়া প্রহ্লাদ ত্রৈলোক্যাধিপতি হইলে পর, ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “শ্রেয় কিসে হয় তাহা আমাকে বল।” তখন বৃহস্পতি রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, “ইহাই শ্রেয়” (এতাবচ্ছ্রেয় ইতি)। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া “আরও বেশী কিছু আছে কি” (কো বিশেষো ভবেৎ ?) পুনরায় এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, বৃহস্পতি তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও ঐরূপ ঘটিলে পর, শুক্রাচার্য্য বলিলেন যে, “উহা প্রহ্লাদের ভাল জানা আছে।” তখন শেষে ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া ইন্দ্র প্রহ্লাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন প্রহ্লাদ তাহাকে বলিলেন যে, শীলই (সত্য ও ধর্ম্মানুসারে

আচরণ করিবার স্বভাব) ত্রৈলোক্যের রাজ্যলাভের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তাহাই শ্রেয়ঃ। তাহার পর, প্রহ্লাদ যখন বলিলেন যে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি ভাগ বান, তোমাকে বর দান করিব, তখন ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র এই বর চাহিলেন যে, "তোমার 'শীল' আমাকে দেও"। প্রহ্লাদ 'তথাস্তু' বলিতেই তাঁহার 'শীল' ও তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, শ্রী অথবা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাহার ফলে ইন্দ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (শা, ১২৪) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন। এই সুন্দর ইন্দ্র-প্রহ্লাদের কথা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, নিছক ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা নিছক্ আত্মজ্ঞান যদি যোগ্যতরও হয়, তথাপি এ জগতে যাহারথাকিতে হইবে তাহার অন্য লোকেরই মতো আপনার জন্য এবং আপনার দেশের জন্য ঐহিক সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকারও আছে ; সেই কারণে যখন এই প্রশ্ন উঠে যে. এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য কি, তখন আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্রে শেষ উত্তর এই পাওয়া যায় যে, শান্তি ও পুষ্টি, শ্রেয় ও প্রেয় কিংবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য—দুই-ই এক সঙ্গে অর্জ্জন কর। যে ভগবান অপেক্ষা এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাঁহার পথ ধরিয়া অন্য সকল লোকই চলিতেছে, (গী, ৩. ২৩) সেই ভগবানই কি ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন ?—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়বিষয়কে 'ভগ' বলে—ভগ শব্দের এই ব্যাখ্যা পুরাণাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে (বিষ্ণু, ৬. ৫. ৭৪ দেখ)। কেহ কেহ এই শ্লোকের ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ 'যোগৈশ্বর্য্য' করেন ; কারণ, শ্রী অর্থাৎ সম্পদ-সূচক শব্দ পরে আসিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারে ঐশ্বর্য্যশব্দে সত্তা, যশ ও সম্পদ, এবং জ্ঞানে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের সমাবেশ হয়, তাই অনায়াসে বলিতে পারি যে, লৌকিক দৃষ্টিতে উক্ত শ্লোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য এই দুই পদেই ব্যক্ত হয়। আর যখন স্বয়ং ভগবানই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন উহাই প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ করা আবশ্যক (গী, ৩. ২১ ; মভা, শাং, ৩৪১. ২৫)। নিছক আত্মজ্ঞানই এই সংসারে পরম সাধ্য বস্তু, ইহা কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধান্ত কখনই নহে ; সংসার দুঃখময় বলিয়া উহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা সন্ন্যাসমার্গের সিদ্ধান্ত। ভিন্ন ভিন্ন মার্গের এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়া গীতার অর্থের বিপর্য্যয় করা উচিত নহে। তথাপি মনে রাখিবেন, গীতাই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল ঐশ্বর্য্যআসুরী সম্পদ। তাই ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্ঞানএবং জ্ঞানের সহিত ঐশ্বর্য্য, কিংবা শান্তি ওপুষ্টিএইদুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানের সহিত ঐশ্বর্য্য হওয়া অত্যাবশ্যক বলাতেই, কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা স্বতই আসিয়া পড়ে। কারণ মনু বলিয়াছেন, "কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষংশ্রীর্নিষেবতে" (মনু. ৯. ৩০০) কর্ম্মকারী ব্যক্তিই এই জগতে শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করে। প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয় ; এবং গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ৮)। মোক্ষদৃষ্টিতে কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকায় অর্থাৎ জ্ঞান-

লাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু আপাতত কেবল সুখদুঃখেরই বিচার করা কর্ত্তব্য ; এবং এ পর্য্যন্ত মোক্ষ ও কর্ম্মের স্বরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই; তাই এই আপত্তির উত্তর এখানে দেওয়া যাইতে পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার আলোচনা করিয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে শূন্যগর্ভ তাহা দেখান যাইবে।

সুখ ও দুঃখ দুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা, সুখেচ্ছা কেবল সুখোপভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে দুঃখই অধিক অনুভূত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই দুঃখ এড়াইবার জন্য তৃষ্ণা বা অসন্তোষকে এবং তাহার সহিত সমস্ত কর্ম্মকে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত নহে ; কেবল ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকাই শ্রেয়স্কর। কেবল বিষয়োপভোগসুখ কখনই পূর্ণ হয় না, উহা অনিত্য ও পশুধর্ম্ম ; অতএব এই সংসারে বুদ্ধীন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্যের যাহা প্রকৃত ধ্যেয় তাহা উহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শেরহওয়া চাই; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে যে শান্তিসুখ পাওয়া যায় সেই শান্তিসুখই মনুষ্যের প্রকৃত ধ্যেয় ; কিন্তু আধ্যাত্মিকসুখই এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও উহার সঙ্গে এই সাংসারিক জীবনে ঐহিক বস্তুসমূহেরও যথোচিত আবশ্যকতা আছে, এবং এই কারণেনিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্ম করাও আবশ্যক,—এই কথাগুলি কর্ম্মযোগশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইলে পর, সুখদৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাযে, কেবল আধিভৌতিকসুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কেবল সুখদুঃখাত্মক বাহ্য পরিণামের তারতম্য হইতেই নীতিমত্তার নির্ণয় করা উচিত নহে। কারণ, যে বস্তু পরিপূর্ণাবস্থায় কখনও স্বতঃ আসিতে পারে না, তাহাকে পরম সাধ্য মনে করা অর্থাৎ 'পরম' শব্দের অপব্যবহার করিয়া মৃগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই অসঙ্গত। পরম সাধ্যই যখন অনিত্য ও অপূর্ণ হইল, তখন তাহার আশায় থাকিলে অনিত্য বস্তু ছাড়া আর কি পাইবে ? "ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে" এই বচনের মর্ম্মও ইহাই। "অধিক লোকের অধিকসুখ" এই বাক্যের মধ্যে সুখশব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদীদিগের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অনেক সময় মনুষ্য সমস্ত বিষয়সুখকে পদাঘাত করিয়া কেবল সত্যের জন্য বা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয় ; কাজেই ইহা মনে করা অনুচিত যে, আধিভৌতিক সুখপ্রাপ্তির জন্যই মনুষ্যের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়। তাই, তাঁহারা সূচনা করিয়াছেন যে, সুখশব্দের বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্দ জুড়িয়া দিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই সূত্রের "অধিক লোকের অধিক হিত বা কল্যাণ" এইরূপ রূপান্তর করিতে হইবে। কিন্তু এত করিয়াও এ মতে এই দোষ থাকিয়া যায় যে, কর্ত্তার বুদ্ধির কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এই মতে থাকিয়া যায়। ভাল, বিষয়সুখের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইবে যদি বলা যায়, তাহা হইলে উহার আধিভৌতিক পক্ষের এই প্রথম প্রতিজ্ঞারই বিরোধ হয় যে, সকল কর্ম্মেরই নীতিমত্তা কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির করা আবশ্যক—এবং তখন তো কোন-না-কোন অংশে অধ্যাত্মপক্ষ একরকম স্বীকার করিতেই হয়। যখন এই প্রকারে শেষে অধ্যাত্মপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তখন আধাআধি স্বীকার করিয়া লাভ কি ? অতএব আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্রে এই শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে যে,

সর্ব্বভূতহিত, অধিক-লোকের অধিক সুখ, এবং মনুষ্যত্বের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতি-নির্ণয়ের সমস্ত বাহ্য সাধন কিংবা আধিভৌতিক মার্গ গৌণ জানিয়া এবং আত্মপ্রসাদরূপ আত্যন্তিক সুখ ও তাহার সহস্থায়ী কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই আধ্যাত্মিক কষ্টিপাথর জানিয়া তাহা দ্বারাই কর্ম্ম-অকর্ম্মের পরীক্ষা করা আবশ্যক। দৃশ্য জগতের অতীত তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশ করিব না বলিয়া যাঁহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। যাঁহারা এ প্রকার শব্দ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের যুক্তি হইতে বুঝা যাইবে যে, মন ও বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্ম্মযোগশাস্ত্রে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বেদান্তে একবার প্রবেশ করিলেই যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়, সেখানে আর ব্যবহারের যুক্তি খাটে না, এইরূপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, তাহা ভ্রান্ত ধারণা। আজকাল সাধারণতঃ বেদান্তবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ পড়িতে পাওয়া যায়, সেগুলি সন্ন্যাসমার্গ অনুযায়ী লিখিত হয় বলিয়া এবং সন্ন্যাসমার্গে তৃষ্ণারূপী সংসারের সমস্ত ব্যবহারই অসার মনে করা হয় বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কর্ম্মযোগের যথার্থ উপপত্তি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। অধিক কি, এই পরসম্প্রদায়-অসহিষ্ণু গ্রন্থকারেরা সন্ন্যাসমার্গের যুক্তিক্রম কর্ম্মযোগেরমধ্যে গুঁজিয়া দিয়া যাহাতে সাধারণ লোকের ধারণা হয় যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ নহে, সন্ন্যাসই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত মোক্ষমার্গ, তাঁহার জন্য প্রযত্ন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে। সন্ন্যাস-মার্গের ন্যায় কর্ম্মযোগমার্গও বৈদিক ধর্ম্মে অনাদিকাল হইতে স্বতন্ত্ররূপে চলিয়া আসিতেছে; এবং এই মার্গের প্রচারকেরা বেদান্ততত্ত্ব না ছাড়িয়া দিয়াও কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রের উপপত্তি ঠিক ঠিক প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা গ্রন্থ এই পন্থারই গ্রন্থ। গীতাকে ছাড়িয়া দিলেও জানা যাইবে যে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রের বিচার আলোচনা করিবার পদ্ধতি স্বয়ং ইংলণ্ডেই গ্রীণের ন্যায় গ্রন্থকারেরা সুরু করিয়াছেন;* এবং জর্ম্মাণীতে তো গ্রীণের পূর্ব্বেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দৃশ্য জগতের যতই বিচার আলোচনা করা হোক্ না কেন, কিন্তু এই জগতের সাক্ষী ও কর্ম্মকর্ত্তা কে, ইহা যে পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক অবগত হওয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই জগতের মনুষ্যের পরম সাধ্য, শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বা অন্তিম ধ্যেয় কি, তাহারও বিচার অপূর্ণই থাকিবে। তাই, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশ উপস্থিত প্রকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। দৃশ্য জগতের পরীক্ষা করিয়া যদি পরোপকাররূপ তত্ত্বই পরিশেষে নিষ্পন্ন হয়, তবে ইহা দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য হ্রাস না হইয়া উল্টা উহা দ্বারা সর্ব্বভূতে একই আত্মা থাকিবার আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। আধিভৌতিকবাদী যে স্বরচিত সীমার বাহিরে যাইতে পারেন না, তাহার কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি এই সংকীর্ণ সীমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, এবং এই কারণে তাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টিতেই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি দিয়াছেন। এই উপপত্তির কথা বলিবার পূর্ব্বে, কর্ম্মাকর্ম্মপরীক্ষা সম্বন্ধে আর এক পূর্ব্বপক্ষেরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক, তাই এক্ষণে সেই পন্থা সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত

* Prolegomena to Ethics, Book I; Kant's Metaphysics of Morals (trans, by Abbot in Kant's Theory of Ethics.)

ষষ্ঠ প্রকরণ

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার

সত্যপূতাং বদেদ্বাচম্ মনঃপূতং সমাচরেৎ।*

মনু. ৬. ৪৬।

আধিভৌতিক মার্গ ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আর এক মার্গ আছে, তাহা আধিদৈবতবাদীদিগের মার্গ। এই মার্গের লোকেরা বলেন যে, যে সময়ে মনুষ্য কর্ম্মাকর্ম্মের বা কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করে সেই সময়ে কোন কর্ম্ম হইতে কাহার কত সুখ বা দুঃখ হইবে, অথবা সেগুলি হইতে সুখের মোট সংখ্যা বা দুঃখের মোট সংখ্যা অধিক হইবে, মনুষ্য এইরূপ গোলযোগের মধ্যে কিংবা আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে কখনই পড়ে না। অনেকে, এইরূপ গোলযোগ আছে বলিয়াই জানে না। অধিকন্তু, প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কর্ম্ম যে কেবল নিজের সুখের জন্য করে এইরূপ নহে। আধিভৌতিকবাদী যাহাই বলুন না কেন। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় মানব-মনের অবস্থা কিরূপ হয়, একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে, কারুণ্য, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি মানব-মনের স্বাভাবিক ও উচ্চ মনোবৃত্তিসকলই কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করায়। উদাহরণ, যথা—কোন ভিখারীকে দেখিয়া তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিলে জগতের কিংবা নিজের আত্মার কতটা কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মনুষ্যের মনে আসিবার পূর্ব্বেই মনুষ্যহৃদয়ে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং সে আপন শক্তি অনুসারে ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়াই খালাস হয়। সেইরূপ ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে দুধ দিবার সময়, কত লোকের কতটা হিত হইবে ইহার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তাহার মা তাহাকে দুধ দেয়। সুতরাং এই উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহই কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। এই মনোবৃত্তিসকল আমাদিগকে কেহ দেয় নাই; কিন্তু এগুলি নিসর্গসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক, কিংবা এক ভাবে স্বয়ম্ভূ দেবতা। বিচারপতি আপন বিচার-আসনে বসিলে, তাঁহার বুদ্ধিতে ন্যায়দেবতার প্রেরণা হয় এবং তিনি সেই প্রেরণা অনুসারে ন্যায়-বিচার করেন; কিন্তু যখন কোন বিচারপতি এই প্রেরণাকে গ্রাহ্য না করেন, তখনই তাঁহার হাত দিয়া অন্যায়-বিচার বাহির হয়। ন্যায়-দেবতার মতোই কারুণ্য, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যানুরাগ, ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণসমূহের যে সকল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহারাও দেবতা। এই দেবতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ প্রত্যেকেরই স্বভাবতঃ জানা আছে; কিন্তু লোভ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কোন কারণবশত যদি সে দেবতাদিগের প্রেরণা গ্রাহ্য না করে, তবে দেবতারা কি করিবেন? ইহা সত্য যে, কখনো কখনো এই দেবতাদিগেরও মধ্যে লড়াই বাধিয়া যাওয়ায় কোন কার্য্য করিবার সময় কোন্ দেবতার প্রেরণা বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করিব, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়। এই

* "সত্যের দ্বারা যাহা পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বাক্য বলিবেক এবং মন যাহা শুদ্ধ মনে করিবে তাহাই আচরণ করিবেক।"

সংশয়ের নির্ণয়ার্থ ন্যায় কারুণ্যাদি দেবতাগণের অতিরিক্ত অপর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অবসরে অধ্যাত্মবিচারের কিংবা সুখদুঃখের তারতম্যের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোদেবতার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সে-ই এই দুয়ের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেয়স্কর, শীঘ্রই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। তাহার কারণ এই যে, উপরি-উক্ত সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যে মনোদেবতা শ্রেষ্ঠ। 'মনোদেবতা' শব্দে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত মনোবিকারের সমাবেশ করা ঠিক নহে; কিন্তু এই শব্দের দ্বারা ভালমন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদত্ত বা স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে তাহাই ধরিতে হইবে। এই শক্তির 'সদসদ্বিবেকবুদ্ধি' * এই এক বড় নাম আছে। কোন সংশয় প্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শান্তভাবে যদি ক্ষণমাত্র বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে এই সদসদ্বিবেকবুদ্ধি কখনই তাহাকে ধোঁকা লাগাইবে না বা পরিত্যাগ করিবে না। অধিক কি, এইরূপ প্রসঙ্গে "তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর" এইরূপেই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। কোন্ সদ্গুণের কোন্ সময়ে কতটা গুরুত্ব দিতে হইবে, এই বড় দেবতার নিকট সেই বিষয়ের একটা সূচী বা স্মারকলিপি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। সেই লিপি অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা আপন নিষ্পত্তি ব্যক্ত করেন। মনে কর যে, কোনো সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিল এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন এই সংশয় নিবারণের জন্য শান্তচিত্তে এই মনোদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিলে তখনি "অভক্ষ্য ভক্ষণ কর" এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপ স্বার্থ ও পরার্থ বা পরোপকার ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চ্চনার দ্বারা করিতে হইবে। মনোদেবতার আপন ঘরের, ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্যের এই সূচী বা স্মারকলিপি এক গ্রন্থকার শান্তভাবে বিচার করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; এবং তাঁহার নিজ গ্রন্থে উহা প্রকাশ করিয়াছেন; † এই স্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে প্রথম আসন অর্থাৎ অত্যুচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার নীচে কারুণ্য, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবসমূহকে ক্রমশঃ নীচের শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে। নীচের ও উপরের ধাপের সদ্গুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবামাত্র অপেক্ষাকৃত উপর-উপর ধাপের সদ্গুণগুলিকেই অধিকাধিক মান দেওয়া আবশ্যক, ইহাই এই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। কার্য্যাকার্য্যের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার মতে, ইহা অপেক্ষা যোগ মার্গ আর নাই। কারণ আমাদের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় তাহা সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিলেও, এই তারতম্য-বুদ্ধিতে ইহা বলিবার অধিকার নাই যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয় তুমি তাহা কর; তাই শেষে "অধিক লোকের অধিক হিত" আমি কেন করিব এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি

* এই সদসদ্বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজীতে conscience বলে; এবং আধিদৈবতাবাদ অর্থে Intuitionist School বলে।

† এই গ্রন্থকারের নাম James Martineau (জেমস্ মার্টিনো)। ইনি এই স্মারকলিপি নিজের Types of Ethical Theory (Vol. II. P. 266. 3d Ed.) নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। মার্টিনো আপন পন্থাকে Idiopsychological এই নাম দিয়াছেন কিন্তু আমি উহা আধিদৈবতবাদেরই সামিল করিতেছি।

হয় না। সুতরাং সমস্ত ঝগড়া যেখানে ছিল সেখানেই থাকিয়া যায়। কোন বিচারপতি রাজার নিকট অধিকার না পাইয়া কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে সেই নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, দূর-দৃষ্টিতে সুখদুঃখের বিচার করিয়া যে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। তুমি এইরূপ কর, এই কাজটা তোমার করিতেই হইবে, একথা কেবল দূর-দৃষ্টি কাহাকেও বলিয়া দিতে পারে না। কারণ, দূর-দৃষ্টি যতই কেন হোক না, তাহা মনুষ্যকৃত বলিয়া মনুষ্যের উপরে নিজের শাসনাধিকার বিস্তার করিতে পারে না। এইরূপ প্রসঙ্গে, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকারবিশিষ্ট কাহারো নিকট হইতে আদেশ পাওয়া আবশ্যক। এবং ঐ কার্য্য ঈশ্বরদত্ত সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিই করিতে পারে, কারণ উহা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং মনুষ্যের উপর নিজের অধিকার স্থাপনে সমর্থ। এই সদসদ্বিবেকবুদ্ধি বা 'দেবতা' স্বয়ম্ভু হওয়া প্রযুক্ত প্রচলিত ব্যবহারে এই-রূপ বলিবার রীতি হইয়া গিয়াছে যে, আমার 'মনোদেবতা' আমাকে অমুক প্রকারের সাক্ষ্য দিতেছেন না। কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে পশ্চাত্তাপবশতঃ সে নিজেই লজ্জিত হয় এবং তাহার মনে সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহাও এই মনোদেবতার শাসনের ফল। ইহা দ্বারাও স্বতন্ত্র মনোদেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আমার মন আমাকে কেন কষ্ট দেয়, আধিভৌতিক মতে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত এই প্রশ্নের আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য আধিদৈবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য দেশের এই মতবাদ প্রায় খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা এই ঈশ্বরদত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহ্য। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এইরূপ স্বতন্ত্র কোন পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে মহাভারতের অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ব্ব প্রকরণে বলাও হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, শীল, শ্রী প্রভৃতি দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে বিরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। কার্য্যাকার্য্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়কারী দেবতার নামও 'ধর্ম্ম'ই দেওয়া হইয়াছে। শিবি রাজার আত্মবলের পরীক্ষা করিবার জন্য শ্যেনের রূপ ধরিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে যক্ষের রূপ ধরিয়া ও শেষে কুকুরের রূপ ধরিয়া ধর্ম্ম প্রকট হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ভগবদ্গীতাতেও (১০. ৩৪) কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা মনের ধর্ম্ম। মনও এক দেবতা, এবং পরব্রহ্মের প্রতীক মানিয়া তাহার উপাসনাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে (তৈ, ৩. ৪, ছা, ৩. ১৮)। "মনঃপূতং সমাচরেৎ",—মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে— মনু যখন ইহা বলিতেছেন (৬. ৪৬), তখন ইহাই মনে হয় যে, 'মন' শব্দে মনোদেবতাই মনুর অভিপ্রেত। প্রচলিত ব্যবহারে আমি বলি যে, "যাহা ভাল লাগে তাহাই করিবে"।

'মনঃপূত' এই শব্দের অর্থ মারাঠীতে উল্টা হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক সময়, যাহা মনে হয় তাহাই যদৃচ্ছাক্রমে করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 'মনঃপূত' আচরণ এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ "মনেতে যাহা পবিত্র কিংবা শুদ্ধ

বলিয়া উপলব্ধি হইবে তাহাই করিবে"—এইরূপ। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে মনু এই বিষয় আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :(মনু, ৪. ১৬১)—

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ—"যে কর্ম্ম করিলে আমার অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট হয় তাহা সযত্নে করিবেক, এবং তাহার বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক"। সেইরূপ আবার চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মাদির ব্যবহারিক নীতির মূলতত্ত্ব বলিবার সময় মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিগ্রন্থকারও বলিতেছেন :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ—"বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার, এবং আপনার আত্মার ভাল লাগা, ধর্ম্মের এই চারি মূলতত্ত্ব" (মনু, ২. ১২)। "আপনার আত্মার যাহা ভাল লাগে" ইহার অর্থ—মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার হইতে কোন কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব নির্ণয় হইতে না পারিলে তখন উহা নির্ণয় করিবার চতুর্থ সাধন হইতেছে 'মনঃপূততা' এইরূপ বুঝিতে হইবে। মহাভারতে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্রের কথা বিবৃত করিবার পর "শীলের" লক্ষণ দিবার সময় ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিয়াছেন—

যদন্যেষাং হিতং ন স্যাৎ আত্মনঃ কর্ম্ম পৌরুষম্ ।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥

অর্থাৎ—আমরা যে কর্ম্ম লোকের হিতকর নহে কিংবা যাহার জন্য নিজেরই লজ্জা হয়, সে কর্ম্ম কখনই করা উচিত নহে। (মভা, শাং, ১২৪. ৬৬)। "লোকের হিতকর নহে" ও "লজ্জা হয়" এই দুই পদে, 'অধিক লোকের অধিক হিত' ও 'মনোদেবতা' এই দুই পক্ষেরই উল্লেখ এই শ্লোকে একত্র কিরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। মনুস্মৃতিতেও (১২. ৩৫, ৩৭) উক্ত হইয়াছে যে, যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা বোধ হয় তাহা তামসিক এবং যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা বোধ হয় না ও অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট থাকে তাহা সাত্ত্বিক। ধম্মপদ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই প্রকার বিচার দৃষ্ট হয় (ধম্মপদ ৬৭ ও ৬৮ দেখ)। কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ—"সৎব্যক্তি নিজের অন্তঃকরণের সাক্ষ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন"—কালিদাসও তাহা বলিয়াছেন (শকুং ১. ২০)। পাতঞ্জল যোগ শিক্ষা দেয় যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া একই বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখিতে হইবে। এই যোগশাস্ত্র আমাদের এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত; তাই কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে স্বস্থ ও শান্ত করিয়া যাহা উচিত মনে হয় তাহাই করিবে—এ কথা আমাদের দেশের কাহাকেও শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের আরম্ভে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, স্মৃতিকার ঋষি নিজের মনকে একাগ্র করিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবৃত করিতেন, (মনু ১. ১)। 'যে কোন কর্ম্মে মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত'—এই মার্গ প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত সুলভ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে 'শুদ্ধ মন' কাহাকে বলে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করিতে থাকি ; তখন এই সহজ মতটি শেষ পর্য্যন্ত কাজ দিতে পারে

না ; কারণ আমাদের শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ইমারত এই কাঁচা ভিত্তির উপর দাঁড় করান নাই। এই তত্ত্বজ্ঞানটি কি, এক্ষণে তাহার বিচার করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা এই আধিদৈবতমতবাদের খণ্ডন কিরূপ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, এই বিষয়ে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই দুই পন্থার যুক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও এই উভয়ের শেষ সিদ্ধান্ত একই প্রকার। অতএব প্রথমে আধিভৌতিক যুক্তিগুলি বলিলে আধ্যাত্মিক যুক্তিসমূহের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা পাঠকদিগের শীঘ্র উপলব্ধি হইবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে, আধিদৈবিক পন্থায় শুদ্ধ মনকেই অগ্রস্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকট হইতেছে যে, 'অধিক লোকের অধিক সুখ' এই আধিভৌতিক নীতি-পন্থায় কর্ত্তার বুদ্ধি বা হেতুর কোন বিচার না করিবার যে দোষ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই আধিদৈবত মতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সদসদ্বিবেকরূপী শুদ্ধ মনো-দেবতা কাহাকে বলা হইবে তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অনেক অপরিহার্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন বিষয় ধর না কেন, তাহার সমস্ত দিক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি অযোগ্য অথবা তাহা লাভজনক বা সুখজনক কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখের কাজ নহে ; কিন্তু এই কাজ এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের, যাহাকে মন বলা যায়। অর্থাৎ কার্য্যা-কার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় মনই করিয়া থাকে ;—তাকে তুমি ইন্দ্রিয়ই বল আর দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের মত যদি এইমাত্র হয় তাহা হইলে কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভাল বা মন্দ (সৎ বা অসৎ) ন্যায্য বা অন্যায্য, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের নির্ণয় করা এক ; আর কোন পদার্থ ভারী বা হাল্কা, সাদা বা কালো, কিংবা গণিতের কোন উদাহরণ ঠিক কি ভুল, তাহা নির্ণয় করা আর এক কথা। এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের নির্ণয় মন ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ, অতএব সেই কার্য্য সদসদ্বিবেচনরূপ যে দেবতা মনেতে আছেন কেবল তিনই করিয়া থাকেন। ইহার কারণ তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, কোনও হিসাব ঠিক কি ভুল স্থির করিবার সময় আমরা সেই হিসাবের তেরিজ, গুণফল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহার পর আমাদের মত স্থির করি ; অর্থাৎ এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে মনের অন্য কোন ক্রিয়া বা ব্যাপার করা দরকার। কিন্তু ভল মন্দের নির্ণয় সেরূপ নহে। কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে। শুনিবামাত্র "ছিঃ ! সে বড়ই মন্দ কাল করিয়াছে" এই রূপ উচ্ছ্বাসোক্তি আমাদের মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হইয়া পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিচার করিতে হয় না। সুতরাং কোনই বিচার না করিয়া আপনা আপনি যে নির্ণয় করা যায়, এবং বিচার করিয়া যে নির্ণয় করা যায়, এই দুইই একই মনোবৃত্তির ব্যাপার, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেই জন্য সদসদ্বিবেচনশক্তিকেও এক স্বতন্ত্র মানসিক দেবতা মানিতে হয়। সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই শক্তি বা দেবতা সমানরূপে জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ মনে করে ; এবং সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু শিখাইতেও হয় না। আধিভৌতিক পন্থার লোকেরা এই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এই উত্তর দেন

যে, কেবল "আমি দুএকটা বিষয়ের নির্ণয় একেবারেই করিতে পারি" এইটুকু হইতে স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, যে বিষয়ের নির্ণয় আমাদের বিচার করিয়া করা হয়, তাহা উহা হইতে ভিন্ন। কোন কাজ দ্রুত বা রহিয়া বসিয়া করা অভ্যাসের কাজ। ধরুন, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মন থেকেই সেরছটাকের দর চট্ করিয়া মুখে মুখে গণিতের প্রণালীতে হিসাব করিয়া বলিতে পারে; তাই বলিয়া বলা যায় না যে, উত্তম গণিতবেত্তা হইতে তাহার গণন করিবার শক্তি বা দেবতা ভিন্ন। সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে কিছু বিচার না করিয়াও মনুষ্য তাহা শীঘ্র ও সহজে করিয়া যায়। উত্তম লক্ষ্যভেদী মনুষ্য বন্দুকে উড়োপাখী সহজে মারিয়া থাকে, তাই বলিয়া লক্ষ্যভেদের এক স্বতন্ত্র দেবতা আছে এরূপ কেহ বলিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, কিরূপে 'তাক্' করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা করিতে হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও কেহ নিরর্থক ও ত্যাজ্য বলিতে পারে না। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেই শত্রুর ছিদ্র কোথায়, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নজরে পড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধকলা এক স্বতন্ত্র দেবতা এবং অন্য মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাবতঃ বেশী, আর কাহারও বা কম, ইহা সত্য; কিন্তু কেবল সেই কারণেই উভয়ের বুদ্ধি বস্তুত ভিন্ন, তাহা আমি বলিতে পারিনা। তাছাড়া এ কথাও সত্য নহে যে, কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় একাএক হইয়া যায়। যদি তাহাই হইত, তবে এই প্রশ্নই কখনও উপস্থিত হইত না যে, "অমুক কাজ করা উচিত অথবা করা অনুচিত"। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার প্রশ্ন প্রসঙ্গ-অনুসারে অর্জ্জুনের ন্যায় সকলেরই সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে; এবং কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কোন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সদসদ্বিবেচনশক্তিরূপ স্বয়ম্ভূ দেবতা যদি একই হন তবে এই ভেদ কেন? কাজেই বলিতে হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি যে পরিমাণে সুশিক্ষিত বা সুসংস্কৃত হইবে, সেই পরিমাণেই যোগ্যতার সহিত সে কোন বিষয়ের নির্ণয় করিবে। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে যাহারা মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া হত মনুষ্যের মাংসও আনন্দে আহার করে! অসভ্য লোকের কথা ছাড়িয়া দাও। সভ্য দেশেও দেখা যায় যে, দেশাচার অনুসারে কোন এক দেশে যাহা গর্হিত বলিয়া মনে করে, অন্য এক দেশে তাহাই সর্ব্বমান্য হইয়া থাকে। উদাহরণ—এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়া গণ্য; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহা বিশেষ দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভরপুর সভার মধ্যে মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া বসা হিন্দুলোকের নিকট লজ্জা ও অমর্য্যাদার কথা। কিন্তু ইংরেজ লোক মাথা হইতে টুপি খোলাই সভ্যতার লক্ষণ মনে করে। যদি ঈশ্বরদত্ত বা স্বাভাবিক সদসদ্বিবেচনশক্তি প্রযুক্তই মন্দ কর্ম্ম করিতে লজ্জাবোধ করা সত্য হয়, তাহা হইলে সকলেই একই কার্য্যে একই রকম লজ্জা বোধ করে না কেন? বড় বড় দস্যুও যাহার অন্ন একবার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা নিন্দনীয় মনে করে; কিন্তু বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করা স্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্বিবেচনশক্তিরূপ দেবতা যদি একই হয় তাহা হইলে এই

পার্থক্য কেন মানা যায়? এবং যদি বলা যায় যে, সদসদ্বিবেচনশক্তিরও শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার অনুসারে ভেদ হয়, তাহা হইলে তাহার স্বয়ম্ভূ নিত্যত্ববিষয়ে বাধা আসে। অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়া মনুষ্য যেমন যেমন সভ্য হইতে থাকে সেই অনুসারে তাহার মন ও বুদ্ধি বিকশিত হইতে থাকে; এবং এই প্রকারে বুদ্ধির বিকাশ হইলে পর পূর্ব্বে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে যে সকল বিষয়ে বিচার সে করিতে পারিত না, এক্ষণে সভ্য অবস্থায় সেই সকল বিষয়েরই বিচার সে সত্বর করিতে প্রবৃত্ত হয়। অথবা বলিতে হয় যে, এই প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। সুসভ্য কিংবা সুশিক্ষিত মনুষ্য যে অপরের কোন বস্তু দেখিবামাত্র চাহিয়া বসে না বা লইতে ইচ্ছা করে না, ইহা তাহার ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পরিণাম। সেইরূপ ভাল-মন্দ নির্ণয় করিবার মনের শক্তিও আস্তে আস্তে বুদ্ধি পায়, এবং এখন তো কোন কোন বিষয়ে উহা এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, কোন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমরা নিজের নৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি। চক্ষু দ্বারা নিকটের কিংবা দূরের বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষু, শিরা, ও স্নায়ু ন্যূনাধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং এই সব ক্রিয়া এত দ্রুত হইয়া থাকে যে আমরা তাহা জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ এই বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা, মনুষ্যের মন বা বুদ্ধি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকাজে একই। কালো ও সাদার নির্ণয় একপ্রকারের বুদ্ধি করে এবং ভালমন্দের নির্ণয় অন্য প্রকারের বুদ্ধি করে, এ কথা ঠিক নহে। কাহারো বুদ্ধি কম থাকে, আর কাহারও বুদ্ধি অশিক্ষিত বা অপরিণত থাকে, এইটুকুই যা প্রভেদ। এই ভেদের প্রতি, এবং কোন কার্য্য দ্রুত করিতে পারা যে অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা স্থির করিয়াছেন যে, মনের যে স্বাভাবিক শক্তি সমূহ আছে তাহার ওদিকে সদসদ্বিচারশক্তি বলিয়া কোন আলাদা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের এই সম্বন্ধীয় চরম সিদ্ধান্তও পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীদিগেরই ন্যায়। স্বস্থ ও শান্ত চিত্তে সকল বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের বুদ্ধি এক, এবং কালোসাদা বুঝিবার বুদ্ধি আর-এক, এ মত তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মন যে পরিমাণে সুশিক্ষিত হইবে সেই পরিমাণে সে ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারিবে, তাই মনের উন্নতিসাধনের জন্য প্রত্যেকের যত্ন করা আবশ্যক, এবং এই উৎকর্ষ কিরূপে সাধন করিতে হইবে তাহার নিয়মও তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সদসদ্বিবেচনশক্তি সাধারণ বুদ্ধি হইতে কোন ভিন্ন বস্তু বা ঈশ্বরের দান, এমত তাঁহারা মানেন না। মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার মন বা বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করিয়া চলে, প্রাচীন কালে তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র অর্থে শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে আত্মা। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার আধ্যাত্মবিদ্যার মূল। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্যার ঠিক্ জ্ঞান হইলে পর, শুধু সদসদ্বিবেচনশক্তি কেন, কোন মনোদেবতারই অস্তিত্ব আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট বা স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই অবস্থাতে আধিদৈবত পক্ষ স্বতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই এক্ষণে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্যারই সংক্ষেপে বিচার করা

হইবে। ভগবদ্‌গীতার অনেক সিদ্ধান্তেরই প্রকৃত অর্থও এই বিচারসূত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি হইবে।

মনুষ্যের দেহ (পিণ্ড, ক্ষেত্র, বা শরীর) একটা মস্ত বড় কারখানা বলিলেও চলে। কোন কারখানা যেরূপ বাহিরের পণ্যদ্রব্য প্রথমে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাহার পর সেই মালের বাছাই বা ব্যবস্থা করিয়া পরে কারখানার উপযোগী পদার্থ কোন্‌গুলি এবং অনুপযোগী কোন্‌গুলি তাহা স্থির করিয়া বাহির হইতে ভিতরে-আনা কাঁচা মাল হইতে নূতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা বাহিরে পাঠান হয়, সেইরূপ মনুষ্যের দেহের মধ্যেও প্রতিক্ষণে অনেক ব্যাপার চলিতে থাকে। এই জগতের পাঞ্চভৌতিক পদার্থসম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহই প্রথম সাধন। এই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জাগতিক পদার্থের প্রকৃত বা মূল স্বরূপ জানা যায় না। আধিভৌতিক-বাদিগণের মত এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে পদার্থসমূহ যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাদের যথার্থ স্বরূপ তাহাই। কিন্তু কাল যদি আমরা কোন নব ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণধর্ম্ম বর্ত্তমান হইতে যে ভিন্ন হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও দুই ভেদ আছে—এক কর্ম্মেন্দ্রিয়। দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়, হাত, পা, বাক্‌-যন্ত্র, গুদ ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা যে কোনো ব্যবহার করি সে সমস্তই এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই করিয়া থাকি। নাক, চোখ, কান, জিভ ও ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করি। যে কোন বাহ্য পদার্থই ধর না কেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা উক্ত পদার্থের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বাহিরে অন্য আর কিছুই নহে। উদাহরণ যথা—ধর, এক টুকরা সোনা। উহা চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, ত্বকের নিকট কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয়, পিটলে লম্বা হয়, ইত্যাদি তাহার যে গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহাকেই আমরা সোনা বলি এবং এই গুণসকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে একই রকমে দেখিতে পাওয়া গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে সোনা এক স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া এবং ভিতরের মাল বাহিরে পাঠিয়ে দিবার জন্য যেরূপ কোন কারখানার দরজা থাকে, সেইরূপ মানবদেহে বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপী দ্বার আছে এবং ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ দ্বার আছে। সূর্য্যের কিরণ কোন পদার্থের উপর পড়িয়া তথা হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমাদের আত্মার সেই পদার্থের রূপসম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন পদার্থ হইতে নিঃসৃত গন্ধের সূক্ষ্ম পরমাণু আমাদের নাকের মজ্জাতন্তুর উপর আসিয়া পড়িলে আমাদের নিকট তাহার গন্ধ আসে। অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারও এইরূপেই চলিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল এইরূপে ব্যাপার করিতে থাকিলে তাহাদের দ্বারা বাহ্য জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল যে কোন ব্যাপার করে তাহাদের জ্ঞান স্বতঃ তাহাদের হয় না, তাই জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে 'জ্ঞাতা' না বলিয়া শুধু বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার 'দরজা' বলা হইয়াছে। এই দরজা দিয়া মাল ভিতরে আসিয়া পড়িলে পর, তাহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা করা মনের কাজ। উদাহরণ

যথা—দ্বিপ্রহর হইলে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিতে থাকিলে তখনই আমাদের মন বুঝিতে পারে না যে কয়টা বাজিয়াছে। কিন্তু যেমন যেমন ঘড়িতে 'ঠন্‌ঠন' করিয়া এক একটি আওয়াজ হইতে থাকে, তেমনি তেমনি বায়ুতরঙ্গ আমাদের কানে আসিয়া আঘাত করে, এবং মজ্জাতন্তুর দ্বারা প্রত্যেক আওয়াজের পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথমে আমাদের মনের উপর হয় এবং শেষে এই সকল মিলিত করিয়া কয়টা বাজিল তাহা আমরা স্থির করি। জ্ঞানেন্দ্রিয় পশুদিগেরও আছে। ঘড়ির এক এক ঠোকা যেমন যেমন পড়িতে থাকে, তেমনি তেমনি প্রত্যেক ধ্বনির সংস্কার তাহার কান দিয়া মন পর্য্যন্ত পৌঁছায় ; কিন্তু তাহারা ঐ সমস্ত সংস্কারকে একত্র করিয়া বারোটা বাজিল বলিয়া স্থির যে করিতে পারিবে, তাহাদের মন এতটা বিকশিত হয় নাই। এই শব্দ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে হইলে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, পশুর একাধিক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান হইলেও তাহার সেই অনেকতার মধ্যে একত্বের বোধ হয় না। ভগবদ্‌গীতাতে আছে—"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ"—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল (বাহ্য) পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ (গীতা ৩. ৪২)। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহারও ভাবার্থ। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মন স্থির না হইলে চোখ খোলা থাকিলেও কিছুই দেখা যায় না এবং কান খোলা থাকিলেও কিছুই শোনা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, এই দেহরূপী কারখানায় 'মন' একটি মুন্সী (কেরাণী), যাহার নিকট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের সমস্ত মাল প্রেরিত হয় ; এবং এই মুন্সী (মন) ঐ মালের যাচাই করে। এখন বিচার করিতে হইবে যে, এই যাচাই কিরূপে করা হয়, এবং এ পর্য্যন্ত আমরা যাহাকে সাধারণত মন বলিয়া আসিয়াছি, তাহারও আর কত প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে, কিংবা একই মন অধিকারভেদে কি-কি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে মনের উপর যে সকল সংস্কার ঘটে সেগুলি প্রথমে একত্র করিয়া এবং তাহাদের পরস্পর তুলনা করিয়া নির্ণয় করিতে হয় যে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি গ্রাহ্য আর কোন্‌টি ত্যাজ্য, এবং কোন্‌টি লাভজনক ও কোন্‌টি ক্ষতিজনক। ইহা নির্ণয় হইলে পর, তাহাদের মধ্যে যেটি ভাল, গ্রাহ্য, লাভজনক, উচিত বা করিবার যোগ্য তাহাই করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। ইহাই সাধারণ মানসিক ব্যবহার। উদাহরণ যথা—আমরা কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিকা এই দুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের মনের উপর বাগানের গাছ ও ফুলগুলির সংস্কার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই ফুলগুলির মধ্যে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোন্‌টির গন্ধ খারাপ, এই জ্ঞান আমাদের আত্মাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছা মনে উৎপন্ন হয় না এবং তাহা তুলিবার উদ্যোগও আমরা করি না। অতএব সমস্ত মনোব্যাপারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান পাইয়া সেই সকল সংস্কারের তুলনার জন্য ব্যবস্থাপূর্ব্বক সাজাইয়া রাখা ; (২) এইরূপ ব্যবস্থার পর তাহাদের ভালমন্দের সারাসার বিচার করিয়া কোন্‌টি গ্রাহ্য ও কোন্‌টি ত্যাজ্য তাহা স্থির করা ; এবং (৩) এই নিশ্চয় হইলে পর, গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহ্য বস্তু ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া আবার সেই অনুসারে প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু ইহা আবশ্যক নহে যে, এই তিন ক্রিয়া ব্যবধান বিনা সঙ্গে সঙ্গে

একের পিছনে আর একটি হইতে থাকিবে। ইহা সম্ভব যে, পূর্ব্বদৃষ্ট কোন বস্তুর ইচ্ছা আজ হইল ; কিন্তু ইহাতেই বলা যাইতে পারে না যে, উক্ত তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। বিচারের কাছারী এক হইলেও যেখানে যেমন কাজের এইরূপ বিভাগ আছে—প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদী কিংবা তাহাদের উকিল আপন আপন সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের সাক্ষীসাবুদ দেখিয়া তাহার উপর বিচারপতি আপন বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং বিচারপতি-কৃত নিষ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে ; ঠিক সেইরূপ এই পর্য্যন্ত যে মুন্সীকে আমরা সাধারণত 'মন' বলিয়া আসিয়াছি, তাহার ব্যাপারসমূহেরও বিভাগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সম্মুখে উপস্থিত বিষয়সমূহের সারাসার বিচার করিয়া কোন এক বিষয় অমুক প্রকারেরই (এবমেব) অন্য প্রকারের নহে (নাঽন্যথা), এইরূপ নিশ্চয় করিবার কাজ (অর্থাৎ কেবল বিচারপতির কাজ) বুদ্ধি নামক ইন্দ্রিয়ের। উপরি কথিত সমস্ত মনোব্যাপার হইতে এই সারাসার বিবেকশক্তিকে পৃথক্ করিলে পর, কেবল বাকী সমস্ত ব্যাপারেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহাকেই সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রে মন বলে (সাং. কা. ২৩ ও ২৭ দেখুন)। এই মন উকিলের মতো কোন বিষয় এইপ্রকার (সংকল্প), কিংবা ইহার বিপরীত ঐ প্রকার (বিকল্প), ইত্যাদি কল্পনাসমূহকে বুদ্ধির সমক্ষে নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত করে। তাই ইহাকে 'সংকল্পবিকল্পাত্মক' অর্থাৎ নিশ্চয়কারী না বলিয়া শুধু কল্পনাকারী ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। 'সংকল্প' শব্দে কখন কখন 'নিশ্চয়ের' ও অর্থ সমাবেশ করা যায় (ছান্দোগ্য, ৭. ৪. ১ দেখ)। কিন্তু এখানে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া অমুক বিষয় অমুক প্রকারের মনে করা, মানা, কল্পনা করা, বুঝা কিংবা কিছু যোজনা করা, ইচ্ছা করা, চিন্তা করা, মনে আনা ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্যেই 'সংকল্প' শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু উকিলের মতো এই প্রকার নিজ কল্পনাসমূহকে বুদ্ধিসমক্ষে নিষ্পত্তির জন্য কেবল উপস্থিত করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বুদ্ধি দ্বারা ভালমন্দের নির্ণয় হইলে পর, যে বিষয় বুদ্ধি গ্রাহ্য মানিয়াছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহারই আচরণ করা অর্থাৎ বুদ্ধির আজ্ঞাকে কার্য্যে পরিণত করা—এই নাজিরের কাজও মনেরই করিতে হয়। তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও করিতে পারা যায়। ইহা বলিতে কোনই আপত্তি নাই যে, বুদ্ধিকৃত নির্ণয়কে কিরূপে আমলে আনিতে হইবে তাহার যে বিচার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার সংকল্পবিকল্পাত্মকই। কিন্তু ইহার জন্য সংস্কৃতভাষায় 'ব্যাকরণ-বিস্তার করা' এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত কাজ বুদ্ধিরই। এই পর্য্যন্ত মন নিজেই কল্পনাসমূহের সারাসার বিচার করে না। সারাসার বিচার করিয়া কোন এক বস্তুর যথার্থ জ্ঞান আত্মার করাইয়া দেওয়া, কিংবা বাছাই করিয়া অমুক বস্তু অমুক প্রকারের তাহা নিশ্চয় করা বা তর্কের দ্বারা কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিয়া নিশ্চিত অনুমান করা, অথবা কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করা, এই সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধির। সংস্কৃত ভাষায় এই ব্যাপারসমূহকে 'ব্যবসায়' বা 'অধ্যবসায়' বলে। তাই, এই দুই শব্দের উপযোগ করিয়া 'বুদ্ধি' ও 'মন' ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইবার জন্য মহাভারতে (শাং ২৫১. ১১) এই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ মনো ব্যাকরণাত্মকম্ ॥

"বুদ্ধি (ইন্দ্রিয়) ব্যবসায়কারী অর্থাৎ সারাসারবিচারপূর্ব্বক নিশ্চয়কারী ; এবং মন ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তারকারী—যে পরবর্ত্তী ব্যবস্থাকারী প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মক এবং মন ব্যাকরণাত্মক"। ভগবদ্গীতাতে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ" এই শব্দের উল্লেখ আছে (গী, ২. ৪৪) ; এবং সেই স্থানেও বুদ্ধির অর্থ 'সারাসারবিচারপূর্ব্বক নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়ই। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি কেবল এক তলোয়ার মাত্র। যাহা কিছু তাহার সম্মুখে আসে বা আনীত হয়, তাহার কাটাছাঁটা করাই তাহার কাজ ; তাহার অন্য কোনও গুণ বা ধর্ম্ম নাই (মভা. বন. ১৮১.২৬)। সংকল্প, বাসনা, ইচ্ছা, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারুণ্য, উৎকণ্ঠা, প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ ইত্যাদি সমস্ত মনেরই গুণ বা ধর্ম্ম (বৃ. ১. ৫. ২, মৈত্র্যু, ৬. ৩০)। এই সকল মনোবৃত্তি যেমন যেমন জাগ্রত হয় তেমনি তেমনি কর্ম্ম করিবার দিকে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণ, যথা—মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন এবং যতই ভালরূপে গরীব লোকেদের অবস্থা জানুক না, তাহার মনে যদি করুণাবৃত্তি জাগ্রত না হয় তাহা হইলে তাহার গরীবদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা কখনই হইবে না। অথবা, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে বিষয় আমরা করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে বুদ্ধি কেবল তাহাই বলিয়া দেয়। ইচ্ছা কিংবা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বুদ্ধির ধর্ম্ম না হওয়ায় বুদ্ধি আপনা হইতে অর্থাৎ মনের সাহায্য ব্যতীত কখনই ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণা দিতে পারে না। উল্টাপক্ষে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া স্বয়ং মন ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণা দিতে পারিলেও বুদ্ধির সারাসার বিচারব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিসমূহের প্রেরণার দ্বারা সংঘটিত কর্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই তাহা বলা যায় না। উদাহরণ যথা—বুদ্ধির উপযোগ না করিয়া শুধু করুণাবৃত্তি হইতে কোন দান করিলে তাহা কোনো অপাত্রে পড়িয়া তাহার মন্দ পরিণাম হইবার সম্ভাবনা আছে। সার কথা—বুদ্ধির সাহায্যব্যতীত মনোবৃত্তি সকল অন্ধ। তাই মনুষ্যের কোনো কাজ তখনই শুদ্ধ হইতে পারে, যখন বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ভালমন্দের অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারে, মন, বুদ্ধির অনুরোধে কার্য্য করে ; এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনে অবস্থিত। বুদ্ধি ও মন এই দুই শব্দ ব্যতীত 'অন্তঃকরণ' ও 'চিত্ত' এই দুই শব্দও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 'অন্তঃকরণ' শব্দের ধাত্বর্থ "অন্তরস্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়", এইজন্য তাহার মধ্যে মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণতঃ সমাবেশ করা হয় ; এবং মনে সর্ব্বপ্রথম বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাই চিত্ত হয় (মভাঁ. শা. ২৭৪, ১৭)। কিন্তু সাধারণব্যবহারে এই সমস্ত শব্দ প্রায় একই অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকসময় কোন অর্থ কোথায় বিবক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাই উক্ত অনেক শব্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই দুই শব্দই উপরি-প্রদত্ত নিশ্চিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মন ও বুদ্ধির ভেদ স্থাপন করিলে, বিচারপতির অধিকারসূত্রে বুদ্ধিকেই মন অপেক্ষা কাজেকাজেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয় ; এবং মন ঐ বিচারপতি বুদ্ধির মুন্সি বা কেরাণী হইয়া দাঁড়ায়। "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ"—মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বা অতীত (গী, ৩. ৪২) গীতা-

বাক্যের ভাবার্থও এই। তথাপি উপরি-উক্ত অনুসারে ঐ কেরাণীকেও দুই প্রকারের কাজ করিতে হয়—এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অথবা বাহির হইতে ভিতরে আনীত সংস্কার-সমূহের ব্যবস্থা করিয়া, উহাদিগকে নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধির সমক্ষে স্থাপন করা; এবং দ্বিতীয়, বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে পর, বুদ্ধির হুকুম বা আদেশ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যক বাহ্যক্রিয়া করাইয়া লওয়া। দোকানের জন্য জিনিস খরিদ করা ও দোকানে বসিয়া বিক্রী করা, এই দুই কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের একই কর্ম্মচারীকে করিতে হয়, সেইরূপ মনেরও দুই কাজ করিতে হয়। আমাদের কোন স্নেহপাত্র আমাদের নজরে পড়িলে এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইলে আমরা তাকে 'ওরে' বলিয়া ডাকি। এই ব্যাপারটিতে অন্তঃকরণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ। প্রথমে চোখ অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সংস্কার মনের মারফত বুদ্ধির নিকট পাঠাইল যে, আমাদের স্নেহপাত্র নিকটে আছে; আবার বুদ্ধির মারফত সেই জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইল জ্ঞান হইবার ক্রিয়া। তাহার পর, সেই স্নেহপাত্রকে হাঁক দিয়া ডাকিতে হইবে, আত্মা বুদ্ধির দ্বারা ইহা স্থির করে; এবং বুদ্ধির এই অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলিবার ইচ্ছা হয় এবং মন আমার জিহ্বা (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) দ্বারা 'ওরে' শব্দ বলাইয়া থাকে। পাণিনির শিক্ষাগ্রন্থে শব্দোচ্চারণক্রিয়ার বর্ণনা এই ভাবেই করা হইয়াছে।

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুংক্তে বিবক্ষয়া
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥

অর্থাৎ—"আত্মা প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বিষয় আয়ত্তগত করিয়া মনোমধ্যে বলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন করে; এবং মন কায়াগ্নিকে চালিত করিবার পর কায়াগ্নি বায়ুকে প্রেরিত করে। তদনন্তর, এই বায়ু বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দ্র স্বর উৎপন্ন করে।" এই স্বর পরে কণ্ঠতালব্যাদিবর্ণভেদে মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। উপরিউক্ত শ্লোকের শেষ দুই চরণ মৈত্র্যুপনিষদেও প্রদত্ত হইয়াছে (মৈত্র্য, ৭. ১১); এবং ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, এই শ্লোক পাণিনি হইতেও প্রাচীন।* "আধুনিক শরীরশাস্ত্রে কায়াগ্নিরই নাম 'মজ্জাতন্তু'। কিন্তু বহিঃপদার্থের জ্ঞান অন্তরে আনিবার জন্য যে মজ্জাতন্তু এবং বুদ্ধির আদেশ কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে মনের দ্বারা সম্পাদন করিবার জন্য যে মজ্জাতন্তু, এই দুই মজ্জাতন্তু বিভিন্ন; তাই তদনুসারে মনও দুই বলিয়া মানিতে হইবে, এইরূপ পাশ্চাত্য শারীরশাস্ত্রজ্ঞদিগের উক্তি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা দুই মন না মানিয়া, বুদ্ধি ও মনকে পৃথক্ করিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন যে, মন উভয়াত্মক অর্থাৎ তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিকট কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অনুরূপ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। উভয়ের তাৎপর্য্য একই। উভয়ের দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্চয়কারী বিচারপতি এবং মন প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট সংকল্প-বিকল্পাত্মক হইয়া যায় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিকট

* মৈত্র্যুপনিষৎ পাণিনি হইতে প্রাচীন, এইরূপ মোক্ষমূলর সাহেব লিখিয়াছেন। Sacred Books of the East Series, Vol. XV. PP XL V. II—LI. ইহার বিস্তৃত বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি, তাহা দেখুন।

ব্যাকরণাত্মক বা কার্য্যসম্পাদক অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের 'ব্যাকরণ' অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময়, বুদ্ধির হুকুম কি প্রকারে পালন করা যাইবে, সে সম্বন্ধে কখনো কখনো সংকল্প-বিকল্প করাও মনের আবশ্যক হয়। তাই, মনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, সাধারণত 'সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ', এইরূপ বলিবারই রীতি আছে। কিন্তু মনে রেখো যে, সে সময়েও উহার মধ্যে মনের দুই ব্যাপারেরই সমাবেশ হইয়া থাকে।

'বুদ্ধি' কিনা নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয়, এই যে অর্থ উপরে বলা হইয়াছে তাহা কেবল শাস্ত্রীয়ও সূক্ষ্ম বিচারের জন্য উপযোগী। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অর্থের নির্ণয় প্রায়ই পরে করা হয়। তাই, এখানে এই শাস্ত্রীয় অর্থ নিশ্চিত হইবার পূর্বেই 'বুদ্ধি' শব্দের যে ব্যবহারিক অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাও এখানে বিচার করা আবশ্যক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কোনও বিষয়ের প্রথম নির্ণয় না করিলে, সেই বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয় না; এবং জ্ঞান না হইলে সে বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা বাসনাও হয় না। তাই ব্যবহারে, আম গাছ ও ফল উভয়েতেই যেরূপ 'আম' এই একই শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ও সেই বুদ্ধির বাসনাদি ফল, উভয়েতেই ব্যবহারে সাধারণ লোক অনেক সময় এই একই বুদ্ধিশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা—অমুকের বুদ্ধি দুষ্ট এইরূপ যখন আমরা বলি তখন তাহার বাসনা দুষ্ট এইরূপ অর্থে বলিয়া থাকি। শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইচ্ছা বা বাসনা মনের ধর্ম্ম হওয়ায় তাহার বুদ্ধি নাম দেওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু বুদ্ধি শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ নিষ্কর্ষিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ ব্যবহারে লোকেরা এই দুই অর্থে বুদ্ধি শব্দের প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে—(১) নির্ণয়-কারী ইন্দ্রিয় এবং (২) সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মনুষ্যের মনে উৎপন্ন বাসনা বা ইচ্ছা। তাই আমের ভেদ দেখাইতে হইলে যেমন 'গাছ' ও 'ফল' এই শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ বুদ্ধির দুই অর্থের প্রভেদ দেখান যখন আবশ্যক হয় তখন নির্ণয়কারী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধির সহিত 'ব্যবসায়াত্মিকা' এই বিশেষণ সংযোজিত করা হয়, এবং বাসনাকে শুধু 'বুদ্ধি' বড় জোর 'বাসনাত্মক' বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। গীতাতে উপরি-উক্ত দুই অর্থেই 'বুদ্ধি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (গী, ২, ৪১. ৪৪, ৪৯; ৩. ৪২)। কর্ম্মযোগের বিচার ঠিক্ বুঝিতে হইলে 'বুদ্ধি' শব্দের উপরি-উক্ত দুই অর্থই সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। মনুষ্য যে-কোন কর্ম্ম করুক না কেন, তাহার মনো-ব্যাপারের ক্রম এইরূপ—সেই কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, করণীয় কি করণীয় নহে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার সে প্রথমে 'ব্যবসায়াত্মিক' বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ে দ্বারাই করিয়া থাকে; এবং পরে সেই কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বা বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া তাহাকে উক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করে। কার্য্যাকার্য্যের নিষ্পত্তি করা, যাহা (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, উহা স্বস্থ ও শান্ত থাকিলে, নিরর্থক অন্য বাসনা (বুদ্ধি) মনেতে উৎপন্ন হইয়া মনকে বিগড়াইতে পারে না। তাই প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও স্থির করা গীতান্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪১। শুধু গীতায় নহে, ক্যাণ্টও * বুদ্ধির এইরূপ দুই ভেদ করিয়া শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক

* ক্যাণ্ট এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে Pure reason এবং বাসনাত্মক বুদ্ধিকে Practical Reason নাম দিয়াছেন; এবং দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে এই দুই বুদ্ধির বিচার আলোচনা করিয়াছেন।

বুদ্ধির ও ব্যবহারিক অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধির ব্যাপারাদি দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। বস্তুত দেখিলে প্রতীতি হয় যে, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে সুস্থির করা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিষয়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের নহে। কিন্তু কর্ম্মের বিচার করিবার সময় কর্ম্মের পরিণামের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কর্ম্মকর্ত্তার বাসনা অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি কিরূপ তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই হইল গীতার সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪৯)। এবং এই প্রকারে বাসনার বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি সুস্থির ও শুদ্ধ হয় নাই, তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সেইজন্য বলা যায় না যে, সেই বাসনা সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই (গী. ২. ৪১)। বাসনা শুদ্ধ না হইলে পরবর্ত্তী কর্ম্ম কি করিয়া শুদ্ধ হইবে? তাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রেও ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ রাখিবার সাধনা অথবা উপায়সমূহের সবিস্তার বিচার করা আবশ্যক হয়; এবং এই জন্যই ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার এক সাধন, এই দৃষ্টিতে পাতঞ্জল যোগের বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কোন সাম্প্রদায়িক টীকাকার গীতার তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন যে পাতঞ্জল যোগই গীতার প্রতিপাদ্য। এক্ষণে গীতাশাস্ত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের উপরি-প্রদত্ত দুই অর্থ ও সেই দুই অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ মনে রাখা আবশ্যক, তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে।

সে যাক্, মানব-অন্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মন ও বুদ্ধির কাজ কি, এবং বুদ্ধি শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে মন ও ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদ্বিবেক-দেবতার কাজটা কি, তাহা দেখা যাক্। ভালমন্দ নির্বাচন করাই এই দেবতার কাজ হওয়ায় মনের মধ্যে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না। এবং একমাত্র ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিই যে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া নির্ণয় করে বলিয়া সদসদ্বিবেকরূপ দেবতার জন্য কোন স্বতন্ত্র স্থান থাকে না। ইহা নিঃসন্দেহ যে, যে কথার বা বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই সমস্ত বিষয় অনেক হইতে পারে। যেমন বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমা, মহাজনী, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিবিধ প্রসঙ্গে সারাসার বিচার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার; এবং সেই জন্য বিবেক অথবা নির্ণয়কারী বুদ্ধিও একই হওয়া চাই। কিন্তু মনের ন্যায় বুদ্ধিও শারীরধর্ম্ম হওয়া প্রযুক্ত পূর্ব্বকর্ম্মের অনুসারে, বংশানুক্রমিক বা আনুষঙ্গিক সংস্কার-বশতঃ বা শিক্ষাদি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি ন্যূনাধিক পরিমাণে সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে। কারণ, একের বুদ্ধিতে যে গ্রাহ্য প্রতীত হয়, তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, মনে কর চোখ। কাহারও চোখ ট্যারা, কাহারও বোজা, আর কাহারও বা কাণা; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, আর কাহারও বা স্বচ্ছ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে, বহু—তাহা আমরা বলিতে পারি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই ন্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে বুদ্ধির দ্বারা চাউল কিংবা গম জানা যায়; যে বুদ্ধির দ্বারা পাথর ও

হীরার প্রভেদ জানা যায়; যে বুদ্ধি দ্বারা কালো, সাদা বা মিষ্ট-কটুর জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, কিংবা সৎ কি আর অসৎ কি, লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং কার্য্য ও অকার্য্যের ভেদ কি, এই সমস্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষ নির্ণয়ও করিয়া থাকে। সাধারণ ব্যবহারে 'মনো-দেবতা' বলিয়া উহার যতই গৌরব করা হউক না কেন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে উহা একই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি। এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে বলিয়াছেন ঃ—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

অর্থাৎ "কোন্ কর্ম্ম করিবে, কোন্ কর্ম্ম করিবে না, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম্ম করা অনুচিত; কোন্ বিষয়ে ভয় করিবে কোন্ বিষয়ে ভয় করিবে, না, বন্ধন কিসে হয় আর মোক্ষ কিসে হয়, যে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল বিষয়ের (যথার্থ) জ্ঞান হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি" (গী ১৮. ৩০)। এইরূপ বলিবার পর বলিয়াছেন যে ঃ—

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥

অর্থাৎ—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কিংবা কার্য্য ও অকার্য্যের যথার্থ নির্ণয় যে বুদ্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সর্ব্বদা ভুল করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিই রাজসিক" (১৮. ৩১)। এবং শেষে বলিয়াছেন—

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥

অর্থাৎ—"যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত বা উল্টা নির্ণয় করে সেই বুদ্ধি তামসী" (গী, ১৮. ৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কেবল ভালমন্দনির্ণয়কারী অর্থাৎ সদসদ্বিবেকবুদ্ধিরূপ স্বতন্ত্রও পৃথক্ দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি নিয়ত ভালোর নির্ণয়কারী কখনই হইতে পারে না—এইরূপ ইহার অর্থ নহে। উপযুক্ত শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি একই; এবং ঠিক ঠিক নির্ণয় করিবার সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ঐ এক বুদ্ধিতেই পূর্ব্বসংস্কার, শিক্ষা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিংবা আহারাদির কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং এই পূর্ব্বসংস্কারাদির কারণের অভাবেই ঐ বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের ন্যায় অন্যান্য বিষয়েও রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে। চোর ও সাধুদের অথবা বিভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, সদসদ্বিবেচনশক্তিকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মানিলে সেরূপ হয় না। আপনার বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি মনুষ্যে হিত কিসে হয় জানিতে পারে না, এবং তার নির্ণয় বা পরীক্ষা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়দের মর্জ্জি অনুসারে চলে, সে পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিকে 'শুদ্ধ' বলা যাইতে পারে না। সেইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতে না দিয়া, আমাদের এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে মন ও

ইন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীনে আসে। ভগবদ্‌গীতাতে অনেক স্থানে এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে (গী, ২. ৬৭, ৬৮ ; ৩. ৭, ৪১ ; ৬. ২৪, ২৬) ; এবং কারণ এই যে, কঠোপনিষদে শরীরের সহিত রথের উপমা দিয়া এই রূপক বাঁধা হইয়াছে যে, ঐ শরীররূপী রথে যোজিত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে বিষয়োপভোগমার্গে সুনিয়মে চালাইবার জন্য ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধিরূপ সারথীকে মনোময় লাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানিয়া ধরিতে হইবে (কঠ, ৩. ৩. ৯)। মহাভারতেও দুই তিন স্থানে এই রূপকই কিছু ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত গৃহীত হইয়াছে (মভা. বন. ২১০, ২৫ ; স্ত্রী, ৭. ১৩ ; অশ্ব, ৫১. ৫)। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বর্ণনা করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ তত্ত্ববেত্তা প্লেটোও আপন গ্রন্থে (ফীড্রস ২৪৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টান্তই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাতে এই দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে ; তথাপি উপরে নির্দ্দেশিত গীতার শ্লোকে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা যে এই দৃষ্টান্তটি মনে রাখিয়াই করা হইয়াছে, তাহা এই বিষয়ের পূর্ব্বাপর ধারা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের চোখে ইহা না পড়িয়া থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মভেদ করিবার আবশ্যকতা যখন হয়, তখন উহাকেই মনোনিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে মন ও বুদ্ধির যখন ভেদ করা হয়, তখন নিগ্রহের কর্ত্তৃত্ব মনের হাতে না থাকিয়া ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়া যায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া, সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই আত্মা আছে এই তত্ত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক ; ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে ইচ্ছা, বাসনা, ইত্যাদি মনোধর্ম্ম (কিংবা বাসনাত্মক বুদ্ধি) স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্মের দিকে ইন্দ্রিয়দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইহাই সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্ম্মযোগশাস্ত্রের রহস্য।

মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অতিরিক্ত সদসদ্‌বিবেকশক্তিরূপ স্বতন্ত্র দেবতার অস্তিত্ব আমাদের শাস্ত্রকারেরা কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরিউক্ত বিচার আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। তাঁহাদের মতেও মনকে বা বুদ্ধিকে গৌরবার্থে দেবতা বলিতে কোন বাধা নাই ; কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে মন বা বুদ্ধি বলি, তাহা হইতে ভিন্ন ও স্বয়ম্ভূ সদসদ্‌বিবেক নামক কোন তৃতীয় দেবতার অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। 'সতাং হি সন্দেহপদেষু' এই বাক্যে 'সতাং' পদের উপযোগিতা ও গুরুত্ব এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যাঁহাদের মন শুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ, তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিছুই অসঙ্গত নহে ; অধিক কি, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আপনার মনকে শুদ্ধ করিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকের 'আমরাও এই রকম করেই চলি' বলিলে কখনও উচিত কথা হইবে না। কারণ, দুইজনের সদসদ্‌বিবেচনশক্তি এক হয় না,—সাধু লোকদিগের সাত্ত্বিক এবং চোরদিগের তামসিক হইয়া থাকে। সার কথা—যাহাকে আধিদৈবতপক্ষের

লোক সদসদ্‌বিবেকদেবতা বলেন, তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্বরূপসমূহেরই মধ্যে উহা এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ সাত্ত্বিক স্বরূপ, ইহাই আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত। এবং এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, আধিদৈবতপক্ষ স্বতই খোঁড়া হইয়া পড়ে।

আধিভৌতিক পক্ষ একদেশদর্শী ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও অকর্ম্মণ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি নির্দ্ধারণের অন্য কোন মার্গ আছে কি না, দেখা আবশ্যক। অন্য এক মার্গ আছে—তাহাকে আধ্যাত্মিক মার্গ বলে। কারণ, বাহ্যকর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও যখন সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ দেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন শুদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, কিংবা বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রেও এই সকল প্রশ্নের বিচার আবশ্যক হইয়া পড়ে। এবং এই বিচার শুধু বাহ্যজগতের বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রবেশ না করিলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আত্মা কিংবা পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপী প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান যে বুদ্ধির হয় নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বলা হয় তাহাই বলিবার জন্য গীতাতে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের প্রতি ঠিক লক্ষ্য না করিয়া গীতাসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, বেদান্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সম্বন্ধে উক্ত টীকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় যে ঠিক নহে, তাহা পরে সবিস্তারে দেখান যাইবে। এখানে শুধু ইহাই দেখাইব যে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য আত্মারও বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক হয়। এই আত্মার বিষয়ে এই বিচার দুই দিক্‌ দিয়া করা হয়—(১) আপন পিণ্ডের, ক্ষেত্রের, বা শরীরের এবং মনের ব্যাপারসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া উহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহার বিচার করা—(গী. অ. ১৩)। ইহারই সংজ্ঞা—শারীরক কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ; এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রকে "শারীরক (শরীরের বিচারকারী) সূত্র" বলে। নিজের শরীর ও মনের এইরূপ বিচার হইলে পর (২) দেখা আবশ্যক যে, তাহা হইতে নিষ্পন্ন তত্ত্ব, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নিষ্পন্ন তত্ত্ব, এই দুই একই কিংবা বিভিন্ন। এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত জগতের বিচার-আলোচনাকে "ক্ষরাক্ষরবিচার" কিংবা "ব্যক্তাব্যক্তবিচার" বলে। সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমস্ত নশ্বর পদার্থ 'ক্ষর' কিংবা 'ব্যক্ত' এবং সৃষ্টির অন্তর্গত নশ্বর পদার্থের মধ্যে যাহা সারভূত নিত্য তত্ত্ব তাহাই অক্ষর কিংবা অব্যক্ত (গী, ৮. ২১ ; ১৫. ১৬)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের দ্বারা এবং ক্ষরাক্ষরবিচারের দ্বারা নিষ্পন্ন এই দুই তত্ত্বের পুনর্ব্বার বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই দুই তত্ত্ব যাহা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং এই দুয়ের অতীত (পর) সমস্তের মূলীভূত যে এক তত্ত্ব আছে তাহাকেই 'পরমাত্মা' বা পুরুষোত্তম' বলা হয় (গী, ৮.২০)। ভগবদ্‌গীতাতে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে ; এবং পরিশেষে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি বুঝাইবার জন্য দেখানো হইয়াছে যে, সকলের মূলীভূত পরমাত্মরূপ তত্ত্বের জ্ঞানের

দ্বারা বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয়। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে। সদসদ্বিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহা সুরু করা হইয়াছে সেই পিণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে।

পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি,—এই সকল বিষয়ে বিচার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেই শরীরসম্বন্ধীয় বিচার পূর্ণ হয় না। মন ও বুদ্ধি, ইহারা কেবল বিচার করিবার সাধন বা ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহার অতিরিক্ত প্রাণরূপী চেতনা অর্থাৎ চেষ্টাচাঞ্চল্য যদি না থাকিত তাহা হইলে মন ও বুদ্ধি থাকা ও না থাকা সমান অর্থাৎ অনাবশ্যক বুঝা যাইত। সুতরাং শরীরের মধ্যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির অতিরিক্ত চেতনা বলিয়া আর এক তত্ত্বেরও সমাবেশ করা চাই। কখনো কখনো চেতনাশব্দের অর্থ "চৈতন্য"ও করা হয়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে চেতনাশব্দ "চৈতন্য" অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখা হয়; জড়দেহের মধ্যে যে প্রাণ-চেষ্টা বা জীবনব্যাপার দেখা যায় সেই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে চিৎশক্তির দ্বারা জড়েরও মধ্যে চেষ্টা বা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য; এই শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহারই বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃশ্যমান জীবনব্যাপার কিংবা চেতনার অতিরিক্ত বস্তু যাহাতে করিয়া আত্মপরভেদ উৎপন্ন হয় তাহাও এক পৃথক্ গুণ। কারণ, উপরি কথিত বিচার অনুসারে বুদ্ধি সারাসারের বিচার পূর্ব্বক নির্ণয়কারী এক ইন্দ্রিয় হওয়ায়, আত্মপর-ভেদের মূলস্বরূপ অহঙ্কার ঐ বুদ্ধি হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হয়। ইচ্ছাদ্বেষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্তু নৈয়ায়িক এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করায়, এই ভ্রম দূর করিবার জন্য বেদান্ত-শাস্ত্র মনের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্চমহাভূত যে মূল তত্ত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রকৃতিরূপ তত্ত্বেরও সমাবেশ শরীরেই করা হইয়া থাকে (গী. ১৩. ৫, ৬)। এই সমস্ত তত্ত্ব যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে সেই শক্তিও আবার এই সকল হইতে পৃথক। তাহাকে 'ধৃতি' বলে (গী. ১৮. ৩৩)। এই সমস্ত বিষয় একত্র করিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় তাহা শাস্ত্রে সবিকার শরীর কিংবা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং ইহাকে ব্যবহারে আমরা 'চলছে-ফিরছে', (সবিকার) এইরূপ মনুষ্যশরীর বা পিণ্ড বলিয়া থাকি। ক্ষেত্র শব্দের এই ব্যাখ্যা আমি গীতা অবলম্বনেই করিয়াছি; কিন্তু ইচ্ছাদ্বেষাদিগুণ গণনা করিবার সময় কখনও এই ব্যাখ্যার অল্পস্বল্প ইতরবিশেষও করা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—শান্তিপর্ব্বে জনক-সুলভা-সংবাদে (শাং, ৩২০) শরীরের ব্যাখ্যা করিবার সময় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে কাল, সদসদ্ভাব, বিধি, শুক্র ও বলের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই গণনা অনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয়; এবং স্বীকার করিতে হয় যে, গীতার গণনানুসারে কালের অন্তর্ভাব আকাশে এবং বিধিশুক্রবলাদির অন্তর্ভাব অন্য মহাভূতসমূহে করা হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, ক্ষেত্রশব্দের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত; অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপী বিশিষ্ট-

চেতনাযুক্ত যে 'সমুদায়', তাহারই নাম ক্ষেত্র। শরীর শব্দ মৃত দেহ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই বিষয়ের বিচারকালে শরীর শব্দ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্দই অধিক ব্যবহৃত হয়। 'ক্ষেত্র' শব্দের মূল অর্থ ক্ষেত; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, 'সবিকার ও সজীব মনুষ্যদেহ' এই অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ করা হইয়াছে। এই সবিকার ও সজীব মনুষ্যদেহই আমার উপরি-উক্ত 'বড় কারখানা'। বাহিরের মাল এই কারখানায় আনিবার এবং কারখানা হইতে ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ঐ কারখানার যথাক্রম দ্বার; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও চেতনা ঐ কারখানার কর্ম্মচারী। এই কর্ম্মচারী যে বিছু ব্যবহার বরে বা করায়, তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার বা ধর্ম্ম বলা যায়।

এই প্রকারে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে পর এই প্রশ্ন সহজে উঠে যে, এই ক্ষেত্র কিংবা ক্ষেত্র কাহার, এই কারখানার কোন মালিক আছে কি না? আত্মা শব্দ মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বয়ং—এইরূপ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের মালিক বা স্বামী। মনুষ্য যে যে ক্রিয়া করে,—তাহা মানসিক হোক্ বা শারীরিক হোক্—সে সমস্ত তাহার বুদ্ধি-আদি অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কিংবা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় উহারাও মূলে জড়দেহের কিংবা প্রকৃতিরই বিকার (পূর্ব্ব প্রকরণ দেখ)। তাই, মন ও বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও উহারা আপন-আপন বিশিষ্ট ব্যাপারের বাহিরে অন্য কিছুই করিতে পারে না; এবং পারাও সম্ভব নহে। মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধি নিশ্চয় করে, ইহা সত্য; কিন্তু ইহা হইতে এ কথা স্থির হয় না যে, এই কাজ মন ও বুদ্ধি কি জন্য করে, অথবা বিভিন্ন সময়ে মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহাদের একত্বের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্য যে একীকরণ আবশ্যক হয় সেই একীকরণ কে করে, কিংবা তদনুসারে পরে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপারকে তদনুকূল করিবার সন্ধান কি করিয়া পায়। মনুষ্যের জড়দেহই এই সমস্ত কাজ করে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, শরীরের চেতনা অর্থাৎ নড়াচড়াব্যাপার নষ্ট হইলে যে জড়দেহ অবশিষ্ট থাকে, সে এ কাজ করিতে পারে না। জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি উপাদানসমূহ অন্নেরই পরিণাম, এবং নিত্য ক্ষয়গ্রস্ত ও নিত্য নূতন নির্ম্মিত হয়; সেইজন্য, কাল যে 'আমি' অমুক বিষয় দেখিয়াছিলাম, সেই আমি আজ অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে একত্ববুদ্ধি তাহা নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জড়দেহের ধর্ম্ম, এইরূপ মানিতে পারা যায় না। ভাল; এখন জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনাকেই যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে এই আপত্তি উঠে যে, গাঢ় নিদ্রাতে প্রাণাদি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি অথবা রক্তচলাচল-আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতনা বজায় থাকিলেও 'আমি'-জ্ঞান থাকে না (বৃ. ২.১, ১৫, ১৮)। তাই, চেতনা কিংবা প্রাণাদির ব্যাপারও কেবল জড়েরই একপ্রকার বিশিষ্ট গুণ; তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারের একীকরণ করিবার মূল প্রভুশক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫.৫)। 'আমার' ও 'তোমার' এই সম্বন্ধবোধক শব্দের দ্বারা কেবল অহঙ্কাররূপী গুণের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' কে, এ বিষয়ের নির্ণয় হয় না। এই 'আমি' কে যদি নিছক ভ্রম বল, তাহা হইলে

বলিতে হয় যে, প্রত্যেকের প্রতীতি কিংবা অনুভূতি সেরূপ নহে; এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া অন্য কোন বিষয়ের কল্পনা করা কেমন ? না, যেমন শ্রীসমর্থ-রামদাস স্বামী বলিয়াছেন—

> "প্রতীতীবীণ জেঁ বোলণে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারবাণে।
> তোঁড় পসরূণ চেসেঁ সুণেঁ। রডোন গেলে ॥"

অর্থাৎ—মুখব্যাদান করিয়া কুকুরের কান্না যেমন বিরক্তিকর, প্রতীতি বিনা যাহা কিছু বলা হয় সে সমস্তই তেমনি বিরক্তিকর (দা, ৯. ৫ ১৫)। এত করিয়াও তবু ইন্দ্রিয়ব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, 'আমি' বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই; কিন্তু 'ক্ষেত্র' শব্দে মন, বুদ্ধি, চেতনা, জড়দেহ প্রভৃতি যে সকল তত্ত্বের সমাবেশ করা হইয়া থাকে, সেই সমস্তর সংঘাতক বা সমুচ্চয়কে 'আমি' বলা যায়। কিন্তু কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্স হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত করিলেই তাহাতে গতিও উৎপন্ন হয় না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই, নিছক সংঘাতের দ্বারা বা সমুচ্চয়ের দ্বারাই কর্তৃত্ব আইসে এরূপ বলা চলে না। বলা বাহুল্য যে, ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে; কিন্তু তাহাতে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা হেতু থাকে। এই ক্ষেত্ররূপ কারখানার মন, বুদ্ধি আদি সমস্ত কর্ম্মচারীকে এই বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কে বলিয়া দেয় ? সংঘাত অর্থে শুধু সমূহ। কতকগুলি পদার্থ একত্র করিলেও তাহার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক; নচেৎ উহা পুনর্ব্বার কখন-না-কখন পৃথক পৃথক হইয়া যাইতে পারে। এই যোগসূত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। সংঘাত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে; তবে তাহার গণনা ক্ষেত্রেই করা হইয়া থাকে (গী, ১৩. ৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্ষেত্রজ্ঞ কে, সংঘাতের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু প্রথমত এই মতই তো সত্য নহে, কারণ, পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না, তা এ জগতে নূতন উৎপন্ন হয় না, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীরা পূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধ করিয়াছেন (গী, ২. ১৬)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ক্ষণতরে একটু পাশে সরাইয়া রাখিলেও এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয় যে, সংঘাতে উৎপন্ন নূতন গুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া কেন স্বীকার করা যাইবে না ? এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে না, গুণের কোন-না-কোন অধিষ্ঠান থাকা চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে ইহাঁরা সমুচ্চয়কেই এই ক্ষেত্রের মালিক বলেন। ঠিক কথা; কিন্তু অ[illegible] ব্যবহারেও 'অগ্নি' শব্দের বদলে জ্বালানি কাঠ, 'বিদ্যুৎ' শব্দের বদলে মেঘ কিংবা পৃথিবীর 'আকর্ষণের' বদলে পৃথিবী, কেন বলা যায় না ? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক ব্যবস্থা ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি ব্যতীত কোন ভিন্ন শক্তি থাকা চাই, এই কথা যদি নির্ব্বিবাদ হয়; এবং যদি ইহা সত্য হয় যে ঐ শক্তির অধিষ্ঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য, কিংবা সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পূর্ণস্বরূপ ঠিক বলিতে পারা যায় না, তবে সেই শক্তিই নাই এ কথা বলা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হয় ? যেমন কোনও মানুষ নিজের কাঁধের উপর বসিতে পারে না,

সেইরূপই সংঘাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন করিয়া লয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব, দেহ ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতের ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য হইয়া থাকে, সে সংঘাত হইতে ভিন্ন, তর্কদৃষ্টিতেও এই দৃঢ় অনুমান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ত্ব স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থ-সমূহের ন্যায় ইহা নিজেই নিজের 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোন বাধা হয় না, কারণ সমস্ত পদার্থকে এই একই "জ্ঞেয়" কোঠারই শামিল করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সকল পদার্থের বর্গ বা বিভাগ হয়; যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দুই বর্গ—অর্থাৎ যে জানে, আর জানিবার বিষয়। এবং যখন কোন বস্তু দ্বিতীয় বর্গের (জ্ঞেয়) শামিল না হয়, তখন প্রথম বর্গের মধ্যে তাহার সমাবেশ হয়, এবং তাহার সত্তাও জ্ঞেয়বস্তুর সমানই পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। অধিক কি, ইহাও বলা যায় যে, সংঘাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা হওয়ায় সে তাহার জ্ঞানের বিষয় না হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই অভিপ্রায় অনুসারেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (বৃ, ২. ৪. ১৪) "ওরে! যে সমস্ত বিষয় জানে তাহার জ্ঞাতা অন্য কোথা হইতে আসিবে"?—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। তাই শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এই চেতনাবিশিষ্ট সজীব শরীরে (ক্ষেত্রে) এমন এক শক্তি আছে, যাহা হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে প্রাণ, চেতনা, মন বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শী কর্ম্মচারীদিগেরও বাহিরে থাকিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যাপারের একীকরণ করে এবং তাহারা কিরূপ ভাবে কাজ করিবে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; কিংবা যাহা তাহাদের কর্ম্মের নিত্য সাক্ষীস্বরূপ থাকিলেও তাহাদের হইতে ভিন্ন, অধিক ব্যাপক ও সমর্থ। সংখ্যা ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মান্য; এবং অর্ব্বাচীনকালে জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যাণ্টও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিব্যাপারের সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিলে এই তত্ত্বই নিষ্পন্ন হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনা এই সমস্ত, দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ বা অবয়ব। ইহাদের প্রবর্ত্তক ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ইহাদের অতীত—"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" (গী, ৩. ৪২.)। সাংখ্য-শাস্ত্রে ইহারই নাম পুরুষ। বেদান্ত ইহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আত্মা বলে এবং "আমি আছি" এই যে প্রত্যেক মনুষ্যের সাক্ষাৎপ্রতীতি, ইহাই আত্মার অস্তিত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ (বেসূ শাং ভা, ৩. ৩. ৫৩, ৫৪)। "আমি নাই" এরূপ কেহ মনে করে না। শুধু তাহা নহে; মুখে "আমি নাই" এইরূপ উচ্চারণ করিবার সময়েও 'নাই' এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তার অর্থাৎ 'আমি'র কিংবা আত্মার বা 'আপনার' অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষ রীতিতে স্বীকার করিয়াই থাকে। এই প্রকারে 'আমি' এই অহঙ্কারযুক্ত সগুণরূপে, দেহের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ত্বের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত স্বরূপটি কি, তাহারই যথাশক্তি নির্ণয়ার্থ বেদান্তশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে (গী, ১৩. ৪)। তথাপি এই নির্ণয় কেবল দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার করিয়া কি নিষ্পন্ন হয় তাহা দেখা আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড-বিচারের নামই "ক্ষরাক্ষর-বিচার"। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের দ্বারা নির্ণয় হয় যে, ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে বা পিণ্ডের মধ্যে) মূলতত্ত্ব

(ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা) কোন্‌টি ; এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারের দ্বারা বাহ্য জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্বের জ্ঞান হয়। যখন এই প্রকারে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্ধারিত হয়, তখন বেদান্তশাস্ত্রে চরম সিদ্ধান্ত করা হয় যে, * এই দুই তত্ত্ব একরূপ অর্থাৎ একই—কিংবা "যাহা পিণ্ডে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে আছে"। ইহাই চরাচর সৃষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও এই বিষয়ের বিচারালোচনা হইয়াছে এবং ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে খুড়ি মিলিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং এখনকার মত পূর্ব্বে আধিভৌতিক শাস্ত্রের উন্নতি না হইলেও যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অতি প্রাচীনকালে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন, তাঁহাদের অলৌকিক বুদ্ধিবৈভব দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। শুধু আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না, সেই সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব্ব অনুভব করাও আবশ্যক।

ইতি ষষ্ঠপ্রকরণ সমাপ্ত

———

* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার—আমাদের শাস্ত্রের এই বর্গীকরণ, গ্রীণ সাহেবের জানা ছিল না। তথাপি আপন Prolegomenato Ethics গ্রন্থের আরম্ভে তিনি অধ্যাত্মের যে বিচার করিয়াছেন তাহাতে প্রথমে Spiritual Principle in Nature এবং Spiritual Principle in Man এই দুই পৃথক ভাগ করিয়া পরে তাহাদের ঐক্য দেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে Psychology প্রভৃতি মানসশাস্ত্রের এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারে Pshysics, Metaphysics প্রভৃতি শাস্ত্রের সমাবেশ হইয়া থাকে। এই সমস্তের বিচার করিয়া পরে আত্মস্বরূপের বিচার করিতে হয়, ইহা পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগেরও মান্য।

সপ্তম প্রকরণ

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। *

গীতা, ১৩, ১৯।

শরীর এবং শরীরের অধিস্বামী বা অধিষ্ঠাতা—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহাদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ এবং তাহার মূলতত্ত্ব—ক্ষর ও অক্ষর—ইহাদেরও বিচার করিবার পশ্চাৎ আবার আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক, ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে। যোগ্য রীতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়শাস্ত্র এবং দ্বিতীয় কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র ; কিন্তু এই দুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ স্থির করিয়া বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপের নির্ণয় তৃতীয় রীতিতে করিয়াছেন। তাই বেদান্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্ব্বে, ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত কি, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক। বাদরায়ণাচার্য্যের বেদান্তসূত্রে এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে করিতে না পারিলেও ভগবদ্‌গীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক ততটুকু এ বিষয়ের উল্লেখ এই প্রকরণে ও পরবর্ত্তী প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে করিয়াছি। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাংখ্য সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, কোন শিষ্ট ও প্রমুখ বেদান্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না করিলেও কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত মনু-আদি স্মৃতি-গ্রন্থে এবং গীতাতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কথা বাদরায়ণাচার্য্যও বলিয়াছেন (বে. সূ. ২. ১. ১২ ও ২. ২. ১৭)। তাই প্রথমেই পাঠকের সাংখ্যসিদ্ধান্ত জানা আবশ্যক। তথাপি সাংখ্যশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত বেদান্তে নিঃসন্দেহে পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক যেন বিস্মৃত না হন। এখানে এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় এই যে, বেদান্ত ও সাংখ্যের যে সিদ্ধান্ত সাধারণ, তাহা প্রথমে কে আবিষ্কার করে—বেদান্ত না সাংখ্য ? কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারে প্রবেশ করা আবশ্যক নহে। এই প্রশ্নের উত্তর তিন প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম এই যে, উপনিষৎ (বেদান্ত) ও সাংখ্য, ইহাদের বৃদ্ধি দুই বৈমাত্র ভাইয়ের মতো এক সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত সাংখ্য মতের অনুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা উপনিষৎকারেরা স্বতন্ত্র রীতিতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, বেদান্তী কখনও কোন সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্র হইতে লইয়া সেগুলিকে বেদান্তের অনুকূল স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তৃতীয় এই যে, কপিলাচার্য আপন মত অনুসারে প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তেই কতক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই তিনটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতই অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়; কারণ বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়ই খুব প্রাচীন হইলেও তাহাদের মধ্যে বেদান্ত বা উপনিষৎ সাংখ্য অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন (শ্রৌত)। সে যাহাই হোক্, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত-গুলির সহিত আমাদের ভালরূপ পরিচয় হইলে, বেদান্তের—বিশেষত গীতান্তর্গত

* 'প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জান'।

বেদান্তের—তত্ত্ব-সকল শীঘ্রই আমাদের উপলব্ধি হইবে। এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচনা সম্বন্ধে এই দুই স্মার্ত্ত শাস্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব।

কোনো বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা কোন অনুমান কেমন করিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং এই অনুমানগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি ভ্রান্ত, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে, ন্যায়শাস্ত্রের ইহাই উপযুক্ত বিষয়—এইরূপ মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অনুমানাদি প্রমাণখণ্ড ন্যায়শাস্ত্রের এক ভাগ সত্য, কিন্তু ইহা তাহার মুখ্য বিষয় নহে; প্রমাণসমূহের অতিরিক্ত, জগতের অন্তর্ভুক্ত অনেক বস্তুর, অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের শ্রেণীবন্ধন বা বর্গীকরণ করিয়া, নিম্নবর্গ হইতে উচ্চতর বর্গে আরোহণ করিতে করিতে, সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল বর্গ কিংবা পদার্থ কত, তাহাদের গুণধর্ম্ম কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয় এবং এই বিষয়ে কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার ন্যায়শাস্ত্রে করা হইয়াছে। ইহাই বলা উচিত যে, শুধু অনুমানখণ্ডের বিচার করিবার জন্য নহে বরঞ্চ উক্ত প্রশ্নসমূহের বিচার করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। কণাদকৃত ন্যায়-সূত্রের আরম্ভ ও পরবর্ত্তী রচনাও এইপ্রকার। কণাদের অনুযায়ীদিগকে কাণাদ বলা যায়। ইঁহাদের মত এই যে পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখ্যা ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিকশাস্ত্রকারদিগের পরমাণু ব্যাখ্যা একই প্রকার। যে কোন পদার্থের বিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাকে (পরম-অণু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি-তেমনি সংযোগের কারণ তাহাদের মধ্যে নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। মন ও আত্মারও পরমাণু আছে; এবং উহা একত্র হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই পৃথক পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর মূল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাণুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে দুই গুণ, এবং বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ আছে। এইরূপ সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ। পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মূল কারণ নাই। সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুগণের পরস্পরসংযোগ যখন 'আরম্ভ' হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত পদার্থ সকল রচিত হইতে থাকে। ব্যক্ত সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িক-প্রতিপাদিত এই কল্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা—"আরম্ভ-বাদ"। কোনো নৈয়ায়িক ইহা ছাড়াইয়া কখনো যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইতে বলিলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পীলবঃ! পীলবঃ! পরমাণুঃ! পরমাণুঃ! পরমাণুঃ। অন্য কোন নৈয়ায়িক স্বীকার করেন যে, পরমাণুর সংযোগের নিমিত্তকারণ ঈশ্বর। এইপ্রকারে তিনি সৃষ্টির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পূর্ণ করিয়া লন। এই প্রকার নৈয়ায়িকদিগকে "সেশ্বর নৈয়ায়িক" বলা হয়। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, এই পরমাণুবাদের (২. ২. ১১-১৭) এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই "ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ" এই মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে।

উপরি উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ ডাল্টন নামক পণ্ডিতপ্রতিপাদিত পরমাণুবাদ, ইংরাজিশিক্ষিত পাঠক স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু

পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের পরমাণুবাদকে ডার্বিন নামক প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞের উৎক্রান্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, সেইরূপ আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে সাংখ্যমত কণাদের মতকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মূল পরমাণুতে গতি কিরূপে আসিল ইহা কাণাদেরা বলিতে পারে না। তদ্ব্যতীত, বৃক্ষ-পশু-মনুষ্য ইত্যাদি সচেতন প্রাণী-দিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি করিয়া হইল এবং অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া আসিল, এ সকল বিষয়েও তাহারা যথোচিত নির্ণয় করিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে লামার্ক ও ডার্বিন এবং আমাদের দেশে পুরাকালে কপিল মুনি এই নির্ণয় করিয়াছেন। একই মূলপদার্থের গুণসমূহের বিকাশ হইয়া জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই দুই মতের ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্য প্রথমে হিন্দুস্থানে এবং সমস্ত পাশ্চাত্যদেশেও পরমাণুবাদের উপর বিশ্বাস দাঁড়ায় নাই। এখন তো আধুনিক পদার্থশাস্ত্রজ্ঞেরা সিদ্ধ করিয়াছেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য নহে। আজকাল যেরূপ সৃষ্টির অনেক পদার্থের পৃথক্‌করণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক সৃষ্টিশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে পরমাণুবাদ বা উৎক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থের উপর নূতন নূতন ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখা, কিংবা তাহা-দিগকে অনেক প্রকারে পৃথক্কৃত করিয়া তাহাদের গুণধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা কিংবা সজীব জগতের প্রাচীন ও নূতন অনেক প্রাণীদিগের শারীরিক অবয়বসমূহের একত্র তুলনা করা, ইত্যাদি আধিভৌতিকশাস্ত্রের অর্ব্বাচীন যুক্তি কণাদের কিংবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় যে সকল সামগ্রী ছিল তাহা হইতেই তাঁহারা আপন সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছিলেন। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সৃষ্টির অভিবৃদ্ধি ও তাহার সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে এবং অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে অধিক প্রভেদ নাই। সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত এই মতের আধিভৌতিক উপপত্তির বর্ণনা বর্ত্তমানকালে অধিক নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে করা যাইতে পারে, এবং আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধির দরুন ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনুষ্যের অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 'একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি কি করিয়া হইল' এই বিষয়ে অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রকারও কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই পরে আমি কপিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তুলনা করিবার অভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলিরও সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি। হেকেল নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন যে, তিনি এই সিদ্ধান্ত নূতন বাহির করেন নাই; ডার্বিন, স্পেন্সর প্রভৃতি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারেই নিজের সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি সিদ্ধান্ত যথাযথ নিয়মানুসারে লিখিয়া সর্ব্বপ্রথম তিনি এই সকল একত্র জুড়িয়া "বিশ্বের রহস্য" * নামক গ্রন্থে সেগুলিকে একত্র করিয়া সরল প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন। এই কারণে সুবিধার জন্য হেকেলকেই আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রধান মানিয়া তাঁহারই মত এই প্রকরণে ও পরবর্ত্তী প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। এই উল্লেখ খুবই

* The Riddle of the Universe by Earnest Hackel. এই গ্রন্থের R. P. A. Cheap reprint সংস্করণের আমি সর্ব্বত্র উপযোগ করিয়াছি।

যে সংক্ষিপ্ত, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সকল সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এই সম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাহেন তাঁহাদের স্পেন্সর, ডার্বিন, হেকেল প্রভৃতির মূলগ্রন্থ অবলোকন করা আবশ্যক।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের বিচার করিবার পূর্ব্বে, 'সাংখ্য' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অর্থ আছে তাহা এখানে বলা আবশ্যক। প্রথম অর্থ কপিলাচার্য্যপ্রতিপাদিত সাংখ্যশাস্ত্র। তাহাই এই প্রকরণে এবং ভগবদ্‌গীতাতেও একবার (গী. ১৮. ১৩) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু, এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি আছে; এবং এই 'সাংখ্য' শব্দে বেদান্তশাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। 'সাংখ্য-নিষ্ঠা' কিংবা 'সাংখ্যযোগ' শব্দে, 'সাংখ্য' শব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়া থাকে। এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী পুরুষদিগকেও ভগবদ্‌গীতাতে যেখানে (গী. ২. ৩৯ ; ৩. ৩ ; ৫, ৪, ৫ ও ১৩. ১৪) 'সাংখ্য' বলা হইয়াছে, সেই স্থানে 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ কেবল কাপিলসাংখ্যমার্গীই নহে ; বরঞ্চ উহাতে আত্মানাত্মবিচারের দ্বারা সন্ন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেতেই যাহারা নিমগ্ন থাকে সেই সকল বৈদান্তিকেরও সমস্তঃকর্ম্মের সমাবেশ করা হইয়া থাকে। শব্দশাস্ত্রজ্ঞদিগের মত এই যে, 'সাংখ্য' শব্দ 'সং-খ্যা' ধাতু হইতে বাহির হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ 'গণনাকারী' ; এবং কপিলশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই ঐ 'গণনাকারী'র অর্থে এই বিশিষ্ট 'সাংখ্য' নাম দেওয়া হইয়াছে ; তাহার পর আবার 'সাংখ্য' অর্থাৎ সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার তত্ত্বজ্ঞান—এই ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—এইরূপ শব্দশাস্ত্র সমূহের মত। তাই, কপিলভিক্ষুকে 'সাংখ্য' বলিবার রীতি প্রথমে দাঁড়াইয়া গেলে, পরে বেদান্তী সন্ন্যাসীকেও ঐ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে ইহাই কারণ মনে হয়। যাহাই হোক, সাংখ্য শব্দের এই অর্থভেদ প্রযুক্ত পাছে গোলযোগ হয় এইজন্য ইচ্ছা করিয়াই আমি এই প্রকরণের "কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র" এই লম্বাচোড়া নাম দিয়াছি। কাণাদ ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় এই কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রেরও সূত্র আছে। কিন্তু গৌড়পাদ বা শারীরিকভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সকল সূত্র আপন গ্রন্থের প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ঐ সকল সূত্র প্রাচীন না হইতে পারে এইরূপ অনেক বিদ্বান্ লোকের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন এবং তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদ ভাষ্য লিখিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্যে এই কারিকা হইতেও অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীনীয় ভাষায় অনূদিত উক্ত গ্রন্থের ভাষান্তর অধুনা পাওয়া গিয়াছে।* 'ষষ্টিতন্ত্র' নামক ষাট প্রকরণের এক প্রাচীন ও বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া) সত্তর আর্য্যাশ্লোকে এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণ

* ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুর গুরু এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সমকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন ; এই বসুবন্ধুর পরমার্থ কর্ত্তৃক (খৃষ্টাব্দে ৪৯৯-৫৬৯) চীনীয় ভাষায় লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে ঈশ্বর-কৃষ্ণের কাল প্রায় খৃষ্টাব্দ ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টক্কসু স্থির করিয়াছেন। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. 1905 PP. 33—53. কিন্তু ডাক্তার ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে স্বয়ং বসুবন্ধুর কালই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে (প্রায় ২৮০-৩১০) ধরিতে হয় ; কারণ সেই গ্রন্থের ভাষান্তর খৃঃ ৪০৪ এ চীনীয় ভাষায় হইয়াছে। বসুবন্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়া পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও সেইরূপ প্রায় দুইশত বৎসর পশ্চাৎ অর্থাৎ খৃঃ ২৪০ ধরিতে হয়। Vincent Smith's Early History of India. 3d Ed. P. 328.

নিজের কারিকার শেষভাগে বলিয়াছেন। এই ষষ্টিতন্ত্র গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তাই এই কারিকার আধারেই কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি আমি এখানে আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতে কয়েক অধ্যায়ে সাংখ্যমতের নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৈদান্তিকমতের মিশ্রণ থাকায় শুদ্ধ কাপিল সাংখ্যমতটি কি তাহা স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রন্থও দেখা আবশ্যক হয়। এই কার্যে উক্ত সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (গী, ১০. ২৬) সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি-ভগবান গীতায় যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে কপিলের যোগ্যতা সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি কপিল ঋষি কোথায় এবং কখন্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার ঠিকানা নাই। শান্তিপর্ব্বের একস্থলে (৩৪০-৬৭) উল্লেখ আছে যে, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎসুজাত, সন, সনাতন এবং কপিল— ব্রহ্মদেবের এই সাত মানসপুত্র। জন্মিবামাত্রই তাহাদের জ্ঞান হইয়াছিল। আর এক স্থানে (শাং ২১৮) কপিল-শিষ্য আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ জনককে সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। সেইরূপ আবার শান্তিপর্ব্বে (৩০১. ১০৮. ১০৯) ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, সাংখ্যেরা সৃষ্টিরচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সময় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাই "পুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে" দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, "জ্ঞানং চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্"—এই জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার অধুনা সকল স্থলে উৎক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ করিতেছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উৎক্রান্তিশাস্ত্রেরই অনুরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রেরও ন্যূনাধিক অংশ এদেশবাসী সকলেই যে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইবে না। 'গুরুত্বাকর্ষণ', জগৎরচনার 'উৎক্রান্তিতত্ত্ব' * বা ব্রহ্মাত্মৈক্য, এই রকমের উচ্চ কল্পনা শত শত বৎসরেই কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়া থাকে। তাই, সে সময়ে যে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা ব্যাপক তত্ত্ব সমাজে প্রচলিত থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন গ্রন্থের তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার রীতি সাধারণত সর্ব্বদেশের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাক ; কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের অভ্যাস আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত এই প্রস্তাবনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি কি তাহা দেখা যাক্। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, এই জগতে নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না, কারণ, শূন্য অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিলই না তাহা হইতে শূন্য ছাড়া অন্য কিছুই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন বস্তুতে অর্থাৎ কার্য্যে যে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, যাহা হইতে উক্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাতে অর্থাৎ কারণে সূক্ষ্ম আকারে অবশ্যই ছিল, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণাদদিগের মতে, এক পদার্থের নাশ হইয়া তাহা হইতে অন্য নূতন পদার্থ প্রস্তুত হয় ; উদাহরণ যথা—বীজের নাশ হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের নাশ হইয়া তাহা হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি হয়। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রী ও বেদান্তিগণ এ মত স্বীকার করেন

* উৎক্রান্তিবাদ এই শব্দ Evolution Theory এই অর্থে আজকাল প্রচলিত হওয়া প্রযুক্ত আমি এখানে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু 'উৎক্রান্তি' এই শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভাষায় 'মরণ'। তাই উৎক্রান্তি-তত্ত্বশব্দ অপেক্ষা গুণবিকাশ, গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণাম প্রভৃতি সাংখ্যদিগের শব্দের উপযোগ করা আমার মতে অধিক প্রশস্ত।

না। তাঁহারা প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বীজে যে দ্রব্য আছে তাহা বিনষ্ট না হইয়া তাহাই ভূমি হইতে ও বায়ু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লওয়া প্রযুক্ত বীজ অঙ্কুরের নূতন রূপ বা অবস্থা প্রাপ্ত হয় (বেসূ. শাং ভা. ২. ১. ২৮)। সেইরূপ কাঠ জ্বলিলে তাহারই ছাই, ধোঁয়া ইত্যাদি রূপান্তর হয়; কাঠের মূল দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া ধূম নামক কোন নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং, ৬. ২. ২) যে, "কথমসতঃ সজ্জায়েত"—যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? জগতের মূল কারণের প্রতি 'অসৎ' শব্দের উপযোগ কখনো কখনো উপনিষদে করা হইয়াছে (ছাং, ৩. ১৯. ১; তৈ. ২. ৭. ১); কিন্তু এখানে অসৎ শব্দের অর্থ 'অভাব=নাই' নহে; বেদান্তসূত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, (বেসূ, ২. ১. ১৬, ১৭) কেবল নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের বা অবস্থার অভাবই বিবক্ষিত। দুগ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল বাহির হয়, বালুকা হইতে বাহির হয় না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেও এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে। কারণে যে গুণ নাই সেই গুণ 'কার্য্যে' স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয় ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না, ইহার কারণ আমি বলিতে পারি না। সার কথা—যাহা মূলেতেই নাই তাহা হইতে, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই, যে কোন কার্য্য ধর না কেন, তাহার বর্ত্তমান দ্রব্যাংশ ও গুণ মূল কারণেও কোন-না-কোন আকারে থাকা চাই, সাংখ্যেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তেরই নাম 'সৎকার্য্যবাদ'। অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও এই সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন যে, পদার্থ সমূহের জড়দ্রব্য ও কর্ম্মশক্তি উভয়ই চিরস্থায়ী; কোন পদার্থের যতই রূপান্তর হোক না কেন, শেষে সৃষ্টির সমগ্র দ্রব্যাংশের ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে। উদাহরণ যথা—দীপ জ্বালিয়া তৈল বিনষ্ট হইতেছে মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু মোটেই বিনষ্ট হয় না। কাজল, ধোঁয়া বা অন্য সূক্ষ্ম দ্রব্যের আকারে ঐ পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে। এই সূক্ষ্ম দ্রব্যসকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা এবং তৈল পুড়িবার সময় তাহার সহিত মিশ্রিত বায়ুস্থিত পদার্থ এই দুইয়ের ওজন সমান হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে যে, এই নিয়ম কর্ম্মশক্তিসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রের এবং সাংখ্যের সিদ্ধান্ত দেখিতে এক হইলেও সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপত্তি বিষয়ে অর্থাৎ কেবল কার্য্যকারণভাবেরই সম্বন্ধে উপযুক্ত। কিন্তু অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক। 'কার্য্যের' কোন গুণই 'কারণ'-বহির্ভূত গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, যখন কারণ কার্য্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কার্য্যের দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির একটুও নাশ হয় না; পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ সর্ব্বদাই একই থাকে, বাড়েও না কমেও না। এই বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা গণিতপদ্ধতি অনুসারে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাই উক্ত দুই সিদ্ধান্তের গুরুতর বিশেষত্ব। এই প্রকার দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যায় যে, ভগবদ্গীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"—যাহা মূলেই নাই তাহার কখন অস্তিত্ব আসিতে পারে না—ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ২.১৬), তাহা সৎকার্য্যবাদের

মতো দেখিতে হইলেও, কেবল কার্য্যকারণাত্মক সৎকার্য্যবাদ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন পদার্থ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য অধিক। উপরে প্রদত্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদের বচনেরও ইহাই ভাবার্থ। সার কথা—সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তীরা স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রের মত এই যে, এই সিদ্ধান্ত সগুণ সৃষ্টির বাহিরে একটুও প্রযুক্ত হইতে পারে না, এবং নির্গুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি কিরূপে দেখায় তাহার উপপত্তি অন্য প্রকারে লাগাইতে হইবে। এই বেদান্তমতের বিচার পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা যাইবে। আপাতত সাংখ্যমতবাদের দৌড় কোন পর্য্যন্ত, তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য হওয়ায় সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ক্ষরাক্ষরশাস্ত্রে সাংখ্যেরা তাহার কিরূপ উপযোগ করিয়াছেন তাহার বিচার করিব।

সাংখ্যমতানুসারে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, এই মতটি আপনা-আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায় যে, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, শূন্য অর্থে—'যাহা কিছুই নাই' বুঝায়; এবং যাহা নাই তাহা হইতে 'যাহা অস্তিত্বে আছে' তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, জগৎ কোন-না-কোন পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়াছে; এবং এক্ষণে জগতের যে গুণ দেখিতে পাই তাহাই এই মূল পদার্থেও অবশ্য থাকা চাই। এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য, পাথর, সোনা, রূপা, হীরা, জল, বায়ু প্রভৃতি অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। এবং এই সকলের রূপ ও গুণও বিভিন্ন। সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিভিন্নতা বা নানাত্ব আদিতে অর্থাৎ মূল পদার্থে নাই; মূলে সমস্ত পদার্থের মূলবস্তু একই। অর্ব্বাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞগণ বিভিন্ন দ্রব্যের পৃথককরণ করিয়া প্রথমে বাষট্টি (৬২) মূল তত্ত্ব বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন পাশ্চাত্য পদার্থশাস্ত্রবেত্তারাও স্থির করিয়াছেন যে, এই ৬২ মূল তত্ত্ব স্বতন্ত্র বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, কিন্তু এই সকলের মূলে একটি কোন পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থ হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথ্বী প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। জগতের সমস্ত পদার্থের এই যে মূল বস্তু তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রকৃতি' বলে। প্রকৃতির অর্থ 'মূলের'। এই প্রকৃতি হইতে পরে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'বিকৃতি' অর্থাৎ মূল বস্তুর বিকার নাম দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে মূল বস্তু একই হইলেও যদি এই মূল বস্তুর গুণও একই হয়, তবে সৎকার্য্যবাদ অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এবং এদিকে যখন এই জগতের পাথর, মাটি, জল, সোনা ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ দেখি, তখন ঐ সকলে বিভিন্ন অনেক গুণ চোখ পড়ে। তাই প্রথমে পদার্থসমূহের গুণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া সাংখ্যেরা এই গুণসমূহের সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভেদ বা বর্গ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ যে কোন পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নির্ম্মল কিংবা পূর্ণাবস্থা এবং তদ্বিরুদ্ধ নিকৃষ্টাবস্থা এই দুই ভেদ স্বভাবতই দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই পদার্থের নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার দিকে উন্নত হইবার প্রবৃত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই তৃতীয় অবস্থা। এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধাবস্থা বা পূর্ণাবস্থাকে সাত্ত্বিক, নিকৃষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্ত্তক অবস্থাকে

রাজসিক বলা যায়। সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মূলবস্তুরও অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রারম্ভ হইতেই আছে। অধিক কি, এই তিন গুণকেই প্রকৃতি বলিলে অনুচিত হইবে না। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরম্ভে একইরূপ থাকায় প্রথম প্রথম এই প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে। এই সাম্যাবস্থা জগতের আরম্ভে ছিল, এবং জগতের লয় হইলে পুনর্ব্বার হইবে। সাম্যাবস্থাতে কোন নড়াচড়া নাই, যাহা কিছু সমস্ত স্তব্ধ থাকে। কিন্তু যখন এই তিন গুণ কম বেশী হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রবৃত্ত্যাত্মক রজোগুণের দরুণ, মূল প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এখন এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক্য কিরূপে উৎপন্ন হইল? সাংখ্যেরা তাহার উত্তরে বলেন যে, ইহা প্রকৃতির মূল ধর্ম্মই (সাং. কা. ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, তাহা আপনা-আপনিই সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকে এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব-গুণের লক্ষণই জ্ঞান অর্থাৎ জানা এবং তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান। রজোগুণ ভালমন্দ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই তিন গুণ কখনই পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে পারে না। সকল পদার্থের সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের মিশ্রণ থাকে; এবং এই মিশ্রণ নিয়তই এই তিনের অন্যোন্য-ন্যূনাধিক্য অনুসারে হয়। তাই মূলবস্তু এক হইলেও গুণভেদের দরুণ এক মূল বস্তুরই সোনা, লোহা, মাটি, জল, আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি অনেক বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা সাত্ত্বিক গুণের পদার্থ বলি, তাহাতে রজ ও তম এই দুই গুণ অপেক্ষা সত্ত্বের বল বা পরিমাণ অধিক থাকায়, সেই পদার্থে সদাবস্থিত রজ ও তম চাপা পড়ে, কাজেই আমাদের চোখে পড়ে না। বস্তুত সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ অন্য পদার্থের ন্যায় সাত্ত্বিক পদার্থেও থাকে। নিছক্ সত্ত্বগুণী, নিছক্ রজোগুণী, কিংবা নিছক্ তমোগুণী কোন পদার্থই নাই। প্রত্যেক পদার্থের তিন গুণেরই সংঘর্ষ চলিতে থাকে; এবং এই সংঘর্ষে যে গুণ প্রবল হয় তদনুসারে প্রত্যেক পদার্থকে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলা যায় (সাং, কা, ১২; মভা, অশ্ব—অনুগীতা—৩৬ ও শাং ৩০৫)। উদাহরণ যথা—নিজের শরীরে রজ ও তম এই দুইয়ের উপর সত্ত্বের প্রাধান্য হইলে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য কি তাহা আমরা জানিতে পারি, এবং চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। সেই সময়ে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, নিজের রজোগুণ ও তমোগুণ একেবারেই থাকে না; তবে কিনা, সেগুলি সত্ত্বগুণের প্রভাবে দমিয়া থাকায় তাহাদের কোন অধিকার দাঁড়াইতে পারে না (গী. ১৪. ১০)। সত্ত্বের বদলে রজোগুণ যদি প্রবল হয় তবে অন্তঃকরণে লোভ জাগ্রত হইয়া আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকে এবং তাহা আমাকে অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সেইরূপ সত্ত্ব ও রজ এই দুইয়ের উপর তমোগুণের প্রাধান্য হইলে নিদ্রা, আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীরে উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জাগতিক পদার্থে সোনা, লোহা, পারা ইত্যাদি যে নানাত্ব বা প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণেরই পরস্পর ন্যূনাধিকতার ফল। মূল প্রকৃতি এক হইলেও জানা চাই যে, এই নানাত্ব বা ভিন্নতা কিরূপে উৎপন্ন হয়। ইহারই যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। ইহাতেই সমস্ত আধিভৌতিকশাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। উদাহরণ যথা—রসায়নশাস্ত্র, বিদ্যুৎশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্র, এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।

সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি সাংখ্যশাস্ত্রে 'অব্যক্ত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কথিত হইয়াছে। এই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের পরস্পর ন্যূনাধিকতার কারণে যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, শুনি, আস্বাদ করি, আঘ্রাণ করি বা স্পর্শ করি, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহাই 'ব্যক্ত' বলা হইয়াছে। 'ব্যক্ত' অর্থে স্পষ্টরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ; তাহা আকৃতির দ্বারা, রূপের দ্বারা, গন্ধের দ্বারা বা অন্য কোন যে গুণের দ্বারাই ব্যক্ত হউক। ব্যক্ত পদার্থ অনেক। তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল, আর মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের অর্থ এ স্থলে ক্ষুদ্র নহে; কারণ, আকাশ সূক্ষ্ম হইলেও সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তাই, সূক্ষ্ম অর্থে স্থূলের বিপরীত বা বায়ু হইতেও অনেক সূক্ষ্ম, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' এই দুই শব্দের দ্বারা যে কোন বস্তুর শরীর রচনার জ্ঞান হয়; এবং 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' এই দুই শব্দের দ্বারা, উক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব বা সম্ভব নহে, ইহাই বোধগম্য হয়। তাই, দুই বিভিন্ন পদার্থের (উভয়ই সূক্ষ্ম হইলেও) মধ্যে একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—বায়ু সূক্ষ্ম হইলেও স্পর্শেন্দ্রিয় তাহা জানিতে পারে বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলি; এবং সমস্ত পদার্থের মূলবস্তু বা মূলপ্রকৃতি, বায়ু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়া প্রযুক্ত কোন ইন্দ্রিয়ই তাহাকে জানিতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলি। প্রকৃতি যদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না হয়, তবে প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সাংখ্যেরা এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, অনেক ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সৎকার্য্যবাদ অনুসারে এই অনুমান সিদ্ধ হয় যে, এই সকল পদার্থের মূলরূপ (প্রকৃতি) ইন্দ্রিয়সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্য থাকাই চাই (সাং, কা. ৮)। বেদান্তীরাও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সময় এই যুক্তিই স্বীকার করিয়াছেন (কঠ, ৬. ১২, ১৩ উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ)। প্রকৃতিকে এই প্রকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত স্বীকার করিলে নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ আপনা-আপনিই সমূলে খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ পরমাণু অব্যক্ত ও অসংখ্য হইলেও, প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা অবয়ব হওয়া প্রযুক্ত এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায় যে, দুই পরমাণুর মধ্যস্থলে কোন্ পদার্থ আছে। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতিতে পরমাণুরূপ অবয়বভেদ নাই। কিন্তু উহা সর্ব্বদাই একসংলগ্ন, মধ্যে একটুও ব্যবধান থাকে না, এক-সমান; অথবা ইহা বলা যায় যে, উহা অব্যক্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ও নিরবয়বরূপে নিরন্তর সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় দাসবোধে (দা, ২০. ২. ৩.) শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলেন—

জিকড়ে পহাবে তিকড়ে অপার।
কোনীকড়ে নাহি পার॥
এক জিনসী স্বতন্ত্র। দুসরে নাহী॥

অর্থাৎ—যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীমা নাই। একমাত্র বস্তু ও স্বতন্ত্র, তাঁহাতে দ্বৈত বা অন্য কিছুই নাই। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বয়ম্ভু, ও একই প্রকার; এবং

উহা চারিদিকে নিরন্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ। আকাশ, বায়ু ইত্যাদি ভেদ পরে হইয়াছে এবং তাহা সূক্ষ্ম হইলেও ব্যক্ত ; এই সমস্তের মূল প্রকৃতি এইরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী ও অব্যক্ত। মনে থাকে যেন, বেদান্তীদিগের পরব্রহ্মে এবং সাংখ্যদিগের প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কারণ, পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপ ও নির্গুণ। কিন্তু প্রকৃতি জড়রূপ ও সত্ত্বরজস্তমোময় অর্থাৎ সগুণ। এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে করা যাইবে। এক্ষণে সাংখ্যদিগের মত কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য। 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল', 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত', ইহাদের এইরূপ অর্থ করিলে, সৃষ্টির আরম্ভে প্রত্যেক পদার্থ সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত প্রকৃতির রূপে থাকে, তাহার পর উহা (স্থূল হোক্ বা সূক্ষ্মই হোক্) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্যক্তস্বরূপের নাশ হইলে আবার উহা অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়া অব্যক্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ বলিতে হয়। গীতাতেও এই মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২. ২৮ ও ৮.১৮)। সাংখ্যশাস্ত্রে এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'অক্ষর', এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে 'ক্ষর' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এখানে ক্ষর অর্থে সম্পূর্ণ নাশ নহে ; কেবল ব্যক্তরূপের নাশই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিণী বহুধানক, প্রসবধর্ম্মিণী, ইত্যাদি প্রকৃতির আরও অনেক নাম আছে। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের মুখ্য মূল হওয়া প্রযুক্ত প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা আপনিই আপনাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া উহাকে গুণক্ষোভিণী বলে। গুণত্রয়রূপী পদার্থ ভেদের বীজ প্রকৃতিতে আছে বলিয়া উহাকে বহুধানক বলে এবং প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পদার্থ প্রসূত হয় বা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে প্রসবধর্ম্মিণী বলে। বেদান্তশাস্ত্রে এই প্রকৃতিকেই 'মায়া' অর্থাৎ মায়িক অবভাস বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির সমস্ত পদার্থকে 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' বা 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিলে পর দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদি সাংখ্যমতে কোন্ বিভাগে বা বর্গে ফেলিতে হইবে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহ তো জড়ই, তাই ব্যক্ত পদার্থে উহাদের সমাবেশ হইতে পারে ; কিন্তু মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা, ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে ? য়ুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ হেকেল আপন গ্রন্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা, এ সমস্তই শারীরধর্ম্ম। উদাহরণ যথা—মনুষ্যের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া গেলে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্তও হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কোন অংশ অসাড় হইয়া গেলেও সেই অংশের মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সারকথা এই যে, মনোধর্ম্মও মস্তিষ্কেরই গুণ ; অতএব উহাকে জড়বস্তু হইতে কখনই পৃথক করা যায় না, এবং সেইজন্য মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে মনোধর্ম্ম ও আত্মাকেও 'ব্যক্ত' পদার্থের বর্গে ফেলা আবশ্যক। এই জড়বাদ মানিয়া লইলে শেষে কেবল অব্যক্ত ও জড় প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ এই মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃতি ব্যতীত জগতের কর্ত্তা বা উৎপাদক আর কেহই হইতে পারে না। তখন তো ইহাই বলিতে হয় যে, মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে বাড়িতে তাহাই চৈতন্য বা আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সৎকার্য্যবাদের ন্যায় এই মূল প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত হইয়াছে ; এবং তদনুসারে সমস্ত জগৎ

ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যও এই নিয়মানুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে। জড় প্রকৃতি ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, কাজেই উহা অবিনাশীও নহে, স্বতন্ত্রও নহে। তবে মোক্ষের আবশ্যকতা কি ? আমার ইচ্ছানুসারে আমি অমুক কর্ম্ম করিব এইরূপ প্রত্যেকে যে মনে করে তাহা নিছক ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে। সারকথা—৺শঙ্করমোরো রানডে কলহপুরী নাটকের আরম্ভের ধুয়াপদে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে বলিতে হয়—

বিশ্ব সর্ব্ব হেঁ তুরুঙ্গ মোঠো প্রাণীমাত্র কৈদী।
পদার্থধর্ম্মাঙ্গিয়া শৃঙ্খলা ত্যাঁতেঁ কোণি ন ভেদী।

এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহৎ কারাগার, প্রাণিমাত্রই কয়েদী এবং পদার্থের গুণধর্ম্ম শৃঙ্খল—এই শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। ইহাই হেকেলের মতের সারাংশ। ঐ মতানুসারে একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমস্ত সৃষ্টির মূল হওয়া প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন—'অদ্বৈত'। কিন্তু এই অদ্বৈত জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতিতেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ করে বলিয়া আমি উহাকে জড়াদ্বৈত বা আধি-ভৌতিকশাস্ত্রোদ্বৈত বলিব।

কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহারা পঞ্চভূতাত্মক জড়প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি গুণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার মত এই যে, জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, যেমন কোন মনুষ্য আপন কাঁধের উপর বসিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতির জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না হইলে আমি ইহা জানিতেছি, উহা জানিতেছি, এইপ্রকার ভাষাও প্রযুক্ত হইতে পারে না। এবং জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেরই ইহা অনুভূত হয় যে, আমি যাহা কিছু জানিতেছি বা দেখিতেছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন। তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তু কিংবা প্রকৃতির দ্রষ্টা ও জড়প্রকৃতি এই দুই পদার্থ মূলতই ভিন্ন ভিন্ন মানিতে হয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং, কা. ১৭)। পূর্ব্বপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা বলা হইয়াছে তাহাই এই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা বা উপভোক্তা, এবং ইহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'পুরুষ' বা 'জ্ঞ' (জ্ঞাতা) বলা হইয়াছে। এই জ্ঞাতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহা সত্ত্ব, রজ ও তম, প্রকৃতির এই তিন গুণের বাহিরে অর্থাৎ উহা নির্গুণ ও অবিকারী এবং জানা দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না। অতএব জগতের যাহা কিছু ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত একমাত্র প্রকৃতিরই কাজ, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। সারকথা—প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন ; প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্ত্তা ; প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, পুরুষ নির্গুণ ; প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ সাক্ষী। এই প্রকারে এই সৃষ্টির মধ্যে এই দুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব অনাদিসিদ্ধ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভগবদ্গীতাতে প্রথমে বলা হইয়াছে "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" —প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (গী, ১৩. ১৯) ; ইহার পরে উহাদের এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার প্রকৃতি করিয়া থাকে ; এবং "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে

হেতুরুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষ সুখদুঃখের উপভোগ করিবার কারণ। গীতাতে প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই যে, সাংখ্যদের ন্যায় গীতাতে এই দুই তত্ত্ব স্বতন্ত্র কিংবা স্বয়ম্ভু বলিয়া স্বীকৃত নহে। কারণ, গীতাতে ভগবান প্রকৃতিকে আপন মায়া বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪; ১৪, ৩); এবং পুরুষ-সম্বন্ধেও "মমৈবাংশো জীবলোকে" (গী, ১৫. ৭)—উহা আমারই অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গীতা সাংখ্যশাস্ত্রকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সাংখ্যশাস্ত্র পরে কি বলিতেছেন তাহাই দেখিব।

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে, সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ তিন বর্গে বিভক্ত। প্রথম অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দ্বিতীয় ব্যক্ত (প্রকৃতির বিকার) এবং তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রলয়কালে ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হয়; তাই এখন কেবল মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই তত্ত্বই বাকী রহিয়া যায়। এই দুই মতলব সাংখ্যদিগের মতে অনাদি ও স্বয়ম্ভূ; তাই সাংখ্যদিগকে দ্বৈতবাদী (এই দুই মূলতত্ত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন) বলা হইয়া থাকে। ইঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে ঈশ্বর, কাল, স্বভাব বা অন্য কোন মূল তত্ত্বই মানেন না। * কারণ, সগুণ ঈশ্বর, কাল ও স্বভাব এই সমস্ত ব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহাদের সমাবেশ হইয়া থাকে; এবং ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া মানিলে, সৎকার্য্যবাদ অনুসারে নির্গুণ মূলতত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই তাঁহারা স্থির নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষকে ছাড়িয়া এই সৃষ্টির তৃতীয় কোন মূলতত্ত্ব

* ঈশ্বরকৃষ্ণ একজন পাক্কা নিরীশ্বরবাদী। তিনি নিজের সাংখ্যকারিকার উপসংহারাত্মক তিন আর্য্যাতে বলিয়াছেন যে, মূলবিষয়ের উপর ৭০ আর্য্যা শ্লোক ছিল। কিন্তু কোলব্রুক ও উইলসনের অনুবাদের সহিত বোম্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাত্যা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন তাহাতে মূলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্য্যা আছে। এই হেতু ৭০ম আর্য্যা কোন্‌টি, এইরূপ উইলসন্‌ সাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্তু ঐ আর্য্যাটি না পাওয়ায় তাঁহার সন্দেহের সমাধান হয় নাই। আমার মতে, এই আর্য্যা এখনকার ৬১ম আর্য্যার পরে হইবে। কারণ, ৬১ম আর্য্যার উপর গৌড়পাদের যে ভাষ্য আছে তাহা এক আর্য্যার উপর নহে, দুই আর্য্যার উপর। এবং এই ভাষ্যের লঘুশ্লোকের পদগুলি লইয়া আর্য্যা রচনা করিলে তাহা—

> কারণমীশ্বরমেকে ব্রুবন্তি কালং পরে স্বভাবং বা।
> প্রজাঃ কথং নির্গুণতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ ॥

এইরূপ দাঁড়ায়। এই আর্য্যা অগ্রপশ্চাৎ সন্দর্ভের (অর্থ বা ভাবের) সহিত ঠিকঠিক মিলেও। এই আর্য্যা নিরীশ্বর মতের প্রতিপাদক হওয়ায় মনে হয় যে, কেহ ইহা পরে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই আর্য্যার শোধনকারী মনুষ্য সেই আর্য্যার ভাষ্যও ছাঁটিয়া ফেলিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, তাই এক্ষণে এই আর্য্যা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম; এবং এই জন্য ঐ মনুষ্যকে আমাদের ধন্যবাদই দিতে হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং বেদান্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া ঈশ্বরকে জগতের মূল কারণ মানিতেন। মন্ত্রটী এই—

> স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
> দেবস্যৈষা মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥

কিন্তু ইহা দেখিবার জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ উপরি-উক্ত আর্য্যাকে বর্ত্তমান ৬১ম আর্য্যার পরে বসাইয়াছেন যে, এই তিন মূল কারণ (অর্থাৎ স্বভাব, কাল ও ঈশ্বর) সাংখ্যেরা স্বীকার করেন না।

নাই। এই প্রকারে তাঁহারা দুই মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিলে পর, তাঁহারা আপন মতানুসারে ইহাও সিদ্ধ করিলেন যে, সেই দুই মূলতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল। তাঁহারা বলেন যে, নির্গুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না পারিলেও প্রকৃতির সঙ্গে উহার সংযোগ হইলে, যেমন গরু নিজের বাছুরের জন্য দুধ দেয় কিংবা লোহ চুম্বকের সন্নিধানে আসিলে লোহে আকর্ষণশক্তি আসে, সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ব্যক্ত বিস্তার পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে (সাং, কা, ৫৭)। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাত হইলেও, কেবল অর্থাৎ নির্গুণ হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম্ম করিবার কোন সাধন নাই; এবং প্রকৃতি কর্ম্মকর্ত্তা হইলেও জড় বা অচেতন হওয়া প্রযুক্ত, সে জানে না যে কোন্‌ কাজ করিতে হইবে। এই কারণে ইহা খঞ্জ ও অন্ধের জুড়ী; অন্ধের কাঁধের উপর খঞ্জ বসিয়া অন্যোন্যসহায়তায় দুজনেই যেরূপ পথ চলিতে থাকে, সেইরূপই জড় প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষের সংযোগ হইলে সৃষ্টির সকল কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া থাকে (সাং, কা, ২১)। এবং যেমন নাটকে প্রেক্ষকদিগের মনোরঞ্জনার্থ রঙ্গ-ভূমির উপর একই নটী এখন এক বেশে, খানিক পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য (পুরুষার্থের জন্য) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, এই প্রকৃতি সত্ত্বরজতম গুণসমূহের ন্যূনাধিক্য অনুসারে অনেক রূপ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে সমান নাচিতে থাকে (সাং, কা, ৫৯)। প্রকৃতির এই নৃত্যে মোহবশত ভুলিয়া বা বৃথাভিমানবশত যে পর্য্যন্ত পুরুষ এই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আপনারই কর্ত্তৃত্ব বলিয়া স্বীকার করে এবং সুখদুঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখে, সে পর্য্যন্ত কখনো তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে না (গী. ৩. ২৭)। কিন্তু যে সময়ে পুরুষের জ্ঞান হয় যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক এবং আমি পৃথক, সেই সময়ে সে মুক্ত হয় (গী, ১৩, ২৯ ৩০; ১৪. ২০)। কারণ বস্তুত পুরুষ কর্ত্তাও নহে, বন্ধও নহে—সে তো স্বতন্ত্র ও স্বভাবতই কৈবল্য-অবস্থাপন্ন বা অকর্ত্তা। যাহা কিছু হয় সে সমস্ত প্রকৃতিরই খেলা। অধিক কি, মন ও বুদ্ধিও প্রকৃতিরই বিকার হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধির যে যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্য্যেরই ফল। এই জ্ঞান তিন প্রকারের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (গীতা, ১৮. ২০-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে পুরুষ জানিতে পারে যে আমি প্রকৃতি হইতে পৃথক। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। পুরুষ নির্গুণ এবং ত্রিগুণাত্মক, প্রকৃতি উহার দর্পণ (মভা, শাং, ২০৪.৮)। এই দর্পণ যখন স্বচ্ছ বা নির্মল থাকে, অর্থাৎ যখন নিজের এই বুদ্ধি, যাহা প্রকৃতির বিকার, সাত্ত্বিক হয়, তখন এই স্বচ্ছ দর্পণে পুরুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে থাকে এবং উহার এই বোধ হয় যে আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সেই সময়ে এই প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া ঐ পুরুষের সম্মুখে নৃত্য, খেলা ও জালবিস্তার বন্ধ করিয়া দেয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুরুষ সমস্ত পাশ ও জাল হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। 'কৈবল্য' অর্থাৎ কেবলত্ব, একাকীত্ব প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা। পুরুষের এই নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মোক্ষ (বন্ধন-মোচন) বলে। এই অবস্থার বিষয়ে সাংখ্যবাদী এক সূক্ষ্ম প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রশ্ন এই যে, পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, না প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে। অনেকের নিকট এই প্রশ্ন, বর অপেক্ষা কনে চাঙ্গা কিংবা কনে অপেক্ষা

বর বটে, এইরূপ ধরণের প্রশ্নের ন্যায় নিরর্থক প্রতীত হইবে। কারণ, দুই বস্তুর এক বস্তু হইতে অপরটির বিয়োগ হইলে পর কে কাহাকে ছাড়িল ইহা দেখার কোন ফল নাই; উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাঁহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে পুরুষ নির্গুণ, অকর্ত্তা ও উদাসীন হওয়া প্রযুক্ত তত্ত্বদৃষ্টিতে 'ছাড়া' বা 'ধরা' এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব পুরুষে বর্ত্তিতে পারে না (গী, ১৩.৩১, ৩২)। তাই, সাংখ্যবাদী স্থির করিয়াছেন যে, সেই প্রকৃতিই 'পুরুষ'কে ছাড়িয়া যায়, অর্থাৎ প্রকৃতিই 'পুরুষ' হইতে আপনার মোক্ষসাধন করিয়া লয়, কারণ কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, (সাং কা, ৬২ ও গী, ১৩. ৩৪)। সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে এমন কোন পৃথক অবস্থা নাই যাহা 'পুরুষ' বাহির হইতে প্রাপ্ত হয়; কিংবা পুরুষের মূল ও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ভিন্ন কোন অবস্থাই নাই। ঘাসের উপরকার ছাল হইতে ভিতরকার শাঁস যেরূপ পৃথক্ কিংবা জলস্থ মাছ যেরূপ জল হইতে পৃথক্, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন ব্যক্তি নিজের এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা বুঝিতে পারে না, তাই সংসারচক্রে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু এই ভিন্নতা যে জানিতে পারে সে মুক্তই হয়। এই প্রকার পুরুষকে 'জ্ঞানী' বা 'বুদ্ধ' ও 'কৃতকৃত্য' বলে, ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (মভা, শাং ১৯৪.৫৮; ২৪৮. ১১ ও ৩০৬-৩০৮)। "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ" (গী, ১৫।২০) এই গীতাবচনে 'বুদ্ধিমান্' শব্দেরও এই অর্থ। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপও ইহাই (বেসূ শাং ভা, ১. ১. ৪)। কিন্তু সাংখ্য হইতে অদ্বৈত বেদান্তের বিশেষ উক্তি এই যে, পুরুষ স্বভাবত কৈবল্য অবস্থায় আছে এইরূপ কারণ না দিয়া, আত্মা মূলেই পরব্রহ্মস্বরূপ এবং যখন সে আপন মূলস্বরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানিতে পারে তখন তাহাই উহার মোক্ষ। সাংখ্য ও বেদান্ত, ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্ত্তী প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইবে।

পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, উদাসীন ও অকর্ত্তা—সাংখ্যদিগের এই মত যদিও অদ্বৈত বেদান্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মূলেই অসংখ্য,—পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই দ্বিতীয় কল্পনা বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। (গী, ৮. ৪; ১৩. ২০-২২; মভা, শাং, ৩৫১; এবং বেসূ. শাং ভা. ২. ১. ১)। বেদান্তীরা বলেন যে, উপাধিভেদপ্রযুক্ত সমস্ত জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হয়, বস্তুত সমস্তই ব্রহ্ম। সাংখ্যদিগের মত এই যে, যখন দেখি যে, প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম, মরণ ও জীবন ভিন্ন ভিন্ন এবং যখন এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, তখন মানিতে হয় যে, প্রত্যেক আত্মা বা পুরুষ মূলেই ভিন্ন এবং তাহাদের সংখ্যাও অনন্ত (সাং, কা. ১৮)। কেবল প্রকৃতি ও পুরুষই সমস্ত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব ধরিলাম; কিন্তু উহাদের মধ্যে, পুরুষ শব্দে সাংখ্যদিগের মতানুসারে 'অসংখ্য পুরুষের সমুদায়' এর সমাবেশ হয়। এই সকল অসংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সংযোগ হইতে সৃষ্টির সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। প্রত্যেক পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন গুণের বিস্তার সেই পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে, এবং তাহা উপভোগ করিতে থাকে। এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেলা সাত্ত্বিক হয়, সেই

পুরুষেরই (সকল পুরুষের নহে) যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং তাহারই নিকটে প্রকৃতির সমস্ত খেলা বন্ধ হইয়া যায়, আর সে আপনার মূল ও কৈবল্য স্বরূপে উপনীত হয়। কিন্তু তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের সংসারে আবদ্ধ থাকিতেই হয়। পুরুষ এইরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হইলেই সে প্রকৃতির জাল হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়া যায়—কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপী প্রকৃতির বিকার মনুষ্যকে তাহার মরণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না। সাংখ্যবাদী ইহার এই কারণ বলেন যে, "যেরূপ কুমারের চাকা হইত কলসী তৈয়ার করিয়া বাহির করিয়া লইলেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাহা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, সেইরূপ কৈবল্যপ্রাপ্ত মনুষ্যেরও শরীর কিছুদিন অবশিষ্ট থাকে" (সাং, কা. ৬৭)। তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা সুখদুঃখের বাধা হয় না। কারণ, এই শরীর জড়প্রকৃতির বিকার হওয়া প্রযুক্ত স্বয়ং জড়ই, সেইজন্য সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, তাহার নিকট দুই-ই সমান; এবং যদি ইহা বলা যায় যে পুরুষের সুখদুঃখের বাধা হয়, তবে ইহাও ঠিক নহে; কারণ সে জানে যে, প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই, আমার নহে। এই অবস্থাতে প্রকৃতির যাই খেলা হউক না কেন, পুরুষের সুখদুঃখ হয় না, সে সর্ব্বদা উদাসীনই থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যে পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবৃত্তির একেবারে শেষ হয় না; চাই সে, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষপ্রযুক্ত দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে পশুর শ্রেণীতে উৎপন্ন হউক (সাং, কা. ৪৪. ৫৪)। জন্মমরণরূপী চক্রের এই ফল, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার বুদ্ধির সত্ত্বরজতমোগুণের উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রযুক্ত প্রাপ্ত হয়। "ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ"—সাত্ত্বিক বৃত্তির পুরুষ স্বর্গে যায় এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, ইহা গীতাতেও উক্ত হইয়াছে (গী, ১৪. ১৮)। কিন্তু এই স্বর্গাদি ফল অনিত্য। জন্মমরণ হইতে যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে, কিংবা সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে প্রকৃতি হইতে আপনার ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে, তাহার ত্রিগুণাতীত হইয়া বিরক্ত (সন্ন্যস্ত) হওয়া ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান কপিলাচার্য্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থা জন্ম হইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করিয়া আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন প্রত্যেকের করা আবশ্যক। এইরূপ প্রযত্নের দ্বারা বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে পরে সেই বুদ্ধিরই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং শেষে মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহা পাইতে ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থ্যকেই এইস্থানে ঐশ্বর্য্য বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতানুসারে, ধর্ম্মের গণনা সাত্ত্বিক গুণের মধ্যেই করা হয়; কিন্তু শুধু ধর্ম্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র, এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্ন্যাস) দ্বারা মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচার্য্য শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়সমূহে ও বুদ্ধিতে প্রথমে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে

পরিশেষে পুরুষের এই জ্ঞান যখন হয় যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক্ ও আমি পৃথক্, তখন সে ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে পৌঁছিয়াছে ইহা সাংখ্যবাদী বলেন। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সত্ত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধ্যে কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন অবস্থা হইতে এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয় এবং এই অভিপ্রায়েই ভাগবতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর চতুর্থ আর এক ভেদ করা হইয়াছে। তিন গুণেরই পারগামী পুরুষ নির্হেতুক ও অভেদভাবে যে ভক্তি করিয়া থাকেন তাহাকে নির্গুণ ভক্তি বলে (ভাগ ৩.২৯. ৭-১৪)। কিন্তু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন বর্গ অপেক্ষা বর্গীকরণের তত্ত্বসকলের ফাজিল বৃথা বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাই সাংখ্যবাদী বলেন যে সত্ত্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষের দ্বারাই শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জন্য তিনি এই অবস্থার গণনা সাত্ত্বিকবর্গেই করিয়া থাকেন। গীতাতেও এই মত স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—যে অভেদাত্মক জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় যে, যাহা কিছু সমস্তই এক তাহাকেই "সাত্ত্বিক জ্ঞান" বলে এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ১৮. ২০)। ইহা ব্যতীত সত্ত্বগুণের বর্ণনার পরেই গীতার ১৪শ অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনা আসিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকৃত নহে, তাই মনে রাখা আবশ্যক যে গীতাতে 'প্রকৃতি', 'পুরুষ', 'ত্রিগুণাতীত' ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে করা হইয়াছে; কিংবা ইহা বলিতে হয় যে, গীতাতে সাংখ্যের দ্বৈতের উপর অদ্বৈত পরব্রহ্মের ছাপ সর্বত্র লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ-ভেদই গীতার ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গী, ১৩. ১৯-৩৪)। কিন্তু সেস্থলে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই দুই শব্দ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সমানার্থক। সেইরূপ, ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনাও (গী, ১৪. ২২-২৭) ত্রিগুণাত্মক মায়াজাল হইতে মুক্ত এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও অতীত পরমাত্মার জ্ঞাতা সিদ্ধ পুরুষের বিষয়ে করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া পুরুষের কৈবল্যই ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহারা মানে, এই বর্ণন সাংখ্যদের এ সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নহে। এই ভেদ পরে আধ্যাত্মপ্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদিত হইলেও অধ্যাত্মতত্ত্বসকল বিবৃত করিবার সময় ভগবান, সাংখ্যপরিভাষার ও যুক্তিবাদের উপযোগ স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয়া, গীতায় কেবল সাংখ্য-মতই গ্রাহ্য, এইরূপ কোন কোন পাঠকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। এই ভ্রম দূর করিবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্র ও গীতার তৎসদৃশ সিদ্ধান্তের ভেদ পুনর্ব্বার এখানে বলা হইয়াছে। বেদান্তসূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে এই জগতের পরব্রহ্মরূপী একই মূল তত্ত্ব আছে এবং তাহা হইতে প্রকৃতিপুরুষাদি সমস্ত সৃষ্টিই উৎপন্ন হইয়াছে", উপনিষদের এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে না ছাড়িয়া সাংখ্যদিগের শেষ সিদ্ধান্ত আমার অগ্রাহ্য নহে (বেসূ, শাং, ভা, ২. ১. ৩)। এই বিষয় গীতার উপপাদের বিষয়েও চরিতার্থ হয়।

ইতি সপ্তম প্রকরণ সমাপ্ত।

অষ্টম প্রকরণ

বিশ্বের রচনা ও সংহার

"গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশন্তি চ"।*

মহাভারত, শান্তি, ৩. ৫. ২৩।

কাপিলসাংখ্য অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে দুই স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং দুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণ ঘটিলে পর, পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুণত্রয়ের যে বাজার বসাইয়া থাকে, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির বাজারা-লীলা, মারাঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছেন "সংসারের খেলা" এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে "প্রকৃতির টাকশাল" বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতির সংসার কি অনুক্রম অনুসারে পুরুষের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে ও তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনো বাকী রহিয়া গিয়াছে; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা করিব। প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের "রচনা ও সংহার" বলে। সাংখ্যমতানুসারে এই সমস্ত জগৎ বা সৃষ্টি অসংখ্য পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে নির্ম্মাণ হয়, 'দাসবোধের' দুই তিন স্থানে শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীও তাহার সুরস বর্ণনা করিয়াছেন; এবং সেই বর্ণনা হইতেই "বিশ্বের রচনা ও সংহার", এই নাম আমি গ্রহণ করিয়াছি। সেইরূপ, ভগবদ্গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে—"ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া" (গী. ১১. ২) ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় (যাহা আপনি) বিস্তারিতরূপে (বলিয়াছেন তাহা) আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন—এই যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিশ্বের রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-বিচারের এক মুখ্য ভাগ। সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক (নানা) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা যাহা দ্বারা বুঝা যায় তাহাই জ্ঞান (গী. ১৮. ২০); এবং যাহা দ্বারা একই মূলভূত অব্যক্ত দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদার্থসকল কিরূপে পৃথকভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে (গী. ১৩. ৩০) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান; এবং ইহার মধ্যে কেবল ক্ষরাক্ষর-বিচারের সমাবেশ হয় না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিষয়সকলেরও সমাবেশ হয়।

ভগবদ্গীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের কার্য্য, স্বতন্ত্ররূপে নির্ব্বাহ করেন না, পরন্তু তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন (গী, ৯. ১০)। সাংখ্যশাস্ত্রের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির সংসারকার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতি এই বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। সাংখ্যের বক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতি-টাকশালের কাজ আরম্ভ হয়

* "গুণ হইতেই গুণ উৎপন্ন হয় এবং গুণেতেই গুণ লয় পায়"।

এবং বসন্ত ঋতুতে যেরূপ পল্লব ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় (মভা. শাং ২৩১. ৭৩ ; মনু ১. ৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহার গুণ-সমূহের বিস্তার হইতে থাকে। ইহার বিপরীতে বেদসংহিতাতে, উপনিষদে ও স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে প্রকৃতিকে মূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া, পরব্রহ্মকে মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে ; যথা —"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" প্রথমে হিরণ্যগর্ভ (ঋ, ১০. ১২১,১), এবং এই হিরণ্যগর্ভ হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ, ১০. ৭২ ; ১০. ১৯০) ; কিংবা প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া (ঋ, ১০. ৮২, ৬ ; তৈ, ব্রা, ১. ১. ৩. ৭ ; ঐ, উ, ১. ১. ২) তাহা হইতে সৃষ্টি হইল, এই জলেতে এক অণ্ড উৎপন্ন হইবার পর তাহা হইতে ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে কিংবা মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু, ১. ৮. ১৩ ; ছাং, ৩. ১৯) , কিংবা সেই ব্রহ্মাই (পুরুষ) অর্দ্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন (বৃ, ১. ৪. ৩ , মনু, ১. ৩২) ; কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পুরুষ হইয়াছিল (কঠ, ৪. ৬) অথবা প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে তেজ, জল ও পৃথ্বী (অন্ন) এই তিন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রণে সমস্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল (ছাং, ৬. ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে বেদান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে (বেসূ ২. ৩. ১-১৫) আত্মরূপী মূল ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইয়াছে (তৈ, উ, ২. ১), কঠ (৩. ১১) মৈত্রায়ণী (৬. ১) শ্বেতাশ্বতর (৪. ১০ ; ৬. ১৬), প্রভৃতি উপনিষদেও, প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্ত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বেদান্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ ব্রহ্মেতেই মায়াত্মক প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে তাঁহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম একবাক্যতা হইয়া গিয়াছে, এবং এই কারণেই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১. ১০৮. ১০৯)। "ইতিহাস, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে কিছু জ্ঞান আছে সে সমস্ত সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে"—কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীরা কিংবা পৌরাণিকেরা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ তাহার অর্থ নহে ; কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের জ্ঞান সর্ব্বত্রই এক প্রকার, এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল তাহাই নহে, 'জ্ঞান' এই ব্যাপক অর্থেই, এই স্থানে 'সাংখ্য' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এ কথা বলিলেও চলে। কপিলাচার্য্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতিসহকারে বিবৃত করিয়াছেন, এবং ভগবদ্গীতাতেও এই সাংখ্যক্রম মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এই প্রকরণে তাহার বিচার করা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম একবস্তুমাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ডরূপে পরি-পূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সাংখ্যদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশের অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রজ্ঞদিগের শুদ্ধ গ্রাহ্য নহে, পরন্তু এই মূল দ্রব্যের অন্তর্ভূত শক্তির ক্রমশ বিকাশ হইয়া আসিতেছে এবং এই পূর্ব্বাপর ক্রম কিংবা ধারা ছাড়িয়ে মাঝখানে উপরি-পড়ার মতন হঠাৎ কিছুই নির্ম্মাণ হয় নাই ইহাও তাঁহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন। এই মতকে উৎক্রান্তিবাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীতে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকসমূহে

এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত ও জঙ্গমশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তি-বাদ বাহির হইবার পূর্ব্বে সমস্ত খৃষ্টানমণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাই, যখন উৎক্রান্তিবাদ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্তিবাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং অদ্যাপি ঐ আক্রমণ অল্পাধিকতর চলিতেছে। তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, সৃষ্টির উৎপত্তিসম্বন্ধে উৎক্রান্তি মতটাই সমস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহ্য হইতে চলিয়াছে। এই মতানুসারে সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তুসার সূক্ষ্ম দ্রব্য ভরিয়াছিল ; উহার গতি বা উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল, তখন উক্ত দ্রব্যের অধিকাধিক সংকোচ হইয়া পৃথ্বীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং সূর্য্যই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও সূর্য্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ গোলক ছিল, কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্যসমূহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন জড় গোলার সৃষ্টি হইল, এবং পরে, এই সকল বস্তুর সংমিশ্রণে বা সংযোগে সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ডার্বিন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি আত্মা বলিয়া মূলে পৃথক্ কোন তত্ত্ব স্বীকার করা যাইবে কি, যাইবে না, এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাড়িতে বাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া জড়াদ্বৈত প্রতিপাদন করেন , এবং ইহার বিপরীতে ক্যান্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিতে হয়। কারণ, বাহ্য জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্মা স্বতঃ গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহ্য জগৎ হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে এই কথা বলা,—"আপন স্কন্ধের উপর আপনি বসিতে পারি"—এই কথার ন্যায় তর্কদৃষ্টিতে অসম্ভব । এই কারণেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সারকথা এই যে, আধিভৌতিক জগৎজ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন, জাগতিক মূলতত্ত্বের স্বরূপের বিচার সর্ব্বদাই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হইবে. অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য উৎক্রান্তিমত ও সাংখ্য শাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চ-তত্ত্ব, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না। কারণ, অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও একবস্তু সার মূল প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে (সূক্ষ্ম ও স্থূল) বস্তুবহুল ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদিগের 'সত্ত্ব, রজ, তম'এই তিন গুণের বদলে অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ

অপেক্ষা উষ্ণতা কিংবা আকর্ষণশক্তির ন্যূনাধিক্যের ধারণা আধিভৌতিক-শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বোধগম্য হয়। তথাপি "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গী, ৩. ২৮) এইরূপ যে গুণত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব তাহা উভয়দিকেই এক। ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা যেরূপ আস্তে আস্তে খোলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রকৃতির ঘাড় আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল সাংখ্যশাস্ত্রের কথা; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাদে বস্তুত কোন ভেদ নাই। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্ত্বকে উপেক্ষা না করিয়া গীতাতে এবং অংশত উপনিষদাদি বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের অবিরোধেই স্বীকৃত হইয়াছে; এই ভেদ তাত্ত্বিক ধর্ম্মদৃষ্টিতে মনে রাখিবার যোগ্য।

ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন দেখা যাক্। এই ক্রমকেই গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণামবাদ বলে কোনও কাজ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য উক্ত কাজ করিবে বলিয়া আপন বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি বা সংকল্প তাহার প্রথমে হওয়া চাই, ইহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। অধিক কি উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, মূল এক পরমাত্মারও "আমি বহু হইব"—এই বুদ্ধি বা সঙ্কল্প হইবার পর, জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং ৬. ২. ৩. তৈ, ২. ৬)। এই ন্যায় অনুসারে অব্যক্তপ্রকৃতিও আপনা হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা বুদ্ধিরই লক্ষণ। তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সারকথা, এই যে মনুষ্যের যেরূপ কোন কার্য্য করিবার বুদ্ধি প্রথমে হয় সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া চাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণী সচেতন হওয়া প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির সহিত সচেতন পুরুষের (আত্মার) সংযোগ প্রযুক্ত, মনুষ্যের ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তাহা শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অস্বয়ংবেদ্যশক্তি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ না মানিলে গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা রসায়নক্রিয়ার বা লোহচুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জগতের স্বেচ্ছানির্বাচনের কার্য্য এই যুক্তি খাটে না। এই কথা অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞও এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞদিগের

* Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of chemistry are indexplicable, pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will."—Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol. II. p. 399, 3rd Ed, Haeckel himself explains this statement as follows :—I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of

এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছা হয় তো অচেতন বা অস্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল,—যাহাই বল না কেন, মানুষ্যের বুদ্ধি ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উভয়ই মূলে সে একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা সুস্পষ্ট; এবং সেইজন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার করা হইয়াছে। এই বুদ্ধিরই—'মহৎ, জ্ঞান, মতি, আসুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি' প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনুমান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ (পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান্—বড়) এই নাম, প্রকৃতি এক্ষণে বড় হওয়ায় তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্ কিংবা বুদ্ধিগুণ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায় প্রকৃতির এই বুদ্ধি দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারণ, এই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হইলেও বিচার দৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনন্তরূপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন হইতেই প্রত্যেকগুণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গুণ অনন্ত হইতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধিও প্রকৃতির ন্যায় সূক্ষ্ম। কিন্তু পূর্ব্বপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূল, ইহাদের যে অর্থ বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যক্ত নহে—তাহা মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। তাই, এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, 'ব্যক্ত' এই মনুষ্যগোচর বৃহৎ পদার্থবর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এক মূল প্রকৃতি ব্যতীত কোন তত্ত্বই অব্যক্ত নহে।

অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি এখনও এক বস্তুসারই রহিয়াছে। এই একবস্তুপরতা ভাঙ্গিয়া বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হওয়াকেই 'পৃথকত্ব' বলে। উদাহরণ যথা—সারা জমির উপর পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া। বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা বহুত্ব উৎপন্ন না হইলে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে উৎপন্ন পৃথকত্ব গুণকেই 'অহঙ্কার' বলে কারণ, পৃথকত্ব 'আমি-তুমি' এই সকল শব্দের দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; এবং 'আমি-তুমি'র অর্থই অহঙ্কার,—অহং অহং (আমি আমি) করা। প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার গুণকে ইচ্ছা হয় তো অ-স্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অসমর্থ বলুন। কিন্তু মনুষ্যে প্রকটীভূত অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুসার প্রকৃতি হইতে নির্ম্মিত হয়, ইহাদের জাতি একই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার 'অহং' এর জ্ঞান হয় না এবং মুখ না থাকায় 'আমি পৃথক্ তুমি পৃথক্' এইরূপ স্বাভিমানসহকারে সে নিজের

Sensation and will which may be attributed to atoms, to be uncon-scious—just as unconscious as the elementary memory, which I in common with the distinguished psychologist Ewald Hering consider to be a common, function of all organised matter, or more correctly the living substances.'—The Riddle of the Universe, Chap, IX P. 63 (R. P. A. Chap. Ed.)

পার্থক্য অন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে থাকিবার তত্ত্ব অর্থাৎ অভিমানের কিংবা অহংকারের তত্ত্ব সকল স্থানেই এক। এই অহংকারকেই তৈজস, অভিমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভৃতিও বলা যায়। অহংকার বুদ্ধিরই এক উপভেদ হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি না হইলে অহংকার উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই অহংকার অন্য একটী গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্ত্তী এক গুণ ইহা সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহংকারেরও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে পরবর্ত্তী গুণসমূহেরও প্রত্যেকের তিন-গুণ অনন্তভেদ। অধিক কি, বাস্ত জগতে প্রত্যেক বস্তুর এইরূপ অনন্ত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে : এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গীতাতে গুণত্রয়-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত হইয়াছে (গী, অ. ১৪ ও ১৭)।

ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অহংকার এই দুই ব্যক্ত গুণ, মূল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় আছে। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের সূক্ষ্ম পরমাণু এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহংকার উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্ বুদ্ধি ও নিছক্ অহংকার—বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ। তাই, প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহারা পৃথক্ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। আসল কথা এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মক ব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার যখন মূল প্রকৃতিতে অহংকারের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আসে তখন পরে উহার বৃদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, মনুষ্য প্রভৃতি সেন্দ্রিয় প্রাণিগণের সৃষ্টি ; এবং দ্বিতীয়, নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি। এই স্থানে ইন্দ্রিয়শব্দে "ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়ের শক্তি" এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ সেন্দ্রিয় প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড়ে অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টিতে হইয়া থাকে, এবং এই প্রাণীদিগের আত্মা 'পুরুষ' নামক পৃথক্ বর্গের ভিতরেই পড়ে। তাই সাংখ্যশাস্ত্রে সেন্দ্রিয় জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্মা ছাড়িয়া কেবল ইন্দ্রিয়েরই বিচার করা হইয়াছে। জগতে সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ায় অহংকার হইতে দুইয়ের অধিক শাখা বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে হইবে না। তন্মধ্যে নিরিন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়জগতের সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এবং নিরিন্দ্রিয় জগতের তামসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন, এইরূপ নাম আছে। সারকথা এই যে, অহংকার আপন শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই এক সময় সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া ইন্দ্রিয়জগতের মূলভূত এগারো ইন্দ্রিয় এবং অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া তাহা হইতে নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় থাকা প্রযুক্ত অহংকার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তত্ত্বও সূক্ষ্ম হইয়াই থাকে।*

* ইংরাজী ভাষায় এই অর্থই সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহাদের তন্মাত্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না হইয়া প্রত্যেক গুণের পৃথক পৃথক অতিসূক্ষ্ম মূলস্বরূপ – নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলতত্ত্ব এবং মনসমেত এগারো ইন্দ্রিয় সেন্দ্রিয় জগতের বীজ। এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রপ্রদত্ত উপপত্তি যে, নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পাঁচই বা কেন এবং সেন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব এগারোই বা কেন মানা আবশ্যক হয় তাহা বিচার করিবার যোগ্য বিষয়। অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বায়ুরূপী তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য-শাস্ত্রে পদার্থসমূহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য বলেন যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মনুষ্যের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে ; এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক ইন্দ্রিয়ের একই গুণ জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। চোখে আঘ্রাণ হয় না, কানেও দেখা যায় না , এবং ত্বকের মিষ্টতিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব্দ জ্ঞান হয় না , নাক শাদা-কালো বুঝিতে পারে না। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয়, এইরূপ যদি স্থির হইয়া থাকে, তবে জগতের সমস্ত গুণ ইহা অপেক্ষা অধিক স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ অপেক্ষা অধিক গুণ যদি কল্পনা করাও যায় তাহা হইলে তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। উদাহরণ যথা—শব্দ, এই গুণ একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গা, চেরা, মধুর কিংবা সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে নিষাদ, গান্ধার, ষড়জ ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে কণ্ঠ্য তালব্য, ওষ্ঠ্য প্রভৃতি এক শব্দেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। রস কিংবা রুচি, ইহারা বস্তুত এক হইলেও তাহারও মধুর, টক্, নোনতা, ঝাল, তিতো কিংবা কষা ইত্যাদি অনেক ভেদ হইয়া থাকে , এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, শাদা, কালো, সবুজ, নীল, হলুদে, তাঁবাটে এই প্রকার অনেক প্রকারেরও হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার মিষ্টতা, এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, তাহাতেও আখের মিষ্টতা ভিন্ন, দুধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে ; এবং পৃথক পৃথক গুণের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ যদি ধর—এই গুণবৈচিত্র্য অনন্তপ্রকারে অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, পদার্থসকলের মূল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় পাঁচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই বোধগম্য হয়। এইজন্য কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শগুণের এইরূপ পৃথক পৃথক পদার্থ অর্থাৎ অন্য গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের নজরে না আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ, কেবলমাত্র রূপ, কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এইরূপ মূল প্রকৃতির পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই

The Pri eval matter (Prakriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the Principle of differentiation (Ahankara) became heterogeneous. It then brauched off into two Sections—one organic (Sendriya) and the other inorganic (Nirindriya). There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation. Purusha or the observer is differ nt from all these and falls under none of the above categories.

আছে, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র কিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে উপনিষৎকারেরা কি বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি।

নিরিন্দ্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়া উহাতে পাঁচটিমাত্র সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব আছে এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এবং যখন সেন্দ্রিয় জগৎ দেখি, তখনও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। স্থূল দেহে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় স্থূল প্রতীত হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব না মানিলে ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্নতার যথোচিত কারণ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক উৎক্রান্তিবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছে। এই মতে আদিম ক্ষুদ্রতম গোলাকার জন্তুর ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়; এবং এই ত্বক্ হইতে অন্য ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। উদাহরণ যথা—মূল-জন্তুর ত্বকের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে পর চোখ হইল ইত্যাদি। আলোকাদির সংযোগে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে,—আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ত্ব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ্য। মহাভারতে (শাং. ২১৩. ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্দ্রিয়সমূহের আবির্ভাবের এইপ্রকার বর্ণনা আছে:—

শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ
রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া॥

অর্থাৎ "প্রাণীর আত্মায় শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার ইচ্ছায় চোখ, এবং গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়"। কিন্তু সাংখ্যেরা এই-রূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও মূল-প্রকৃতিতেই যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে, তবে সজীব জগতের অন্তর্ভূত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীটের চর্ম্মের উপর সূর্য্যালোকের যতই আঘাত বা সংযোগ হউক না, তাহার চোখ—এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ—কোথা হইতে আসিবে? ডার্বিনের সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং দ্বিতীয় চক্ষুহীন—এই দুই প্রাণী সৃষ্টি হইলে পর জড়জগতের যুঝাযুঝি বা ঝটাপটিতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু নেত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি পাশ্চাত্য আধিভৌতিক সৃষ্টি শাস্ত্র বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় এক মূল ইন্দ্রিয় হইতেই পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহংকার প্রযুক্ত প্রকৃতির বহুত্ব আরম্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহংকার হইতে পাঁচ সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া এগারো ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণ, মূলপ্রকৃতিতেই যুগপৎ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হইয়া পরে তাহা হইতে স্থূল সেন্দ্রিয় জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে সংকল্পবিকল্পাত্মক কাজ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে ব্যাকরণাত্মক কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজে প্রয়োগ করে—এইপ্রকারে উহা উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকারের কাজ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। উপনিষদেও ইন্দ্রিয়সমূহেরই প্রাণ এই নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগের মতানুসারে

উপনিষৎকারদিগেরও এই মত যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাভূতাত্মক না হইয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছে (মুণ্ড. ২. ১. ৩)। এই প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা উপনিষদে কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এগারই সিদ্ধ হয়, বেদান্তসূত্রের ভিত্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাই স্থির করিয়াছেন (বেসূ. শাংভা, ২. ৪. ৫. ৬); এবং গীতাতে "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ" (গী, ১৩. ৫)—ইন্দ্রিয় দশ এবং এক অর্থাৎ এগার—এইরূপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রেই কোন মতভেদ নাই।

সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, সেন্দ্রিয় জগতের মূলভূত এগার ইন্দ্রিয়-শক্তি বা গুণ সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়; নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য তামস অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে স্থূল পঞ্চমহাভূত (ইহার 'বিশেষ' এইরূপ নামও আছে) এবং স্থূল নিরিন্দ্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থসমূহের যথাসম্ভব এগার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে জগৎ সৃষ্ট হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত তত্ত্বসমূহের ক্রম—যাহার বর্ণনা এতক্ষণ করা হইয়াছে—নিম্নপ্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে—

ব্রহ্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ

পুরুষ → (উভয়েই স্বয়ম্ভু ও অনাদি) ← প্রকৃতি (অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম) (নির্গুণ)
পর্য্যায়শব্দ:—(জ্ঞ, দ্রষ্টা ইত্যাদি)। (সত্ত্ব-রজ-তমোগুণী; পর্য্যায়শব্দঃ—প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, প্রসবধর্ম্মিণী ইত্যাদি)
|
মহান্ কিংবা বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায়শব্দঃ—আসুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি)
|
অহংকার (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায়শব্দ—অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি)
|
(সাত্ত্বিক, জগৎ অর্থাৎ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়) (তামস অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় জগৎ)
|
পাঁচ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় | পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় | মন | পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম)
|
বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থূল)

১৮ তত্ত্বের লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্ম)

স্থূল পঞ্চ-মহাভূত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব্ব-সমেত ২৫ তত্ত্ব। ইহার মধ্যে মহান্ কিংবা বুদ্ধি হইতে পরবর্ত্তী ২৩ গুণ-মূল প্রকৃতির বিকার। কিন্তু তাহার মধ্যেও এই প্রভেদ যে সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও পাঁচ স্থূল মহাভূত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার; এবং বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবল শক্তি বা গুণ; এই ২৩ তত্ত্ব ব্যক্ত এবং মূল প্রকৃতি

অব্যক্ত। এই ২৩ তত্ত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশেই দিক্‌ ও কালেরও সমাবেশ করিয়া থাকেন। প্রাণকে পৃথক্‌ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সুরু হয় তখন উহাদিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং, কা, ২৯)। কিন্তু বেদান্তী এ মত স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন (বেসূ, ২, ৪, ৯)। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যেরা যেরূপ বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র, বেদান্তীরা তাহা না বলিয়া উভয়কে এক পরমেশ্বরেরই দুই বিভূতি বলিয়া মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত উহাদের মধ্যে এই ভেদ বাদে বাকী জগদুৎপত্তিক্রম উভয়েরই গ্রাহ্য। উদাহরণ যথা—মহাভারতের অনুগীতায় 'ব্রহ্মবৃক্ষ' কিংবা 'ব্রহ্মবন' —ইহাদের যে দুইবার বর্ণন আছে (মভা, অশ্ব ৩৫, ২০-২৩ ; ও ৪৭ ১২-১৫) তাহা সাংখ্যদিগের তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে—

অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্‌।
মহাহংকারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥
মহাভূতবিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্‌।
সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥
আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এনং ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ তত্ত্বজ্ঞানাসিনা বুধঃ ॥
হিত্বা সঙ্গময়ান্‌ পাশান্‌ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্‌।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ "অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার বীজ, বুদ্ধি (মহান্‌) যাহার স্কন্ধ, অহঙ্কার যাহার মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্দ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সূক্ষ্ম মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) যাহার বড় বড় শাখা এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থূল মহাভূত যাহার ছোট ছোট ডাল-পালা, এইরূপ সদা-পত্র-পুষ্পধারী শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণীমাত্রের আধারভূত পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্মবৃক্ষ। ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকরা করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর সঙ্গময় পাশকে ছিন্ন করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহংকার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।" সংক্ষেপে এই ব্রহ্মবৃক্ষই "সংসারের লীলা" কিংবা প্রকৃতির বা মায়ার 'প্রপঞ্চ'। ইহাকে বৃক্ষ বলিবার রীতি বহু প্রাচীনকাল—ঋগ্বেদের কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে ; ইহাকেই উপনিষদে 'সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ' বলা হইয়াছে (কঠ, ৬, ১)। কিন্তু বেদে এই বৃক্ষের মূল (পরব্রহ্ম) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার) নীচে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখ্যদিগের তত্ত্ব ইহাদিগকে একত্র জুড়িয়া গীতায় অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, ১ ও ২ শ্লোকসম্বন্ধীয় আমার টীকাতে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে।

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রাপ্ত পঁচিশ তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্গীকরণ করা প্রযুক্ত, এই বর্গীকরণ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। সাংখ্য বলেন যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের মূল-প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি, এই চারি বর্গ। (১) প্রকৃতিতত্ত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া উহা মূল-প্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) এই মূলপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্য ভিতর উপর

আসিলে "মহান্‌" তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহান্‌ তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত বলিয়া 'মহান্‌' অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই প্রকারে মহান্‌ অথবা বুদ্ধি একপক্ষে অহঙ্কারের প্রকৃত বা মূল, এবং অন্যপক্ষে মূলপ্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকার। তাই সাংখ্যেরা তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে ; এবং এই ন্যায়-অনুসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহাদের সমাবেশও 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা যায়। যে তত্ত্ব বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃসৃত (বিকৃতি) হইবার পরে নিজেই অন্য তত্ত্বের মূলভূত (প্রকৃতি) হয়, তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলা যায়। এই বর্গের সাত তত্ত্ব—মহান, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। (৩) কিন্তু পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ষোল তত্ত্ব হইতে পরে অন্য কোন তত্ত্বই নিঃসৃত হয় নাই। উল্টা, তাহাই অন্য তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তাই, এই ষোল তত্ত্বকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' না বলিয়া কেবল 'বিকৃতি' কিংবা 'বিকার' বলা হয়। (৪) পুরুষ প্রকৃতিও নহে এবং বিকারও নহে ; উহা স্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া আবার উহার এইরূপে স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন ঃ—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

অর্থাৎ—"এই মূলপ্রকৃতিঅবিকৃতিঅর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে। মহাদাদি সাত (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি ; এবং মনসমেত এগার ইন্দ্রিয় ও স্থূল পঞ্চ মহাভূত মিলাইয়া ষোল তত্ত্বকে শুধু বিকৃতি কিংবা বিকার বলা হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিকৃতিও নহে" (সাং. কা. ৩)। পরে এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ তত্ত্ব ব্যক্ত, এবং পুরুষজ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ। পুরাণ, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি বৈদিকমার্গীয় গ্রন্থসমূহে প্রায় এই পঁচিশ তত্ত্বই কথিত হইয়া থাকে। (মৈত্র্যু, ৬ ১০ ; মনু ১. ১৪. ১৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে উহাদের বিশেষ বিচার বা বর্গীকরণও করা হয় নাই। উপনিষদের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকরণ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হইতে তাহা ভিন্ন। সমস্ত ধরিয়া পঁচিশ তত্ত্ব ; তন্মধ্যে ষোল তত্ত্ব সাংখ্য মতানুসারেই স্পষ্টই অন্য তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মূলভূত পদার্থবর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাকী নয় তত্ত্ব অবশিষ্ট রহিল—১ পুরুষ, ২ প্রকৃতি, ৩—৯ মহৎ, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলেন। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় না ; এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মূলপ্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি, এই যে ভেদ সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রকৃতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে মূল বলা যাইতে পারে না, তাহা প্রকৃতি-বিকৃতির বর্গের মধ্যেই আইসে। তাই সৃষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার

সময় বেদান্তী বলেন যে, এক পরমেশ্বর হইতেই এক পক্ষে জীব ও অন্য পক্ষে (মহদাদি সাত প্রকৃতি-বিকৃতিসহ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে (মভা. শাং ৩০৬. ২৯ ও ৩১০.১০ দেখ)।অর্থাৎ বেদান্তীদিগের মতে পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে ষোল তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া বাকী নয় তত্ত্বের 'জীব' ও 'অষ্টধা প্রকৃতি' এই দুই প্রকার বর্গীকরণইহইয়াথাকে। বেদান্তীদিগেরএই বর্গীকরণভগবদ্‌গীতাতে স্বীকৃতহইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতায় জীব বলা হয়; এবং জীবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে এবং সাংখ্য যাহাকে মূলপ্রকৃতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের 'অপর' অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বলা হইয়াছে (গী. ৭ ৪, ৫)। এই প্রকার প্রথমে দুই বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপের পরবর্ত্তী ভেদ কিংবা প্রকার যেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বরূপের অতিরিক্ত ও তাহা হইতে নিঃসৃত বাকী তত্ত্ব বিবৃত করা আবশ্যক। কারণ, এই কনিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতি) স্বয়ং আপনারই এক প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে যখন বলিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে না। তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপের ভেদ কত হইয়াছে তাহা বলিবার সময় বেদান্তীরা অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যে মূলপ্রকৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বাকী মহান, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী সেই মূলপ্রকৃতির ভেদ কিংবা প্রকার বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ করিলে পরমেশ্বরেরকনিষ্ঠ স্বরূপ বা মূলপ্রকৃতি সাত প্রকার বলিতে হয়; এবং উপরে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তী প্রকৃতিকে অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তী যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন, গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন—এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ না রাখিয়া 'অষ্টধা প্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান্, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৭. ৫)। তন্মধ্যে মনের ভিতরেই দশ ইন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমাবেশ করা হইয়াছে। এখন ইহা প্রতীত হইবে যে, গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের ও বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্ত্বগুলির সাংখ্য তৎপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয় না।
হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্ত্বগুলির সাংখ্যা তৎপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয় না!
স্বীকৃত হইয়াছে, তত্ত্ব সর্ব্বত্র পঞ্চবিংশতিই। তথাপি বর্গীকরণের উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্রমে পড়িতে হয় বলিয়া এই তিন বর্গীকরণ কোষ্টকের আকারে একত্র করিয়া পরে দেওয়া হইয়াছে। গীতার ১৩ অধ্যায়ে (১৩. ৫) বর্গীকরণের বিষয় বলিবার সময় সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ত্ব যেমনটি তেমনিই পৃথক পৃথক বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহা ধরিয়া বর্গীকরণ ভিন্ন হইলেও দুই স্থানেই তত্ত্বসংখ্যা একই—ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

পঁচিশ মূলতত্ত্বের বর্গীকরণ

সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ।	তত্ত্ব।	বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ।	গীতায় বর্গীকরণ
অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি	১ পুরুষ	পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠস্বরূপ	পরা প্রকৃতি
মূলপ্রকৃতি	১ প্রকৃতি		অপরা প্রকৃতি
৭ প্রকৃতি-বিকৃতি	১ মহান্ ১ অহংকার ৫ তন্মাত্র	পরব্রহ্মের কনিষ্ঠা স্বরূপ (আট প্রকারের)	অপরা প্রকৃতির আট প্রকার
১৬ বিকার	১ মন ৫ বুদ্ধীন্দ্রিয় ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ মহাভূত	বিকার বলিয়া বেদান্তী এই ষোল তত্ত্বকে মূল-তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করেন না।	বিকার বলিয়া গীতাতে এই ১৫ তত্ত্বকে মূল তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

যাক্ এই পর্য্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র নিরবয়ব অব্যক্ত জড় প্রকৃতিতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি কিরূপে প্রকট হইল; আবার 'অহংকার' দ্বারা সেই প্রকৃতির মধ্যেই সাবয়ব বহুবস্তুত্ব কিরূপে আসিল; এবং পরে 'গুণ হইতে গুণ', এই গুণপরিণামবাদ অনুসারে একপক্ষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সেন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলভূত সূক্ষ্ম এগার ইন্দ্রিয় এবং অপর পক্ষে তামসিক অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র কিরূপে নির্ম্মিত হইল। এখন ইহার পরবর্ত্তী সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল পঞ্চ মহাভূত বা তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নির্ম্মিত হইল, তাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতেই 'স্থূল পঞ্চ মহাভূত' অথবা 'বিশেষ', গুণপরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার করা প্রযুক্ত প্রসঙ্গক্রমে তাহারও সংক্ষেপে বর্ণন—এই সূচনারই সঙ্গে ইহা যে বেদান্তশাস্ত্রের মত, সাংখ্যদিগের নহে—করা আবশ্যক মনে হয়। 'স্থূল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ, ইহাদিগকে পঞ্চ মহাভূত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ইত্যাদি" (তৈ. উ, ২. ১)—অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় মূল প্রকৃতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ক্রমের কারণ কি তাহা কথিত হয় নাই। কিন্তু উত্তর-বেদন্তগ্রন্থসমূহে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিক্রমের কারণ-বিচার সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত গুণপরিণামের তত্ত্বের উপরেই করা হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদান্তিগণ বলেন যে, "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" এই ন্যায় অনুসারে প্রথমেএকই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুই গুণের তিন গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের শব্দ এই একই মুখ্য গুণ থাকাপ্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পরবায়ু; কারণ,বায়ুর শব্দও স্পর্শ এই দুইগুণ আছে। বারটা বাজিলে শুধু শোনা যায় নহে, উহা স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয়। বায়ুর পর অগ্নি। কারণ শব্দ ও স্পর্শ এই দুই ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই

তিন গুণের সঙ্গেই রুচি বা রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক ; এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়া প্রযুক্ত জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। যাস্ক এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন (নিরুক্ত, ১৪. ৪)। স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ক্রম-অনুসারে উৎপন্ন হইলে পর "পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অর্থাৎ পুরুষঃ"। (তৈ, ২. ১) পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনস্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল,—এইরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রক্রিয়াকে বেদান্তগ্রন্থে 'পঞ্চীকরণ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চীকরণের অর্থে "পাঁচ মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেকের ন্যূনাধিক অংশ লইয়া সেই সমস্তের মিশ্রণে নূতন পদার্থ প্রস্তুত হওয়া"। এই পঞ্চীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী "দাসবোধ" গ্রন্থে এই কথারইসমর্থন করিয়া বর্ণনাকরিয়াছেন—

কালে পাঁঢরে মেলবিতাঁ। পাববেঁ হোতেঁ তত্ত্বত।
কালে পিবলে মেলবিতাঁ। হিরবেঁ হোয় ॥

অর্থাৎ "কালো ও সাদা মিলিয়া নীল রং হয়, কালো হলদে মিশিয়া সবুজ রং হয়।" দাসবোধের নবম দশকে (৯. ৬. ৪০) এইরূপ বলিয়া তেরো দশকে—

ত্যা ভূগোরাচে পোটী। অনন্ত বীজাঁচিয়া কোটী ॥
পৃথ্বী মান্যা হোতাঁ ভেটী। অংকুর নিবতী ॥
পৃথ্বী বল্লী নানা রঙ্গ। পত্রেঁ পুষ্পাঁচে তরঙ্গ।
নানা স্বাদ তে মগ। ফলেঁ জালী ॥

* *

অন্তজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভীজ।
পৃথ্বী পানী সকলাচে বীজ ঐসে হে নরম চীজ। সৃষ্টি বচনেচে' ॥
চারি খানী চারি বাণী।
চৌর্‍যাঁশী লক্ষ জীব যোনী
নির্ম্মাণ ঝালে লোক তিন্হী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ॥
(দা. ১৩. ৩. ১০-১৫)

অর্থাৎ—সেই ভূগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহিয়াছে। মাটির সহিত মিলন হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নানা রঙ্গ, পত্রপুষ্পের তরঙ্গ। তারপর নানা আস্বাদের নানা ফল। অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভিদ—পৃথ্বী ও জল

সকলের বীজ। এই সৃষ্টি-রচনা অদ্ভুত। এই প্রকার চারি খণ্ড, চারি বাণী, চুরাশি লক্ষ* জীবযোনি, তিন লোক, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পঞ্চীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং পরে আত্মার সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত তাহার সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

উত্তরবেদান্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এই পঞ্চীকরণ প্রচীন উপনিষদের নহে ইহাও এখানে বলা আবশ্যক। পঞ্চ তন্মাত্র বা পাঁচ মহাভূত স্বীকার না করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তেজ, জল ও অন্ন (পৃথ্বী)' এই তিন সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বের মিশ্রণ অর্থাৎ 'ত্রিবিৎকরণ হইতে বিবিধ সৃষ্টি' উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণনা আছে। এবং "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" (শ্বেতা, ৪. ৫) অর্থাৎ—লাল বা তেজরূপী, সাদা বা জলরূপী এবং কালো বা পৃথ্বীরূপী, এই তিন রং-বিশিষ্ট তিন তত্ত্বের এক যে প্রজা (সৃষ্টি) উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতার সংবাদ (কথোপকথন) প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার আরম্ভেই শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা স্পষ্ট বলিতেছেন যে, "বৎস! জগতের আরম্ভে 'একমেবাদ্বিতীয় সং' ব্যতীত অর্থাৎ যথাতথা সমস্ত একবস্তুময় ও নিত্য পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা অসৎ (অর্থাৎ নাই) তাহা হইতে সং কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্ভে সৎ-ই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পর, উহা অনেক অর্থাৎ বহু বস্তু হইবে মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম তেজঃ (অগ্নি), জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহার পর

* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন নহে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিকশাস্ত্রীউৎক্রান্তিবাদ-অনুসারে সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন এক ক্ষুদ্র গোল সজীব জন্তু হইতে মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মানেন। এই কল্পনা অনুসারে সূক্ষ্ম গোল জন্তু হইতে স্থূল গোল জন্তুর উৎপত্তি, এই স্থূল জন্তু হইতে পুনরায় ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, ক্ষুদ্র কীটহইতে পরবর্ত্তী প্রাণীরউৎপত্তি ; প্রত্যেক যোনি অর্থাৎজাতির মধ্যে এইরূপ অনেক ধাপ চলিয়া গিয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবাশাস্ত্রজ্ঞ এইরূপ গণনা করিয়াছেন যে জলের ক্ষুদ্র মৎস্যদিগের গুণধর্ম্ম বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ চলিয়া গিয়াছে ; এবং কখনও বা এই সংখ্যারদশগুণও হইতে পারে। জলের ক্ষুদ্র জলচর হইলে মনুষ্য যোনি উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যেও ক্ষুদ্র জলচরের পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে হয় তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আমাদের পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা অপেক্ষা আধিভৌতিক শাস্ত্রের পৌরাণিক বংশকল্পনা কত বাড়িয়া গিয়াছে। কালের কল্পনা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। সজীব জগতের সূক্ষ্ম জন্তু এই পৃথিবীতে কখন উৎপন্ন হইল, স্থূল পরিমাণেও তাহা নিশ্চয় করিতে না পারায় সূক্ষ্ম জলচরের উৎপত্তিও কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপ ভূগর্ভগত জীবশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন। এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে The Last Link by Ernst Haeckel with notes & c by Dr Gadow (1898) এই পুস্তক দেখিবে। এই পুস্তকে ডাক্তার গাডো যে দুই তিন উপযুক্ত পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন তাহাতে উপরি-উক্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারের করা হইয়াছে—৮ লক্ষ জলচর ১০ লক্ষ পক্ষী ১১ লক্ষ কৃমি, ২০ লক্ষ পশু, ৩০ লক্ষ স্থাবর ও ৪ চার লক্ষ মনুষ্য (দাস ২০, ৬ দেখ)

এই তিন তত্ত্বের মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা জগতের অনেক নামরূপাত্মক বস্তু নির্ম্মিত হইল। স্থূল অগ্নি, সূর্য্য বা বিদ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাম্র (লোহিত) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম তেজোরূপী মূলতত্ত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুক্ল) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম জলতত্ত্বের এবং যে কালো (কৃষ্ণ) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্বের পরিণাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অন্ন ভক্ষণ করে তাহাতেও সূক্ষ্ম তেজ সূক্ষ্ম জল ও সূক্ষ্ম অন্ন (পৃথ্বী) এই তিন মূল তত্ত্বই ভরিয়া থাকে। দধি ঘুঁটিলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন সূক্ষ্ম তত্ত্বের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন উদরে গেলে, তন্মধ্যে তেজস্তত্ত্ব হইতে মনুষ্যের দেহে অস্থি, মজ্জা ও বাণীরূপে অনুক্রমে স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম পরিণাম উৎপন্ন হয়, এবং সেইরূপ জল এই তত্ত্ব হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাণ; এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথ্বী এই তত্ত্ব হইতে পুরীষ, মাংস ও মন এই তিন দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে (ছাং, ৬, ২-৬)। মূল মহাভূত পাঁচ না মানিয়া তিনই মানিয়া ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিষদের এই পদ্ধতিই বেদান্তসূত্রেও (২-৪ ২০) উক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণাচার্য্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি তৈত্তিরীয় (২. ১), প্রশ্ন (৪.৮) বৃহদারণ্যক (৪. ৪. ৫) প্রভৃতি অন্য উপনিষদে এবং বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর (২, ১২), বেদান্তসূত্র (২. ৩. ১-১৫) ও পরিশেষে গীতাতেও (৭. ৪, ১৩-৫) তিনের বদলে পাঁচ মহাভূত উক্ত হইয়াছে। গর্ভোপনিষদের আরম্ভেই মনুষ্য-দেহ 'পঞ্চাত্মক' কথিত হইয়াছে; মহাভারত ও পুরাণে তে পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে (মভা, শাং, ১৮৪-১৮৬)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিবৃৎকরণ প্রাচীন হইলেও যখন মহাভূতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন ত্রিবৃৎকরণের দৃষ্টান্তেই পঞ্চীকরণের কল্পনার প্রাদুর্ভাব হইল এবং ত্রিবৃৎকরণ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, এবং পরিশেষে পঞ্চীকরণের কল্পনা বেদান্তীদিগের গ্রাহ্য হইল। পরে এই পঞ্চীকরণ শব্দের অর্থে এই কথাও বলা হইয়াছে যে মনুষ্যের শরীর কেবল পঞ্চ-মহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু শরীরের মধ্যে ঐ পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক পাঁচ প্রকার বিভক্তও হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি বিভাগ অন্নময় পৃথ্বীতত্ত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি (মভা, শাং, ১৮৪, ২০-২৫; ও দাসবোধে ১৭. ৮ দেখ)। এই কল্পনাও উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবৃৎকরণের বর্ণনা হইতে সূচিত দেখা যায়। কারণ, সেখানেও শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে 'তেজ, জল ও পৃথ্বী' এই তত্ত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মনুষ্যের দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে পরব্রহ্ম হইতে অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নির্জীব বা জড়পদার্থ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ করা গিয়াছে। এক্ষণে বিচার করিব যে, জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের বিশেষ বক্তব্য কি আছে, তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কতটা মিল আছে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত পৃথিব্যাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই শরীর সেন্দ্রিয় হইলেও জড় ছাড়া

আর কিছুই নহে। এই ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরিত করিবার তত্ত্ব জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং তাহাকে 'পুরুষ' বলা হয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব প্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে যদিও 'পুরুষ' মূলে অকর্ত্তা, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব সৃষ্টির আরম্ভ হয়; এবং "আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্" এই জ্ঞান হইলে পর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুষ পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ এই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই। অতএব এখানে তৎসম্বন্ধে বেশী বিচার করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যে মনুষ্য মরে, তাহার আত্মা প্রকৃতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পায় না, ইহা সুস্পষ্ট। কারণ ছাড়ান পাইলে, জ্ঞানের কিংবা পাপপুণ্যের কোনই মাতব্বরী থাকে না; চার্ব্বাকের ন্যায় ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি হইতে ছাড়ান পায় বা মোক্ষ লাভ করে। ভাল; যদি বলা যায় যে, মরিবার পর শুধু আত্মা অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপনা হইতেই নব নব জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে পুরুষ অকর্ত্তা ও উদাসীন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতির— এই মূলভূত সিদ্ধান্তের বাধা হয়। তাছাড়া যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতে নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হইয়া যাইতেছে; এবং তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুক্তি পাইতেই পারে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, যদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন মনুষ্য মরিয়া যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অবশ্যই থাকা চাই। মৃত্যুর পর স্থূল দেহের নাশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থূল মহাভূতাত্মক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, প্রকৃতি কেবল স্থূল পঞ্চ মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে সমস্ত তেইস তত্ত্ব উৎপন্ন হয়; এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত ঐ তেইস তত্ত্বের শেষের পাঁচ। এই শেষের পাঁচ তত্ত্বকে (স্থূল পঞ্চ মহাভূত) তেইস তত্ত্ব হইতে পৃথক করিলে আঠারো তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে। অতএব, এক্ষণে কাজেকাজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইয়া যে মরে সেই পুরুষ পঞ্চ-মহাভূতাত্মক স্থূল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইলেও প্রকৃতির অন্য আঠার তত্ত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ এই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটী আঠারো তত্ত্ব (গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ব্রহ্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ দেখ)। এ সমস্তই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। তাই এই তত্ত্বগুলির সহিত পুরুষের সংযোগ বজায় রাখিয়া যে দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাকে স্থূল শরীরের বিরুদ্ধ সূক্ষ্ম কিংবা লিঙ্গশরীর বলা (সাং. কা. ৪০) হয়। যখন কোন প্রাণী জ্ঞান পাইয়া মরে, তখন মৃত্যুর সময় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উক্ত আঠার তত্ত্বের নির্ম্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থূল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পুরুষ ঐ লিঙ্গ শরীরেই কারণে নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার এই সন্দেহ হয় যে, মনুষ্য মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও নষ্ট

হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্ত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্ত্বের সহিত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের সমাবেশ কেন স্বীকার করিব ? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ অহংকার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তত্ত্ব—প্রকৃতির শুদ্ধ গুণ ; এবং ছায়ার যেরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল কাগজ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইরূপ এই গুণাত্মক তের তত্ত্বেরও একত্র থাকিবার জন্য কোন-না-কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন আত্মা (পুরুষ) স্বয়ং নির্গুণ ও অকর্ত্তা, সুতরাং তাহা কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে না॥ মনুষ্য জীবিত থাকিতে, তাহার দেহের স্থূল পঞ্চ মহাভূতই এই তের-তত্ত্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু মরণান্তর অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশানন্তর স্থূল পঞ্চ মহাভূতের এই আশ্রয় বিনষ্ট হয়। তখন এই গুণাত্মক তের তত্ত্বের অন্য কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করা চাই। যদি মূল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহা অব্যক্ত ও অবিকৃত অবস্থার অর্থাৎ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত উহা একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরীরস্থ অহংকার বুদ্ধি-আদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মূল প্রকৃতিরই দ্রব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের বদলে তাহাদের মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে লিঙ্গশরীরের মধ্যে সমাবেশ করিতে হয় (সাং. কা. ৪১)। অনেক সাংখ্যগ্রন্থকার লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনির্ম্মিত তৃতীয় এক শরীর কল্পনা করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। কিন্তু সাংখ্যকারিকার একচল্লিশ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নহে, টীকাকারেরা ভ্রান্তিবশতঃ তৃতীয় শরীর কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়। আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই বুঝানো যে, বুদ্ধি-আদি ১৩ তত্ত্বের সহিত লিঙ্গশরীরে পঞ্চতন্মাত্রেরও সমাবেশ কেন করা হইয়াছে। * ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন কারণ নাই।

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সূক্ষ্ম আঠারো তত্ত্বের সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, "জোঁক (জলৌকা) যেরূপ একগাছা ঘাসের এক ডগায় পৌঁছিলে অন্য একগাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়া) শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পূর্ব্ব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদ্‌ভাগটা টানিয়া লয়, সেইরূপ আত্মা এক শরীর ছাড়িয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে" (বৃ. ৪.৪. ৩)। কিন্তু কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং তাহাও এক শরীর ছাড়িবামাত্রই

* আমাদেরই মতানুযায়ী ভট্টকুমারিলও এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থের এক শ্লোক হইতে (আত্মবাদ, শ্লো, ৬২) দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শ্লোকটি এই—

অন্তরাভবদেহো হি নেষ্যতে বিন্ধ্যবাসিনা।
তদস্তিত্বে প্রমাণং হি ন কিঞ্চিদবগম্যতে ॥ ৬২ ॥

"অন্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্থূল শরীর এই দুয়ের মধ্যস্থিত দেহ কিংবা শরীর বিন্ধ্যবাসীর সম্মত নহে। এই প্রকারের মধ্যবর্ত্তী দেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" ঈশ্বরকৃষ্ণ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসী বলা হইয়াছে। অন্তরাভব শরীরের 'গন্ধর্ব্ব' এই নামও আছে। অমরকোষ ৩, ৩, ১৩২ এবং তাহার উপর কৃষ্ণাজী গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টীকা ও মূল গ্রন্থের প্রস্তাবনা পৃ. ৮ দেখ।

যায়, এই দুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, বৃহদারণ্যকোপনিষদেই পরে (বৃ. ৪. ৪. ৫) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ (সূক্ষ্ম) ভূত, মন, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মও শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় ; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে আপন কর্ম্ম-অনুসারে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে (বৃ. ৬ ২. ১৪, ১৫)। সেইরূপ, ছান্দোগ্যোপনিষদেও অপ (জল) মূলতত্ত্বের সঙ্গে জীবের যে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাং, ৫. ৩. ৩ ; ৫. ৯. ১), এবং বেদান্তসূত্রে তাহার যে অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে (বেসূ, ৩. ১. ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, লিঙ্গশরীরে জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মূলতত্ত্বেরই সমাবেশ ছান্দোগ্যোপনিষদেরও অভিপ্রেত। সার-কথা, মহদাদি আঠারো সূক্ষ্ম তত্ত্বের নির্ম্মিত সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম সামিল করিলেই বেদান্তীর লিঙ্গশরীর হয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এগারো ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত ভেদ কেবল শাব্দিক,—লিঙ্গশরীরের গঠনসম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তুত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। এইজন্য মৈত্র্যুপনিষদে (মৈ. ৬. ১০) "মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্ত" এই সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরের লক্ষণ "মহদাদ্যবিশেষান্তং" এইরূপ পর্য্যায়ের দ্বারা যেমনটি তেমনি ঠিক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।* ভগবদ্‌গীতাতে "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (গী, ১৫. ৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়াই সূক্ষ্ম শরীর হয়, এইরূপ বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—"বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" (১৫. ৮) অর্থাৎ বায়ু যেরূপ ফুল হইতে সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্থূল শরীর ছাড়িবার সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়া যায়। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়ায় বলা যায় যে, 'মনের সহিত ছয় ইন্দ্রিয়' এই শব্দগুলির মধ্যেই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। মনুস্মৃতিতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মরিবার পর এই জন্মের পাপপুণ্য-ফল ভোগ করিবার জন্য পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয় (মনু. ১২. ১৬. ১৭)। "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর যে সূক্ষ্ম, তাহাই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু তাহার আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে (মভা, বন. ২৯৭. ১৬) সত্যবানের (স্থূল) শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত এক পুরুষকে যম বাহির করিল,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" এই যে

* দ্বাত্রিংশৎ উপনিষদের পুণ্য আনন্দাশ্রম-সংস্করণের মৈত্র্যুপনিষদের উক্ত মন্ত্রের পাঠ "মহদাদ্যং বিশেষান্তং" এইরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই টীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরম্ভের মহৎ-তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া বিশেষান্তং এই পদের দ্বারা সূচিত বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ছাড়িয়া দিতে হয়। অথবা এই অর্থ করা আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে 'মহৎ'কে ধরিতে হইবে এবং 'বিশেষান্তং' ইহার মধ্যে বিশেষকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু যেখানে আদ্যন্ত বলা হইয়াছে সেখানে দুই-ই ধরা কিংবা ছাড়া যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্ বলিয়াছেন যে, মহাদাদ্যং এই পদের অনুস্বার ছাঁটিয়া ফেলিয়া "মহদাদ্যবিশেষান্তম্ (মহদাদি + অবিশেষান্তম্) এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ করিয়া অবিশেষ পদ ধরিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অন্ত এই দুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এবং লিঙ্গশরীরে উভয়েরই সমাবেশ করা যাইবে। এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ। কিন্তু যে-কোন পাঠই গ্রহণ করুন না কেন, অর্থের ভেদ হয় না, ইহা [illegible] রাখা আবশ্যক।

বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এই দৃষ্টান্তেরই জন্য লিঙ্গশরীর অঙ্গুষ্ঠ আকারবিশিষ্ট মান্য হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

লিঙ্গশরীর আমাদের চোখে না দেখা গেলেও তাহার অস্তিত্ব কোন অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার করা হইল। কিন্তু, প্রকৃতি ও পাঁচ স্থূল মহাভূতের অতিরিক্ত আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় হইতে লিঙ্গশরীর নির্ম্মিত হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেইখানে যেইখানে থাকিবে, সেইখানে সেইখানে এই আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধর্ম্মানুসারে মাতাপিতার স্থূল দেহ হইতে এবং পরে স্থূল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থূল অবয়ব বা স্থূল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিবে অথবা তাহাদের পোষণ করিবে। কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেহ কেন উৎপন্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী 'পুরুষ' বলেন, এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অকর্ত্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাণীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ উৎপন্ন করিবার কর্ত্তৃত্ব পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রে পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না; এবং পুরুষ যখন উদাসীন, তখন বলিতেই হয় যে, কর্ম্ম প্রকৃতির সত্ত্বরজতমোগুণেরই বিকার। লিঙ্গশরীরে যে আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রধান। কারণ, বুদ্ধি হইতেই পরে অহঙ্কারাদি সতেরো তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অতএব বেদান্ত যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের ন্যূনাধিক পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্ম্ম বা বিকার বলা হয়। বুদ্ধির এই ধর্ম্মের সংজ্ঞা—'ভাব'। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের তারতম্যে এই ভাব অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। ফুলেতে যেরূপ গন্ধ ও কাপড়ে যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে এই ভাব লাগিয়া থাকে (সাং কা ৪০)। এই ভাব অনুসারে কিংবা বেদান্তের পরিভাষায় কর্ম্মানুসারে লিঙ্গশরীর নব নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ করিবার সময় পিতামাতার শরীর হইতে যে দ্রব্য লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লয় সেই সকল দ্রব্যেতেও অন্যভাব আসিয়া থাকে। 'দেবযোনি, মনুষ্যযোনি, পশুযোনি ও বৃক্ষযোনি' এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্চয়েরই পরিণাম (সাং, কা, ৪৩-৫৫)। এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেইপ্রযুক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন আপনার মূলস্বরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হয়; এবং তখন এই লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান না হইয়া শুধু সাত্ত্বিক-গুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গশরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে; রজোগুণের প্রাবল্য হইলে মনুষ্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে তাহাকে তির্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী. ১৪. ১৮)। "গুণা গুণেষু জায়ন্তে" এই তত্ত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে,

মানবযোনিতে জন্ম হইলে পর রেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদ্বুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন ভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে গঠিত হয় (সাং. কা. ৪৩ ; মভা. শাং. ৩২০)। সাংখ্য ও গর্ভোপনিষদের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্রে 'ভাব' শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ বলা হইয়াছে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বিবক্ষিত না হইলেও ভগবদ্‌গীতাতে (গী. ১০. ৪, ৫ ; ৭. ১২), "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ" ইত্যাদি গুণের (পরবর্ত্তী শ্লোকে) যে 'ভাব' নাম দেওয়া হইয়াছে, অনুমান হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা মনে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকারে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্ত অনুসারে মূল সৎরূপী পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির সমস্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যখন সৃষ্টির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন উপরে কথিত জগৎ-উৎপত্তির গুণপরিণামক্রমে বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্রেরই মান্য (বেসূ. ২. ৩. ১৪ ; মভা. শাং. ২৩২)। উদাহরণ যথা, পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্নিতে, অগ্নির বায়ুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের তন্মাত্রে, তন্মাত্রের অহঙ্কারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি বা মহানের প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং বেদান্তানুসারে প্রকৃতি মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইলে পর উহার লয় ও সংহার পর্য্যন্ত কতকাল অতীত হয়, ইহা সাংখ্যকারিকায় কোথাও কথিত হয় নাই। তথাপি মনে হয় যে, মনুসংহিতা (১.৬৮-৭৩), ভগবদ্‌গীতা (৮.১৭), এবং মহাভারতে (শাং. ৩১) বর্ণিত কালগণনা সাংখ্যদিগেরও মান্য। আমাদের উত্তরায়নই দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই দেবতাদের রাত্রি। কারণ, শুধু স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে পরন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের সংহিতাদিতেও বর্ণনা আছে (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১. ১৩ ; ১২. ৩৫, ৬৭) যে, দেবতা মেরুপর্ব্বতের উপর অর্থাৎ উত্তর ধ্রুবস্থানে থাকেন। অর্থাৎ দুই অয়নের আমাদের এক বৎসরই দেবতাদের এক দিবারাত্রি এবং আমাদের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ৩৬০ দিবারাত্রি বা এক বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ। এই চারিযুগের কালগণনা এইরূপ—সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের তিন হাজার, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার বৎসর। কিন্তু এক যুগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আরম্ভ না হইয়া মধ্যে দুয়ের গোলযোগ অর্থাৎ সন্ধিকালের কয়েক বৎসর চলিয়া যায়। এই প্রকারে সত্যযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ত্রেতাযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে তিনশত বর্ষের, দ্বাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে দুইশত বর্ষের, এবং কলিযুগের পূর্ব্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত বর্ষের, সন্ধিকাল মিলিয়া মোট চারিযুগের আদ্যন্তের সন্ধিকাল দুই হাজার বৎসর হয়। এই দুই হাজার বৎসর এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত সাংখ্যমতে চারি যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়া মোট বারো হাজার বৎসর হয়। এই বারো হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের না দেবতাদিগের? মনুষ্যের বলিয়া ধরিলে, কলিযুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে; কাজেই বলিতে হয় যে, হাজার মানব-বৎসরের

কলিযুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় তার পরে আগন্তব্য সত্যযুগও শেষ হইয়া এক্ষণে ত্রেতাযুগ আসিয়াছে। এই বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারো হাজার বৎসর দেবতাদের, এইরূপ পুরাণে নির্ধারিত হইয়াছে। দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর, মনুষ্যদের ৩৬০ × ১২০০০ = ৪৩, ২০, ০০০, তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ হাজার বৎসর হয়। এখনকার পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হইয়া থাকে। (দেবতাদের) বারো হাজার বৎসর মিলিয়া মনুষ্যদের এক মহাযুগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর বলা যায় এবং এইরূপ মন্বন্তর চৌদ্দটি। কিন্তু প্রথম মন্বন্তরের আরম্ভে ও শেষে এবং পরে প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে দুই দিকে সত্যযুগের ন্যায় একাদিক্রমে এইরূপ পনেরো সন্ধিকাল হইয়া থাকে। এই পনেরো সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মন্বন্তর মিলিয়া দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা ব্রহ্মদেবের এক দিন হয় (সূর্যসিদ্ধান্ত ১. ১৫-২০); এবং মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়া ব্রহ্মদেবের এক রাত্রি হয় (মনু., ১. ৬৯-৭৩ ও ৭৯; মভা, শাং ২৩১. ১৮-২১; এবং যাস্কের নিরুক্ত ১৪.৯ দেখ)। এই গণনানুসারে ব্রহ্মদেবের একদিন মনুষ্যের চার অর্বুদ বত্রিশ কোটি বৎসর, এবং ইহারই নাম—কল্প।* ভগবদ্গীতাতে (গী. ৮-১৮ ও ৯. ৭ দেখ), স্মৃতিগ্রন্থে এবং মহাভারতেও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেবের এই দিন কিংবা কল্প আরম্ভ হইলে পর—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ব্রহ্মদেবের রাত্রি সুরু হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ আবার অব্যক্তের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়"। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়েরও কথা পুরাণ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রলয়সমূহে সূর্যচন্দ্রাদি সমস্ত জগতের নাশ না হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের বিচার করিবার সময় ইহাদিগকে জমার মধ্যে ধরা হয় না। কল্প—ব্রহ্মদেবের এক দিন কিংবা রাত্রি; এবং এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিই তাঁহার এক বৎসর। তাই পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে (বিষ্ণুপুরাণ ১. ৩ দেখ) যে, ব্রহ্মদেবের আয়ু তাঁহার একশত বৎসর, তাহার অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংবা শ্বেতবারাহ নামক কল্প এখন সুরু হইয়াছে; এবং এই কল্পের চৌদ্দ মন্বন্তরের মধ্যে ছয় মন্বন্তর গিয়া সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে। ১৯৫৬ সম্বতে (১৮২১ সকে) এই কলিযুগের ঠিক ৫০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিযুগের প্রলয় হইতে ১৮২১ অব্দে (১৯৫৬ সম্বতে) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর বাকী ছিল; আর বর্ত্তমান মন্বন্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্পান্তে যে মহাপ্রলয় হইবে সে ত দূরেই রহিয়া গেল। মানবী চার অব্জ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রহ্মদেবের যে দিন এখন চলিতেছে, তাহার পূর্ণ মধ্যাহ্নও এখনো হইল না অর্থাৎ সাত মন্বন্তর এখনও অতীত হয় নাই!

* জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভিত্তিতে যুগাদির গণনার বিচার স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বীয় 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে ঠিকঠিকানা করিয়াছেন। তাহা দেখ পৃ. ১০৩-১০৫; ১৯৩ ইত্যাদি।

জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা বেদান্তের উপর—এবং পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানের—উপর করা হইয়াছে, সেই কারণে জগৎ-উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পরাই আমাদের শাস্ত্রকার সর্ব্বদা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, এবং ভগবদ্গীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায়; যেমন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের কোন কোন স্থানে কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মদেব বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংবা জল প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পরমেশ্বরের বীজ হইতে এক সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচার গৌণ ও উপলক্ষণাত্মক বুঝিয়া তাহাদের উপপত্তি বুঝাইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বলা যায় যে, হিরণ্য গর্ভ কিংবা ব্রহ্মদেব অর্থে প্রকৃতিই বুঝায়। ভগবদ্গীতাতেও "মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম" (গী. ১৪. ৩) এইরূপ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হইতে এই প্রকৃতিতে ত্রিগুণের দ্বারা অনেক মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়। অন্যত্র এইরূপ বর্ণন আছে যে, ব্রহ্মদেব হইতে আরম্ভে দক্ষাদি সাত মানসপুত্র বা সাত মনু উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা পরে চরাচর জগৎ নির্মাণ করিলেন (মভা. আ. ৬৫-৬৭; মভা. শাং. ২০৩; মনু. ১. ৩৪-৬৩); এবং ইহার উল্লেখ একবার গীতাতেও করা হইয়াছে (গী. ১০. ৬)। কিন্তু বেদান্তগ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে ব্রহ্মদেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্ত্বিক জগদুৎপত্তিক্রমের সহিত মিল হইয়া যায়; এবং এ নিয়ম অন্যত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ যথা, শৈব ও পাশুপতদর্শনে শিবকে নিমিত্ত-কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে কার্য্যকারণাদি পাঁচ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মত দেখা যায়; এবং নারায়ণীয় ভাগবত ধর্ম্মে বাসুদেবকে প্রধান মানিয়া বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব), সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রানুসার জীব প্রত্যেকবারই নব নব উৎপন্ন হয় না, উহা নিত্য ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য—অতএব অনাদি—অংশ; তাই বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (বেসূ. ২. ২. ৪২. ৪৫) ভাগবতধর্ম্মোক্ত জীবের উৎপত্তিবিষয়ক উপরিউক্ত মতের খণ্ডন করিয়া ঐ মত বেদবিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং গীতাতে বেদান্তসূত্রের এই সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে (গী. ১৩. ৪; ১৫. ৭)। সেইরূপ আবার সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কে স্বতন্ত্র তত্ত্ব মানিয়া থাকেন; কিন্তু এই দ্বৈত অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব নিত্য ও নির্গুণ এক পরমাত্মারই বিভূতি, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে (গী. ৯. ১০)! কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা যাইবে। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে বর্ণিত বাসুদেবভক্তির ও প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মের তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় মান্য হইলেও গীতাতে ভগবতধর্ম্মের এই কল্পনা স্বীকৃত হয় নাই যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) প্রাদুর্ভূত হয়। সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, বা অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত ভাগবতধর্ম্ম এবং গীতার ভাগবতধর্ম্মের মধ্যে ইহাই

গুরুতর ভেদ। এই বিষয়ের উল্লেখ এইখানে জানিয়া বুঝিয়া করা হইয়াছে, কারণ "ভগবদ্‌গীতাতে ভাগবতধর্ম্ম বলা হইয়াছে" এইটুকু হইতে কেহ ইহা না বুঝেন যে জগতের উৎপত্তি-ক্রমসম্বন্ধে কিংবা জীব-পরমেশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে ভাগবতাদি ভক্তি-সম্প্রদায়ের মতও গীতার মান্য। এক্ষণে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই বাহিরে ব্যক্তাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতে মূলের অন্য কোন তত্ত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই নাম অধ্যাত্ম কিংবা বেদান্ত।

ইতি অষ্টম প্রকরণ সমাপ্ত।

নবম প্রকরণ

অধ্যাত্ম

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ *
গীতা, ৮, ২০।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই প্রকরণের মর্ম্মার্থ এই যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে তাহারই নাম সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ; সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার ও সৃষ্টির বিচার করিবার সময়, সাংখ্যমতানুসারে শেষে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই-ই স্বতন্ত্র ও অনাদি মূলতত্ত্ব থাকিয়া যায়; এবং আপনার সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে, প্রকৃতি হইতে আপন ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য উপলব্ধি করিয়া পুরুষের ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের কেমন করিয়া বিস্তার করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্যশাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন; এবং আধিভৌতিক শাস্ত্রসমূহের যেমন যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎকর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য হইতে পারে না। তথাপি, এই বিষয় অন্য শাস্ত্রের, আমাদের নহে, এইরূপ মনে করিয়া বেদান্ত-কেশরী সেই সম্বন্ধে বিবাদ করিতে বসে না। তিনি এই সমস্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিয়া পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের মূলে কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে এবং মনুষ্য কেমন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমন করিয়া তদ্রূপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই রাজ্যের মধ্যে অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জ্জন চলিতে দেন না। সিংহের সম্মুখে যেরূপ শৃগাল চুপ হইয়া যায় সেইরূপ বেদান্তের সম্মুখে অন্য শাস্ত্রসকলও নীরব হইয়া যায়। তাই একজন প্রাচীন সুভাষিতকার বেদান্তের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

তাবৎ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎ বেদান্তকেশরী ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচারান্তে নিষ্পন্ন 'দ্রষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা এবং ক্ষরাক্ষর জগতের বিচারান্তে নিষ্পন্ন সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী অব্যক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং জগতের মূলতত্ত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়া মানিতেই হয়—এইরূপ সাংখ্য বলেন। কিন্তু বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ হইলেও অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত ইহা মানা সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের লাভ কিসে হয় তাহা বুঝিয়া প্রত্যেক পুরুষের সহিত তদনুসারে ব্যবহার করিবার সামর্থ্য প্রকৃতির আছে। এইরূপ মানা অপেক্ষা সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করাই

* "সেই (সাংখ্য) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অন্য অব্যক্ত পদার্থ, যাহা সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইলেও নাশ প্রাপ্ত হয় না", তাহাই চরম গতি।

অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, ঐ একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত নির্ব্বিবাদ প্রয়োগ করা হোক এবং প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষের একই পরমতত্ত্বে অবিভক্তরূপে সমাবেশ করা হোক যাহা 'অবিভক্তং বিভক্তেষু' এই অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত শ্রেণীসমূহে দেখা যায় এবং যাহার সহায়তাতেই সৃষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ করা হয় (গী. ১৮. ২০-২২)। ভিন্নতার অবভাস হওয়া অহংকারের পরিণাম; এবং পুরুষ যদি নির্গুণ হয়, তবে অসংখ্য পুরুষের পৃথক্ থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পারে না। কিংবা বলিতে হয় যে, বস্তুত পুরুষ অসংখ্য নহে, কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহংকার গুণরূপী উপাধির কারণেই উহাতে অসংখ্যতা দেখা যায়। তা ছাড়া, আর এক প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে তাহা সত্য বা মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনই দূর হইতে পারে না, সুতরাং সাংখ্যমতানুসারে আত্মা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মিথ্যা বলিয়া যদি মানা যায়, তাহা হইলে, পুরুষের সংযোগ-প্রযুক্ত প্রকৃতি, পুরুষের সম্মুখে নিজের বাজার সাজাইতে যে বসিয়া যান, সে কথা নির্মূল হয়। গাভী যেরূপ বাছুরের জন্য দুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি কার্য্যতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টান্তও খাটে না; কারণ গরুর পেটেই বাছুর হয় বলিয়া বাছুরের উপর গরুর সন্তানবাৎসল্যের উদাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সেইরূপ দেখান যায় না (বেসূ. শাং ভা. ২. ২. ৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূলেই অত্যন্ত ভিন্ন— একটি জড়, আর একটি সচেতন। জগতের আরম্ভ হইতেই এই দুই পদার্থ যদি অত্যন্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তবে আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের স্বভাব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাবেই যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দই বা কি? মূল প্রকৃতির গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার চৈতন্যশক্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইহা তাহার স্বভাবই, হেকলেরও ইহাই সিদ্ধান্ত কি না? কিন্তু এইমত স্বীকার না করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন যে, 'দ্রষ্টা' পৃথক্ এবং 'দৃশ্যজগৎ' পৃথক্। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যে ন্যায়ানুসারে সাংখ্যবাদী এই ভেদ দেখান সেই ন্যায়ের উপযোগ করত আরও অগ্রে চলিব না কেন? বাহ্য জগৎ তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও এবং চক্ষুর স্নায়ুর মধ্যে অমুক অমুক গুণধর্ম্ম আছে নির্দ্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা বা 'দ্রষ্টা' ভিন্ন রহিয়াই যায়। 'দ্রষ্টা' পুরুষ 'দৃশ্য জগৎ' হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই? এবং ইহা জানিবার কোন মার্গ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেরূপ দেখি তাহাই ঠিক্ কিংবা তাহা হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী বলেন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব মূলেই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এইরূপ ধরিয়া লইতে হয়। নিছক্ আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। কারণ জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলে আমরা তাহাদের গুণধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ এই 'দ্রষ্টা'

পুরুষ যাহাকে বেদান্ত 'আত্মা' বলেন সেই দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও গোচর হইতে পারে না; এবং যে পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, মানবী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? ভগবান ভগবদ্গীতাতেও ঐ আত্মার এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ (গী. ২. ২৩)

অর্থাৎ আত্মা এইরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদার্থের ন্যায় আমরা তাহার উপর উষ্ণ জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা দ্রব হইবে, কিংবা প্রয়োগশালার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার আন্তরিকস্বরূপ দেখিয়া লইব, অথবা অগ্নির উপর রাখিলে তাহা ধোঁয়া হইয়া যাইবে কিংবা বাতাসে তাহা শুকাইয়া যাইবে! সারকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক শাস্ত্রবেত্তা-দিগের যে কোন উপায় আছে সে সমস্ত এইস্থলে নিষ্ফল হইয়া যায়। তখন সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, তবে আত্মার পরীক্ষা হইবে কি প্রকারে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই কঠিন নাই। সাংখ্যবাদিগণও 'পুরুষকে' নির্গুণ ও স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির করিলেন? আপন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিভৌতিক শাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নিছক স্বসম্বেদ্য অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য। কেহ যদি এইরূপ বলেন যে, 'আত্মা' যদি স্বসম্বেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুষ্যের ঐ বিষয়ে যেইরূপ জ্ঞান হইবে তাহাই হইতে দাও; তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? হাঁ, প্রত্যেক মনুষ্যের মন কিংবা অন্তঃকরণ যদি সমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যখন সকল লোকের মনের শুদ্ধি ও শক্তি এক প্রকার নহে বলিয়া আমরা জানি, তখন যাঁহাদের মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, তাঁহাদেরই প্রতীতি এই বিষয়ে আমাদের প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। অনর্থক "আমার এইরূপ মনে হয়" কিংবা "তোমার এইরূপ মনে হয়" বলিয়া বাদবিতণ্ডা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। যুক্তিবাদ ছাড়িয়া দেও, বেদান্তশাস্ত্র সে কথা একেবারেই বলে না। বেদান্ত-শাস্ত্র ইহাই বলে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় স্বসম্বেদ্য অর্থাৎ নিছক আধিভৌতিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত হইবার যে সকল যুক্তি অত্যন্ত শুদ্ধ পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল যুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মানা হয়, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্বানুভূতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির প্রামাণিকতা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। যে যুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল তাহাই বেদান্তীদিগের মান্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদিগের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

"ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা কিংবা অনুমানের দ্বারা করিবে না ; সমস্ত জগতের মূল প্রকৃতিরও বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিন্তনীয়"—এই একটী পুরাতন শ্লোক মহাভারতের মধ্যে (মভা. ভীষ্ম. ৫. ১২) পাওয়া যায় এবং 'সাধয়েৎ' ইহার বদলে 'যোজয়েৎ' এইরূপ পাঠভেদে বেদান্তসূত্রসম্বন্ধীয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেতেও গৃহীত হইয়াছে (বেসূ. শাং ভা. ২. ১. ২৭)। মুণ্ডক ও কঠোপনিষদেও আত্মজ্ঞান শুধু তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে (মুং, ৩. ২. ৩ ; কঠ ২. ৮. ৯ ও ২২)। অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপনিষদ্ গ্রন্থাদির বিশেষ মহাত্ম্যের কারণও ইহাই। মনকে কি করিয়া একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক আলোচনা হইয়া পরিশেষে এই বিষয়ে (পাতঞ্জল) যোগশাস্ত্র নামক এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে। যে সকল বড় বড় ঋষি এই শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, এবং স্বভাবতই যাঁহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, সেই সকল মহাত্মাগণ মনকে অন্তর্মুখ করিয়া আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংবা সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের শুদ্ধ ও শান্ত বুদ্ধির যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ্‌গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। তাই, যে কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয়করণে এই শ্রুতি গ্রন্থসমূহে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই (কঠ. ৪. ১)। মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা এই আত্ম-প্রতীতির পোষক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে ; কিন্তু তন্নিবন্ধন মূল প্রতীতির প্রামাণ্য এতটুকুও ন্যূনাধিক হইতে পারে না। ভগবদ্‌গীতা স্মৃতিগ্রন্থের অন্তর্গত সত্য ; কিন্তু এ বিষয়ে তাহার যোগ্যতা উপনিষদের সমানই যে স্বীকৃত হয় ইহা প্রথম প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। অতএব গীতা ও উপনিষদে প্রকৃতির অতীত এই অচিন্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এই প্রকরণে শেষদিকে কেবল তাহাই উক্ত হইয়াছে ; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শাস্ত্ররীতিতে উহাদের উপপত্তির বিচার পরে করা হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদিগের এই দ্বৈত ভগবদ্‌গীতার মান্য নহে। গীতান্তর্ভূত অধ্যাত্মজ্ঞানের এবং বেদান্তশাস্ত্রেও প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই অতীত এক সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ত্ব চরাচর জগতের মূলে আছে। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু যাহা সগুণ তাহা নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্রকৃতিরও নাশ হইলে পর শেষে যে কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও নিত্য তত্ত্ব, প্রকৃতিপুরুষ বিচার করিবার সময় ঐই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত ভগবদ্‌গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। আরো পরে ১৫শ অধ্যায়ে (গী. ১৫. ১৭) ক্ষর ও অক্ষর—ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে এই দুই তত্ত্ব বলিবার পর উক্ত হইয়াছে :—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

অর্থাৎ এই দুই হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অব্যয় ও সর্ব্বশক্তিমান, এবং তিনিই ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের সংরক্ষণ করেন। এই

পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুয়েরই অতীত হওয়ায় তাঁহার যথার্থ সংজ্ঞা 'পুরুষোত্তম' হইয়াছে (গী. ১৫. ৮)। মহাভারতেও ভৃগু ঋষি ভরদ্বাজকে 'পরমাত্মা' ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥

অর্থাৎ "আত্মা যখন প্রকৃতিতে বা দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকে তখন তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) বলে ; তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত হইলে তাহার 'পরমাত্মা' এই সংজ্ঞা হয় (মভা. শাং, ১৮৭. ২৪)। 'পরমাত্মা'র উক্ত দুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়া সম্ভব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর জগৎ ও জীব (অথবা সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ) এই দুয়েরই অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই কারণেও বলা যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের অতীত, আবার কখনও বলা যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার (পুরুষের) অতীত—এইরূপে এক পরমাত্মারই এই দুটি লক্ষণ কিংবা ব্যাখ্যা করা হইলেও বস্তুত কোন ভিন্নতা হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়া কালিদাসও কুমারসম্ভবে পরমেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছেন যে,—"পুরুষের লাভের জন্য সচেষ্ট প্রকৃতিও তুমিই, এবং নিজে উদাসীন থাকিয়া সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা পুরুষও তুমিই" (কুমা. ২. ১৩.)। সেইরূপ আবার গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন 'মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম"—এই প্রকৃতি আমার যোনি বা আমার এক স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আত্মাও আমারই অংশ (১৫. ৭)। ৭ম অধ্যায়েও ভগবান বলিতেছেন যে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অর্থাৎ 'পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারের আমার প্রকৃতি ; ইহা ব্যতীত (অপরেয়মিতস্ত্বন্যাৎ) সমস্ত জগৎ যাহা ধারণ করিয়া আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি (গী. ৭. ৪. ৫)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অনেক স্থানে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে ; কিন্তু সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের অতীত ষড়্‌বিংশতম এক পরম তত্ত্ব আছে, যাঁহাকে জানিতে না পারিলে মনুষ্য 'বুদ্ধ' হয় না (শাং. ৩০৮)। আমাদের নিজের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্থের যে জ্ঞান হয় তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই কখন কখন 'জ্ঞান' এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিতে 'পুরুষ' জ্ঞাতা বলিয়া, উক্ত হয় (শাং. ৩. ৬. ৩৫-৪১)। কিন্তু প্রকৃত 'জ্ঞেয়' যিনি (গী. ১০-১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতায় তাঁহাকেই 'পরমপুরুষ' বলা হইয়াছে। ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া তাহার ধারয়িতা এই যে পরম বা পর-পুরুষ, তাঁহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর,—এ কথা শুধু ভগবদ্‌গীতা নহে, বেদান্তশাস্ত্রের সকল গ্রন্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। 'অক্ষর' ও 'অব্যক্ত' এই দুই বিশেষণ বা শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; কারণ, জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্য কোন মূল কারণ নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং. কা. ৬১)। কিন্তু বেদান্তদৃষ্টিতে

দেখিলে, পরব্রহ্মই এক অক্ষর হন অর্থাৎ তাঁহার কখন নাশ হয় না ; তিনিই অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অতএব গীতার ‘অক্ষর’ ও ‘অব্যক্ত’ এই দুই শব্দই প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই বিষয় পাঠকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গী. ৮. ২০. ; ১১. ৩৭ ; ১৫. ১৬. ১৭)। বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও তাহাকে ‘অক্ষর’ বলা যে ঠিক্ নহে, এ কথা সত্য। জগদুৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে কোন অদল-বদল না করিয়া তাঁহাদের শব্দেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা ব্যক্তাব্যক্ত জগতের বর্ণনা করা হইয়াছে ; কিন্তু মনে রেখো যে, এই বর্ণন হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এই উত্তম পুরুষের সর্ব্বশক্তিত্বে কোন বাধা আসে না। সেইজন্য গীতারও মান্য, তাই, ভগবদ্‌গীতাতে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদান্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জন্য, (সাংখ্য) অব্যক্তেরও অতীত অব্যক্ত এবং (সাংখ্য) অক্ষরেরও অতীত অক্ষর এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। উদাহরণ যথা—এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা গীতা পড়িবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, ‘অব্যক্ত’ এবং ‘অক্ষর’ এই দুই শব্দই কখনো সাংখ্যদিগের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনো বেদান্তের পরব্রহ্মের উদ্দেশে—অর্থাৎ দুই বিভিন্ন প্রকারে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্যক্তই, বেদান্তের মতে জগতের মূল। জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে ইহাই উপরি-উক্ত পার্থক্য। এই পার্থক্য হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত মোক্ষের স্বরূপ এবং সাংখ্যদিগের মোক্ষস্বরূপ কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদের এই দ্বৈতকে না মানিয়া, যখন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুষোত্তমরূপী এক তৃতীয় নিত্য তত্ত্ব আছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তাঁহার বিভূতি, তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, এই তৃতীয় মূলভূত তত্ত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের সহিত উহার কি সম্বন্ধ ? প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর—এই ত্রয়ীকে অধ্যাত্মশাস্ত্রে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্ম বলা হয় ; এবং তিন বস্তুরই স্বরূপ ও ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য কার্য্য ; উপনিষদেও ইহারই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সমস্ত বেদান্তের মতের ঐক্য নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই ; এবং কেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত ভিন্ন। ইহা হইতেই বেদান্তীদিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈতী এইরূপ ভেদ হইয়াছে। জীব ও জগতের সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য। কিন্তু কতক লোক বলেন যে, জীব, জগৎ ও পরব্রহ্ম এই তিন বস্তুর মূলস্বরূপ আকাশের ন্যায় এক ও অখণ্ড ; আবার অন্য বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে না বলিয়া, দাড়িমের ফলের অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় না, তেমনি জীব ও জগৎ পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিলেও উহা পরমেশ্বর হইতে মূলেতে ভিন্ন এবং তিনিই “এক” বলিয়া যখন উপনিষদে বর্ণিত হয় তখন তাহার অর্থে

‘দাড়িমের ফলের ন্যায় এক’ এইরূপ বুঝিতে হইবে। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন এই মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজ নিজ মতানুসারে উপনিষদসমূহের এবং গীতারও শব্দসকলের টানিয়া বুনিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন। তাহার পরিণামে গীতার প্রকৃত স্বরূপ—উহার প্রতিপাদ্য সত্য—কর্ম্মযোগ বিষয় তো একপাশে থাকিয়া গেল এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মতে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গীতা বেদান্তের দ্বৈতমতের বা অদ্বৈতমতের ! হোক ; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ (প্রকৃতি), জীব, (আত্মা কিংবা পুরুষ), এবং পরব্রহ্ম (পরমাত্মা কিংবা পুরুষোত্তম) ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কি বলিয়াছেন। এই বিষয়ে গীতা ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার সমস্ত বিচার উপনিষদে যে প্রথমেই আসিয়াছে, পরবর্ত্তী বিচার হইতে পাঠকদিগের তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুষোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তাঁহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্‌গীতায় প্রথমে তাঁহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর) এই দুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচররূপ যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাকী রহিল অব্যক্ত। এই অব্যক্ত রূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা যে নির্গুণই হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সূক্ষ্মরূপে থাকিতে পারে। তাই, অব্যক্তেরও সগুণ, সগুণ-নির্গুণ ও নির্গুণ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। ‘গুণ’ শব্দে শুধু মনুষ্যের বহিরিন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নহে, মনের দ্বারাও যে সকল গুণের জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের মূর্ত্তিমান অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের নির্দ্দেশ এই প্রকার করিয়াছিলেন—যথা, “প্রকৃতি আমার স্বরূপ” (৯. ৮), “জীব আমার অংশ” (১৫. ৭), “সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা আমি” (১০. ২০), “জগতে যে যে শ্রীমান্ কিংবা বিভূতিমান মূর্ত্তি আছে সে সমস্ত আমার অংশ হইতে হইয়াছে” (৪০. ৪১), “আমার পরে মন রাখিয়া আমার ভক্ত হও” (৯. ৩৪), “তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি” (১৮. ৬৫)। এবং যখন নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান তাঁহাকে এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত রূপ অপেক্ষা ব্যক্তরূপের উপাসনা করা অধিক সহজ ; তাই তুমি আমার উপরই তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২. ৮) আমিই ব্রহ্মের, অব্যয় মোক্ষের শাশ্বত ধর্ম্মের ও নিত্য সুখের মূল স্থান (গী. ১৪. ২৭)। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গীতার অধিকাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন

যে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপই অন্তিম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কারণ, উপরি-উক্ত বর্ণনার সঙ্গেই ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং তাহার অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপই আমার সত্য স্বরূপ। উদাহরণ, যথা সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ (গী. ৭ ২৪)

অর্থাৎ—"আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় স্বরূপ তাহারা জানে না"; এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে (৭. ২৫), ভগবান বলিতেছেন যে, "আমি আমার যোগ-মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে জানে না।" আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্ত স্বরূপের উপপত্তি এই প্রকার বলিয়াছেন—"আমি জন্ম-বিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজ মায়ার দ্বারা (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়া থাকি" (৪. ৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন—"এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি আমার দৈবী মায়া ; এই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে সে-ই আমাকে প্রাপ্ত হয়, এবং সেই মায়ার দ্বারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সেই মূঢ় নরাধম আমার সহিত মিলিত হইতে পারে না" (৭. ১৫)। শেষে আঠারো অধ্যায়ে (১৮. ৬১) ভগবান উপদেশ করিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবরূপে পরমাত্মাই বাস করেন, এবং তিনি আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন।" অর্জ্জুনকে ভগবান যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তাহাই ভগবান নারদকেও দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণী প্রকরণে কথিত হইয়াছে (শাং. ৩৩৯) ; এবং নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মই গীতার প্রতিপাদ্য ইহা আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। নারদকে এইরূপ সহস্র চক্ষুর, রঙ্গের এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

"তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা আমার উৎপাদিত মায়া ; ইহা হইতে তুমি এরূপ বুঝিও না যে, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত।" আবার ইহা বলিয়াছেন যে, "আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহা সিদ্ধপুরুষেরা জানেন," (শাং. ৩৩৯. ৪৪. ৪৮)। এইজন্য বলিতে হয় যে, গীতায় বর্ণিত অর্জ্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মায়িকই ছিল। সারকথা, উপাসনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত স্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠস্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; এবং সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই তাঁহার মায়া ; এবং এই মায়া কাটাইয়া শেষে পরমাত্মার শুদ্ধ ও অব্যক্ত স্বরূপের জ্ঞান না হইলে মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই যে গীতার সিদ্ধান্ত, তাহা উপরি-উক্ত বিচার হইতে নিঃসন্দেহ দেখা যায়। মায়া জিনিসটা কি তাহার অধিক বিচার পরে করিব। উপরে প্রদত্ত বচনাদি হইতে এইটুকু স্পষ্ট হইতেছে যে, এই মায়াবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য নতুন বাহির করেন নাই

তাঁহার পূর্ব্বে তাহা ভগবদ্‌গীতায়, মহাভারতে এবং ভাগবত ধর্ম্মেতেও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও জগতের উৎপত্তি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং" (শ্বেতা, ৪. ১০) অর্থাৎ মায়াই (সাংখ্যের) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি ; তিনিই আপন মায়া দ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন।

পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠস্বরূপ ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত.—ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্তস্বরূপ সগুণ বা নির্গুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক। কারণ, যখন সগুণ অব্যক্তের আমার সম্মুখে এই এক উদাহরণ আছে যে, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী, তখন কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপও ঐ প্রকার সগুণ বলিয়া মানিতে হয়। আপন মায়ার দ্বারাই হোকনা কেন ; কিন্তু যখন ঐ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেন (গী. ৯. ৮) এবং সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার করাইয়া থাকেন (১৮, ৬১), যখন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (৯. ২৪), যখন প্রাণীদিগের সুখ-দুঃখাদি সমস্ত 'ভাব' তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০.৫), এবং যখন প্রাণিগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদনকারীও তিনিই এবং "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (৭. ২২)—প্রাণীদিগের বাসনার ফলদাতাও তিনিই ; তখন তো এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা যুক্ত সুতরাং 'সগুণ'। কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও বলিতেছেন যে "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি"—কর্ম্ম অর্থাৎ গুণও আমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না (৪. ১৪) ; প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খলোক আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭ ; ১৪. ১৯) ; কিংবা এই অব্যয় ও অকর্ত্তা পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপে থাকা প্রযুক্ত (১৩. ৩১), প্রাণিমাত্রের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম এই দুই হইতেই বস্তুত তিনি অলিপ্ত হইলেও অজ্ঞানে অভিভূত লোক মোহে পতিত হয় (৫. ১৪, ১৫)। এই প্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের স্বরূপ—সগুণ ও নির্গুণ—এই দুই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে এরূপ নহে ; কিন্তু কোন কোন স্থলে এই দুই রূপকে একত্র মিশাইয়া পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—"ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো" (৯. ৫)—আমি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি নাই ; "পরব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন" (১৩. ১২) ; "সর্ব্বেন্দ্রিয় আছে বলিয়া প্রতিভাত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত ; এবং নির্গুণ হইয়াও গুণের উপভোক্তা" (১৩. ১৪) ; "দূরে এবং নিকটেও আছেন" (১৩. ১৫) ; "অবিভক্ত অথচ বিভক্তরূপে দৃষ্ট" (১৩. ১৬)—এইপ্রকার পরমেশ্বর-স্বরূপের পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণমিশ্রিত বর্ণনাও করা হইয়াছে। তথাপি প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য" (২. ২৫) ; আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ ও অব্যয় হওয়া প্রযুক্ত শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না" (১৩. ৩১)। এইরূপ পরমাত্মার শুদ্ধ, নির্গুণ, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, অচিন্ত্য, অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবদ্‌গীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ কখন সগুণ, কখন সগুণ-নির্গুণ এইরূপ উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ নির্গুণ, এই তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। উপাসনায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই চোখের সম্মুখে থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর স্বরূপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর না হইলে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনা অর্থে চিন্তন, মনন বা ধ্যান। চিন্তিত বস্তুর কোন রূপ না থাকিলেও অন্য কোনও গুণ মনের উপলব্ধি না হইলে মন কিসের চিন্তা করিবে? তাই উপনিষদে যে যে স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসনা (চিন্তন, মনন, ধ্যান) কথিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমাত্মা সম্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপাসকের অধিকার অনুসারে ন্যূনাধিক ব্যাপক বা সাত্ত্বিক হইয়া থাকে; এবং যাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩. ১৪. ১) উক্ত হইয়াছে, "পুরুষ ক্রতুময়, যাহার যেরূপ ক্রতু (নিশ্চয়), মরিবার পর সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়", এবং ভগবদ্‌গীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, "দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহিত গিয়া মিলিত হয়েন" (গীতা ৯. ২৫), অথবা "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় (১৭. ৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকের অধিকারভেদে উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রকরণকে 'বিদ্যা' বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপ্তির (উপাসনারূপ) মার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও শেষে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাং. ৩. ১৪), পুরুষবিদ্যা (ছাং, ৩. ১৬, ১৭), পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌষী. ১) প্রাণোপাসনা (কৌষী. ২) ইত্যাদি অনেক প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। এই প্রকরণে অব্যক্ত পরমাত্মার সগুণ বর্ণন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস (৩. ১৪. ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তো অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা আনন্দ—এই সকল রূপেও পরমাত্মার ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে (তৈ, ২, ১-৫; ৩, ২-৬)। বৃহদারণ্যকে (২. ১) অজাতশত্রুকে গার্গ্য বালাকী সর্ব্বপ্রথম আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল বা দিক্‌সমূহে অধিষ্ঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে; কিন্তু পরে প্রকৃত ব্রহ্ম এই সকলেরও অতীত, ইহা অজাতশত্রু তাহাকে বলিয়া শেষে প্রাণোপাসনাকেই মুখ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পরা কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্ত সমস্ত ব্রহ্মরূপকে 'প্রতীক' অর্থাৎ এই সকলকে উপাসনার জন্য কল্পিত গৌণ ব্রহ্মস্বরূপ কিংবা ব্রহ্মনিদর্শক চিহ্ন বলা যায়; এবং এই গৌণ রূপকেই কোন মূর্ত্তির রূপে চোখের সামনে রাখিলে তাহাকেই 'প্রতিমা' বলা হয়। কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন (কেন, ১. ২-৮)। এই ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় কোন স্থানে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি ২. ১) কিংবা

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ, ৩. ৯. ২৮) বলা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ,—এই প্রকারে তিনগুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এবং অন্যস্থানে ভগবদ্‌গীতারই ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া ব্রহ্মের বর্ণন এইপ্রকার করা হইয়াছে যে, "ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন" (ঋ. ১০. ১৯০) অথবা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ (কঠ. ২. ২০.), "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে" অর্থাৎ তিনি চলেন এবং চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও আছেন—(ঈশ. ৫; মুং, ৩. ১. ৭), অথবা 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস' অথচ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত' (শ্বেতা. ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, কৃত ও অকৃতের, কিংবা ভূত ও ভব্যেরও অতীত যিনি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান (কঠ. ২. ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে ব্রহ্মা রুদ্রকে (মভা. শাং ৩৫১. ১১), এবং মোক্ষধর্ম্মে নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন (৩৩১. ৪৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২. ৩. ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিনটীকে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্ত্তরূপ বলিয়া দেখানো হইয়াছে যে এই অমূর্ত্তের সারভূত পুরুষের রূপ বা রং বদল হয়; এবং শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহা নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে,—এই সমস্ত নামরূপাত্মক মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত পদার্থের অতীত (পর) যে 'অগ্রাহ্য' বা 'অবর্ণনীয়' আছেন তাঁহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে (বৃহ, ২. ৩. ৬ এবং বেসূ, ৩,।২, ২২)। অধিক কি, যে যে পদার্থের কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে সেই সমস্তেরও অতীত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মের অব্যক্ত ও নির্গুণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য 'নেতি নেতি' এই এক ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ, আদেশ বা সূত্রই হইয়া গিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেই উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ, ৩. ৯. ২৬; ৪. ২. ৪; ৪. ৪. ২২; ৪. ৫. ১৫)। সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরব্রহ্মের নির্গুণ ও অচিন্ত্যরূপের বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তি. ২. ৯); "অদ্রেশ্যং (অদৃশ্য), অগ্রাহ্য" (মুং. ১. ১. ৬) "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মু. ৩. ১. ৮)—চোখে দেখা যায় না কিংবা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; অথবা—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পঞ্চ মহাভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণবিরহিত, অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় (কঠ. ৩. ১৫; বেসূ. ৩. ২. ২২-৩০ দেখ)। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মের বর্ণনাতেও ভগবান নারদকে আপন বাস্তব স্বরূপ "অদৃশ্য, অঘ্রেয়, অস্পৃশ্য, নির্গুণ, নিষ্কল (নিরবয়ব), অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিষ্ক্রিয়" এইরূপ বলিয়া তিনিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়কর্ত্তা ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইঁহাকেই 'বাসুদেব পরমাত্মা' বলা হয়, এইরূপ বলিয়াছেন (মভা. শাং. ৩৩৯. ২১-২৮)।

উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুদ্ধ ভগবদ্গীতায় নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে এবং উপনিষদেও পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, সগুণনির্গুণ ও শেষে কেবল নির্গুণ এই তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে করা যাইবে? এই তিনের মধ্যে সগুণ-নির্গুণ অর্থাৎ উভয়াত্মক যে রূপ তাহা সগুণ হইতে নির্গুণে (কিংবা অজ্ঞেয়ে) যাইবার সোপান বা সাধন এইরূপ বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রথমে সগুণ রূপের জ্ঞান হইলে পরই আস্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে নির্গুণ স্বরূপের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনুসারেই ব্রহ্মপ্রতীকের ক্রমোচ্চ উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে বরুণ ভৃগুকে প্রথমে এই উপদেশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম; তদনন্তর ক্রমে ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান তাঁহাকে দিলেন (তৈত্তি. ৩. ২-৬)। কিংবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশেষণের দ্বারা কেহ নির্গুণের বর্ণনা কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, 'দূর' বা 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কোন বস্তু 'নিকটে' বা 'অসৎ' এইরূপ পরোক্ষভাবে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু একই ব্রহ্ম যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন তবে পরমেশ্বরকে 'দূর' বা 'সৎ' বিশেষণ দিয়া "নিকট' বা 'অসৎ' কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে 'দূর নহেন, নিকট নহেন; সৎ নহেন, অসৎ নহেন'— এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে, দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়া দিয়া, বাকী যাহা কিছু নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ বোধ হইবার জন্য, ব্যবহারক্ষেত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই (গী. ১৩. ১২)। যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, নিকটেও তিনিই, সৎও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে, সেই ব্রহ্মের পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে বর্ণনা করা চলে (গী. ১১. ৩৭, ১৩. ১৫)। কিন্তু সগুণ-নির্গুণ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপপত্তি এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে-কথার ব্যাখ্যা অবশিষ্টই রহিয়া যায়। মানিলাম, যখন পরমেশ্বর ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ধারণ করেন তখন উহা তাঁহার মায়া; কিন্তু ব্যক্ত কিম্বা ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই-যখন তিনি নির্গুণের স্থানে সগুণ হইয়া যায় তখন তাহাকে কি বলিবে? উদাহরণ যথা—একই নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্গুণ বলেন, আবার কেহ তাঁহাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বকর্ম্মা ও দয়ালু বলেন। ইহার রহস্য কি? উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্‌টি? এই নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক। সমস্ত সংকল্পের দাতা অব্যক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ; উপনিষদে ও গীতায় নির্গুণস্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর উক্তি— এইরূপ বলিলে অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূল ভিত্তিতেই আঘাত করা হয়। যে বড় বড়

মহাত্মাগণ ও ঋষিরা মনকে একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম ও শান্ত বিচারের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈ ২. ৯) মনেরও যিনি দুর্গম, বাক্যও যাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, তিনিই চরম ব্রহ্মস্বরূপ— তাঁহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয়োক্তি, কি প্রকারে বলা যায়? আমরা সাধারণ মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনন্ত ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা হয় না বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হইবে বলা আর সূর্য্যাপেক্ষা আমাদের দীপ শ্রেষ্ঠ বলা একই! হাঁ, যদি এই নির্গুণ রূপের উপপত্তি উপনিষদে অথবা গীতায় না দেওয়া হইত তবে পৃথক কথা হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দেখ না, ভগবদ্গীতায় তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্তই; এবং তিনি জগতের রূপ যে ধারণ করেন সে তো তাঁর মায়া (গী. ৪. ৬); কিন্তু ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা "মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খ লোক (অব্যক্ত ও নির্গুণ) আত্মাকেই কর্ত্তা মনে করে" (গী. ৩. ২৭-২৯), কিন্তু ঈশ্বর তো কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বারা লোক ভ্রান্ত হয় (গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, অব্যক্ত আত্মা ও পরমেশ্বর বস্তুত নির্গুণ হইলেও (গী. ১৩. ৩১) মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া তাঁহাকে সগুণ অব্যক্ত করিয়া তোলে (গী. ৭. ২৪)। ইহা হইতে পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়—(১) গীতার পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও পরমেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নির্গুণ ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাঁহাকে সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত জগৎ এই পরমেশ্বরের মায়া; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ বা জীবাত্মা যথার্থতঃ পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নির্গুণ ও অকর্ত্তা, কিন্তু অজ্ঞানবশত লোকে তাহাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ; কিন্তু উত্তরবেদান্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায়া ও অবিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, আত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; এই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াতে প্রতিবিম্ব হন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী (সাংখ্যদিগের মূল) প্রকৃতি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই আবার 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' এইরূপ দুই ভেদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মায়ার ত্রিগুণের মধ্যে 'শুদ্ধ' সত্ত্বগুণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়া বলা হয়, এবং এই মায়াতেই প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে সগুণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ) বলা হয়; এবং এই সত্ত্বগুণ 'অশুদ্ধ' হইলে 'অবিদ্যা' হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে 'জীব' এই নাম দেওয়া হয় (পঞ্চ. ১. ১৫-১৭)। এইভাবে দেখিলে একই মায়ার স্বরূপতঃ দুই ভেদ করিতে হয়—অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিলে, পরব্রহ্ম হইতে 'ব্যক্ত ঈশ্বর' উৎপন্ন হইবার কারণ মায়া এবং 'জীব' উৎপন্ন হইবার কারণ অবিদ্যা মানিতে হয়। কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ করা হয় নাই। গীতা বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ ধারণ করেন (৭. ২৫), কিংবা যে মায়ার দ্বারা অষ্টধা প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের সমস্ত বিভূতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, (৪. ৬), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বারা জীব মোহ প্রাপ্ত হয় (৭. ৪-১৫)। 'অবিদ্যা' এই শব্দ গীতার

কোথাও আসে নাই ; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যেখানে ঐ শব্দ আসিয়াছে সেখানে তাহার অর্থও এইপ্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, (শ্বেতা. ৫. ১)। তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল নিরূপণের সুবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ায় সূক্ষ্ম ভেদ স্বীকার না করিয়া আমি 'মায়া', 'অবিদ্যা' ও 'অজ্ঞান' এই শব্দগুলিকেই সমানার্থকই মানি ; এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, ত্রিগুণাত্মক মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্ত্বিক স্বরূপ কি, এবং উহার সাহায্যে গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে লাগানো যায়।

নির্গুণ ও সগুণ এই শব্দ দুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে সত্যই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। যথা, জগতের মূল যখন ঐ অনাদি পরব্রহ্মই, যিনি এক, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, তখন তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের গোচর অনেক প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল এবং এই প্রকার তাঁহার অখণ্ডতা কি প্রকারে ভগ্ন হইল ; কিংবা যিনি মূলেতে একই তাঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ পদার্থ কিরূপে দৃষ্ট হইতেছে ; যে পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার এবং যাঁহাতে, মধুর, অম্ল, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তাঁহাতেই বিভিন্ন রুচি, ন্যূনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা শীতল ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, মৃত্যু ও অমরতা ইত্যাদি অনেক প্রকারের দ্বন্দ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল ; যে পরব্রহ্ম শান্ত নির্ব্বাত, তাঁহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল ; যে পরব্রহ্মে অন্তর-বাহির কিংবা দূর-নিকট ভেদ নাই, তাঁহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার ও-পার কিংবা দূর-নিকট অথবা পূর্ব্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিক্‌কৃত স্থলকৃত ভেদ কিরূপে আসিল ; যে পরব্রহ্ম অবিকারী, ত্রিকালে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত, তাঁহাতে ন্যূনাধিক কালপরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল, কিংবা যাঁহাতে কার্য্যকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রহ্মের কার্য্যকারণস্বরূপ,— যথা মৃত্তিকা ও ঘট—কেন দেখা যায় ; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের সমাবেশ উক্ত ছোট শব্দ দুটির মধ্যে হইয়াছে। কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্দ্বন্দ্বে অনেক প্রকার দ্বন্দ্ব, অদ্বৈতে দ্বৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারেরা এই বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নির্গুণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিও নিত্য ও স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দ্বৈতের দ্বারা তাহার সমাধান হয় না শুধু নহে প্রত্যুত যুক্তিবাদেও এই দ্বৈত টেঁকে না। তাই, প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠপদবীর 'নির্গুণ' ব্রহ্মই জগতের মূল। কিন্তু এক্ষণে নির্গুণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যাহা নাই তাহা হইতেই পারে না ; এবং তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্গুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সে ব্রহ্ম হইতে, সগুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে

না। তবে আবার সগুণ আসিল কোথা হইতে? সগুণ কিছু নাই যদি বল, তাহা তো চোখের সামনে দেখা যাইতেছে। এবং নির্গুণের ন্যায় সগুণও সত্য যদি বল, তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ইন্দ্রিয়ের গোচর শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি সমস্ত গুণের স্বরূপ আজ এক প্রকার কল্য অন্য প্রকার—অর্থাৎ উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তো (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া) ইহাই বলিতে হয় যে এইরূপ সগুণ পরমেশ্বরও পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। কিন্তু বিভাজ্য ও নশ্বর হইয়া যিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধতির মধ্যে নিত্য পরতন্ত্র হইয়া কাজ করেন তাঁহাকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে? সারকথা, চাই ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা আধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, সমস্ত পদার্থ একই সগুণ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ;—যে কোন পক্ষই স্বীকার কর না কেন ইহা নির্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে নশ্বর গুণ যে পর্য্যন্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত না হয় সে পর্য্যন্ত পঞ্চমহাভূতকে বা প্রকৃতিরূপ এই সগুণ মূল পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না। তাই যিনি প্রকৃতিবাদ স্বীকার করেন তাঁহার পরমেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত বলা ছাড়িয়া দিতে হয় ; অথবা পঞ্চ মহাভূতের অথবা সগুণ মূল প্রকৃতিরও অতীত কোন্ তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই। মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণা নিবারণ কিংবা বালুকা হইতে তৈল বাহির হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্তু হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও ব্যর্থ ; এবং এইজন্য, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যতই কেন সম্পত্তিলাভ হউক না, তাহা দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ. ২. ৪. ২)। ভাল, এখন যদি অমৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে মানুষের এই স্বাভাবিক ইচ্ছা দেখা যায় যে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম বা পুরস্কার কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থাৎ চিরকাল উপভোগ করিতে চায় ; অথবা ইহাও দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্ত্তির অবসর উপস্থিত হইলে আমরা জীবনের পরোয়া রাখি না। ঋগ্বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূর্ব্বতন ঋষিদের এই প্রার্থনা যে, "হে ইন্দ্র! তুমি 'অক্ষিতশ্রব' অর্থাৎ অক্ষর কীর্ত্তি বা ধন দাও" (ঋ. ১. ৯. ৭), অথবা "হে সোম! তুমি আমাকে বৈবস্বত (যম) লোকে অমর কর" (ঋ. ৯. ১১৩. ৮)। পূর্ব্ব ঋষিদিগের প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেও অর্ব্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি নিছক আধিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, "কোন ক্ষণিক সুখে না ভুলিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরন্তন সুখের জন্য চেষ্টা করাই এই জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্ত্তব্য"। আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে নিরন্তর কল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পনা আসিল কোথা হইতে? যদি বল তাহা স্বভাবসিদ্ধ, তাহা হইলে এই বিনশ্বর দেহের বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্তু আছে এইরূপ বলিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্তু কিছু নাই যদি বল, তবে আমাদের যে মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও দেওয়া যাইতে পারে না। এই কঠিন সমস্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌতিক পণ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংসা

হইবার নহে, তাই ইহার বিচার না করিয়া, দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মের বাহিরে আমাদের মনকে ধাবিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মনুষ্যের মনে তত্ত্বজ্ঞানের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কে আটক করিবে, আর কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই দুর্দ্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহাকে একবার নিহত করিলে. পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা হইতে হইবে? যে দিন মনুষ্য এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়া আসিয়াছে যে, "সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ত্ব কি, এবং তাহা আমি কিরূপে প্রাপ্ত হইব"। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, মনুষ্যের অমৃততত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হইবার নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, সমস্ত আধিভৌতিক জগদ্‌বিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত দৌড়িতে থাকিবে! দু চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও ঐ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক কি, মানববুদ্ধির এই আকাঙ্ক্ষা যে দিন চলিয়া যাইবে সেই দিন তাহাকে "স বৈ মুক্তোঽথবা পশুঃ" এইরূপ বলিতে হইবে!

যাক্। দিক্‌কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্র, সম, এক, নিরন্তর, সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ তত্ত্বের অস্তিত্বসম্বন্ধে অথবা সেই নির্গুণ তত্ত্ব হইতে সগুণ জগতের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপাদিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক উপপাদন অন্য কোন দেশের তত্ত্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির করেন নাই। অর্ব্বাচীন জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট মনুষ্যের বাহ্যজগতে নানাত্বজ্ঞান একত্বের দ্বারা কেন ও কি প্রকারে হয়; এবং তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এই উপপত্তিকেই অর্ব্বাচীনশাস্ত্র পদ্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন; এবং হেগেল নিজের বিচারে ক্যাণ্ট হইতে কিছু আগাইয়া গেলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বেদান্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। শোপেন্‌হোরের কথাও তাই। তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তিনি একথাও লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, 'জগতের সাহিত্যের এই অত্যুত্তম গ্রন্থ' হইতে কোন কোন বিচার তিনি আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক প্রমাণে কিংবা বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তে কতটা সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য; অথবা উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত এবং তদুত্তরকালীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত—ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। তাই, গীতার অধ্যাত্মসিদ্ধান্তের সত্যতা, উপপত্তি ও মহত্ত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিয়া, মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও তাহার শাঙ্করভাষ্য-অবলম্বনে, আমি কেবল ঐ সকল বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষরূপী সাংখ্যোক্ত দ্বৈতের অতীত কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জগৎদ্রষ্টা ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই দাঁড়াইয়া না থাকিয়া জগৎদ্রষ্টা পুরুষের বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার স্বরূপ কি, তাহা কি করিয়া ও কাহার হয়, এই বিষয়েরও সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। বাহ্য জগতের পদার্থ মনুষ্যের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের

ইহাই বিশেষত্ব যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাকা প্রযুক্ত, বাহ্যজগতের পদার্থমাত্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে। এ বিশেষ শক্তি যে একীকরণের ফল, সেই শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা আত্মার শক্তি, ইহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি। কেবল একটিমাত্র পদার্থের নহে, প্রত্যুত জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কার্য্যকারণভাবাদি যে অনেক সম্বন্ধ যাহাকে জাগতিক নিয়ম বলে—তাহারও জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কিন্তু দ্রষ্টা স্বীয় মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা—কোন এক পদার্থ আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার রূপ ও গতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, তাহা একজন যুদ্ধের সেপাই এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়া যায়। ইহার পরেই আর কোন পদার্থ ঐ প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিলে আবার সেই মানসিক ক্রিয়া সুরু হয় এবং উহাও আর এক সিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে একের পর এক করিয়া যে অনেক সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয়, আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি স্মরণ করিয়া একত্র করি; এবং যখন ঐ পদার্থসমূহ আমাদের সম্মুখে আসে, তখন ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমারা বলি যে আমাদের সম্মুখ দিয়া 'সৈন্য' চলিতেছে। এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত পদার্থের রূপ দেখিয়া তাহাকে 'রাজা' বলিয়া নির্দ্ধারিত করি। এবং সৈন্য-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব-সংস্কার ও 'রাজা' সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার—এই দুই সংস্কারকে একত্র করিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, 'রাজার সোয়ারী' চলিয়াছে! এইজন্য বলিতে হয় যে, জগৎ-জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের যে 'একীকরণ' দর্শক' আত্মা করে, তাহারই ফল এই জ্ঞান। এই জন্য ভগবদগীতাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, "অবিভক্তং বিভক্তেষু" অর্থাৎ যাহা বিভক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিভক্ততা বা একত্ব যাহা দ্বারা বুঝা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান * (গী. ১৮. ২০)। কিন্তু ইন্দ্রিয়-যোগে মনের উপর যে সংস্কার প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহা কিরূপ, এই বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিলে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থ-মাত্রের রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ্য গুণ যে দ্রব্যের মধ্যে আছে সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহা আমরা দেখি সত্য, কিন্তু যাহাকে আমরা 'ভিজা মাটি' বলি, সেই পদার্থের মূল তাত্ত্বিক স্বরূপ কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দ্রতা, ময়লা রং বা গোলার ন্যায় আকার (রূপ) ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিয়যোগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত হইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়া 'দ্রষ্টা' আত্মা, বলিয়া থাকে যে ইহা 'ভিজা মাটি'; এবং পরে এই দ্রব্যের

* Cf. "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold" Kant's Critique of Pure Reason, P. 64 Max Muller's translation 2nd Ed.

(কারণ, দ্রব্যের তাত্ত্বিক স্বরূপ বদলিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।) ভিতরফাঁপা ও গোলাকার রূপ, থন্‌থনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গুণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন অবগত হইলে পর, তাহাদের একীকরণ করিয়া 'দর্শক' আত্মা তাহাকে 'ঘট' বলিয়া থাকে। সারকথা, সমস্ত পরিবর্ত্তন বা ভেদ, রূপ বা আকারেই হইতে থাকে; এবং মনের উপর উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, 'দ্রষ্টা' সেই সকল সংস্কারের একীকরণ করিবার পর, একই তাত্ত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ—সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা সুবর্ণ ও অলঙ্কার। কারণ, এই দুই উদাহরণে রং, ঘনত্ব, তরলতা, ওজন প্রভৃতি গুণ একই থাকে, কেবল রূপ (আকার) ও নাম এই দুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদান্তে এই সহজ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সোনা একই, কিন্তু তাহার আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইন্দ্রিয়যোগে গৃহীত তাহারই সংস্কার-সবল মনের দ্বারা একত্র করিয়া 'দ্রষ্টা', তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একই মূল পদার্থের একবার 'ঠুসী', একবার 'পোঁটী', একবার 'সল্লে' একবার 'তর্ম্মাণ' এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকে। আমরা সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম দিয়া থাকি, সেই নামকে এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে থাকে সেই আকৃতিসমূহকে উপনিষদে 'নামরূপ' (নাম ও রূপ) বলা হয়; এবং অন্য সমস্ত গুণেরও উহারই মধ্যে সমাবেশ করা যায় (ছা. ৩ ও ৪; বৃ. ১. ৪. ৭)। কারণ, যে কোন গুণ ধর না কেন, তাহার কোন না কোন নাম বা রূপ থাকিবেই। কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, মূলে তাহাদের আধারভূত এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্ত্তনীয় কোন দ্রব্য আছে বলিতে হয়। জলের উপর যেমন ফেনপুঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ একই মূল দ্রব্যের উপর অনেক নামরূপের আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন ঐ যে মূল দ্রব্য, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সমস্ত জগতের আধারভূত এই তত্ত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় হইলেও তাহা সৎ, অর্থাৎ সত্য সত্যই সর্ব্বকালে সকল নামরূপের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও বাস করিতেছে, তাহার কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত অনুমান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, এইরূপ মানিলে 'হার' ও 'বলয়' প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে না। এই অবস্থাতে ইহা 'হার' ইহা 'বলয়', ইহাই বলা যাইতে পারে; কিন্তু 'হার সোনার', এবং 'বলয় সোনার' ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। তাই ন্যায়ত ইহা সিদ্ধ হয় যে, 'সোনার হার', 'সোনার বালা' ইত্যাদি বাক্যে 'সোনার' এই শব্দের দ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরূপাত্মক হার ও বালার সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা সমস্ত অলঙ্কারের আধারভূত দ্রব্যাংশেরই বোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সমস্ত পদার্থে প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, মুক্তা, রূপা, লোহা, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্মক যে সকল পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত একই কোন নিত্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন নামরূপের গিল্টি চড়াইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ

সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপেরই, মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার নামরূপের নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে। 'সমস্ত পদার্থে এইরূপ নিত্যরূপে সর্ব্বদাই থাকা'—ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'সত্তাসামান্যত্ব' বলে।

আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের উক্ত সিদ্ধান্তই কান্ট প্রভৃতি অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন। নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ হইতে ভিন্ন, এই যে কোন অদৃশ্য দ্রব্য আছে তাহাকেই তাঁহারা আপন গ্রন্থে 'বস্তুতত্ত্ব' বলিয়া এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে 'বহির্দৃশ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে, নিত্য পরিবর্তনশীল নামরূপাত্মক বহির্দৃশ্যকে 'মিথ্যা' বা 'নশ্বর' এবং মূল দ্রব্যকে 'সত্য' বা 'অমৃত' বলিবার রীতি আছে। সাধারণ লোক 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; এবং লোকব্যবহারেও দেখা যায় যে, লাখ টাকা পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাকা পাইবার কথা কানে শোনা, এবং লাখ টাকা হাতে পাওয়া,—ইহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। এইজন্য কানাঘুষা কোন কথা যে শুনে এবং চক্ষে যে দেখে এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহার মীমাংসার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে, 'চক্ষুর্বৈ সত্যং' এই বাক্য আসিয়াছে (বৃ. ৫. ১৪. ৪)। কিন্তু টাকা পদার্থটি—'টাকা' দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ বর্ত্তুল আকৃতিতে সত্য কিনা—যে শাস্ত্র ইহার নির্ণয় করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের এই আপেক্ষিক ব্যাখ্যা কি উপযোগী? ব্যবহারে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির কথায় যদি মিল না থাকে, যদি সে এখন এক কথা পরক্ষণে আর এক কথা বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। আবার ঐ ন্যায়ই প্রয়োগ করিয়া 'টাকার' নামরূপকে (আভ্যন্তরিক দ্রব্যকে নহে) মিথ্যুক কিংবা মিথ্যা বলিতে বাধা কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুর্গ্রাহ্য নামরূপ আজ টাকা হইতে বাহির করিয়া লইয়া কাল তাহার স্থানে 'চেন' কিংবা 'পেয়ালা' এই নামরূপ দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের মিল থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এখন চোখে যাহা দেখা যায় তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একীকরণের যে মানসিক ক্রিয়াতে জগৎজ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়াও চোখে দেখা যায় না। অতএব তাহাকেও মিথ্যা বলিতে হয়; সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিতে হয়। এই বাধা এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহা চোখে দেখা যায় এইরূপ সত্যকে, সত্যের এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া, যাহা অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় লোপ পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায় না তাহাই সত্য, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং মহাভারতেও সত্যের এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

* কান্টের Critique of Pure Reason গ্রন্থে এই বিচার করা হইয়াছে। নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি 'ডিং আন্ সিক্' (Ding an sich—Thing in itself) এইরূপ নাম দিয়াছেন এবং ইহারই ভাষান্তর আমরা বস্তুতত্ত্ব করিয়াছি। নামরূপের অবভাস কান্টের এরশায়নুঙ্ (Ercheinung—appearance)। কান্টের মতে 'বস্তুতত্ত্ব' অজ্ঞেয়।

সত্যং নামাঽব্যয়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ ।*

অর্থাৎ—"যাহা অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্তন কখনই হয় না, তাহাই সত্য"—(মভা. শাং. ১৬২. ১০)। এখন এক কথা বলা, আর এক সময় আর এক কথা বলা—এই ব্যবহারকে যে মিথ্যা ব্যবহার বলা হয়, ইহাই তাহার বীজ। সত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, চোখে দেখিলেও ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মিথ্যা; এবং চোখে না দেখা গেলেও নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অমৃত বস্তুতত্ত্বই সত্য। ভগবদ্গীতাতে "যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" (গী. ৮. ২০; ১৩. ২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামরূপাত্মক শরীর লোপ পাইলেও যাহা লোপ পায় না তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম—ব্রহ্মের এইরূপ যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্মের নিরূপণে, "যঃ স সর্ব্বেষু" ইহার বদলে 'ভূতগ্রামশরীরেষু' এইরূপ পাঠভেদে এই শ্লোকই পুনর্ব্বার আসিয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৯. ২৩)। সেইরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যও ইহাই। বেদান্তে 'অলঙ্কার' মিথ্যা এবং 'সুবর্ণ' সত্য এইরূপ যে বলা হয়, তাহার অর্থে অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অথবা মাটীতে গিল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এরূপ অভিপ্রেত নহে। এখানে 'মিথ্যা' শব্দ এইস্থানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ উপরকার বাহ্য দৃশ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরিক তাত্ত্বিক দ্রব্যের লক্ষণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাত্ত্বিক দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে। পদার্থমাত্রেরই নামরূপাত্মক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তত্ত্ব আছে বেদান্তী তাহাই দেখেন; তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহনা গড়াইবার জন্য আমরা অনেক মজুরী দিলেও আপৎকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করিবার সময়, পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে "গহনা গড়াইতে তোলা-পিছু কত খরচা হইয়াছে আমি তা দেখিব না; তুমি এই গহনা যদি সোনার দরে দাও ত কিনিব!" বেদান্তের পরিভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে "পোদ্দারের চোখে গহনা মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই সত্য" এইরূপ বলিতে হয়। নূতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় তাহার সুন্দর আকার (রূপ), অথবা সুবিধাজনক রচনা (আকৃতি) করিতে কত খরচা হইয়াছে সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমসলা ও কাঠের দামে আমাকে বিক্রয় কর, খরিদ্দার এইরূপ বলিয়া থাকে। নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য বেদান্তের এই উক্তির অর্থ উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। 'দৃশ্য জগৎ মিথ্যা' ইহার অর্থে জগৎ চক্ষে দেখা যায় না এরূপ ধরিবে না; একই দ্রব্যের নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক স্থলকৃত কিংবা কালকৃত দৃশ্য নশ্বর অতএব মিথ্যা, এবং এই সমস্ত নামরূপাত্মক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত অবস্থিত

* গ্রীন real এর (সৎ বা সত্য) ব্যাখ্যা করিবার সময় "whatever anything is really, it is unalterably" এইরূপ বলিয়াছেন (Prolegomena to Ethics § 25)। গ্রীনের এই ব্যাখ্যা এবং মহাভারতের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা এই দুই তত্ত্বতঃ একই।

অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনীয় দ্রব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহনা মিথ্যা এবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে স্বর্ণকার, তাঁহার কারখানায় মূল একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দিয়া সোনা, পাথর, কাঠ, জল, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত গহনা গড়া হয় বলিয়া বেদান্তী পোদ্দার অপেক্ষা আরও কিছু বেশী তলাইয়া সোনা, রূপা কিংবা পাথর প্রভৃতি নামরূপকে গহনারই ন্যায় মিথ্যা জানিয়া এই সমস্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্তুতত্ত্বে নামরূপ আদি কোন গুণই না থাকা প্রযুক্ত উহা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর কখনই হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আঘ্রাণ না করিলেও, হাতে স্পর্শ না করিলেও অব্যক্তরূপে তাহা থাকেই, কেবল এইটুকু বুদ্ধির দ্বারা যে অনুমান করা যায় তাহা নহে, কিন্তু জগতে যাহার কখন পরিবর্ত্তন হয় না এমন একটা কিছু যাহা আছে তাহাই সত্য বস্তুতত্ত্ব, এরূপও নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাকেই জগতের মূল সত্য বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, ইহাদের বেদান্তশাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্য না করিয়া কিংবা আমরা এই শব্দের যে অর্থ মনে করি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কি না ইহা দেখিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া "আমাদের চোখে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতও বেদান্তী মিথ্যা বলে, এর উপায় কি?" এই কথা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতম্মন্য লোকও অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাস্কের উক্তি অনুসারে বলিতে পারি যে, অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না তাহা কিছু স্তম্ভের দোষ নহে! নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অতএব নশ্বর নামরূপ সত্য নহে; যে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী তত্ত্ব দেখিতে চায় তাহার দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াইয়া নামরূপের বাহিরে যাওয়া চাই. ছান্দোগ্য (৬. ১; ও ৭. ১), বৃহদারণ্যক (১. ৬. ৩), মুণ্ডক (৩. ২. ৮), এবং প্রশ্ন (৬. ৫) প্রভৃতি উপনিষদে ইহা বারম্বার উক্ত হইয়াছে। এই নামরূপকে কঠ (২. ৫) মুণ্ডক (১. ২. ৯) প্রভৃতি উপনিষদে 'অবিদ্যা' এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'মায়া' নামে কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় 'মায়া' 'মোহ' 'অজ্ঞান' এই সকল শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বিবক্ষিত। জগতের আরম্ভে যাহা কিছু ছিল তাহা নামরূপবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্গুণ ও অব্যক্ত ছিল; পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত ও সগুণ হইয়া পড়িল (বৃ. ১. ৪. ৭; ছাং ৬. ১. ২. ৩)। তাই বিকারী কিংবা নশ্বর নামরূপকেই 'মায়া' সংজ্ঞা দিয়া এই সগুণ বা দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ার খেলা কিংবা লীলা এইরূপ বলা হয়। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহা সত্ত্বরজস্তমোগুণী অতএব নামরূপের দ্বারা যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে (৮ম প্রকরণে বর্ণিত) বিশ্বের যে উৎপত্তি বা বিস্তার হইতেছে, তাহাও সেই মায়ার সগুণ নামরূপাত্মক বিকার। যে কোন গুণই বল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর সুতরাং নামরূপাত্মক হইবেই হইবে। সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রও এইরূপ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে আসে। ইতিহাস, ভূজ্ঞান, বিদ্যুৎশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার আলোচনা করা হইয়া থাকে তাহাতে সমস্ত নামরূপেরই বিচার থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়া গিয়া সেই পদার্থের অন্য নামরূপ কি

করিয়া হয় তাহারই বিচার আলোচনা করা হয়। উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাষ্প নাম কখন ও কিরূপে আসে, কিংবা এক কুচকুচে কালো জাম হইতে তাম্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের রং (রূপ) কি করিয়া হয় ইত্যাদি নামরূপের ভেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে করা হইয়া থাকে। তাই, নামরূপের মধ্যেই মগ্ন এই শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা নামরূপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে ইহা সুস্পষ্ট। এবং এই অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কথার মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কথারম্ভে নারদ ঋষি সনৎকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া "আমাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দাও", এইরূপ বলিলেন ; তখন সনৎকুমার "তুমি কি শিখিয়াছ আগে বল তার পর আমি বলিব" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। নারদ বলিলেন "আমি ঋগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, কালশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার নিকট আসিয়াছি।" তাহাতে সনৎকুমার "তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ তাহা সমস্ত নামরূপাত্মক, প্রকৃত ব্রহ্ম এই নামব্রহ্মের অতীত" এইরূপ উত্তর দিয়া পরে ক্রমে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কল্প, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রাণ—ইহাদেরও অতীত এবং ইহাদের খুব উপরে অবস্থিত যে পরমাত্মরূপী অমৃত তত্ত্ব নারদকে তাহারই সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে, মানব-ইন্দ্রিয়ের নামরূপের অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই অনিত্য নামরূপের আবরণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত কোন কিছু নিত্য দ্রব্য অবশ্যই থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের দ্বারা হইয়া থাকে। যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়া থাকে, তাই আত্মা জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহা নামরূপাত্মক জগতেরই জ্ঞান ; তাই, নামরূপাত্মক বাহ্য জগৎই জ্ঞান (মভা. শাং. ৩০৬. ৪০) ; এবং এই নামরূপাত্মক জগতের মূলে যে-কিছু বস্তুতত্ত্ব আছে তাহাই জ্ঞেয়। এই বর্গীকরণ স্বীকার করিয়া ভগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা এবং জ্ঞেয়কে ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্ম (গী. ১৩. ১২-১৭) বলা হইয়াছে ; এবং পরে জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়া ভিন্নত্ব কিংবা নানাত্বের দ্বারা উৎপন্ন জগৎজ্ঞানকে রাজসিক এবং শেষে নানাত্বের যে জ্ঞান একতত্ত্বরূপ হইতে হয় তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ২০, ২১)। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক নহে ; আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হয়, এই জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গরু ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বাহ্য বস্তু আমরা দেখিতে পাই তাহা আমাদের জ্ঞানই, এবং এই জ্ঞান সত্য হইলেও কি করিয়া উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না ; অতএব এই জ্ঞান ব্যতীত বাহ্য

পদার্থ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কিংবা এই সকল বাহ্য বস্তুর মূলে অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, জ্ঞাতা না থাকিলে জগৎ থাকে কোথায় ? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের মধ্যে এই তৃতীয় বর্গ থাকে না ; জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞান এই দুই শুধু বাকী থাকে ; এবং এই যুক্তিবাদকে আর একটু দূরে লইয়া গেলে 'জ্ঞাতা' বা 'দ্রষ্টা'ও তো, একপ্রকারের জ্ঞানই, তাই শেষে জ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাকে 'বিজ্ঞানবাদ' বলে, এবং ইহাকেই যোগাচারপন্থী বৌদ্ধেরা প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছে। জ্ঞাতার জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছুই এই জগতে নাই ; অধিক কি, জগৎই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা মনুষ্যের জ্ঞানই, এইরূপ এই মার্গের বিদ্বানেরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও হিউমের ন্যায় পণ্ডিত এইপ্রকার মতের অগ্রণী। কিন্তু বেদান্তীদিগের নিকট এই মত মান্য নহে ; বাদরায়ণাচার্য্য বেদান্তসূত্রে (বেসূ. ২. ২, ২৮-৩২) এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রসমূহের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারই শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহা মিথ্যা নহে ; এবং ইহাকেই আমরা জ্ঞান বলি। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত যদি অন্য কিছু না থাকে, তবে 'গরু' সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভিন্ন, 'ঘোড়া' সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভিন্ন, এবং 'আমি বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন,—এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে তাহার কারণ কি ? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়া সর্ব্বত্র একই মানিলাম ; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল কোথা হইতে ? স্বপ্নজগতের ন্যায় মন আপনিই মর্জি অনুসারে জ্ঞানের এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে স্বপ্নজগৎ হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না। (বেসূ, শাং ভা, ২. ২. ২৯ ; ৩. ২.৪)। তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, এবং 'দ্রষ্টার' মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করে এইরূপ বলিলে প্রত্যেক দ্রষ্টার 'আমার মন' অর্থাৎ 'আমিই স্তম্ভ' কিংবা 'আমিই গরু' এইরূপ 'আমি-পূর্ব্বক' সমস্ত জ্ঞান হওয়া চাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, আমি পৃথক, স্তম্ভ, গরু প্রভৃতি পদার্থও আমা হইতে ভিন্ন, যখন এইরূপ প্রতীতি সকলের হইয়া থাকে, তখন দ্রষ্টার মনে সমস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্য এই আধারভূত বাহ্যজগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ্য বস্তু অবশ্যই থাকিবে—এইরূপ শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ, শাংভা ২. ২. ২৮)। কাণ্টের মতও এইরূপ ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যের বুদ্ধির একীকরণ আবশ্যক হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই আপন হইতে অর্থাৎ নিরাধার কিংবা সম্পূর্ণ নূতন উৎপন্ন করে না, তাহা সর্ব্বদাই জাগতিক বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করে, ইহা তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "কিহে ! শঙ্করাচার্য্য একবার বাহ্য জগৎ মিথ্যা বলেন এবং পুনরায় বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ্য জগতের অস্তিত্বই 'দ্রষ্টা'র অস্তিত্বেরই ন্যায় সত্য, এইরূপ প্রতিপাদন করেন ! কেমন করিয়া ইহার সমন্বয় করা যাইবে ?" এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য বাহ্য জগৎকে যখন মিথ্যা বা অসত্য বলেন, তখন বাহ্যজগতের দৃশ্য নামরূপ অসত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। নামরূপাত্মক বাহ্য দৃশ্য মিথ্যা

হইলেও উহার দ্বারা তাহার মূলে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত সত্য বস্তু আছে, এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা হয় না। সারকথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যেমন এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে ; সেইরূপ বলিতে হয় যে, নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের মূলেও কোন নিত্য আত্মতত্ত্ব আছে। তাই, দেহেন্দ্রিয় ও বাহ্য জগৎ এই দুয়ের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্যমান বস্তুর মূলে দুইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সত্য বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া আছে, এইরূপ বেদান্ত-শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরে দুই দিকের এই যে নিত্য তত্ত্ব, ইহা বিভিন্ন কি একরূপ এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু ইহার বিচার আবার করিব। অনেক সময় এই মতের অর্ব্বাচীনতাসম্বন্ধে যে আপত্তি করা হয় প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত না হইলেও, চক্ষুর গোচর বাহ্যজগতের নামরূপাত্মক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার মূলদেশে যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শঙ্করাচার্য্যের এই মত—যাহাকে মায়াবাদ বলে—প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদান্তশাস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পারা যায় না। কিন্তু উপনিষদ্ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এই আপত্তি যে ভিত্তিহীন, ইহা যে-কোন ব্যক্তির সহজে উপলব্ধি হইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, 'সত্য' শব্দ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য 'সত্য' শব্দের এই ব্যবহারিক অর্থ লইয়াই উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামরূপাত্মক বাহ্য পদার্থকে 'সত্য' এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে 'অমৃত' নাম দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৬. ৩) "তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং"—সেই অমৃত সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত—এইরূপ বলিয়া অমৃত ও সত্য এই দুই শব্দের "প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ"—প্রাণ অমৃত এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে প্রাণের অর্থ প্রাণস্বরূপ পরব্রহ্ম। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী উপনিষদে যাহাকে 'মিথ্যা' ও 'সত্য' বলা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহারই অনুক্রমে 'সত্য' ও 'অমৃত' এই নাম ছিল। কোন কোন স্থানে এই অমৃতকে 'সত্যস্য সত্যং'—চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ, ২. ৩. ৬) বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেই উক্ত আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে—কারণ, বৃহদারণ্যকেই শেষে আত্মরূপ পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত 'আর্ত্তম্' অর্থাৎ নশ্বর, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বৃ, ৩. ৭. ২৩)। জগতের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন চক্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই সত্য মানিয়া লইয়া তাহার অভ্যন্তরে অন্য কোন্ সূক্ষ্ম সত্য লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরূপ দেখা গেল যে, যে দৃশ্য জগতের রূপকে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা আসলে নশ্বর এবং তাহার অভ্যন্তরে কোন অবিনশ্বর বা অমৃত তত্ত্ব আছে। দুয়ের মধ্যে এই ভেদ যেমন যেমন অধিক ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই অনুসারে 'সত্য' ও 'অমৃত' এই দুই শব্দের স্থানে 'অবিদ্যা' ও 'বিদ্যা' এবং পরিশেষে 'মায়া ও সত্য' কিংবা 'মিথ্যা ও সত্য' এই পরিভাষা প্রচলিত হইতে লাগিল। কারণ 'সত্য' শব্দের ধাত্বর্থ 'নিত্যস্থায়ী' হওয়া প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল

ও নশ্বর নামরূপকে সত্য বলা উত্তরোত্তর অধিকতর অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এই প্রকারে 'মায়া' কিংবা 'মিথ্যা' শব্দ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তুর বাহ্য আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্য, এবং তাহার মূলস্থিত 'তাত্ত্বিক দ্রব্য'ই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" (১. ১৬৪. ৪৬ ও ১০. ১১৪. ৫)—যাহা মূলে এক ও নিত্য (সৎ) তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাতা) বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—অর্থাৎ এক সত্য বস্তুই নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীত হয় এইরূপ কথিত হইয়াছে। "এক রূপের অনেক রূপ করিয়া দেখান" এই অর্থে ঋগ্‌বেদেও 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বারা অনেক রূপ ধারণ করেন (ঋ. ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক স্থলে (তৈ. সং. ৩. ১. ১১) এই অর্থেই 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ; এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই 'মায়া' শব্দ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়া শব্দের নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কাল অবধিই প্রচলিত হইলেও ইহা তো নির্ব্বিবাদ যে, নামরূপকে অনিত্য কিংবা অসত্য কল্পনা করা উহার পূর্ব্ববর্তী, 'মায়া' শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই কল্পনা নূতন বাহির করেন নাই। শ্রীশঙ্করা-চার্য্যের ন্যায় যাঁহাদের নামরূপাত্মক জগৎ-স্বরূপকে 'মিথ্যা' নাম দিবার সাহস হয় না, অথবা গীতায় যেমন ভগবান ঐ অর্থে মায়া শব্দের উপযোগ করিয়াছেন, তাহা করিতেও যাঁহারা ভয় পান, তাঁহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'সত্য' ও 'অমৃত' শব্দের স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। যাই বলুন না কেন, নামরূপ 'নশ্বর' এবং নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্ত্ব 'অমৃত' বা 'অবিনশ্বর' এবং এই ভেদ প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধা আসে না।

যাক্। নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মায় উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার আধারভূত এবং আত্মার সহিত সমশ্রেণীর বাহ্যজগতের নানা পদার্থের মূলে বর্ত্তমান 'কোন না কোন কিছু' এক মূলীভূত নিত্য এবং পদার্থ থাকা চাই ; নচেৎ এই জ্ঞান হইতেই পারে না। কিন্তু এইটুকু স্থির করিলেই অধ্যাত্মশাস্ত্রের কাজ শেষ হয় না। বাহ্য জগতের মূলে অবস্থিত এই নিত্য বস্তুকেই বেদান্তী 'ব্রহ্ম' বলেন ; এবং সম্ভব হইলে এই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করাও আবশ্যক। সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থের মূলে অবস্থিত এই নিত্য তত্ত্ব অব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত তাহার স্বরূপ নামরূপাত্মক পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত ও স্থূল (জড়) হইতে পারে না, ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ব্যক্ত ও স্থূল পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও মন, স্মৃতি, বাসনা, প্রাণ ও জ্ঞান প্রভৃতি স্থূল নহে এমন অনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, পরব্রহ্মও তাহাদেরই মধ্যে কোন না কোন একটীর স্বরূপবিশিষ্ট। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণের ও পরব্রহ্মের স্বরূপ একই। জর্ম্মন পণ্ডিত শোপেনহর পরব্রহ্মকে বাসনাত্মক স্থির করিয়াছেন। বাসনা মনের ধর্ম্ম হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রহ্মকে মনোময় বলা যাইতে পারে (তৈ. ৩. ৪)। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঐ, ৩. ৩) কিংবা 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' (তৈ. ৩. ৫)—জড়জগতের নানাত্বের যে জ্ঞান একস্বরূপ হইতে আমার হয় তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই। কিন্তু উপনিষদে চিদ্‌রূপী জ্ঞানের ন্যায়ই সৎকে (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম্ম বা সত্তাসামান্যত্বকে) এবং আনন্দকেও ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছে ওঁকার। ইহার উপপত্তি এইরূপ ;—প্রথমে সমস্ত বেদ অনাদি ওঁকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছে ; এবং উহা বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শব্দ হইতেই পরে ব্রহ্মা যখন সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন (গী. ১৭. ২৩ ; মভা. শাং ২৩১. ৫৬-৫৮), ওঁকার ব্যতীত মূলারম্ভে অন্য কিছু ছিল না। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ওঁকারই প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ (মাণ্ডুক্য, ১ ; তৈত্তি, ১, ৮)। কিন্তু শুধু অধ্যাত্ম শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলে পরব্রহ্মের এই সমস্ত স্বরূপই ন্যূনাধিক নামরূপাত্মক হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত স্বরূপ মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এইপ্রকারে যাহা জানে তাহা নামরূপের গণ্ডীর মধ্যেই পড়িয়া যায়। তবে, এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাদি, অন্তর-বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ত্ব (গী. ১৩. ১২-১৭) আছে, তাহার স্বরূপের নির্ণয় কি করিয়া হইবে ? অনেক অধ্যাত্ম-শাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হউক না কেন, এই তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয় থাকিবেই ; ক্যাণ্ট তো এই প্রশ্নের বিচার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেইরূপ উপনিষদেও "নেতি নেতি"—অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে তাহা নহে ; ব্রহ্ম তাহারও অতীত, এবং চক্ষুর অদৃশ্য ; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্যমনের অগোচর—এই প্রকারে পরব্রহ্মের অজ্ঞেয় স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের একপ্রকার নির্ণয় করিতে পারে, ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্র স্থির করিয়াছে। বাসনা, স্মৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা হইয়াছে তন্মধ্যে যাহা অতিশয় ব্যাপক কিংবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারিত হইবে তাহাকেই পরব্রহ্মের স্বরূপ মানিতে হইবে। কারণে সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ এই বিষয়টি নির্ব্বিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্মৃতি, বাসনা, ধৃতি ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; এবং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; এবং শেষে বুদ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (গী. ৩ ৪২)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকরণে ইহার বিচার করা হইয়াছে। এমন বাসনা, মন প্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে যদি আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরব্রহ্মের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে ইহা স্বতই নিষ্পন্ন হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই যুক্তিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন যে, বাক্য অপেক্ষা মন অধিক যোগ্য (ভূয়স্), মন অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া আত্মা যখন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভূমন্) তখন আত্মাকেই পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বলিতে হয়। ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায় তাহা এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব। গ্রীণ বলেন যে, ইন্দ্রিয়াদির যোগে আমাদের মনের উপর বাহ্য নানারূপের যে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের একীকরণ করিয়া আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; ঐ জ্ঞানের অনুরূপ বাহ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন নানারূপের মূলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোন

প্রকার বস্তু থাকা চাই ; নচেৎ আত্মার একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বকপোলকল্পিত ও নিরাধার হইয়া বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া পড়িবে। এই 'কোন এক' বস্তুকে আমরা ব্রহ্ম বলি। প্রভেদ এই যে কাণ্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়া গ্রীণ তাহাকে বস্তু-তত্ত্ব বলেন। যাহাই বলনা কেন, শেষে বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) ও আত্মা পরস্পরের অনুরূপ এই দুই পদার্থই অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে 'আত্মা' মন ও বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, নিজের প্রতীতিকে প্রমাণ মানিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি যে, আত্মা জড় নহে,—উহা চিৎরূপী বা চৈতন্যরূপী ; আত্মার স্বরূপ এইরূপ নির্দ্ধারিত করিলে পর, বাহ্যজগতের অন্তর্গত ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে দুইটি মাত্র পক্ষই সম্ভব—এই ব্রহ্ম বা বস্তুতত্ত্ব (১) আত্মস্বরূপাত্মক কিংবা (২) আত্মা হইতে ভিন্ন স্বরূপাত্মক। কারণ ব্রহ্ম ও আত্মা ব্যতীত তৃতীয় বস্তুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু সকলেই ইহা জানে যে, কোনও দুই পদার্থ স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলে তাহাদের পরিণাম কিংবা কার্য্যও অবশ্য ভিন্ন হইবে। তাই, পদার্থের পরিণাম হইতেই উক্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা একরূপ, তাহার নির্ণয় আমরা যে কোন শাস্ত্রে করিয়া থাকি। উদাহরণ যথা—দুই গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি দেখিয়া আমরা স্থির করি যে, ঐ দুইটি গাছ একই অথবা ভিন্ন। এই রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক-স্বরূপাত্মকই হইবে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের যে সংস্কার মনের উপর হয়, এই আত্মার ব্যাপারের দ্বারা তাহাদের একীকরণ হয় ; একীকরণের সঙ্গে যে একীকরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম উক্ত পদার্থসমূহের নানাত্ব ভাঙ্গিয়া দেয় সেই একীকরণের মিল হওয়া চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হইয়া পড়িবে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক অন্যের সহিত মিলাইয়া একীকরণকারী এই তত্ত্ব দুইস্থানে হইলেও পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না ; এতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রহ্মেরও রূপ হইবে।* সারকথা, যে কোনপ্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে বাহ্যজগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামরূপাত্মক প্রকৃতির ন্যায় জড় তো নহে, পরন্তু বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোময় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, কিংবা ওঁকাররূপী শব্দব্রহ্ম, এই সমস্ত ব্রহ্মের রূপও নিম্নপদবীর এবং প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। ইহাই যে গীতারও সিদ্ধান্ত তাহা এই সম্বন্ধে গীতার অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী. ২. ২০ ; ৭. ৫ ; ৮. ৪ ; ১৩. ৩১, ১৫. ৭. ৮ দেখুন)। তথাপি ব্রহ্মের ও আত্মার স্বরূপ এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তি প্রয়োগে আমাদের ঋষিরা যে প্রথমে সন্ধান করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবেন না। কারণ, অধ্যাত্মশাস্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কোন অনুমানই নিশ্চিত করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্ব্বদা আত্মপ্রতীতির যোগ হওয়া চাই, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। তাছাড়া আধিভৌতিক শাস্ত্রেও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর তাহার উপপত্তি জানা যায়, কিংবা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হয়, ইহা ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ন্যায় অনুসারে

*Green's Prolegomena to Ethics § § 26-36.

উপরিপ্রদত্ত ব্রহ্মাত্মৈক্যের বুদ্ধিগম্য উপপত্তি বাহির হইবার শত শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯, কঠ, ৪. ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ত্ব আছে (গী, ১৮. ২০) এইরূপ প্রথমে নির্ণয় করিয়া, শেষে বাহ্যজগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী তত্ত্ব এবং আমাদের শরীরান্তর্ভূত বুদ্ধির অতীত আত্মতত্ত্ব এই দুই একই অর্থাৎ একপদার্থ, অমর ও অব্যয় কিংবা যে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহেতেই অবস্থিত, এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন ; এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে, গার্গী, বারুণী প্রভৃতিকে এবং জনককে সম্পূর্ণ বেদান্তের এই রহস্যই বলিয়াছেন (বৃ, ৩. ৫-৮ ; ৪ ২-৪)। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম,—ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (বৃ. ১. ৪. ১০) ; ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা অদ্বৈতবেদান্তের এই তত্ত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "মাটির এক গোলায় কি আছে তাহা জানিতে পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাত্মক সমস্ত বিকার যে রূপ বুঝা যায় সেইরূপ যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সমস্ত বস্তুই জানা যায়, সেই বস্তু আমাকে বল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আমার নাই" অধ্যায়ের আরম্ভে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাঁহার পিতা তখন নদী, সমুদ্র, জল ও লবণ ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, বাহ্যজগতের মূলে যে দ্রব্য আছে তাহা (তৎ) এবং তুমি (ত্বম্) অর্থাৎ তোমার দেহান্তর্গত আত্মা একই—"তত্ত্বমসি" ; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে তাহা স্বতই তুমি জানিতে পারিবে। এইরূপ শ্বেতকেতুর পিতা নূতন নূতন বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন ; এবং প্রতিবারই "তত্ত্বমসি"—তাহাই তুমি—এই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (ছাং. ৬. ৮-১৬)। "তত্ত্বমসি" ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মহাকাব্যগুলির মধ্যে মুখ্য বাক্য।

ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী—ইহা নির্ণয় হইল। কিন্তু আত্মা চিদ্রূপী বলিয়া ব্রহ্মও চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই এখানে ব্রহ্মের ও সেই সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আত্মার সান্নিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধর্ম্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্তু যখন বুদ্ধির এই ধর্ম্মকে আত্মার উপর চাপানো উচিত নহে, তখন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আত্মার মূল স্বরূপকেও নির্গুণ ও অজ্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। তাই কাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী হইলেও এই উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বলা কিয়দংশে গৌণ। কেবল চিদ্রূপসম্বন্ধেই এই আপত্তি নহে ; কিন্তু 'সৎ' এই বিশেষণও পরব্রহ্মের উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও ঐ সঙ্গে স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ সৎ ও অসৎ এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ দুই বিভিন্ন বস্তুর উদ্দেশেই বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আলোক কখনই দেখে নাই, সে আঁধারের কল্পনা করিতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, আলো ও আঁধার এই দুটি শব্দের দ্বন্দ্বও সে বুঝিতে পারিবে না। সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে এই ন্যায়ই উপযোগী। কোন কোন বস্তুর নাশ হইয়া থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি

হইলে, আমরা সমস্ত বস্তুর অসৎ (নশ্বর) ও সৎ (অবিনশ্বর) এই দুই বর্গ নির্দ্দেশ করিতে থাকি ; কিংবা সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দ বুঝিতে হইলে মনুষ্যের দৃষ্টির সম্মুখে দুই প্রকারের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসা আবশ্যক। কিন্তু মূলারম্ভে যদি একই বস্তু ছিল, তবে দ্বৈত উৎপন্ন হইলে পর দুই বস্তুর উদ্দেশে যে সাপেক্ষ সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের প্রচার হইয়াছে, এই মূল বস্তুতে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে? কারণ ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার বিরুদ্ধ কোন অসৎ ছিল কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ না দিয়াই "জগতের আরম্ভে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, যাহা কিছু ছিল তাহা একই ছিল", ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে জগতের মূলতত্ত্বের এইরূপ বর্ণনা আছে (ঋ. ১০. ১২৯) সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের জুড়ী (কিংবা দ্বন্দ্ব) পরে বাহির হইয়াছে ; এবং সৎ ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে যাহার বুদ্ধি মুক্ত হইয়াছে সে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্মপদে উপনীত হয় এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ২৮ ; ২. ৪৫)। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের বিচার কিরূপ গভীর ও সূক্ষ্ম তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। কেবল তর্কদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রহ্মের কিংবা আত্মারও অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞেয় ও নির্গুণ অতএব ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও ইহা প্রতীতি হইতে পারে যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীতি হওয়ায়, আমার নির্গুণ ও অনির্ব্বাচ্য আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমি জানিতে পারি তাহাই পরব্রহ্মেরও স্বরূপ। সেইজন্য ব্রহ্ম ও আত্মা একস্বরূপী, এই সিদ্ধান্ত নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, "ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী" ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না ; অবশিষ্ট বিষয়সম্বন্ধে স্বানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগম্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদনে যতদূর সম্ভব শব্দের দ্বারা খোলসা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ব্যাপ্ত, অজ্ঞেয়, অনির্ব্বাচ্য হইলেও জড়জগতের ও আত্মস্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বের ভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আত্মার সন্নিধানে জড়প্রকৃতিতে চৈতন্যরূপী যে গুণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়া, অধ্যাত্মশাস্ত্র আত্মা ও ব্রহ্ম দুইকেই চিদ্রূপী বা চৈতন্য-রূপী বলিয়া থাকে। কারণ সেরূপ না করিলে আত্মা ও ব্রহ্ম দুই-ই নির্গুণ, নিরঞ্জন ও অনির্ব্বাচ্য হওয়ায় তাহাদের স্বরূপ বর্ণন একেবারেই বন্ধ করিতে হয়, কিংবা শব্দের দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করিতে হইলে "নেতি নেতি"। "এতস্মাদন্যৎপরমস্তি"।—ইহা নহে, ইহা (ব্রহ্ম) নহে, (ইহা নামরূপ), প্রকৃত ব্রহ্ম ইহার অতীত আর কিছু ; এইরূপ নিয়ত "না"-"না" ধারা পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই (বৃ. ২. ৩. ৬.)। তাই চিৎ (জ্ঞান), সৎ (সত্তামাত্রত্ব কিংবা অস্তিত্ব) ও আনন্দ—সাধারণত ব্রহ্মস্বরূপের এই লক্ষণগুলি বলা হয়। এই লক্ষণগুলি অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশয় নাই। তথাপি শব্দের দ্বারা যতদূর হইতে পারে ব্রহ্মের স্বরূপ জানাইবার জন্য লক্ষণগুলি কথিত হইয়াছে ; প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ হওয়ায় তাহার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশ্যক হয়, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই অনুভূতি কিরূপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত অতএব অনির্বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপ

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিরূপে ও কখন্ অনুভবে আইসে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার যে বিচার করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

ব্রহ্ম ও আত্মা এক এই সমীকরণকে মারাঠীতে "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে পর জ্ঞাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা পৃথক এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু ভিন্ন, এই ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, তবে ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ভিন্ন—এই ভেদ কি করিয়া চলিয়া যাইবে? এবং এই ভেদ না চলিয়া গেলে ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি কি করিয়া ঘটিবে? এইরূপ এক সংশয় আসিতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশয় সম্পূর্ণ অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই করে এরূপ নহে। "চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা" (মভা. শাং. ৩১১. ১৭) যে কোন বস্তু দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের (ও কান প্রভৃতির) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়; মন শূন্য থাকিলে অন্য কোন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিলে, বস্তু চোখের সম্মুখে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ঠিক্ থাকিলেও মনকে যদি তাহা হইতে বাহির করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বিষয়ের দ্বন্দ্ব বাহ্য জগতে থাকিলেও আমাদিগের নিকট না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল আত্মাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপী ব্রহ্মতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্মাত্মৈক্যের সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একান্ত উপাসনার দ্বারা, কিংবা অত্যন্ত ব্রহ্মবিচারন্তে শেষে এই মানসিক অবস্থা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, দৃশ্য জগতের দ্বন্দ্ব বা ভেদ তাহার নেত্রসম্মুখে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়; এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা উপাস্য ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। কারণ 'অন্য' এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র এই অবস্থা বিঘট্টিত হয় এবং মনুষ্য অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে আসিয়া পড়ে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। অধিক কি, এই অবস্থা আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহা বলাও মুস্কিল! কারণ, 'আমি' বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা মনে আসে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্য হইবার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হয়। এই কারণে "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি… জিঘ্রতি… শৃণোতি… বিজানাতি।… যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ… জিঘ্রেৎ… শৃণুয়াৎ… বিজানীয়াৎ। …বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদেব খলু অমৃতত্বমিতি।"—দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই দ্বৈত যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় সে পর্য্যন্ত এক আর এককে দেখে, আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে, এবং জানে; কিন্তু সমস্ত যখন আত্মময় হইয়া যায় (অর্থাৎ আত্ম-পর ভেদই থাকে না) তখন কে কাহাকে দেখিবে, আঘ্রাণ করিবে, শুনিবে বা জানিবে! ওরে! যে স্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথা হইতে আসিবে?—যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে

এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বৃ. ৪. ৫. ১৫; ৪. ৩. ২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মভূত কিংবা ব্রহ্মভূত হইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বও থাকিতে পারে না (ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে—আমা হইতে—ভিন্ন হওয়া চাই এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকার ভিন্নতার কোন অবকাশ থাকে না। এই দুঃখশোকবিরহিত অবস্থাকেই 'আনন্দময়' এই নাম দিয়া এই আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৮; ৩. ৬) কিন্তু এই বর্ণনাও গৌণ। কারণ, আনন্দের অনুভবকারী এখন থাকে কোথায়? তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেষ প্রকারের, এইরূপ বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৩. ৩২.)। ব্রহ্মবর্ণনায় যে 'আনন্দ' শব্দ প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের গৌণত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অন্য স্থানে 'আনন্দ' শব্দকে ছাঁটিয়া ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, "ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (বৃ ৪. ৪. ২৫) কিংবা "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুং ৩. ২, ৯)—যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়।…এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে (বৃ. ২. ৪. ১২; ছাং ৬. ১৩)—লবণখণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়া গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত নহে এইরূপ ভেদ যেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মাত্মৈক্যের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। কিন্তু "জয়াচী বদে নিত্য বেদান্ত বাণী"—যিনি বলেন নিত্য বেদান্তের বাণী সেই তুকারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টান্তের বদলে—

গোড়পণে জৈসা গুড়। তৈসা দেব ঝালা সকল।
আতাঁ ভজো কোণেপরী। দেব সবাহ্য অন্তরী॥

অর্থাৎ "গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিষ্টতা, সেইরূপ সমস্তের মধ্যেই ভগবান, এখন যে রকমেরই ভজনা কর—ভগবান বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন"—এইরূপ গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণনা করিয়াছেন (তু. গা. ৩৬২৭)। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বানুভবগম্য এইরূপ যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্যই এই। পরব্রহ্মের যে অজ্ঞেয়তা বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতী অবস্থাসম্বন্ধীয়, অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারের অবস্থাসম্বন্ধীয় নহে। আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সে পর্য্যন্ত যাহাই কর না কেন ব্রহ্মাত্মৈক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু নদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহার যেরূপ সমুদ্র-রূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়া থাকে; এবং তাহার পর, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (গী. ৬. ২৯.) সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপনি সর্ব্বভূতে—এইরূপ তাহার ব্রহ্মময় অবস্থা হইয়া পড়ে। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ কেবল স্বানুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাং" (কেন ২.৩) আমি পরব্রহ্মকে জানি যাহারা বলে তাহারা তাঁহাকে জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরব্রহ্মকে জানি না তাহারাই তাঁহাকে জানে, কেনোপনিষদে এইরূপ পরব্রহ্মস্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক অতি সুন্দর বর্ণনা করা

হইয়াছে। কারণ, পরব্রহ্মকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সময় আমি (জ্ঞাতা) ভিন্ন, এবং আমার জানা (জ্ঞেয়) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা কাঁচা কিংবা অপূর্ণই হইয়া থাকে। তাই, এইরূপ যে বলে সে প্রকৃত ব্রহ্মকে জানে না ইহা তাহার নিজের মুখেই সিদ্ধ হয়। উল্টাপক্ষে, 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দ্বৈতী ভেদ লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যের যখন পূর্ণ অনুভূতি আসে তখন "আমি তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানি" এই ভাষা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই এই অবস্থায়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে ব্রহ্মকে জানিয়াছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দ্বৈতীভাবের এইরূপ সম্পূর্ণ লোপ হইয়া জ্ঞাতার সমস্তই ব্রহ্মতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া যাওয়া, মাখামাখি হওয়া, 'মরিয়া' যাওয়া সাধারণতঃ দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই নির্ব্বাণ' অবস্থা দুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা শেষে মনুষ্যের সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনুভবের দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় বলিয়া ইহা আত্মনাশেরই এক প্রকারভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু এই অবস্থা অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না, তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত সন্দেহ নির্ম্মূল হয় * ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ সাধুসন্তদিগের অনুভূতি। পূর্ব্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণনা রাখিয়া দেও; কিন্তু নিতান্ত আধুনিক ভগবদ্‌ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাবাও—"আদুলে" মরণ পাহিলেঁ ম্যাঁ ঢোলাঁ। তো জালা সোহলা অনুপম।" অর্থাৎ নিজের মরণ নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক ভাষায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন (গা. ৩৫৮৯)। ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. ১. ৪. ১০)—আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পেঁছায়; তাহার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তাহার পর তাঁহার মধ্যে সে এরূপ নিমজ্জিত হয় যে আমি কি অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অনুভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই যায় না। এই অবস্থায় জাগরণ বজায় থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা সুষুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পারা যায় না; যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে সাধারণত যে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে। তাই স্বপ্ন সুষুপ্তি, 'নিদ্রা' কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক চতুর্থ কিংবা তুরীয় অবস্থা এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে

* ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত এই অদ্বৈতের কিংবা অভেদভাবের অবস্থা nitrous oxide gas নামক এক প্রকার রাসায়নিক বায়ু আঘ্রাণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বায়ুকে 'লাফিং গ্যাস, বলে। Will to Believe and Other Essays on Popular philosophy by Willim James. PP 294. 298. কিন্তু এই অবস্থা কৃত্রিম। সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক। এই দুয়ের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। তথাপি এই কৃত্রিম অবস্থার প্রমাণ হইতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোন বিরোধ থাকে না, তাই এইস্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছি।

এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ নাই, এইরূপ সমাধিযোগে প্রবৃত্ত করাই পাতঞ্জল যোগদৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই কারণেই গীতাতে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আরম্ভ করিতে মনুষ্য যেন অবহেলা না করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী, ৬. ২০-২৩)। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা। কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ একই হইয়া গেলে "অবিভক্তং বিভক্তেষু"—অনেকের একত্ব করা চাই গীতার জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্ঞান হইতে পারে না। সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভব আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মানুষের আপনা-আপনিই চুকিয়া যায়। কারণ, জন্মমরণ তো নামরূপেতেই আছে এবং ইহা তাহার অতীত (গী. ৮. ২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে 'মরণের মরণ' এই নাম দিয়াছেন (গা. ৩৫৮৯); এবং যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন। ইহাই জীবন্মুক্তাবস্থা। এই অবস্থায় আকাশগমনাদি কতকগুলি অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতাঞ্জল যোগসূত্রে এবং অন্যত্রও বর্ণিত আছে (পাতাঞ্জল সূ, ৩. ১৬-৫৫); এবং এইজন্য কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসের সখ হইয়া থাকে। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্তি অনুসারে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবন্মুক্ত পুরুষ এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাঁহার এই সিদ্ধি দেখাও যায় না (যো. ৫. ৮৯)। তাই শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই। ইহা চমৎকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, এইরূপ বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। উহা কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরূপ আমি বলি না। যাহা হউক উহা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নহে এইটুকু নির্ব্বিবাদ। তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংবা তাহার ইচ্ছা বা আশাও না করিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা, ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষেই মনুষ্যের চেষ্টা ও প্রযত্ন করা চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রের উক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাদু অথবা ধোঁকা লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার শক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি তো হয়ই না, ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যায় এক্ষণে মানুষও বিমানে করিয়া আকাশে উড়িয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া সেই মানুষকে কেহ ব্রহ্মবেত্তার মধ্যে গণনা করে না। এমন কি, আকাশগমনাদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্রূর ঘাতক পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপে আনন্দময় অবস্থার অনির্ব্বাচ্য অনুভূতি অন্যকে পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বলিতে গেলে 'আমি-তুমি এই দ্বৈতাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে যে বর্ণনা আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং এই বর্ণনা যখন গৌণ, তখন জগতে উৎপত্তি, রচনা প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য উপনিষদের অনেক স্থানে যে শুদ্ধ দ্বৈতী বর্ণনা পাওয়া

যায়, তাহাও গৌণ বলিয়াই মানিতে হইবে। উদাহরণ যথা,—আত্মস্বরূপী, শুদ্ধ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও অধিকারী ব্রহ্ম হইতেই পরে হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ পুরুষ অথবা অপ (জল) প্রভৃতি জগতের ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ সৃষ্টি করিয়া পরে জীবরূপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তৈ. ২. ৬; ছাং ৬. ২. ৩; বৃ. ১. ৪. ৭), এইরূপ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা উপনিষদে করা হইয়াছে তাহা অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নির্গুণ পরমেশ্বরই যদি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-একেকে উৎপন্ন করিয়াছে এই কথাও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ লোককে জগৎ-রচনা বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতের ভাষাই একমাত্র সাধন হওয়ায়, ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি-উক্ত বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতের যোগসূত্রটি বজায় আছে এবং এই প্রকার দ্বৈতের ব্যবহারিক ভাষা ব্যবহৃত হইলেও মূলে অদ্বৈতই সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। সূর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, সূর্য্য উদয় হইল কিংবা অস্ত হইল এই ভাষা যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মস্বরূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে অখণ্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দ্ধারণ হইলেও "পরব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে" এইরূপ ভাষা উপনিষদে প্রয়োগ হইয়া থাকে; এবং গীতাতেও সেইরূপ "আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও অজ" (গীতা ৭. ২৫) উক্ত হইলেও "আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকি" (গী. ৪. ৯) ইহা ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহা শব্দশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত মত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বত্র একই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার বিনশ্বর সগুণ পদার্থ কিরূপে সৃষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ নামরূপাত্মক জগৎকে 'মায়া' বলিলে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ মায়া উৎপন্ন হওয়া তর্ক-দৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ খণ্ড হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা সাংখ্যশাস্ত্রের উক্তি অনুসারে প্রকৃতির ন্যায় নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের কোন সগুণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া লৌহযন্ত্রের মধ্যে বাষ্পের ন্যায় তাহার অন্তরে পরব্রহ্মরূপ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব খেলিতেছে, (বৃ. ৩. ৭), এবং এই দুয়ের মধ্যে দাড়িম ফলের মধ্যে তাহার দানার ন্যায় ঐক্য আছে এইরূপ মনে করা অধিক প্রশস্ত। কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদে কখন দ্বৈতী ও কখন শুদ্ধ অদ্বৈতী বর্ণনা থাকায় এই দুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে মুখ্য মানিয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হওয়া পর্য্যন্ত মায়িক দ্বৈতের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ মনে করিলে সমস্ত বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈতপক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যান্তর্গত পদের অন্বয় দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক লাগে না। দ্বৈতীদিগের মনে ইহা একটা খটকা বলিয়া মনে হয় না এরূপ নহে। কিন্তু তত্ত্বম্—তস্য ত্বম্—অর্থাৎ তোমা হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন ব্যক্তি তাহার তুমি, সে

তুমি নও—এইরূপে কোন রকমে এই মহাবাক্যের অর্থ করিয়া দ্বৈতী নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, যাঁহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই 'টানাবুনা' অর্থ সত্য নহে বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। কৈবল্যোপনিষদে আবার "স ত্বমেব ত্বমেব তৎ" (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ "তৎ" ও "ত্বম্" শব্দদুটীকে উল্টাপাল্টা করিয়া উক্ত মহাবাক্যের অদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই দেখান হইয়াছে। অধিক কি বলিব? সমস্ত উপনিষদের অধিকাংশ কাটিয়া না ফেলিলে কিংবা জানিয়া বুঝিয়া তাহার প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন রহস্য আছে, এরূপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্তু এই প্রতিবাদ কখনই শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে আমি অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। যাঁহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন। যে মহাত্মারা উপনিষদে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ. ৪. ৪. ১৯; কঠ ৪. ১১)—এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে মূলে সমস্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাং ৬. ২. ২.) এইরূপ আপন প্রতীতি স্পষ্ট বলিয়া পরে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—এ জগতে যে নানাত্ব দেখে সে জন্মমরণের ফেরে পড়িয়া যায়—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে এরূপ আমার মনে হয় না। কিন্তু অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাকা প্রযুক্ত সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদাচিৎ যেরূপ অবকাশ পাওয়া যায়, গীতা-সম্বন্ধে সেরূপ নহে। গীতা একই গ্রন্থ হওয়ায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্পষ্ট রহিয়াছে; এবং সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে "সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও যে একই বজায় থাকে" (গী. ৮. ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ায়, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া সর্ব্বত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া আছে (গী. ১৩. ৩১), এইরূপ অদ্বৈতমূলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না। অধিক কি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির যে নীতিতত্ত্ব গীতাতে বলা হইয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত অন্য প্রকারের বেদান্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না; শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়ে কিংবা তদুত্তর কালে অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক যে সকল যুক্তি অথবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে তাহার সমস্তই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই গীতা হইয়াছে; এবং সেইজন্য তাহাতে কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ হইতে পারে না, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সেইজন্য গীতাতে যে বেদান্ত আছে তাহা সাধারণতঃ শাঙ্করসম্প্রদায়ের জ্ঞানানুরূপ অদ্বৈতী, দ্বৈতী নহে, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে গীতা ও শাঙ্করসম্প্রদায় মধ্যে এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শাঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত। কিন্তু তাহার বিচার পরে করা যাইবে। এখানকার বিষয় তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয়; তাই এই তত্ত্বজ্ঞান গীতা ও শাঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইহাই এখানে বক্তব্য। অন্য সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্করভাষ্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার কারণও এই।

সমস্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিতে একপাশে সরাইয়া রাখিবার পর, একই নির্ব্বিকার ও নির্গুণ তত্ত্ব থাকিয়া যায়, সেই জন্য পূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিচারান্তে অদ্বৈতসিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়। ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নির্গুণ ও অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ সৃষ্টি কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদান্তদৃষ্টিতে তাহার বিচার করা আবশ্যক। নির্গুণ পুরুষেরই সহিত ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যেরা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলে জগতের মূলতত্ত্ব দুই হয়; এবং এইরূপ করিলে অনেক কারণে পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত অদ্বৈতমতে বাধা আসে। সগুণ প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে একই মূল নির্গুণ দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নির্গুণ হইতে সগুণ—অর্থাৎ যাহা কিছু নাই তাহা হইতে অন্য কিছু—উৎপন্ন হইতে পারে না, সৎকার্য্যবাদের এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে। এইজন্য, দুইদিকু হইতেই বাধা। এখন এই জটিল প্যাঁচ ঘুচিবে কি করিয়া? অদ্বৈতকে না ছাড়িয়াই নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা বলিতে হইবে; এবং সৎকার্য্যবাদের দৃষ্টিতে উহা বন্ধ হইবার মতো দেখায়। পেঁচটা খুবই বড় সত্য। অধিক কি, কাহারও কাহারও মতে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই মুখ্য বাধা এবং এই জন্যই তাহারা দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতী পণ্ডিতেরা নিজ বুদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হইতে মুক্ত হইবারও এক সযুক্তিক ও অক্ষুণ্ণ মার্গ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে কার্য্য ও কারণ এই দুই-ই যখন একই গণ্ডীর মধ্যে কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই সৎকার্য্যবাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই জন্য সত্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সগুণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা অদ্বৈত বেদান্ত স্বীকার করিবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি তখনকারই যখন দুই পদার্থই সত্য। যেখানে এক পদার্থ সত্য এবং অন্যটি শুধু তাহার অনুরূপ, সেখানে সৎকার্য্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিকেও সাংখ্য স্বতন্ত্র ও সত্য পদার্থ বলিয়া মানে। তাই উহা নির্গুণ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকৃতির উৎপত্তির উপপত্তি সৎকার্য্যবাদ অনুসারে করিতে পারে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্ত যে, মায়া অনাদি হইলেও তাহা সত্য এ স্বতন্ত্র নহে, গীতার উক্তি অনুসারে তাহা, 'মোহ' 'অজ্ঞান' কিংবা 'ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষয়'; তাই সৎকার্য্যবাদ হইতে নিষ্পন্ন আপত্তি অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না। পিতা হইতে পুত্র হইলে পিতার গুণ পরিণামে হইয়াছে বলিব; কিন্তু পিতা একই ব্যক্তি হইয়া তিনি যখন কখনও বালকের কখনও যুবকের এবং কখনও বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন এই ব্যক্তিতে এবং ইহার অনেক রূপের মধ্যে গুণপরিণামরূপী কার্য্য-কারণভাব থাকে না, এইরূপ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার সূর্য্য একই, ইহা নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর তাহার প্রতিবিম্ব একটা ভ্রম, গুণ-পরিণাম প্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য সূর্য্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ দূরবীণে কোন গ্রহের প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিলে পর, সেই গ্রহের কেবল চক্ষুদৃষ্ট স্বরূপ চক্ষের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত উৎপন্ন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র স্পষ্ট বলে।

ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, কোন বিষয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর হইলেই তাহাকে স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায় না। আবার ঐ ন্যায়ই অধ্যাত্মশাস্ত্রেও প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচক্ষুরূপ দূরবীণের দ্বারা নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মই সত্য, এবং জ্ঞানশূন্য চর্ম্মচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরব্রহ্মের কার্য্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন শুধু একটা ভ্রম অর্থাৎ মোহাত্মক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই আপত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, দুই বস্তু একই গণ্ডীভুক্ত নহে; একটী সত্য, অপরটী শুধু প্রতীয়মান রূপ মাত্র; এবং মূলে একই বস্তু থাকিলেও দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অজ্ঞানে, দৃষ্টি-বিভ্রমে সেই একই বস্তুর প্রতীয়মান রূপ পরিবর্ত্তিত হয় এইরূপ আমাদের অনুভব আছে। উদাহরণ যথা—কানে শোনা শব্দ আর চোখে দেখা রং, এই দুই গুণ ধরুন। তন্মধ্যে কানে আমরা যে শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া 'শব্দ' বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গতি এইরূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ আবার চোখে দেখা লাল, হলদে, নীল প্রভৃতি রংও মূলে একই সূর্য্যালোকের বিকার, এবং সূর্যালোকও একপ্রকার গতি এইরূপ এক্ষণে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'গতি' মূলে একই হওয়ায় কান যদি তাহাকে শব্দ ও চোখ যদি তাহাকে রং বলে তবে এই ন্যায়ই অধিকতর ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নামরূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৎকার্য্যবাদের সহায়তা ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই প্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, মনুষ্যের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপন আপন দিক হইতে নির্ব্বিকার বস্তুর উপরেই শব্দরূপাদি অনেক নামরূপাত্মক গুণসমূহের 'অধ্যারোপ' করিয়া নানাপ্রকার প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু মূলের একই বস্তুতে এই প্রতীয়মান রূপ গুণ কিংবা এই নামরূপ থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। এবং এই অর্থই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, অথবা চোখে আঙ্গুল দিলে এক বস্তুকে দুইটী দেখা, অথবা অনেক রংয়ের চশমা পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বেদান্তশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহ মনুষ্যকে কখনই ছাড়িয়া যায় না বলিয়া জগতের নামরূপ কিংবা গুণ তাহার নজরে অবশ্যই পড়িবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক স্বরূপ দেখা যায়, তাহাই এই জগতের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ, এরূপ বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যদি সে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় তখন সেরূপ দেখা যাইবে না এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে তাহার নিত্য ও প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মূলতত্ত্ব নির্গুণ বটে, মনুষ্যের নিকট উহা সগুণ দেখায়; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, মূল বস্তুর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়েরই বিচার হয় বলিয়া এইপ্রকার কখনই উত্থিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিয় নষ্টপ্রায় হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত হন, কিংবা মনুষ্যের নিকট তিনি অমুক প্রকার দৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার ত্রিকাল-অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ

স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। তাই, জগতের মূলে অবস্থিত সত্যের মূলস্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহার বিচার করিতে হয় তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষ বিচার করা আবশ্যক হয়। এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত গুণই স্বতঃই চলিয়া যায় এবং ইহা সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নির্গুণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে নির্গুণ, তাহার বর্ণনা কে-ই বা করিবে, আর কি প্রকারে করিবে? এইজন্য পরব্রহ্মের চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল নির্গুণ নহে, তাহা অনির্ব্বাচ্যও বটে; এবং এই নির্গুণ স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রিয়যোগে সগুণ রূপ দেখিতে পায়, অদ্বৈতবেদান্তে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণকে সগুণ করিবার এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্র ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন যে, মানবজ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হয়, এইজন্য ইহা ইন্দ্রিয়সমূহের অজ্ঞান এবং নির্গুণ পরব্রহ্মে সগুণ জগতের রূপ দেখা সেই অজ্ঞানের পরিণাম; কিংবা ইন্দ্রিয়াদিও পরমেশ্বরের জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সগুণ সৃষ্টি (প্রকৃতি) নির্গুণ পরমেশ্বরেরই এক 'দৈবী মায়া' (গী. ৭. ১৪) এখানে এইটুকু নিশ্চিত অনুমান করিয়া নিশ্চিত হইতে হয়। অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট পরমেশ্বর ব্যক্ত ও সগুণ দৃষ্ট হইলেও পরমেশ্বরের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নির্গুণ, তাহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের চরমসীমা, ইত্যাদি গীতাতে যে বর্ণনা আছে (গী. ৭. ১৪, ২৪, ২৫), তাহার তত্ত্ব পাঠকের এক্ষণে উপলব্ধি হইবে। পরমেশ্বর মূলে নির্গুণ, তাহার মধ্যে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সগুণ জগতের বিবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখিতে পায়, এইরূপ নির্ণয় করিলেও উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ কি বুঝাইবার জন্য বিষয় আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয় যখন বায়ুতরঙ্গের উপর শব্দরূপাদি গুণের কিংবা শুক্তির উপর রজতের অধ্যারোপ করে তখন বায়ুতরঙ্গের মধ্যে শব্দরূপাদির কিংবা শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ থাকে না ইহা সত্য; কিন্তু অধ্যারোপিত গুণ তাহাতে না থাকিলেও উহা হইতে ভিন্ন গুণ মূল পদার্থের মধ্যে থাকিবেই না এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, শুক্তির মধ্যে রজতের গুণ না থাকিলেও রজতের গুণের অতিরিক্ত অন্যগুণ উহাতে থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইহা হইতে আপন অজ্ঞানে মূল ব্রহ্মের উপর ইন্দ্রিয়াদির অধ্যারোপিত গুণ এই ব্রহ্মের মধ্যে নাই বলিলেও অন্য গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে কি নাই, এবং যদি থাকে তবে তিনি নির্গুণ হন কিরূপে, এইরূপ আর এক সংশয় এই স্থানে আসে। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মূল ব্রহ্মের মধ্যে অন্য গুণ থাকিলেও তাহা আমরা জানিব কিরূপে? মনুষ্য যে গুণ অবগত হয় তাহা নিজের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অবগত হয়; এবং যে গুণ ইন্দ্রিয়গোচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই পারে না। সার কথা এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত যদি অন্য কোন গুণ পরব্রহ্মে থাকে, তাহা জানা আমাদের সাধ্য নহে, এবং তাহা পরব্রহ্মের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যায়শাস্ত্র দৃষ্টিতে ঠিক্‌ নহে। তাই গুণশব্দের "মনুষ্যের জ্ঞানগম্য গুণ" অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম 'নির্গুণ' ইহা বেদান্তী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। মনুষ্যের অচিন্তনীয় এইরূপ গুণ

কিংবা শক্তি মূল পরব্রহ্মস্বরূপে আছে অদ্বৈত বেদান্তও এরূপ বলেন না, আর অপর কেহ তাহা বলিতে পারেন না। অধিক কি বেদান্তিগণও ইন্দ্রিয়াদির উপরি-উক্ত অজ্ঞান কিংবা মায়াকে সেই মূল পরব্রহ্মেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ত্রিগুণাত্মক মায়া কিংবা প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে; কিন্তু একই নির্গুণ ব্রহ্মের উপর মনুষ্যের ইন্দ্রিয় অজ্ঞানবশতঃ সগুণ দৃশ্য রূপের অধ্যারোপ করিয়া থাকে। এই মতকে '**বিবর্ত্তবাদ**' বলে। নির্গুণ ব্রহ্ম একই মূলতত্ত্ব হওয়ায়, নানাবিধ সগুণ জগৎ প্রথমে কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল—অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে এই বিষয়ের ইহাই উপপত্তি। কাণাদন্যায়শাস্ত্রে অসংখ্য পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইয়াছে; এবং নৈয়ায়িক এই পরমাণুকে সত্য বলিয়া মানেন। তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ হইতে আরম্ভ হইলে পর জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল এইরূপ তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে পরমাণুদের সংযোগ আরম্ভ হইবার পর জগৎ সৃষ্ট হয়, তাই ইহাকে 'আরম্ভবাদ' বলে। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের অসংখ্য পরমাণুসম্বন্ধীয় মত স্বীকার না করিয়া "একপদার্থী, সত্য ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই" জড়জগতের মূলকারণ এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অন্তর্গত গুণের বিকাশে কিংবা পরিণামে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহা সাংখ্যেরা বলেন। এই মতকে 'গুণপরিণামবাদ' বলে। কারণ, এক মূল সগুণ প্রকৃতির গুণবিকাশেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ইহাতে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এই দুই মতবাদকে অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। পরমাণু অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত অদ্বৈতমতানুসারে উহা জগতের মূল হইতে পারে না; এবং অবশিষ্ট প্রকৃতি এক হইলেও উহা পুরুষ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়ায় এই দ্বৈতও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রকারে দুই মতবাদকে ছাড়িয়া দিলে এক নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক। কারণ, সৎকার্য্যবাদ অনুসারে নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে বেদান্তী বলেন যে, সৎকার্য্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কার্য্য ও কারণ এই দুই বস্তু যেখানে সত্য সেইখানেই খাটে। মূল বস্তু যেখানে একই এবং তাহার শুধু বাহ্যরূপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখা সেই বস্তুর ধর্ম্ম না হইয়া দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। * এই ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ জগতের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাহাতেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা বিবর্ত্তবাদ। একই মূল সত্য দ্রব্যের উপরেই অনেক অসত্য অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, ইহাই বিবর্ত্তবাদের মত; এবং গুণপরিণামবাদে প্রথমেই দুই সত্য দ্রব্যকে মানিয়া লওয়া হয়। তন্মধ্যে একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানা

* ইংরাজীতে এই অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে appearances are the results of subjective conditions, viz. The senses of the observer and not of the thing in itself.

গুণযুক্ত অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম বিবর্ত ; এবং নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি হওয়া কিংবা দুধ হইতে দৈ হওয়া গুণপরিণাম। এই কারণে বেদান্তসার গ্রন্থের এক সংস্করণে এই দুই মতবাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—

যস্তাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম উদীরিতঃ।
অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবো বিবর্তঃ স উদীরিতঃ॥

"কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্যই অন্য প্রকারের বস্তু প্রস্তুত হয় তখন তাহাকে (গুণ-) 'পরিণাম' বলে ; এবং সেরূপ না হইয়া মূল বস্তুই যখন অসত্যরূপে (অতাত্ত্বিক) প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'বিবর্ত' বলে" (বে. সা. ২১)। আরম্ভবাদ নৈয়ায়িকদিগের, গুণপরিণামবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্তবাদ অদ্বৈত-বেদান্তীদিগের। অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা প্রকৃতি এই দুই সগুণ বস্তুকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানেন না। কিন্তু আবার এই আপত্তি হয় যে, সৎকার্যবাদ অনুসারে নির্গুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। ইহা দূর করিবার জন্যই বিবর্তবাদ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কেহ কেহ যে ধারণা করেন যে, বেদান্তী গুণপরিণামবাদ কখনই স্বীকার করেন না, কিংবা কখনও করিবেন না, তাহা ভুল। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াই অসম্ভব। অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের কিংবা অন্য দ্বৈতীদিগেরও যে মুখ্য আপত্তি তাহা অপরিহার্য নহে। একই নির্গুণ ব্রহ্মেতে মায়ার অনেক প্রতীয়মান বাহ্য রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে ইহা দেখানোই বিবর্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখা যাইতে পারে, বিবর্তবাদে ইহা সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদান্তশাস্ত্রের কোনও বাধা নাই। মূলপ্রকৃতি স্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সত্য নহে—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্য উক্তি। প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র না মানিয়া এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান রূপের গুণ, এইরূপ নানাগুণাত্মক রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মানিতে অদ্বৈত বেদান্তের কোন বাধা নাই। তাই "প্রকৃতি আমারই মায়া" (গী, ৭. ১৪; ৪. ৬) ভগবান ইহা গীতাতে বলিলেও আবার গীতাতেই ইহা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত (গী, ৯. ১০) এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার এই 'গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে" (গী, ৩. ২৮; ১৪. ২৩) এই নীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, বিবর্তবাদ অনুসারে মূল নির্গুণ পরব্রহ্মেতে একবার মায়ার দৃশ্য রূপ উৎপন্ন হইলে পর, এই মায়িক রূপের অর্থাৎ প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্য জগৎকেই একবার মায়াত্মক রূপ বলিলে, এই রূপের রূপান্তরের জন্য গুণোৎকর্ষের ন্যায় কোন একটা নিয়ম চাই-ই এরূপ বলিবার প্রয়োজন নাই। মায়াত্মক রূপের বিস্তারও নিয়মবদ্ধই থাকে ইহা বেদান্তীরা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথাটা এই যে, মূলপ্রকৃতির ন্যায় এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মায়িক নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত ; তাঁহার সত্তাতেই এই নিয়মের নিয়মত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব

প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন করিবার সামর্থ্য, প্রতীয়মান-রূপ-বিশিষ্ট সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রকৃতির হইতে পারে না।

উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর—অথবা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে মায়া (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন জগৎ), আত্মা ও পরব্রহ্ম—ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানা যাইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জাগতিক সমস্ত বস্তু এই দুই বর্গে বিভক্ত—'নামরূপ' এবং তাহাদের আবরণের নিম্নে 'নিত্য তত্ত্ব'। তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায়া কিংবা প্রকৃতি বলে। কিন্তু নামরূপকে একপাশে সরাইয়া রাখিলে যে 'নিত্য দ্রব্য' অবশিষ্ট থাকে, তাহা নির্গুণই থাকিবে। কারণ কোন গুণই নামরূপবর্জিত হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্ত্বই পরব্রহ্ম ; এবং মনুষ্যের দুর্বল ইন্দ্রিয়ের নিকট এই নির্গুণ পরব্রহ্মেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মায়া সত্য পদার্থ নহে ; পরব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত ও অপরিবর্তনীয় বস্তু। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহা দ্বারা আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই ন্যায় অনুসারে মনুষ্যের বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয় দৃশ্য জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মক অর্থাৎ অনিত্য মায়ার বর্গে পড়ে ; এবং এই দেহেন্দ্রিয়ে আচ্ছাদিত আত্মা নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ; কিংবা ব্রহ্ম ও আত্মা একই। যে অদ্বৈতীসিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগৎকে স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের ভেদ পাঠকের এখন অবশ্যই উপলব্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগৎই নাই ; তিনি একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন ; এবং বেদান্তশাস্ত্রী বাহ্য জগতের নিত্যপরিবর্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলিয়া মনে করেন, এবং এই নামরূপের মূলে ও মনুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মস্বরূপী নিত্য দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং এই একপদার্থাত্মক আত্মতত্ত্বই চরম সত্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদী "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই ন্যায় অনুসারে সৃষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়-প্রকৃতিরই পক্ষে স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তীরা সৎকার্যবাদের বাধাটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে" এই কারণে এখানে সাংখ্যেতে অসংখ্য পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মাতে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিভাগে সমাবেশ হইয়াছে। শুদ্ধাধিভৌতিক পণ্ডিত হেকেলকে অদ্বৈতী ধরিলাম। কিন্তু তিনি এক জড় প্রকৃতিতেই চৈতন্যেরও সংগ্রহ করেন ; এবং বেদান্ত জড়কে প্রাধান্য না দিয়া দেশকালে অসীম, অমৃত ও স্বতন্ত্র চিদ্রূপী পরব্রহ্মেই সমস্ত জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বৈত এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের অদ্বৈত এই দুয়ের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্তই গীতাতেই আছে, এবং এক প্রাচীন কবি সমস্ত অদ্বৈতবেদান্তের সার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

"কোটি গ্রন্থের সার অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি—(১) ব্রহ্ম সত্য (২) জগৎ অর্থাৎ জগতের সমস্ত নামরূপই মিথ্যা কিংবা নশ্বর ; এবং (৩) মনুষ্যের আত্মা ও ব্রহ্ম মূলে একই, দুই

নহে"। এই শ্লোকের 'মিথ্যা' শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে তিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদ অনুসারে ইহার তৃতীয় চরণের 'ব্রহ্মামৃতং জগৎ সত্যং' এই পাঠান্তর স্বচ্ছন্দে করিয়া লইতে পারেন ; সেইজন্য ভাবার্থের বদল হইবে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি সমস্ত অদৃশ্য জগতের দৃশ্য অথচ নিত্য পরব্রহ্মরূপী মূলতত্ত্বকে সৎ (সত্য) বলিবে কি অসৎ (অসত্য-অনৃত) বলিবে, ইহা লইয়া কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই এই বিষয়ের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি। সৎ কিংবা সত্য এই একই শব্দের দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়া উঠিয়াছে ; এবং 'সৎ' এই শব্দকে প্রত্যেক ব্যক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, তৎপ্রতি ঠিক লক্ষ্য করিলে, কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকার্য্য। এই সৎ কিংবা সত্য শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্মুখে এক্ষণে জাজ্বল্যমান অর্থাৎ ব্যক্ত (কাল উহার বাহ্য রূপ বদলাক বা নাই বদলাক) ; এবং দ্বিতীয় অর্থ (২)—চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও যে স্বরূপ চিরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে, প্রথম অর্থ যাঁহার সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরব্রহ্মকে তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ চক্ষের অদৃশ্য সুতরাং অসৎ বা অসত্য বলেন। উদাহরণ যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি 'সৎ' ও দৃশ্য জগতের অতীতের প্রতি 'ত্যৎ' (অর্থাৎ যাহা অতীত কিংবা 'অনৃত' চক্ষের অদৃশ্য) শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মের এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যাহা কিছু মূলে বা আরম্ভে ছিল সেই দ্রব্যই 'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ।" (তৈ. ২. ৬)—সৎ (চক্ষের গোচর) এবং 'তাহা' (যাহা অতীত), বাচ্য ও অনির্বাচ্য, সাধার ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়), সত্য ও অনৃত এইরূপ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মকে এইরূপ 'অনৃত' বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে ; পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদেই "এই অনৃত ব্রহ্ম জগতের 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা আধার, তাহার জন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় হইয়াছে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শব্দভেদে ভাবার্থের বদল হয় না। সেইরূপ আবার শেষে 'অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ"—"এই সমস্ত জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রহ্ম) ছিল", এবং ঋগ্বেদের (১০, ১২৯, ৪) বর্ণন অনুসারে তাহা হইতেই পরে সৎ অর্থাৎ নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৭)। ইহা হইতেও স্পষ্টই দেখা যায়—'অসৎ' শব্দ এই স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ 'চক্ষের অদৃশ্য' এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণাচার্য্য উক্ত বচনের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন; (বেসূ ২. ১. ১৭)। কিন্তু 'সৎ' কিংবা 'সত্য' এই শব্দের,—চক্ষে দেখা না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ (অর্থাৎ উপরে প্রদত্ত দুই অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়) অর্থ যাঁহাদের সম্মত, তাঁহারা অদৃশ্য অথচ অপরিবর্ত্তনীয় পরব্রহ্মকেই সৎ কিংবা সত্য নাম দিয়া, নামরূপাত্মক মায়াকে অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর এইরূপ বলিয়া থাকেন। উদাহরণ যথা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত"—হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা 'নাই' তাহা হইতে সৎ

অর্থাৎ "যাহা আছে" তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে—এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে (ছাং, ৯. ২. ১, ২) আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেই এই পরব্রহ্মকে একস্থানে অব্যক্ত অর্থে 'অসৎ বলা হইয়াছে (ছাং, ৩, ১৯, ১)। * একই পরব্রহ্মের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার 'সৎ' ও একবার 'অসৎ' এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ—অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই হইলেও শুধু শব্দবাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহায্যকারী—পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়া গিয়া শেষে ব্রহ্ম সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, এবং দৃশ্য জগৎ অসৎ অর্থাৎ নশ্বর, এই এক পরিভাষাই স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্গীতাতে এই শেষের পরিভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ১৬. ১৮) পরব্রহ্ম সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং বেদান্তসূত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ। পুনশ্চ দৃশ্য জগৎকে 'সৎ' বলিয়া পরব্রহ্মকে 'অসৎ' বা তৎ (তাহা=অতীত) বলিবার তৈত্তিরীয়োপনিষদীয় সেই পুরাতন পরিভাষার চিহ্ন এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ওঁ তৎসৎ এইরূপ যে ব্রহ্মনির্দ্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৭. ২৩) তাহার মূল অর্থ কি হইতে পারে—এই পুরাতন পরিভাষার দ্বারা ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। এই 'ওঁ' গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (প্র, ৫ ; মাং, ৮-১২ ; ছাং, ১, ১)। 'তৎ' অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য জগতের অতীত, দূরবর্তী অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব; এবং 'সৎ' অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ। এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই অর্থেই "সদসচ্চাহমর্জ্জুন" (গী. ৯. ১৯)—সৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও অসৎ অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতায় কর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য হওয়ায় সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের দ্বারাও কর্ম্মযোগের পূর্ণ সমর্থন হয় ; "ওঁ তৎসৎ" এর 'সৎ'শব্দের অর্থ অলৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল পাওয়া যায় সেই কর্ম্ম : এবং তৎ-এর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। সংকল্পে যাহাকে 'সৎ' বলা হইয়াছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ কর্ম্মই হওয়ায় (পরের প্রকরণ দেখুন) এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের এই কর্ম্মমূলক অর্থ মূল অর্থ হইতে সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ওঁ তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং সত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনির্দ্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু গীতার্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না থাকায় এখানে সেগুলি বুঝানো হয় নাই।

জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাত্মা) ইহাদের পরস্পর-সম্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে পর, "জীব আমারই অংশ" (গী. ১৫. ৭) এবং "আমিই এক অংশের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি" (গী. ১০. ৪২) এইরূপ যাহা ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—এবং বদরায়ণাচার্য্যও বেদান্তসূত্রে ইহাই বলিয়াছেন (বেসূ. ২. ৩. ৩৪. ৪. ১৯)—কিংবা পুরুষসূক্তে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—স্থিরচর

* অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাব (মায়া) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাবকে সৎ বুঝিয়া (real) বস্তুতত্ত্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্তু হেগেল ও গ্রীন প্রভৃতি উক্ত আবির্ভাবকে অসৎ (unreal) বুঝিয়া বস্তুতত্ত্বকে (real) সৎ বলেন।

ব্যাপুনি অবঘা জোঃজগদাত্মা দশাংগুলে উরল্য"—সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়া যে জগদাত্মা দশাঙ্গুলে রহিয়াছেন—এইরূপ যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে 'পাদ বা অংশ' শব্দের অর্থ-নির্ণয়ও সহজ হয়। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও নিরবয়ব একপদার্থাত্মক নামরূপবিরহিত সুতরাং অচ্ছেদ্য এবং নির্ব্বিকার হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুকরা হওয়া সম্ভব নহে (গী. ২. ২৫) তাই, চতুর্দ্দিকে ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত একপদার্থী পরব্রহ্ম এবং মনুষ্যের দেহান্তর্গত আত্মা, এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 'শারীর আত্মা' পরব্রহ্মেরই 'অংশ' এইরূপ বলিতে হইলেও, 'অংশ' বা 'ভাগ' শব্দের 'কাটিয়া ফেলা বিচ্ছিন্ন টুকরা', বা 'ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি দানা' এইরূপ অর্থ না করিয়া, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে গৃহাস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ (মঠাকাশ, ঘটাকাশ) এই সকল যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, সেইরূপ শারীর আত্মাও পরব্রহ্মের অংশ, এইরূপ অর্থ করিতে হয় (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ৩০ দেখ)। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত এক পদার্থমূলক তত্ত্ব,—ইহাও এইরূপ সত্য নির্গুণ পরমেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ। অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মূলতত্ত্ব (তাহা আকাশের মতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের দ্বারা বদ্ধ নামরূপমাত্র সুতরাং সসীম নশ্বর। ইহা সত্য যে, সেই তত্ত্বসমূহের ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত; কিন্তু পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া সেই সমস্তের মধ্যে ওতপ্রোত আছেন এবং তদতিরিক্ত জানি না তিনি কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। পরমেশ্বরের ব্যাপকতা দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহা দেখাইবার জন্য 'ত্রিপাদ' শব্দ পুরুষসূক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ 'অনন্তই' বিবক্ষিত। কিন্তু দেখা যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ বা সংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার; এবং ইহা বলিয়া আসিয়াছি যে পরব্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত। এইজন্য, যে নাম-রূপাত্মক 'কালের' দ্বারা সমস্ত কবলিত রহিয়াছে সেই কালকেও যিনি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন তিনিই পরব্রহ্ম উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় (মৈ. ৬. ১৫), এবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ"—পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে সূর্য্য চন্দ্র কিংবা অগ্নির সমান কোন প্রকাশক সাধন নাই, কিন্তু তিনি স্বপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণনা গীতাতে ও উপনিষদে আছে (গী. ১৫. ৬; কঠ, ৫. ১৫; শ্বে, ৬. ১৩) তাহারও ইহাই তাৎপর্য্য। সূর্য্য চন্দ্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। যাঁহাকে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (গী. ১৩. ১৭; বৃ, ৪. ১৬)—জ্যোতির জ্যোতি বলা হয় সেই স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন; তাঁহার অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই; এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয় (মুং, ২, ২, ১০)। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়-গোচর অতি সূক্ষ্ম বা অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমস্তই দেশকালাদি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব 'জগতেই' উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক, উহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল

হইতে স্বতন্ত্র; অতএব কেবল নামরূপেরই বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি বা সাধন বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা শতগুণ সূক্ষ্ম ও প্রগল্ভ হইলেও তাহার দ্বারা জগতের মূল "অমৃত তত্ত্বের" সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্ব্বিকার ও অমৃত তত্ত্বকে কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ. এবং তাহারও মধ্যে নির্গুণ অর্থাৎ নামরূপরহিত স্বরূপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং নির্গুণই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল শব্দের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় যাঁহাদের দুই অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসাধারণত্ব নাই। এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই ভাবের দ্বারা সঙ্কটকালেও সম্পূর্ণ সমতার সহিত আচরণ করিবার স্থির স্বভাব উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহার জন্য বহুবংশাগত সংস্কারের, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়তা আবশ্যক হয়। এই সমস্তের সাহায্যে "সর্ব্বভূতে একই আত্মা" এই তত্ত্ব যখন কোন মনুষ্যের সঙ্কট সময়েও তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে সহজভাবে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারের মনুষ্যের মোক্ষ-লাভ হয় (গী. ৫. ১৮-২০; ৬. ২১. ২২)—ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপরিউক্ত সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সারভূত ও শিরোমণিভূত চরম সিদ্ধান্ত। এই আচরণ যে ব্যক্তিতে দেখা যায় না তাহাকে 'কাঁচা' বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে সে এখনও সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই। প্রকৃত সাধু এবং নিছক্ বেদান্তশাস্ত্রী, ইহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ। এবং এই অভিপ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লক্ষণ বলিবার সময় "বাহ্য জগতের মূল তত্ত্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা।" জ্ঞান না বলিয়া "অমানিত্ব, ক্ষান্তি, আত্মনিগ্রহ সমবুদ্ধি" ইত্যাদি উদাত্ত মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়া যাহার দ্বারা চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্ব্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ১৬. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বারা যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্ব্ব-ভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তির বাসনাত্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হয়। কিন্তু কাহার বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন না থাকায় এখানকার কেবল কেতাবী জ্ঞান প্রচারের কালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, 'জ্ঞান' বা 'সমবুদ্ধি' শব্দেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা (বাসনাত্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ করা হয়। ব্রহ্মসম্বন্ধে শুষ্ক, বাক্‌পাণ্ডিত্য প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া "বাঃ বাঃ" বলিয়া শিরঃসঞ্চালক, কিংবা অভিনয়দর্শকের ন্যায় "আরও একবার" বলিবার লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯; ক. ২. ৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে যে ব্যক্তি অন্তর্বাহ্যশুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে

সে-ই প্রকৃত আত্মনিষ্ঠ এবং তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক্ পণ্ডিতের হয় না—সে যতই কেন বুদ্ধিমান বা বিদ্বান হোক না। "ন্যায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২. ২২ ; মুং, ৩. ২. ৩.)। এইরূপ তুকারাম বাবাও বলিয়াছেন—"ঝালাসি পণ্ডিত পুরাণ সাঙ্গসী। পরী তুং নেণসি মী হেং কোণ॥" অর্থাৎ—"পণ্ডিত হইয়াছে, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি জান না যে 'আমি' কে।" (গা, ২৫. ৯৯)। আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা দেখ। 'মুক্তি লাভ হয়' এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হইয়া পড়ে। মনে করি আত্মা হইতে এই মুক্তি কোন পৃথক বস্তু! ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে দ্রষ্টা ও দৃশ্য জগতের ভেদ ছিল ঠিক ; কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যের পূর্ণ জ্ঞান হইলে আত্মা ব্রহ্মেতে মিশিয়া যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রহ্মরূপ হইয়া যান ; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' মোক্ষ নাম দেওয়া হইয়াছে ; এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা অন্য কোথা হইতে আসে না, অথবা তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আত্মজ্ঞান যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রহিয়াছে ; কারণ মোক্ষ তো আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ; উহা পৃথক স্বতন্ত্র কোন বস্তু বা স্থল নহে। শিবগীতাতে এই শ্লোক আছে (১৩, ৩২)—

মোক্ষস্য ন হি বাসোঽস্তি ন গ্রামান্তরমেব বা।
অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থি-নাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ "মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ প্রদেশে যাইতে হয়, এরূপ নহে ; আপন হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হওয়াকেই মোক্ষ বলে।" এই প্রকারে অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে নিষ্পন্ন এই অর্থই "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্," (গী. ৫. ২৬)—যাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার সকল স্থানেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপী মোক্ষলাভ হয়, এবং "যঃ সদা মুক্ত এব সঃ" (গী. ৫. ২৮) ভগবদ্গীতার এই শ্লোকসমূহে এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মই হইয়াছেন (মুং, ৩. ২. ৯)—ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের আত্মার জ্ঞানদৃষ্টিতে এই যে পূর্ণাবস্থা হয় ইহাকেই 'ব্রহ্মভূত' (গী. ১৮. ৫৪) বা "ব্রাহ্মী স্থিতি" (গী, ২.৭২), বলা হইয়া থাকে ; এবং স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫-৭২), ভক্তিমান্ (গী. ১২. ১৩-২০) বা ত্রিগুণাতীত (গী. ১৪, ২২-২৭) পুরুষদিগের ভগবদ্গীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও এই অবস্থারই বর্ণনা। 'ত্রিগুণাতীত' পদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই গীতারও অভিমত, এরূপ বুঝা যেন না হয় ; অধ্যাত্মশাস্ত্রের "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম—(বৃ, ১. ৪. ১০)—এই ব্রাহ্মী অবস্থা কখনো ভক্তিমার্গের দ্বারা, কখনো চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখনো বা গুণাগুণবিচাররূপ সাংখ্যমার্গের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায়। এই মার্গসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মার্গ হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বরস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ভক্তিই সুলভ সাধন ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে। এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি। সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্মাত্মৈক্যের

অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান হইয়া জগতের সর্ব্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারে কার্য্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; এবং এই অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে সেই পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন—এইটুকুতো নির্ব্বিবাদ। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ পশু ও মনুষ্যের একই সমান হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কিংবা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই হইয়া থাকে। সমস্ত ভূতের বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এইপ্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করাই নিত্য মুক্তাবস্থা, পূর্ণযোগ বা সিদ্ধাবস্থা। গীতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টীকা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ * অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মভূত পুরুষের সাম্যাবস্থার সুরস ও চটকদার নিরূপণ করিয়াছেন ; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাহ্মী স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই। যথা—"হে পার্থ! যাঁহার হৃদয়ে বৈষম্য কিছু মাত্র নাই, যিনি শত্রুমিত্র সকলকে সমান ভাবেন ; অথবা হে পাণ্ডব! যিনি প্রদীপের ন্যায় ইহা আমার ঘর বলিয়া এখানে আলোক দিব, উহা অপরের ঘর বলিয়া ওখানে অন্ধকার করিয়া রাখিব, এ প্রকার ভেদজ্ঞান করেন না ; বীজ যে বপন করে এবং গাছ যে কাটে উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে ছায়াদান করে ; ইত্যাদি (জ্ঞা, ১২. ১৮)। সেইরূপ "পৃথিবীর ন্যায় তিনি এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না যে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহা ভাবেন না যে, রাজার শরীর রক্ষা করি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি ; যেমন জল এই ভেদ করে না যে, গরুর তৃষ্ণা শান্তি করি এবং ব্যাঘ্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করি ; সেইরূপই সর্ব্বভূতে যাঁহার একই মৈত্রী ; যিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান দয়া এবং যিনি 'আমি' ও 'আমার' ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাঁহাতে সুখদুঃখের আভাস দেখা যায় না" ইত্যাদি (জ্ঞা, ১২. ১৩) † অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা শেষে যাহা লাভ হয় তাহা ইহাই।

সমস্ত মোক্ষধর্ম্মের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস, ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পূর্ব্বে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই

* জ্ঞানেশ্বর মহারাজের "জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ নাগপুরে সবজজ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মালব ভগড়ে বি-এ, করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী তাহা বাংলাভাষাতে ও সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

† পার্থা জয়াচিয়া ঠাষীং। বৈষম্যাচী বার্ত্তা নাহী। বিদুমিত্রা দোহী। সরিস্বা পাডু॥ কাঁ ঘরিচিয়া উজিযেতু করারা। পারাথিয়া অংধারু পাডাবা। হে নেণোঁচি গা পাণ্ডবা। দীনু জৈসা॥ জো খাণ্ডাবয়া ঘাকে ঘালী। কাঁ লাবণী জয়ানে কেলী॥ দেঘাঁ একাচি সাউলী। বৃক্ষু দে জৈসা।

কিংবা তৎপূর্ব্বে (জ্ঞা. ১২. ১৩) সেই অধ্যায়ে—

উত্তমানে ধরিজে। অধমানে অহেরিজে। হেং কাঁহীং চং নেণিজে। অসুধা জেবীং॥ কাঁ রায়াচেং দেহ চালুং। রঙ্কা পবোতে গালুং। হেং ন-ক্ষণোঁচি কৃপালু। প্রাণু সৈং গা॥ গাঈচা তৃষা হরু। কাঁ ব্যাঘ্রা বিষ হোউনি মারু। ঐ সে নেণোচি কাঁকরু, তোয় জৈসেং॥ তৈসী আষ বিষাঁচি ভূতমাত্রী। একপণে জয়া মৈত্রী॥ কৃপেশীং ধাত্রী। আপণচি জো॥ আণির্মী হে ভাষ নেণে। মাঝেং কাঁহীং চি ন ক্ষণে সুখদুঃখ জাণণেং। নাহিং জয়া।

আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার আধারভূত ঋগ্বেদের এক প্রসিদ্ধসূক্ত ভাষান্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি জগতের অগম্য মূলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই সূক্তে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্ভ, স্বতন্ত্র ও মূলস্পর্শী তত্ত্বজ্ঞানের মার্ম্মিক বিচার অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পূর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরূপাত্মক জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় ইহা দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই সূক্তের গুরুত্ব বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আপনাপন ভাষায় তাহার চমৎকার ভাষান্তর করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত হইতেছে ; এবং এই সূক্তের প্রারম্ভিক শব্দ হইতে ইহাকে "নাসদীয় সূক্ত" বলে। এই সূক্তই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২. ৮. ৯) প্রদত্ত হইয়াছে ; মহাভারতের নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মে, এই সূক্তেরই আধারে ভগবদিচ্ছায় সর্ব্বপ্রথমে জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে (মভা, শাং, ৩৪২. ৮)। সর্ব্বানুক্রমণিকা অনুসারে ইহার ঋষি পরমেষ্ঠি প্রজাপতি এবং দেবতা পরমাত্মা ; ইহাতে ত্রিষ্টুভ্ বৃত্তের অর্থাৎ এগারো অক্ষরের চার চরণের-সাত ঋক্ আছে। 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দ্ব্যর্থী হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে 'সৎ' বলা সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের যে মতভেদের কথা পূর্ব্বে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ ঋগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—এই মূলকারণ সম্বন্ধে কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ, ১. ১৬৪. ৪৬) কিংবা "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" (ঋ, ১. ১১৪, ৫)—তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, কিন্তু তাঁহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে ; আবার কোন কোন স্থলে ইহার উল্টাও বলা হইয়াছে যে, "দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত" (ঋ. ১০. ৭২. ৭)—দেবতাদেরও পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ 'অব্যক্ত হইতে সৎ' অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি হওয়া সম্বন্ধে ঋগ্বেদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায় ; যেমন জগতের আরম্ভে-মূল হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই দুই তাঁহারই ছায়া ; তিনিই পরে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন (ঋ. ১০. ১২১. ১, ২) ; প্রথমে বিরাটরূপী পুরুষ ছিলেন ; তাঁহা হইতে যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ, ১০. ৯০) ; প্রথমে আপ (জল) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন (ঋ, ১০. ৭২. ৬., ১০. ৮২. ৬) ; ঋত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর রাত্রি (অন্ধকার) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল (ঋ, ১০. ১৯০. ১)। ঋগ্বেদে বর্ণিত এই মূল দ্রব্য-সমূহের পরে অন্যান্য স্থানে এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—(১) জলের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ' এই সমস্ত প্রথমে কেবল তরল জল ছিল (তৈ, ব্রা, ১. ১. ৩. ৫) ; (২) অসতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইহা প্রথমে অসৎ ছিল (তৈ, ২. ৭) ; (৩) সতের, ছান্দোগ্যে 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' এই সমস্ত প্রথমে সৎই ছিল (ছাং, ৬. ২) ; কিংবা ৪) আকাশের, আকাশঃ পরায়ণম্'

আকাশই সমস্তের মূল (ছাং, ১. ৯) ; (৫) মৃত্যুর, বৃহদারণ্যকে 'নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ' প্রথমে ইহা কিছুই ছিল না, সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল (বৃ. ১. ২. ১), এবং (৬) তমের, মৈত্র্যুপনিষদে 'তমো বা ইদমগ্র আসীদেকম্' (মৈ, ৫.২) প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম (তমোগুণী, অন্ধকার) ছিল—পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ত্ব হইল। শেষে এই সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়া মনুস্মৃতিতে জগতের আরম্ভের বর্ণনা এই প্রকার করা হইয়াছে—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

অর্থাৎ "এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, ভেদাভেদ উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল ; অনন্তর তাহার মধ্যে অব্যক্ত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন"—(মনু ১. ৫-৮)। জগৎ আরম্ভের মূল-দ্রব্যসম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা নাসদীয় সূক্তের সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল ; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে কোন্ মূলদ্রব্য সত্য ধরা যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাই উহার সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন যে—

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥

১। তখন অর্থাৎ মূলারম্ভে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না। অন্তরীক্ষ ছিল না এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। (এইরূপ অবস্থাতে) কে (কাহাকে) আবরণ করিল ? কোথায় ? কাহার সুখের জন্য ? অগাধ ও গহন জলও কোথায় ছিল ?*

ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ ॥

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, সেইজন্য অন্য অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ) ও ছিল না। (এইপ্রকার) রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন (=প্রকেত) ছিল না। (যাহা ছিল) তাহা একমাত্র আপন শক্তি (স্বধা) দ্বারাই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলঃ সর্ব্বমা ইদম্ ।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাঽজায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥

৩। যে (যৎ) এইরূপ বলা যায় যে, অন্ধকার ছিল, আরম্ভে এই সমস্ত অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেদাভেদবিরহিত জল ছিল, কিংবা আভূ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম (আরম্ভেই) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন, তাহা (তৎ) মূলে এক (ব্রহ্মই) তপের মহিমার দ্বারা (রূপান্তরে পরে) প্রকট হইয়াছিলেন।

---

* প্রথম ঋক্—চতুর্থ চরণে 'আসীৎ কিং' এই অন্বয় করিয়া আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি ; এবং উহার ভাবার্থ হইতেছে 'জল সে সময়ে ছিল না' (তৈ, ব্রা, ২. ২. ৯ দেখ)।

† তৃতীয় ঋক্—কেহ কেহ ইহার প্রথম তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া উহার এইরূপ বিধানাত্মক

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

৪। ইহার মনের যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃসৃত হয় তাহাই আরম্ভে কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে। জ্ঞানীরা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্রহ্মের মধ্যে সৎ-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের (প্রথম) সম্বন্ধ।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্ অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

৫। (এই) রশ্মি বা সূত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত; এবং যদি বল যে ইহা নীচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল; (ইহাদের ভিতর কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হয় এবং (বাড়িয়া) বড়ও হয়। তাহারই স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রযতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়া থাকে।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

৬। (সৎ এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে আসিল— ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক) প্র অর্থাৎ বিস্তারপূর্ব্বক এখানে কে বলিবে? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারাও এই (সৎ জগতের) বিসর্গের পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা কে জানিবে?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

৭। (সৎ-এর) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংবা সৃষ্টি হইয়াছে বা হয় নাই,—তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে অধ্যক্ষ (হিরণ্যগর্ভ) তিনিই জানেন; কিংবা না জানিতেও পারেন। (কে বলিতে পারে)?

চক্ষের বা সাধারণতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরূপাত্মক নানা দৃশ্যের জালে বিজড়িত না থাকিয়া তাহার অতীত কোন এক ও অমৃত তত্ত্ব আছে ইহা

অর্থ করেন যে, "অন্ধকার, অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের দ্বারা আচ্ছাদিত আভূ (শূন্যগর্ভ) ছিলেন"। কিন্তু আমার মতে ইহা ভুল। কারণ প্রথম দুই ঋকে, মূলারম্ভে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার বিপরীত, অন্ধকার কিংবা জল মূলারম্ভে ছিল, এই সূক্তে ইহা উক্ত হইতে পারে না। তাছাড়া, এইরূপ অর্থ করিলেও তৃতীয় চরণে যৎ শব্দকে নিরর্থক মানিতে হয়। তাই তৃতীয় চরণের যৎ-এর সহিত চতুর্থ চরণের তৎ পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপরি-উক্ত অর্থ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মূলারম্ভে জল প্রভৃতি পদার্থ ছিল' এইরূপ যাহারা বলে তাহাদের উত্তরস্বরূপে এই ঋক্ এই সূক্তে আসিয়াছে; এবং তোমার কথা অনুসারে তম, জল, প্রভৃতি পদার্থ মূলে ছিল না, উহা এক ব্রহ্মেরই পরবর্ত্তী বিস্তার এইরূপ বলাই ঋষির উদ্দেশ্য। 'তুচ্ছ' ও 'আভূ' এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আভূ শব্দের অর্থ বড় কিংবা সমর্থ হইতেছে; এবং ঋগ্বেদে অন্য যে দুই স্থানে এই শব্দ আসিয়াছে (ঋ ১০. ২৭. ১. ৪) তথায় সায়ণাচার্য্যও উহার এই অর্থই করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে (চিত্র. ১২৯. ১৩০) তুচ্ছ এই শব্দ মায়ার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; (নৃসিং. উত্ত. ৯ দেখ); সুতরাং আভূর অর্থ শূন্যগর্ভ না হইয়া 'পরব্রহ্ম'ই হইতেছে। 'সর্ব্বং আঃ ইদম্ এই স্থানে আঃ (আ+অস্) অস্ ধাতুর ভূতকালের রূপ; তাহার অর্থ আসীৎ।'

জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য। এই মাখনের গোলা পাইবার জন্যই উক্ত সূক্তের ঋষির বুদ্ধি একেবারেই দৌড়িয়া গিয়াছিল; ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কত তীব্র ছিল! মূলারম্ভে অর্থাৎ জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তাহা সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অমৃত, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার ছিল, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত ঋষি সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্ত্য ও অমৃত, অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও সুখভোক্তা, এই প্রকার দ্বৈতের পরস্পরসাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের সৃষ্টির পরে হওয়ায়, জগতে এই দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ এক ও দুই এই ভেদও যখন ছিল না, তখন কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত? তাই এই সূক্তের ঋষি আরম্ভেই নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারম্ভের একমাত্র দ্রব্যকে সৎ বা অসৎ, আকাশ বা জল, আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা মৃত্যু ইত্যাদি পরস্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া উচিত নহে; যাহা কিছু ছিল তাহা এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং তাহা একমাত্র চতুর্দ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফূর্ত্তিমান ছিল; তাহার জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছাদক অন্য কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় ঋকে 'আনীৎ' এই ক্রিয়াপদের 'অন্' ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করা বা স্ফুরণ হওয়া, এবং 'প্রাণ' শব্দও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু যাহা না সৎ এবং না-অসৎ, তাহা সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল, তাহা কে বলিতে পারে? এবং শ্বাসোচ্ছ্বাস চলিবার জন্য তখনই বায়ুই বা কোথায়? তাই 'আনীৎ' এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং'=বায়ুহীন, ও 'স্বধয়া'=আপনার নিজ মহিমাতে—এই দুই পদ জুড়িয়া "জগতের মূলতত্ত্ব জড় ছিল না" এই অদ্বৈতাবস্থার অর্থ দ্বৈতের ভাষায় খুব নিপুণভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, "তাহা এক বায়ু বিনা আপন শক্তিতেই শ্বাসোচ্ছ্বাস করিতেছিল কিংবা স্ফুরিত হইতেছিল"! ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে যে বিরোধ দেখা যায়, তাহা দ্বৈতীভাষার অপূর্ণতা প্রযুক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। "নেতি নেতি একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" (ছাং, ৭. ২৪. ১)—আপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া একাই অবস্থিত—ইত্যাদি পরব্রহ্মের যে বর্ণনা উপনিষদে আছে তাহাও উপরি-উক্ত অর্থেরই দ্যোতক। সমস্ত জগতের মূলারম্ভে চারিদিকে যে অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব স্ফুরিত ছিল বলিয়া এই সূক্তে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবশিষ্ট থাকিবে। তাই গীতাতে "সমস্ত পদার্থের নাশ হইলেও যাহার নাশ হয় না" (গী. ৮. ২০), এইরূপ এই পরব্রহ্মেরই কোন পর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে এই সূক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "তাহা সৎও নহে অসৎও নহে"। (গী, ১৩. ১২)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত মূলারম্ভে যদি অন্য কিছুই ছিল না তবে "আরম্ভে জল, অন্ধকার, বা আভূ ও তুচ্ছ ইহাদের দ্বন্দ্ব ছিল" ইত্যাদি যে বর্ণনা বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় ঋকে কবি বলিতেছেন যে, জগতের আরম্ভে অন্ধকার ছিল কিংবা অন্ধকারে আবৃত জল ছিল কিংবা আভু (ব্রহ্ম) ও তাঁহার আচ্ছাদনকারী মায়া (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই ছিল ইত্যাদি, ঐ সমস্ত যখন একমাত্র মূল পরব্রহ্মের তপোমাহাত্ম্যে তাঁহার বিবিধরূপে বিস্তার হইয়াছিল সেই সময়েরই—এইরূপ যত বর্ণনা তাহা মূলারম্ভের

স্থিতিবিষয়ক নহে। এই ঋকে 'তপ' শব্দে মূল ব্রহ্মের জ্ঞানময় বিশেষ শক্তি বিবক্ষিত এবং তাহার বর্ণনা চতুর্থ ঋকে করা হইয়াছে (মুং, ১. ১. ৯ দেখ)। "এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ" (ঋ, ১০. ৯০. ৩) এই ন্যায় অনুসারে সমস্ত জগতই যাঁহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমস্তের অতীত, সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও দ্রষ্টা, ভোক্তা ও ভোগ্য, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও অমৃত ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্রূপী, অসাধারণ পরব্রহ্মই মূলারম্ভে ছিলেন ইহা নির্দ্ধারণ করিলেও যখন ইহা বুঝাইবার সময় আসিয়াছে যে, এই অনির্ব্বাচ্য নির্গুণ একমাত্র এক তত্ত্ব হইতে আকাশ, জল প্রভৃতি দ্বন্দ্বাত্মক নশ্বর সগুণ নামরূপাত্মক বিবিধ সৃষ্টি কিংবা এই জগতের মূলভূত ত্রিগুণাত্মক প্রভৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো আমাদের উল্লিখিত ঋষিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতের ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে ; এবং শেষে ঋষি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষ্যের বুদ্ধির সীমার বাহিরে। চতুর্থ ঋকে মূল ব্রহ্মকেই 'অসৎ' বলা হইয়াছে ; কিন্তু তাহার অর্থ "কিছু নাই" ইহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কারণ দ্বিতীয় ঋকেই 'তাহা আছে' এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই সূক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য জগতের সহিত যজ্ঞের উপমা দিয়া এই যজ্ঞ করিবার ঘৃত, সমিধ প্রভৃতি সামগ্রী প্রথমে কোথা হইতে আসিল (ঋ, ১০. ১৩০. ৩) ? কিংবা গৃহের দৃষ্টান্ত, লইয়া মূল এক নির্গুণ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর আকাশ, পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রকৃতি) কোথা হইতে মিলিল ?—কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ, এইরূপ ব্যবহারিক ভাষা স্বীকার করিয়াই ঋগ্বেদে ও বাজসনেয় সংহিতায় কঠিন বিষয়-সমূহের বিচার এই প্রকার প্রশ্ন দ্বারা করা হইয়াছে (ঋ, ১০. ৩১. ৭, ১০ ৮১. ৪ ; বাজ, সং, ১৭. ২০)। সেই অনির্ব্বাচ্য একমাত্র এক ব্রহ্মেরই মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার 'কাম'-রূপী তত্ত্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বস্ত্রের সূত্রের ন্যায় কিংবা সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপরে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সৎএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশপৃথিবী-রূপ এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, উপরি-উক্ত সূক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে (বাজ, সং, ৩৩. ৭৪ দেখ) এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। এই সূক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" (তৈ' ২. ৬ ; ছাং, ৬. ২. ৩)—সেই পরব্রহ্মেরই বহু হইবার ইচ্ছা হইল—(বৃ, ১. ৪ দেখ) ; অথর্ব্ববেদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দৃশ্য জগতের মূলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব্ব প্রথমে 'কাম' উৎপন্ন হইল, (অথর্ব্ব ৯. ২. ১৯)। কিন্তু এই সূক্তের বিশেষত্ব এই যে, নির্গুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নির্দ্বন্দ্ব হইতে দ্বন্দ্বের কিংবা অসঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব বুদ্ধির অগম্য বলিয়া সাংখ্যের ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া মূলপ্রকৃতিকেই বা তাহার ন্যায় অন্য কোন তত্ত্বকে স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র মানা হয় নাই ; কিন্তু এই সূক্তের ঋষি প্রতিপাদন করিতেছেন যে, "যাহা বুঝা হয় নাই, স্পষ্ট বল যে তাহা বুঝা যায় নাই ; কিন্তু সেইজন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ও আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবধারিত অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মের যোগ্যতাকে দৃশ্য জগৎরূপ

মায়ার উপর আরোপ করিয়া পরব্রহ্মসম্বন্ধে অদ্বৈত বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া ন্যায্য নহে।" তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মানিলেও তাহাতে জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য (মহান্) বা অহংকার প্রথমে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া যায় না। এবং এই দোষ যখন কিছুতে এড়ানো যায় না, তখন প্রকৃতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই বা কি লাভ ? মূল ব্রহ্ম হইতে সৎ অর্থাৎ প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা জানা যায় না এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। মানববুদ্ধির কথা দূরে থাকু, সৎএর উৎপত্তি কিরূপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও দৃশ্য জগৎ আরম্ভ হইবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার পূর্ব্বের ব্যাপার তাঁহারা কি প্রকারে জানিবেন ? (গী, ১০. ২ দেখ)। কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাও হিরণ্য-গর্ভ অনেক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ এবং ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে যে একমাত্র তিনিই আরম্ভে "ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" (ঋ, ১০. ১২১, ১)—সমস্ত জগতের 'পতি' অর্থাৎ 'রাজা' বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন তিনি এই বিষয় জানিতে পারিবেন না কেন ? এবং তিনি যদি জানিয়া থাকেন, তবে উহা দুর্ব্বোধ্য কেন বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই সূক্তের ঋষি প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ঔপচারিক উত্তর দিলেন যে,—"হাঁ ; তিনি এই বিষয় জানিয়া থাকিবেন" ; কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মদেবের ও জ্ঞানের গভীরতা-দ্রষ্টা এই ঋষি আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সভয়ে তখনই আবার বলিয়াছেন যে, "অথবা নাও জানতে পারেন ! কে বলিবে ? কারণ তিনিও সৎএর শ্রেণীতে পড়ায় 'পরম' বলা হইলেও 'আকাশের' মধ্যেই অবস্থিত জগতের এই অধ্যক্ষের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে ? কিন্তু এক 'অসৎ' অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না গেলেও মূলব্রহ্ম যে একই সে বিষয়ে ঋষি নিজের অদ্বৈতবুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই। এ বিষয়ে এই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, অচিন্ত্য বস্তুর গহন অরণ্যে মানববুদ্ধি, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্ম্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সেখানে তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে ! ঋগ্বেদে যে এইরূপ সূক্ত পাওয়া যায় ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের বিষয় ! এই সূক্তান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণে (তৈত্তি, ব্রা, ২. ৮. ৯) উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হইয়াছে। এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কাণ্ট প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কর্ত্তৃক ঐ বিষয়েরই অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, এই সূক্তের ঋষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্ত্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আরও দৃঢ়, স্পষ্ট কিংবা তর্কদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ করিয়াছে—ইহার পরে এখনও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিয়া অধিক আশাও নাই।

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পূর্ব্বে 'কেসরী'র অনুকরণে যে রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ চলা গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষপাত করা উচিত। কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ানুসন্ধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থের আরম্ভে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া দিয়া কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কর্ম্মযোগশাস্ত্রই গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা দেখান হইয়াছে। অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে দুঃখসুখবিচারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি একদেশদর্শী ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খঞ্জ। আবার কর্ম্মযোগের আধ্যাত্মিক উপপত্তি বলিবার পূর্ব্বে, আত্মা কি তাহা জানিবার জন্য ষষ্ঠ প্রকরণে প্রথমেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রান্তর্গত দ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষরবিচার করা হইয়াছে। আবার এই প্রকরণে আসিয়া আত্মার স্বরূপ কি এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে দুইদিকে একই অমৃত ও নির্গুণ আত্মতত্ত্ব কিরূপে ওতপ্রোত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছি। এইপ্রকার এখানে ইহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতে একই আত্মা—এই সমবুদ্ধিযোগ সম্পাদন করিয়া তাহা সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখাই আত্মজ্ঞান ও আত্মসুখের পরাকাষ্ঠা; এবং আরও বলা গিয়াছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা বা মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহা কি ভাবে করিতে হইবে, কিংবা যে শুদ্ধ বুদ্ধিতে এই ব্যবহার করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি—এই যে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক কিংবা অবিরোধীভাবে যে করিতে হইবে ইহা আর এক্ষণে বলিতে হইবে না। কর্ম্মযোগের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভগবদ্‌গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নামরূপাত্মক জগতের ব্যবহার আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা জ্ঞানীপুরুষের ত্যাগ করা উচিত; এবং ইহাই যদি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য নির্দ্ধারিত হইবে এবং কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রও নিরর্থক হইবে! তাই এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্মের নিয়ম কি ও তাহার পরিণাম কি, অথবা বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও কর্ম্মযোগশাস্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবশ্যক। ভগবদ্‌গীতাতে তাহারও বিচার করা হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা এই প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় ভগবদ্‌গীতার বেদান্ত বা ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না হইতেই তাঁহারা আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় সুরু করিয়া দেন। কিন্তু সেরূপ করিলে আমার মতে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এইজন্য ভগবদ্‌গীতায় উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব।

ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত

———

দশম প্রকরণ

কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।*

মহাভারত, শান্তি, ২৪০.৭।

এই জগতে যাহা কিছু আছে তাহা পরব্রহ্মই, পরব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গোচর দৃশ্যজগতের পদার্থ-সমূহ অধ্যাত্মশাস্ত্রের চালুনি দিয়া সংশোধন করিতে গেলে উক্ত পদার্থ সকলের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ কিন্তু চিরবর্ত্তনশীল সুতরাং অনিত্য নামরূপাত্মক আবির্ভাব, সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অদৃশ্য অথচ নিত্য পরমাত্মতত্ত্ব, এইরূপ নিত্য-অনিত্য-রূপী দুই বিভাগ হইয়া যায়। রসায়নশাস্ত্রে কোন পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেরূপ পৃথকরূপে বাহির করা হয় সেই প্রকার এই দুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্-রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে না সত্য। কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই দুইকে পৃথক করিয়া শাস্ত্রীয় উপপত্তির সুবিধার জন্য উহাদিগকে অনুক্রমে 'ব্রহ্ম' ও 'মায়া' এবং কখনো কখনো 'ব্রহ্ম-জগৎ' ও 'মায়া-জগত' এইরূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি ইহা যেন মনে থাকে, ব্রহ্ম মূলেই নিত্য ও সত্য হওয়া প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে 'জগৎ' শব্দ এইরূপ প্রসঙ্গে অনুপ্রাসার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম-জগৎ' এই শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মকে কেহ উৎপন্ন করিয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এই দুই জগতের মধ্যে, দেশকালাদি নামরূপের দ্বারা অনাবদ্ধ, অনাদি, নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র; এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত হইয়া তাহার অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ব্রহ্মজগতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব্ব প্রকরণে করা হইয়াছে; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্র ঐখানে শেষ হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা মূলে ব্রহ্মজগতে হইলেও দৃশ্যজগতে অন্য বস্তুর ন্যায় তাহাও নাম-রূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি নামরূপে নশ্বর হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব কিরূপে প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের বিচারার্থ, কর্ম্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বৈতী রাজ্যেও আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই মূলে যদি একই নিত্য ও স্বতন্ত্র আত্মা থাকে তবে পিণ্ডের অর্থাৎ শরীরের আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া জানায় কি বাধা আছে, এবং তাহা কিরূপে দূর হইতে পারে, এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। এই প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়। কারণ, বেদান্তদৃষ্টিতে আত্মা কিংবা পরমাত্মা এবং তৎসম্বন্ধীয় নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই দুই বর্গে বিভক্ত হওয়ায়, নামরূপাত্মক আবরণ ব্যতীত এক্ষণে

* "কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা তাহার মুক্তি হয়।"

আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ কোন স্থানে ঘন, কোন স্থানে তরল হওয়া প্রযুক্ত দৃশ্যজগতের পদার্থসমূহের মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়,—বেদান্তের এইরূপ মত। আত্মরূপী ব্রহ্ম কোথাও নাই। এরূপ নহে ব্রহ্ম প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মনুষ্যের মধ্যেও আছেন। কিন্তু দীপ একই হইলেও লোহার ভিতর কিংবা ন্যূনাধিক স্বচ্ছ কাচের লণ্ঠনের মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র একই হইলেও তৎসম্বন্ধীয় কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্যভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে। অধিক কি, সচেতনের মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহাই তাহার কারণ।” আত্মা সর্ব্বত্র একই সত্য, তথাপি তাহা মূলে নির্গুণ ও উদাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপনা হইতে কিছুই করিতে পারে না; এবং এই সকল সাধন মনুষ্য-যোনি ব্যতীত অন্যত্র পূর্ণরূপে না থাকায়, মনুষ্যজন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ হইলে, আত্মার নামরূপাত্মক আবরণের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভেদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থূল আবরণ মনুষ্যের শুক্র-শোণিতাত্মক স্থূল দেহই। শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক্‌, মাংস ও কেশ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মানিয়া এই সমস্তকে বেদান্তী ‘অন্নময় কোষ’ বলেন। স্থূল কোষ ছাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্রমে বায়ুরূপী প্রাণ অর্থাৎ ‘প্রাণময় কোষ’, মন অর্থাৎ ‘মনোময় কোষ’, বুদ্ধি অর্থাৎ ‘জ্ঞানময় কোষ’ ও শেষে ‘আনন্দময় কোষ’ পাওয়া যায়। আত্মা তাহারও অতীত। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে আনন্দময় কোষের কথা বলিয়া, বরুণ ভৃগুকে আত্মস্বরূপের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন (তৈ. ২. ১-৫; ৩, ২-৬)। এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থূলদেহের কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চতন্মাত্রকে বেদান্তী ‘লিঙ্গ’ কিংবা ‘সূক্ষ্ম শরীর’ বলেন। তাঁহারা ‘একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে কিরূপে জন্ম লাভ হয়’ সাংখ্য শাস্ত্রের ন্যায় বুদ্ধির অনেক ‘ভাব’ মানিয়া ইহার উপপত্তি করেন না; তাহার বদলে এই সমস্ত কর্ম্মবিপাকের কিংবা কর্ম্মফলের পরিণাম,—ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই কর্ম্ম লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে অর্থাৎ আধারে অবস্থিত করে, এবং আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্ম্ম ও লিঙ্গশরীর দ্বারা তাহার সঙ্গে গিয়া আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, এইরূপ গীতাতে, বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, নামরূপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য পরমেশ্বররূপী হইবার পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভের পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম্ম এই দুয়েরই বিচার করা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই পূর্ব্বেই লিঙ্গশরীরের বিচার করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব না। যে কর্ম্মের দরুণ আত্মার ব্রহ্মজ্ঞান না হইয়া অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয় সেই কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে মনুষ্যের কিরূপ আচরণ করা উচিত, এই প্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি।

সৃষ্টির আরম্ভকালে মূলে অব্যক্ত ও নির্গুণ পরব্রহ্ম যে দেশকালাদি নানারূপাত্মক সগুণ শক্তি দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে প্রতীয়মান হয় বেদান্তশাস্ত্রে তাহারই নাম ‘মায়া’ (গী. ৭. ২৪. ২৫); এবং তাহার মধ্যে কর্ম্মেরও সমাবেশ হয় (বৃ. ১. ৬. ১)। অধিক কি, ‘মায়া’ ও ‘কর্ম্ম’ দুই-ই সমানার্থক বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না-কোন কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার হওয়া ব্যতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া কিংবা নির্গুণের সগুণ হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য আমি আমার মায়া দ্বারা প্রকৃতিতে জন্মিয়া থাকি (গী. ৪. ৬) প্রথমে ইহা বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতাতেই “অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে পঞ্চ-মহাভূতাদি বিবিধ সৃষ্টি হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্ম” এরূপ কর্ম্মের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৩) কর্ম্ম অর্থে ব্যাপার কিংবা ক্রিয়া; কিন্তু তাহা মনুষ্যকৃতই হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই হউক—এইরূপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তু যে কোন কর্ম্মই ধর না কেন, তাহার পরিণাম সর্ব্বদা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়া তাহার স্থানে অন্য নাম-রূপ করা; কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল দ্রব্য কখনো বদলায় না,—একই রকম থাকে। উদাহরণ যথা—বয়নক্রিয়া দ্বারা ‘সুতা’ এই নাম গিয়া সেই দ্রব্যেরই নাম হয় ‘বস্ত্র’; এবং কুম্ভকারের ব্যাপারে ‘মাটী’ এই নামের বদলে ‘ঘট’ এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার সময় কর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়া নাম ও রূপ এই দুইকেই কেহ কেহ ‘মায়া’ বলেন। তথাপি যখন কর্ম্মের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হয় তখন কর্ম্ম-স্বরূপ ও মায়াস্বরূপ একই, তাহা বলিবার সময় উপস্থিত হয়। তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম্ম, এই তিনই মূলে একস্বরূপই,—ইহা আরম্ভেই বলা অধিক সুবিধা। উহার মধ্যেও এই সূক্ষ্মভেদ করা যাইতে পারে যে, মায়া একটি সামান্য শব্দ; এই মায়ার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম “নামরূপ” এবং মায়ার ব্যাপারের বিশিষ্টার্থক নাম “কর্ম্ম”। কিন্তু সাধারণতঃ এই ভেদ দেখাইবার আবশ্যকতা না থাকায়, তিন শব্দ-কেই অনেক সময় সমান অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদন (কিংবা উপাধি=উপরে স্থাপিত আবরণ) আমাদের চোখে দেখা যায় তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে ‘ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি’ বলে। সাংখ্যবাদী পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বকে স্বয়ম্ভূ, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানেন। কিন্তু মায়া, নাম-রূপ কিংবা কর্ম্ম, ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র বলিয়া মানা ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও অনিত্য এই দুই কল্পনা পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায়, দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে স্বীকার করা যায় না। তাই বেদান্তীরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, বিনাশী প্রকৃতি কিংবা কর্ম্মাত্মক মায়া স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু এক নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও নির্গুণ পরব্রহ্মেতেই মনুষ্যের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সমূহ মায়া-দৃশ্য দর্শন করে। কিন্তু মায়া পরতন্ত্র এবং পরব্রহ্মেতেই এই মায়াদৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার মীমাংসা হয় না। গুণপরিণামে না হইলেও বিবর্ত্ত-বাদে নির্গুণ ও নিত্য ব্রহ্মেতে নশ্বর সগুণ নামরূপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা সম্ভব হইলেও এখানে এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ রূপ, নির্গুণ পরব্রহ্মের মধ্যে মূলারম্ভে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন্‌ ও কেন প্রকাশ পাইল? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও চিদ্রূপী পরমেশ্বর,

নামরূপাত্মক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্‌ ও কেন উৎপন্ন করিলেন ? কিন্তু ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনানুসারে এই বিষয় শুধু মনুষ্যের নহে, দেবতা ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় (ঋ. ১০. ১২৯ ; তৈ, ব্রা, ২. ৮. ৯), এই প্রশ্নের—"জ্ঞানদৃষ্টিতে নির্দ্ধারিত নির্গুণ পরব্রহ্মেরই ইহা এক অচিন্ত্য লীলা"—ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়া যায় না (বেসূ, ২. ১. ৩৩)। যখন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক নশ্বর কর্ম্ম কিংবা সগুণ মায়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—এইরূপ গোড়ায় ধরিয়া লইয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ম্ম অনাদি এইরূপ বেদান্ত-সূত্রে উক্ত হইয়াছে (বেসূ, ২. ১. ৩৫-৩৭), ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা 'আমারই মায়া' (গী. ৭. ১৪) এইরূপ বর্ণনা করিয়া পরে এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া ও পুরুষ উভয়ই 'অনাদি' বলিয়াছেন (গী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার শ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাঽবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য 'মায়া' 'শক্তিঃ' 'প্রকৃতি-রিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে' (বেসূ, শাংভা, ২. ১. ১৪)। "(ইন্দ্রিয়গণের) অজ্ঞানবশতঃ মূলব্রহ্মেতে কল্পিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের 'মায়া' 'শক্তি' কিংবা 'প্রকৃতি বলা হয়" ; এই নামরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের আত্মভূত স্বারা জানা যায়, কিন্তু ইহা জড় হওয়া প্রযুক্ত ইহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন (তত্ত্বান্যত্ব), এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য) বিস্তারের মূল, তাহা বলিতে পারা যায় না" ; এবং 'এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পক্ষে আবশ্যক ও অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপনিষদে অব্যক্ত, আকাশ, অক্ষর, এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে" (বেসূ. শাংভা, ১. ৪. ৩)। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্ময় (পুরুষ) ও অচেতন মায়া (প্রকৃতি), এই দুই তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানেন , কিন্তু বেদান্তী মায়ার অনাদিত্ব একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র স্বীকার করেন না ; এবং এই কারণে সংসারাত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ গীতায় উল্লেখ আছে—'ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো নচাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা" (গী. ১৫, ৩)—এই সংসারবৃক্ষের রূপ, অন্ত, আদি, মূল কিংবা তল পাওয়া যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' (গী. ৩. ১৫) ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে ; 'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ' (৩, ১৪) যজ্ঞও কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ; কিংবা 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা' (গী. ৩ ১০) ব্রহ্মদেব প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম্ম) একসঙ্গেই সৃষ্টি করিয়াছেন ;—এইরূপ যে বর্ণনা আছে তাহার তাৎপর্য্যও এই যে, "কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মরূপী যজ্ঞ, জগৎ অর্থাৎ প্রজা, এই সমস্ত এক সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে"। এখন এই জগৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদেব হইতে সৃষ্ট হইয়াছেই বলো কিংবা মীমাংসকের মতানুসারে সেই ব্রহ্মদেব নিত্য বেদশব্দ হইতে উহা উৎপন্ন করিয়াছেনই বলো, উভয়ের অর্থ একই (মভা, শাং ২৩১ , মনু ১, ২১)। সারকথা, কর্ম্ম অর্থে দৃশ্য জগতের সৃষ্টি হইবার সময় মূল নির্গুণ ব্রহ্মেতেই দৃশ্যমান ব্যাপার। এই ব্যাপারকেই নামরূপাত্মক মায়া বলা হয়, এবং এই

মূলকর্ম্ম হইতেই চন্দ্রসূর্য্যাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাপার পরে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (বৃ, ৩, ৮, ৯)। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের মূলভূত এই যে জগৎ উৎপত্তিকালের কর্ম্ম কিংবা মায়া তাহা ব্রহ্মেরই কোন এক অচিন্ত্য লীলা, স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুরুষেরা বুদ্ধির স্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। * কিন্তু জ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হওয়া প্রযুক্ত এই লীলা, নামরূপ কিংবা মায়াত্মক কর্ম্ম 'কখন্' উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই, কেবল কর্ম্মজগতেরই বিচার যখন করিতে হইবে, তখন এই পরতন্ত্র ও নশ্বর মায়া এবং মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গভূত কর্ম্মকেও 'অনাদি' বলা বেদান্তশাস্ত্রের রীতি (বেসূ. ২. ১. ৩৫)। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, সাংখ্যবাদীর ন্যায় অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে যে, মায়া বলতেই পরমেশ্বরের সমানই নিরারম্ভ ও স্বতন্ত্র ;—অনাদি শব্দে দুর্জ্ঞেয়ারম্ভ অর্থাৎ যাহার আদি (আরম্ভ) জানা যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু চিদ্রূপ ব্রহ্ম কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে কখন্ ও কেন প্রকাশিত হইলেন ইহার সন্ধান আমরা না পাইলেও এই মায়াত্মক কর্ম্মের পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাপারের নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। মূল প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ অনাদি মায়াত্মক কর্ম্ম হইতে জগতের নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অনুক্রমে উৎপন্ন হইল, অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে ইহার বিচার করা হইয়াছে ; সেইখানেই আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তুলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্র প্রকৃতিকে পরব্রহ্মের ন্যায় স্বয়ম্ভু বলিয়া মানে না সত্য ; কিন্তু প্রকৃতির পরবর্ত্তী বিস্তারের সাংখ্যোক্ত ক্রম বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করি নাই। কর্ম্মাত্মক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির যে ক্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাকে যে সাধারণ নিয়মে মনুষ্যকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় তাহার কোনই বিচার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই 'কর্ম্মবিপাক' বলে। এই কর্ম্মবিপাকের প্রথম নিয়ম এই যে, কর্ম্ম একবার সুরু হইলে তাহার ব্যাপার কিংবা চেষ্টা পরে অখণ্ডরূপে সমান চলিতে থাকে ; এবং ব্রহ্মার দিন শেষ হইয়া জগতের সংহার হইলেও এই কর্ম্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনর্ব্বার অঙ্কুর পূর্ব্ববৎ উদ্গত হয়। মহাভারতে উক্ত আছে যে,—

যেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥

অর্থাৎ "প্রত্যেক প্রাণী পূর্ব্বের সৃষ্টিতে যে যে কর্ম্ম করিয়াছে সেই সেই কর্ম্ম (তাহার ইচ্ছা হউক বা না হউক) সে যথাপূর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (মভা. শাং, ২৩১. ৪৮, ৪৯ ও গী, ৮. ১৮ ও ১৯ দেখ)। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" (গী. ৪. ১৭) কর্ম্মের গতি কঠিন ; শুধু তাহাই নহে, কর্ম্মের বন্ধনও অতীব কঠিন। কেহই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। কর্ম্মবশতই বায়ু বহিতেছে, কর্ম্মবশতই সূর্য্যচন্দ্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে ; এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আদি সগুণ দেবতারাও কর্ম্মবশতই কার্য্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন,

* What belongs to more appearance is necessarily subordinated to the nature of the thing in itself". Kant's Metaphysics of Morals (Abbot's trans. in Kant's Theory of Ethics P. 81)

ইন্দ্রাদির কথা দূরে থাক্! সগুণ অর্থে নামরূপাত্মক, এবং নামরূপাত্মক অর্থে কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মের পরিণাম। মায়াত্মক কর্ম্ম মূলারম্ভে কোথা হইতে আসিল ইহা যখন বলা যায় না, তখন তদঙ্গভূত মনুষ্য এই কর্ম্মের ফেরে প্রথমে কিরূপে আবদ্ধ হইল তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়? কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক না, সেই কর্ম্মের ফেরে একবার আট্‌কা পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাশ হইলে কর্ম্মের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শাস্ত্রীরাও এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্ম্মশক্তির কখনই নাশ হয় না; যে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখা যায়, তাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়া থাকে। * এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয় তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরূপও মানিতে পারা যায় না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই নামরূপাত্মক পরম্পরাকেই জন্ম-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে; এবং এই নামরূপের আধারভূত শক্তির নাম সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিরূপে জীবাত্মা হইয়াছে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে, এই আত্মা জন্মেও না মরেও না; ইহা নিত্য ও চিরস্থায়ী। কিন্তু কর্ম্মের ফেরে আট্‌কা পড়ায় এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহা করিবে তাহার ভোগ কাল হইবে, কাল যাহা করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে; শুধু তাহা নহে, এই জন্মে যাহা করিবে তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে;—এইরূপে এই ভবচক্র সর্ব্বদাই চলিতেছে। কেবল আমাদের নহে, কখনো কখনো আমাদের নামরূপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদেরও এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (মনু. ৪. ১৭৩; মভা, আ, ৮০. ৩)। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

পাপং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিদ্‌যদি তস্মিন্ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি চ নপ্তৃষু ॥

"হে রাজন্! কোন পাপকর্ম্মের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও সেই কর্ম্মফল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের ভুগিতে হয়" (শাং, ১২৯. ২১); কোন কোন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, কেহ জন্ম হইতেই দরিদ্র হয় এবং কেহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহারও উপপত্তি

* এই কল্পনা কেবলী হিন্দুধর্ম্মের কিংবা আস্তিকবাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ নহে। বৌদ্ধেরা আত্মা না মানিলেও বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত পুনর্জন্মের কল্পনা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আপন ধর্ম্মের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশ শতাব্দীতে "পরমেশ্বর মরিয়াছেন" এইরূপ যিনি বলেন সেই পাক্কা নিরীশ্বরবাদী জর্ম্মণ পণ্ডিত নিৎশেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মশক্তির যে রূপান্তর নিয়ত হইয়া থাকে তাহা সীমাবিশিষ্ট এবং কাল অনন্ত হওয়া প্রযুক্ত, যে নামরূপ একবার হইয়াছে তাহা কখনো না কখনো পরে উৎপন্ন হইবেই এবং সেইজন্য কর্ম্মের চক্র কিংবা ফের নিছক্ আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই সিদ্ধ হয়, এবং এইরূপ কল্পনা ও উপপত্তি আমাদের বুদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়—এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন! Nietzche's Eternal Recurrence, (Complete Works, Eng. Trans, Vol. XVI. PP. 25-253)

কর্ম্মবাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এবং অনেকের মতে, ইহাই কর্ম্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ। কর্ম্মের এই চক্র 'বা চাকীকল' একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও তাহা বন্ধ করিতে পারেন না। সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্ম্মফলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না (বেসূ, ৩. ২. ৩৮; কৌ, ৫. ৮); এবং সেই জন্য, "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" (গী, ৭. ২২)—আমার নির্দ্দিষ্ট বাঞ্ছিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়—এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন (কিন্তু কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভাল মন্দ কর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তুত উদাসীন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভালমন্দের ভেদ হইলেও পরমেশ্বর বৈষম্য (বিষম বুদ্ধি) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের পাত্র হন না, এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত (বেসূ, ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (গী. ৯. ২৯)—ঈশ্বর সকলের সম্বন্ধেই সমান; কিংবা—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ॥

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, কর্ম্ম কিংবা মায়ার স্বাভাবিক চক্র চলিতে থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্ম্মানুরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫. ১৪. ১৪) সারকথা, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জাগতিক কর্ম্মের কখন্ আরম্ভ হইয়াছে কিংবা তদঙ্গভূত মনুষ্য প্রথমে কর্ম্মের চক্রে কিরূপ পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্ম্মের পরবর্ত্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন জগতের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্মক অনাদি কর্ম্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' এই যে বচন এই প্রকরণের আরম্ভেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থই এই।

এই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহের পর্য্যায়শব্দ অনেক, যথা, সংসার, প্রকৃতি, মায়া, দৃশ্য, জগৎ, জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি। কারণ সৃষ্টিশাস্ত্রের নিয়ম নামরূপের মধ্যে অবস্থিত পরিবর্ত্তনেরই নিয়ম, এবং এই দৃষ্টিতে দেখিলে, সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্র নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন সুদৃঢ় ও সর্ব্বব্যাপী। তাই, এই নামরূপাত্মক মায়ার কিংবা দৃশ্যজগতের অতীত অথবা মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তত্ত্ব নাই। এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের ন্যায় নিছক্ আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞ এই জগৎচক্র যে দিকে টানিবে মনুষ্যকে সেইদিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব কিংবা অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের যে ধারণা, তাহা নিছক্ ভ্রান্তি; আত্মা কিংবা পরমাত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এবং অমৃতত্বও মিথ্যা; শুধু তাহাই নহে, এই জগতে কোন মনুষ্যই আপন ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না—তাহার সে স্বাতন্ত্র্য নাই। মনুষ্য আজ যে কাজ করে, তাহা পূর্ব্বে তাহার নিজের কিংবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা কৃত কর্ম্মেরই পরিণাম; সুতরাং উক্ত কাজ করা কিংবা না করা, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

উদাহরণ যথা—অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে উহা চুরি করিব এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও, উৎপন্ন হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে ঐ বস্তু চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, 'অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ' (গী. ৩. ৩৬) ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে—এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র একইরূপ উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রম নাই, তাহা হইতে মুক্ত হইবারও পথ নাই, ইহাই এই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। এই মতানুসারে দেখিলে মানিতে হইবে যে, মনুষ্যের আজ যে, বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা হইতেছে তাহা কল্যকার কর্ম্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কর্ম্মের ফল; এবং শেষে এই কারণপরম্পরার অন্ত না পাওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে কখনই কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহা পূর্ব্বকর্ম্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল—কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মেরই লোকে 'দৈব' নাম দিয়া থাকে। এইরূপ, যদি কোন কাজ করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্যই মনুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন আচরণ অমুক প্রকারে সংশোধন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নদীর প্রবাহে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, মায়া, প্রকৃতি, সৃষ্টি-ক্রম, কিংবা কর্ম্মপ্রবাহ যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে—তাহাতে প্রগতিই হউক বা অধোগতিই হউক। এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী এইরূপ বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়; এই কারণে যে জাগতিক নিয়মে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিয়া মনুষ্য আপনার লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্য জগৎকে বদলাইয়া লইবে; এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে এই নীতিসূত্র অনুসারেই অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ শক্তিকে মনুষ্য আপনার কাজে লাগাইয়া থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, চেষ্টার দ্বারা মনুষ্যস্বভাবও ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, ইহাও অনুভূতির বিষয়। কিন্তু জগৎসৃষ্টির কার্য্যে কিংবা মনুষ্যের স্বভাবে পরিবর্ত্তন হয় বা হয় না, কিংবা পরিবর্ত্তন হইতে হইবে কি না—ইহা উপস্থিত প্রশ্ন নহে; এই পরিবর্ত্তন করিবার যে বুদ্ধি বা ইচ্ছা মনুষ্যের হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে কি না ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে। এবং আধিভৌতিক শাস্ত্রদৃষ্টিতে, এই বুদ্ধি হওয়া বা না হওয়া যদি 'বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী' এই নীতি অনুসারে প্রকৃতির, কর্ম্মের, কিংবা জগতের নিয়মে প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রানুসারে কোন কর্ম্ম করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্য মনুষ্যের নাই, এইরূপই নিষ্পন্ন হয়। এই মতবাদকে 'বাসনা-স্বাতন্ত্র্য' 'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য' কিংবা 'প্রবৃত্তি স্বাতন্ত্র্য' বলে। শুধু কর্ম্মবিপাকের কিংবা শুধু আধিভৌতিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই যদি বিচার করা যায় তবে কোন মনুষ্যেরই কোন প্রকার প্রবৃত্তি স্বাতন্ত্র্য বা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য নাই—কর্ম্মের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর চাকার মতো প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে মনুষ্যের অন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহে। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণ বলে যে, সূর্য্যকে পশ্চিমদিকে উদিত করিবার সামর্থ্য আমার না থাকিলেও আমার এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি,

তাহার সারাসার বিচারপূর্ব্বক করা বা না করা, কিংবা যখন আমার সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দুই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই দুই মার্গের মধ্যে ভাল কিংবা মন্দকে স্বীকার করা আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে। এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। যদি মিথ্যা বলো, তবে, এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়া হত্যা প্রভৃতি অপরাধকারীকে অপরাধ স্থির করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়, আর যদি সত্য বলিয়া মানো তবে কর্ম্মবাদ, কর্ম্মবিপাক, কিংবা দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল জড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেরই বিচার করা হয় বলিয়া এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না। কিন্তু যে কর্ম্মযোগশাস্ত্রে জ্ঞানবান মনুষ্যকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার করিতে হয়, তাহাতে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ায় তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কারণ, মনুষ্যের কোনই প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্য নাই এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবে, কিংবা অমুক কার্য্য করিবে এবং অমুক কার্য্য করিবে না, অমুক ধর্ম্ম্য, অমুক অধর্ম্ম্য ইত্যাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের সমস্ত গোলযোগই স্বতই অন্তর্হিত হইবে (বেসূ, ২. ৩. ৩৩) * এবং তখন পরম্পরাক্রমে কিংবা প্রত্যক্ষ রীতিতে মহামায়া প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুরুষার্থ হইবে। অথবা পুরুষার্থই কেন?—আপনার অধীনে থাকার কথা হয় তো পুরুষার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার বলিয়া তিলমাত্র সত্তা বা ইচ্ছা রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা কিংবা দাস্য ছাড়া আর অন্য কি হইতে পারে? লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির হুকুমে খাটিয়া মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন 'পদার্থধর্ম্মের শৃঙ্খল' নিত্য আমাদের পায়ে পরিতে হয়! আমাদের দেশে কর্ম্মবাদে কিংবা দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত ভবিতব্যতাবাদে এবং আধুনিক কালে শুদ্ধ আধিভৌতিক শাস্ত্রে সৃষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; এখনও চলিতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত এইখানে বলা অসম্ভব বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রেও ভগবদ্গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি।

কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্ম্ম একবার সুরু হইলে কর্ম্মচক্রের উপর পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না সত্য। তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, দৃশ্যজগৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্ম্মমাত্র নহে; কিন্তু এই নামরূপাত্মক আবরণের নীচে আধারভূত এক আত্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্রহ্মজগৎ আছে এবং মনুষ্যের দেহান্তর্ভূত আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্রহ্মেরই অংশ। এই সিদ্ধান্তের সহায়তায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহা অনিবার্য্য বাধা বলিয়া মনে হয় সেই বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ার শেষ অংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। যেরূপ কর্ম্ম করিবে

* বেদান্তসূত্রের এই অধিকরণকে 'জীবকর্ত্তৃত্বাধিকরণ' বলে। তাহার প্রথম সূত্রই "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ বিধিনিষেধশাস্ত্রে অর্থস্বত্ত্ব হইবার জন্য জীবকে কর্ত্তা বলিয়া মানা আবশ্যক হয়। পাণিনির "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" সূত্রের (পা, ১, ৪. ৫৪) 'কর্ত্তা' শব্দেই আত্মস্বাতন্ত্র্য বুঝায়, এবং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই অধিকরণ ইহারই সংক্রান্ত।

সেইরূপ ভোগ হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না ; পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র, এমন-কি সমস্ত জগতের পক্ষেও ইহা উপযোগী। নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতেই হয় এবং পরিবারের মধ্যে, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্যের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল শুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কর্ম্মের ফলও অংশতঃ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই বিচার করা হয় বলিয়া কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়াতে কর্ম্মবিভাগ প্রায় একটা মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই করা হয়। উদাহরণ যথা,—মনুষ্যকৃত অশুভ কর্ম্মের—কায়িক, বাচিক ও মানসিক—মনু এই তিন ভেদ করিয়া, ব্যভিচার, হিংসা ও চৌর্য্য এই তিনটাকে কায়িক ; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া বলা ও প্রলাপ বকা এই চারিটাকে বাচিক ; এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, অন্যের মন্দ চিন্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা এই তিনটিকে মানসিক—এই প্রকারে সবশুদ্ধ দশ প্রকার অশুভ কিংবা পাপ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া (মনু. ১২. ৫-৭ ; মভা. অনু. ১৩), সেই সব কর্ম্মের ফলও বলিয়াছেন। তথাপি এই ভেদ চিরস্থির নহে। কারণ এই অধ্যায়েই পরে সমস্ত কর্ম্মের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভেদ করা হইয়াছে এবং প্রায় ভগবদ্‌গীতার বর্ণনানুসারেই এই তিন প্রকার গুণের কিংবা কর্ম্মের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৪. ১১-১৫ ; ১৮. ২৩-২৫ ; মনু. ১২. ৩১-৩৪)। কিন্তু কর্ম্মবিপাক প্রকরণে কর্ম্মের যে বিভাগ সাধারণত পাওয়া যায় তাহা এই দুই হইতেও ভিন্ন ; তাহাতে কর্ম্মের সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ, এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে। কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করিয়াছে—তাহা এই জন্মেই করা হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক—সে সমস্তকে তাহার 'সঞ্চিত' কর্ম্ম বলে। এই 'সঞ্চিতের' অপর নাম 'অদৃষ্ট' এবং মীমাংসকদিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম 'অপূর্ব্ব'। এই নাম হইবার কারণ এই যে, কর্ম্ম কিংবা ক্রিয়া যে সময় করা হয়, শুধু সেই সময়েই তাহা দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়া গেলে পরে সেই কর্ম্ম স্বরূপত অবশিষ্ট না থাকায় তাহার সূক্ষ্ম সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিশিষ্ট পরিণামই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (বে. সূ. শাং ভা. ৩. ২. ৩৯, ৪০)। যাহাই বলনা কেন, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, 'সঞ্চিত', 'অদৃষ্ট' কিংবা 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি। এই সঞ্চিত কর্ম্ম সমস্ত একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে কিছু ভাল ও কিছু মন্দ অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ যথা—কোন সঞ্চিত কর্ম্ম স্বর্গপ্রদ এবং কোনটী নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না—একটার পর একটা ভোগ করিতে হয়। তাই 'সঞ্চিতের' মধ্যে যে কর্ম্মের ফল প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকেই 'প্রারব্ধ' অর্থাৎ সুরু-হওয়া 'সঞ্চিত' বলে। ব্যবহারে সঞ্চিতের অর্থেই 'প্রারব্ধ' শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল। শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে, 'সঞ্চিতের' অর্থাৎ সমস্ত ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবান্তর ভেদকেই 'প্রারব্ধ' বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রারব্ধ কিছু সমস্ত সঞ্চিত নহে ; সঞ্চিতের মধ্যে যে অংশের ফলের (কার্য্যের) ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই প্রারব্ধ ; এবং সেইজন্য এই প্রারব্ধেরই আর এক নাম—আরব্ধ কার্য্য। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়মাণ বলিয়া কর্ম্মের তৃতীয় আর এক ভেদ আছে। "ক্রিয়মাণ"—ইহা

বর্ত্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত শব্দ এবং তাহার অর্থ—"যাহা এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহা এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।" কিন্তু এক্ষণে আমরা যাহা কিছু করিতেছি তাহা সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ প্রারব্ধেরই পরিণাম ; তাই কর্ম্মের এই তৃতীয় 'ক্রিয়মাণ' ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারব্ধ কারণ এবং ক্রিয়মাণ তাহার ফল অর্থাৎ কার্য্য, দুয়ের মধ্যে এই ভেদ করা যাইতে পারে সত্য ; কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায় এই ভেদের কোন উপযোগ হইতে পারে না। সঞ্চিতের মধ্যে প্রারব্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকে তাহা দেখাইবার জন্য ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদান্তসূত্রে প্রারব্ধকেই 'প্রারব্ধকার্য্য' এবং যাহা প্রারব্ধ নহে, তাহাকে অনারব্ধ কার্য্য বলা হইয়াছে (বেসূ. ৪. ১. ১৫)। আমার মতে, সঞ্চিত কর্ম্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্য এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাই, 'ক্রিয়মাণ'কে ধাতুসাধিত বর্ত্তমানকাল-বাচক মনে না করিয়া "বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্‌বা" এই পাণিনিসূত্র অনুসারে (পা. ৩. ৩. ১৩১) ভবিষ্যৎকালবাচক মনে করিলে তাহার অর্থ "যাহা শীঘ্রই পরে ভোগ করিতে হইবে" এইরূপ করিতে পারা যায় ; এবং তখন "ক্রিয়মাণ" এরই অর্থ 'অনারব্ধ কার্য্য' এইরূপ হইবে ; 'প্রারব্ধ' ও 'ক্রিয়মাণ' এই দুই শব্দ অনুক্রমে বেদান্তসূত্রের 'আরব্ধকার্য্য' ও 'অনারব্ধকার্য্য' এই দুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে। কিন্তু 'ক্রিয়মাণ' এর সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করে না ; ক্রিয়মাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ম্ম এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারব্ধের ফলকেই ক্রিয়মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম্ম অনারব্ধকার্য্য তাহা বুঝাইবার জন্য সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্দই পর্য্যাপ্ত হয় না, এই একটা বড় রকমের আপত্তি উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণশব্দের রূঢ়ার্থ ছাড়াও ভাল নহে। এই কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের এই লৌকিক ভেদ স্বীকার না করিয়া প্রারব্ধ-কার্য্য ও অনারব্ধ কার্য্য এই দুই বর্গে আমি উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই শাস্ত্রদৃষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। 'ভোগ কর' এই ক্রিয়ার, ভুক্ত (অতীত), ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে (বর্ত্তমান) এবং পরে ভোগ করিতে হইবে (ভবিষ্যৎ) এইরূপ কালকৃত তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়াতে এইরূপ কর্ম্মের তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়া ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্ব্বার সঞ্চিতের মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাই কর্ম্মভোগের বিচার করিবার সময় সঞ্চিতের (১) ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারব্ধ এবং (২) আরম্ভ না হইলে অনারব্ধ—এই দুই ভেদ হইতে পারে ; ইহার অধিক বর্গে "সঞ্চিত"কে বিভক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমস্ত কর্ম্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিবার পর, তাহার উপভোগ সম্বন্ধে কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়া এই বলে যে, সঞ্চিত সমস্তই ভোগ্য। তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়া এই দেহ কিংবা জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়,—অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়াছে তাহার ভোগ ব্যতীত অব্যাহতি নাই "প্রারব্ধ-কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"। হাত হইতে বাণ একবার মুক্ত হইলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই যায় ; কিংবা কুম্ভকারের চাকা একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহা যেরূপ উক্ত গতির শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে,

প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। যাহা সুরু হইয়াছে তাহার শেষ হওয়া চাই ; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারব্ধকার্য কর্ম্মের বিষয়ে সে বিধি নহে—এই সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ নাশ করা যাইতে পারে। প্রারব্ধকার্য্য ও অনারব্ধকার্য্যে এই যে গুরুতর ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হওয়া পর্য্যন্ত,—শান্তভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেইরূপ না করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করিলে—জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলেও—দেহারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (বে, সূ. ৪. ১. ১৩-১৫ ; সা. কা. ৬৭)। ইহা ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা এক নূতন কর্ম্ম হইবে এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য নবজন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতেও আত্মহত্যা করা নির্ব্বুদ্ধিতা।

কর্ম্মফলভোগদৃষ্টিতে কর্ম্মের কি কি ভেদ তাহা বলা হইল। এক্ষণে, কর্ম্মের বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিচার করিব। প্রথম যুক্তি কর্ম্মবাদীদিগেরই। অনারব্ধকার্য্য অর্থে পরে ভোগার্থ সঞ্চিত কর্ম্ম, তাহা উপরে বলিয়াছি—তাহা এই জন্মেই ভোগ করিতে হউক কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক। কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোন কোন মীমাংসক কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার মতে মোক্ষলাভের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে মীমাংসকদৃষ্টিতে সমস্ত কর্ম্মের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে। তাই, এই দুই কর্ম্ম করিতেই হইবে, এইরূপ মীমাংসকেরা বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই ; এবং কাম্য কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহাও করিতে নাই। এই প্রকার বিভিন্ন কর্ম্মের পরিণামের তারতম্য বিচার করিয়া মনুষ্য কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে এবং কোন কর্ম্ম যথাশাস্ত্র করিতে থাকিলে সে আপনাআপনি মুক্ত হইবে। কারণ এই জন্মের ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান হয় ; এবং এই জন্মে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকতা থাকে না। ইহলোক, নরক ও স্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইরূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে 'কর্ম্মমুক্তি' কিংবা 'নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি' বলে। কর্ম্ম করিলেও যাহা না করার সমান হয়, অর্থাৎ যখন কর্ম্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্ত্তার হয় না, সেই অবস্থাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলে। কিন্তু মীমাংসকদিগের উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্কর্ম্ম্য পূর্ণরূপে সাধিত হয় না, ইহা বেদান্তশাস্ত্র স্থির করিয়াছেন (বেসূ. শাং. ভা. ৪ ৩. ১৪) ; এবং গীতাতেও এই অভিপ্রায়েই "কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, এবং কর্ম্ম ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় না"—উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ৪)। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে

যে, গোড়ায় সমস্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করাই দুঃসাধ্য ; এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে শুধু নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিত হয় না। তথাপি উক্ত বিষয় সম্ভব বলিয়া মানিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে কিংবা না করিলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের সমষ্টি শেষ হয়, মীমাংসকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না। কারণ, দুই 'সঞ্চিত' কর্ম্মের ফল পরস্পরবিরোধী—উদাহরণ যথা, একের ফল স্বর্গসুখ এবং অন্যটির ফল নরকযাতনা হইলে, তাহা একই কালে ও একই স্থলে ভোগ করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারব্ধকর্ম্মের দ্বারা এবং এই জন্মে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। মহাভারতের পরাশরগীতায় আছে—

কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥

"কখনো কখনো মনুষ্যের সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য (উহা নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়া) চুপ করিয়া বসিয়া থাকে" (মভা. শাং, ২৯০. ১৭) ; এবং এই নীতিসূত্রই সঞ্চিত পাপকর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চিতকর্ম্মভোগ এইরূপে একই জন্মে শেষ না হইয়া এই সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে অনারব্ধ-কার্য্যরূপ এক অংশ সর্ব্বদা অবশিষ্টই থাকে ; এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম্ম উপরি-উক্ত যুক্তিতে সাধন করিলেও অবশিষ্ট অনারব্ধকার্য্যের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হয়। তাই, মীমাংসকদিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এই পথের কথা বলা হয় নাই। কেবল তর্কের জোরে ইহাকে খাড়া করা হইয়াছে ; ঐ তর্কও শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না। সারকথা, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার আশা অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়া পার করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই যুক্তি স্বীকার না করিয়া, আগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া নিরুদ্যোগী হইয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের বন্ধন ঘুচিবে এইরূপ যদি বলো, তবে তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অনারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে কর্ম্মত্যাগের আগ্রহ ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—এই দুই-ই তামসিক কর্ম্ম হইয়া যায় ; এবং এই তামসিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতেই হয় (গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ)। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত শ্বাসোচ্ছ্বাস, কিংবা শোওয়া, বসা ইত্যাদি কর্ম্ম চলিতে থাকায় সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আগ্রহও ব্যর্থই হয়,—এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম ছাড়িতে পারে না, গীতায় অনেক স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৩, ., ১৮, ১১ দেখ)।

কর্ম্ম ভালোই হউক বা মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-না-কোন জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; কর্ম্ম অনাদি, তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না ; সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব ; এবং মীমাংসকের কথা অনুসারে কোন কর্ম্ম করিলে এবং কোন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না—ইত্যাদি বিষয় সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্মাত্মক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মূলে স্থিত অমৃত ও অবিনাশী তত্ত্বে

মিলিত হইবার জন্য মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত করিবার কোন্ পথ, এই প্রথম প্রশ্নটী পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়। বেদে ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যাগযজ্ঞাদি পারলৌকিক কল্যাণের বহুবিধ সাধন বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রদৃষ্টিতে সে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইলে, দীর্ঘকালেই হউক না কেন—কখনো-না-কখনো নীচের কর্ম্মভূমিতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেই হয় (মভা. বন, ২৫৯, ২৬০, গী. ৮, ২৫ ও ৯, ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মের কাইচী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অমৃততত্ত্বে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্ঝাট চিরকালের জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে; এই ঝঞ্ঝাট দূর করিবার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানই একমাত্র পন্থা। 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরূপাত্মক সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে; এস্থলে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকে 'বিদ্যা'ও বলে; এবং "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে"—মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারাই বন্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়—এই প্রকরণের আরম্ভে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে "বিদ্যা" শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতে—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

"জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হয়" (গী. ৪, ৩৭), ইহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; মহাভারতেরও দুই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,—

বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥

"দগ্ধ বীজ যেরূপ গজায় না সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা (কর্ম্মের) ক্লেশ, দগ্ধ হইলে তাহা আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না" (মভা. বন. ১৯৯. ১০৬. ১০৭, শা ২১১; ১৭)। উপনিষদেও এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিবার অনেক বচন আছে—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (বৃ. ১. ৪. ১০)—আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত ব্রহ্ম হয়; যেমন পদ্মপত্রে জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কর্ম্ম দূষিত করিতে পারে না (ছাং, ৪. ১৪. ৩), ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে লাভ করে (তৈ, ২. ১), যে সমস্তই আত্মময় জানিয়াছে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না (বৃ, ৪. ৪, ২৩); "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বে, ৫. ১৩. ৬. ১৩) পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে" মুং ২. ২. ৮)—পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে পর তাহার সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়; 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে (ঈশা. ১১ মৈত্র্যু, ৭, ৯) বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়; 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (শ্বে, ৩, ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই। এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কর্ম্মময় হইলেও তাহা এই জগতের আধারভূত পরব্রহ্মেরই লীলা হওয়া প্রযুক্ত কোন কর্ম্মই পরব্রহ্মকে যে বন্ধন করিতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিলেও পরব্রহ্ম অলিপ্তই থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কর্ম্ম (মায়া) এবং ব্রহ্ম এই দুই বর্গে বিভক্ত, ইহা এই প্রকরণের আরম্ভেই

বলা হইয়াছে। তাই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই দুই বর্গের মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে হইবে। এই এক মার্গই তাহার নিকট উন্মুক্ত। কারণ, সমস্ত বিষয়ের কেবল দুই বর্গ হওয়ায় কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ কি, আগে তাহা ঠিক জানা আবশ্যক। নচেৎ এক করিতে গিয়া আর এক হইয়া সমস্ত ব্যর্থ হইবে! "বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণো রচয়ামাস বানরম্"—অর্থাৎ "গণেশ করিতে বানর" হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্মশাস্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যের ও ব্রহ্মের অলিপ্ততার জ্ঞান পাইয়া তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখাই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত সাধন। "কর্ম্মে আমার কোনই আসক্তি নাই; তাই কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না—এবং এই তত্ত্ব যে জানিয়াছে সে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়" এইরূপ ভগবান গীতায় যাহা বলিয়াছেন (গী ৪. ১৪, ১৩. ২৩) তাহার তাৎপর্য্যও এই। এই স্থানে 'জ্ঞান' অর্থে শুধু শাব্দিক জ্ঞান কিংবা শুধু মানসিক ক্রিয়া নহে; কিন্তু বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্ভেই কথিত অনুসারে 'জ্ঞান' অর্থে মানসিক জ্ঞান প্রথমে হইলে পর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে পর ব্রহ্মীভূত হইবার অবস্থা বা ব্রাহ্মী স্থিতি"—এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইবেনা। পূর্ব্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতেও "জ্ঞানেন কুরুতেযত্নংযত্নেন প্রাপ্যতে মহৎ"—জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে পর মনুষ্য যত্ন করে এবং এই যত্নের দ্বারাই মহৎতত্ত্ব (পরমেশ্বর) প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জনক সুলভাকে বলিয়াছেন (শাং, ৩২০ ৩০)। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে—ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্ত্র কখনই বেশী বলিতে পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্গে কোন কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপসারিত করিয়া পথ পরিষ্কার করা এবং সেই পথে চলিতে চলিতে শেষে ধ্যেয় বস্তুকে লাভ করা—এই সমস্ত কার্য্য প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রযত্নও পাতঞ্জল যোগ, অধ্যাত্মবিচার, ভক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে (গী ১২. ৮. ১২), এবং সেই জন্য, অনেক সময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া যায়। তাই গীতায় প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মুখ্যমার্গ বলিয়া তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে যম-নিয়ম আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অঙ্গভূত সাধনাদিরও বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্ম্মযোগ আচরণ করিয়াই অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা কিংবা তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা উক্ত হইয়াছে (গী, ১৮. ৫৬)।

কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্ম্মত্যাগ নহে; ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকিলেই শেষে মোক্ষলাভ হয়; কর্ম্মত্যাগ করা ভ্রম 'কারণ কর্ম্ম হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না'—ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে নির্ব্বিবাদ নির্দ্ধারিত হইলেও এই প্রথমবার প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয় যে, এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য জ্ঞানলাভের যে চেষ্টা আবশ্যক সেই চেষ্টা কি মনুষ্যের

সাধ্যায়ত্ত ? কিংবা নামরূপ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতি যে দিকে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে ? ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন যে, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি (গী ৩. ৩৩)—নিগ্রহ কি করিবে ? প্রাণীমাত্রই আপন আপন প্রকৃতির পথেই চলিয়া থাকে ; মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি"—তোমার প্রতিজ্ঞা নিরর্থক, তুমি যেদিকে যাইতে চাহিবে না, সেইদিকে প্রকৃতি তোমাকে টানিবে (গী. ১৮. ৫৯ ; ২. ৬০) বলিয়াছেন ; আবার মনুও—"বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" (মনু. ২. ২১৫)—বিদ্বানকেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে—এইরূপ বলিয়াছেন। কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তও তাহাই। কারণ, মনুষ্যের মনের সমস্ত প্রেরণা পূর্ব্বকর্ম্মবশতই উৎপন্ন হয় এইরূপ মানিলে, এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে, এইরূপে সর্ব্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, এইরূপ অনুমান না করিলে চলে না। অধিক কি, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও কর্ম্ম ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলেও চলে। এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহই স্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে। অধ্যাত্মশাস্ত্র এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য-জগতের আধারভূত যে তত্ত্ব তাহাই মনুষ্যের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মনুষ্যের কার্য্যের যে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই দুই দিক হইতেই করা আবশ্যক। তন্মধ্যে, আত্মস্বরূপী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র অদ্বিতীয় হওয়া প্রযুক্ত কখনই পরতন্ত্র হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে হইলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থায়ী হওয়া চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্মক কর্ম্মই সেই অন্য পদার্থ। কিন্তু এই কর্ম্ম অনিত্য ও মূলে পরব্রহ্মেরই লীলা হওয়ায়, পরব্রহ্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলেও তাহা পরব্রহ্মকে কখনই দাস করিতে পারে না, ইহা নির্ব্বিবাদ। তাছাড়া, যে আত্মা কর্ম্মজগতের ব্যাপারাদির একীকরণ করিয়া জগৎ জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কর্ম্মজগৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই হওয়া চাই ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাই পরব্রহ্ম ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই দুই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক প্রকৃতিসত্তার বাহিরের বস্তু, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত, ইহার বাহিরে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান মনুষ্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই পরমাত্মারই অংশ জীবাত্মা মূলে শুদ্ধ মুক্তস্বভাব, নির্গুণ ও অকর্ত্তা হইলেও দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়গণের গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া পড়ায় তাহা মনুষ্যের মনে যে স্ফুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভবরূপী জ্ঞান আমাদের হইতে পারে। মুক্ত বাষ্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও তাহা কোন ভাণ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেরূপ সেই চাপ পড়ে, সেই নিয়মেই অনাদি-পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরমাত্মারই অংশভূত জীব (গী. ১৫. ৭) আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই গণ্ডী হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার মতো অর্থাৎ মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্দ্রিয়দিগের হয় ; এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 'আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি' বলে। 'ব্যবহার দৃষ্টিতে' বলিবার কারণ এই যে, শুদ্ধ মুক্তাবস্থায় কিংবা 'তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে' আত্মা ইচ্ছারহিত ও অকর্ত্তা, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই (গী. ১৩. ২৯ ; বেসূ, শাংভা, ২. ৩. ৪০)। কিন্তু এই প্রকৃতি আপনা হইতে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করে, সাংখ্যের ন্যায়

বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানিলে, জড়প্রকৃতি অন্ধভাবে অজ্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে হয়। এবং মূলে যে আত্মা অকর্ত্তা সে স্বতন্ত্র ভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপনার স্বাভাবিকগুণকেই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। তাই, আত্মা মূলে অকর্ত্তা হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হউক একবার এইরূপ আগন্তুক প্রবর্ত্তকতা তাহাতে আসিলে, তাহা কর্ম্মের নিয়ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, বেদান্তশাস্ত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্যের উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়া থাকে। "স্বতন্ত্র" অর্থে নির্নিমিত্তক নহে এবং আত্মা আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্ত্তাও হয় না। কিন্তু বারম্বার এই লম্বা চৌড়া কর্ম্মকথা বলিতে না বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কিংবা প্রেরণা এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে। আত্মা বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গৃহীত স্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্যজগতের পদার্থ-সমূহের সংযোগে ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই দুই একেবারে ভিন্ন। 'খাও, পিয়ো মজা লুটো'—ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা ; এবং আত্মার প্রেরণা মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মজগতের ; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের ; এবং এই দুই প্রেরণা প্রায় পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়। ইহাদের ঝগড়ার সময় যখন মনে সন্দেহ হয় তখন কর্ম্মজগতের প্রেরণাকে স্বীকার না করিয়া (ভাগ. ১১. ১০. ৪), যদি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার স্বতন্ত্র প্রেরণা অনুসারে কাজ করে—এবং ইহাকেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান কিংবা প্রকৃত আত্মনিষ্ঠা বলে—তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষানুকূলই হইবে ; এবং শেষে—

> বিশুদ্ধধর্ম্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্।
> বিমলাত্মা চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মনা।
> স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে ॥

"মূলে স্বতন্ত্র শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল ও স্বতন্ত্র পরমাত্মাতে মিলিত হয় (মভা. শাং ৩০৮. ২৭. ৩০)। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ যাহা উপরে বলা হইয়াছে তাহার অর্থই এই। কিন্তু উল্টাপক্ষে, জড় ইন্দ্রিয়গণের প্রাকৃত ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ শারীর আত্মার ইন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করাইতে এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের এই যে স্বতন্ত্র শক্তি তাহা মনে করিয়াই ভগবান—

> উদ্ধরেদাত্মনাঽঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

"মনুষ্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে ; আপনি আপনাকে অবসন্ন করিবে না ; কারণ (প্রত্যেকেই) আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী) এবং আপনিই আপনার শত্রু (অনিষ্টকারী)" (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতন্ত্র্যের অর্থাৎ স্বাবলম্বনের তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্ঠে দৈবের নিরাকরণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে (যো. ২. সর্গ ৪-৮)। সর্ব্বভূতে একই আত্মা, এই তত্ত্বটি বুঝিয়া এই অনুসারে যে মনুষ্য আচরণ করে তাঁহারই আচরণকে

সদাচরণ কিংবা মোক্ষানুকূল আচরণ বলে ; এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বদ্ধ জীবাত্মারও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হওয়ায় দুরাচারী মনুষ্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিজ কর্ম্মের জন্য দুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে। আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদ্‌বিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার স্বতন্ত্র স্ফুরণ বলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধিইন্দ্রিয় জড়প্রকৃতিরই বিকার হওয়ায় উহা আপনারই প্রেরণা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা কর্ম্মজগতের বাহিরের আত্মা হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাত্য পন্ডিতদিগের 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' শব্দও বেদান্ত-দৃষ্টিতে ঠিক্ নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে অষ্টম প্রকরণে বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্ম্মাত্মক জড়প্রকৃতির অসম্বেদ্য বিকার হওয়া প্রযুক্ত এই দুই আপনা হইতে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তাই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা আত্মারই—এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আত্মার এই স্বাতন্ত্র্য কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্মার অংশরূপ জীবাত্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া পড়িলে সে আপনা হইতেই স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত অনুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়া থাকে। অন্তঃকরণের এই প্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ কাজ করে তাহা হইলে—

যে যেঁ কোণাচেঁ কায় বা গেলে।
জ্যাচে ত্যানেঁ অর্নাহত কেলেঁ ॥

'সে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তুত' এইরূপ তুকারামবাবার মতো বলিতে হয় (গা ৪৪৪৮)! ভগবদ্‌গীতায় 'ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং'—যে আপনাকে আপনি হনন করে না তাহার উত্তম গতি লাভ হয়, এই তত্ত্বের উল্লেখ পরে করা হইয়াছে (গী. ১৩. ২৮); "দাসবোধে"ও ইহার স্পষ্ট অনুবাদ করা হইয়াছে (দাস ১৭. ৭. ৭-১০ দেখ)। যদিও দেখা যায় যে, মনুষ্য কর্ম্মজগতের অভেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মনুষ্য স্বভাবতই মনে করে যে, আমি যে কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারি। অনুভবের এই তত্ত্বের উপপত্তি উপরি-উক্ত অনুসারে জড়-জগৎ হইতে ব্রহ্মজগৎ ভিন্ন বলিয়া না মানিলে অন্য কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যাত্মশাস্ত্র মানে না তাহাকে এই বিষয়ে মনুষ্যের নিত্য দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথবা প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে ; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্যের কিংবা ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের এই উপপত্তি, - জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একরূপ অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া দিয়াছি (বেসূ. শাং ভা, ২. ৩. ৪০)। কিন্তু এই অদ্বৈত মত যিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি দ্বৈত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাত্মার এই সামর্থ্য তাহার নিজের নহে, উহা পরমেশ্বর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি কখনও "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋ. ৪. ৩৩. ১১)—শ্রান্ত হওয়া পর্যান্ত প্রযত্নকারী মনুষ্য ছাড়া অন্যকে দেবতারা সাহায্য করেন না—ঋগ্বেদের এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, এই সামর্থ্যলাভের জন্য জীবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই প্রযত্ন করা আবশ্যক অর্থাৎ আত্মপ্রযত্নের এবং পর্য্যায়ক্রমে আত্মস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব পুনরপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেসূ. ২. ৩. ৪১, ৪২ ; গী.

১০. ৫ ও ১০)! আর কত বলিব ? বৌদ্ধেরা আত্মার কিংবা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব মানে না ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান তাহারা না মানিলেও তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থেই "অত্তনা (আত্মনা) চোদয়হত্তানং"—আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত করিতে হইবে—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বলা হইয়াছে—

অত্তা (আত্মা) হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সঞ্ঞমহত্তানং অস্‌সং (অশ্বং) ভদ্দং ব বাণিজো ॥

'আপনিই আপনার কর্ত্তা, আপনার আত্মা ছাড়া অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই ; অতএব কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংযত করে সেইরূপ আপনিই আপনাকে সংযমন করিবে" (ধম্মপদ ৩৮০) ; গীতার ন্যায় আত্মস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত ২. ৩৩-৩৫ দেখ)। আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কোৎ-এর নির্দ্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ কোন অধ্যাত্মবাদকেই তিনি না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিনা কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া, প্রযত্নের দ্বারা মনুষ্য নিজের আচরণ ও পরিস্থিতি সংশোধন করিতে পারে ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই একমাত্র মহৌষধ, এবং এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের আয়ত্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই স্বতন্ত্র আত্মাও আপনার বক্ষস্থিত প্রকৃতির বোঝাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে ফেলিয়া দিতে পারে না। কোন কারিগরের নিজের দক্ষতা থাকিলেও যন্ত্র না হইলে যেমন তাহার চলে না এবং যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা মেরামৎ করিতে তাহার সময় লাগে, জীবাত্মারও সেইরূপ অবস্থা। জ্ঞানলাভের প্রেরণা করিবার সময় জীবাত্মা স্বতন্ত্র একথা সত্য, কিন্তু জীবাত্মা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নির্গুণ ও কেবল, কিংবা পূর্ব্বে সপ্তম প্রকরণে উক্ত-অনুসারে চক্ষুষ্মান্ কিন্তু খঞ্জ হওয়া প্রযুক্ত (মৈত্র্যু. ৩. ২, ৩ ; গী. ১৩. ২০), উক্ত প্রেরণা অনুসারে পরে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংবা যে সাধন আবশ্যক হয় (যথা কুম্ভকারের চাকা ইত্যাদি) তাহা এই আত্মার নিজের নিকট থাকে না—যে সাধন উপলব্ধ হয় যথা দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত মায়াত্মক প্রকৃতির বিকার। তাই, নিজের মুক্তির কার্য্যও জীবাত্মাকে প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সাধন বা উপাধির দ্বারাই করিয়া লইতে হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় মুখ্য হওয়ায় কোন কার্য্য করিতে হইলে, আত্মা বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পূর্বকর্ম্মানুসারে এবং প্রকৃতি-স্বভাব-বশতঃ এই বুদ্ধি যে সর্ব্বদা শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকই থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই, প্রথমে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া এই বুদ্ধি অন্তর্মুখ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে ; অর্থাৎ এই বুদ্ধি এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ হয় এইরূপ কর্ম্ম করিবে। ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভ্যাস করা আবশ্যক। এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম এবং যে সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া ত যায়ই না। তাই, বন্ধন-উপাধি-বদ্ধ জীবাত্মার

দেহেন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষানুকূল কর্ম্ম করিবার প্রেরণা করিবার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কার্য্য করাই হয় বলিয়া সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের ন্যায় সেই আত্মা পরাবলম্বী হইয়া যায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র প্রথমে সাফ্ করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে (বেসূ. ২. ৩. ৪০)। এই কার্য্য একেবারে হইতে পারে না ; ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে, নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয়সকল খানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত হইবে। এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহার্থ • বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ ধৈর্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬. ২৫) ; এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধির ন্যায় ধৃতির সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্গিক ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে (গী. ১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক পৈঠাকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হয় ; তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্দ্রিয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত স্থান, আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, 'শনৈঃ শনৈঃ' (গী. ৬. ২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত স্থির হইয়া ইন্দ্রিয়গণ আয়ত্তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একবারে নহে) ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া, "আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি • ধনঞ্জয়"—সেই জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন মোচন হয় (গী. ৪. ৩৮-৪১)। কিন্তু ভগবান একান্তে যোগাভ্যাস করিতে বলিতেছেন বলিয়া (গী. ৬. ১০) জগতের সমস্ত ব্যবহার ছাড়িয়া :যোগাভ্যাসেই সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাপর্য্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কোন ব্যবসায়ী যেরূপ নিজের অল্পস্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহা লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আস্তে আস্তে সুরু করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পত্তি লাভ করে, সেইরূপই গীতার কর্ম্মযোগেরও কথা। আপনার যতটা সাধ্য ততটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া প্রথমে কর্ম্মযোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই শেষে অধিকাধিক ইন্দ্রিয়নিগ্রহসামর্থ্য লাভ করা যায়। তথাপি একেবারে হাত গুটাইয়া বসিয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। তাই যাহাতে কর্ম্মযোগ বরাবর সমান চালাইতে পারা যায় এইজন্য অল্পসময় নিত্য-নিয়মিত, কিংবা মাঝে মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী. ১৩. ১০)। তাহার জন্য জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান্ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক ব্যবহার নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগও যথাশক্তি প্রত্যেকের করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ। মৈত্র্যুপনিষদে এবং মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাস ছয় মাসের মধ্যে সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে ; (মৈত্র্যু. ৬. ২৮ ; মভা. শাং ২৩৯. ৩২ ; অশ্ব. অনুগীতা. ১৯. ৬৬)। কিন্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্ত্বিক, সম কিংবা আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয় বৎসরেও প্রাপ্ত হয় না, এবং এই অভ্যাস অপূর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না শুধু নহে,

পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুরু করিতে হইবে বলিয়া, পরজন্মের যোগাভ্যাসও পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে ; তাই এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, এইপ্রকার পুরুষ পূর্ব্বসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না ; ফলতঃ এইরূপ মনে করাও সম্ভব যে, কর্ম্মযোগের আচরণ করিবার পূর্ব্বে পাতঞ্জলযোগের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধির শিক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক। অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষ্যের কি করা উচিত এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (গী. ৬. ৩৭. ৩৯) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়ায় তাহার উপর লিঙ্গশরীর দ্বারা এই জন্মে যে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই পরে দৃঢ়স্থায়ী হয় এবং এই 'যোগভ্রষ্ট' ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সম্পূর্ণ সাধন না করিয়া তাহা হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি পরজন্মে আপন প্রযত্নে সেখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্"—(গী. ৬. ৪৫)—অনেক জন্মের পর শেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গী. ২. ৪০) এই ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়—এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সারকথা, মনুষ্যের আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রকৃতি-স্বভাববশতঃ একজন্মেই মনুষ্যের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও "নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ" (মনু. ৪-১৩৭) কেহ যেন নিরাশ না হয় ; একজন্মেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবার দুরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিছক্ কসরৎ-কার্য্যেই সমস্ত জীবন যেন অনর্থক কাটিয়া না যায়। আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহা সাধ্য ততটা যোগবলই আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি অধিকাধিক সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ হইয়া কর্ম্মযোগের এই স্বল্পাচরণ কেন, জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত,—চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে ঠেলিতে শেষে,—আজ নয় তো কাল, এ জন্মে নয় তো পরজন্মে, তাহার আত্মাকে পূর্ণব্রহ্ম-প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। সেইজন্য কর্ম্মযোগমার্গের অত্যন্ত স্বল্পাচরণ কিংবা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিশেষ গুণ—এইরূপ গীতাতেই ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী. ৬. ১৫ সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ)। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্য্যত্যাগ না করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উদ্যোগে স্বাতন্ত্র্যসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি আমাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রকৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ মোচন হইবার নহে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবর্দ্ধমান কর্ম্মযোগের অভ্যাসে কাল কিংবা পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যায় এবং এইরূপ হইতে হইতে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" (গী. ৭. ১৯)—কখনো না কখনো পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন কিংবা পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা অবশেষে আপন মূল পূর্ণ নির্গুণ মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কি না পারে? "নর করণী করে

তো নরসে নারায়ণ হোয়" নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়—এই যে চলিত কথা আছে তাহা এই বেদান্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্ঠকার এই কারণেই মুমুক্ষু-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ বিধান করিয়াছেন (যো. ২. ৪. ১০-১৮)।

যাক্। জ্ঞানলাভার্থ প্রযত্ন করিবার জন্য জীবাত্মা মূলে স্বতন্ত্র এবং স্বাবলম্বন-পূর্ব্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে কখনো-না-কখনো প্রাক্তন কর্ম্মের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয়, ইহা সিদ্ধ হইলেও কর্ম্মক্ষয় কি, ও কখন কর্ম্মক্ষয় হয় এবিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কর্ম্মক্ষয় অর্থে সমস্ত কর্ম্মের বন্ধন হইতে পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া। কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতদিন দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে তৃষ্ণা, ক্ষুধা, শোয়া, বসাইত্যাদি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্ব্বক দেহত্যাগাদি করিতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কৃতকর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহে হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন জ্ঞানোত্তরকালেও ন্যূনাধিক কর্ম্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম্ম হইতে তাহার মুক্তি কি করিয়া হইবে? এবং মুক্ত না হইলে, পূর্ব্বকর্ম্মক্ষয় কিংবা পরে মোক্ষও হয় না, এই সংশয় উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বেদান্তশাস্ত্র এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামরূপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারিলেও, আত্মার সেই কর্ম্ম আপনাতে গ্রহণ করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা থাকায়, ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়া, কর্ম্মে প্রাণীমাত্রের যে আসক্তি থাকে তাহাকে যদি ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম্ম করিলেও তাহার অংকুর বিনষ্ট প্রায় হয়। কর্ম্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত। কর্ম্ম আপনা হইতে কাহাকে ধরে না এবং ছাড়েও না; উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে। মনুষ্য আপনাকে এই কর্ম্মে আবদ্ধ রাখিয়া নিজ আসক্তির দ্বারা উহাকে ভালো কিংবা মন্দ, শুভ কিংবা অশুভ প্রস্তুত করিয়া লয়। তাই, এই মমত্বযুক্ত আসক্তি হইতে মুক্ত হইলে, কর্ম্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বলা যায়;—তারপর সেই কর্ম্ম থাকুক বা চলিয়া যাক্। গীতারও স্থানে স্থানে এর উপদেশই দেওয়াহ ইয়াছে—প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য ইহাতেই, কর্ম্মত্যাগে নহে (গী. ৩. ৪); কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফল লাভ করা বা না করা তোমার অধিকারের বিষয় নহে (গী. ২. ৪৭); "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ" (গী. ৩. ৭)—ফলের আশা না রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-দিগকে কর্ম্ম করিতে দেও; "ত্যক্তা কর্ম্ম-ফলাসঙ্গম্" (গী. ৪. ২০) কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" (গী. ৫. ৭)—সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু" (গী. ১২. ১১)—সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর; "কার্য্য-মিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে" (গী. ১৮. ৯)—কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে সাত্ত্বিক: "চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য" (গী. ১৮. ৭)—সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া কাজ কর। উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ। জ্ঞানী মনুষ্য সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তৎসম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা

যাইবে। এখন কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি; এবং উপরি-প্রদত্ত বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত হয়। ব্যবহারেও এই নীতিসূত্রই আমরা প্রয়োগ করি। উদাহরণ যথা—অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক্কা মারে তাহা হইলে আমরা সেই ব্যক্তিকে গুণ্ডা বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও নিছক্ অপঘাতঘটিত হত্যাকে হত্যা বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পুড়িয়া গেলে, কিংবা বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়া গেলে, আগুনকে কিংবা বৃষ্টিকে কি কেহ অপরাধী মনে করে? শুধু কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্ম্মে মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে,—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ" (গী. ১৮. ৪৮)। কিন্তু গীতা যে দোষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহা নহে। মনুষ্যের কোন কর্ম্মকে আমরা যে শুভাশুভ বলি ভালমন্দত্ব কর্ম্মে থাকে না, তাহা সেই কর্ম্মের কর্ত্তার বুদ্ধিতে থাকে। ইহা মনে রাখিয়া গীতায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কর্ম্মের মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্ত্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, (গী. ২. ৪৯-৫১); এবং উপনিষদেও—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

"মনুষ্যের (কর্ম্মের) বন্ধন কিংবা মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে, বন্ধন এবং নিষ্কাম কিংবা নির্ব্বিষয় অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইলে মোক্ষ"—এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে (মৈত্রু. ৬. ৩৪; অমৃতবিন্দু. ২)। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধির এই সাম্যাবস্থা কিরূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ভগবদ্গীতায় মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম করিলে সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। নিরগ্নি হইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিংবা অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না (গী. ৬. ১)। মনুষ্যের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, প্রকৃতির চক্র সর্ব্বদা ঘুরিতে থাকায় মনুষ্যকেও সেই সঙ্গে চলিতে হয় (গী. ৩. ৩৩; ১৮. ৬০)। কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি সৃষ্টিক্রমানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শান্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত পুরুষ (গী. ৩. ৭; ৪ ২১; ৫. ৭-৯; ১৮. ১১)। যদি কোন জ্ঞানী পুরুষ কোনও ব্যবহারিক কর্ম্ম না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনে গমন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কর্ম্ম ত্যাগ করায় তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে করা বড় ভুল (গী. ৩ ৪)। সে কর্ম্ম করুক বা না করুক, তাহার কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে বলিয়াই হয়, কর্ম্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা না করিবার দরুন নহে, এই তত্ত্বটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না সেইরূপ জ্ঞানী

পুরুষকে—অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ করিয়া অথবা আসক্তি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম্ম লেপিয়া ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং. ৪. ১৪. ৩ ; গী. ৫. ১০) কর্ম্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী। কর্ম্ম স্বরূপতঃ কখনই দগ্ধ হয় না ; এবং উহাকে দগ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতাও হয় না। কর্ম্ম নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহা যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া ? এবং কচিৎ কখনো দগ্ধ হইলেও সৎকার্য্যবাদ অনুসারে বড় জোর তাহার নামরূপই পরিবর্ত্তিত হইবে। নামরূপাত্মক কর্ম্ম কিংবা মায়া নিত্য বদলায় বলিয়া নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে মনুষ্য যদি বদলাইয়া লয়, তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক না কেন, এই নামরূপাত্মক কর্ম্মের সমূলে নাশ করিতে পারে না ; তাহা কেবল পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই (বেসূ. ৪. ৪. ১৭ দেখ)। কিন্তু মূলে এই জড় কর্ম্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ অবস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমত্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকে উৎপাদন করিয়া থাকে তাহার নাশ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত. এবং তাহার দ্বারা যাহা দগ্ধ করা যাইতে পারে তাহা ইহাই। সমস্ত ভূতে মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া আপনার সমস্ত কর্ম্মের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য কৃতকৃত্য ও মুক্ত ; সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে. এইরূপ উক্ত হয় (গী. ৪. ১৯ : ১৮. ৫৬)। এই প্রকারে কর্ম্ম দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে মনের নির্ব্বিষয়তার উপর এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরূপ তাহার দহন করিবার ধর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান যখনই হউক না কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কর্ম্মক্ষয়রূপ পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। জ্ঞান হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মৃত্যুই আয়ুর চরম কাল ; এবং তাহার পূর্ব্বে কোন এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া অনারব্ধ-সঞ্চিতের ক্ষয় হইলেও প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। তাই, এই ব্রহ্মজ্ঞান যদি শেষ পর্য্যন্ত বরাবর সমানভাবে স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে মরণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ কর্ম্ম যাহা ঘটিবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হইয়াছে তাহার এই ভয় থাকে না, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এই বিষয়ের শাস্ত্রদৃষ্টিতে যখন বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও বা শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়ের বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বের কাল অপেক্ষা শাস্ত্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরূপে গুরুতর কাল বলিয়া মনে করেন ; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের অনুভূতি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। এই অভিপ্রায়েই "অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য মুক্ত হয়" এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৫)। এই সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয় যে, যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যুসময়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত হয়। অনেকের মতে এরূপ

হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইরূপ প্রতীতি হইবে। যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই সুবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয়ের ন্যায় মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস করা চাই ; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহা একবারে পাওয়া পরম দুর্ঘট, এমন কি, অসম্ভব। তাই, এই সম্বন্ধে গীতার আর একটা বড় কথা আছে — প্রত্যেকেই মনকে বিষয়-বাসনা-শূন্য করিবার অভ্যাস নিত্যকাল রাখিবে, যাহার ফলে অন্তকালেও সেই অবস্থাটাই বজায় রাখিবার পক্ষে কোন বাধা ঘটিবে না, এবং মনুষ্য শেষে মুক্ত হইবে (গী. ৮. ৬. ৭ ও ২. ৭২)। কিন্তু শাস্ত্র ছাঁকিয়া সত্য নির্ব্বাচনের জন্য স্বীকার করা যাউক যে, পূর্ব্বসংস্কারাদি কারণবশতঃ কাহারও কেবল মৃত্যুকালেই সহসা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইল। লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কত দুর্লভ বা দুর্ঘট তাহার বিচার একপাশে রাখিয়া দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে আমাদের ইহাই আলোচ্য। মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্ না কেন, তাহা দ্বারা মনুষ্যের অনারব্ধ-সঞ্চিতের ক্ষয় হইবেই ; এবং আরব্ধকার্য্য-সঞ্চিতের ক্ষয় এই জন্মের ভোগের দ্বারা মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কর্ম্ম ভোগ করাই অবশিষ্ট থাকে না ; এবং এইরূপ অগত্যা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মুক্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদি (গী. ৯. ৩০)—খুব দুরাচারী মনুষ্যও পরমেশ্বরকে অনন্য-ভাবে ভজনা করিলে মুক্ত হয়ই হয়—এই গীতাবাক্যে উক্ত হইয়াছে ; এবং এই সিদ্ধান্ত জগতের অন্য ধর্ম্মেও গ্রাহ্য হইয়াছে। 'অনন্যভাব' অর্থে পরমেশ্বরে মানুষের চিত্ত-বৃত্তি পূর্ণরূপে লীন হওয়া ; চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে রাখিয়া মুখে "রাম রাম" বিড় বিড় করা নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে রাখা চাই। মোট কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত অনারব্ধসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা যখনই প্রাপ্ত হই না কেন, সর্ব্বদা ইষ্ট তো বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, কিংবা পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অন্তকালে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক ; নতুবা মৃত্যুকালে কিছু বাসনা অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জ্জন্ম এড়ানো যাইবে না, এবং পুনর্জ্জন্ম এড়াইতে না পারিলে মোক্ষও পিছাইয়া পড়িবে এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন।

কর্ম্মবন্ধন কি, কর্ম্মক্ষয় কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে ও কখন্ হয়, ইহা বলিয়াছি। এখন উপস্থিতপ্রসঙ্গে, যাহাদের কর্ম্মফল নষ্ট হইয়াছে তাহারা এবং যাহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা মৃত্যুর পর বৈদিক ধর্ম্মানুসারে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ইহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। এই সম্বন্ধে উপনিষদে অনেক আলোচনা হইয়াছে (ছাং. ৪. ১৫ ; ৫. ১০ ; বৃ. ৬. ২. ২-১৬, কৌ. ১. ২. ৩)। তাহাদের একবাক্যতা বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা বিবৃত করিবার এখানে কোন প্রয়োজনই নাই। কেবল ভগবদ্গীতায় যে দুই মার্গ (গী. ৮. ২৩-২৭) প্রদত্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেই

এক্ষণে আমাদের বিচার কর্ত্তব্য। বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই প্রসিদ্ধ ভেদ আছে। তন্মধ্যে, কর্ম্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি বৈদিক দেবতাদিগকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া, তাঁহাদের প্রসাদে ইহলোকে পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি এবং গো-অশ্ব-ধনধান্যাদি সম্পত্তি লাভ করিয়া শেষে মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করা। বর্ত্তমানকালে এই যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেবভক্তি ও দানধর্ম্মাদি শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম লোকে করিয়া থাকে। ঋগ্বেদ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে লোক শুধু স্বার্থের জন্য নহে, সমস্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাদের আরাধনা করিত। উক্ত কার্য্যের জন্য যে দেবতার আনুকূল্য সম্পাদন করিতে হয় সেই ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবস্তুতির দ্বারাই ঋগ্বেদের সূক্তগুলি পূর্ণ; এবং তাহারও স্থানে স্থানে "হে দেব! আমাদিগকে সন্ততি দেও, সমৃদ্ধি দেও" "আমাদিগকে শতায়ু কর;" "আমাদিগকে, আমাদের সন্তান-সন্ততিকে, আমাদের বীরপুরুষদিগকে এবং আমাদের গরুবাছুরকে মারিও না" এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে।* এই যাগযজ্ঞ তিন বেদেরই বিধান হওয়ায় এই মার্গের পুরাতন নাম—'ত্রয়ীধর্ম্ম'; এই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের বিভিন্ন বিধি বর্ণিত থাকায় কোন্‌টি গ্রাহ্য তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল; তাই জৈমিনি এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যগুলির সমন্বয় কিরূপে করা যাইবে তৎসম্বন্ধীয় অর্থনির্ণায়ক নিয়মসমূহের সংগ্রহ করিলেন। জৈমিনির এই নিয়মকেই 'মীমাংসাসূত্র' কিংবা 'পূর্ব্বমীমাংসা' বলে; এবং সেই জন্য এই প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডের নাম পরে 'মীমাংসক মার্গ' হইয়াছে; ঐ নামই এক্ষণে প্রচলিত হওয়ায় আমিও এই গ্রন্থে অনেকবার উহার উপযোগ করিয়াছি। কিন্তু 'মীমাংসা' শব্দই পরে প্রচলিত হইলেও যাগযজ্ঞাদির এই মার্গ অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা মনে রাখা উচিত। এই কারণে গীতায় 'মীমাংসা' শব্দ কোথাও আসে নাই; তাহার বদলে 'ত্রয়ীধর্ম্ম' (গী. ৯. ২০. ২১) কিংবা 'ত্রয়ী বিদ্যা' নাম আসিয়াছে। যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্মপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির পরে আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম গৌণ ও ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার ধর্ম্মকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলা হয়। তথাপি, বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিচার থাকায় উহাদেরও সমন্বয় করা আবশ্যক। এই কার্য্য বাদরায়ণাচার্য্য স্বকীয় বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। এই গ্রন্থকে ব্রহ্মসূত্র কিংবা শারীরকসূত্র বা উত্তরমীমাংসা বলে। এই প্রকার পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা অনুক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থ মূলে মীমাংসারই অর্থাৎ বৈদিক রচনাদির অর্থের আলোচনা করিয়াছে। তথাপি কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদককে শুধু 'মীমাংসক' এবং জ্ঞানকাণ্ড-প্রতিপাদককে 'বেদান্তী' বলাই এক্ষণে রীতি হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডীরা অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলেন যে শ্রৌতধর্ম্মে চাতুর্ম্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞাদি

* এই মন্ত্র অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু সে সমস্ত না দিয়া এই বহুল প্রচলিত এই স্থানে বলিলেই যথেষ্ট—"মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদামিত্বা হবামহে ॥ (১. ১১৪. ৮)

কর্ম্মই প্রধান; এবং তাহা যে ব্যক্তি করিবে, সে-ই বেদের আদেশ অনুসারে মোক্ষলাভ করে। এই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারিবে না। যদি ছাড়ে, তবে শ্রৌতধর্ম্ম হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, জগতের উৎপত্তির সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং মনুষ্য যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিবে, এবং দেবতারাও মনুষ্যের যে যে বিষয় আবশ্যক তাহা পূরণ করিবেন, এই চক্র অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমি এই বিচারের বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি না, কারণ যাগযজ্ঞরূপ শ্রৌতধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত নাই। কিন্তু গীতাকালের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় ভগবদ্গীতাতেও (গী. ৩. ১৬-২৫) যজ্ঞকর্ম্মের মাহাত্ম্য উপরি-উক্ত-অনুসারেই বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি গীতা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সে সময়েও উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষদৃষ্টিতে এই যজ্ঞকর্ম্মাদির গৌণত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল (গী. ২. ৪১-৪৬)। এই গৌণত্বই অহিংসাধর্ম্মের বিস্তারের পর ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। যাগযজ্ঞ বেদবিহিত হইলেও তাহার জন্য পশুবধ প্রশস্ত নহে, ধান্যের দ্বারাই যজ্ঞ করিবে, এইরূপ ভাগবতধর্ম্মে স্পষ্ট প্রতিপাদন করা হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৬. ১০ ও ৩৩৭ দেখ)। সেই জন্য (এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও এইরূপ কথাই উত্থাপন করায়) এখনকার কালে শ্রৌতযজ্ঞমার্গের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, নিত্য শ্রৌতাগ্নিহোত্রপালনকারী অগ্নিহোত্রী কাশীর ন্যায় বড় বড় ধর্ম্মক্ষেত্রেও খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং দশ কুড়ি বৎসরের মধ্যে একটী জ্যোতিষ্টোমাদি পশুযজ্ঞ হইয়াছে বলিয়া কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি শ্রৌতধর্ম্মই সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের মূল হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদরবুদ্ধি অদ্যাপি বজায় আছে এবং জৈমিনীয় সূত্র অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্রের তৌলের উপর প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম এইরূপ শিথিল হইলেও মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণিত অন্য যজ্ঞ—যাহাকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে—অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং এই সম্বন্ধেও শ্রৌতযাগযজ্ঞচক্রাদিরই উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ যথা, মন্বাদি স্মৃতিকারেরা বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হোমরূপ দেবযজ্ঞ, বলিরূপ ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসন্তর্পণরূপ মনুষ্যযজ্ঞ, এইরূপ পাঁচ অহিংসাত্মক ও নিত্য গৃহযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন; এই পাঁচ যজ্ঞেই অনুক্রমে ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, ভূতগণ ও মনুষ্যগণকে প্রথমে তৃপ্ত করিয়া তাহার পর গৃহস্থ নিজে অন্ন গ্রহণ করিবে এইরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৩. ৬৮-১২৩)। এই যজ্ঞ করিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম 'অমৃত'; এবং সমস্ত লোকের আহার হইয়া যে অন্ন উদ্বৃত্ত হয় তাহাকে 'বিঘস' বলে (মনু. ৩. ২৮৫)। এই 'অমৃত' ও 'বিঘস' অন্নই গৃহস্থের পক্ষে বিহিত ও শ্রেয়স্কর। এইরূপ না করিয়া যে কেহ কেবল আপনার উদরের জন্য অন্ন পাক করিয়া খায় সে অঘ অর্থাৎ পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে মনুস্মৃতি ঋগ্বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই 'অঘাশী' বলা হইয়াছে (ঋ ১১. ১১৭. ৬; মনু. ৩. ১১৮; গী. ৩. ১৩)। এই স্মার্ত্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ ছাড়া দান, সত্য, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি সর্ব্বভূতহিতপ্রদ অন্য ধর্ম্মও উপনিষদে ও স্মৃতিগ্রন্থে গৃহস্থের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (তৈ. ১. ১১); এবং তাহাতেই, পরিবারের বৃদ্ধি করিয়া বংশ বজায় রাখিবে—'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'—এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কর্ম্মকে একপ্রকার যজ্ঞ

বলিয়াই মানা যায় এবং তাহা করিবার কারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ জন্মতই আপনার পৃষ্ঠের উপর তিন প্রকার ঋণ লইয়া আসে— এক ঋষিদের, দ্বিতীয় দেবতাদিগের ও তৃতীয় পিতৃগণের। তন্মধ্যে ঋষিদের ঋণ বেদাভ্যাসে, দেবতাদের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা এবং পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপত্তির দ্বারা শোধ করা আবশ্যক, নচেৎ তাহার সদ্গতি হইবে না (তৈ. সং. ৬. ৩ ১০. ৫)*। জরৎকারু যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন সন্তানক্ষয় প্রযুক্ত তাঁহার যাযাবর নামক পিতৃপুরুষ আকাশে ঝুলিয়া আছেন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং তাঁহার আদেশ ক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিলেন, এইরূপ মহাভারতের আদি পর্ব্বে এক কথা আছে (মভা. আ ১৩)। এই সমস্ত কর্ম্ম অথবা যজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণদিগেরই করিতে হইবে এরূপ নহে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্ম যথাধিকার স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্মৃতি-কারদিগের কল্পিত চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞ; উদাহরণ যথা, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধও এক যজ্ঞ; এবং যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাপক অর্থই এই প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে। যাহার পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই তাহার তপঃ (১১. ২৩৬) এইরূপ মনু বলিয়াছেন। মহাভারতেও—

আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাশ্চ জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ॥

আরম্ভ (উদ্যোগ), হবি, সেবা ও জপ এই চার যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ এই চার বর্ণের পক্ষে যথানুক্রমে বিহিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মভা. শাং. ২৩৭. ১২)। সার কথা, এই জগতের সমস্ত মনুষ্যকে যজ্ঞার্থই ব্রহ্মদেব সৃষ্টি করিয়াছেন (মভা. অনু. ৪৮. ৩ ; ও গী. ৩. ১০ ও ৪. ৩২ দেখ)। ফলত চাতুর্বর্ণ্যাদি সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই একপ্রকার যজ্ঞ; এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ অধিকারানুসারে এই যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম— ধন্ধা, ব্যবসায় বা কর্ত্তব্যব্যবহার— যদি তাহারা প্রচলিত না রাখে তাহা হইলে সমস্ত সমাজের ক্ষতি হইয়া অবশেষে তাহার ধ্বংস হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। তাই এই ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ হইতেছে যে, লোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞের আবশ্যকতা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, যদি বেদ-অনুসারে এবং চাতুর্বর্ণ্যাদি স্মার্ত্ত ব্যবস্থানুসারে গৃহস্থের পক্ষে সেই কেবল কর্ম্মময়, যজ্ঞপ্রধান বৃত্তিবিহিত বলিয়া স্বীকৃত হইল, তবে কি এই সাংসারিক কর্ম্ম ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে যথা বিধি (অর্থাৎ নীতি ও ধর্ম্মের আদেশ অনুসারে) করিলে তাহার দ্বারাই মনুষ্য জন্ম-মরণের ফের হইতে মুক্ত হয়? আর যদি বলা যায় যে সে মুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের মাতব্বরী ও যোগ্যতা কি রহিল? ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইয়া কর্ম্মে বিরক্ত না হইলে নামরূপাত্মক মায়া হইতে কিংবা জন্মমরণের ফের হইতে মুক্তি নাই, এইরূপ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্ স্পষ্ট বলেন; এবং শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্ম যদি দেখ, তবে প্রত্যেকের সমস্ত জীবন কর্ম্মপ্রধান কিংবা ব্যাপকার্থে যজ্ঞময়, এইরূপ দেখা যায়। তাছাড়া যজ্ঞার্থে

* তৈত্তিরীয় সংহিতার বচনটি এই—'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবা জায়তে ব্রহ্মচর্যেণর্ষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারিবা সাতি।'

অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এইরূপ বেদও স্পষ্ট বলিয়াছেন। স্বর্গের কথা একপাশে সরাইয়া রাখিলেও ইন্দ্রাদি দেবতারা সন্তুষ্ট না হইলে বৃষ্টি পড়ে না এবং যজ্ঞ না করিলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন না, এইরূপ নিয়ম ব্রহ্মদেবই স্থাপন করিয়াছেন। তবে যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া?

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

"যজ্ঞে হুত দ্রব্যাদি অগ্নি দ্বারা সূর্য্যের নিকট পৌঁছায় এবং সূর্য্য হইতে পর্জন্য, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়" ইহলোকে মনুস্মৃতি, মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাতে এইরূপ ক্রম দেওয়া হইয়াছে (মনু. ৩. ৭৬ ; মভা. শাং. ২৬২. ১১ ; মৈত্রু ৬. ৩৭ ; ও গী. ৩. ১৪ দেখ)। এবং এই যজ্ঞ যদি কর্ম্মের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কর্ম্ম ছাড়িলে কাজ চলিবে কি করিয়া? যজ্ঞময় কর্ম্ম ছাড়িলে সংসারচক্র বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে না। ইহার উত্তরে ভাগবত ধর্ম্ম ও গীতাশাস্ত্র বলেন যে, যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কিংবা অন্য কোন স্মার্ত্ত বা ব্যবহারিক যজ্ঞময় কর্ম্ম ছাড়ো—আমরা এ কথা বলি না; অধিক কি, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে এই যে যজ্ঞের চক্র ইহা বন্ধ হইয়া গেলে জগৎ উৎসন্ন হইবে, তোমাদের এই কথা আমাদেরও মান্য। তাই, কর্ম্মময় যজ্ঞ কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত (মভা. শাং. ৩৪০ ; গী. ৩. ১৬)। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হইলে মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, এই দুই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম কিংবা বিরক্ত বুদ্ধিতে করিতে হইবে ইহাই আমাদের শেষ কথা (গী. ৩. ১৭-১৯ দেখ)। স্বর্গফলের কাম্যবুদ্ধি মনে স্থাপন করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যাগযজ্ঞ করিলে, বেদের কথা অনুসারে তুমি স্বর্গফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, বেদজ্ঞ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু স্বর্গফল নিত্য অর্থাৎ স্থায়ী হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে,—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥*

"ইহলোকে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গভোগের দ্বারা শেষ হইলে, যজ্ঞকারী কর্ম্মকাণ্ডী মনুষ্যকে স্বর্গলোক হইতে এই কর্ম্মলোক অর্থাৎ ভূলোকে পুনর্ব্বার আসিতে হয়" (বৃ. ৪. ৪. ৬ ; বেসূ. ৩. ১. ৮ ; মভা. বন. ২৬০. ৩৯)। স্বর্গ হইতে নীচে আসিবার কোন্ পথ তাহাও ছান্দোগ্য-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং. ৫. ১১. ৩-৯)। "কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ" কিংবা "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (গী. ২. ৪৩. ৪৫) এইরূপ কিছু গৌণত্বসূচক যে বর্ণনা ভগবদ্গীতায় আছে তাহা এই কর্ম্মকাণ্ডী লোকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "গতাগতং কামকামা লভন্তে" (গী. ৯. ২১)—তাহাদিগকে স্বর্গলোকে ও ইহলোকে

*এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ পড়িবার সময় 'পুনরেতি' এবং 'অস্মৈ' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া পড়িলে এই চরণে অক্ষরের কমা পড়িবে না। বৈদিক গ্রন্থ পড়িবার সময় এইরূপ করা আবশ্যক হয়।

বারবার যাতায়াত করিতে হয়। এই যাতায়াত না ঘুচিলে আত্মার প্রকৃত শান্তি, পূর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গীতার সমস্ত উপদেশের সার এই যে, শুধু যাগযজ্ঞাদি কেন, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্মই তুমি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা ও সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়িয়া কর, এই প্রকারে কর্ম্মচক্র বজায় রাখিয়াও তুমি মুক্ত হইবে (গী. ১৮. ৫. ৬)। দেবতাদের উদ্দেশে, তিল তণ্ডুল কিংবা পশু "ইদং অমুকদেবতায়ৈ ন মম" বলিয়া অগ্নিতে হবন করিলেই যজ্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ পশুবধ করা অপেক্ষা প্রত্যেকের শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পশুবৃত্তি আছে, সাম্যবুদ্ধি-রূপ সংযম-অগ্নিতে তাহাদের হোম করাই অধিক শ্রেয়স্কর যজ্ঞ (গী. ৪. ৩৩)। এই অভিপ্রায়েই "যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গীতায় ও নারায়ণীয় ধর্ম্মে ভগবান বলিয়াছেন (গী. ১০. ২৫; মভা. শাং. ৩. ৩৭.)। মনু-স্মৃতিতেও জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে—তারপর আর যাহা করুক বা না করুক,—এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মনু. ২. ৮৭)। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় 'ন মম' ইহা আমার নয়—এইরূপ বলিয়া উক্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্ত্ব; এবং দানাদি কর্ম্মেরও ইহাই বীজ, তাই এই কর্ম্মের যোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান। অধিক কি, যাহাতে নিজের কিছুমাত্র স্বার্থ নাই এইরূপ কর্ম্ম শুদ্ধ বুদ্ধিতে করিলে তাহাকে যজ্ঞ বলিলেও চলে। যজ্ঞের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে, বুদ্ধিকে নির্ম্মম কিংবা নিষ্কাম রাখিয়া অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকেই ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলা যায়; এবং দ্রব্যময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মীমাংসকের 'যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধনকারণ হয় না' এই নিয়মসূত্র ঐ সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্মেও প্রযুক্ত হয়। এই কর্ম্ম করিবার সময় ফলাশাও ত্যাগ করা প্রযুক্ত স্বর্গের যাতায়াতও ঘটে না এবং এই কর্ম্ম করিলেও শেষে মোক্ষরূপ সদ্গতি লাভ হয় (গী. ৩. ৯)। সার কথা, সংসার যজ্ঞময় কিংবা কর্ম্মময় হইলেও কর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারীদিগকে দুই বর্গে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক, শাস্ত্রোক্তরীতিতে কিন্তু ফলাশা রাখিয়া যাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে (কর্ম্মকাণ্ডী লোক); আর এক, নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে (জ্ঞানী লোক)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ নিছক কর্ম্মকাণ্ডী লোকদিগের স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ অনিত্য ফল, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কিংবা নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ম্মকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিত্য মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। মোক্ষের জন্য কর্ম্ম ছাড়িতে গীতা কোথাও বলেন নাই। উল্টা, অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, 'ত্যাগ =ছাড়া' শব্দে গীতাতে কর্ম্মত্যাগের পরিবর্ত্তে 'ফলত্যাগ'ই সর্ব্বত্র বিবক্ষিত।

কর্ম্মকাণ্ডী ও কর্ম্মযোগীদিগের প্রাপ্য ফল এইপ্রকারে বিভিন্ন হওয়ায়, প্রত্যেককে মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই মার্গের নাম অনুক্রমে 'পিতৃযান' ও 'দেবযান' (শাং. ১৭. ১৫. ১৬)। এবং উপনিষদের ভিত্তিতে এই দুই মার্গই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তির—এবং এই জ্ঞান অন্ততঃ অন্তিমকালে তো অবশ্যই হইয়া গিয়াছে (গী. ২. ৭২)—শরীর মৃত্যুর পর চিতায় দগ্ধ হইলে, সেই অগ্নি হইতে জ্যোতি (জ্বালা), দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসে—প্রয়াণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদে

গিয়া পৌঁছায় এবং সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মৃত্যুলোকে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কর্ম্মকাণ্ডী অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয় নাই, সে সেই অগ্নি হইতে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই ক্রমানুসারে চলিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়া তাহার কৃত পুণ্যের সমস্ত ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে; এই দুই মার্গের এইরূপ ভেদ (গী. ৮. ২৩-২৭)। 'জ্যোতি' (জ্বালা) শব্দের স্থানে উপনিষদে 'অর্চ্চি' (জ্বালা) এই শব্দ থাকায় প্রথম মার্গের 'অর্চ্চিরাদি' এবং দ্বিতীয়তে 'ধূম্রাদি' এইরূপ নামও আছে। আমাদের উত্তরায়ণ উত্তর ধ্রুবস্থানে অবস্থিত দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই তাঁহাদের রাত্রি, এই পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই দুই মার্গের মধ্যে অর্চ্চিরাদি (জ্যোতিরাদি) কিংবা প্রথম মার্গ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশময় এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ধূম্রাদি মার্গ অন্ধকারময়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। জ্ঞান প্রকাশময় এবং পরব্রহ্ম 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (গী. ১৩. ১৭)—জ্যোতির জ্যোতি—হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যুর পর জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাশময় হওয়াই সঙ্গত; গীতায় এই দুই মার্গের—'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই যে দুই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়ই তাহার অর্থ। গীতায় উত্তরায়ণের পরবর্ত্তী পৈঠার উল্লেখ নাই। কিন্তু যাস্কের নিরুক্তে উদগয়নের পর দেবলোক, সূর্য্য, বৈদ্যুত, ও মানস পুরুষের বর্ণনা আছে (নিরুক্ত ১৪. ৯); এবং উপনিষদে দেবযানের যে বর্ণনা আছে তাহার সমন্বয় করিয়া বেদান্ত-সূত্রে উত্তরায়ণের পরে সম্বৎসর, বায়ুলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও পরিশেষে ব্রহ্মলোক এইরূপ পরবর্ত্তী সমস্ত পৈঠা প্রদত্ত হইয়াছে (বৃহ. ৫. ১১; ৬. ২. ১৫; ছাং. ৫. ১১, কৌষী. ১. ৩; বেসূ. ৪. ৩. ১-৬)।

দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের পৈঠা বা আড্ডার বর্ণনা করা হইল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দিবস, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে তাহার সাধারণ অর্থ কালবাচক হওয়ায় দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের সহিত কালের কোন সম্বন্ধ আছে কিংবা প্রথমে কখন ছিল না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। দিন, রাত্রি, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কালবাচক হইলেও অগ্নি, জ্যোতি, বায়ুলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অন্য যে সকল পৈঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের অর্থ কালবাচক হইতে পারে না; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি দিন কিংবা রাত্রে মরিলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ মানিলে জ্ঞানেরও কোন মাহাত্ম্য থাকে না। তাই, অগ্নি, দিন, উত্তরায়ণ প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কালবাচক স্বীকার না করিয়া বেদান্তসূত্রে ঐ সকল শব্দের দ্বারা তত্তদভিমানী দেবতা কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তির আত্মাকে বিভিন্ন মার্গ দিয়া ব্রহ্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেসূ. ৪. ২. ১৯—২১; ৪. ৩. ৪)। কিন্তু এই মত ভগবদ্গীতার অভিমত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, উত্তরায়ণের পরবর্ত্তী পৈঠা যাহা কালবাচক নহে, গীতায় বর্ণিত হয় নাই। তাহাই নহে, এই মার্গ বলিবার পূর্ব্বেই—"যে সময়ে মরিলে কর্ম্মযোগী ফিরিয়া আসে কিংবা আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বলিব" (গী. ৮. ২৩) এইরূপ ভগবান্ কালের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন; এবং মহাভারতেও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়িলে দেহত্যাগ করিবার জন্য উত্তরায়ণ কালের অর্থাৎ

সূর্য্যের উত্তরদিকে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন (ভী. ১২০ ; অনু. ১৬৭)। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন সময়ে মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া মানা হইত ; ঋগ্বেদেও দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে (ঋ. ১০. ৮৮. ১৫. ও বৃ. ৬. ২. ১৫), সেখানে কালবাচক অর্থই বিবক্ষিত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, উত্তর গোলার্দ্ধের যে স্থানে সূর্য্য ক্ষিতিজের উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়া থাকে সেই স্থানে অর্থাৎ উত্তর ধ্রুবের নিকট অথবা মেরুস্থানে বৈদিক ঋষিদিগের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস উত্তরায়ণের প্রকাশকালকেই মৃত্যুর প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইহার সবিস্তর বিচার আমি আমার অন্য গ্রন্থে করিয়াছি কারণ যাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি যে খুবই প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং এই ধারণাই দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গের মধ্যে স্পষ্ট পরিস্ফুট না থাকিলেও পর্য্যায়ক্রমে উহাদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। অধিক কি, এই দুই মার্গেরই মূল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, এইরূপ আমার মনে হয়। নচেৎ ভগবদ্গীতায় দেবযান ও পিতৃযান লক্ষ্য করিয়া একবার যে 'কাল' (গী. ৮. ২৩) এবং অপর একবার 'গতি' বা 'সৃতি' অর্থাৎ মার্গ (গী. ৮. ২৬ ও ২৭) বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এই দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের শব্দ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপত্তি ঠিক লাগানো যায় না। বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে দেবযান ও পিতৃযানের কালবাচক অর্থ স্মার্ত্ত, যাহা কর্ম্মযোগের পক্ষেই খাটে ; এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী উপনিষদে বর্ণিত শ্রৌত অর্থাৎ দেবতাপ্রদর্শিত প্রকাশময় মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ করিয়া 'কালবাচক' ও 'দেবতাবাচক' অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (বেসূ. শাং. ভা. ৪. ২. ১৮-২১)। কিন্তু মূল সূত্রে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা না রাখিয়া উত্তরায়ণাদি শব্দের দ্বারা দেবতা কল্পনা করিয়া দেবযানের যে দেবতাবাচক অর্থ বাদরায়ণাচার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার মতে সর্ব্বত্র অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে ; এবং গীতায় বর্ণিত মার্গ উপনিষদের এই দেবযান গতিকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিন্তু এ স্থলে এত গভীর জলে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ দেবযান ও পিতৃযানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দ ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে মূলারম্ভে কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই কালবাচক অর্থ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা নির্ব্বিবাদ। কালের অপেক্ষা না রাখিয়া মনুষ্য যে সময়েই মরুক না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কর্ম্মানুসারে প্রকাশময় মার্গ দিয়া এবং নিছক কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তি অন্ধকারময় মার্গ দিয়া পরলোকে যাত্রা করে, দেবযান এই দুই শব্দের এই অর্থই শেষে নির্দ্ধারিত ও রূঢ় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, দিন ও উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দে বাদরায়ণাচার্য্যের কথা অনুসারে দেবতাই মনে করে কিংবা উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের ক্রমবর্দ্ধনশীল পৈঠাই মনে কর, দেবযান ও পিতৃযান ইহাদের রূঢ় অর্থ যে মার্গবাচক এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভেদ হয় না।

কিন্তু কি দেবযান, কি পিতৃযান,—শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্মকারীই ঐ দুই মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ পিতৃযানমার্গ দেবযান অপেক্ষা নিম্ন পৈঠার হইলেও, তাহাও

চন্দ্রলোকে অর্থাৎ এক প্রকার স্বর্গলোকেই উপনীত হইবার মার্গ। তাই ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কোন প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিলেই সেখানকার সুখভোগের যোগ্যতা হয়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় (গী. ৯. ২০. ২১)। যাহারা কিছুমাত্র শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া সংসারে যাবজ্জীবন পাপাচরণে নিমগ্ন থাকে তাহারা ঐ দুয়ের মধ্যে কোন মার্গ দিয়াই যাইতে পারে না। তাহারা মৃত্যুর পর একেবারেই পশুপক্ষী আদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ পুনঃ যমলোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকেই 'তৃতীয়' মার্গ বলে (ছাং, ৫. ১০. ৮ ; কঠ. ২. ৬. ৭) ; এবং ভগবদ্গীতাতেও নিছক্ পাপী অর্থাৎ আসুরী পুরুষেরা এই নিরয়গতিই প্রাপ্ত হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী ১৬ ১৯-২১ , ৯. ১২ ; বেসূ. ৩. ১ ১২, ১৩ ; নিরুক্ত. ১৪. ৯)।

বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীন পরম্পরাক্রমে মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মানুরূপ মরণান্তর তিনপ্রকার গতি কি ক্রম-অনুসারে প্রাপ্ত হয় তাহা উপরে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবযান মার্গের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় ; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি সোপানে পর-পর আরোহণ করিয়া পরিশেষে এই মোক্ষ লাভ হয় ; তাই এই মার্গের আর এক নাম 'ক্রমমুক্তি', এবং মরণান্তর ব্রহ্মলোকে গিয়া সেখানে শেষে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া ইহার 'বিদেহমুক্তি' এই নামও হইয়াছে। কিন্তু খাঁটি অধ্যাত্মশাস্ত্র ইহার পরে আরও এই কথা বলেন যে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মা এক—এই পূর্ণ সাক্ষাৎকার যাহার মনে নিত্য জাগ্রত আছে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে কেন যাইবে ? কিংবা মরণেরও পথই বা সে কেন দেখিবে ? উপাসনার জন্য স্বীকৃত সূর্য্যাদি প্রতীকের অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহা প্রথমে একটু অপূর্ণ থাকে সত্য, কারণ, তাহার দরুণ সূর্য্যলোক কিংবা ব্রহ্মলোক ইত্যাদির কল্পনা মনে উদিত হইয়া তাহাই মরণ সময়েও ন্যূনাধিক পরিমাণে মনে স্থায়ী হইয়া থাকে। তাই, এই ত্রুটি পরিহার করিয়া মোক্ষলাভার্থ এই সকল লোককে দেবযান মার্গ দিয়াই যাইতে হয়,—(বেসূ. ৪. ৩. ১৫)। কারণ, মরণ সময়ে যাহার যেরূপ ভাবনা কিংবা ক্রতু হয় তাহার সেইরূপ গতি হয় ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত (ছাং. ৩, ১৪. ১)। কিন্তু সগুণোপাসনা, কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রহ্ম ও নিজের আত্মার মধ্যে কোন দ্বৈতী অন্তরাল (তৈ. ২. ৭) যাহার মনে একটুও অবশিষ্ট থাকে না, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই ব্রহ্মরূপে থাকায় তাহাকে ব্রহ্মলাভের জন্য অন্য কোথাও যাইতে হয় না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ নিষ্কাম হইয়াছে, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে নিত্য ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়—এইরূপ বৃহদারণ্যকে (বৃ. ৪. ৪. ৬) যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছেন ; এই প্রকার ব্যক্তি "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে, (কঠ. ৬. ১৪) এইখানেই ব্রহ্ম লাভ করেন, এইরূপ বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রুতির ভিত্তিতে, মোক্ষার্থে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই এইরূপ শিবগীতাতেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এরূপ কোন বস্তু নহে যে, তাহা অমুক স্থানে আছে ও অমুক স্থানে নাই (ছাং. ৭. ২৫ ; মুং. ২. ২. ১১)। তবে, কোনসময়ে পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য পূর্ণজ্ঞানী পুরুষকে উত্তরায়ণ,

সূর্য্যলোক আদি মার্গ দিয়া ক্রমে ক্রমে যাইতে হইবে কেন? "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুং. ৩. ২. ৯) যে ব্রহ্মকে জানে সে এখানেই এই লোকেই ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে। একজনের অপরের কাছে যাইতে হইলে, 'এক' ও 'অন্য' এই স্থলকৃত কিংবা কালকৃত ভেদ থাকে; এবং এই ভেদ, শেষের অদ্বৈত ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে থাকিতে পারে না। তাই, "যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ' (বৃ. ২. ৪. ১৪), কিংবা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাং. ৩. ১৪. ১), অথবা আমিই ব্রহ্ম—"অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ. ৪. ১০) এইরূপ যাহার মনের নিত্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য অন্যস্থানে কেন যাইবে?—সে সর্ব্বদাই ব্রহ্মভূতই হইয়া থাকে। পূর্ব্বপ্রকরণের শেষে যাহা বলা হইয়াছে গীতাতে সেই ভাবেই পরম জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে যে, "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্" (গী. ৫. ২৬)—যাঁহারা দ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ার্থ মৃত্যুর পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্য কোথাও যাইতে হয় না, কারণ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ তো সর্ব্বদাই তাঁহাদের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দণ্ডায়মান; কিংবা "ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ" (গী. ৫. ১৯)—যাঁহাদিগের মনে সর্ব্বভূতান্তর্গত ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সাম্য প্রতিভাত হয় তাঁহারা (দেবযান মার্গের অপেক্ষা না রাখিয়া) এখানেই জন্মমরণকে জয় করিয়াছেন; অথবা "ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থ-মনুপশ্যতি"—সমস্ত ভূতের নানাত্ব নষ্ট হইয়া সেই সমস্ত একস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া যাহার মনে হয়, সে-ই 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে"—ব্রহ্মে মিলিত হয় (গী. ১৩. ৩০)। সেইরূপ আবার, দেবযান ও পিতৃযান এই দুই মার্গ তত্ত্বতঃ যাহারা জানে সেই কর্ম্মযোগীরা মোহ প্রাপ্ত হয় না" (গী. ৮. ২৭), এইরূপ গীতার যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও "তত্ত্বতঃ যাহারা জানে" এই পদের অর্থ "পরম ব্রহ্মস্বরূপ যাহারা জানে" ইহাই বিবক্ষিত (ভাগ. ৭. ১৫. ৫৬ দেখ)। ইহাই পূর্ণ ব্রহ্মীভূত কিংবা পরাকাষ্ঠা ব্রহ্মস্থিতি; এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন শারীরিক ভাষ্যে (বেসূ. ৪. ৩. ১৪) ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা কিংবা পূর্ণাবস্থা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধিক কি, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একপ্রকার পরমেশ্বরই হইতে হয়, এইরূপ বলাতেও কোন অতিশয়োক্তি হইবে না। এবং এই প্রকারে ব্রহ্মীভূত ব্যক্তি কর্ম্মজগতের সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হন, ইহাও আর বলিতে হইবে না; কারণ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহা সর্ব্বদাই নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয় বলিয়া পাপপুণ্যের দ্বারা নির্লিপ্ত থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরণেরও কোন আবশ্যকতা না থাকায় এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষকে 'জীবন্মুক্ত' বলে (যো. ৩. ৯ দেখ)। বৌদ্ধেরা আত্মা কিংবা ব্রহ্ম না মানিলেও জীবন্মুক্তের এই নিষ্কাম অবস্থাই মনুষ্যের পরম সাধ্য এই কথা তাঁহারা স্বীকার করেন। অল্প শব্দভেদে এই মতকে তাঁহারা আপন ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছেন (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। পরাকাষ্ঠার নিষ্কামত্বের এই অবস্থা এবং সাংসারিক কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই পরস্পর বিরোধ থাকা প্রযুক্ত যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম্ম হইতে স্বতই মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া

যায়, এইরূপ অনেকে বলেন। কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে; স্বয়ং পরমেশ্বর যেরূপ কর্ম্ম করেন সেইরূপ জীবন্মুক্তেরও নিষ্কামবুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ আমরণ সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ, নিষ্কামত্ব ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। ইহা পরবর্তী প্রকরণের নিরূপণে স্পষ্ট দেখা যাইবে। গীতার এই তত্ত্ব যোগবাসিষ্ঠেও স্বীকৃত হইয়াছে (যো. ৬. উ. ১৯৯)।

ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত।

———

একাদশ প্রকরণ

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥*

গীতা. ৫. ২।

পূর্ব্বপ্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সর্ব্বভূতে একত্বে অবস্থিত পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞান হওয়াই অনাদি কর্ম্মের ফের হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র মার্গ; এবং এই অমৃত ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য আছে কি না এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা কর্ম্ম মনুষ্য কেন করিবে। শেষে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধন কর্ম্মের ধর্ম্ম বা গুণ নহে, উহা মনের ধর্ম্ম; তাই ব্যবহারিক কর্ম্মের ফলে আমাদের যে আসক্তি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া উক্তকর্ম্ম শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া গেলে, কিছুকাল পরে সাম্যবুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান দেহেন্দ্রিয়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরিশেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য কিরূপ সাধন করিতে হয়, ইহার নিষ্পত্তি এইরূপ হইয়াছে। এক্ষণে, এই প্রকার আচরণের দ্বারা অর্থাৎ যথাশক্তি ও যথাধিকার নিষ্কামকর্ম্ম করিতে থাকিলে, কর্ম্মবন্ধন মোচন হইয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা শেষে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পর, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মই করিতে থাকিবে, কিংবা যাহা কিছু পাইবার তাহা পাইয়া কৃতকৃত্য হওয়ায় মায়া-জগতের সমস্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুঝিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা (কর্ম্মসন্ন্যাস) বা তাহাই আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা (কর্ম্মযোগে), এই দুই পক্ষ তর্কদৃষ্টিতে এই স্থলে সম্ভব। এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ সুবিধাজনক বলিয়া এই উভয়ের তারতম্যের বিচার ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্মের কোন আধ্যাত্মিক বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম করা আর না করা দুই-ই সমান (গী. ৩. ১৮), কারণ সমস্ত ব্যবহারে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বভূতে যাহার সমত্ব-বুদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর কোন কর্ম্মেরই শুভাশুভত্বের লেপ লাগে না। (গী. ৪. ২০, ২১)—অর্জ্জুনকে কেবল এইটুকু

*"সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষদায়ক; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেষ্ঠ।" দ্বিতীয় চরণের "কর্ম্মসন্ন্যাস" পদ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম চরণের "সন্ন্যাস" শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে। গণেশগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে গীতার এই প্রশ্নোত্তরই লওয়া হইয়াছে। সেখানে এই শ্লোক অল্প শব্দভেদে এই প্রকার আসিয়াছে—

"ক্রিয়াযোগো বিয়োগশ্চাপ্যুভৌ মোক্ষস্য সাধনে।
তয়োর্মধ্যে ক্রিয়াযোগস্ত্যাগাত্তস্য বিশিষ্যতে ॥"

বলিলে কার্য্যনির্ব্বাহ হইত না। তাঁহার প্রতি ভগবানের ইহাই নিশ্চিত উপদেশ ছিল যে তুমি যুদ্ধ কর—যুদ্ধ্যস্ব! (গী. ২. ১৮); এবং এই ব্রজ্রনাদী স্পষ্ট উপদেশের সমর্থনে 'যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না করিলেও ভাল' এইরূপ ধরা ছাড়া উত্তর অপেক্ষা অন্য কোন বলবত্তর কারণ দেখান আবশ্যক ছিল। অধিক কি, কোন কর্ম্মের ভয়ংকর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখা গেলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা কেন করিবে, ইহা বলিবার জন্যই গীতা-শাস্ত্রের সৃষ্টি; ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য। কর্ম্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, ইহা সত্য হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম করাই দরকার কেন? কর্ম্মক্ষয় অর্থে কর্ম্মত্যাগ নহে; কেবল ফলাশা ছাড়িলেই কর্ম্মের ক্ষয় হয়, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না; ইত্যাদি সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে পুরাপুরি সিদ্ধ হয় না যে, যতটুকু কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় তাহাও ত্যাগ করিবে না। এবং ন্যায়তঃ দেখিলেও এই অর্থই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, চতুর্দ্দিক জলময় হইলে যেরূপ জলের জন্য কূপের দিকে কেহ ছুটিয়া যায় না, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্মের কোন অপেক্ষা রাখিতে হয় না, এইরূপ গীতাতেই উক্ত হইয়াছে (গী. ২. ৪৬)। এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা নিষ্কাম কিংবা সাম্যবুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় আমারও বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিলেই হইল; এই ঘোর যুদ্ধকর্ম্মে কেন আমাকে স্থাপন করিলে? (গী. ৩. ১.) এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্ 'কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেহ পারে না,' ইত্যাদি কারণ বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য (সন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গই যদি শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের পরে ইহাদের মধ্যে যাহার যে মার্গ ভাল লাগিবে সে-ই সে মার্গ স্বীকার করুক, এইরূপ বলিতে হয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন আবার এই প্রশ্ন করিলেন যে, দুই মার্গ মিশা-মিশি করিয়া আমাকে না বলিয়া, এই দুয়ের মধ্যে ভালো যেটি তাহাই আমাকে ঠিক করিয়া বলো (গী. ৫. ১)। জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম করা কিংবা না করা যদি সমানই হয় তবে আমার ইচ্ছামত তাহা আমি করিব কিংবা করিব না। কর্ম্ম করাই উত্তম পক্ষ হইলে, আমাকে তাহার কারণ বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথা অনুসারে চলিব। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন কিছুই অপূর্ব্ব নহে। যোগবাসিষ্ঠে রাম বসিষ্ঠকে (যো. ৫. ৫৬. ৬) এবং গণেশ-গীতায় (৪, ১) বরেণ্য নামক রাজা গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন। কেবল আমাদের দেশে নহে, য়ুরোপ-খণ্ডের যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের বিচার সর্ব্বপ্রথম সুরু হয় সেই গ্রীস দেশেও প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থে দেখা যায়। এই প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্ঞানীপুরুষ স্বীয় নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে (১০. ৭ ও ৮) এই প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, নিজের এই মত প্রথমে বলিয়াছেন যে, সংসারের কিংবা রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় আয়ুক্ষেপ করা অপেক্ষা জ্ঞানীপুরুষের শান্তভাবে তত্ত্ববিচারে আয়ুক্ষেপ করিলেই প্রকৃত ও পূর্ণ আনন্দ হয়, তথাপি, ইহার পর লিখিত স্বীয় রাজধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থে (৭. ২ ও ৩) অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্ববিচারে এবং কেহ কেহ রাষ্ট্র-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখা যায়; এবং এই দুই মার্গের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মার্গই অংশতঃ

সত্য। তথাপি কর্ম্ম অপেক্ষা অকর্ম্মকে ভাল বলা ভুল।* কারণ, আনন্দও এক কর্ম্মই এবং প্রকৃত শ্রেয়োলাভও অনেকাংশে জ্ঞানযুক্ত ও নীতিযুক্ত কর্ম্মেতেই আছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই"। অ্যারিষ্টটল দুই স্থানে দুই বিভিন্ন বিধান করিয়াছেন দেখিয়া "কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" (গী. ৩. ৮), অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—গীতার এই স্পষ্ট কথার গুরুত্ব পাঠকের উপলব্ধ হইবে। বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আগষ্ট্ কোঁৎ স্বকীয় আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞানে বলিয়াছেন যে,—"তত্ত্বচিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া আয়ুক্ষেপণ শ্রেয়স্কর বলা ভ্রান্তিমূলক; যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এইপ্রকারে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া যথাসাধ্য লোকের কল্যাণসাধনে বিরত হন, তিনি নিজের সাধনগুলির অপব্যবহার করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।" উল্টাপক্ষে জর্ম্মান তত্ত্ববেত্তা শোপেন্‌হর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার, এমন কি বাঁচিয়া থাকাও, দুঃখময় হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্ত কর্ম্মের যত শীঘ্র সম্ভব নাশ করাই এই জগতে মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য। কোঁতের মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং শোপেন্‌হরের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। শোপেন্‌হরের পন্থা হার্টমান পরে বজায় রাখিয়াছেন। স্পেন্সর, মিল প্রভৃতি ইংরেজ তত্ত্বজ্ঞানীদের মত কোঁৎ-এরই ন্যায়, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইঁহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া নিতান্ত আধুনিক আধিভৌতিক জর্ম্মান পণ্ডিত নিৎশে স্বকীয় গ্রন্থে সরোষে বলিয়াছেন যে, 'মূর্খশিরোমণি' অপেক্ষা সৌম্যতর নাম কর্ম্মসন্ন্যাসীদিগের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।*

য়ুরোপখণ্ডে অ্যারিষ্টটল হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যেরূপ দুই পক্ষ আছে, সেইরূপ প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বৈদিকধর্ম্মেও এই সম্বন্ধে দুই মার্গ সমান চলিয়া আসিতেছে (মভা. শাং. ৩৪৯. ৭)। তন্মধ্যে এক মার্গের নাম সন্ন্যাসমার্গ, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা শুদ্ধ সাংখ্য (অথবা জ্ঞানেতেই নিত্য নিমগ্ন থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠাও) বলা হয়; দ্বিতীয় মার্গের নাম কর্ম্মযোগ, কিংবা সংক্ষেপে শুদ্ধ যোগ অথবা কর্ম্মনিষ্ঠা বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ এই দুই শব্দে অনুক্রমে কাপিলসাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ অর্থ বিবক্ষিত নহে, ইহা পূর্ব্বে তৃতীয় প্রকরণেই আমি বলিয়াছি। কিন্তু 'সন্ন্যাস' শব্দও একটু সন্দিগ্ধ হওয়ায় তাহার অর্থ একটু বেশী ব্যাখ্যা করা এখানে আবশ্যক। 'সন্ন্যাস' শব্দে 'বিবাহ না করা' কিংবা বিবাহ করিলে 'স্ত্রীপুত্র

* "And it is equally a mistake to place inactivity above action for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realisation of much that is noble." (Aristotle's Politics, trans. by Jowett. Vol. I P 212. The italics are ours).

* কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ (সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাস) এই দুই মার্গের নাম ইনি আপন Pessimism নামক গ্রন্থে—অনুক্রমে Optimism ও Pessimism দিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে এই নাম ঠিক নহে। Pessimism শব্দের অর্থ—"উদাস, নিরাশাবাদী কিংবা কাঁদুনে কিংবা রোদনশীল"। কিন্তু সংসার দুঃখময় বলিয়া ভাবিয়া যাহারা সংসার ত্যাগ করে তাহারা আনন্দে থাকে এবং সংসার ত্যাগ করিয়াও তাহা আনন্দের সহিতই ত্যাগ করে। তাই উঁহাদের সম্বন্ধে Pessimist শব্দ প্রয়োগ করা আমার মতে ঠিক নহে। ইহা অপেক্ষা কর্ম্মযোগের Energism এবং সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গের Quietism এইরূপ নাম দেওয়াই অধিক প্রশস্ত। বৈদিক ধর্ম্ম সংসারে দুই মার্গে ব্রহ্মজ্ঞান একই হওয়ায় দুয়েতেই আনন্দ ও শান্তি একই হইয়া থাকে। এক মার্গ আনন্দময় এবং অন্য মার্গ দুঃখময় কিংবা এক আশাবাদী এবং অন্য নিরাশাবাদী এইরূপ ভেদ আমি করি না।

ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করা', অথবা 'কেবল চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা' এইটুকু অর্থ এইস্থানে বিবক্ষিত নহে। কারণ, বিবাহ না করিয়াও ভীষ্ম আমরণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; এবং ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারেই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, কিংবা আমাদের মহারাষ্ট্রদেশে আমরণ ব্রহ্মচারী গোস্বামী থাকিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা জগতের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর জগতের ব্যবহার কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া লোকের কল্যাণার্থ করিবে কিংবা তাহা মিথ্যা বলিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে ইহাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন। এই ব্যবহার যে করে সে-ই কর্ম্মযোগী; তারপর সে বিবাহ করুক বা না করুক অথবা গেরুয়া বসন পরুক বা না পরুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। একথা বলা যায় যে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে বিবাহ না করা কিংবা গেরুয়া বসন পরা কিংবা সহরের বাহিরে বৈরাগী হইয়া থাকাই অনেক সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয়। কারণ, তাহা হইলে নিজের পশ্চাতে পরিবার-পোষণের ঝঞ্ঝাট না থাকায় আমাদের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম লোক-কার্য্যার্থে ব্যয় করিবার পক্ষে কোন বাধাই থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্ন্যাসী বেশ থাকিলেও, সে তত্ত্বদৃষ্টিতে কর্ম্মযোগীই। কিন্তু উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকে অসার ভাবিয়া ও ত্যাগ করিয়া যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিতে হয়, চাই তাহারা প্রত্যক্ষ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। মোদ্দা কথা, গীতার কটাক্ষ গেরুয়া বস্ত্রের উপরে কিংবা শুভ্র বস্ত্রের উপরে, অথবা বিবাহ কিংবা ব্রহ্মচর্য্যের উপরেও নহে; জ্ঞানী পুরুষ জাগতিক ব্যবহার করে কিংবা করে না এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখিয়া সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, গীতায় এই দুই মার্গের ভেদ করা হইয়াছে। বাকী বিষয় গীতাধর্ম্মে গুরুত্বসূচক নহে। সন্ন্যাস কিংবা চতুর্থাশ্রম শব্দ অপেক্ষা কর্ম্মসন্ন্যাস কিংবা কর্ম্মত্যাগ শব্দই এস্থলে অধিক অন্বর্থক ও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই দুই অপেক্ষা শুধু সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগ করিবারই অধিক চলন থাকায় তাহার পারিভাষিক অর্থ এইখানে খুলিয়া বলিয়াছি। যাহারা জাগতিক ব্যবহারকে অসার মনে করে তাহারা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে গিয়া স্মৃতিধর্ম্মানুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করে বলিয়া কর্ম্মত্যাগের এই মার্গকে সন্ন্যাস বলে। কিন্তু তাহার প্রধান অংশ কর্ম্মত্যাগই, গেরুয়া বসন নহে।

পূর্ণজ্ঞান হইবার পর কর্ম্ম করিবে (কর্ম্মযোগ) কিংবা কর্ম্ম ত্যাগ করিবে (কর্ম্মসন্ন্যাস), এইরূপ দুই পক্ষ প্রচলিত থাকিলেও, শেষে মোক্ষলাভের দুই মার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সমানরূপেই সমর্থ; কিংবা কর্ম্মযোগ পূর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ প্রথম চৈত্তশুদ্ধির জন্য এবং শেষে মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসই গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রশ্ন গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা এই স্থানে উপস্থিত করিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণন হইতে এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানা যায়। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ যাঁহাদের মত—এবং তাহাই গীতারও প্রতিপাদ্য হইবে এই দৃষ্টিতে গীতার টীকা করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাঁহারা গীতার এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বাহির করিয়া থাকেন যে, 'কর্ম্মযোগ স্বতন্ত্ররূপে মোক্ষলাভের মার্গ নহে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া শেষে সন্ন্যাসই গ্রহণ করিতে হইবে,

সন্ন্যাসই চরম অর্থাৎ মুখ্য নিষ্ঠা।" কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে 'সাংখ্য (সন্ন্যাস) ও যোগ (কর্ম্মযোগ) জগতে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে' (গী. ৩. ৩), এইরূপ ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, সেই দ্বিবিধ পদের সার্থকতা আদৌ থাকে না। কর্ম্মযোগ শব্দের তিন অর্থ হইতে পারে—(১) জ্ঞান হউক বা না হউক, যাগযজ্ঞাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কিংবা শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম করিয়াও মোক্ষলাভ হয়—ইহাই প্রথম অর্থ। কিন্তু মীমাংসকদিগের এই পক্ষ গীতার মান্য নহে (গী. ২. ৪৫)। (২) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা (কর্ম্মযোগ) আবশ্যক বলিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করা—ইহাই দ্বিতীয় অর্থ। এই অর্থে কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ কিংবা পূর্ব্বায়োজন।। কিন্তু গীতার বর্ণিত কর্ম্মযোগ ইহা নহে। (৩) নিজের আত্মার কল্যাণ কিসে হয় তাহা যিনি জানেন সেই জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মোক্ত সাংসারিক কর্ম্ম আমরণ করিবেন কি করিবেন না ইহাই গীতার মুখ্য প্রশ্ন; এবং ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানী পুরুষকেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হইবে (গী. ৩. ২৫)—ইহাই কর্ম্মযোগ শব্দের তৃতীয় অর্থ; এবং এই কর্ম্মযোগই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ কখনই হইতে পারে না, কারণ এই মার্গে কর্ম্ম হইতে কখনই মুক্তি নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে মোক্ষলাভের বিষয়ে। এই বিষয়ে গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানলাভ হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধন না হইয়া, সন্ন্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ করিবার কথা, সেই মোক্ষ কর্ম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী. ৫. ৫)। তাই গীতার কর্ম্মযোগ, সন্ন্যাসমার্গের পূর্ব্বাঙ্গ নহে; কিন্তু জ্ঞানোত্তর এই দুই মার্গই মোক্ষদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল (গী. ৫. ২); 'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা' (গী. ৩. ৩.) এই গীতাবাক্যের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই কারণেই, ভগবান্ পরবর্ত্তী চরণে 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং' এই দুই মার্গকে পৃথক্ রূপে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। পরে ১৩শ অধ্যায়ে 'অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে' (গী. ১৩. ২৪) এই শ্লোকের 'অন্যে' (এক) ও 'অপরে' (দ্বিতীয়) এই দুই পদ উক্ত দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে অন্বর্থক হয় না। তাছাড়া, যে নারায়ণীয় ধর্ম্মের প্রবৃত্তিমার্গ (যোগ) গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ইতিহাস দেখিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। জগতের আরম্ভে ভগবান হিরণ্যগর্ভকে অর্থাৎ ব্রহ্মদেবকে জগৎ সৃষ্টি করিতে বলিলে, তাঁহা হইতে মরীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা সৃষ্টিক্রম ঠিক্ সুরু করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ কর্ম্মময় প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। ব্রহ্মার সনৎকুমার, কপিল প্রভৃতি অন্য সাতপুত্র জন্মিলেই নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ সাংখ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপ দুই মার্গের উৎপত্তি বলিয়া, এই দুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল অর্থাৎ বাসুদেবস্বরূপী একই পরমেশ্বর প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মার্গ, এইরূপ পরে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মভা. শাং, ৩৪৮. ৭৪; ৩৪৯. ৬৩-৭৩)। সেইরূপ আবার, যোগের অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভ এবং সাংখ্যমার্গের মূলপ্রবর্ত্তক কপিল এইরূপ ভেদও করা হইয়াছে; কিন্তু হিরণ্যগর্ভ পরে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই। উল্টা, জগতের ব্যবহার যাহাতে সুচারুরূপে চলে তজ্জন্য ভগবান্ কর্ম্মরূপ যজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিয়া তাহা সতত

চলমান রাখিবার জন্য তাঁহাকে এবং অন্য দেবতাকে বলিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে (মভা. শাং. ৩৪০. ৪৪-৭৫ ও ৩৩৯. ৬৬. ৬৭ দেখ)। ইহা হইতে সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গ প্রথম হইতেই যে স্বতন্ত্র, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে আরও দেখা যায় যে, গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা কর্ম্মযোগকে যে গৌণত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিছক্ সাম্প্রদায়িক আগ্রহের পরিণাম; এবং কর্ম্মযোগ জ্ঞানলাভের কিংবা সন্ন্যাসের কেবল সাধন মাত্র বলিয়া এই টীকাকারেরা স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের নিজের কথা, গীতার প্রকৃত ভাবার্থ সেরূপ নহে। আমার মতে, সন্ন্যাসমার্গীয় গীতার টীকাসমূহের ইহাই মুখ্য দোষ। এবং টীকাকারদিগের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রহ হইতে মুক্তি না হইলে গীতার প্রকৃত রহস্যের জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই-ই স্বতন্ত্রভাবে সমান মোক্ষপ্রদ, এক অন্যটির পূর্ব্বাঙ্গ নহে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, যদি দুই মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহাদের মধ্যে আমাদের যেটি ভাল লাগে আমরা তাহাই অবলম্বন করিব, এইরূপ বলিতে হয়। এবং তাহা হইলে, অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এইরূপ সিদ্ধ না হইয়া, ভগবানের উপদেশে পরমেশ্বরজ্ঞান হইলেও অর্জ্জুন আপন অভিরুচি অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিংবা যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ দুই পক্ষই সম্ভব হয়। তাই "এই দুই মার্গের মধ্যে অধিক প্রশস্ত যেটি সেই এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক করিয়া বল" (গী. ৫.) অর্থাৎ যে আচরণ করিলে গোলযোগ হইবে না, অর্জ্জুন সহজভাবে ও সরলভাবে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান তাহার এই স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন যে "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগে এই দুই মার্গ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষদৃষ্টিতে সমতুল্য হইলেও এই দুয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগের মাতব্বরী কিংবা যোগ্যতা বিশেষভাবে আছে (বিশিষ্যতে)" (গী. ৫. ২); এবং এই শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরম্ভেই দিয়াছি। কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এই একটি মাত্র বচন যে গীতায় আছে তাহা নহে; অনেক বচন আছে; যথা "তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব" (গী. ২. ৫০)—অতএব তুমি কর্ম্মযোগই স্বীকার কর; "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" (গী. ২. ৪৭)—কর্ম্ম না করিবার আগ্রহ রাখিও না ঃ

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥

কর্ম্ম একেবারে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়া "ইন্দ্রিয়দিগকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অনাসক্তবুদ্ধিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা 'বিশিষ্যতে' অর্থাৎ বিশেষ" (গী. ৩. ৭); কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, "কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ (গী. ৩. ৮) অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; "অতএব তুমি কর্ম্মই কর" (গী. ৪. ১৫); কিংবা "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ" (গী. ৪. ৪২)—কর্ম্মযোগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও; "(যোগী) জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ" জ্ঞানমার্গী (সন্ন্যাসী) অপেক্ষা কর্ম্মযোগীর যোগ্যতা অধিক; "তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন"

(গী. ৬. ৪৬)—অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি (কর্ম্ম) যোগী হও; কিংবা "মামনুস্মর যুধ্য চ" (গী. ৮. ৭)—আমাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধ কর; এই প্রকার অনেক বচনে গীতায় অর্জ্জুনকে স্থানে স্থানে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও সন্ন্যাস বা অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিক যোগ্য এইরূপ দেখাইবার জন্য 'জ্যায়ঃ' 'অধিকঃ', 'বিশিষ্যতে' এইরূপ স্পষ্ট পদ আছে। ১৮শ অধ্যায়ের উপসংহারেও "নিয়ত কর্ম্মসন্ন্যাস করা উচিত নহে; আসক্তিবিরহিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে হইবে, ইহাই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত", এইরূপ ভগবান পুনর্ব্বার বলিয়াছেন (গী. ১৮. ৬. ৭)। ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হয় যে, সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই গীতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কিন্তু সন্ন্যাস কিংবা ভক্তিই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির কেবল সাধনমাত্র, মুখ্য সাধ্য বা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মত, এই সিদ্ধান্ত তাঁহাদের রুচিবে কি প্রকারে? সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা গীতায় কর্ম্মযোগের অধিক গুরুত্ব স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথা তাঁহাদের যে মনে হয় নাই এইরূপ নহে। কিন্তু ইহা মানিলে, নিজের সাম্প্রদায়িক যোগ্যতা কমিয়া যাইবে, স্পষ্ট দেখা যায়। তাই, পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্ন এবং ভগবৎ-প্রদত্ত উত্তর, দুই-ই সরল, সযুক্তিক ও স্পষ্টার্থক হইলেও, ইহার কোন্ অর্থ কি প্রকারে করা যাইবে, এই সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ বড়ই মুষ্কিলে পড়িয়াছেন। প্রথম মুষ্কিল এই ছিল যে, 'সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেষ্ঠ'? এই প্রশ্নই উপস্থিত হয় না, যদি না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানা যায়। কারণ, টীকাকারদিগের কথা অনুসারে কর্ম্মযোগ যদি জ্ঞানের কেবল পূর্ব্বাঙ্গ হয়, তবে পূর্ব্বাঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংবা সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বতই সিদ্ধ হয়। এবং তাহার পর, প্রশ্ন করিবার কোন অবসর থাকে না। ভাল; এই প্রশ্নকে উচিত প্রশ্ন বলিলেও, এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয়; এবং এইরূপ স্বীকার করিলে, নিজের সম্প্রদায়ই একমাত্র মোক্ষমার্গ এই কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়! এই জন্য, এই টীকাকারগণ অর্জ্জুনের প্রশ্নই ঠিক্ নহে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রথমে করিয়াছেন; এবং ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের উত্তরের তাৎপর্য্যও এইরূপই। কিন্তু এক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা "কর্ম্মযোগের যোগ্যতা কিংবা প্রামাণ্য অধিক" (গী. ৫. ২) ভগবানের এই স্পষ্ট উত্তরের অর্থ লাগাইতে পারেন নাই! তাই, শেষে "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"—কর্ম্মযোগের প্রামাণ্য বিশেষ রকমের—এই বচন কর্ম্মযোগের স্তুতিমাত্র অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক; ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমার্গই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ, (গী. শাং. ভা. ৫. ২.; ৬. ১. ২; ১৮. ১১ দেখ) এইরূপ পূর্ব্বাপর সন্দর্ভবিরুদ্ধ নিজের মনগড়া আর একটা টিপ্পনী করিয়া কোন প্রকারে মনকে আশ্বস্ত করিতে হইয়াছে। শাংকরভাষ্যে শুদ্ধ নহে, রামানুজভাষ্যেও এই শ্লোক কর্ম্মযোগের স্তুতিবাচক অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে (গী. রা. ভ. ৫. ১)। রামানুজচার্য্য অদ্বৈতী না হইলেও তাঁহার মতে ভক্তিই মুখ্য সাধ্য হওয়ায়, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাধনই হইয়া যায় (গী. রাভা. ৩. ১ দেখ)।

মূলগ্রন্থ হইতে টীকাকারদিগের সম্প্রদায় ভিন্ন; কিন্তু টীকাকার, নিজের মার্গই মূলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সেই গ্রন্থের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু মূলগ্রন্থের কিরূপ টানা-বুনা ব্যাখ্যা হয় তাহা পাঠক দেখুন। "অর্জ্জুন! তোমার প্রশ্নই ঠিক্ নহে" এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের সংস্কৃত ভাষায় স্পষ্টশব্দে বলা আসে নাই কি? কিন্তু তাহা না করিয়া যখন "কর্ম্মযোগই বিশেষরূপে যোগ্য" এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন তখন সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের উক্ত অর্থ সরল নহে, এ কথা বলিতেই হয়; এবং পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলেও এই অনুমান দৃঢ় হয়। কারণ গীতাতেই, জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মের সন্ন্যাস না করিয়া, জ্ঞানোত্তরেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে নিজের সমস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে (গী. ২. ৬৪; ৩. ১৯; ৩. ২৫; ১৮. ৯ দেখ)। ইহার উপর শ্রীশংকরাচার্য্য আপন ভাষ্যে প্রথমে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়; এবং পুনরায় এই গীতার্থ স্থির করিয়াছেন যে, কেবল জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়া মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। ইহা হইতে পরে এই অনুমান করা হইয়াছে যে, যখন গীতার দৃষ্টিতেও মোক্ষের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, তখন চিত্তশুদ্ধি হইলে সমস্ত কর্ম্ম নিরর্থকই হইয়া থাকে; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ জ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায়, জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়'—এই মতই গীতায় ভগবানেরও গ্রাহ্য হইয়াছে। 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও কর্ম্ম করিতে হয়'—এই মতের নাম "জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষ"; এবং শ্রীশংকরাচার্য্যের উপরি-উক্ত যুক্তিবাদই তদ্বিরুদ্ধে মুখ্য আপত্তি। এইরূপ যুক্তিবাদই মধ্বাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন (গী. মা. ভা. ৩. ৩১. দেখ)। কিন্তু এই যুক্তিবাদ আমার মতে সন্তোষজনক কিংবা নিরুত্তরও নহে। কারণ, (১) কাম্য কর্ম্ম বন্ধক হইয়া জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও এই যুক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না; এবং (২) জ্ঞানোত্তর মোক্ষের জন্য কর্ম্ম অনাবশ্যক হইলেও 'অন্য কোন বলবৎ কারণের জন্য জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম করা আবশ্যক,' এইরূপ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উহা দ্বারা কোন বাধা হয় না। মুমুক্ষুর চিত্ত শুদ্ধ করাই জগতে কর্ম্মের উপযোগ নহে, কিংবা ইহারই জন্য কর্ম্ম উৎপন্নও হয় নাই; তাই মোক্ষ ব্যতীত অন্য কারণবশতঃ স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্মজগতের সমস্ত ব্যবহার জ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক, এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই কারণগুলি কি, তাহার সবিস্তর বিচার এই প্রকরণে পরে করা হইয়াছে। এক্ষণে এইটুকুই বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জ্জুনকে এই সমস্ত কারণ বলিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে; এবং এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না যে. চিত্তশুদ্ধির পর মোক্ষের জন্য কর্ম্মের অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া গীতায় সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানোত্তর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেই হইবে ইহা শাংকর-সম্প্রদায়ের মত সত্য; কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধ হয় না যে গীতার তাৎপর্য্যও তাহাই হইবে, কিংবা শাংকর অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে 'ধর্ম্ম'

মনে করিয়া তাহারই অনুকূলে গীতার কোনরূপ অর্থ করিতেই হইবে। জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন অপেক্ষা কর্ম্মযোগ স্বীকার করাই উত্তম পক্ষ, ইহাই তো গীতার স্থির সিদ্ধান্ত। তাহার পর, তাহাকে তুমি পৃথক সম্প্রদায়ই বল, কিংবা তাহার আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু গীতা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, সন্ন্যাসমার্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, অন্য পরমতাসহিষ্ণু সম্প্রদায়ের ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক! সন্ন্যাসমার্গসম্বন্ধে গীতার কোথাও অনাদরবুদ্ধি প্রদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ একই প্রকার নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষদৃষ্টিতে সমান মূল্যবান, এইরূপ ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং পরে "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি" স পশ্যতি (গী. ৫. ৫) এই দুই মার্গ একই অর্থাৎ তুল্যবল ইহা যে জানে সেই প্রকৃত তত্ত্ব জানে; কিংবা 'কর্ম্মযোগ' হইলেও তাহাতে ফলাশার 'সন্ন্যাস' করাই আবশ্যক হয়—"ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন" (গী. ৬, ২),—এইরূপ যুক্তিদ্বারা এই দুই ভিন্ন মার্গের একরূপতা করিয়াও দেখানো হইয়াছে। জ্ঞানোত্তর (প্রথমেই নহে) কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম্মযোগ স্বীকার করা, দুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে একই যোগ্যতার হইলেও লোকব্যবহারদৃষ্টিতে বিচার করিলে বুদ্ধিতে সন্ন্যাস রাখিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিষ্কাম করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিযোগে আমরণ লোকসংগ্রহকারী কর্ম্ম করিতে থাকা—এই মার্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। কারণ, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম এই দুই-ই তাহাতে বজায় থাকে, এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ; এবং তদনুসারে অর্জ্জুন পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ইহাদের মধ্যে ইহাই যাহা কিছু ভেদ। কেবল শারীর কর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংঘটিত কর্ম্ম দেখিলে, উভয়েই একই হইবেই; কিন্তু অজ্ঞান মনুষ্য তাহা আসক্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মনুষ্য অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিয়া থাকে (গী. ৩. ২৫)। গীতার এই সিদ্ধান্তই ভাস কবি স্বীয় নাটকে বলিয়াছেন—

"প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্য্যযোগে।
সমত্বমভ্যেতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ॥

"জ্ঞানী ও মূর্খ ইহাদের কর্ম্ম করিবার পক্ষে দেহ একরকমই, কেবল বুদ্ধিই ভিন্ন হইয়া থাকে" (অবিমার ৫. ৫)।

কতকগুলি সন্ন্যাসমার্গের ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা বলে যে "গীতায় অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু অর্জ্জুন অজ্ঞান বলিয়া চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবারই তাঁহার অধিকার ছিল—এই কথা মনে রাখিয়াই ভগবান এই উপদেশ করিয়াছেন। সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের মতেও কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ"। এই যুক্তিবাদের সরল ভাবার্থ ইহাই দেখা যায় যে, ভগবান অর্জ্জুনকে যদি "তুমি অজ্ঞানী" এইরূপ বলিতেন, তবে কঠোপনিষদে নচিকেতা যেরূপ পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য জেদ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন সেইরূপ জেদ করিতেন; এবং তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলিতেই হইত; এবং সেইরূপ পূর্ণজ্ঞানের উপদেশ তাঁহাকে দিলে তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন এবং তাহা হইলে তো ভগবানের ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইত এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তকে

ঠকাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থনার্থ ভগবানেরও উপর যাহারা এই প্রতারণারূপ গর্হিত কার্য্য আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ না করাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু সাধারণ লোক এই ভ্রান্ত যুক্তিবাদের দ্বারা পাছে প্রতারিত হয় সেইজন্যই এইটুকু বলিতেছি যে "তুমি অজ্ঞানী, সেইজন্য কর্ম্ম কর" অর্জ্জুনকে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না; এবং ইহার পরেও যদি অর্জ্জুন কোন গোলযোগ করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনকে অজ্ঞানী রাখিয়াই তাহা দ্বারা প্রকৃতি-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করাইবার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ)। কিন্তু সেরূপ না করিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'ই পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া (গী. ৭. ২; ৯. ১; ১০. ১; ১৩. ২; ১৪. ১), ১৫শ অধ্যায়ের শেষে এই শাস্ত্র বুঝিয়া লইতে পারিলে মনুষ্য জ্ঞাতা ও কৃতার্থ হয়" (গী. ১৫. ২০), এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তাঁহা দ্বারা তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ করাইয়াছেন (গী. ১৮. ৬৩ দেখুন)। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাতা পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই থাকিবে—এই মতই সর্ব্বোত্তম, এবং ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন ইহা একবার মানিয়া লইলেও, তাঁহাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার সমর্থনার্থ, জনকাদি প্রাচীন কর্ম্মযোগীদিগের এবং ভগবান নিজেরও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অজ্ঞানী ছিলেন এইরূপ কখনো বলা যাইতে পারে না। তাই, সাম্প্রদায়িক আগ্রহের এই শুষ্ক তর্ক সর্ব্বথা অনুচিত ও ত্যাজ্য, এবং গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে, এইকথা বলিতেই হয়।

যাক্। সিদ্ধাবস্থাতেও কর্ম্মত্যাগ (সাংখ্য) ও কর্ম্মযোগ (যোগ), এই দুই মার্গ শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। অনন্তর এই বিষয়ে, গীতাশাস্ত্রের দুই মুখ্য সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে—(১) এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ মোক্ষ দৃষ্টিতে পরস্পরনিরপেক্ষ ও তুল্যবল, একটি অপরটির অঙ্গ নহে; এবং (২) ইহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই অধিক প্রশস্ত। এই দুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও টীকাকারেরা কেন ও কি প্রকারে তাহাদের বিপর্য্যয় করিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত প্রস্তাবনা লিখিতে হইয়াছে। এইক্ষণে, সিদ্ধাবস্থাতে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ কর্ম্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, এই যে উপস্থিত প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য গীতায় যে সকল কারণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই নিরূপণ করিব। তন্মধ্যে দুই এক বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে সুখ-দুঃখ-বিবেচন-প্রকরণে করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার কেবল সুখ-দুঃখ সম্বন্ধেই হওয়ায় সেখানে এই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিতে পারা যায় নাই। তাই, তাহারই জন্য এই স্বতন্ত্র প্রকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি শ্রৌতগ্রন্থে এবং অংশতঃ উপনিষদেও এইরূপ স্পষ্ট বচন আছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণই হউক বা ক্ষত্রিয়ই হউক—অগ্নিহোত্র পালন করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যাগযজ্ঞ অধিকারানুসারে করিবে এবং

বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবে। উদাহরণ যথা—"এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রম",—অগ্নিহোত্ররূপ এই সত্র মরণ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে হইবে (শ. ব্রা. ১২. ৪. ১. ১); "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী"—বংশের ধারা ভঙ্গ করিবে না (তৈ. উ. ১. ১১. ১,); কিংবা "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—জগতে যাহা কিছু আছে তাহা পরমেশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত অর্থাৎ আমার নহে তাঁহার, এইরূপ বুঝিবে, এবং এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

"কর্ম্ম করিতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষের পরমায়ুর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে, এবং এইরূপ ঈশাবাস্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম তোমার (অর্থাৎ পুরুষের) বন্ধন হইবে না ; ইহা ব্যতীত (উক্ত বন্ধন পরিহার করিবার জন্য) অন্য মার্গ নাই, (ঈশ. ১ ও ২)" ; ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে উঠিবার পথে "ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি মোক্ষম্" (তৈ. ২. ১. ১)—ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় ; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বে. ৩. ৮)—(জ্ঞান ব্যতীত) মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই ; "পূর্ব্বে বিশ্বাসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণয়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" (বৃ. ৪. ৪. ২২ ও ৩. ৫. ১)—পূর্ব্বকালের জ্ঞানী পুরুষেরা পুত্রাদি ভালবাসিতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্মা হইল, তখন আমার (অন্য) সন্তানের কি প্রয়োজন, এইরূপ বলিয়া তাঁহারা সন্ততি, সম্পত্তি ও স্বর্গাদির মধ্যে কোন কিছুরই 'এষণা' অর্থাৎ ইচ্ছা না করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; কিংবা "এই প্রকারে বিরাগী পুরুষদিগের মোক্ষলাভ হয়" (মু. ১. ২. ১১); অথবা পরিশেষে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবা. ৪)—যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই দিন সন্ন্যাস লইবে ; —এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয় বচনাদিও বৈদিক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদাজ্ঞা দ্বিবিধ হওয়ায় (মভা. শাং. ২৪০. ৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কিংবা কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহা দেখা আবশ্যক। আচার অর্থাৎ শিষ্ট লোকদিগের আচরণ, রীতি কিংবা চাল কিরূপ, তাহা দেখিয়া এই প্রশ্নের নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উভয়বিধ। শুক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সন্ন্যাসমার্গ,- এবং জনক, শ্রীকৃষ্ণ, জৈগীষব্য প্রভৃতি জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্মমার্গই অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস হইতে প্রকাশ পায়। এই অভিপ্রায়েই "তুল্যং তু দর্শনং" (বেসূ. ৩. ৪. ৯) অর্থাৎ আচারদৃষ্টিতে এই দুই পন্থা তুল্যবল, ইহা সিদ্ধান্তপক্ষে বাদরায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন।

বিবেকী সর্ব্বদা মুক্তঃ কুর্ব্বতো নাস্তি কর্ত্তৃতা।
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণজনকৌ যথা ॥

পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের ন্যায় অকর্ত্তা, অলিপ্ত

ও সর্ব্বদা মুক্তই থাকেন"—এইরূপ স্মৃতিবচনও আছে।* সেইরূপ আবার ভগবদ্‌গীতাতেও কর্ম্মযোগীদিগের পরম্পরা বলিতে গিয়া মনু, ইক্ষ্বাকু ইত্যাদির নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ" (গী. ৪. ১৫) —ইহা জানিয়া পূর্ব্বে জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্ম করিয়াছেন। জনক ব্যতীত এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগবাসিষ্ঠে ও ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে (যো. ৫. ৭৫); ভাগ ২, ৮. ৪৩-৪৫)। জনকাদির পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই এইরূপ কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। তাই বলিতেছি যে, ইহারা সকলে জীবন্মুক্ত ছিলেন এইরূপ যোগবাসিষ্ঠে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, মহাভারতেও ব্যাস আপন পুত্র শুককে মোক্ষধর্ম্মের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শেষে জনকের নিকট পাঠাইলেন এইরূপ কথা বিবৃত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩২৫ ও যো. ৩. ১ দেখুন)। সেইরূপ উপনিষদেও অশ্বপতি কৈকেয় রাজা উদ্দালক ঋষিকে (ছাং. ৫. ১১-২৪), এবং কাশিরাজ অজাতশত্রু গার্গ্য বালাকীকে (বৃ. ২. ১) ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন এইরূপ কথা আছে। তথাপি অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, জনকসুলভা-সংবাদে জনক "আমি মুক্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়া রাজ্য করিতেছি এবং আমার এক হাতে চন্দন মাখিলেও এবং অন্য হস্ত কাটিয়া ফেলিলেও আমার পক্ষে দুই-ই সমান" ইত্যাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথমে করিয়া (মভা. শাং. ৩২০-৩৬) পরে সুলভাকে বলিতেছেন—

"মোক্ষে হি ত্রিবিধা নিষ্ঠা দৃষ্টাঽন্যৈর্মোক্ষবিত্তমৈঃ।
জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্ব্বত্যাগশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥
জ্ঞাননিষ্ঠাং বদন্ত্যেকে মোক্ষশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
কর্ম্মনিষ্ঠাং তথৈবান্যে যতয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥
প্রহায়োভয়মপ্যেবং জ্ঞানং কর্ম্ম চ কেবলম্ ॥
তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা ॥

অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশাস্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন— (১) 'জ্ঞান' লাভ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা ; ইহাকেই কোন কোন মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠা বলেন ; (২) সেইরূপ আবার, অন্য সূক্ষ্মদর্শী লোকে কর্ম্মনিষ্ঠা বলেন ; কিন্তু কেবল জ্ঞান ও কেবল ধর্ম্ম এই দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া, (৩) এই তৃতীয় (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম্ম করিবার) নিষ্ঠা (আমাকে) সেই মহাত্মা (পঞ্চশিখ) বলিয়াছেন" (মভা. শাং. ৩২০. ৩৮-৪০)। নিষ্ঠা শব্দের সাধারণ অর্থ অন্তিম স্থিতি, আধার কিংবা অবস্থা। কিন্তু এই স্থানে এবং গীতাতেও নিষ্ঠা শব্দের "যে প্রকার জীবন যাপন করিলে শেষে মোক্ষলাভ হয় সেইরূপ জীবনযাত্রার মার্গ" এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত। গীতার শাঙ্করভাষ্যেও নিষ্ঠা = অনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্য— অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ আচরণীয় তাহার প্রতি তৎপরতা অর্থাৎ তাহাতে মগ্ন থাকা, এই অর্থই করা হইয়াছে। জীবনের এই মার্গ মধ্যে

* ইহা স্মৃতির বচন বলিয়া আনন্দগিরি কঠোপনিষদের (কঠ ২. ১৯) শাঙ্করভাষ্যের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মূল বচনটি কোথাকার তাহা আমি জানি না।

জৈমিনি প্রভৃতি অমীমাংসকেরা জ্ঞানের গুরুত্ব না দিয়া কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়াছেন—

ঈজানা বহুভিঃ যজ্ঞৈঃ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
শাস্ত্রাণি চেৎ প্রমাণং স্যুঃ প্রাপ্তাস্তে পরমাং গতিম্॥

কারণ, ঐরূপ না মানিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের আজ্ঞা ব্যর্থ হইবে, (জৈসূ. ৫.২. ২৩ শাংকরভাষ্য দেখ)। এবং উপনিষৎকার বাদরায়ণাচার্য্য সমস্ত যাগযজ্ঞাদি গৌণ স্থির করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানব্যতীত আর কিছুরই দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. ৩. ৪. ১. ২)। কিন্তু এই দুই নিষ্ঠাকে ছাড়িয়া দিয়া আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করিবার এক তৃতীয় নিষ্ঠাই পঞ্চশিখ (নিজে সাংখ্যমার্গী হইলেও) আমাকেও বলিয়াছেন, এইরূপ জনক বলেন। "দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া" এই শব্দগুলি হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, এই তৃতীয় নিষ্ঠাটি পূর্ব্বের দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন নিষ্ঠারই অঙ্গীভূত নহে,—প্রত্যুত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রেও (বেসূ. ৩, ৪, ৩২-৩৫) জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠার উল্লেখ করা হইয়াছে; ভগবদ্গীতায় জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠাই—তাহার ভিতর ভক্তি নূতন যোগ করিয়া—বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্মমার্গ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুদ্ধ স্বর্গপ্রদ—এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত (গী. ২, ৪২-৪৪; ৯. ২১)। তাই যে মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে তাহার 'নিষ্ঠা' নামই দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার দ্বারা শেষে মোক্ষলাভ হয় সেই মার্গকেই নিষ্ঠা বলা উচিত—এই ব্যাখ্যা সকলেরই স্বীকৃত। অতএব সকলের মতের সাধারণ বর্ণনা করিবার সময় জনক তিন নিষ্ঠার কথা বলিলেও মীমাংসকদিগের নিছক্ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মমার্গ 'নিষ্ঠা' হইতে বাহির করিয়া দিয়া সিদ্ধান্তপক্ষে স্থির নির্দ্ধারিত দুই নিষ্ঠাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৩. ৩)। নিছক্ জ্ঞান (সাংখ্য) ও জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম (যোগ) এই দুই-নিষ্ঠা; এবং সিদ্ধান্তপক্ষীয় এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ জনকের কথা অনুসারে তৃতীয়) নিষ্ঠার সমর্থনার্থ "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গী. ৩. ২০) জনকাদি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—এই পুরাতন দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজার কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যাস বিচিত্রবীর্য্যের বংশ বজায় রাখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তিন বৎসর সতত পরিশ্রম করিয়া জগতের উদ্ধারার্থ মহাভারতও লিখিলেন; এবং কলিযুগে স্মার্ত্ত অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীশংকরাচার্য্যও স্বকীয় অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা ও উদ্যোগে ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন ইহা সর্ব্বশ্রুত কথা। অধিক কি, স্বয়ং ব্রহ্মদেব যখন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়; ব্রহ্মদেব হইতেই মরীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া সৃষ্টিক্রম বজায় রাখিবার জন্য আমরণ প্রবৃত্তিমার্গই অঙ্গীকার করেন; এবং সনৎকুমারাদি অন্য সাত মানসপুত্র জন্ম হইতেই বিরক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তিপন্থী—এইরূপ মহাভারতে নারায়ণীয়ধর্ম্মনিরূপণে বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৩৯ ও ৩৪০)। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরা এবং ব্রহ্মদেবও কর্ম্ম করিবারই এই প্রবৃত্তিমার্গ কেন স্বীকার করিলেন? বেদান্তসূত্রে তাহার এই প্রকার উপপত্তি কথিত হইয়াছে—"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম্" (বেসূ. ৩. ৩. ৩২)—যাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত যে অধিকার, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই উপপত্তির বিচার পরে করা যাইবে। উপপত্তি যাহাই হউক না কেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই পন্থা জগতের আরম্ভ হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে—এ কথাও নির্ব্বিবাদ। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বাচার এইরূপ দ্বিবিধ হওয়ায় কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ কিংবা প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সন্ন্যাসমার্গী লোকদিগের আর একটী যুক্তিক্রম এই যে, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ব্যতীত মোক্ষ হয় না ইহা যদি নির্ব্বিবাদ হয়, তবে জ্ঞানলাভ হইলে পর তৃষ্ণামূলক কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট্ যত শীঘ্র হয় দূর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মহাভারতের শুকানুশাসনে—ইহাকেই 'শুকানুপ্রশ্ন'ও বলে—সন্ন্যাসমার্গেরই প্রতিপাদন আছে। সেই স্থানে শুক ব্যাসকে প্রশ্ন করিতেছেন—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছন্তি কর্ম্মণা॥

"বেদ কর্ম্মত্যাগ করিতেও বলেন আবার কর্ম্ম করিতেও বলেন; এরূপ স্থলে, বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা এবং নিছক্ কর্ম্মের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয়, তাহা আমাকে বল" (শাং. ২৪০. ১) তাহার উত্তরে ব্যাস বলিলেন—

কর্ম্মণা বিদ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥

"কর্ম্মের দ্বারা জীব বন্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়; তাই পারদর্শী যতি কিংবা সন্ন্যাসী কর্ম্ম করে না" (শাং. ২৪০. ৭)। এই শ্লোকের প্রথম চরণের বিচার পূর্ব্বপ্রকরণে আমি করিয়াছি। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে" এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই দেখানো হইয়াছে যে, "কর্ম্মণা বধ্যতে" এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, কর্ম্মের দ্বারা জড় কিংবা চেতন, কেহ বন্ধও হয় না, মুক্ত হয় না; মনুষ্য ফলাশায় কিংবা নিজের আসক্তিনিবন্ধন কর্ম্মে বন্ধ হয়; এই আসক্তির মোচন হইলে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিলেও সে মুক্ত। এই অর্থই মনে করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণে (২. ৪. ৪২) রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে—

প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব॥

"কর্ম্মময় সংসারের প্রবাহে পতিত মনুষ্য বাহ্যতঃ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও অলিপ্ত থাকে"। অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কর্ম্ম দুঃখময় বলিয়া তাহা ছাড়িবার আবশ্যকতা নাই; মনকে শুদ্ধ ও সম করিয়া ফলাশা ছাড়িলেই সমস্ত কাজ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ

হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ্ হইতে পারে না। তাই অনুগীতায় "তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্বন্তি"—অতএব কর্ম্ম করে না—এই বাক্যের বদলে—

তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ ।

"অতএব পারদর্শী পুরুষ কর্ম্মতে আসক্তি রাখে না" (অশ্ব. ৫১. ৩৩) এইরূপ বাক্য আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে—

কুর্বতে যে তু কর্ম্মাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ ।
অনাশীর্যোগসংযুক্তাস্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥

"যে সকল জ্ঞানী পুরুষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ফলাশা না রাখিয়া (কর্ম্ম) যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করে তাহারাই সাধুদর্শী" (অশ্ব. ৫০. ৬. ৭),—এইরূপ কর্ম্মযোগ স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইরূপ—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ ।

এই পূর্ব্বার্দ্ধে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শৌনকের এই উপদেশ—

তস্মাদ্ধর্মানিমান্ সর্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ।

"কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম ছাড়ো বেদ, উভয়ই বলেন ; তাই (কর্ত্তৃত্বের) অভিমান না রাখিয়া আমাদিগের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে" (বন। ২। ৭৩)। শুকানুপ্রশ্নেও ব্যাসদেব শুককে দুইবার স্পষ্ট বলিয়াছেন—

এষা পূর্বতরা বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ।
জ্ঞানবানের কর্ম্মাণি কুর্বন্ সর্ব্বত্র সিধ্যতি ॥

"জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা, ইহাই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বকালের (পূর্বতন) পুরাতন বৃত্তি" (মভা. শাং. ২৩৭. ১ ; ২৩৪. ২৯)। "জ্ঞানবানের" এই পদের দ্বারা জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই এইস্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাক্ ; দুই পক্ষের এই বচনগুলি নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে শান্তভাবে, বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" এই যুক্তিক্রমে "তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্বন্তি"—অতএব কর্ম্ম করে না—কর্ম্মত্যাগমূলক এই এবই অনুমান নিষ্পন্ন না হইয়া, "তস্মাৎকর্ম্মসু নিঃস্নেহাঃ"—অতএব কর্ম্মে আসক্তি রাখে না—এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার অন্য অনুমানও ততটাই যোগ্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। কেবল আমিই এইরূপ দুই অনুমান করিতেছি এরূপ নহে, স্বয়ং ব্যাসও এই অর্থই শুকানুপ্রশ্নের নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন —

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যস্মিন্ বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মঃ নিবৃত্তিশ্চ বিভাষিতঃ ॥*

"এই দুই মার্গের উপর বেদ (একই রূপ) প্রতিষ্ঠিত—একটি প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, অন্যটি নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের ধর্ম্ম" (মভা. শাং. ২৪০-৬)। সেইরূপ আবার

* এই চরণের 'নিবৃত্তিশ্চ সুভাষিত' 'নিবৃত্তিশ্চ বিভাবিতঃ' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। যে কোন পাঠই গ্রহণ কর না কেন, প্রথমে 'দ্বাবিমৌ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; ইহা হইতে দুই পন্থা যে, স্বতন্ত্র তাহা নির্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

নারায়ণীয় ধর্ম্মেতেও এই দুই পন্থাই পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রচলিত থাকার বর্ণনা আছে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মনে রেখো মহাভারতে প্রসঙ্গানুসারে এই দুই পন্থা বর্ণিত হওয়ায় প্রবৃত্তিমার্গেরই ন্যায় নিবৃত্তি-মার্গের সমর্থক বচনাদিও মহাভারতেই পাওয়া যায়। গীতার সন্ন্যাসমার্গীয় টীকায় নিবৃত্তিমার্গের এই বচনকেই মুখ্য মনে করিয়া, তাহা ছাড়া যেন আর কোন পন্থাই নাই কিংবা যদি থাকে তো সে গৌণ অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ, এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রতিপাদন সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, এবং সেইজন্য গীতার্থ সরল ও স্পষ্ট হইলেও আজিকার কালে তাহা অনেকের দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" (গী. ৩. ৩) গীতার এই শ্লোকের জুড়ী "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" এই শ্লোক ; এই স্থানে দুই তুল্যবল মার্গ বুঝাইবার হেতু আছে, এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এই সুস্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই শ্লোকেই দুয়ের বদলে এক মার্গই প্রতিপাদ্য এইরূপ কেহ কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন !

এই প্রকারে সুস্পষ্ট হইলে যে, কর্ম্মসন্ন্যাস (সাংখ্য) ও নিষ্কাম কর্ম্ম (যোগ) বৈদিক ধর্ম্মের দুই স্বতন্ত্র মার্গ এবং সে বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে উহারা বিকল্পাত্মক নহে, কিন্তু "সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের যোগ্যতা বিশেষ রকমের"। এক্ষণে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে গীতা পরে বলেন যে, যে জগতে আমরা থাকি সেই জগৎ এবং তাহাতে ক্ষণকাল জীবিত থাকার যদি কর্ম্ম হয়, তবে কর্ম্ম ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? এবং এই জগতে অর্থাৎ কর্ম্মভূমিতেই যদি থাকিতেই হয় তবে কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবই বা কি প্রকারে ? যতদিন দেহ থাকে সে পর্য্যন্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি বিকার আমাদিগকে যেমন ছাড়ে না প্রত্যক্ষ দেখি, (গী. ৫. ৮, ৯), এবং তন্নিবারণার্থ ভিক্ষা মাগিবার লজ্জাজনক কর্ম্ম করাও যদি সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে বৈধ হয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য ব্যবহারিক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতেই কি প্রকারে প্রত্যবায় হয় ? কর্ম্ম করিলে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দ হারাইবে কিংবা ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অদ্বৈত বুদ্ধি বিচলিত হইবে এই ভয়ে অন্য কর্ম্ম যদি কেহ ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি দৃঢ় হয় নাই বলিতে হয় ; এবং মনোনিগ্রহ অদৃঢ় থাকিতে যে কর্ম্মত্যাগ, তাহা গীতানুসারে মোহাত্মক অর্থাৎ তামস কিংবা মিথ্যাচার (গী. ১৮. ৭ ; ৩. ৬)। এই অবস্থায় এই অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইরূপ অদৃঢ় মনোনিগ্রহকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ করিতে হইলে, নিষ্কামবুদ্ধিপরিবর্দ্ধক যজ্ঞদানাদি গৃহস্থাশ্রমের শ্রৌত কিংবা স্মার্ত্ত কর্ম্মই মনুষ্যের করিতে হইবে। ফলকথা, এইপ্রকার কর্ম্মত্যাগ কখনই শ্রেয়স্কর হয় না। ভাল, যদি বলো, মন নির্ব্বিষয় এবং তাহা উহার অধীন, তবে উহার কর্ম্মের ভয়ই কেন, কিংবা কর্ম্ম না করিবার ব্যর্থ আগ্রহই বা সে করে কেন ? বর্ষার জন্য যে ছত্র তাহার পরীক্ষা যেরূপ বর্ষাকালেই হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কিংবা—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

"যে সকল কারণে বিকার উৎপন্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা বিষয় চোখের সামনে থাকিলেও যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই সকল পুরুষকেই

ধৈর্য্যশালী বলা যায়" (কুমার ১. ৫৯)—কালিদাসের এই ব্যাপক নীতিসূত্র অনুসারে মনোনিগ্রহকে কর্ম্মের কষ্টিপাথরেই পরখ করিয়া, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার সাক্ষ্য শুদ্ধ অন্যের নিকট নহে, আপনার নিকটেও পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতেও শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপতিত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য এইরূপ সিদ্ধ হয় (গী. ১৮. ৬)। ভাল; যদি বল, "মন বশে থাকায় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি বিগড়াইয়া যাইবার কোন ভয় নাই; কিন্তু মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ব্যর্থ কর্ম্ম করিয়া দেহকে কষ্ট দিতে চাহি না", তবে কায়ক্লেশভয়ে অর্থাৎ কেবল দেহের কষ্ট হইবে এই ক্ষুদ্র ভয়ে কৃত এই কর্ম্মত্যাগ রাজসিক; ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস কর্ম্মত্যাগে পাওয়া যায় না (গী. ১৮. ৮)। তবে কর্ম্মত্যাগই করিব কেন? সমস্ত কর্ম্ম মায়াজগতের অতএব অনিত্য হওয়া প্রযুক্ত ব্রহ্ম-জগতের নিত্য আত্মার উহার মধ্যে পতিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা যদি কেহ বলেন,—তাহাও ঠিক নহে। কারণ পরব্রহ্ম যদি নিজেই মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইরূপ মায়ার মধ্যে মনুষ্যেরও কাজ করিতে বাধা কি? ব্রহ্মজগৎ ও মায়াজগৎ, সমস্ত জগতের যেরূপ এই দুই ভাগ আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদি এইরূপ দুই আছে। তম্মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মের যোগ করিয়া দিয়া ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কর এবং এই ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল মায়িক দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়া-জগতের ব্যবহার কর। এইরূপ করিলে, মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধক আসিবে না; এবং উক্ত দুই ভাগের যোগ আপোষে নিবন্ধ হইলে জগতের কোন ভাগের উপেক্ষা বা বিচ্ছেদ করিবার দোষও লাগিবে না; এবং ব্রহ্মজগৎ ও মায়াজগৎ—পরলোক ও ইহলোক—এই দুই লোকেরই কর্ত্তব্য করাতে তোমার শ্রেয় লাভ হইবে। ঈশোপনিষদে এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে (ঈশ. ১১)। এই শ্রুতিবচনের সবিস্তার বিচার পরে করা যাইবে। এক্ষণে এইটুকু বলিতেছি যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভবকারী জ্ঞানী পুরুষ মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরীরের দ্বারা অথবা কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই করিয়া থাকে, এইরূপ গীতাতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৪. ২১; ৫. ১২) তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই; এই হেতু, ১৮শ অধ্যায়ে 'নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে ফলাশা ছাড়িয়া কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত 'সাত্ত্বিক' কর্ম্মত্যাগ'—কর্ম্ম না করা প্রকৃত কর্ম্ম-ত্যাগ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী. ১৮. ৯)। কর্ম্ম মায়াজগতের হইলেও তাহা পরমেশ্বরই কোন অজ্ঞেয় কারণে উৎপন্ন করিয়াছেন; তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন, অতএব বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল শারীর কর্ম্ম করিলে মোক্ষের বাধা হয় না, ইহা নির্বিবাদ। তবে, চিত্তেতে বৈরাগ্য রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শাস্ত্রপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে বাধাই বা কি? "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১)—এই জগতে ক্ষণকালও কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারা যায় না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে; আবার অনুগীতায় "নৈষ্কর্ম্যং ন চ লোকেঽস্মিন্ মুহূর্ত্তমপি লভ্যতে" (অশ্ব. ২০. ৭)—এই লোকে (কেহই) এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম হইতে মুক্ত নহে—এইরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সূর্য্যচন্দ্রাদি পর্য্যন্ত সকলে নিরন্তর কর্ম্মই করিতেছে! অধিক কি, কর্ম্মই জগৎ আর জগৎই কর্ম্ম ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা কর্ম্মের ক্ষণমাত্র

বিরাম নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। দেখ, একদিকে ভগবান গীতাতে বলিতেছেন "কর্ম্ম ছাড়িলে খাওয়া পর্য্যন্ত হইবে না" (গী. ৩. ৮) অপরদিকে বনপর্ব্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"অকর্ম্মণা বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন" (বন. ৩২. ৮), কর্ম্ম ব্যতীত প্রাণীমাত্রের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; সেইরূপ দাসবোধেও প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া তাহার পর "প্রপঞ্চ সাণ্ডূন পরমার্থ কেলা। তরী অন্ন মিলেনা খায়লা।" অর্থাৎ—"প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমার্থ করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না" (দা. ১২. ১. ৩) এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীও বলিয়াছেন। ভাল; স্বয়ং ভগবানের চরিত্র আলোচনা করুন; দেখিবেন যে, ভগবান যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার হইয়া, এই মায়িক জগতে সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের বিনাশসাধনরূপ কর্ম্ম করিয়াই আসিতেছেন (গী. ৪. ৮ ও মভা. শাং. ৩৩৯. ১০৩ দেখ)। এই কর্ম্ম যদি আমি না করি তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা তিনিই গীতাতে বলিয়াছেন (গী. ৩. ২৪)। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যখন স্বয়ং ভগবান্ জগতের ধারণার্থ কর্ম্ম করিতেছেন, তখন জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম নিরর্থক, এই কথার কোন ফল নাই। তাই, "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" (মভা. বন. ৩১২. ১০৮)—যে ক্রিয়াবান্ সে-ই পণ্ডিত—এই নীতিসূত্র অনুসারে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সকলকেই এই উপদেশ করিতেছেন যে, এই জগতে কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না; কর্ম্মের বাধা হইতে বাঁচিবার জন্য মনুষ্যের সর্ব্বদা নিজ ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য, ফলাশা ছাড়িয়া, বিরক্ত বুদ্ধিতে করা—এই একমার্গ (যোগ) মনুষ্যের আয়ত্তাধীন এবং ইহাই উত্তমও বটে। প্রকৃতি তো নিজের কাজ সর্ব্বদা করিতেই থাকিবে; কিন্তু উহাতে কর্ত্তৃত্বের অভিমান-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুমি মুক্তই (গী. ১. ২৭; ১৩. ২৯.; ১৪. ১৯; ১৮. ১৬)। মুক্তির জন্য কর্ম্মত্যাগ কিংবা সাংখ্যের অনুসারে কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই; কারণ এই কর্ম্মভূমিতে সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ করা সম্ভবই নহে।

এই সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ ফ্যাকড়া বাহির করেন যে, মানিলাম যে, কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্য কর্ম্ম ছাড়িবার আবশ্যকতা নাই, কেবল কর্ম্মফলাশা ত্যাগ করিলেই সমস্ত নির্ব্বাহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিষ্কাম হয় তখন সমস্ত বাসনা ক্ষয় হয় এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণই অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কায়ক্লেশভয়ে নহে—বাসনাক্ষয় প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম্ম আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়। এই জগতে মোক্ষই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা, সম্পত্তি কিংবা স্বর্গলোকাদির সুখ—এই সমস্তের কোনও 'এষণা' (ইচ্ছা) থাকে না (বৃ. ৩. ৫. ১ ও ৪. ৪. ২২) বলিয়া কর্ম্ম না ছাড়িলেও শেষে সেই জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণাম ইহাই হয় যে, কর্ম্ম আপনিই ছুটিয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

"জ্ঞানামৃত পান করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছে সেই পুরুষের পরে কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না; এবং যদি থাকে তো সে তত্ত্বজ্ঞানী নহে" এইরূপ উত্তরগীতায় (১. ২৩)

উক্ত হইয়াছে। * ইহা জ্ঞানী পুরুষের দোষ বলিয়া যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা ঠিক নহে ; কারণ ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের এক অলংকার—“অলংকারো হ্যয়মস্মাকং যদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ” (বেসূ. শাং. ভা. ১. ১. ৪)—এইরূপ শংকরাচার্য্য বলিয়াছেন। সেইরূপ গীতাতেও “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে” (গী. ৩. ১৭) জ্ঞানীর পরে আর কিছুই করিবার থাকে না ; তাঁহার সমস্ত বৈদিক কর্ম্মের কোনই প্রয়োজন নাই (গী. ২. ৪৬) ; অথবা “যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে” (গী. ৬. ৩) যে যোগারূঢ় তাহার শমই কারণ এইরূপ বচন আছে। তাছাড়া “সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী” (গী. ১২. ১৬) অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ যে ত্যাগ করে, এবং “অনিকেতঃ” (গী. ১২. ১৯) অর্থাৎ যাহার গৃহ নাই ইত্যাদি বিশেষণও জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনায় গীতাতে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা হইতে—জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মবন্ধন আপনা-আপনিই মোচন হয়—এই কথা ভগবদ্‌গীতার মান্য এইরূপ কাহারও কাহারও মত। কিন্তু আমার মতে, গীতা-বাক্যগুলির এই অর্থ এবং উপরি-উক্ত যুক্তিবাদও ঠিক্ নহে। তাই তদ্বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিতেছি।

মনুষ্য জ্ঞানী হইলে তাহার সকল প্রকার ইচ্ছা কিংবা বাসনা বিলুপ্ত হওয়া উচিত, এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা সুখদুঃখবিবেক প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। শুধু বাসনা বা ইচ্ছা থাকতে কোন দুঃখ নাই, আসক্তিই দুঃখের প্রকৃত মূল। তাই, সর্ব্বপ্রকার বাসনা বিনষ্ট না করিয়া জ্ঞানী কেবল আসক্তি ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। আসক্তি চলিয়া যাইবার সঙ্গেই সমস্ত কর্ম্মও যে ছাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। অধিক কি, বাসনা হইতে মুক্ত হইলেও সমস্ত কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা থাক বা না থাক, শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি কর্ম্ম নিত্য সমান চলিতে থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। বেশী দূরে যাইতে হইবে কেন? ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও তো কর্ম্মই ; পূর্ণজ্ঞান হইলেও আপনার বাসনা দ্বারা কিংবা বাসনাক্ষয়ের দ্বারা উহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা হইতে মুক্ত বলিয়া কোনও জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এ কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এবং সেইজন্যই “নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ” (গী. ৩. ৫) যে-ই হউক না কেন, সে কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—এই বচন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম তো নিসর্গতঃ প্রাপ্ত প্রবাহপতিত ও অপরিহার্য্য, তাহা মনুষ্যের বাসনার উপর ঝুলিয়া নাই, ইহা গীতাশাস্ত্রের কর্ম্মযোগের প্রথম সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম ও বাসনার পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ নাই এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইলে পর বাসনাক্ষয়ের সঙ্গেই কর্ম্মেরও ক্ষয় স্বীকার করা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর, বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের কি প্রকারে করিতে হইবে এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার টীকা দেখ)। জ্ঞানীপুরুষের জ্ঞানোত্তর নিজের বলিয়া কোন কর্ত্তব্য থাকে না, এ

* ইহা শ্রুতির শ্লোক—এই ধারণা ঠিক্ নহে। বেদান্তসূত্রের শাংকর ভাষ্যে এই শ্লোকটি নাই। কিন্তু সনৎসুজাতীয়ের ভাষ্যে আচার্য্য তাহা গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি লিঙ্গপুরাণে ইহা আছে বলিয়াছেন। সুতরাং শ্লোকটি সন্ন্যাস মার্গের, কর্ম্মযোগের নহে নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থেও এইরূপ বচনাদি আছে (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)।

কথা গীতার মান্য। কিন্তু ইহার পর গীতা ইহাও বলিতেছেন, যে, যে কেহই হউক না কেন, কর্ম্মবন্ধন হইতে কেহই মুক্ত হয় না। জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য থাকে না এবং কর্ম্ম মোচন হয় না, এই দুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু গীতার কথা সেরূপ নহে। গীতা উহাদের এই মিল করিয়া বলেন যে, যখন কর্ম্ম অপরিহার্য্য, তখন জ্ঞানী পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না, অতএব তাহার আপনার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করাই কর্ত্তব্য। সার কথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে” এই বাক্যে ‘কার্য্যং ন বিদ্যতে’ এই শব্দগুলি অপেক্ষা ‘তস্য’ (অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষের) এই শব্দ অধিক গুরুত্বসূচক ; এবং তাহার ভাবার্থ এই যে, ‘তাহার নিজের’ জন্য প্রাপ্ত কোন কর্ম্ম থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর তাহার আপন কর্ত্তব্য তাহাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে করিতে হইবে। পরে ১৯শ শ্লোকে ‘তস্মাৎ’ এই কারণবোধক পদ প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুনকে এই অর্থের উপদেশ করিয়াছেন, “তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার” (গী. ৩. ১৯)—তাই শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত নিজে কর্ত্তব্য তুমি আসক্তি না রাখিয়া করিয়া যাও, কর্ম্ম ছাড়িও না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পরিব্যক্ত কার্য্যকারণভাবে এবং অধ্যায়ান্তর্ভূত সমস্ত প্রকরণের সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্ন্যাসমার্গীর কথা অনুসারে “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে” এই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মানা যুক্তিসিদ্ধ নহে এইরূপ উপলব্ধি হইবে। নিম্ন-প্রদত্ত দৃষ্টান্তই তাহার উত্তম প্রমাণ। জ্ঞানলাভের পর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়,’ এই সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥

“হে পার্থ! ‘আমার’ বলিয়া ত্রিভুবনে কোন কর্ত্তব্য (অবশিষ্ট) নাই, অথবা অপ্রাপ্ত কোন বস্তু পাইবার (বাসনা) নাই ; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি” (গী. ৩. ২২)। ‘ন মে কর্ত্তব্যমস্তি’—আমার কর্ত্তব্য নাই—এই শব্দ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে”—তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না—এই শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ‘জ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকিলেও, অধিক কি, এই কারণে, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতেই হইবে’ এই অর্থ এই চার পাঁচ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, ‘তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে’ ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ নিজের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা একেবারেই অসংবদ্ধ হইবে, এবং সিদ্ধান্ত এক, আর তাহার উদাহরণ একেবারেই বিরুদ্ধ—এইরূপ অনবস্থা দোষ ঘটিবে। এই অনবস্থা পরিহারার্থ সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকার, ‘তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর’ ইহার মধ্যে ‘তস্মাৎ’ এই শব্দেরও অর্থ ভিন্ন প্রকার করিয়া থাকেন। তাঁহার কথন এই যে, জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ; কিন্তু অর্জ্জুন সেইরূপ জ্ঞানী ছিলেন না বলিয়া—‘তস্মাৎ’—তাঁহাকে ভগবান্ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন। ‘গীতা-উপদেশের পরেও অর্জ্জুন অজ্ঞানীই ছিলেন’ এই যুক্তি ঠিক্ নহে আমি উপরে

দেখাইয়াছি। তাছাড়া ‘তস্মাৎ’ এই শব্দের এইরূপ টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলেও “ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং” ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ “আমার কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি” এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার সঙ্গতিও এই পক্ষে সুচারুরূপে হয় না। তাই “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে” এই বাক্যে ‘কার্য্যং ন বিদ্যতে’ এই শব্দগুলিকে মুখ্য বলিয়া না মানিয়া, ‘তস্য’ শব্দকেই প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে; এবং তাহা করিলে “তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর” ইহার অর্থ “তুমি জ্ঞানী বলিয়াই তোমার স্বার্থের জন্য তোমার কর্ম্ম নাই এ কথা সত্য; কিন্তু তোমার নিজের কর্ম্ম নাই বলিয়াই, এক্ষণে শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত কর্ম্ম ‘আমার নহে’ এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর” এইরূপ করিতে হয়। সংক্ষেপে এই অনুমান হয় যে, ‘আমার অনাবশ্যক’ ইহা কর্ম্ম ছাড়িবার কারণ হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম অপরিহার্য্য অতএব শাস্ত্রতঃপ্রাপ্ত অপরিহার্য্য কর্ম্ম স্বার্থ-ত্যাগবুদ্ধিতে করাই উচিত। ইহাই গীতা বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে দেখিলেও, এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুয়ের মধ্যে যে বড়রকম ভেদ আছে তাহা ইহাই। “তোমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই; অতএব তুমি কোন কর্ম্ম করিও না,” এইরূপ সন্ন্যাস-পক্ষীয় লোকেরা বলেন; এবং “তোমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই বলিয়াই, এখন তোমার যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা স্বার্থপর বাসনা ছাড়িয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর” এইরূপ গীতা বলেন। একই হেতুবাক্য হইতে এই প্রকার দুই ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কেন বাহির হয়? ইহার উত্তর এই যে, গীতা কর্ম্ম অপরিহার্য্য মানেন বলিয়া, ‘কর্ম্ম ছাড়ো’ এই অনুমান, গীতার তত্ত্ববিচারানুসারে বাহির হইতেই পারে না। তাই, তোমার অনাবশ্যক; এই হেতুবাক্য হইতেই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া কর্ম্ম কর, গীতায় এই অনুমান বাহির করা হইয়াছে। রামচন্দ্রকে সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান বলিবার পর, নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যোগবাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ যে যুক্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার। যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের শেষে ভগবদ্গীতার উক্ত সিদ্ধান্তই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে (যো. ৬ উ. ১৯৯ ও ২১৬. ১৪; এবং গী. ৩. ১৯-এর অনুবাদের উপর আমার টিপ্পনী দেখুন)। যোগবাসিষ্ঠেরই ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানপন্থার গ্রন্থেও এই বিষয়ে গীতার অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ান্তর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা এখানে না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি।

আত্মজ্ঞান হইলে পর ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই অহংকারের ভাষাই থাকে না (গী. ১৮. ১৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপুরুষকে “নির্-মম” বলে। নির্ম্মম অর্থে ‘যে আমার-আমার বলে না’। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিবার সময় এই অর্থই এই আবী-শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

আণি মী হে ভাষ নেণে। মাঝেং কাঁহিংচ ন ক্ষণে।
সুখ দুঃখ জাণণে। নাহি জয়া ॥

অর্থাৎ—‘আমি’ এই বাক্য জানি না, ‘আমার’ বলিয়া কিছুই নাই— সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই বুদ্ধি চলিয়া গেলেও এই শব্দের বদলে ‘জগৎ’ ও ‘জগতের’—কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে ‘পরমেশ্বর’ ও ‘পরমেশ্বরের’—

এই শব্দ আসে, ইহা বিস্মৃত হইবে না। জগতের প্রত্যেক সাধারণ মনুষ্য নিজের সমস্ত কর্ম্ম ‘আমার’ কিংবা ‘আমার জন্য’ বলিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন তাঁহার মমত্ববুদ্ধি চলিয়া যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের এবং তাহা করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে (অর্থাৎ নির্ম্মম বুদ্ধিতে) সেই কর্ম্ম করিতে থাকেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই ভেদ (গী. ৩. ২৭. ২৮)। গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, “যোগারূঢ় পুরুষের জন্য শমই কারণ হয়” (গী. ৬. ৩ ও তাহার উপর আমার টীকা দেখুন) এই শ্লোকের সরল অর্থ কি। গীতার টীকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তি পরে (জ্ঞান হইলে পর) শম অর্থাৎ শান্তি অবলম্বন করিবে, সে আর কিছু করিবে না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ ঠিক্ নহে। শম মনের শান্তি; তাহাকে চরম ‘কার্য্য’ না বলিয়া শম কিংবা শান্তি অন্য কিছুর কারণ—‘শমঃ কারণমুচ্যতে’—ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এখন শমকে কারণ বলিয়া মানিয়া পরে তাহার ‘কার্য্য’ কি, দেখিতে হইবে। পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের বিচার করিলে ‘কর্ম্মই সেই কার্য্য’ এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এবং তখন যোগারূঢ় ব্যক্তি চিত্তকে শান্ত করিয়া সেই শান্তির বা শমের দ্বারাই পরে নিজের সমস্ত কর্ম্ম করিবেক এইরূপ এই শ্লোকের অর্থ হয়; টীকাকারদিগের কল্পনানুসারে “যোগারূঢ় ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে” এই অর্থ করা যাইতে পারে না। সেইরূপ আবার, “সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী” ও “অনিকেত” প্রভৃতি শব্দের অর্থও কর্ম্মত্যাগমূলক নহে, ফলাশা-ত্যাগ-মূলকই করা উচিত; গীতার অনুবাদে যে সকলস্থলে এই পদ আসিয়াছে, সেইস্থলে সংযোজিত টিপ্পনীতে আমি এই বিষয় খুলিয়া দেখাইয়াছি। ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষেরও চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি সমস্ত কর্ম্ম যথাশাস্ত্র করা উচিত, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য আপনার নিজের দৃষ্টান্ত ছাড়া ভগবান আর একটী দৃষ্টান্ত জনকের দিয়াছেন। জনক একজন বড় কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি কতটা চলিয়া গিয়াছিল ‘আমার রাজধানী দগ্ধ হইলেও তাহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হয় নাই’—‘মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন’ (শাং. ২৭৫. ৪ ও ২১৯. ৫০) তাঁহার মুখের এই বাণী হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ নিজের স্বার্থ কিংবা লাভালাভ কিছুই না থাকিলেও রাজ্যের সমস্ত কর্ম্ম করিবার কারণ বলিবার সময় জনক নিজেই বলিতেছেন—

দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ।
ইত্যর্থং সর্ব্ব এবৈতে সমারম্ভা ভবন্তি বৈ ॥

“দেবতা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও অতিথি ইহাদের জন্য এই সমস্ত কর্ম্ম চলিতেছে, আমার জন্য নহে” (মভা. অশ্ব. ৩২. ২৪)। নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও কিংবা নিজের কোন বস্তু লাভ করিবার বাসনা না থাকিলেও জনক ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পুরুষ জগতের কল্যাণ করিতে যদি প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে এই জগৎ উৎসন্ন হইবে—উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ—(গী. ৩. ২৪)।

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ‘ফলাশা ত্যাগ করিবে, সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই,’ গীতার এই সিদ্ধান্ত এবং বাসনাক্ষয়ের সিদ্ধান্তে অধিক

তফাৎ করা যায় না। কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক কি ফলাশাই ছাড়া হউক, উভয়পক্ষে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; তাই কোন এক পক্ষকে স্বীকার করিলেও শেষে তাহার পরিণাম কর্ম্মত্যাগই ঘটে। কিন্তু এই আপত্তি অজ্ঞানমূলক, কারণ 'ফলাশা' শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার কারণেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। ফলাশা ত্যাগের সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংবা আমার কর্ম্মের ফল কেহ কখনই পাইবে না, কিংবা পাইলেই কেহ গ্রহণ করিবে না—এই বুদ্ধি হওয়া অর্থ নহে; প্রত্যুত পঞ্চম প্রকরণে প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে,—অমুক ফল পাইবার জন্যই আমি এই কর্ম্ম করিতেছি এই প্রকার ফলবিষয়ক মমত্বযুক্ত আসক্তি কিংবা বুদ্ধি আগ্রহকে,—গীতা নাম দিয়াছেন 'ফলাশা', 'সঙ্গ' কিংবা 'কাম'। কিন্তু, ফললাভের আগ্রহ কিংবা বৃথা আসক্তি না রাখিলেও, প্রাপ্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিবার বুদ্ধি ও উৎসাহকেও উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদূরিত করিতে হইবে এইরূপ নহে। নিজের লাভ ছাড়া এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং যে কেবল ফলাশার আগ্রহেই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, সে ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম করা সম্ভব বলিয়া মনে করে না; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি সম ও বিরক্ত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন নহে। আমি কোন কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হই তাহা কেবল আমার কর্ম্মের ফল, এই ধারণাই প্রথমত ভ্রান্তিমূলক। জলের দ্রবত্ব কিংবা অগ্নির উষ্ণতার সাহায্য না পাইলে, মনুষ্য যতই মাথা ঘামাক না কেন, তাহার চেষ্টায় পাক-কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং অগ্নিপ্রভৃতিতে এই গুণধর্ম্ম থাকা বা না থাকা—মনুষ্যের আয়ত্তাধীন কিংবা প্রযত্নাধীন নহে। তাই, কর্ম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ বিবিধ ব্যাপারের কিংবা ধর্ম্মের প্রথমে যথাশক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা আমাদের প্রযত্নের অনুকূল হয় সেই ভাবেই মনুষ্যকে নিজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুতরাং মনুষ্য স্বীয় প্রযত্নের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহা কেবল তাহারই প্রযত্নের ফল নহে বরং উহার কর্ম্ম ও কর্ম্মজগতের তদনুকূল অনেক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম এই দুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের প্রযত্ন সফল হইবার পক্ষে এইরূপ যে সমস্ত জগদ্-ব্যাপারের অনুকূলতা আবশ্যক হয়, সেই সমস্তের যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় মনুষ্যে থাকে না, এবং কোন কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও নহে। ইহাকেই 'দৈব' বলে। আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত এবং আমাদের অজ্ঞাত জগদ্ব্যাপারে সাহায্য ফলসিদ্ধির জন্য যদি নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে "কেবল নিজের প্রযত্নের দ্বারাই আমি অমুক কর্ম্ম করিব" এইরূপ অভিমান পোষণ করা যে মূর্খতামাত্র, তাহা বলিতেই হইবে না (গী. ১৮. ১৪-১৬ দেখ)। কারণ, কর্ম্মজগতের জ্ঞাত অজ্ঞাত ব্যাপারের মানবীয় প্রযত্নে সংযোগ সাধিত হইলে পর যে ফল হয়, তাহা কেবল কর্ম্মের নিয়মেই হয় বলিয়া, আমরা ফলাশায় আগ্রহ রাখি বা না রাখি, ফলসিদ্ধিসম্বন্ধে কোন তফাৎ হয় না, আমাদের ফলাশা অবশ্য আমাদের দুঃখজনক হয়। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, মনুষ্যের জন্য আবশ্যক বিষয় একা জগদ্-ব্যাপার আপনা হইতেই ঘটাইয়া আনে না। রুটি রুচিকর হইতে হইলে যেরূপ আটার নেচীতে একটু নুন দিতে হয় সেইরূপ কর্ম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মনুষ্যের উপযোগী করিতে হইলে তাহার উপর মনুষ্যের

একটু প্রযত্নের চাপ দিতে হয়। তাই জ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তি সাধারণ লোকের ন্যায় ফলের আসক্তি কিংবা আগ্রহ না রাখিয়া জগতের কর্ম্মসাধনার্থ প্রবাহ-পতিত কর্ম্মের (অর্থাৎ কর্ম্মের অনাদি প্রবাহের মধ্যে শাস্ত্রতঃপ্রাপ্ত যথাধিকার কর্ম্মের) ছোট বড় অংশ শান্তভাবে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়া থাকেন। এবং ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম-সংযোগের উপর কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। "তোমার কেবল কর্ম্ম করিবারই অধিকার আছে, ফললাভ তোমার আয়ত্তাধীন নহে" (গী. ২. ৪৭) ইত্যাদি যে উপদেশ অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহার বীজও ইহাই। এইরূপে ফলাশা না রাখিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পরে কোন কারণে কদাচিৎ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তবু উদ্যোগ করিয়া আমাদের নিজের অধিকারের কর্ম্ম করায়, নিষ্ফলতা হইতে দুঃখ পাইবার কোন কারণ থাকে না। উদাহরণ যথা পরমায়ুর বন্ধনরজ্জু (অর্থাৎ শরীরপোষক ধাতুসমূহের নৈসর্গিক শক্তি) দৃঢ় না থাকিলে শুধু ঔষধে রোগীর কখনই উপকার হয় না, এইরূপ বৈদ্যশাস্ত্র স্পষ্ট বলে; এবং এই বন্ধনরজ্জুর দৃঢ়তা অনেক প্রাক্তন কিংবা বংশানুক্রমিক সংস্কারের ফল। এই বিষয় বৈদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে, এবং তৎসম্বন্ধে বৈদ্যের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও হইতে পারে না। তথাপি রোগীকে ঔষধ দেওয়া নিজের কর্ত্তব্য মনে করিয়া কেবল পরোপকার-বুদ্ধিতে হাজার হাজার রোগীকে বৈদ্য যথাজ্ঞান ঔষধ দিয়া থাকেন, এইরূপ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এইরূপ কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিলে পর, কোন রোগী ভাল না হইলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উদ্বিগ্ন হন না শুধু নহে, কিন্তু অমুক রোগে অমুক ঔষধের দ্বারা শতকরা লোকের উপকার হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই তিনি অতীব শান্তচিত্তে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু এই বৈদ্যের পুত্র পীড়িত হইলে তাহাকে ঔষধ দিবার সময় তিনি পরমায়ুর বন্ধনরজ্জুর বিষয় ভুলিয়া গিয়া "আমার ছেলেকে আরাম করিতেই হইবে" এই মমত্বযুক্ত ফলাশাবশতঃ উৎকণ্ঠিতচিত্ত হওয়ায় অন্য বৈদ্যকে ডাকিতে হয়; কিংবা অন্য বৈদ্যের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক হয়। কর্ম্মফল মমত্বরূপ আসক্তি কাহাকে বলে এবং ফলাশা না থাকিলেও কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম্ম কিরূপে করিতে পারা যায়, এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ ফলাশা বিলোপের জন্য জ্ঞানের দ্বারা মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের রং (রাগ) উঠাইয়া ফেলিতে বলিলে যেমন সেই কাপড়কে নষ্ট করিতে বলা হয় না, সেইরূপ 'কর্ম্মে বাসনা, আসক্তি কিংবা অনুরাগ রাখিবে না' এইরূপ বলিলে, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে এমন নহে। বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই যদি অসম্ভব হয় তো সে কথা আলাদা। কিন্তু বৈরাগ্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারা যায় শুধু নহে, কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই অজ্ঞানী লোক যে কর্ম্ম ফলের আশায় করিয়া থাকে, তাহাই জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানলাভের পরেও, লাভালাভ ও সুখদুঃখ সমান মনে করিয়া (গী. ২. ৩৮) ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলসম্বন্ধে বিরক্ত কিংবা উদাসীন থাকিয়া (গী. ১৮. ২৬), কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া আপন আপন অধিকারানুসারে

শান্তচিত্তে করিতে থাকেন (গী. ৬. ৩)। ইহাই নীতিদৃষ্টিতে ও মোক্ষদৃষ্টিতে উত্তম জীবনযাপনের প্রকৃত তত্ত্ব। অনেক স্থিতপ্রজ্ঞ, মহাভগবদ্ভক্ত ও পরমজ্ঞানী পুরুষেরা, এমন কি স্বয়ং ভগবানও এই মার্গই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রেরই পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা বা পরমার্থ, এই 'যোগে'র দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজন-পূজন হয় এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভও হয় (গী. ১৮. ৪৬), ভগবদ্‌গীতা ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন। তাহার পরেও যদি আপনা হইতে কেহ ভুল বুঝেন তবে তাহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আত্মদৃষ্টি স্পেন্সর সাহেবের অভিমত ছিল না, তথাপি তিনিও স্বপ্রণীত 'সমাজশাস্ত্রের অভ্যাস' গ্রন্থের শেষে গীতার ন্যায়ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এই বিষয় আধিভৌতিক পদ্ধতি অনুসারেও সিদ্ধ যে, এই জগতে কোন কিছুই একেবারে সংঘটিত করা সম্ভব নহে, তাহার কারণীভূত ও অবশ্যম্ভাবী অন্য হাজার বিষয় পূর্ব্বে যেরূপে ঘটিয়াছে তদনুসারে মনুষ্যের প্রযত্ন সফল, নিষ্ফল কিংবা ন্যূনাধিক পরিমাণে সফল হইয়া থাকে; এই কারণে সাধারণ লোক ফলাশায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ফলের আশা না রাখিয়া শান্তভাবে ও উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্য করাই উচিত।*

ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে সংসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষকে অবশ্য আজীবন করিতে হইবে ইহা সিদ্ধ হইলেও এই কর্ম্ম কিসের দরুণ ও কেন প্রাপ্ত হয় ইহা না বলিলে কর্ম্মযোগের বিচার পুরাপুরি হয় না। তাই, "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" (গী. ৩. ২০)—লোকসংগ্রহের হিসাবে দেখিলেও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত—কর্ম্মযোগের সমর্থনে অর্জ্জুনকে ভগবান শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি বলিয়াছেন। লোকসংগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, 'মনুষ্যদিগকে শুধু জমা করিবে' কিংবা 'নিজের কর্ম্মত্যাগ করিবার অধিকার হইলেও, কর্ম্মত্যাগ করা অজ্ঞানী লোকদের উচিত নহে এবং তাহাদের নিজের (জ্ঞানী পুরুষের) কর্ম্মতৎপরতা ভাল লাগিবে এই কারণে জ্ঞানী পুরুষ কাজ করিবার ভাণ করুন'। কারণ, লোকেরা অজ্ঞানী থাকিবে কিংবা তাহাদিগকে অজ্ঞানী রাখিবার জন্য জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করিবার ভাণ করিবে, গীতার ইহা শিখাইবার কোন হেতু নাই। ভাণ করা দূরে থাক; কিন্তু 'লোকে তোমার অপকীর্ত্তি গাহিবে' (গী. ২. ৩৪) ইত্যাদি সাধারণ লোককে বুঝাইবার মতো যুক্তিবাদেও যখন অর্জ্জুনের সন্তোষ হইল না তখন তাহা অপেক্ষা গুরুত্বের ও

* "Thus admitting that for the fanatic some wild anticipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted of his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting philanthrophic energy with philosophic calm."—Spencer's Study of Sociology, 8th Ed. P. 403. The italics are ours. এই বাক্যে fanatics এর বদলে 'প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমূঢ়' (গী. ৩. ২৯) কিংবা 'অহঙ্কারবিমূঢ়' (গী. ৩. ২৭) অথবা ভাস্করের 'মূর্খ' শব্দ এবং man of higher type এর স্থানে 'বিদ্বান্' (গী. ৩. ২৫) এবং greatly moderated expectations এর স্থানে 'ফলোদাসীন্য' অথবা 'ফলাশাত্যাগ', এই সমানার্থক শব্দ বসাইলে গীতা-সিদ্ধান্তের স্পেন্সর সাহেব যেন একরকম অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ মনে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বলবত্তর কারণ ভগবান এক্ষণে বলিতেছেন। তাই 'সংগ্রহ' এই শব্দের জমা করা, রাখা, পালন করা, নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি যে সকল অর্থ অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হয়; এবং ঐরূপ লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ "তাহাদিগকে একত্র সম্বন্ধ করিয়া তাহাদের পরস্পরানুকূল্যের দ্বারা যে সামর্থ্য উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের মধ্যে যাহাতে আসে এই প্রকারে তাহাদের পালন পোষণ কিংবা নিয়মন করা, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সুস্থিতি বজায় রাখিয়া, তাহাদিগকে শ্রেয়োলাভের পথে প্রবর্ত্তিত করা", এইরূপ ইহার অর্থ হয়। 'রাষ্ট্রের সংগ্রহ' শব্দ এই অর্থে মনুস্মৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৭. ১৪), এবং শাঙ্কর ভাষ্যে—"লোকসংগ্রহ = লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণম্" এইরূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, সংগ্রহ শব্দের আমি যে অর্থ করিতেছি তাহা অপূর্ব্ব কিংবা ভিত্তিহীন নহে। সংগ্রহ শব্দের অর্থ ত এই হইল; কিন্তু 'লোকসংগ্রহ' শব্দে 'লোক' শব্দ কেবল মনুষ্যবাচী নহে, ইহাও এখানে বলা আবশ্যক। জগতের ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 'লোকসংগ্রহ' শব্দে মুখ্যরূপে মানবজাতিরই কল্যাণের সমাবেশ হয়, একথা সত্য, তথাপি ভূলোক, সত্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি যে অনেক লোক অর্থাৎ জগৎ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ পোষণ হইয়া সেই সমস্ত সুচারুরূপে চলিবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা; তাই মনুষ্যলোকের ন্যায়ই এই সমস্ত লোকের ব্যবহারও সুব্যবস্থিতরূপে চলিবে (লোকানাং সংগ্রহঃ) এই ব্যাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ' পদের দ্বারা এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়।* জনক-কৃত আপন কর্ত্তব্যের যে বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ আছে, এবং ভগবদ্‌গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীয়-উপাখ্যানে যে যজ্ঞচক্রের বর্ণনা আছে তাহাতেও দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই দুয়েরই ধারণপোষণ হইবে বলিয়া ব্রহ্মদেব যজ্ঞ উৎপন্ন করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৩. ১০-১২)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, শুধু মনুষ্যলোকের নহে, দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণপোষণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রেয়ঃসম্পাদন করিবে, এই অর্থই লোকসংগ্রহপদে ভগবদ্‌গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে। সমস্ত জগতের পালন-পোষণ করিয়া লোকসংগ্রহ করিবার ভগবানের এই যে অধিকার, তাহাই জ্ঞানী পুরুষ নিজের জ্ঞানপ্রযুক্তই প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানীপুরুষেরা যাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাহাই অন্য লোকেরাও প্রমাণ মনে করিয়া সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে (গী. ৩. ২১)। কারণ, সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণ কিসে হইবে, শান্তচিত্তে ও সমবুদ্ধিতে তাহার বিচার করিয়া তদনুসারে কর্ম্মবন্ধন স্থাপন করা জ্ঞানীপুরুষদিগের কাজ, ইহা সাধারণ লোকের ধারণা। এই ধারণা ভ্রান্তিমূলকও নহে। অধিক কি, সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে এই বিষয় ঠিক আসে না বলিয়া জ্ঞানীপুরুষদিগের উপর তাহারা ভরসা রাখে, এরূপ বলিলেও চলে। এই কথা মনে করিয়াই শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

লোকসংগ্রহসংযুক্তং বিধাত্রা বিহিতং পুরা
সূক্ষ্মধর্ম্মার্থনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্ ॥

* সংস্কৃতে লোক শব্দের দ্বারা মানুষ ও ভুবন দুইই বুঝায়। 'লোকস্তু ভুবনে জনে'।

"লোকসংগ্রহকারক সূক্ষ্মধর্ম্মার্থনিরত সাধুদিগের উত্তম চরিত্র বিধাতারই বিধান"— (মভা. শাং. ২৫৮. ২৫)। লোকসংগ্রহ অর্থে, নিরর্থক কোন প্রকার মনগড়া মিথ্যা কিংবা লোকদিগকে অজ্ঞানে রাখিবার কৌশল নহে; জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইলে জগতের বিনাশ সম্ভাবনা হয় বলিয়া ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিধাতাবিহিত সাধুপুরুষদিগের কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে ইহা এক মুখ্য কর্ত্তব্য। এবং "আমি এই কর্ম্ম না করিলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে" (গী. ৩. ২৩) এই ভগবদ্‌বচনের ভাবার্থ ও এই। জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু; ইঁহারা যদি নিজের কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাহা হইলে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না হইয়া যায় না। লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে আনয়ন করা জ্ঞানীপুরুষদিগেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কার্য্য কেবল মুখভারতীতে অর্থাৎ শুষ্ক উপদেশের দ্বারাই কখনও সিদ্ধ হয় না। কারণ যাহাদের সদাচরণের অভ্যাস নাই, যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে শুধু শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইলে, "তুমি সে আমি, আমি সে তুমি" এই প্রকারে তাহাদিগকে জ্ঞানের অপব্যবহার করিতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। তাহাছাড়া, কোন উপদেশের সত্যতার পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ দেখিয়াই করিয়া থাকে। তাই, জ্ঞানী মনুষ্য নিজে কাজ যদি না করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লোককে অলস করিবার এক বড় কারণ হইবেন। ইহাকেই 'বুদ্ধিভেদ' বলে। এবং এই বুদ্ধিভেদ না হইয়া লোকেরা সত্যসত্যই নিষ্কাম হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে জাগ্রত হইবে বলিয়া সংসারে থাকিয়াই নিজ কর্ম্মের দ্বারা লোকদিগকে সদাচরণের অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়াই জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য (ভড়ং নহে) হইয়া পড়ে। তাই কর্ম্মত্যাগের অধিকার তিনি (জ্ঞানীপুরুষ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহার্থ চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম যথাধিকার তাঁহার করিতে হইবে এইরূপ গীতার উপদেশ। কিন্তু জ্ঞানীপুরুষের চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করাও আবশ্যক নহে, এমন কি করা উচিত নহে, এইরূপ সন্ন্যাসমার্গীদিগের মত হওয়ায় "জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবেন" এই গীতাসিদ্ধান্তের সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকারেরা কতকগুলো গোলমেলে অর্থ করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে নহে পরন্তু পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ কথা বলিতেও তাঁহারা প্রস্তুত যে, স্বয়ং ভগবানও ভড়ং করিবার উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু গীতার লোকসংগ্রহ শব্দের এই তৈলাক্ত রকমের অর্থ ঠিক নহে ইহা পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হন এই মতই গীতার আদৌ মান্য নহে; এবং তাহার সমর্থনে গীতায় যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে লোকসংগ্রহ একটি মুখ্য কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরুষের কর্ম্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়া লইয়া লোকসংগ্রহ পদের ভড়ং-মূলক অর্থ করা সর্ব্বথাই অন্যায্য। মনুষ্য এই জগতে কেবল নিজের জন্যই জন্মে নাই। অজ্ঞাতবশতঃ সাধারণ লোক নিজ স্বার্থের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে ইহা সত্য। কিন্তু "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (গী. ৬. ২৯)—আমি সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে—এই প্রকার সমস্ত জগৎই যাঁহার আত্মভূত হইয়াছে তিনি "আমার মোক্ষ লাভ হইয়াছে, একণে লোকেরা দুঃখী হইলেও আমার তাহাতে কিসের ভাবনা" এইরূপ কথা বলিলে, তাঁহার নিজমুখেই জ্ঞানের হীনতা স্বীকার

করা হয়। জ্ঞানীপুরুষের আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে কি? তাঁহার আত্মার উপর যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের আবরণ ছিল সে পর্য্যন্ত "আমি" ও "লোক" এই ভেদ বজায় ছিল। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সমস্ত লোকের আত্মাই তাঁহার আত্মা। তাই যোগবাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন—

যাবল্লোকপরামর্শো নিরূঢ়ো নাস্তি যোগিনঃ।
তাবদ্‌রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নির্ম্মলম্‌॥

"যে পর্য্যন্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লোকসংগ্রহের) কাজ একটু অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগারূঢ় পুরুষের অবস্থা নির্দ্দোষ, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না" (যো. ৬ পূ. ১২৮. ৯৭)। কেবল আপন সমাধিসুখেই নিমগ্ন থাকা এক প্রকার নিজের স্বার্থসাধনা মনে হয়। সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না, ইহাই তাহাদের যুক্তিবাদের মুখ্য দোষ। ভগবান অপেক্ষা কেহই অধিক জ্ঞানী, অধিক নিষ্কাম কিংবা অধিক যোগারূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানও "সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন" এইপ্রকার লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই যদি সময়ে সময়ে অবতার হন (গী. ৪. ৮) তবে জ্ঞানী পুরুষের লোকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়া দিয়া "যে পরমেশ্বর এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ইচ্ছামতো ভরণ-পোষণ করিবেন, সে দিক দেখা আমাদের কাজ নহে" এইরূপ বলা সর্ব্বথাই অনুচিত। কারণ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর, 'পরমেশ্বর', 'আমি' ও 'জগৎ'—এই ভেদই থাকে না; এবং যদি থাকে, তবে তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানী বলিয়া ভড়ং করেন বলিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেশ্বররূপী হন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা পরমেশ্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করিবার আবশ্যকতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ কি করিয়া অব্যাহতি পাইবেন (গী. ৩. ২২ ও ৪. ১৪ ও ১৫)? তাহাছাড়া, পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন তাহাও জ্ঞানীপুরুষের রূপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের দ্বারাই করিয়া থাকেন। তাই, "সকল ভূতে এক আত্মা" পরমেশ্বরের স্বরূপের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহার মনে সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাদি উচ্চবৃত্তি পূর্ণ জাগ্রত থাকিয়া স্বভাবতই লোককল্যাণের দিকে তাঁহার মনের প্রবৃত্তি হইবে। এই অভিপ্রায়ে তুকারাম বাবা সাধুপুরুষের লক্ষণ এই প্রকার বলিয়াছেন—

জে কাঁ রঞ্জলে গাঞ্জলে। ত্যাঁসি ম্হণে জো আপুলে।
তোচি সাধু ওড়খাবা। দেব তেথেঁ চি জাণাবা॥ (গা. ৯৬০. ১-২)

অর্থাৎ "সকলের সুখদুঃখকে যে আপনার বলে তাহাকেই সাধু বলিয়া জানিবে—দেবতা সেইখানেই জানিবে;" কিংবা—

পরউপকারী বেঁচিলেল্যা শক্তী। তেণেঁ আত্মস্থিতী জাণিতলী (গা. ৪৫৬২)

অর্থাৎ "পরোপকারে যিনি নিজশক্তি ব্যয় করিয়াছেন তিনিই আত্মস্থিতি জানেন;" এবং শেষে সাধুদিগের (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহাত্মাদের) কার্য্যের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন—

জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাঞ্চা বিভূতি।
দেহে কষ্টবিতো উপকারে॥

অর্থাৎ "জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি, উঁহারা কষ্ট করিয়াও দশজনের উপকার করেন" (গা. ৯২৯), "স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ" পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন না ? কিন্তু তৃষ্ণাদুঃখরূপ রজ্জুর একটা মস্ত জুজু তৈয়ারি করিয়া তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বৃত্তিকে বিদলিত না করিয়া তাঁহারা লোকসংগ্রহকারক চাতুর্বর্ণ্যাদি শাস্ত্রীয় সীমা স্থাপনের কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যব্যবসায় কিংবা শূদ্রের সেবা, এই যে গুণকর্ম্মস্বভাবানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির হিতেরই জন্য এরূপ নহে ; প্রত্যুত মনুস্মৃতিতে আছে (মনু ১ ৮৭) যে, চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবসায়বিভাগ লোকসংগ্রহার্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সমস্ত সমাজের রক্ষণার্থে কতকগুলি ব্যক্তির যুদ্ধকলা নিত্য অভ্যাস করিয়া প্রস্তুত থাকা আবশ্যক এবং কাহারও কাহারও কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা সমাজের অন্য অভাব পূর্ণ করা আবশ্যক গীতার অভিপ্রায়ও ঐরূপ (গী. ৪. ১৩ ; ১৮. ৪১ দেখ)। এই চাতুর্বর্ণ্যধর্ম্মের মধ্যে কোন এক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে সমাজ ততটুকু পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং শেষে তাহার নাশ হইবারও সম্ভাবনা থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কর্ম্মবিভাগের এই ব্যবস্থা একই প্রকার থাকে না, যেন স্মরণ থাকে। প্রাচীন গ্রীক তত্ত্বজ্ঞ প্লেটো এই বিষয়ক আপন গ্রন্থে এবং আধুনিক ফরাসী শাস্ত্রজ্ঞ কোঁৎ আপন "আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞানে" সমাজধারণার্থ যে ব্যবস্থা সূচিত করিয়াছেন, তাহা চাতুর্বর্ণ্যের সাদৃশ্য হইলেও বৈদিক ধর্ম্মের চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা হইতে উহা অল্পাধিক অংশে যে ভিন্ন, ইহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। ইহার মধ্যে কোন্ সমাজব্যবস্থা উত্তম, অথবা এই উত্তমতা আপেক্ষিক, এবং যুগকালানুসারে ইহাতে কোন ফেরফার হইতে পারে কি না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এইস্থানে উঠে ; এবং 'লোকসংগ্রহ' এখনকার কালে পাশ্চাত্যদেশে একটা বড় রকমের শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য-নির্ণয়ই আমাদের উপস্থিত বিষয় হওয়ায় এখানে এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কারণ নাই। গীতাকালে চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহা গোড়ায় লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহা নির্ব্বিবাদ। তাই চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে নিজনিজ প্রাপ্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে যেরূপ করিতে হইবে তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নির্দ্দেশ করাই গীতার এই লোকসংগ্রহ পদের অর্থ। ইহাই এখানে মুখ্য বক্তব্য। জ্ঞানী পুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহে, সমাজের গুরুও বটে। তাই ইহা স্বতই সিদ্ধ হয় যে, উক্ত প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার জন্য তিনি আপন কালের সমাজব্যবস্থায় যদি কোন ত্রুটি দেখেন, তবে তিনি তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালানুরূপ পরিমার্জ্জিত করিবেন এবং সমাজের ধারণ-পোষণ শক্তিকে হ্রাস হইতে না দিয়া, তাহা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে এইরূপ উদ্যোগ করিবেন। এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্যই জনক সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ রাজত্ব করিতে থাকিলেন এবং মনু প্রথম রাজা হইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন ; এবং এই কারণেই 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি (গী. ২. ৩১)

স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে কাঁদিতে বসা তোমার উচিত নহে ; কিংবা "স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" (গী. ১৮. ৪৭) স্বভাব ও গুণানুরূপ নির্দ্ধারিত চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিলে তোমার কোন পাপ হইবে না, ইত্যাদি প্রকার চাতুর্বর্ণ্যকর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনকে গীতায় বারবার উপদেশ করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের জ্ঞান যথাশক্তি অর্জ্জন করিও না, এরূপ কেহই বলে না। অধিক-কি, এই জ্ঞান অর্জ্জন করাই এই জগতে মনুষ্যের ইতিকর্ত্তব্য, ইহা গীতারও সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে নিজের আত্মার কল্যাণেই সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণার্থ যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া লোকসংগ্রহ করাই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের প্রকৃত পর্য্যবসান। তথাপি, কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম স্বহস্তে করিবার যোগ্য হয় এরূপ নহে। ভীষ্ম ও ব্যাস দুইজনেই মহাজ্ঞানী ও পরম ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যাসও ভীষ্মের ন্যায় যুদ্ধের কাজই করিয়াছেন, এরূপ কেহ বলে না। দেবতাদের দিকে দেখিলে, সেখানেও জগতের সংহার করিবার কাজ শঙ্করের বদলে বিষ্ণুর উপর সমর্পিত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। জীবন্মুক্তাবস্থা—মনের নির্বিষয়তার, সম ও শুদ্ধবুদ্ধির এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ পৈঠা ; উহা আধিভৌতিক কর্ম্মবুদ্ধির পরীক্ষা নহে। তাই, স্বভাব ও গুণানুরূপ প্রবৃত্ত চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা অনুসারে যে কর্ম্ম আমরা চিরজন্ম করিয়া আসিতেছি, স্বভাব অনুসারে সেই কর্ম্ম বা ব্যবসায় জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও লোকসংগ্রহার্থ চালিত রাখিতে হইবে, কারণ তাহার ভিতরেই বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য ফালতো ব্যবসায় করিলে তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে, গীতার এই বিশেষ উপদেশ পুনর্ব্বার এই প্রকরণেই বিচার করা হইয়াছে (গী. ৩. ৩৫ ; ১৮. ৪৭)। প্রত্যেক মনুষ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই অধিকার বলা হয় ; এবং "পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও এই অধিকার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, লোকসংগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাইবে, কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না" —"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম্" (বেসূ. ৩. ৩. ৩২) এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রকারের এই উপপত্তি কেবল বড়-অধিকারের ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই খাটে, কেহ কেহ এইরূপ বলেন ; এবং এই সূত্রের ভাষ্যে, তৎসমর্থনার্থ যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত উদাহরণই ব্যাস-আদি বড় বড় অধিকারী পুরুষদিগেরই দেওয়া আছে। কিন্তু মূলসূত্রে অধিকারের ছোট-বড়র সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তাই "অধিকার" শব্দে ছোট-বড় সমস্ত অধিকার ধরিতে হয় ; এবং এই অধিকার কে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের সঙ্গেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গেই মনুষ্য পরমেশ্বর উৎপন্ন করায়, যাহার যতটা বুদ্ধিবল, প্রাণবল, দ্রব্যবল কিংবা শরীরবল স্বভাবতঃ হইতে পারে কিংবা স্বধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে, সেই হিসাবেই যথাশক্তি জগতের ধারণপোষণ করিবার ন্যূনাধিক অধিকার (চাতুর্বর্ণ্যাদি কিংবা অন্য গুণকর্ম্মবিভাগরূপ সামাজিক ব্যবস্থা হইতেই) প্রত্যেকেই জন্মতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল ভাল চালাইবার জন্য বড় চাকার মতো খুব ছোট চাকারও যেমন দরকার হয় ; সেইরূপেই সমস্ত জগতের এই বৃহৎ বিরাট সৃষ্টিসংহারের কাজ অথবা চক্র সুব্যবস্থিতরূপে চলমান রাখিবার জন্য ব্যাস আদির বড়

বড় অধিকারের সমানই অন্য মনুষ্যের ছোট ছোট অধিকারও পূর্ণ ও যোগ্যরীতিতে করিয়া আমলে আনা কর্ত্তব্য। কুমার ঘট এবং তাঁতি বস্ত্র তৈয়ার না করিলে, রাজা দ্বারা যথোচিত রাজ্যরক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাজ পুরোপুরি হইতে পারে না; কিংবা আগুন-গাড়ীতে সামান্য নিশান-ওয়ালা কিংবা পয়েন্টস্‌ম্যান (রেল-জুড়িবার শিপাই) যদি নিজের কর্ত্তব্য না করে, তবে এখন যেমন আগুনগাড়ী বায়ুবেগে নির্ভয়ে ছুটিয়া চলে, সেরূপ আর চলিতে পারিবে না। তাই বেদান্তসূত্রকারেরই উপরি-উক্ত যুক্তিবাদের দ্বারা এক্ষণে নিষ্পন্ন হইল যে, ব্যাস-আদি বড় বড় অধিকারী শুধু নহে অন্য লোকেরও—তা তিনি রাজাই হউন বা প্রজাই হউন—লোকসংগ্রহার্থ যথানির্দ্দিষ্ট ছোটবড় অধিকারের কর্ম্ম জ্ঞানলাভের পরেও ত্যাগ না করিয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য জানিয়া যথাশক্তি, যথামতি ও যথাসম্ভব করিয়া যাওয়া উচিত। আমি না করি, অন্য কেহ এই কাজ করিবে এরূপ বলা উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কর্ম্মে আবশ্যক ব্যক্তির মধ্যে একজন কম হইয়া যায় এবং সংঘশক্তি কমিয়া যায় শুধু নহে কিন্তু জ্ঞানীপুরুষ সেই কর্ম্ম যতটা বিশুদ্ধভাবে করিবেন সেইরূপ অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; ফলতঃ এই হিসাবে লো সংগ্রহও থোঁড়াই থাকিয়া যাইবে। তাছাড়া জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্মত্যাগরূপ উদাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও বিগড়াইয়া যায় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবার পর নিজের আত্মার মোক্ষলাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার পরোয়া না রাখিয়া "লোকসংগ্রহধর্ম্মং চ নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ"—লোকসংগ্রহ করিবে না, করাইবেও না (মভা. অশ্ব. অনুগীতা, ৪৬. ৩৯) এইরূপ সন্ন্যাসমার্গীয় লোক কখনো কখনো বলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু ব্যাসাদির আচরণের তাঁহারা যে উপপত্তি দেন তাহা হইতে, এবং বশিষ্ঠ ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি রাম-জনকাদিকে আপনাপন অধিকার অনুসারে সমাজের ধারণ-পোষণাদি কর্ম্মই আমরণ করিতে যে বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, যে সন্ন্যাসমার্গীর কর্ম্মত্যাগের উপদেশ একদেশদর্শী, সর্ব্বথা-সিদ্ধ শাস্ত্রীয় সত্য নহে। তাই বলিতে হয় যে, এই প্রকার একপক্ষীয় উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভগবানের নিজেরই উদাহরণ অনুসারে জ্ঞানলাভের পরেও আপন অধিকার বুঝিয়া তদনুসারে লোকসংগ্রহ-কারী কর্ম্ম আমরণ করিতে থাকাই শাস্ত্রোক্ত ও উত্তম মার্গ; তথাপি এই লোকসংগ্রহ ফলাশা রাখিয়া করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক না কেন, ফলের আশা রাখিলে কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে দুঃখ না হইয়া যায় না। তাই আমি 'লোকসংগ্রহ করিব' এই অভিমান বা ফলাশার বুদ্ধি মনে না রাখিয়া লোকসংগ্রহও কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই করিতে হয়। সেই কারণে "লোকসংগ্রহার্থ" অর্থাৎ লোকসংগ্রহরূপ ফললাভের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, গীতা এইরূপ না বলিয়া 'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্' লোক-সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও (সংপশ্যন্) তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন (গী. ৩. ২০)। এই প্রকার গীতায় যে একটু লম্বাচোড়া শব্দযোজনা করা হইয়াছে—ইহাই তাহার বীজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্ত্তব্য সত্য; কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে (গী. ৩. ১৯) অনাসক্তবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবার ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ করিয়াছেন সেই উপদেশ লোকসংগ্রহের জন্যও উপযুক্ত, ইহা বিস্মৃত হইবেন না।

জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ তাহা জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মেরই বিরোধ; জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কোন বিরোধ নাই। কর্ম্ম অপরিহার্য্য এবং লোক-সংগ্রহ-দৃষ্টিতেও উহার আবশ্যকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, যাবজ্জীবন যথাধিকার নিঃসঙ্গ-বুদ্ধিতে চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের করিতেই হইবে। যদি এই বিষয়ই শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গীতারও যদি ইহাই অর্থ হয়, তবে বৈদিক ধর্ম্মের স্মৃতিগ্রন্থে কথিত চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমের কি দশা হইবে, এই সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতিসমূহে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি আশ্রমের কথা বলিয়া অধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ, দান কিংবা চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট অন্য কর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত আচরণের দ্বারা প্রথম তিন আশ্রমে আস্তে আস্তে চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই এবং শেষে সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করিবে ও সন্ন্যাস লইয়া মোক্ষ অর্জ্জন করিবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মনু. ৬. ১ ও ৩৩-৩৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যাগযজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও তাহা চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ সেগুলির ইহাই উদ্দেশ্য যে, বিষয়াসক্তি বা স্বার্থপর-বুদ্ধি চলিয়া গিয়া পরোপকারবুদ্ধি বাড়িয়া বাড়িয়া সর্ব্বভূতে একই আত্মা রহিয়াছে এই উপলব্ধির শক্তি পাওয়া যাইবে; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে, ইহাই সমস্ত স্মৃতিকারদিগের অভিপ্রায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কলিযুগে যে সন্ন্যাসধর্ম্মের স্থাপনা করিয়াছেন সেই মার্গ ইহাই; এবং স্মার্ত্তমার্গীয় কালিদাসও রঘুবংশের আরম্ভে—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্ ।
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥

"বাল্যকালে বিদ্যা-অভ্যাস (ব্রহ্মচর্য্য) কারী, যৌবনে বিষয়োপভোগরূপ সংসার (গৃহস্থা-শ্রম) কারী, শেষ বয়সে মুনিবৃত্তি কিংবা বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনকারী এবং শেষে (পাতঞ্জল) যোগের দ্বারা সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মাকে লইয়া গিয়া প্রাণত্যাগকারী" এইরূপ পরাক্রান্ত সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে (রঘু. ১. ৮)। সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকানুপ্রশ্নে—

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষা প্রতিষ্ঠিতা ।
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

"চারি আশ্রমরূপ চারি পৈঁঠার এই সোপান শেষে ব্রহ্মপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই পৈঁঠা দ্বারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরোহণ করিতে থাকিলে পর মনুষ্য শেষে ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব লাভ করে (শাং. ২৪১. ১৫) এই কথা বলিয়া, পরে এই ক্রমপরম্পরার বর্ণনা করিয়াছেন—

কষায়ং পাচয়িত্বাশু শ্রেণিস্থানেষু চ ত্রিষু ।
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্ ॥

"এই সোপানের তিন পৈঁঠায় মনুষ্য আপন কিল্বিষের (পাপের) অর্থাৎ স্বার্থপর আত্মবুদ্ধির কিংবা বিষয়াসক্তিরূপ দোষের শীঘ্রই ক্ষয় করিয়া আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান" (শাং. ২৪৪. ৩)। এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরম্পরাই মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে

(মনু. ৬. ৩৪)। কিন্তু ইহার মধ্যে অন্তিম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের দিকে লোকের অতিরিক্ত প্রবৃত্তি হইলে সংসারের কর্তৃত্ব নষ্ট হইয়া সমাজও পঙ্গু হইবে এই কথা মনুর খুব উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই, পূর্ব্বাশ্রমে গৃহকর্ম্ম অনুসারে পরাক্রমের ও লোক-সংগ্রহের সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্তব্য, মনু এই কথা বলিয়া, পরে—

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

"শরীরে বলি পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌত্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে"—এইরূপ মনু স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মনু. ৬. ২)। এই সীমা পালন করিতে হইবে, কারণ মনুস্মৃতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্য জন্মতই আপন পৃষ্ঠের উপর ঋষিগণ, পিতৃগণ ও দেবগণের তিন ঋণভার (কর্ত্তব্য) লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। তাই, বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা দেবঋণ এইরূপ তিন ঋণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়া মনুষ্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে না। সেরূপ করিলে (অর্থাৎ সন্ন্যাস লইলে) জন্মতঃ-প্রাপ্ত এই ঋণ শোধ না করিবার দরুণ সে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে (মনু. ৬. ৩৫-৩৭ ও পূর্ব্বপ্রকরণে প্রদত্ত তৈ. সং. মন্ত্র দেখুন)। প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতার ঋণের পরিশোধের কালসীমা নির্দ্দেশ করা নাই, তাহা পুত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হইবে; এবং কাহারও ঋণ রাখিয়া মরা অত্যন্ত দুর্গতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, এই কথা মনে করিলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উক্ত বড় রকমের সামাজিক কর্ত্তব্যকে 'ঋণ' বলায় আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কি হেতু ছিল, তাহা পাঠকের সহজেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতিকারদিগের নির্দ্দিষ্ট এই সীমা অনুসারে সূর্য্যবংশীয় রাজারা কাজ করিতেন, এবং পুত্র রাজ্য চালাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া (প্রথম হইতেই নহে) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন এইরূপ কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন (রঘু. ৭. ৬৮)। এই নিয়ম পালন না করিয়া দক্ষপ্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক পুত্রদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর শবলাশ্ব নামক অন্য পুত্রদিগকেও, তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বেই, নারদ নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া এই অশাস্ত্র ও গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে নারদকে ভর্ৎসনা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ. ৬. ৫. ৩৫-৪২)। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, আমরা গার্হস্থ্য জীবন যথাশাস্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের ছেলেরা সস্ত্রীক কর্ত্তা হইলে, বার্দ্ধক্যের অনর্থক আশার কারণে তাহাদের কর্তৃত্বের বাধা না আনিয়া নিছক মোক্ষপরায়ণ হইয়া আপনা হইতেই আনন্দের সহিত সংসার হইতে নিবৃত্ত হইব, ইহাই এই আশ্রমব্যবস্থার মূল হেতু ছিল। এই হেতুই বিদুরনীতিতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোঽনুবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ব্বা অরণ্যসংস্থোঽথ মুনির্বুভূষেৎ ॥

"গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঋণী করিয়া, তাহাদের জীবিকার কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া, এবং কন্যাদিগকে যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করিয়া, পরে বানপস্থী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে" (মভা. উ. ৩৬. ৯৩)। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ

লোকের সংসারসম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণাও প্রায় বিদুরের কথারই মতো। তথাপি কখন-না-কখনো সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণই মনুষ্যমাত্রের পরমসাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, জাগতিক কর্ম্মের সংসিদ্ধির জন্য স্মৃতিকারদিগের নির্দিষ্ট প্রথম তিন আশ্রমের শ্রেয়স্কর সীমা আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়িতে পড়িতে, কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা অল্পবয়সেই জ্ঞানলাভ করিলে, তাহার এই তিন পৈঠায় ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার আবশ্যকতা নাই—একবারেই সন্ন্যাসগ্রহণে তাহার কোন বাধা নাই—'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা' (জাবা. ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থামিয়াছে! এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল স্যূমরশ্মিকে বলিয়াছেন—

শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥*

"সকল কর্ম্ম, শরীরিক (বিষয়াসক্তিরূপ) রোগ বহিষ্কৃত করিবার জন্য আছে, জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম এবং চরম গতি; কর্ম্মের দ্বারা শরীরের কষায় কিংবা অজ্ঞানরূপ রোগ বিনষ্ট হইলে পর, রসজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়" (শাং. ২৬৯. ৩৮)। সেইরূপ এই প্রকার মোক্ষধর্ম্মে পিঙ্গলগীতাতেও "নৈরাশ্যং পরমং সুখং"—কিংবা "যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্‌"—তৃষ্ণারূপ প্রাণান্তিক রোগ না গেলে সুখ নাই (শাং. ১৭৪. ৬৫ ও ৫৮) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। জাবাল ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন ব্যতীত কৈবল্য ও নারায়ণোপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" কর্ম্মের দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা নহে—ত্যাগের দ্বারাই (কিংবা ন্যাসের দ্বারা) কোন কোন ব্যক্তি মোক্ষ অর্জ্জন করে—(তৈ. ১. ২. নারা, উ. ১২. ৩ ও ৭৮ দেখুন)। জ্ঞানী পুরুষকেও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মই করিতে হইবে ইহাই যদি গীতার সিদ্ধান্ত হয় তবে এই বচনগুলির কি প্রকার প্রয়োগ কি ভাবে লাগাইতে হইবে তাহা বলা আবশ্যক। অর্জ্জুনের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে "তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস কি, ও ত্যাগ কি, তাহা পৃথক্‌ করিয়া বলো" (১৮. ১) এইরূপ ভগবানকে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌ এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন তাহা দেখিবার পূর্ব্বে স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত আশ্রমমার্গ ব্যতীত অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্গেরও বিচার এখানে কিছু করা আবশ্যক।

ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাস এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই 'স্মার্ত' অর্থাৎ 'স্মৃতিকারগণের প্রতিপাদিত মার্গ' বলে। কর্ম্ম কর ও কর্ম্ম ছাড়ো—এইরূপ উভয় প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ বেদের যে আজ্ঞা তাহার সমন্বয়ার্থ স্মৃতিকারেরা বয়োভেদানুরূপ আশ্রমের এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্বরূপতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকেই যদি চরম ধ্যেয় বলিয়া মানা যায় তবে সেই ধ্যেয়সিদ্ধির জন্য স্মৃতিকারগণের অঙ্কিত জীবনের চারি পৈঠার এই মার্গে সাধ্যের পূর্ব্বায়োজন অর্থাৎ সাধনরূপে কিছু অসঙ্গত বলা যায় না। জীবনের এই

* বেদান্ত-সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে (৩. ৪. ২৬) এই শ্লোক গৃহীত হইয়াছে; তাহাতে উহার পাঠ "কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" ॥—এইরূপ আছে। আমি এই শ্লোক, মহাভারতে যেমনটি পাইয়াছি তাহাই দিয়াছি।

প্রকার ক্রমোচ্চ পৈঠার ব্যবস্থা দ্বারা জাগতিক ব্যবহারের লোপ না ঘটিয়া, যদিও বৈদিক কর্ম্ম ও ঔপনিষদিক জ্ঞানকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারা যায় সত্য ; তথাপি গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের পরিপোষক হওয়ায় (মনু. ৬. ৮৯) মনুস্মৃতি ও মহাভারতেও শেষে গৃহস্থাশ্রমেরই মাহাত্ম্য স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে—

যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ ॥

"মায়ের (পৃথিবীর) আশ্রয়ে সমস্ত জন্তু যেরূপ জীবিত থাকে, সেইপ্রকার গৃহস্থাশ্রমেরই আশ্রয়ে সকল রহিয়াছে" (শাং. ২৬৮. ৬ ; ও মনু. ৩. ৭৭ দেখ)। মনু তো অন্য আশ্রমগুলিকে নদী এবং গৃহস্থাশ্রমকে সাগর বলিয়াছেন (মনু. ৬. ৯০ ; মভা, ২৯৫. ৩৯)। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে যদি নির্ব্বিবাদ হইল তবে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া 'কর্ম্ম সন্ন্যাস কর' এইরূপ উপদেশ করায় লাভ কি? জ্ঞানলাভের পরে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম করা কি অসম্ভব ? অসম্ভব না হইলে জ্ঞানী পুরুষ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবেক এইরূপ বলার অর্থ কি ? ন্যূনাধিক স্বার্থবুদ্ধিতে যাহারা কাজ করে সেই সাধারণ লোকদিগের অপেক্ষা পূর্ণ নিষ্কাম-বুদ্ধিতে যাঁহারা কাজ করেন সেই জ্ঞানীপুরুষেরা কাজেকাজেই লোকসংগ্রহে অধিক সমর্থ ও যোগ্য হইয়া থাকেন। তাই, জ্ঞানের দ্বারা যখন জ্ঞানীপুরুষের এই সামর্থ্য পূর্ণাবস্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ ছাড়িয়া যাইবার স্বাধীনতা জ্ঞানী পুরুষের জন্য রাখিলে, চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা যাহার হিতের জন্য করা হইয়াছে সেই সমাজেরই তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি করা হয়। শরীরের সামর্থ্য না থাকিলে কেহ যদি সমাজ ছাড়িয়া বনে যায়, তো সে আলাদা কথা ; তাহা দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ হানি হইবে না। অনুমান হয় যে, সন্ন্যাসাশ্রমের সীমা বৃদ্ধকালে নির্দ্দেশ করায় মনুর বোধ হয় এই অভিপ্রায়ই ছিল। কিন্তু এই শ্রেয়স্কর সীমা পরে ব্যবহারে বজায় থাকে নাই ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই, কর্ম্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ বেদবচনের মিল করিবার জন্যই স্মৃতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীপরম্পরা স্থাপন করিলেও এই বিভিন্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নির্ব্বিবাদ অধিকার স্মৃতিকারদিগেরই ন্যায়,—এমন কি তাঁহাদের অধিক—যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আছে, তিনিই ভাগবত ধর্ম্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মে শুদ্ধ অধ্যাত্মবিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়া বাসুদেবভক্তির সুলভ সাধনারও উপর ভর দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সবিস্তার বিচার করা যাইবে। ভাগবতধর্ম্ম ভক্তিমূলক হইলেও, তাহাতেও পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে পর কর্ম্ম-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষদিগকেও লোক-সংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনকমার্গের এই মহৎ তত্ত্বটি বজায় আছে ; তাই কর্ম্মদৃষ্টিতে এই দুই মার্গ একই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়াত্মক কিংবা প্রবৃত্তিমূলক। পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি এই প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক এবং সেইজন্যই এই ধর্ম্মের প্রাচীন নাম—'নারায়ণীয় ধর্ম্ম'। এই দুই ঋষি পরম জ্ঞানী ও নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নিষ্কাম কর্ম্ম নিজেও করিতেন (মভা. উ. ৪৮. ২১) এবং সেইজন্যই "প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব

ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ, (মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১), কিংবা "প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ"—নারায়ণ ঋষিপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আমরণপ্রবৃত্তিমূলক (মভা.শাং.২১৭.২) মহাভারতে এই ধর্ম্মের এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই সাত্বত কিংবা ভাগবতধর্ম্ম ; এবং এই সাত্বত কিংবা মূল ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ 'নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ'—অর্থাৎ নিষ্কাম প্রবৃত্তিমূলক (ভাগ. ১. ৩. ৯ ও ১১. ৪৬. দেখ)। এই প্রবৃত্তিমার্গেরই আর এক নাম ছিল 'যোগ', তাহা "প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্" অনুগীতার এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় (মভা. অশ্ব. ৪৩. ২৫)। এইজন্যই নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নরের অবতার অর্জ্জুনকে গীতায় যে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, গীতাতেই তাহার নাম 'যোগ' উক্ত হইয়াছে। ভাগবত ও স্মার্ত্ত, দুই পথ উপাস্য-ভেদপ্রযুক্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধুনা কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা। কিন্তু আমাদের মতে এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কারণ এই দুই মার্গের উপাস্য ভিন্ন হইলেও উহাদের অন্তর্ভূত অধ্যাত্মজ্ঞান একই। এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তি একই হইলে এই উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদর্শী জ্ঞানী পুরুষ কেবল উপাস্যভেদের জন্য বিবাদ করিতে বসিবেন ইহা সম্ভব নহে। এই কারণেই, যাহাকেই ভক্তি কর না কেন, সেই ভক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেই গিয়া পৌঁছায়, ভগবদ্‌গীতা (৯. ১৪) ও শিবগীতা (১২. ৪) এই দুই গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। নারায়ণ ও রুদ্র একই, যাহারা রুদ্রের ভক্ত তাহারা নারায়ণেরও ভক্ত এবং যাহারা রুদ্রের দ্বেষী তাহারা নারায়ণেরও দ্বেষী,—এইরূপে মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে তো এই দুই দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩৪২ ১২৯ দেখ)। শৈব ও বৈষ্ণব এই ভেদ প্রাচীনকালে ছিল না এ কথা আমি বলি না। কিন্তু স্মার্ত্ত ও ভাগবত এই দুই ভিন্ন পন্থা হইবার পক্ষে, শিব কিংবা বিষ্ণু এই উপাস্যভেদ কারণ নহে ; জ্ঞানোত্তর নিবৃত্তি কিংবা প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি করিবে না, কেবল ইহারই মহত্ত্বের সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় এই দুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, ইহাই আমার বলিবার তাৎপর্য্য। পরে, কালক্রমে যখন মূল ভাগবতধর্ম্মের প্রবৃত্তি-মার্গ কিংবা কর্ম্মযোগ লুপ্ত হইয়া তাহাও কেবল বিষ্ণুভক্তিমূলক অর্থাৎ বহু-অংশে নিবৃত্তিমূলক আধুনিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং তৎপ্রযুক্ত তোমার দেবতা 'শিব' আমার দেবতা 'বিষ্ণু' এই রকম বৃথাভিমানে মনুষ্যেরা যখন ঝগড়া করিতে লাগিল, তখন 'স্মার্ত্ত' ও 'ভগবত' শব্দ অনুক্রমে 'শৈব' ও 'বৈষ্ণব' শব্দের সহিত সমানার্থক হইয়া পরিশেষে এই আধুনিক ভাগবতধর্ম্মীদিগের বেদান্ত (দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈত) ভিন্ন হইল এবং বেদান্তেরই ন্যায় জ্যোতিষের রীতিও অর্থাৎ একাদশী করিবার ও কপালে ফোঁটা কাটিবার রীতিও স্মার্ত্তমার্গ হইতে ভিন্ন হইল ! কিন্তু এইভেদ প্রকৃত ভেদ নহে অর্থাৎ মূলগত প্রাচীন ভেদ নহে—ইহা 'স্মার্ত্ত' শব্দ হইতেই ব্যক্ত হইতেছে। ভাগবতধর্ম্ম ভগবানই প্রবর্ত্তিত করায়, তাহার উপাস্য দেবতাও যে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বিষ্ণু, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু 'স্মার্ত্ত' শব্দের ধাত্বর্থ 'স্মৃত্যুক্ত'—কেবল এইটুকু হওয়ায় স্মার্ত্তধর্ম্মের উপাস্য দেবতা শিবই হইবেন এইরূপ বলা যায় না। কারণ, মন্বাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে একমাত্র শিবেরই উপাসনা করিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম প্রদত্ত হয় নাই। উল্টা, বিষ্ণুরই অধিক বর্ণনা আছে ; কোন কোন স্থানে গণপতি প্রভৃতি উপাস্য দেবতার কথাও উক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া

শিব ও বিষ্ণু এই দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটিকেই স্মার্ত্ত বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে স্মার্ত্তমতের প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শাঙ্করমঠে উপাস্য দেবতা—শারদা এবং শাঙ্করভাষ্যে প্রতিমাপূজার যেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই শিবলিঙ্গের নির্দ্দেশ না করিয়া শালগ্রামের অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রতিমারই উল্লেখ আচার্য্য করিয়াছেন (বেসূ. ১. ২. ৭; ১ ৩. ১৪ ও ৪. ১. ৩; ছাং শাংভা. ৮. ১. ১)। সেইরূপ পঞ্চায়তন-পূজাও প্রথমে শঙ্করাচার্য্যই প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম স্মার্ত্ত ও ভাগবত পন্থার মধ্যে 'শিবভক্ত' কিংবা 'বিষ্ণুভক্ত' এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগড়া ছিল না, কিন্তু যাঁহার দৃষ্টিতে স্মৃতিগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থানুসারে যৌবনকালে যথাশাস্ত্র সংসার করিবার পর, বার্দ্ধক্যে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ চরম সাধ্য ছিল তিনিই স্মার্ত্ত, এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্‌-ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ যিনি বুঝিতেন তিনিই ভাগবত বলিয়া উক্ত হইতেন। ইহাই এই দুই শব্দের মূল অর্থ; এবং এই হেতু এই দুই শব্দ, সাংখ্য ও যোগ কিংবা সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের সহিত অনুক্রমে সমানার্থক। ভগবানের অবতার-কার্য্যের কথা ধরিয়াই বলো, কিংবা জ্ঞানযুক্ত গার্হস্থ্যধর্ম্মের মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলুন, সন্ন্যাসাশ্রম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; এবং কলি-বর্জ্জ্যের প্রকরণে অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। * আবার জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া, সংসার হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং বুদ্ধতো যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিলেও জৈন ও বৌদ্ধরা যে সন্ন্যাসধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাই শ্রৌতস্মার্ত্ত সন্ন্যাস বলিয়া আচার্য বজায় রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই সন্ন্যাসধর্ম্মই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ গীতা স্মার্ত্তমার্গের গ্রন্থ নহে; সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গ হইতেই গীতার আরম্ভ হইলেও পরে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মই তাহাতে প্রতিপাদ্য হইয়াছে। ইহা স্বয়ং মহাভারতকারেরর বচন এবং প্রথম প্রকরণেই আমি তাহা দিয়াছি। এই দুই পন্থাই বৈদিক হওয়ায় সর্ব্বাংশে না হউক বহুলাংশে উভয়ের সমন্বয় করিতে পারা যায়। কিন্তু এইরূপ সমন্বয় করা এক কথা; এবং গীতায় সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, কর্ম্মমার্গকে যদি কোথাও মোক্ষপ্রদ বলা

* নির্ণয়সিন্ধু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কলিবর্জ্য প্রকরণ দেখ। উহাতে "অগ্নিহোত্রং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্‌। দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥" এবং "সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিজানতা" ইত্যাদি স্মৃতিবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ,—অগ্নিহোত্র, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও নিয়োগ, কলিযুগে নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে সন্ন্যাসের নিষিদ্ধতাও শ্রীশঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ব হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

হইয়া থাকে তো সে শুদ্ধ অর্থবাদ কিংবা ফাঁকা স্তুতিমাত্র, এইরূপ বলা আর এক কথা। রুচিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত ভাগবত ধর্ম্মাপেক্ষা স্মার্ত্তধর্ম্মই কাহার বেশী মিষ্ট লাগিবে না কিংবা কর্ম্মসন্ন্যাস পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল কারণ বলা হইয়া থাকে, তাহাই যে কেহ অধিক বলবত্তর মনে করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? উদাহরণ যথা—স্মার্ত্ত কিংবা সন্ন্যাসধর্ম্মই যে শ্রীশংকরাচার্য্যের মান্য ছিল, অন্য সমস্ত মার্গ তিনি অজ্ঞানমূলক বলিয়া মনে করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্যই যে গীতার ভাবার্থ ও তাহাই হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। গীতার সিদ্ধান্ত আপন মান্য না হয়, আপনি তাহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য "এই জগতে জীবনের দুই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ মার্গ কিংবা নিষ্ঠা আছে" এইরূপ যাহা গীতার আরম্ভে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ "সন্ন্যাসনিষ্ঠাই একমাত্র প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ মার্গ" এরূপ করা সঙ্গত নহে! গীতায় বর্ণিত এই দুই মার্গ বৈদিক ধর্ম্মে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ব হইতেই স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষণ করিবার অধিকার ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে, বংশপরম্পরাক্রমে কিংবা নিজ সামর্থ্যে যিনি প্রাপ্ত হইতেন তিনি জ্ঞানলাভে পরেও আপন কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই নিজের সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয়া যায়। সমাজের এই অধিকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই "সুখং জীবন্তি মুনয়ো ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ" (শাং ১৭৮. ১১)—অরণ্যবাসী মুনি আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন—আবার, "দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্মো ন মুণ্ডনম্‌" (শাং. ২৩. ৪৬)—দণ্ডের দ্বারা লোকের ধারণপোষণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, মুণ্ডন করাইয়া লওয়া নহে—এইরূপ মহাভারতে অধিকারভেদে দুয়েরই বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহা ইহতে এমনও বুঝিতে হইবে না যে, কেবল প্রজাপালনের অধিকারী ক্ষত্রিয়েরই নিজের অধিকার হেতুই কর্ম্মযোগ বিহিত ছিল। যে, যে কর্ম্ম করিবার অধিকারী, জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে সেই কর্ম্ম করিতে হইবে ইহাই কর্ম্মযোগের উক্ত বচনের প্রকৃত ভাবার্থ; এবং এই কারণেই "এষা পূর্ব্বতরা বৃত্তি ব্রাহ্মণস্য বিধিয়তে" (শান্তি. ২৩৭)—জ্ঞানলাভের পর ব্রাহ্মণও আপন অধিকারানুসারে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রাচীনকালে বজায় রাখিতেন—এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও সন্ন্যাসাশ্রমের বদলে সমস্ত বর্ণের পক্ষে বৈদিক কর্ম্মযোগই বিকল্পে বিহিত বলিয়া ধৃত হইয়াছে (মনু. ৬. ৮৬-৯৬)। ভাগবত ধর্ম্ম কেবল ক্ষত্রিয়ের জন্যই, এরূপ কোথাও উক্ত নাই; উল্টা, স্ত্রীশূদ্রাদি সমস্ত লোকের উহা সুলভ এইরূপে তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (গী. ৯. ৩২)। মহাভারতে তুলাধার (বৈশ্য) ও ব্যাধ (বহেলিয়া) এই ধর্ম্মেই আচরণ করিত, এবং তাহারা ব্রাহ্মণদিগকেও ঐধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে (শাং. ২৬১; বন. ২১৫)। নিষ্কাম, কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে অগ্রসর পুরুষদিগের যে সকল উদাহরণ ভাগবত ধর্ম্মগ্রন্থে প্রদত্ত হয় তাহা কেবল জনক-শ্রীকৃষ্ণআদি ক্ষত্রিয়দেরই নহে—তাহাতে বসিষ্ঠ, জৈগীষব্য ও ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগেরও সমাবেশ করা হইয়া থাকে।

গীতায় কর্ম্মমার্গই প্রতিপাদ্য হইলেও শুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্ম করিবার মার্গকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া গীতা স্বীকার করেন না এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত

না হই। জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্ম করিবারও দুই প্রকারভেদ আছে। এক, দম্ভের সহিত কিংবা আসুরি বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত। তন্মধ্যে দম্ভের মার্গ কিংবা আসুরী মার্গকে গীতা (গী. ১৬. ১৬ ও ১৭. ২৮), এবং মীমাংসকেরাও গর্হিত ও নরকপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন; ঋগ্বেদেও অনেক স্থানে শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে (ঋ. ১০. ১৫১; ৯. ১১৩ ২ ও ২. ১২. ৫)। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া কর্ম্ম করিবার মার্গসম্বন্ধে মীমাংসকেরা বলেন যে, পরমেশ্বর-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইলেও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম আমরণ করিতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাভই হয়। মীমাংসকদিগের এই মার্গ যে কর্ম্মকাণ্ডরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে সন্ন্যাসাশ্রম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই। বরঞ্চ, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ হয় এইরূপ বেদের স্পষ্ট বিধান থাকার কথা জৈমিনি বলিয়াছেন (বেসূ. ৩. ৪. ১৭-২০ দেখ); তাঁহার এই উক্তি কিছু ভিত্তিহীনও নহে। কারণ কর্ম্মকাণ্ডের এই প্রাচীন মার্গকে গৌণ বলিয়া স্বীকার করা উপনিষদেই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়। উপনিষদ্ বৈদিক হইলেও যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী, তাহা উপনিষদের বিষয়-প্রতিপাদন হইতেই প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে পরমেশ্বরের জ্ঞান তৎপূর্ব্বে হয়ই নাই। হাঁ; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্তর বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করা বিধেয়, এই মত উপনিষৎকালেই অবশ্য প্রথমে আমলে আসে; এবং তদনন্তর সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বর্ণিত কর্ম্মকাণ্ডের গৌণত্ব আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া মানা হইত। উপনিষদের কালে বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানের অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের এইরূপ প্রাধান্য হইতে থাকিলে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রতি কিংবা চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মেরও প্রতি জ্ঞানীপুরুষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং সেই অবধিই লোকসংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য এই ধারণা মন্দীভূত হইল। স্মৃতিকারেরা স্ব স্ব গ্রন্থে, গৃহস্থাশ্রমে যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কিংবা চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্মার্ত্তকর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু স্মৃতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, উপনিষদের জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মকাণ্ডের যে গৌণত্ব আসিয়াছিল, স্মৃতিকারদিগের আশ্রমব্যবস্থায় সেই গৌণত্ব হ্রাস হইতে পারে নাই। এই ব্যবস্থায় জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে কাহাকেই গৌণত্ব না দিয়া, ভক্তির সহিত এই দুয়েরই সমন্বয় করিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা বড়জোর স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গীতার মান্য (মুণ্ড. ১. ২. ১০; গী. ২. ৪১-৪৫)। কিন্তু ইহাও গীতার সিদ্ধান্ত যে, সৃষ্টিক্রম চলিত রাখিতে হইলে যজ্ঞ কিংবা কর্ম্মচক্রকে বজায় রাখা আবশ্যক, কর্ম্ম ত্যাগ করা নিছক পাগ্‌লামি বা মূর্খতা। তাই যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্ম কিংবা চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম অজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত না করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া কর; তাহা হইলে এই চক্রও বিশৃঙ্খলিত হইবে না, এবং তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধকও হইবে না, এইরূপ গীতার

উপদেশ। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের (সন্ন্যাস ও কর্ম্মের) সমন্বয় করিবার গীতার এই নৈপুণ্য স্মৃতিকারদিগের অপেক্ষা যে অধিক সরস তাহা আর বলিতে হইবে না। কারণ, ব্যষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণ একটুও কম না করিয়া তাহার সঙ্গে জগতের সমষ্টিরূপ আত্মার কল্যাণও গীতামার্গের দ্বারা সংসাধিত হয়। কর্ম্ম অনাদি ও বেদপ্রতিপাদিত হওয়ায় তোমার জ্ঞান হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাহা করাই আবশ্যক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। অনেকগুলি উপনিষৎকার (সকলে নহে) কর্ম্মকে গৌণ স্থির করিয়া বলেন যে, বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; নিদানপক্ষে তাঁহাদের সেই দিকে যে ঝোঁক তাহা মানিতে বাধা নাই। এবং স্মৃতিকার বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমব্যবস্থা দ্বারা উক্ত দুই মতের এইরূপ সমন্বয় করেন যে, পূর্ব্ব আশ্রমে এই সকল কর্ম্ম করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে। কিন্তু গীতার পন্থা এই তিন পন্থা হইতে ভিন্ন। জ্ঞান কাম্যকর্ম্মের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই; তাই, নিষ্কামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়া যাও, তাহা কখনও ছাড়িও না, গীতা এইরূপ বলেন। এখন এই চারি মতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে ইহা সকলেরই মান্য। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে, এইরূপ উপনিষদে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে। ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে পর কর্ম্ম করিবে কি করিবে না এই সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কাম্যবুদ্ধির হ্রাস হইলে পর যে ব্যক্তি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহার কেবল স্বর্গপ্রাপ্তিকর কাম্য কর্ম্ম করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে না এইরূপ কোন কোন উপনিষৎকার বলেন; কিন্তু ঈশাবাস্যাদি অন্য কতকগুলি উপনিষৎ, মৃত্যুলোকের ব্যবহার বজায় রাখিবার জন্য কর্ম্ম করাই আবশ্যক, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত এই দুই মার্গের মধ্যে দ্বিতীয় মার্গই গীতা প্রতিপাদ্য, ইহা স্পষ্ট দেখা যায় (গী. ৫. ২)। কিন্তু মোক্ষের অধিকারী জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবেক এইরূপ বলিলেও, যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বর্গপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম্ম তিনি কেনই বা করিবেন এই প্রশ্ন এই স্থানে স্বভাবতই উপস্থিত হয়। তাই ১৮শ অধ্যায়ের আরম্ভে ঐ প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, ভগবান্ স্পষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, "যজ্ঞ, দান, তপ" প্রভৃতি কর্ম্ম সর্ব্বদাই চিত্তশুদ্ধিকারক অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধি উৎপাদক ও বর্দ্ধক হওয়া প্রযুক্ত "এই সকল কর্ম্মও (এতান্যপি) অন্য নিষ্কাম কর্ম্মেরই ন্যায় লোকসংগ্রহার্থ, ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীপুরুষের নিয়ত করা কর্ত্তব্য (গী. ১৮. ৬)। পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে, ব্যাপকার্থে ইহাই এক বড়-রকমের যজ্ঞ হইয়া যায়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ হয় না (গী. ৪. ২৩); কিন্তু সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, যজ্ঞ হইতে স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ যে বন্ধনাত্মক ফল পাইবার কথা ছিল তাহাও

পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কর্ম্ম মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। মোদ্দা কথা, মীমাংসকদিগের কর্ম্মকাণ্ড গীতায় বজায় রাখা হইলেও এইরূপ কৌশলে বজায় রাখা হইয়াছে যে তাহার দরুন স্বর্গে গমনাগমন না ঘটিয়া সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হইয়া যায় না। মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গ এবং গীতার কর্ম্মযোগের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ—দুই এক নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

ভগবদ্গীতায় প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্ম কিংবা কর্ম্মযোগেই যে প্রতিপাদ্য, এবং এই কর্ম্মযোগে ও মীমাংসকদিগের কর্ম্মকাণ্ডে যে কি প্রভেদ তাহা এখানে বলিয়াছি। এক্ষণে গীতার কর্ম্মযোগে এবং জ্ঞানকাণ্ডকে ধরিয়া স্মৃতিকারদিগের বর্ণিত আশ্রমব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাহার একটু বিচার করিব। এই ভেদ অতীব সূক্ষ্ম এবং বাস্তবিক বলিতে হইলে এই সম্বন্ধে বাদবিতণ্ডা করিবার কোন কারণও নাই। জ্ঞানলাভ হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথম দুই (ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ) আশ্রমের কার্য্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য ইহা উভয় পক্ষেরই মান্য। পূর্ণ জ্ঞান হইলে পর কর্ম্ম করিবেক কিংবা সন্ন্যাস লইবেক এইটুকুই যা মতভেদ। কিন্তু এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ যে কোন সমাজে অল্পই দেখা যায় ; তাই, এই অল্পসংখক জ্ঞানী লোকের কর্ম্ম করা বা না করা একই, সে সম্বন্ধে বিশেষ দাপাদাপি করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ বলিয়া মানে এবং নিজের চরম সাধ্য অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন আচরণের গতিপথ নির্দ্ধারণ করায় 'জ্ঞানী পুরুষের কি করা কর্ত্তব্য' এই প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে একটা বড় প্রশ্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানীপুরুষ শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেক স্মৃতিগ্রন্থে ইহা বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু স্মার্ত্তমার্গের অনুসারেই এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে তাহা উপরে বলা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি জনককে কোথাও বলেন নাই যে, "তুমি এখন রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর"। বরং, যে জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোত্তর সংসার ত্যাগ করেন, সংসার তাঁর ভাল লাগে না (ন কাময়ন্তে) বলিয়াই তিনি ত্যাগ করেন—এইরূপ বলিয়াছেন (বৃ. ৪. ৪. ২২) ; ইহা বলিতে বৃহদারণ্যকের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানোত্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করা বা না করা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বৈকল্পিক বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই ; এবং বেদান্তসূত্রে বৃহদারণ্যক-উপনিষদের এই বচনের অর্থ ঐরূপই করা হইয়াছে (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। জ্ঞানোত্তর কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না, ইহা শংকরাচার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত ; এই জন্য আপন ভাষ্যে তিনি সমস্ত উপনিষদ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জ্ঞানোত্তরও যথাধিকার আমরণ কর্ম্ম করিবার কোন বাধা নাই ইহা শ্রীশংকরাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন

(বেসূ. শাংভা. ৩. ৩. ৩২ ; এবং গী. শাংভা. ২. ১১ ও ৩. ২০ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সন্ন্যাস কিংবা স্মার্ত্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাজ্য বলা যায় না ; কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যতিক্রমস্থল মানিয়া, এই মার্গেও যথাধিকার কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যতিক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া গীতা বলেন যে, চাতুর্বর্ণ্যবিহিত কর্ম্ম জ্ঞানলাভ হইবার পরেও লোকসংগ্রহার্থ কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্কামবুদ্ধিতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের কর্ত্তব্য। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, গীতাধর্ম্ম ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ত্ব সন্ন্যাসমার্গীদিগের দৃষ্টিতেও নির্দ্দোষ ; এবং বেদান্তসূত্র স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, উহাতেও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগসন্ন্যাসের বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (বেসূ. ৩. ৪. ২৬ ; ৩. ৪. ৩২-৩৫)।* নিষ্কামবুদ্ধিতেই হউক যদি আমরণ কর্ম্মই করিতে হয় তবে স্মৃতিগ্রন্থে কথিত কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্ন্যাসাশ্রমের কি অবস্থা হইবে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। অর্জ্জুন মনে ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান কখনো-না-কখনো কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না বলিবেনই ; এবং তখন ভগবানের মুখেই যুদ্ধ ছাড়িয়া দিবার পক্ষে আমি স্বাধীনতা পাইব। কিন্তু যখন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, ১৭শ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের একটি কথাও বলিলেন না, সর্ব্বক্ষণ এই উপদেশই করিলেন যে, ফলের আশা ত্যাগ কর, তখন ১৮শ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন—"তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের ভেদ কি তাহা আমাকে আবার বলো। অর্জ্জুনকে এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, এতক্ষণ তোমাকে যে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে সন্ন্যাস নাই এইরূপ যদি তোমার ধারণা হয় তবে তাহা ভুল। কর্ম্মযোগী পুরুষ সমস্ত কর্ম্মের 'কাম্য' অর্থাৎ আসক্তবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম এবং 'নিষ্কাম' অর্থাৎ আসক্তি ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম এই দুই ভেদ করেন। (ইহাকেই মনুস্মৃতি ২৩. ৮৯-এ অনুক্রমে 'প্রবৃত্ত' ও 'নিবৃত্ত' নাম দিয়াছেন)। তন্মধ্যে 'কাম্য' বর্গের সমস্ত কর্ম্মযোগী একেবারেই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের 'সন্ন্যাস' করেন। বাকী রহিল নিষ্কাম, কিংবা 'নিবৃত্ত' কর্ম্ম ; এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মযোগী করেনই তো, কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে তিনি ফলাশা সর্ব্বথাই ত্যাগ করিয়া থাকেন। সারকথা, কর্ম্মযোগমার্গেও 'সন্ন্যাস ও ত্যাগ' হইতে অব্যাহতি হইল কৈ? স্মার্ত্তমার্গী স্বরূপতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া থাকেন, আর কর্ম্মমার্গের যোগী তাহা না করিয়া কর্ম্মের ফলাশা সন্ন্যাস করেন। সন্ন্যাস দুই পক্ষেই বজায় আছে (গী. ১৮. ১-৬ এর উপর আমার টীকা দেখ)। সমস্ত কর্ম্ম যিনি পরমেশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কামবুদ্ধিতে করেন, গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহাকে 'নিত্যসন্ন্যাসীই' বলিতে হইবে (গী. ৫. ৩), ইহাই

* বেদান্তসূত্রের এই অধিকরণের অর্থ শাঙ্করভাষ্যে একটু ভিন্নরূপে করা হইয়াছে। কিন্তু 'বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি' (৩. ৪. ৩২) ইহার অর্থ আমাদের মতো "জ্ঞানীপুরুষ আশ্রমকর্ম্ম করিলেও উত্তম। কারণ উহা বিহিত"। মোদ্দাকথা, জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করুন বা না করুন, দুই পক্ষই আমার মতে বেদান্তসূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

ভাগবত ধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব ; এবং ভাগবত পুরাণেও সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কথা প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই তত্ত্বই উপদেশ করিয়াছেন। বামন পণ্ডিত গীতাসম্বন্ধীয় স্বলিখিত টীকা যথার্থদীপিকায় (১৮. ২) যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে "শিখা বোডুনী তোডিলা দোরা"—মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাস। কিংবা হস্তে দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে লাগিল, অথবা সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিল, এইরূপ করিয়াই যে সন্ন্যাস হয় তাহা নহে। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বুদ্ধির ধর্ম্ম ; দণ্ড, শিখা বা পৈতার নহে। বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে, দণ্ড আদিরই ধর্ম্ম যদি বলো, তবে যে ব্যক্তি রাজচ্ছত্র কিংবা ছত্রদণ্ড হস্তে ধারণ করেন তাঁহাদেরও সন্ন্যাসীর মোক্ষ লাভ করিতে হয় ; জনক-সুলভ-সংবাদে এইরূপই উক্ত হইয়াছে—

ত্রিদণ্ডাদিষু যদ্যস্তি মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ।
ছত্রাদিষু কথং ন স্যাৎ তুল্যহেতৌ পরিগ্রহে ॥ (শাং, ৩২০, ২)

—কারণ, হস্তে দণ্ডপরিগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই। তাৎপর্য্য,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংযমই প্রকৃত ত্রিদণ্ড (মনু. ১২. ২০) ; এবং কামবুদ্ধির সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস (গী. ১৮. ২) ; এবং ভাগবতধর্ম্মে উহা হইতে যেরূপ নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না (গী. ৬. ২) সেইরূপই বুদ্ধি স্থির রাখিবার কর্ম্ম কিংবা ভোজনাদি কর্ম্ম হইতেও সাংখ্য মার্গে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আবার ত্রিদণ্ডী কিংবা কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস কর্ম্মযোগমার্গে নাই বলিয়া ঐ মার্গ স্মৃতিবিরুদ্ধ কিংবা ত্যাজ্য, এইরূপ বৃথা সন্দেহ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র কিংবা সাদা বস্ত্রের জন্য ঝগড়া করিতে বসায় লাভ কি ?

ভগবান্ খুব নিরভিমান বুদ্ধিতে ইহাই বলিয়াছেন—

"একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"

সাংখ্য ও (কর্ম্ম) যোগ মোক্ষদৃষ্টিতে দুই নহে, একই, ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনিই পণ্ডিত (গী. ৫. ৫)। এবং মহাভারতেও, একান্তিক অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্ম সাংখ্যধর্ম্মের সমানই, "সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম্ম একান্ত-সেবিতঃ" (শাং. ৩৪৮. ৭৪)—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মোদ্দা কথা, পরার্থে সমস্ত স্বার্থের লয় করিয়া আপন আপন যোগ্যতানুরূপ ব্যবহারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্মই সর্ব্বভূতহিতার্থে আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য কিংবা 'নিত্য সন্ন্যাস' (৫. ৩), এই কারণেই কর্ম্মযোগমার্গে স্বরূপতঃ কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া কখনই ভিক্ষা মাগে না। কিন্তু বাহ্যাচরণ দ্বারা দেখিলে এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব কর্ম্মযোগমার্গেও বজায় থাকে। তাই, স্মৃতিগ্রন্থের আশ্রমব্যবস্থা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার শেষ সিদ্ধান্ত।

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের সহিত কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার মধ্যে যে এতটা ধস্তাধস্তি করা হইয়াছে, স্মার্ত্ত কিংবা সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রাচীন হওয়া এবং কর্ম্মযোগমার্গ [তাহার পরে নিঃসৃত হওয়াই তাহার লক্ষণ। কিন্তু ইতিহাসদৃষ্টিতে বিচার করিলে

সকলেরই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। পরে ঔপনিষদিক জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের গৌণতা প্রচলিত হইতে থাকে এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস আস্তে আস্তে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের বৃদ্ধির কিন্তু এই দ্বিতীয় সোপান। কিন্তু এই সময়েও ঔপনিষদিক জ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত মিল করিয়া জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ আপন কর্ম্ম আমরণ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের এই দ্বিতীয় সোপান দুই প্রকার ছিল—এক জনকাদির, এবং দ্বিতীয়টি যাজ্ঞবল্ক্যাদির। স্মার্ত্ত আশ্রম-ব্যবস্থা ইহার পরবর্ত্তী কিংবা তৃতীয় সোপান। কিন্তু দ্বিতীয় সোপানের ন্যায় তৃতীয়টিরও দুই ভেদ আছে। স্মৃতিগ্রন্থে কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহারই সঙ্গে জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগেরও—সন্ন্যাসাশ্রমের বিকল্প সূত্র—স্মৃতিকারেরা বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থে মূলীভূত মনুস্মৃতিই ধরুন না কেন। এই স্মৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমূহে উঠিতে উঠিতে, শেষে কর্ম্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ যতিধর্ম্মের নিরূপণ শেষ করিবার পর "যতিদিগের অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের এই ধর্ম্ম বলিলাম, এক্ষণে বেদসন্ন্যাসিকদিগের কর্ম্মযোগ বলিতেছি" এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রম অন্য আশ্রম হইতে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বলিয়া, মনু সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা যতিধর্ম্মকে বৈকল্পিক মানিয়া নিষ্কাম গার্হস্থ্যবৃত্তির কর্ম্মযোগ বর্ণনা করিয়াছেন (মনু. ৬. ৮৬-৯৬) ; এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই "বৈদিক কর্ম্ম-যোগ" নাম দিয়া; এই মার্গও চতুর্থাশ্রমেরই ন্যায় নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ এইরূপ বলিয়াছেন (মনু. ১২. ৮৬-৯০)। মনুর এই সিদ্ধান্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে যতিধর্ম্মের নিরূপণ শেষ হইলে পর, 'অথবা' পদ প্রয়োগ করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্যবাদী গৃহস্থও (সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া) মুক্তি লাভ করে (যাজ্ঞ. ৩. ২০৪ ও ২০৫)। সেইরূপ, যাস্কও স্বীয় নিরুক্তে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগী তপস্বী ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকারী কর্ম্মযোগী একই দেবযান গতি প্রাপ্ত হন (নি. ১৪. ৯)। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য প্রমাণ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের। এই ধর্ম্মসূত্র গদ্যাত্মক হওয়ায় শ্লোকে লিখিত স্মৃতিগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে, এইরূপ বিদ্বানদিগের মত। এই মত ঠিক্ কি ভুল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। তাহা ঠিক্ই হউক বা ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গের মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির বচন প্রদর্শিত গৃহাস্থাশ্রমের কিংবা কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব অপেক্ষাও ধর্ম্মসূত্রে অধিক মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম্মযোগকে চতুর্থাশ্রমের বিকল্প বলিয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপস্তম্ব সেরূপ না বলিয়া গৃহস্থাশ্রমই মুখ্য ও তাহার দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয় এইরূপ স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন। বৌধায়ন ধর্ম্ম সূত্রে "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণৈর্বা জায়তে" প্রত্যেক ব্রাহ্মণ জন্মতই তিন ঋণ আপন পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছে—ইত্যাদি তৈত্তিরীয় সংহিতার বচন প্রথমে দিয়া তাহার পর এই সকল ঋণ শোধ করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদিপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়কারী মনুষ্য ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য কিংবা সন্ন্যাসের যাহারা প্রশংসা করে সেই সব

ইতর লোক ধূলিতে মিলিত হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (বৌ. ২. ৬. ১১. ৩৩ ও ৩৪); এবং আপস্তম্বসূত্রেও ঐরূপ বিধানই আছে (আপ. ২. ৯. ২৪. ৫*)। এই দুই ধর্ম্মসূত্রে সন্ন্যাসাশ্রম বর্ণিত হয় নাই এরূপ নহে; কিন্তু উহার বর্ণনা করিয়াও গৃহস্থাশ্রমেরই মহত্ত্ব অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে, এবং বিশেষতঃ মনুস্মৃতির কর্ম্মযোগকে 'বৈদিক' বিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মনুস্মৃতির সময়েও কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস-আশ্রম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ গৃহস্থাশ্রম প্রাচীন বলিয়া ধারণা ছিল এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তাহার যোগ্যতা চতুর্থাশ্রমেরই ন্যায় পরিগণিত হইত। গীতার টীকাকারদিগের ঝোঁক সন্ন্যাস কিংবা কর্ম্মত্যাগযুক্ত ভক্তির উপরেই থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদের টীকায় উপরোক্ত স্মৃতিবচনসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও কর্ম্মযোগের প্রাচীনত্ব তাহাতে কমে না। কর্ম্মযোগমার্গ এইরূপ প্রাচীন হওয়াতেই উহাকে যতিধর্ম্মের বিকল্প বলিয়া স্মৃতিকারদিগের মানিতে হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই। ইহা হইল বৈদিক কর্ম্মযোগের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে জনকাদি-এই পন্থা অনুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে ভগবান তাহাতে ভক্তিকেও মিলাইয়া দিয়া তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করায়, তাহাই 'ভাগবতধর্ম্ম' নাম পাইয়াছে। ভগবদ্গীতা এই প্রকারে সন্ন্যাসাপেক্ষাও কর্ম্মযোগকে অধিক মান্য বলিয়া স্থির করিলেও তাহাতে পরে গৌণত্ব আসিয়া সন্ন্যাসমার্গেরই প্রাধান্য কেন হইল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহার বিচার পরে করা যাইবে। কর্ম্মযোগ স্মার্ত্তমার্গের পরবর্ত্তী নহে, পুরাতন বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাই এখানে বক্তব্য।

ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'ইতিশ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই যে সংকল্প থাকে, তাহার মর্ম্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। এই সংকল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে অন্য উপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা তো আছেই, কিন্তু শুধু ব্রহ্মবিদ্যাই নহে; প্রত্যুত ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে 'সাংখ্য' ও 'যোগ' (বেদান্তী সন্ন্যাসী ও বেদান্তী কর্ম্ম-যোগী) এই যে দুই পন্থা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে যোগের অর্থাৎ কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনই ভগবদ্গীতার মুখ্য বিষয়। অধিক-কি ভগবদ্গীতোপনিষৎই কর্ম্মযোগের মুখ্য গ্রন্থ, ইহা বলিতেও কোনই বাধা নাই। কারণ কর্ম্মযোগ বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া আসিলেও "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈশ ২) কিংবা "আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতাদি" (শ্বে. ৬. ৪), অথবা "বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধ্যায় আদি কর্ম্ম করিবে" (তৈ. ১. ৯.), এই প্রকার কতকগুলি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত উপনিষদে এই কর্ম্মযোগের সবিস্তর বিচার কোথাও করা হয় নাই। এ বিষয়ে ভগবদ্গীতাই মুখ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ; এবং কাব্যদৃষ্টিতেও ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, ভারতভূমির কর্ত্তৃপুরুষদিগের চরিত্র যে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই অধ্যাত্মশাস্ত্রকে ধরিয়া কর্ম্মযোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যাত হইবে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ভগবদ্গীতার সমাবেশ কেন করা হইয়াছে তাহারও উপপত্তি এক্ষণে ঠিক্ বুঝা যাইতেছে। উপনিষদ মূলীভূত হইলেও উহা বহু ঋষিকর্ত্তৃক কথিত হওয়ায় উহার বিচার সংকীর্ণ ও কোন কোন স্থানে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই, উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের সমন্বয়কারী বেদান্তসূত্রেরও প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গণনা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু উপনিষদ ও বেদান্তসূত্র এই দুয়ের অপেক্ষা গীতায় বেশী কিছু না থাকিলে প্রস্থানত্রয়ের

মধ্যে গীতাকে ধরিবার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু উপনিষদের টান প্রায়ই সন্ন্যাস মার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া জ্ঞানমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞানকে ধরিয়া ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগের সমর্থন আছে,—ব্যাস্, এইটুকু বলিলে, গীতাগ্রন্থের অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের সার্থকতাও পরিব্যক্ত হয়। কারণ বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম্ম (সাংখ্য ও যোগ) এই দুই বৈদিক মার্গের বিচার না থাকিলে প্রস্থানত্রয় ততটা অপূর্ণই রহিয়া যাইত। কাহারো কাহারো এইরূপ ধারণা আছে যে, উপনিষদ্ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক, তখন গীতার প্রবৃত্তিমূলক অর্থ ধরিলে প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্যও কমিয়া যাইবে। সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই যদি একমাত্র বৈদিক মোক্ষমার্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক্ হইবে। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যাদি কোন কোন উপনিষদে কর্ম্মযোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই, বৈদিক ধর্ম্মপুরুষকে কেবল এক-হস্তবিশিষ্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসপ্রধান না বুঝিয়া, তাহার ব্রহ্মবিদ্যারূপ একই মস্তক এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ তাহার দক্ষিণ ও বাম দুই হস্ত, এইরূপ গীতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলে, উপনিষদ্ ও গীতার মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে না। উপনিষদে এক মার্গের এবং গীতায় অন্য মার্গের সমর্থন আছে; তাই প্রস্থানত্রয়ীর এই দুই ভাগও দুই হস্তের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ না হইয়া সাহায্যকারী বলিয়াই উপলব্ধি হইবে। এইরূপেই গীতায় কেবল উপনিষদই প্রতিপাদিত হইয়াছে মানিলে, চর্ব্বিতচর্ব্বণের যে ব্যর্থতা গীতায় প্রযুক্ত হইত, তাহাও হয় না। যাক্। গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা এই বিষয় উপেক্ষা করায় সাংখ্য ও যোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গের প্রবর্ত্তক স্ব স্ব গ্রন্থের সমর্থনার্থ যে সকল মুখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য শীঘ্র নজরে পড়িবে বলিয়া, নিম্নলিখিত যুগল তালিকায় উক্ত কারণসকল পরস্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত স্মার্ত্ত আশ্রমব্যবস্থা ও মূল ভারতধর্ম্মের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহা হইতে দৃষ্ট হইবে—

ব্রহ্মবিদ্যা কিংবা আত্মজ্ঞান।
লাভ হইলে পর।

কর্ম্মসন্ন্যাস (সাংখ্য)	কর্ম্মযোগ (যোগ)
১। মোক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা নহে। জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তাহা অনিত্য।	১। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা নহে। জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তাহা অনিত্য।
২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, নিষ্কাম, বিরক্ত ও সম করা চাই।	২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, নিষ্কাম বিরক্ত ও সম করা আবশ্যক।

৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়পাশ হইতে মুক্ত (স্বতন্ত্র) হও।

৪। তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম দুঃখময় ও বন্ধনস্বরূপ।

৫। তাই, চিত্তশুদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলেও শেষে ত্যাগ করিতে হইবে।

৬। যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, বন্ধন না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহা করিতে বাধা নাই।

৭। দেহের ধর্ম্ম দেহ ছাড়ে না বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পর উদরের জন্য ভিক্ষা করা অসঙ্গত নহে।

৮। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর নিজের কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং লোকসংগ্রহ করিবারও আবশ্যকতা নাই।

৯। কিন্তু ব্যতিক্রমস্থলরূপে অধিকারী কোন পুরুষের জ্ঞানলাভের পরেও নিজের ব্যবহারিক অধিকার জনকাদির ন্যায় আমরণ বজায় রাখিতে বাধা নাই।

১০। কিন্তু যাহাই কর না কেন, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। অন্য অন্য আশ্রমের কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির সাধনমাত্র কিংবা পূর্ব্বায়োজন, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে তো স্বভাবতই বিরোধ আছে। তাই পূর্ব্বাশ্রমে যতশীঘ্র পারা যায় চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। চিত্তশুদ্ধি জন্মতই কিংবা পূর্ব্ববয়সে হইয়া থাকিলে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম করা আবশ্যক নহে। স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রম।

১১। কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণের পরও শমদমাদি ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

১২। এই মার্গ অনাদি ও শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত।

১৩। শুক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি এই মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন।

৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ না করিয়া তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ নিষ্কাম-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ কষ্টিপাথর প্রয়োগ কর। নিষ্কামের অর্থ নিষ্ক্রিয় নহে।

৪। দুঃখ ও বন্ধন কেন হয় ইহার ঠিক বিচার করিলে এরূপ দেখা যাইবে যে, অচেতন কর্ম্ম কাহাকেও বন্ধন করে না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার প্রতি কর্ত্তার মনে যে কামনা কিংবা ফলাশা হয় তাহাই বন্ধন ও দুঃখের মূল।

৫। তাই চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত কর। কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও কর্ম্ম কাহাকে ছাড়ে না। সৃষ্টির অর্থই কর্ম্ম, তাহার বিরাম নাই।

৬। নিষ্কামবুদ্ধিতে কিংবা ব্রহ্মার্পণবিধির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই এক বৃহৎ 'যজ্ঞ'। ইহার জন্য স্বধর্ম্ম-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে হইবে।

৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও কর্ম্ম এবং তাহা 'লজ্জাজনক'। এই সব কর্ম্ম যদি করিতেই হয় তবে অন্য কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে কেন না করিবে? তাছাড়া গৃহস্থাশ্রমী ব্যতীত ভিক্ষা আর কে দিবে?

৮। জ্ঞানলাভের পর, আপনার জন্য কিছু অর্জ্জন করিবার না থাকিলেও, কর্ম্ম ছাড়ে না। এই জন্য যাহা কিছু শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহা 'আমার নহে' এইরূপ নির্ম্মমবুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়া যাও। লোকসংগ্রহ কাহাকেও ছাড়ে না। উদাহরণ যথা— ভগবানের চরিত্র দেখ।

৯। গুণবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থানুসারে ছোট বড় অধিকার সকলেই জন্মতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্ব-ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই অধিকার, লোকসংগ্রহার্থ সকলকেই অনাসক্তবুদ্ধিতে আমরণ অব্যতিক্রমে চালাইতে হইবে। কারণ, এই চক্র জগতের ধারণার্থ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। সাংসারিক কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় সত্য। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের একমাত্র উপযোগ নহে। জাগতিক কর্ম্ম চালাইবার জন্যও কর্ম্ম আবশ্যক। সেইরূপ আবার, কাম্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে আদৌ বিরোধ নাই। তাই, চিত্তশুদ্ধির পরেও ফলাশা ত্যাগ করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমস্ত কর্ম্ম আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে জগতের সংগ্রহার্থ করিতে থাকো। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনও উচিত নহে, আর সাধ্যায়ত্তও নহে।

১১। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর ফলাশা ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শমদমাদি ধর্ম্ম ব্যতীত আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সমস্ত ধর্ম্ম পালন কর; এবং এই শমের দ্বারা অর্থাৎ শান্তবুদ্ধি হইতেই শাস্ত্রতঃ-প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম লোক-সংগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাও। নিষ্কাম কর্ম্ম ছাড়িও না।

১২। এই ধর্ম্ম অনাদি ও শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত।

১৩। ব্যাস-বসিষ্ঠজৈগীষব্যাদি এবং জনক-শ্রীকৃষ্ণাদি এই মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন।

শেষে মোক্ষ

এই দুই মার্গ কিংবা নিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যামূলক; দুয়েরই প্রতি মনের নিষ্কাম অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার হওয়া প্রযুক্ত, দুই মার্গের দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে (গী. ৫. ৫)। জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মত্যাগ এবং কাম্যকর্ম্ম ছাড়িয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নিত্য করিতে থাকা, এই দুয়ের মধ্যে ইহাই মুখ্য ভেদ।

কর্ম্ম ত্যাগ করা ও কর্ম্ম করা, উপরি উক্ত দুই মার্গ জ্ঞানমূলক অর্থাৎ জ্ঞানলাভের

পর জ্ঞানীপুরুষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আচরিত হয়। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করা ও কর্ম্ম করা এই দুই বিষয় জ্ঞান না হইলেও হইতে পারে। তাই অজ্ঞানমূলক কর্ম্মের এবং কর্ম্ম- ত্যাগেরও এখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে, তিন প্রকার ভেদ বলা হইয়াছে ইহাই তাহার বীজ। জ্ঞান না হইলেও কোন কোন লোক কেবল কায়ক্লেশভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাকে গীতায় রাজসিক ত্যাগ বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ৮)। সেইরূপ আবার, জ্ঞান না হইলেও শুধু শ্রদ্ধার সহিত কতকগুলি লোক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম করিবার এই মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুধু স্বর্গ এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৯. ২০)। যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতধর্ম্ম অধুনা প্রচলিত না থাকায়, মীমাংসকদিগের এই নিছক্ কর্ম্মমার্গসম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগী নহে, এইরূপ কাহারও কাহারও ধারণা। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ শ্রৌত যাগযজ্ঞ লুপ্ত হইলেও স্মার্ত্ত যজ্ঞ অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম অদ্যাপি চলিতেছে। তাই, অজ্ঞানবশতঃ কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের সম্বন্ধে গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরও সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে খাটে। জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া যাহারা নিয়মপূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ম্ম করে তাহাদেরই বিশেষ আদর হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত নহে। তাই, গণিতশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি না বুঝিয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা করে তাহাদের ন্যায় এই শ্রদ্ধালু ও কর্ম্মঠ লোকদিগের অবস্থা। সমস্ত কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করা হেতু তাহা নির্ভুল (শুদ্ধ,) হইয়া পুণ্যপ্রদ অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, স্বর্গলাভ অপেক্ষা মহত্তর ফললাভ এই কর্ম্মঠ লোক- দিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য স্বর্গসুখেরও অতীত অমৃতত্ব যিনি অর্জ্জন করিবেন— এবং ইহাই এক পরম পুরুষার্থ—তাঁহার উহাকে প্রথম সাধন বলিয়া এবং পরে সিদ্ধা- বস্থায় লোকসংগ্রহার্থক অর্থাৎ আমরণ "সর্ব্বভূতে একই আত্মা এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার মার্গকেই স্বীকার করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত মার্গ অপেক্ষা এই মার্গ উত্তম। গীতাকে অনুসরণ করিয়া উপরি-উক্ত তালিকায় এই মার্গকে কর্ম্ম যোগ বলা হইয়াছে; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কর্ম্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তিমার্গও বলেন। কিন্তু কর্ম্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ, এই দুই শব্দের দ্বারা জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিবার স্বর্গপ্রদ মার্গই সাধারণতঃ বুঝায়—এই এক দোষ। তাই জ্ঞানবিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্ম এবং জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য দুই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। এবং এই কারণেই মনুস্মৃতিতে এবং ভাগবতেও প্রথম প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মকে 'প্রবৃত্ত কর্ম্ম'' এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মকে 'নিবৃত্তি কর্ম্ম'' নাম দেওয়া হইয়াছে (মনু. ১২. ৮৯; ভাগ, ৭. ১৫. ৪৭)। কিন্তু এই দুই শব্দও আমার মতে যতটা হওয়া উচিত ততটা নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কারণ, 'কর্ম্ম'' হইতে পরাবৃত্ত হওয়া, 'নিবৃত্তি' শব্দের সাধারণ অর্থ। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য 'নিবৃত্ত' শব্দের পরে 'কর্ম্ম'' এই বিশেষণ যুক্ত

হইয়াছে; এবং এইরূপ করায়, 'নিবৃত্ত' এই বিশেষণের অর্থ 'কর্ম্ম'' হইতে পরাবৃত্ত' না হইয়া নিবৃত্ত 'কর্ম্ম' = নিষ্কাম কর্ম্ম, এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যাহাই বল না কেন, 'নিবৃত্ত' এই শব্দ যে পর্য্যন্ত উহাতে আছে সে পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগের কল্পনা মনে না আসিয়া ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার মার্গকে নিবৃত্তি কিংবা নিবৃত্ত কর্ম্ম না বলিয়া 'কর্ম্মযোগ' নাম দেওয়া আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্ম্মের পরে যোগ শব্দ যুক্ত থাকিলে স্বভাবতই তাহার 'মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া কর্ম্ম করিবার কৌশল' এই অর্থ হয়; এবং অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের নিরাসও আপনা-আপনি হয়। তথাপি ইহা বিস্মৃত হইবে না যে, গীতার কর্ম্মযোগ জ্ঞানমূলক এবং ইহাকেই কর্ম্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তিমার্গ বলা কেহ যদি ইষ্ট মনে করেন তাহাতে বাধা নাই। কোন কোন স্থলে আমিও ভাষাবৈচিত্র্যের জন্য এই শব্দ গীতার কর্ম্মযোগের বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছি। যাক্। কর্ম্ম করা কিংবা কর্ম্ম ত্যাগ করা, ইহাদের এইরূপ জ্ঞানমূলক ও অজ্ঞানমূলক যে ভেদ আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকের সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ—

জীবনের মার্গ	শ্রেণী		গতি	
১। কামোপভোগকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া অহঙ্কারবশতঃ আসুরী বুদ্ধিতে দম্ভ কিংবা লোভ বশে কেবল আত্ম-সুখের জন্য কর্ম্ম করা, (গী. ১৬. ১৬) —আসুর কিংবা রাক্ষস মার্গ।	অধম		নরক	
১। সর্ব্বভূতে এক আত্মা এইরূপ পর-মেশ্বর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান না হইলে ও বেদাজ্ঞাকে কিংবা শাস্ত্রাজ্ঞাকে অনু-সরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ও নীতি অনুসারে নিজ নিজ কাম্য কর্ম্ম করা (গী. ২. ৪১-৪৪ ও ৯-২০)—কেবল কর্ম্ম, ত্রয়ী ধর্ম্ম কিংবা মীমাংসকমার্গ।	মধ্যম (মীমাংসক মতে উত্তম)	জ্ঞানকর্ব্বিত তিন নিষ্ঠা	স্বর্গ (মীমাংসকমতে মোক্ষ)	
১। শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরা-গ্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানেই তৃপ্ত হইয়া থাকা (গী. ৫. ২)—কেবল জ্ঞান, সাংখ্য কিংবা স্মার্ত্ত মার্গ।	উত্তম		মোক্ষ	গীতার দুই নিষ্ঠা
১। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহার দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া পরে কেবল লোকসংগ্রহার্থ আমরণ ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকা (গী. ৪. ২)—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়, কর্ম্মযোগ কিংবা ভাগবত মার্গ।	সর্ব্বোত্তম		মোক্ষ	

সার কথা,—মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও উহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কারণে—এক তো অপরিহার্য্য বলিয়া এবং তাছাড়া জগতের ধারণপোষণার্থ আবশ্যক বলিয়া—নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা—ইহাই গীতায় সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অথবা "কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ" (মনু. ১. ৯৭) এই মনুবচনানুসারে কর্ত্তৃত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের সংযোগই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, এবং শুদ্ধ কর্ত্তৃত্ব কিংবা শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ইহাদের প্রত্যেকটিই একদেশদর্শী, এইরূপ গীতার শেষ সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিক বলিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু গীতার সিদ্ধান্ত যে শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত তাহাই দেখাইবার জন্য উপরে স্থানে স্থানে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ, উপনিষদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হইতে সমস্ত উপনিষদ সন্ন্যাসমূলক কিংবা নিবৃত্তিমূলক, অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। উপনিষদে সন্ন্যাসমার্গ আদৌ নাই সে কথা আমি বলি না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্য নহে এইরূপ অনুভূতি হইলে পর "কোন কোন জ্ঞানী পুরুষ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার পরোয়া না করিয়া 'সন্তানসন্ততিতে আমার কি প্রয়োজন? সংসারই আমার আত্মা' এইরূপ বলিয়া ভিক্ষা মাগিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়" (বৃ. ৪. ৪. ২২)। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানীকে এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম বৃহদারণ্যকে কোথাও হয় নাই। অধিক কি, যাঁহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের শিখরে পোঁছিয়া অমৃত হইয়াছিলেন এই রূপ তাঁহার বর্ণনা এই উপনিষদে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় জগৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা কোথাও বলা নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জনকের নিষ্কামকর্ম্মমার্গ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের, কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের বিকল্পে সম্মতি আছে এবং বেদান্তসূত্রকারও এই অনুমানই করিয়াছেন (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। কঠোপনিষৎ ইহা অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছেন। আমার মতে কঠোপনিষদে যে নিষ্কামকর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে পঞ্চম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮. ১৫. ১) এই অর্থই প্রতিপাদ্য, এবং শেষে "গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে পরিবারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণকারী জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে না", এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই দুই উপনিষদের এই অর্থেরই বাক্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে (তৈ. ১. ৯ ও শ্বে. ৬. ৪)। তাছাড়া ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, উপনিষদে যাঁহারা অপরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অথবা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানী শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় দুই এক জন ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। বরং তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমীই ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই সমস্ত উপনিষদই সন্ন্যাসমূলক নহে এইরূপ মানিতে হয়। কোন কোন উপনিষদে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের বিকল্প এবং কাহারও কাহারও মধ্যে কেবল জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যে এই ভেদ না দেখাইয়া, সমস্ত উপনিষদ কেবল একই অর্থ—বিশেষতঃ

সন্ন্যাস-প্রতিপাদক এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। সারকথা, সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের হাতে গীতা ও উপনিষদেরও একই অবস্থা হইয়াছে; অর্থাৎ গীতার কতকগুলি শ্লোকের ন্যায় উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্রেরও এই ভাষ্যকারেরা টানাবুনা অর্থ করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—ঈশাবাস্য উপনিষৎ ধরুন না কেন। এই উপনিষৎ ছোট অর্থাৎ শুদ্ধ অষ্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যতা অন্য উপনিষদ্ অপেক্ষা অধিক বলিয়া সকলে বুঝিয়া থাকে। কারণ, এই উপনিষৎ স্বয়ং বাজসনেয়ী সংহিতাতেই কথিত হইয়াছে; এবং অন্যান্য উপনিষদ ও আরণ্যক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সংহিতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আরণ্যক গ্রন্থ উত্তরোত্তর কম প্রামাণ্য, এ কথা সর্ব্বমান্য। এই সমুদয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক। ইহার প্রথম মন্ত্রে (শ্লোকে) "জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশাবাস্য অর্থাৎ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিবে" এইরূপ বলিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে "যাবজ্জীবন শত বৎসর নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিয়াই বাঁচিবার বাসনা মনে পোষণ করিবে" এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। বেদান্তসূত্রে কর্ম্মযোগের বিচার করিবার সময় এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ঈশাবাস্যের এই বচনই জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় পক্ষের সমর্থক বলিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষৎ ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত বিধানের সমর্থনার্থ পরে 'অবিদ্যা' (কর্ম্ম) ও 'বিদ্যা' (জ্ঞান) ইহাদের বিচার আরম্ভ করিয়া, নবম মন্ত্রে "শুদ্ধ অবিদ্যা-(কর্ম্ম) সেবক পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুদ্ধ বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমজ্জিত পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে পতিত হয়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ অবিদ্যা (কর্ম্ম) এবং শুদ্ধ বিদ্যা (জ্ঞান) ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্‌ভাবে এইরূপ ন্যূনতা দেখাইয়া, একাদশ মন্ত্রে নিম্নলিখিত অনুসারে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই দুয়ের সমুচ্চয়ের আবশ্যকতা এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—

বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

"বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) উভয়কে পরস্পরের সহিত যে ব্যক্তি জানে, সে অবিদ্যার (কর্ম্মের) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ নশ্বর মায়াজগতের প্রপঞ্চ (উত্তমরূপে) পার হইয়া, বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে"। এই মন্ত্রের ইহাই স্পষ্ট ও সরল অর্থ। এবং এই অর্থই বিদ্যার 'সংভূতি' অর্থাৎ জগতের আদিকারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন অবিদ্যার 'অসংভূতি' কিংবা 'বিনাশ' এইরূপ অন্য নাম দিয়া ইহার পরবর্ত্তী তিন মন্ত্রে পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে (ঈশ. ১২-১৪)। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত ঈশাবাস্যোপনিষৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার এককালীন (উভয়ং সহ) সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়াছে। উপরি-উক্ত মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই শব্দেরই ন্যায় মৃত্যু ও অমৃত এই দুই শব্দ পরস্পর-প্রতিযোগী। তন্মধ্যে অমৃত শব্দে অবিনাশী ব্রহ্ম অর্থ স্পষ্ট, এবং তদ্বিরুদ্ধ মৃত্যু শব্দে নশ্বর মৃত্যুলোক অথবা ঐহিক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এই অর্থেই এই দুই শব্দ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তেও প্রদত্ত হইয়াছে (ঋ. ১০. ১২৯. ২)। বিদ্যাদি শব্দের এই সরল অর্থ গ্রহণ করিয়া, (অর্থাৎ বিদ্যা = জ্ঞান, অবিদ্যা—কর্ম্ম, অমৃত = ব্রহ্ম এবং মৃত্যু = মৃত্যুলোক এইরূপ বুঝিয়া) ঈশাবাস্যের উপরিপ্রদত্ত একাদশ মন্ত্রের অর্থ করিলে, প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে বিদ্যা ও

অবিদ্যার এককালীন সমুচ্চয় বর্ণিত হইয়াছে ; ঐ বিষয়ই দৃঢ় করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ফল কি তাহা পৃথক্ করিয়া কথিত হইয়াছে। ঈশাবাস্য-উপনিষদের এই দুই ফল ইষ্ট এবং সেই জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়েরই এককালীন সমুচ্চয় এই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মৃত্যুলোকের প্রপঞ্চ ঠিক্ চালানো কিংবা তাহা হইতে উত্তমরূপে পার হওয়াকেই গীতায় 'লোকসংগ্রহ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মোক্ষলাভ মনুষ্যের কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোকসংগ্রহও আবশ্যক। এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রাহক কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক না এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত ; এবং এই সিদ্ধান্তই শব্দভেদে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই উপরি-উক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সারকথা—গীতা উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদে স্পষ্টরূপে বর্ণিত অর্থই গীতায় সবিস্তর প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে ঈশাবাস্যোপনিষৎ যে বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে তাহাই বাজসনেয়ী সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণভাগ। এই শতপথব্রাহ্মণের আরণ্যকে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহাতে "শুদ্ধ বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে" ঈশাবাস্যের এই নবম মন্ত্র অক্ষরশঃ গৃহীত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৪. ১০)। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদেই জনকের কথা আছে ; এবং সেই জনকের দৃষ্টান্ত কর্ম্মযোগসমর্থনার্থ ভগবান কর্ত্তৃক গীতায় গৃহীত হইয়াছে (গী. ৩. ২০)। ইহা হইতে—ঈশাবাস্যের ও ভগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের যে সম্বন্ধ আমি উপরে দেখাইয়াছি তাহাই অধিক দৃঢ় ও নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হয়।

কিন্তু সমস্ত উপনিষদেই মোক্ষপ্রাপ্তির একই মার্গ প্রতিপাদ্য হইয়াছে। এবং তাহাই বৈরাগ্যের কিংবা সন্ন্যাসেরই মার্গ, উপনিষদে দুই দুই মার্গ প্রতিপাদিত হইতে পারে না, এইরূপ যাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাঁহাদিগকে ঈশাবাস্যোপনিষদের স্পষ্টার্থক মন্ত্রগুলিকেও টানিয়াবুনিয়া কোন প্রকারে পৃথক্ অর্থ লাগাইয়া দিতে হয়, নচেৎ এই সকল মন্ত্র তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে যায় ; এবং সেরূপ হওয়া তাঁহাদের ইষ্ট নহে। এই জন্য একাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় শাঙ্করভাষ্যে 'বিদ্যা' এই শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' এইরূপ না করিয়া উপাসনা করা হইয়াছে। বিদ্যা শব্দের অর্থ যে উপাসনা হয় না এমন নহে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি স্থানে তাহার উপাসনা অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা মুখ্য অর্থ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মনে একথা যে উদয় হয় নাই তাহাও নহে ; অধিক কি, উদয় না হওয়া অসম্ভব ছিল। "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং" (কেন ২. ১২), কিংবা "প্রাণস্যাধ্যাত্মং বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে" (প্রশ্ন. ৩. ১২), এইরূপ বচন অন্যান্য উপনিষদেও আছে। মৈত্র্যুপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইত্যাদি উপরিপ্রদত্ত ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রই অক্ষরশঃ গৃহীত হইয়াছে ; তাহারই সংলগ্ন তাহার পূর্ব্বে কঠ. ২. ৪. ও পরে কঠ. ২. ৫.—এই মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তিন মন্ত্রই এক স্থানে পর পর প্রদত্ত হইয়াছে ; মধ্যের মন্ত্রটি ঈশাবাস্যের মন্ত্র। তিনটীতেই 'বিদ্যা' শব্দ আছে। তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শব্দের যে অর্থ, সেই (জ্ঞান) অর্থই ঈশাবাস্যেও গ্রহণ করিতে হইবে—মৈত্র্যুপনিষদের ইহাই অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে "বিদ্যা = আত্মজ্ঞান ও অমৃত = মোক্ষ এই

অর্থই যদি ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রে গ্রহণ করা যায় তবে জ্ঞান (বিদ্যা) ও কর্ম্ম (অবিদ্যা) ইহাদের সমুচ্চয় এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে হয় ; কিন্তু যখন এই সমুচ্চয় ন্যায়সিদ্ধ নহে, তখন বিদ্যা = দেবতার উপাসনা এবং অমৃত = দেবলোক এই গৌণ অর্থই এই স্থানে গ্রহণ করিতে হইবে"। সার-কথা, ইহা সুস্পষ্ট যে, "জ্ঞান হইলে পর, সন্ন্যাস লইবে, কর্ম্ম করিবে না ; কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় কোথাও ন্যায্য নহে"—শাঙ্করসম্প্রদায়ের এই মুখ্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ঈশাবাস্যের মন্ত্র যাহাতে না হয় তাহার জন্য বিদ্যা শব্দের গৌণার্থ স্বীকার করিয়া সমস্ত শ্রুতিবচনের নিজ সম্প্রদায়ানুরূপ সমন্বয় করিবার জন্য শাঙ্করভাষ্যে ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রের উপরিলিখিতানুসারে অর্থ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিলে, এই অর্থ গুরুত্বব্যঞ্জক না হইলেও আবশ্যক বটে। কিন্তু সমস্ত উপনিষদে এক অর্থই প্রতিপাদিত হওয়া উচিত,—দুই মার্গ শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইতে পারে না,—এই মূলসিদ্ধান্তই যাঁহাদের মান্য নহে, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত মন্ত্রে বিদ্যা ও অমৃত শব্দদ্বয়ের অর্থ উল্টাইবার কোনই কারণই থাকে না। পরব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই তত্ত্ব মানিলেও তাঁহার জ্ঞান হইবার উপায় একাধিক হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। একই ছাদের উপর যাইবার দুই সিঁড়ি কিংবা একই শহরে যাইবার দুই রাস্তা যেরূপ থাকিতে পারে, সেইরূপ মোক্ষলাভের উপায় কিংবা নিষ্ঠার কথা ; এবং এই অভিপ্রায়েই "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" এইরূপ ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। নিষ্ঠা দুই প্রকার হওয়া সম্ভব কহিলে পর কোন কোন উপনিষদে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠার, আবার কতকগুলি উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়নিষ্ঠার বর্ণন আসা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধ আসে বলিয়া ঈশাবাস্যোপনিষদের শব্দের সরল, সহজ ও স্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দৃষ্টি সরল অর্থাপেক্ষা সন্ন্যাসনিষ্ঠামূলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাবে ছিল, ইহা বলিবার আরও এক কারণ আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে (তৈ. ২. ১১) "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ঈশাবাস্যের এইটুকু অংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহারই সহিত "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই মনুবচনও (মনু. ১২. ১০৪) দেওয়া হইয়াছে ; এবং এই দুই বচনে "বিদ্যা" শব্দের একই মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) আচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য এইস্থানে এইরূপ বলেন যে, "তীর্ত্ত্বা = তরিয়া যাওয়া" এই পদ হইতে প্রথমে মৃত্যুলোক পার হইবার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে তাহার পরে (একই সময়ে নহে) বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিবার ক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু এই অর্থ পূর্ব্বার্দ্ধের 'উভয়ং সহ' শব্দগুলির বিরুদ্ধ হয়, ইহা বলা বাহুল্য ; এবং প্রায় এই কারণেই ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে এই অর্থ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যে পৃথক ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি, তাহা ইহা হইতে ব্যক্ত হয়। এই কারণ সাম্প্রদায়িক ; এবং ভাষ্যকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে যাঁহারা স্বীকার না করেন তাঁহাদের নিকট প্রস্তুত ভাষ্যের এই ব্যাখ্যা মান্য হইবে না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অলৌকিক-জ্ঞানী-পুরুষ-প্রতিপাদিত অর্থ ছাড়িয়া দিবার প্রসঙ্গ যতই পরিহার করা যায় ততই ভাল, এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িলে, এই প্রসঙ্গ তো আসিবেই ; এবং এই জন্যই আমার পূর্ব্বেও

ঈশাবাস্য মন্ত্রের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে ভিন্ন প্রকারে (আমি যেরূপ বলিতেছি সেইরূপই) অন্য ভাষ্যকারেরাও প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—বাজসনেয়ী সংহিতার সুতরাং ঈশাবাস্যোপনিষদের উপরও উবটাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে তাহাতে "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় "বিদ্যা—আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা—কর্ম্ম এই দুয়ের সমন্বয়ের দ্বারাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়', এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অনন্তাচার্য্য এই উপনিষদের নিজ ভাষ্যে এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক অর্থই স্বীকার করিয়া শেষে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, "এই মন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং 'যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে' (গী. ৫ ৫) এই গীতাবচনের অর্থ একই; এবং গীতার এই শ্লোকের 'সাংখ্য' ও 'যোগ' শব্দ অনুক্রমে 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্মের' বাচক"। সেইরূপ আবার, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর (যা ৩. ৫৭ ও ২০৫) আপন টীকায় অপরার্কদেবও ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্র দিয়া অনন্তাচার্য্যেরই ন্যায় তাহার জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়াত্মক অর্থ করিয়াছেন। ইহা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, আমি আজ নূতন করিয়া ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে ভিন্ন অর্থ করি নাই।

স্বয়ং ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার হইল! এক্ষণে শঙ্করভাষ্যে "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই যে মনুবচন প্রদত্ত হইয়াছে তাহার একটু বিচার করিব। মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকে ১০৪ সংখ্যার, এবং মনু ১২. ৮৬ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, ঐ প্রকরণ বৈদিক কর্ম্মযোগের। কর্ম্মযোগের এই বিচার আলোচনায়—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥*

প্রথম চরণে "তপ্ ও (চ) বিদ্যা (অর্থাৎ দুই-ই) ব্রাহ্মণের উত্তম মোক্ষপ্রদ" এইরূপ বলিয়া আবার প্রত্যেকের উপযোগী দেখাইবার জন্য "তপস্যার দ্বারা দোষ নষ্ট হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়" এইরূপ দ্বিতীয় চরণে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই স্থানে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই মনুর অভিপ্রেত, এবং ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রের অর্থই মনু এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। হারীতস্মৃতির বচন হইতেও এই অর্থই অধিক দৃঢ় হয়। এই হারীতস্মৃতি স্বতন্ত্রতো উপলব্ধি হয়ই এবং তাহাছাড়া নৃসিংহপুরাণে (নৃ. পু. অ. ৫৭. ৬১) প্রদত্ত হইয়াছে। এই নৃসিংহপুরাণে (৬১. ৯-১১) এবং হারীতস্মৃতিতে (৭. ৯-১১) জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সম্বন্ধে এই এক শ্লোক আছে—

যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈর্বিনা যথা।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবপি তপস্বিনঃ ॥

* ঈশাবাস্যোপনিষদের এই সব ভাষ্য পুণার আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত ঈশাবাস্যোপনিষদের সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অপরার্কের টীকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদা ছাপা হইয়াছে। প্রো. মোক্ষমূলর উপনিষদের যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহাতে ঈশাবাস্যের ভাষান্তর শাঙ্করভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া করা হয় নাই। ইহার কারণ তিনি আপন ভাষান্তরের শেষে দিয়াছেন Sacred Books of the East Series Vol. 1. PP. 314-320 অনন্তাচার্য্যের ভাষ্য মোক্ষমূলর সাহেবের জানা ছিল না; এবং শাঙ্করভাষ্যে পৃথক্ অর্থ কেন করা হইয়াছে, তাহার মর্ম্মও মোক্ষমূলর সাহেবের উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

যথান্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ ॥
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥

"যেরূপ রথ ব্যতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলে না) তপস্বীর তপস্যা ও বিদ্যারও সেই অবস্থা। যেরূপ অন্ন মধুসংযুক্ত এবং মধু অন্নসংযুক্ত, সেইরূপ তপস্যা ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা ঔষধ প্রস্তুত হয়। যেরূপ পক্ষীর গতি দুই পক্ষ-যোগেই হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম (এই দুয়ের) দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম লাভ হয়"। হারীতস্মৃতির এই বচন বৃদ্ধাত্রেয়স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায়েও পাওয়া যায়। এই সকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তৎপ্রদত্ত দৃষ্টান্ত হইতে মনুস্মৃতির বচনের কি অর্থ করা উচিত, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তপঃ শব্দের মধ্যেই মনু চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মের সমাবেশ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (মনু. ১১. ২৩৬); এবং এক্ষণে উপলব্ধি হইবে যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তপঃ ও স্বাধ্যায়প্রবচন" ইত্যাদি যে সকল আচরণ করিতে বলা হইয়াছে (তৈ. ১. ৯) তাহাও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে। সমগ্রযোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের তাৎপর্য্যই এই। কারণ, এই গ্রন্থের আরম্ভে সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা, কেবল কর্ম্মের দ্বারা কিংবা দুয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহা আমাকে বলো। এবং তাহার উত্তর দিবার সময়, হারীতস্মৃতির পক্ষীদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া "আকাশে পক্ষীদের গতি যেরূপ দুই পক্ষযোগেই হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হয় না" এইরূপ বলিয়া, পরে সেই অর্থকেই সবিস্তর সপ্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে (যো. ১. ১. ৬-৯)। সেইরূপ মুখ্য কথার মধ্যে বসিষ্ঠ রামকে "জীবন্মুক্তের ন্যায় বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিয়া তুমি সমস্ত কর্ম্ম কর" (যো. ৫. ১৯. ২৭-২৬) কিংবা "কর্ম্ম ত্যাগ করা আমরণ যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় (যো. উ. ২. ৪২), স্বধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট রাজ্য পালনের কাজ কর" (যো. ৫. ৫৪ ও ৬. উ. ২১৩. ৫০) এইরূপ স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কার্য্যও এই উপদেশের অনুরূপ। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠের টীকাকার সন্ন্যাসমার্গীয় ছিলেন, তাই পক্ষীর দুই পক্ষের উপমা স্পষ্ট হইলেও, তিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুই যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে বিহিত নহে, এইরূপ নিজের অভিপ্রেত মত লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে টানাবুনা, ক্লিষ্ট ও সাম্প্রদায়িক, তাহা টীকা ছাড়িয়া দিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেই যে-কোনো ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে। যোগ-বাসিষ্ঠেরই ন্যায় মাদ্রাজ প্রান্তে গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠ-তত্ত্বসারায়ণ নামক এক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে। তাহার জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, এই তিন ভাগ আছে। এই গ্রন্থকে যতটা পুরাতন বলা হয় তত পুরাতন মনে করি না, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন না হইলেও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষই তাহাতে প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহাতে অদ্বৈত বেদান্ত আছে; এবং

নিষ্কাম কর্ম্মের উপর ইহা বিশেষ ঝোঁক দেওয়ায় ইহার সম্প্রদায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় হইতে যে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, ইহা বলিতে বাধা নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের নাম 'অনুভবাদ্বৈত'; এবং বস্তুত দেখিতে গেলে, ইহা গীতার কর্ম্মযোগেরই এই নকল মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু কেবল ভগবদ্‌গীতারই ভিত্তিতে এই সম্প্রদায় সিদ্ধ না করিয়া, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত ১০৮ উপনিষদ্ হইতে ঐ অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রামগীতা ও সূর্য্যগীতা এই দুই নতুন গীতাও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে কর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষকেই স্বীকার করা এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহা এই গ্রন্থ হইতে দূর হইবে। উপরিপ্রদত্ত প্রমাণে এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসূত্র, মনুযাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা, যোগবাসিষ্ঠ ও পরিশেষে তত্ত্বসারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত না মানিয়া কেবল সন্ন্যাসমার্গকেই শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত বলা সর্ব্বথা ভিত্তিহীন।

এই মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা লোকসংগ্রহার্থ যথাধিকার নিষ্কাম কর্ম্ম, এবং মোক্ষলাভার্থ জ্ঞান, এই দুয়ের এককালীন সমুচ্চয়ই অথবা মহারাষ্ট্র কবি শিবদিন-কেসরীর বর্ণনা অনুসারে—

> প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচা লাহো জ্যানেঁ কেলা।
> তো নর ভলা ভলা রে ভলা ভলা॥

"যিনি প্রপঞ্চ সাধন করিয়া (সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিয়া) পরমার্থ লাভ করিয়াছেন তিনিই ভালো, ভালো, ভালো ভালো"—এই অর্থই গীতায়প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে প্রচার হইয়া আসিতেছে; জনক প্রভৃতি ইহাই আচরণ করায় এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা উহার প্রসার ও পুনরুজ্জীবন হওয়া প্রযুক্ত, ইহাকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। এই সকল বিষয় ভালরূপে সিদ্ধ হইল। এই মার্গের জ্ঞানীপুরুষ পরমার্থযুক্ত স্বকীয় প্রপঞ্চ—জাগতিক ব্যবহার—কিরূপভাবে চালান, লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে ইহা দেখাও আবশ্যক। কিন্তু উপস্থিত প্রকরণ অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া প্রযুক্ত পরবর্ত্তী প্রকরণে তাহার স্পষ্টীকরণ করিব।

ইতি একাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

———

দ্বাদশ প্রকরণ

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার

> সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাং চ হিতে রতঃ।
> কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে॥*
>
> মহাভারত, শান্তি। ২৬১. ৯

যে মার্গের এই মত যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বুদ্ধি যখন অত্যন্ত সম ও নিষ্কাম হয় তখন মনুষ্যের কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না; এবং সেই জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের দুঃখময় ও শুষ্ক ব্যবহার, বিরক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞানীপুরুষদের সমস্ত ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা কর্ম্মযোগ কিংবা গৃহস্থাশ্রমের আচরণও বিচার করিবার যোগ্য এক শাস্ত্র আছে এ কথা কখনো মনেই করিতে পারেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া চাই, তাই তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যে ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিকতা আসে, সেই ধর্ম্ম অনুসারেই সংসারের কার্য্য করাই উচিত। সেই কারণে তাঁহারা মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য অবস্থিতি করা বাতুলতা, প্রত্যেক মনুষ্যের যত শীঘ্র সম্ভব সন্ন্যাসগ্রহণই এই জগতে পরম কর্ত্তব্য! এইরূপ মানিলে কর্ম্মযোগের স্বতন্ত্র মহত্ত্ব কিছুই থাকে না; এবং সেই জন্য, সন্ন্যাসমার্গীয় পণ্ডিত সাংসারিক কর্ত্তব্যবিষয়ে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিচার করিয়া মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের বর্ণিত চারি আশ্রমরূপ সোপানে উঠিতে উঠিতে সন্ন্যাস-আশ্রমরূপ শেষ ধাপে শীঘ্র পৌঁছানো অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা আর বেশী কিছু করেন না। সেইজন্য কলিযুগে সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় গীতাভাষ্যে, গীতার কর্ম্মমূলক রচনাগুলি উপেক্ষা করিয়া অথবা উহা কেবল প্রশংসামূলক (অর্থবাদমূলক) এইরূপ কল্পনা করিয়া, শেষ কর্ম্মসন্ন্যাস-ধর্ম্মই সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতার ফলিতার্থ বাহির করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে গীতার এই যে রহস্য বিবৃত করিয়াছেন যে, ভগবান রণভূমির উপরে অর্জ্জুনকে নিবৃত্তিমূলক নিছক্ বা পাতঞ্জল যোগ অথবা মোক্ষমার্গেরেই উপদেশ করিয়াছেন তাহার কারণও এই। সন্ন্যাসমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান যে নির্দ্দোষ এবং তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সাম্যবুদ্ধি কিংবা নিষ্কাম অবস্থাও যে গীতার গ্রাহ্য ও সম্মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মোক্ষলাভের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, সন্ন্যাসমার্গের এই কর্ম্মসম্বন্ধীয় মত গীতার গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত বৈরাগ্য ও সমতার দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত ব্যবহার করিতে হইবে, গীতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর দেখাইয়াছি। জগতের জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া জগতের নাশ হয়; এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হইয়া সুচারুরূপে চলিবে, ইহাই যখন

* "কর্ম্মে মনে ও বাক্যে সকলের হিতসাধনে যিনি রত এবং সকলের যিনি নিত্য সুহৃদ-হে জাজলে, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন।"

ভগবানের ইচ্ছা, তখন জ্ঞানীপুরুষকেও সমস্ত প্রাপঞ্চিক কর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া সাধারণ মনুষ্যদিগকে সদ্‌বর্ত্তনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিতে হইবে। এই মার্গকে অধিক শ্রেয়স্কর ও গ্রাহ্য বলিলে এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক কর্ম্ম কিরূপে করিয়া থাকেন তাহা দেখা আবশ্যক হয়। কারণ, এই প্রকার জ্ঞানী পুরুষদের আচরণই লোকের আদর্শ হয়; তাঁহার আচরণপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয়কারক সাধন উপায়—যাহা আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা—স্বতই আমরা প্রাপ্ত হই। সন্ন্যাসমার্গ হইতে কর্ম্মযোগমার্গে যা কিছু বিশেষত্ব তাহা এই। যে ব্যক্তির ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা স্থির হইয়াছে, "সর্ব্বভূতে এক আত্মা" এই সাম্য উপলব্ধি করিবার সামথ্য হইয়াছে, তাহার বাসনাও অবশ্য শুদ্ধই হয়; এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি এইরূপ শুদ্ধ, সম, নির্ম্মম ও পবিত্র হইলে পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ কিংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্ম্ম করাই সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমে বাসনা ও পরে তদনুকূল কর্ম্ম; এইরূপই যখন ক্রম তখন শুদ্ধ বাসনাজনিত কর্ম্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহা শুদ্ধ তাহাই মোক্ষানুকূল। সুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া এই সংসারে মনুষ্যমাত্রই কিরূপ আচরণ করিবে—আমাদের সম্মুখে 'কর্ম্মাকর্ম্ম-বিচিকিৎসা' কিংবা 'কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি'র এই যে বিকট প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, নিজের আচরণের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ উত্তর দিবার গুরু এক্ষণে আমাদের লাভ হইল (তৈ. ১. ১১. ৪; গী. ৩. ২১)। অর্জ্জুনের সম্মুখে এইরূপ গুরু শ্রীকৃষ্ণরূপে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান ছিলেন। এবং যুদ্ধাদি কর্ম্ম বন্ধন বলিয়া জ্ঞানীপুরুষের কি তাহা ছাড়িতে হইবে অর্জ্জুনের যখন সন্দেহ হইয়াছিল, তখন এই গুরু তাহা দূর করিয়া, জাগতিক ব্যবহার কিরূপ ভাবে করিলে পাপ হয় না, অধ্যাত্মশাস্ত্র অবলম্বনে তাহা অর্জ্জুনকে ঠিক বুঝাইয়া দিলেন; তাহার পর তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে বুঝাইবার গুরু প্রত্যেকে সর্ব্বদা লাভ করিতে পারে না; এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বচনের বিচার করিবার সময় আমি বলিয়াছি যে, এই মহাপুরুষদিগের শুদ্ধ বাহ্য আচরণ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত থাকিতে পারে না। তাই, জগতকে নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাদাতা এই জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া তদন্তর্নিহিত প্রকৃত বীজ কিংবা মূলতত্ত্বটি তাহা বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই কর্ম্মযোগশাস্ত্র বলে; এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাঁহার অবস্থা ও কার্য্যই এই শাস্ত্রের ভিত্তি। এই জগতের সমস্ত লোকই যদি এইরূপ আত্মজ্ঞানী ও কর্ম্মযোগী হয় তাহা হইলে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের দরকারই হয় না। নারায়ণীয় ধর্ম্মে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে—

একান্তিনো হি পুরুষা দুর্লভা বহবো নৃপ।
যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন ॥
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্ব্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥

"একান্তিক অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ আচরণকারী ব্যক্তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানী অহিংসক, সর্ব্বভূতহিতে রত ও একান্তধর্ম্মের জ্ঞানীপুরুষের দ্বারা যদি এই জগৎ ভরিয়া যায় তাহা হইলে আশীঃকর্ম্ম অর্থাৎ কাম্য

অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত সমস্ত কর্ম্ম এই জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার সত্যযুগের আবির্ভাব হয়!" (শাং. ৩৪৮. ৬২. ৬৩)। কারণ এই অবস্থায় সকল ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে না শুধু নহে; প্রত্যেক মনুষ্য, সকলের কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই মনে করিয়া তদনুসারেই শুদ্ধান্তঃকরণে ও নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিবে। পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইরূপই অবস্থা ছিল এবং পুনর্ব্বার তাহা কোন-না-কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের মত, (মভা. শাং. ৫৯. ১৪); কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রথম কথা স্বীকার করেন না—আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়া তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অবস্থা ছিল না; কিন্তু পরে মানবজাতির উন্নতি হইলে, কোন এক সময়ে এই অবস্থা আসিতে পারে। সে যাহাই হউক; এক্ষণে এস্থলে ইতিহাসের বিচার করা উচিত নহে। কিন্তু ইহা বলিতে কোন বাধা নাই যে, সমাজের এই অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থা কিংবা পূর্ণাবস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞানী রহিবেন এবং তাঁহার আচরণই শুদ্ধ, পুণ্যজনক, ধর্ম্ম্য, পরম কর্ত্তব্য বলিয়া মানিতে হইবে। এই মত উভয়েরই গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ স্পেন্সর এই মতই স্বীয় নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা এই সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন!* উদাহরণ যথা,—গ্রীক্‌তত্ত্ববেত্তা প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট যে কর্ম্ম প্রশস্ত বলিয়া মনে হইবে তাহাই শুভজনক ও ন্যায্য; সাধারণ মনুষ্য এই ধর্ম্ম অবগত নহে, এই কারণেই উহাদের তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই নির্ণয়কে প্রমাণ বলিয়া মানা উচিত। আরিস্টটল্ নামক আর এক গ্রীক তত্ত্বজ্ঞ স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে (৩. ৪) বলেন যে, জ্ঞানীপুরুষদিগের সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্ভুল হইয়া থাকে, কারণ প্রকৃত সত্য তাঁহারা জানেন; এবং জ্ঞানীপুরুষেরা এই সিদ্ধান্ত কিংবা আচরণই অন্য লোকের প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকে। এপিকুরস নামক আর এক গ্রীক তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রকার প্রামাণিক পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি "শান্ত, সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং পরমেশ্বরেরই ন্যায় সদা আনন্দময়; তাঁহা হইতে লোকের কিংবা লোকের নিকট হইতে তাঁহার একটুও কষ্ট হয় না"।** ভগবদ্‌গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত কিংবা পরম ভক্ত বা ব্রহ্মভূত পুরুষের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার কতটা সাম্য আছে তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" (গী. ১২. ১৫)—যাঁহা হইতে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয় না কিংবা লোকের দ্বারা যিনি বিরক্তি বোধ করেন না, যিনি হর্ষ ও খেদ, ভয় ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সদা আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট (আত্মন্যেবাত্মনা

* Spencer's Data of Ethics Chap, XV. pp. 275-278 স্পেন্সার ইহার নাম দিয়াছেন—Absolute Ethics,

** Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous, noncompetitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," who "neither suffered vexation in themselves, nor caused, vexation to others," Spencer's Data of Ethics p. 278; Bain's Mental and Moral Science Ed. 1875 p. 530. ইহাকেই Ideal Wise Man বলা হইয়াছে।

তুষ্টঃ গী. ২. ৫৫), ত্রিগুণের দ্বারা যাঁহার নিকটে অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় না (গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ১৪.২৩), স্তুতি ও নিন্দা কিংবা মানাপমান যাঁহার নিকটে সমান এবং সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া (১৮. ৫৪), সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্ত ছাড়িয়া ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি করেন কিংবা যাঁহার নিকট লোষ্ট প্রস্তর কাঞ্চন সবই সমান (১৪. ২৪),—ইত্যাদি প্রকারে ভগবদ্‌গীতাতেও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ তিন চারি বার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। এই অবস্থাকেই সিদ্ধাবস্থা কিংবা ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। এবং যোগবাসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণেতা এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলেন। এই অবস্থা লাভ করা অত্যন্ত দুর্ঘট হওয়া প্রযুক্ত জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্ট বলিয়াছেন যে, গ্রীক পণ্ডিতেরা এই অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন এক বাস্তবিক ব্যক্তির বর্ণনা নহে, শুদ্ধ নীতির তত্ত্ব লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সমস্ত নীতির মূল যে 'শুদ্ধ বাসনা' তাহাকেই মানবমূর্ত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার জ্ঞানী ও নীতিমান পুরুষের এই চিত্র স্বকীয় কল্পনার দ্বারা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা, কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণ সত্য; মনোনিগ্রহের দ্বারা ও প্রযত্নের দ্বারা ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবও আমাদের দেশবাসীর হইয়াছে। তথাপি এই বিষয়টা সাধারণ নহে; হাজারের মধ্যে এক আধ জন ইহার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে এবং এই হাজার প্রযত্নকারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু জন্মান্তরে এই পরম অবস্থা শেষে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ গীতাতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ৩)।

স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা কিংবা জীবন্মুক্তাবস্থা যতই দুর্ব্বল হউক কেন, তথাপি যে ব্যক্তি এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে কার্য্যাকার্য্য কিংবা নীতিশাস্ত্রের নিয়ম শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। উপরে ইহার যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই এই বিষয় স্বতই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, পরমাবস্থার শুদ্ধ, সম ও পবিত্র বুদ্ধিই নীতির সর্ব্বস্ব হওয়ায়, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে নীতিনিয়ম দেখানো স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের নিকট অন্ধকারের কল্পনা করিয়া, সূর্য্যকে মশালের আলো দেখাইবার ন্যায় অসঙ্গত হয়। এক-আধ জনের এই পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু যে কোন প্রণালীতে যখন একবার নিশ্চয় হয় যে কোন ব্যক্তি এই পূর্ণ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তখন তাহার পাপপুণ্য সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কতকগুলি পাশ্চাত্য রাজধর্ম্মশাস্ত্রীর মত অনুসারে রাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে কিংবা ব্যক্তিসমূহে অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বদ্ধ থাকিলেও রাজা সেই সকল নিয়মে বদ্ধ হন না, ঠিক এইরূপ নীতি-রাজ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অধিকার থাকে। তাঁহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিনি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন না; সেইজন্য পাপ কিংবা পুণ্য, নীতি কিংবা অনীতি, এই সকল শব্দ, অত্যন্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধ বাসনাবিশিষ্ট এই পুরুষদিগের আচরণ সম্বন্ধে কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; পাপ ও পুণ্য এই দুয়ের অতীত স্থানে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

"যে ব্যক্তি ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, বিধিনিষেধরূপ নিয়ম তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না," আবার, "উত্তম হীরাকে যেরূপ ঘষিতে হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি নির্ব্বাণপদের অধিকারী হইয়াছে তাহার কর্ম্মে বিধিনিয়মের আটক স্থাপন করিতে হয় না" এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থকারেরাও লিখিয়াছেন (মিলিন্দ প্রশ্ন. ৪. ৫. ৭)। কৌষীতক্যুপনিষদে আত্মজ্ঞানী পুরুষকে "মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি পাপও স্পর্শ করে না" এইরূপ যাহা প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র বলিয়াছেন (কৌষী. ৩. ১), কিংবা যাঁহার অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই গিয়াছে, তিনি লোকদিগকে হত্যা করিলেও পাপপুণ্যে অলিপ্তই থাকেন (গী. ১৮. ১৭), এইরূপ গীতায় যে বর্ণনা আছে,—এই সকলের তাৎপর্য্যও ইহাই। (পঞ্চদশী ১৪. ১৬ ও ১৭ দেখুন)। 'ধম্মপদ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই তত্ত্বেরই অনুরূপ বাক্য দেওয়া হইয়াছে (ধম্মপদ, শ্লোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখুন)।* বাইবেলের নববিধানে "আমার নিকট সমস্তই (সমানই). ধর্ম্ম্য" এইরূপ যাহা খৃষ্টের শিষ্য পল বলিয়াছেন (১ করিং. ৬. ১২, রোম ৮. ২) এই বাক্যের অভিপ্রায় কিংবা জনের "যিনি ভগবানের পুত্র (পূর্ণ ভক্ত) হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দ্বারা পাপ কখনই ঘটিতে পারে না" এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার মতে এইরূপই (জন্‌ ১. ৩. ৯)। শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল বাহ্যকর্ম্মের দ্বারাই নীতিমত্তা নির্ণয় করিতে যাঁহারা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভূত বলিয়া মনে হইবে; এবং 'বিধিনিয়মের অতীত মনে করিয়া ভালমন্দকারী' এইরূপ নিজেরই মনের মতন কুতর্ক-পূর্ণ অর্থ করিয়া, কেহ কেহ "স্থিতপ্রজ্ঞের সমস্ত মন্দ কর্ম্ম করিবারও অধিকার আছে" এইরূপ উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অর্থবিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধ স্তম্ভ দেখিতে না পাইলে যেরূপ স্তম্ভের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে অন্ধীভূত এই আপত্তিকারী উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক না বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য সিদ্ধান্ত দোষী হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির শুদ্ধবুদ্ধির পরীক্ষা প্রথমতঃ তাহার বাহ্য আচরণ দ্বারাই করিতে হয়, এই কথা গীতারও মান্য; এবং কষ্টিপ্রস্তরে যিনি সর্ব্বথা সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিত লোকের প্রতি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যাত্মবাদীও ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পূর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও নিঃসীম নিষ্কাম হওয়া সম্বন্ধে যেস্থলে তিল-

* কৌষীতক্যুপনিষদের বাক্য এই—"যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেনচিৎ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া।" ধর্ম্মপদের শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।।
মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে।
বেয্যগ্ঘপঞ্চমং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।।

ধম্মপদের এই কল্পনা কৌষীতক্যুপনিষৎ হইতে গৃহীত, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ মাতৃবধ, কিংবা পিতৃবধ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'মাতা'র তৃষ্ণা ও 'পিতা'র অভিমান অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্লোকের নীতিতত্ত্ব বৌদ্ধগ্রন্থকার দিগের ঠিক জানা না থাকায়, তাঁহার এইরূপ ঔপচারিক অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৌষীতক্যুপনিষদে "মাতৃবধেন পিতৃবধেন" ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে, "বৃত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও আমার তাহাতে পাপ হয় না" ইন্দ্র এইরূপ বলিয়াছেন; ইহা হইতে প্রত্যক্ষ বধই এইস্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ধম্মপদের ইংরাজী ভাষান্তরে (S, B. E. Vol. X, PP. 70, 71) ম্যাক্সমূলর সাহেব এই শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহাও আমার মতে ভ্রান্তিমূলক।

মাত্রও সন্দেহ থাকে না, সেস্থলে এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত সৎপুরুষের কথা আলাদা হইয়া পড়ে। তাঁহার কোন কার্য্য লৌকিকদৃষ্টিতে বিপরীত দেখিতে হইলেও তত্ত্বতঃ ইহাই বলিতে হয় যে, তাঁহার বুদ্ধির পূর্ণতা শুদ্ধতা ও সমতা প্রথম হইতেই স্থির থাকায় সেই কার্য্যের বীজ নির্দ্দোষই হইবে কিংবা তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতেও কোন যোগ্য কারণ প্রযুক্তই ঘটিয়াছে, কিংবা সাধারণ লোকদিগের কার্য্যের ন্যায় তাহা লোভমূলক কিংবা অনীতিমূলক হইতে পারে না। বাইবেলে লিখিত আছে যে, আব্রাহাম নিজের পুত্রকে বলি দিতে চাহিলেও পুত্রহত্যাচেষ্টার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই; কিংবা বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর মরিলেও মনুষ্যহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই; অথবা মাতৃবধ করিলেও পরশুরামের মাতৃহত্যা ঘটে নাই উপরোক্ত তত্ত্বই ইহার কারণ। "তোমার বুদ্ধি যদি পবিত্র ও নির্ম্মল হয় তবে ফলাশা না রাখিয়া কেবল ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেও, পিতামহ-হত্যা কিংবা গুরুহত্যার পাপ তোমার হইবে না; কারণ এইসময়ে, ঈশ্বরীয় সংকেত সিদ্ধ করিবার পক্ষে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়াছ" (গী. ১১. ৩৩) ইত্যাদি গীতায় যে উপদেশ অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহারও তত্ত্ব ইহাই। ব্যবহারেও আমরা ইহা দেখি যে কোন লক্ষপতি কোন ভিখারীর নিকট হইতে দুই পয়সা কাড়িয়া লইলে লক্ষপতিকে চোর না বলিয়া, ভিখারীই কোন অপরাধ করাতেই লক্ষপতি তাহাকে শাসন করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করা হয়। এই নীতিই আরও নিশ্চিত-রূপে ও সম্পূর্ণরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্হৎ ও ভগবদ্ভক্তদিগের আচরণসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ লক্ষপতির বুদ্ধিও কোন সময়ে বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু ইহা জানা কথা যে, স্থিতপ্রজ্ঞের বুদ্ধিকে এই বিকার কখনই স্পর্শও করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও যেরূপ পাপপুণ্য হইতে অলিপ্ত থাকেন, সেইরূপই এই ব্রহ্মভূত সাধুপুরুষের অবস্থা সর্ব্বদাই পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকে। অধিক কি, সময়ে সময়ে এইরূপ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে যে আচরণ করেন তাহা হইতেই পরে বিধিনিয়মের নির্বন্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং সেই জন্য বলিতেছি যে, এই সৎপুরুষেরা এই বিধিনিয়মের জনক (উৎপাদক)—তাঁহারা ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না। শুধু বৈদিক ধর্ম্মে নহে, বৌদ্ধ ও খৃষ্ট-ধর্ম্মেও এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীন গ্রীক্ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদিগেরও এই তত্ত্ব মান্য হইয়াছিল; এবং আধুনিককালে কাণ্ট্* স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে

* "A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good, Therfore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will; ought is here out of place, because the volition is already of itself necessarily in unison with the law." Kant's metaphysic of morals p. 31 (Abbot's trans, in Kant's Theory of Ethics. 6th Ed.) নিৎসে কোন আধ্যাত্মিক উপপত্তিই স্বীকার করেন নাই, তথাপি তিনি স্বকীয় গ্রন্থে উত্তম পুরুষের 'superman) যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে, উক্ত পুরুষ ভাল ও মন্দের অতীত এইরূপ তিনি বলিয়াছেন। তাঁর এক গ্রন্থের নামও Beyond good Gand Evil.

ইহাই উপপত্তি সহকারে, সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই প্রকার নীতিনিয়মসমূহের চির-নির্ম্মল মূল উৎস কিংবা নির্দ্দোষ নিয়ম সকল স্থির হইলে পর স্বতই সিদ্ধ হয় যে, নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, এই মহানুভব ও নিষ্কলঙ্ক সিদ্ধপুরুষদিগের চরিত্রই তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্গীতায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—"স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্" (গী. ২. ৫৪)—স্থিতপ্রজ্ঞের বলা, বসা ও চলা কিরূপ; অথবা "কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো, কিমাচারঃ" (গী. ১৪. ২১)—পুরুষ ত্রিগুণাতীত কিপ্রকারে হয়, তাহার আচার কি, এবং তাহাকে কিরূপে চেনা যায়। পোদ্দারের নিকট কেহ কোন সোনার গহনা পরখ করিবার জন্য লইয়া আসিলে, সে নিজের দোকানে রক্ষিত একশত ঢঙের সোনার গহনার সহিত তাহার তুলনা করিয়া যেরূপ তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ স্থির করে, সেইরূপ কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিবার পক্ষে স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণই কষ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কষ্টিপাথরের পরিচয় করাইয়া দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিতরকার অর্থ। অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ কিংবা "ত্রিগুণাতীতের অবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসমার্গীয় জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনা, কর্ম্মযোগীর বর্ণনা নহে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কারণ বলা হয় এই যে, সন্ন্যাসী পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই 'নিরাশ্রয়ঃ' (৪. ২০) এই বিশেষণ গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা করিবার সময় 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' (১২. ১৬) এবং 'অনিকেতঃ' (১২. ১৯) এইরূপ স্পষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু নিরাশ্রয় কিংবা অনিকেত পদের অর্থ গৃহে না থাকিয়া বনে বনে ভ্রমণকারী' অর্থ বিবক্ষিত নহে; কিন্তু ইহার অর্থ "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং" (৬. ১) ইহারই সমানার্থক ধরিতে হইবে, অর্থাৎ 'যাহারা কর্ম্ম ফলের আশ্রয় গ্রহণ করে না' অথবা "সেই ফলে যাঁহাদের মনের আস্থা নাই" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গীতার ভাষান্তরে এই শ্লোকসমূহের নীচে সে সব টিপ্পনী দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। তা ছাড়া স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাতেই উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিজের অধীনে রাখিয়া, বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেন" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন (গী. ২. ৬৪); এবং 'নিরাশ্রয়' পদ যে শ্লোকে আসিয়াছে সেইখানেই "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি অলিপ্ত থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অনিকেতাদি পদ সম্বন্ধে এই নিয়মই প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এই অধ্যায়ে প্রথমে কর্ম্মফলত্যাগের (কর্ম্মত্যাগের নহে) প্রশংসা করিবার পর (গী. ১২. ১২) ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহাই দেখাইবার জন্য পরে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণসকল কথিত হইয়াছে; এবং সেইরূপই অষ্টাদশ অধ্যায়েও আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করিলে কিরূপে শান্তি পাওয়া যায় তাহ দেখাইবার জন্য ব্রহ্মভূত পুরুষের বর্ণনা পুনরায় আসিয়াছে (গী. ১৮. ৫০।) তাই, এই সমস্ত বর্ণনা শুধু সন্ন্যাসমার্গীয় দিগের বর্ণনা

নহে, ইহা কর্ম্মযোগীদিগেরই বর্ণনা, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ, এই উভয়ের ব্রহ্মজ্ঞান, শান্তি, আত্মৌপম্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি, অথবা নীতিতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন নহে। উভয়েই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ায় উভয়েরই মানসিক অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার কিন্তু তন্মধ্যে একজন শুধু এক শান্তিতেই নিমগ্ন থাকিয়া আর কিছুরই চিন্তা করেন না, এবং আর একজন ব্যবহারক্ষেত্রে নিজের শান্তির ও আত্মৌপম্য বুদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ করিয়া থাকেন, কর্ম্মদৃষ্টিতে এই দুয়ের মহত্ত্বসম্বন্ধে এই পার্থক্য। তাই এই ন্যায় হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কাজে যাঁহার প্রত্যক্ষ আচরণকে প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞের কর্ম্ম ত্যাগী সাধু কিংবা ভিক্ষু এইস্থানে বিবক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা নাই এবং কর্ম্ম মানুষকে ছাড়েও না; ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কর্ম্মযোগীর ন্যায় ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে সাম্যবস্থায় রাখিবে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাত্মক বুদ্ধিও সর্ব্বদা শুদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকিবে, এবং কর্ম্ম-বন্ধনও ঘটিবে না,—গীতায় অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ইহাই তাহার সার। এই কারণেই এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোকে, 'শুধু বাক্য ও মনেরই দ্বারা নহে, সমস্ত প্রত্যক্ষ কর্ম্মের দ্বারা যে ব্যক্তি সুহৃৎ ও হিতকারী হইয়াছেন তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলিতে হইবে" এই ধর্ম্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। জাজলীকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব বলিবার সময় তুলারূপে বাক্য ও মনের সঙ্গেই, কিন্তু তৎপূর্ব্বেও উহাতে কর্ম্মেরও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের অথবা জীবন্মুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্ব্বভূতে যাঁহার সাম্য-বুদ্ধি হইয়াছে এবং যাঁহার সমস্ত স্বার্থ পরার্থে লয় পাইয়াছে, তাঁহাকে নীতিশাস্ত্র সবিস্তর শুনাইবার আবশ্যকতা নাই, তিনি তো স্বতই স্বপ্রকাশ কিংবা 'বুদ্ধ' হইয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনের এই প্রকার অধিকার থাকা প্রযুক্ত "তুমি নিজের বুদ্ধিকে সম ও স্থির কর" এবং "কর্ম্মত্যাগ করিব এইরূপ ব্যর্থ ভ্রমে পতিত না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি ধরিয়া, স্বধর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত সংসারকর্ম্ম করিতে থাক" ইহা ব্যতীত তাঁহাকে অধিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। তথাপি এই সাম্যবুদ্ধি-রূপ যোগ সকলে একই জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া সাধারণ লোকের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণসম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু এই বিচার-আলোচনা করিবার সময় ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইতেছি, তিনি সত্যযুগের পূর্ণাবস্থায় উপনীত সমাজের অধিবাসী নহেন; কিন্তু যে সমাজে বহুসংখ্যক লোক স্বার্থের মধ্যেই ডুবিয়া আছে, সেই কলিযুগের সমাজেই তাঁহার কাজ করিতে হইবে। কারণ, মনুষ্যের জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বুদ্ধি যতই সাম্যাবস্থায় পৌঁছাক না কেন, তাঁহাকে কামক্রোধাদির চক্রে আবদ্ধ অশুদ্ধবুদ্ধি লোকদিগের সহিত কারবার করিতে হয়। অতএব এই লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিবার সময় অহিংসা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা ইত্যাদি নিত্য ও পরমোৎকৃষ্ট সদ্‌গুণসমূহকেই

সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা স্বীকার করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা যায় না *। অর্থাৎ সেখানে সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ সেই সমাজের উন্নতিশীল নীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে যে সমাজে লোভীপুরুষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছু-না-কিছু ভিন্ন হইবেই; নচেৎ সাধুপুরুষকে এই জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র দুষ্টদিগেরই সাম্রাজ্য হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সাধুপুরুষকে আপন সমতা-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে; আবার সমতা-সমতাতেও ভেদ আছে। "ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি" ব্রাহ্মণ, গো ও হস্তীতে পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি সম হইয়া থাকে (গী. ৫. ১৮), গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া, গরুর জন্য আনীত তৃণ ব্রাহ্মণকে এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অন্ন গরুকে যদি কেহ দেয়, তবে তাহাকে কি আমরা পণ্ডিত বলি? সন্ন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গুরুত্ব না মানিলেও কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রের কথা সেরূপ নহে। দ্বিতীয় প্রকরণের বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের অবশ্য উপলব্ধি হইয়া থাকিবে যে, সত্যযুগের সমাজের পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, দেশকালানুসারে তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় তফাৎ করা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া, স্বার্থপরায়ণ লোকদিগের সমাজে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন; এবং কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ইহাই তো বিকট প্রশ্ন। স্বার্থ-পরায়ণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংবা তাহাদের লোভবুদ্ধি দেখিয়া আপন মনের সমতাকে বিচলিত হইতে না দিয়া, বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্থই কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া বৈরাগ্যের সহিত সাধুপুরুষেরা নিজের উদ্যোগকে বজায় রাখেন। এই তত্ত্বটি মনে রাখিয়া শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া, তাহার পর, স্থিতপ্রজ্ঞ কিংবা উত্তমপুরুষ সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া তুলিবার জন্য, বৈরাগ্য সহকারে অর্থাৎ নিঃস্পৃহতাকে লোকসংগ্রহার্থ যে কাজ বা উদ্যোগ করিয়া থাকেন তাহার বর্ণনা (দাস. ১১. ১০; ১২. ৮-১০; ১৫. ২) সুরু করিয়াছেন, এবং তাহার পর অষ্টাদশ দশকে বলিয়াছেন যে, সকলকেই জ্ঞানীপুরুষদিগের এই সকল গুণ—কথা, গল্প, সাধন, ফিকিরফন্দি, প্রসঙ্গ, প্রযত্ন, তর্ক, ধূর্ত্তামি, গূঢ় অভিসন্ধি, সহিষ্ণুতা, তীক্ষ্ণতা, ঔদার্য্য, অধ্যাত্মজ্ঞান, ভক্তি, অলিপ্ততা, বৈরাগ্য, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞাপালন, নিগ্রহ, সমতা, এবং বিবেক ইত্যাদি—শিক্ষা করিতে হইবে (দাস. ১৮. ২)। কিন্তু এই নিঃস্পৃহ সাধুকে লোভী মনুষ্যদিগের মধ্যেই চলিতে হইবে বলিয়া শেষে শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর এই উপদেশ—

* "In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin" Spencer's Data of Ethics; Chap. XV. p, 280. স্পেনসার সাহেব ইহার নাম দিয়াছেন Relative Ethics; এবং তিনি বলেন যে, "On the evolutionhypothesis, the two (Absolute aud Relative Ethics) presuppose one another; and only when they co-exist, can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right or degrees of wrong."

ঘটাসী আণাবা ঘট। উদ্ধটাসী গাহিজে উদ্ধট।
খটনটাসী খটনাট। অগত্য করী।

অর্থাৎ—"ঘটের সহিত ঘট আনিবে ; উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ লোকের সহিত ভাল মন্দ ব্যবহার অগত্যা করিতে হইবে" (দাস. ১৯. ৯. ৩০)। তাৎপর্য্য পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহার উপনীত হইলে, অত্যুচ্চ পৈঠার ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে অল্প-বিস্তর তারতম্য করা আবশ্যক হয় ইহা নির্ব্বিবাদ।

আধিভৌতিকবাদীদিগের এই সম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে যে, পূর্ণাবস্থার সমাজ হইতে নীচে নামিলে পর, অনেক বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া, যদি পরাকাষ্ঠা নীতি-ধর্ম্মের মধ্যে অল্প-বিস্তর ফেরফার করিতেই হয় তবে নীতিধর্ম্মের নিত্যতা কোথায় রহিল, এবং "ধর্ম্মো নিত্যঃ" বলিয়া ব্যাস, ভারতসাবিত্রীর মাধ্যমে যে তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহার দশা কি হইবে? তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সিদ্ধ নিত্যত্ব কাল্পনিক মাত্র ; প্রত্যেক সমাজের অবস্থা অনুসারে সেই সেই কালে "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্ব হইতে যে নীতিধর্ম্ম পাওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট নীতিনিয়ম। কিন্তু এই যুক্তিক্রম ঠিক নহে। ভূমিতিশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিস্তৃতিহীন সরল রেখা, কিংবা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ বর্ত্তুল পরিধি কেহ বাহির করিতে না পারিলেও, সরল রেখার কিংবা শুদ্ধ বর্ত্তুলের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রান্তিমূলক কিংবা নিরর্থক হয় না, সেইরূপ সরল ও শুদ্ধ নীতিনিয়মের কথা। কোন বিষয়ের পরাকাষ্ঠাশুদ্ধ-স্বরূপটি কি, প্রথমে তাহা নির্দ্ধারণ না করা পর্য্যন্ত ব্যবহার-ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়ের যে সকল বহুল রূপ নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, কিংবা সারাসার বিচারান্তে তদন্তর্ভূত তারতম্যও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না ; এবং এই জন্যই, বাহান্নকোশী সোনা কোনটি, পোদ্দার প্রথমেই তাহার নির্ণয় করিয়া থাকে। দিগ্‌দর্শন ধ্রুবমৎস যন্ত্র কিংবা ধ্রুব-তারার প্রতি উপেক্ষা করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়ু এই দুয়েরই তারতম্য দেখিয়া জাহাজের খালাসী সব সময়ে জাহাজের হাল ধরিয়া থাকিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ নীতিনিয়মের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া কেবল দেশকালানু-সারে যে ব্যক্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয়। তাই নিছক্ আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ধ্রুবতারার ন্যায় অটল ও নিত্য নীতিতত্ত্বটি কি, তাহা প্রথমে স্থির করিতেই হয়, এবং একবার এই আবশ্যকতা স্বীকার করিলেই সমগ্র আধিভৌতিক পক্ষ খোঁড়া হইয়া পড়ে। কারণ, সুখদুঃখাদি সমস্ত বিষয়োপভোগই নামরূপাত্মক সুতরাং অনিত্য ও বিনশ্বর মায়া-গণ্ডীরই মধ্যে পড়ে ; তাই কেবল এই সকল বাহ্য প্রমাণের আধারে সিদ্ধ কোন নীতিনিয়মই নিত্য হইতে পারে না। আধিভৌতিক বাহ্য সুখদুঃখের কল্পনা যেমন যেমন বদলাইবে, সেই অনুসারেই তাহার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিধর্ম্মেরও বদল হইবে। তাই, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নীতিধর্ম্মের এই অবস্থা এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, নীতিধর্ম্মের ইমারত "সর্ব্বভূতে এক আত্মা" এই অধ্যাত্মজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই খাড়া করিতে হয়। কারণ, আত্মা ব্যতীত জগতে কোন বস্তুই নিত্য নহে ইহা পূর্ব্বেই নবম প্রকরণে বলিয়াছি। "ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে"—নীতি কিংবা সদাচরণের ধর্ম্ম নিত্য এবং সুখদুঃখ

অনিত্য, এই ব্যাসবচনের ইহাই তাৎপর্য্য। দুষ্ট ও লোভী লোকদিগের সমাজে অহিংসা ও সত্য প্রভৃতি নিত্য নীতিধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, ইহা সত্য ; কিন্তু তাহার দোষ এই নিত্য নীতি-ধর্ম্মের উপর আরোপ করা উচিত নহে। সূর্য্যের কিরণের দ্বারা কোন পদার্থের ছায়া সমতল প্রদেশের উপর সমতল এবং উঁচুনীচু স্থানের উপর উঁচুনীচুভাবে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়া ঐ ছায়া আসলেই উঁচুনীচু এই অনুমান যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ দুষ্টলোকদিগের সমাজে নীতিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা-শুদ্ধ-স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া ইহা বলিতে পারা যায় না যে, অপূর্ণাবস্থা সমাজে পরিলক্ষিত নীতিধর্ম্মের অপূর্ণস্বরূপই মুখ্য কিংবা মূলগত। এই দোষ সমাজের, নীতির নহে। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তি শুদ্ধ ও নিত্য নীতিধর্ম্মের সহিত ঝগড়া করিতে না বসিয়া, সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উচ্চ পৈঠায় উঠিয়া শেষে পূর্ণাবস্থায় পেঁছিতে পারে সেইরূপ প্রযত্ন করিয়া থাকেন। লোভী মনুষ্যদিগের সমাজে এইরূপ ভাবে চলিবার কালেই নিত্য নীতিধর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম স্থল অপরিহার্য্য বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা মানিলেও তাহার জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্র এই ব্যতিক্রম নির্দ্ধারণ করিবার সময়, তদুপযোগী বাহ্য ফলের তারতম্যতত্ত্বকেই ভ্রমক্রমে নীতির মূলতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ভেদ পূর্ব্ব প্রকরণে আমি কেন দেখাইয়াছি তাহারও মর্ম্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষের বুদ্ধি ও আচরণই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি ; এবং তাহা হইতে নিঃসৃত নীতির নিয়ম—নিত্য হইলেও—সমাজের অপূর্ণাবস্থায় অল্পবিস্তর বদল করিতে হয় ; এবং এইরূপে বদলাইলেও তাহার দ্বারা নীতিনিয়মের নিত্যত্বের কোনই বাধা হয় না, ইহা বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষ অপূর্ণাবস্থা সমাজে যে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংবা মূলতত্ত্ব কি, এই প্রথম প্রশ্নের বিচার করিব। এই বিচার দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি ; এক—কর্ত্তার বুদ্ধিকে প্রধান মনে করিয়া, এবং দ্বিতীয়—তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান ধরিয়া। তন্মধ্যে, কেবল দ্বিতীয়োক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে যে ব্যবহার করেন তাহা প্রায় সমস্ত লোকের হিতকরই হইয়া থাকে। পরমজ্ঞানী সৎপুরুষ "সর্ব্বভূতহিতে রতঃ" অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের কল্যাণে নিরত, এইরূপ গীতায় দুইবার উক্ত হইয়াছে (গী. ৫. ২৫ ; ১২. ৪) ; এবং এই অর্থই মহাভারতেও আরো অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ অহিংসাদি যে নিয়মসমূহ পালন করিয়া থাকেন তাহাই ধর্ম্ম কিংবা সদাচারের আদর্শ তাহা আমি উপরে বলিয়াছি। এই অহিংসাদি নিয়মের প্রয়োজন অথবা এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলিবার সময় 'অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরম্" (বন ২০৬. ৭৩)—অহিংসা ও সত্যভাষণ এই নীতিধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিতার্থ হইয়াছে, "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ" (শা. ১০৯. ১২)—জগৎকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম ; ধর্ম্মং হি শ্রেয় ইত্যাহুঃ" (অনু. ১০৫. ১৪)—কল্যাণই ধর্ম্ম ; "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্" (শাং. ১০৯. ১০)—লোকদিগের অভ্যুদয়ের জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্র বাহির হইয়াছে ; কিংবা "লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ ; উভয়ত্র সুখোদর্কঃ" (শাং ২৫৮. ৪)—লোকব্যবহার চালাইয়া উভয়-

লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম করা হইয়াছে ;—এইরূপ ধর্ম্মের বাহ্য উপযোগ-প্রদর্শক অনেক বচন মহাভারতে আছে। সেইরূপ আবার, ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়স্থলে জ্ঞানী পুরুষও—

লোকযাত্রা চ দ্রষ্টব্যা ধর্ম্মশ্চাত্মহিতানি চ।

"লোকব্যবহার, নীতিধর্ম্ম ও নিজের কল্যাণ—এই বাহ্য বিষয়ের তারতম্যের দ্বারা বিচার করিয়া" (অনু. ৩৭. ১৬ ; বন ২০৬ ৯০) তাহার পর কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং বনপর্ব্বে শিবিরাজা ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ার্থ এই যুক্তিরই উপযোগ করিয়াছেন (বন. ১৩১. ১১ ও ১২ দেখ)। এই বচন হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমাজের উৎকর্ষই স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণের 'বাহ্যনীতি' ; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'অধিক লোকের অধিক সুখ' কিংবা (সুখশব্দকে ব্যাপক করিয়া) 'হিত' বা 'কল্যাণ' এইরূপ আধিভৌতিকবাদীদিগের যে নীতিতত্ত্ব তাহা অধ্যাত্মবাদীও কেন স্বীকার করেন না, এইরূপ প্রশ্ন পরে সহজই হয়। চতুর্থ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, 'অধিক লোকের অধিক সুখ' সূত্রে বুদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সুখের কিংবা উন্নতির এবং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না—এই উহার এক বড় দোষ। কিন্তু 'সুখ' শব্দের অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া এই দোষ অনেকাংশে দূর করা যায় ; এবং নীতিধর্ম্মের নিত্যত্বসম্বন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মিক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারও গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। তাই নীতিশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে গুরুত্বের ভেদটি কি, এইখানে তাহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

কোন কর্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, আহার বিচার দুই প্রকারে করা যাইতে পারে :—(১) সেই কর্ম্মের নিছক্ বাহ্য ফল অর্থাৎ জগতের উপর তাহার দৃশ্য পরিণাম কি ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিবে তাহা দেখিয়া, (২) উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা কিরূপ তাহা দেখিয়া। প্রথমটিকে আধিভৌতিক মার্গ বলে। দ্বিতীয়টিতে আবার দুই পক্ষের উদ্ভব হয়, এবং এই দুই পক্ষের দুই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে উক্ত হইয়াছে যে, শুদ্ধ কর্ম্ম করিতে হইলে বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা চাই এবং বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিতে গেলে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করিবার বুদ্ধিও স্থির, সম ও শুদ্ধ হওয়া চাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাহারও কর্ম্ম শুদ্ধ কিনা দেখিবার জন্য তাহার বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কি না তাহা দেখা আবশ্যক, এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কি না দেখিতে হইলে শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কি না তাহা দেখাও আবশ্যক। সারকথা, কর্ত্তার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা শুদ্ধ আছে কি না ইহার নিষ্পত্তি শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় (গী. ২. ৪১)। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে সদসদ্বিবেচনশক্তিরূপে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মানিলে তাহাই আধিদৈবিক মার্গ হইয়া যায়। কিন্তু এই বুদ্ধি স্বতন্ত্র দৈবত নহে, আমাদের আত্মার এক অন্তরিন্দ্রিয়মাত্র ; সেই জন্য বুদ্ধিকে প্রধান মনে না করিয়া আত্মাকে প্রধান মানিয়া বাসনার শুদ্ধতার বিচার করিলে তাহাই নীতি-নির্ণয়ের আধ্যাত্মিক মার্গ হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, এই

সমস্ত মার্গের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গ শ্রেষ্ঠ ; এবং প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্ট ব্রহ্মাত্মৈক্যের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে না বলিলেও তিনি স্বীয় নীতিশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা, শুদ্ধ বুদ্ধি হইতে অর্থাৎ এক প্রকার অধ্যাত্মদৃষ্টি হইতেই সুরু করিয়াছেন, এবং এইরূপ কেন করিতে হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ উপপত্তিও তিনি দিয়াছেন।* গ্রীনের অভিপ্রায়ও এইরূপই। কিন্তু এই বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে করা সম্ভব নয়। নীতিমত্তার সম্যক্ নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধির প্রতি কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি ; এবং এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে, ১৫শ প্রকরণে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নীতিমার্গের তুলনা করিবার সময় করা যাইবে। আপাততঃ এইটুকু বলিতেছি যে, যে-কোন কর্ম্ম করিবার সময় সেই কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে আবশ্যক হয় বলিয়া কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্ব্বাংশে বুদ্ধির শুদ্ধাশুদ্ধতার বিচারেরই উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি খারাপ হইলে কর্ম্মও খারাপ হইবে ; কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কর্ম্ম খারাপ হইলে তাহা হইতেই বুদ্ধিও খারাপ হইবেই হইবে এইরূপ অনুমান করা যায় না। কারণ ভ্রমক্রমে ভুল বুঝিবার দরুণ কিংবা অজ্ঞানবশতও ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে এবং তখন সেই কর্ম্মকে নীতিদৃষ্টিতে খারাপ বলিতে পারা যায় না। 'অধিক লোকের অধিক সুখ' এই নীতিতত্ত্ব কেবল বাহ্য পরিমাণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে ; এবং এই সুখদুঃখাত্মক বাহ্য পরিণাম নিশ্চিতরূপে গণনা করিবার বাহ্য সাধন যখন অদ্যাপি বাহির হয় নাই, তখন নীতিমত্তার এই কষ্টিপাথরের দ্বারা সর্ব্বদাই যথার্থ নির্ণয় হইবার ভরসাও করা যায় না। সেইরূপ মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহার বুদ্ধি যদি শুদ্ধ না হয় তবে সে প্রত্যেক অবসরে ধর্ম্মাচরণই করিবে তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ তাহার যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে ত কথাই নাই—স্বার্থে সর্ব্বে বিমুহ্যন্তি যেঽপি ধর্ম্মবিদো জনাঃ (মভা. বি. ৫১. ৪)। সারকথা, মানুষ যতই জ্ঞানী, ধর্ম্মবেত্তা বা বুদ্ধিমান হউক না, তাহার বুদ্ধি যদি সর্ব্বভূতে সম না হইয়া থাকে তবে তাহার কর্ম্ম সর্ব্বদাই শুদ্ধ কিংবা নীতিদৃষ্টিতে নির্দোষ হইবে এরূপ কোন কথা নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীতির বিচার করিবার সময়, কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়া বিচার করিতে হইবে ; সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের প্রকৃত বীজ। এবং ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥

তাহারও মর্ম্ম এই। কেহ কেহ এই শ্লোকে (গী. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান বুঝিয়া বলেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ নির্ভুল নহে। এই স্থলের শাঙ্করভাষ্যেও

* See Kant's Theory of Ethics, trans, by Abbot. 6th Ed, especially Metaphysics of Morals therein.

বুদ্ধিযোগের অর্থ 'সমত্ববুদ্ধিযোগ' করা হইয়াছে ; এবং এই শ্লোক কর্ম্মযোগের প্রকরণে আসিয়াছে। তাই বস্তুতঃ উহার অর্থ কর্ম্মমূলকই করিতে হয় ; এক সোজাসুজি ঐ অর্থই খাটে। কর্ম্ম করিবার লোক দুই প্রকারের হইয়া থাকে ; এবং ফলের দিকে—উদাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকের কত সুখ হইবে, সেই দিকে—নজর দিয়া যে কাজ করে ; এবং দ্বিতীয়, বুদ্ধিকে সম ও নিষ্কাম রাখিয়া যে কাজ করে, পরে কর্ম্মধর্ম্মসংযোগে যে পরিণামই হইবার তাহা সংঘটিত হউক। তন্মধ্যে 'ফলহেতবঃ' অর্থাৎ "ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিবার" লোককে নৈতিক দৃষ্টিতে কৃপণ অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্থির করিয়া সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার লোকদিগকে এই শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই শ্লোকে প্রথম দুই চরণে এই যাহা বলা হইয়াছে যে, 'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'—হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবলমাত্র কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট—তাহার তাৎপর্য্য ইহাই ; এবং অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভীষ্মদ্রোণদিগকে আমি কেমন করিয়া বধ করিব ?' তাহারও ইহাই উত্তর। ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংবা মারা—শুধু এই ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য না করিয়া "মনুষ্য কোন্ বুদ্ধিতে ঐ কাজ করে' তাহার প্রতিই দৃষ্টি করা আবশ্যক ; সেই জন্য এই শ্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, "তুমি বুদ্ধির অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও" এবং পরে উপসংহারাত্মক অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান্ পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া তুমি আপন কর্ম্ম কর"। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক শ্লোকেও ব্যক্ত হয় যে, গীতা নিছক কর্ম্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়া সেই কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধিরই বিচারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মের ভালমন্দ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যদি শুধু কর্ম্মফলের দিকেই গীতার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ভগবান্ ইহাই বলিতেন যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয় সেই কর্ম্মই সাত্ত্বিক। কিন্তু তাহা না বলিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, "ফলাশা ছাড়িয়া নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম তাহাই সাত্ত্বিক কিংবা উত্তম" (গী. ১৮. ২৩)। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কর্ম্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্ত্তার নিষ্কাম, সম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিকেই কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করিবার সময় গীতা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন ; এই নীতিসূত্রই স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণসম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে সিদ্ধ হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ যে সাম্যবুদ্ধির দ্বারা নিজের সমান, ছোট ও সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সাম্যবুদ্ধিই তাঁহার আচরণের প্রকৃত বীজ ; এবং এই আচরণের দরুণ সর্ব্বভূতের যে হিত হয়, তাহা সেই সাম্যবুদ্ধির শুধু বাহ্য ও আনুষঙ্গিক পরিণাম। সেই রূপই যাঁহার বুদ্ধি, পূর্ণ সাম্যবস্থায় পৌঁছিয়াছে, সেই ব্যক্তি লোকের কেবল আধিভৌতিক সুখ লাভ করাইবার জন্যই নিজের সমস্ত কর্ম্ম করিবেন না। তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, সত্য ; কিন্তু ইহা তাঁহার মুখ্য ধ্যেয় বিষয় নহে। সমাজে অবস্থিত মানুষের বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়া নিজের মতোই শেষে সমস্ত লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থায় পৌঁছিতে পারে স্থিতপ্রজ্ঞ সেইরূপ

* এই শ্লোকের সরল অর্থ এইরূপ—'হে ধনঞ্জয়। (সম-) বুদ্ধির যোগাপেক্ষা (শুধু) কর্ম্ম খুবই নিকৃষ্ট। (তাই) (সম-) বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। ফলের দিকে নজর রাখিয়া যে কর্ম্ম করে সেই (পুরুষ) কৃপণ অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর'।

প্রযত্ন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র আধিভৌতিক সুখবুদ্ধির প্রযত্নকে আমি গৌণ কিংবা রাজসিক বলিয়া মনে করি।

গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মাকর্ম্মনির্ণয়ার্থ কর্ম্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার উপর কতকগুলি লোকের এইরূপ তর্কপূর্ণ মিথ্যা আপত্তি আছে যে, যদি কর্ম্মফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিরই এইরূপ বিচার করি তবে মানিতে হইবে যে, শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য কোন-না-কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন, এবং তখন তো তিনি সমস্ত দুষ্কর্ম্মই করিবার অধিকার পাইবেন ! এই আপত্তি আমি কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির করিয়াছি এইরূপ নহে ;—কোন কোন পাদ্রী বাহাদুর গীতাধর্ম্মের উপর এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহা আমার নজরে আসিয়াছে।* কিন্তু এই আরোপ কিংবা আপত্তি নিতান্তই মূর্খতাসূচক কিংবা দুরাগ্রহব্যঞ্জক এইরূপ বলিতে আমার কোন দ্বিধা হয় না। অধিক-কি, ইহা বলিতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচকুচে অসভ্য মনুষ্য সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্ত্বের ধারণা করিবার যেরূপ অযোগ্য ও অসমর্থ সেইরূপই এই পাদ্রী ভদ্রলোকদিগের বুদ্ধি, বৈদিক ধর্ম্মোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা শুধু ধারণা করিতেও স্বধর্ম্মের ব্যর্থ দুরাগ্রহবশতঃ কিংবা অন্য কোন খারাপ ও দুষ্ট মনোবিকারবশতঃ অসমর্থ হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট স্বকীয় নীতিশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনেক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীতিনির্ণয়ার্থ কর্ত্তারা বুদ্ধিরই বিচার করিতে হইবে। কিন্তু ক্যাণ্ট সম্বন্ধে কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া দেখি নাই। তবে উহা গীতার নীতিতত্ত্ব-সম্বন্ধেই কিরূপ উপযুক্ত হইবে ? বুদ্ধি সর্ব্বভূতে সম হইলেই পরোপকার করা দেহস্বভাবই হইয়া পড়ে ; এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আসা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ পরমজ্ঞানী ও পরমশুদ্ধবুদ্ধি পুরুষের দ্বারা কুকর্ম্ম ঘটা অসম্ভব হয়। কর্ম্মের বাহ্যফলে বিচার না করিতে যখন গীতা বলেন, তখন তাহার অর্থ ইহা নহে যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ; প্রত্যুত গীতা বলেন যে, যখন বাহ্যতঃ দম্ভ কিংবা লোভবশতঃ কেহ পরোপকার করিবার ভাণ করিতেও পারে, কিন্তু সর্ব্বভূতে এক

* কলিকাতায় এক 'মিশনরি ; এইরূপ বিধান করায়' মিঃ ব্রুক্স্ তাহার যে উত্তর দিয়াছেন—তাহা তাঁহার Kurukshetra (কুরুক্ষেত্র) নামক মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে জুড়িয়া দিয়াছেন—তাহা দেখুন (Kurukshetra Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52.)

† "The second proposition is : That an action done from duty derives its moral worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined."···The moral worth of an action "cannot lie anywhere but in the Principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action." Kant's Metaphysic of Morals (trans, by Abbott, in Kants Theory of Ethics, p. 16. The italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do not see. p. 24. Ibid.

আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বুদ্ধিতে যে স্থৈর্য্য ও সমতা আসে, তাহার ভাণ কেহ করিতে পারে না; তখন কোনও কার্য্যের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার করিবার সময়, কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্ম্মের মধ্যেই অবস্থিত নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তার বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। গীতাতেই পরে বলা হইয়াছে যে, এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কেহ যদি যাহা ইচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসী কিংবা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিতে হইবে (গী. ১৮. ২৫)। একবার বুদ্ধি সম হইলে পর সেই ব্যক্তিকে পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বেশী কিছু উপদেশ করিতে হয় না; এই তত্ত্বটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া তুকারাম বাবা শিবাজী মহারাজকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন—

কল্যাণকারক অর্থ যাচা এক।
সর্ব্বভূতী দেখ এক আত্মা॥

অর্থাৎ—ইহার একই কল্যাণকর অর্থ, সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দেখ (তু. গা. ৪৪২৮ ৯); ইহাতেও ভগবদ্‌গীতার ন্যায় কর্ম্মযোগের একই তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার বলা আবশ্যক যে, সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের বীজ হইলেও, ইহা হইতে ইহাও অনুমান করা উচিত নহে যে, পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকারীকে হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করাই পরম ধ্যেয়; কিন্তু গীতার আরম্ভেই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, এই পরম ধ্যেয়ের পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া যতটা পারা যায় ততটাই নিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ম্ম করিয়া যাইবে; তাহাতেই বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়া শেষে পূর্ণ সিদ্ধি না প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম করিব না এরূপ আগ্রহ ধরিয়া বৃথা কালহরণ করিবে না (গী. ২. ৪০)।

'সর্ব্বভূতহিত' কিংবা 'অধিক লোকের কল্যাণ' এই নীতিতত্ত্ব শুধু বাহ্য কর্ম্মের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া শাখাগ্রাহী ও সংকীর্ণ; 'সর্ব্বভূতে এক আত্মা' স্থিতপ্রজ্ঞের এই সাম্যবুদ্ধি মূলগ্রাহী হওয়ায় উহাকেই নীতিনির্ণয়ের কার্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। এই কথাটি এইরূপ সিদ্ধ হইলেও এই সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি আছে যে, উহার দ্বারা ব্যবহারিক আচরণের ঠিক উপপত্তি লাগে না। প্রায়ই সন্ন্যাসমার্গীর স্থিতপ্রজ্ঞের জাগতিক ব্যবহার দেখিয়াই আপত্তিকারীদিগের মনে এই আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু অল্প বিচারান্তে যে, কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীর ব্যবহারে এ আপত্তি খাটে না। অধিক কি, সর্ব্বভূতে এক আত্মা কিংবা আত্মৌপম্যবুদ্ধিরূপ তত্ত্বের দ্বারা ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের যেরূপ সম্যক্ উপপত্তি হয়, সেরূপ অন্য কোন তত্ত্বের দ্বারা হয় না বলিলেও চলে। উদাহরণ যথা—সমস্ত দেশ ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে, সেই পরোপকারধর্ম্মেরই কথা ধর না কেন। 'অন্যের যে আত্মা তাহাই আমার আত্মা' এই অধ্যাত্মতত্ত্বের দ্বারা পরোপকার ধর্ম্মের যেরূপ উপপত্তি হয় সেরূপ কোনও আধিভৌতিকবাদের দ্বারা হয় না। বড়জোর, আধিভৌতিক শাস্ত্র ইহাই বলিতে পারে যে, পরোপকার বুদ্ধি এক নৈসর্গিক গুণ এবং উহা উৎক্রান্তিবাদ অনুসারে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু

এইটুকু হইতে পরোপকারের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না শুধু নহে, অধিকন্তু স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই দুই ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে ইচ্ছুক চতুর স্বার্থী ব্যক্তিও আপন মতলব সম্মুখে ঠেলিয়া লইবার এই জন্য সুযোগ পায়। এই কথা আমি পূর্ব্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, পরোপকার-বুদ্ধির নিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়া লাভই বা কি হইবে? সর্ব্বভূতে একই আত্মা আছে মানিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সদাসর্ব্বদা সর্ব্বভূতেরই হিতসাধন প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহার নিজের কাজ কিরূপে চলিবে? এবং এইরূপে নিজেরই যোগক্ষেম না চালাইতে পারিলে সে অপর লোকের কল্যাণ কি প্রকারে করিবে? কিন্তু এই আশাঙ্কা অকাট্য কিংবা নূতনও নহে। ভগবান্ গীতাতেই এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গী. ৯. ২২); এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারাও ঐ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। লোক-কল্যাণ করিবার বুদ্ধি যাহার হইয়াছে সে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিবে এইরূপ নহে; কিন্তু আমি লোকের উপকারের জন্যই দেহ ধারণও করিতেছি, এইরূপ তাহার বুদ্ধি হওয়া চাই। জনক বলিয়াছেন যে, এইরূপ বুদ্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনার অধীন হয় এবং লোককল্যাণ সাধিত হয় (মভা-অশ্ব. ৩২); এবং মীমাংসক-দিগের এই সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বীজও এই যে, যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন যে গ্রহণ করে তাহাকে 'অমৃতাশী' বলিতে হইবে (গী. ৪. ৩১)। কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে জগতের ভরণপোষণের কর্ম্মই যজ্ঞ, অতএব লোককল্যাণকর কর্ম্ম করিবার সময় তাহা দ্বারাই নিজের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং করা উচিত, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, নিজের স্বার্থের জন্য যজ্ঞকের উদ্দেশ্য করা ভাল নহে। দাসবোধে শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীও বর্ণনা করিয়াছেন যে—

যো পরোপকার করিত চ গেলা।
পাহিজে তো জাল্যা ত্যালা।
জগ ক ব উণেঁত বান্ধা।
ভূমণ্ডলীঁ॥

অর্থাৎ—যে পরোপকারই করিয়া থাকে, তাহার প্রয়োজনের জন্য সকলেই প্রস্তুত পৃথিবীতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০)? ব্যবহারদৃষ্টিতে দেখিলেও নিজের অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, এই উপদেশ সমস্তই যথার্থ। সারকথা, জগতে দেখা যায় যে, লোককল্যাণার্থ যে চেষ্টা করে তাহার যোগক্ষেম কখনও আটকাইয়া থাকে না। কেবল পরার্থ করিতে হইলে তাহাকে নিষ্কামবুদ্ধিতে প্রস্তুত থাকা চাই। সমস্ত লোক আমার নিজের মধ্যে এবং আমি নিজে সমস্ত লোকের মধ্যে, এই ভাবনা একবার দৃঢ় হইলে পর, পরার্থ হইতে স্বার্থ ভিন্ন কিনা এই প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। 'আমি' ভিন্ন ও 'লোকেরা' ভিন্ন, এই আধিভৌতিক দ্বৈতবুদ্ধিতে 'অধিক লোকের অধিক সুখ' সম্পাদন করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনে উপরি-উক্ত মিথ্যা সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অদ্বৈতবুদ্ধিতে পরোপকার করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ

থাকে না। সর্ব্বভূতাত্মৈক্যবুদ্ধিতে নিষ্পন্ন সর্ব্বভূতহিতের এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এবং স্বার্থ ও পরার্থরূপী দ্বৈতের অর্থাৎ অধিক লোকের সুখের তারতম্য হইতে নিঃসৃত লোককল্যাণের আধিভৌতিক তত্ত্বের মধ্যে এইটুকুই ভেদ, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। লোককল্যাণের হেতুটি মনে পোষণ করিয়া সাধুপুরুষ লোককল্যাণ করেন না। আলো দেওয়া যেরূপ সূর্য্যের স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মনে সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের পূর্ণ উপলব্ধি হইলে, লোককল্যাণ করা এই সাধুপুরুষদিগের সহজ স্বভাব হইয়া যায়; এবং এইরূপ স্বভাব হইয়া গেলে, সূর্য্য যেরূপ অন্যকে আলো দিবার সময় আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, সেইরূপই সাধুপুরুষের পরার্থ উদ্যোগের দ্বারাই তাঁহার যোগক্ষেমও স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরোপকার করিবার এই দেহস্বভাব এবং অনাসক্ত-বুদ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই সংকট আসুক না কেন, তাহার প্রতি দ্রুক্ষেপ না করিয়া, কিংবা সংকট সহ্য করা ভাল অথবা যে লোককল্যাণের পরিবর্ত্তে এই সংকট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা ভাল ইহার বিচারমাত্র না করিয়া, ব্রহ্মাত্মৈক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধুপুরুষ নিজের কার্য্য সমানই করিতে থাকেন; এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য চিন্তা করেন না। কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ ভিন্ন মনে করিয়া দাঁড়িপাল্লার কাঁটা কোন্‌-দিকে ঝুঁকিতেছে তাহা দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে যাহারা শিখিয়াছে তাহাদের লোককল্যাণের ইচ্ছা এতটা তীব্র কখনই হইতে পারে না। তাই সর্ব্বভূতহিতের তত্ত্ব ভগবদ্‌গীতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপত্তি অধিক লোকের অধিক বাহ্য সুখের তারতম্যের দ্বারা লাগাইয়া লোকসংখ্যা অথবা তাহাদের সুখের ন্যূনাধিকতার বিচারকে আগন্তুক সুতরাং হীন স্থির করিয়া, শুদ্ধ ব্যবহারের বীজভূত সাম্যবুদ্ধির উপপত্তি অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানের আধারে বিবৃত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতহিতার্থে চেষ্টা করা কিংবা লোককল্যাণ বা পরোপকার করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপপত্তি কি, তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। এক্ষণে, সমাজে এক মনুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তৎসম্বন্ধে সাম্যবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রে যে মূল নিয়ম বিবৃত হইয়াছে তাহার বিচার করিব। "যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃহ. ২. ৪. ২৪)—তাহার সমস্ত আত্মময় হইয়াছে, সে ব্যক্তি সাম্যবুদ্ধির দ্বারাই সকলের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে, এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা. ৬) এবং কৈবল্য (কৈ. ১. ১০), উপনিষদে এবং মনুসংহিতাতেও (মনু. ১২. ৯১ ও ১২৫), প্রদত্ত হইয়াছে; এবং "সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং "সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইরূপ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই তত্ত্বেরই অক্ষরশঃ উল্লেখ আছে। সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের কিংবা সাম্যবুদ্ধির এই যে তত্ত্ব, আত্মৌপম্যদৃষ্টি তাহারই এক রূপান্তর। কারণ, উহা হইতে এই সহজ সিদ্ধান্তই বাহির হয় যে, সমস্ত ভূতে যখন আমি আছি ও আমাতে যখন সমস্ত আছে, তখন আমি আপনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করি সেইরূপই অন্যভূতের সহিত আমার ব্যবহার করিতে হইবে। তাই, এই "আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে অর্থাৎ সমানভাবে যে সকলের সহিত ব্যবহার করে" সে-ই উত্তম কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞ, এইরূপ বলিয়া তাহার পর ভগবান অর্জ্জুনকে সেই অনুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন

(গী. ৬. ৩০-৩২)। অর্জ্জুন অধিকারী হওয়ায় গীতায় এই তত্ত্বের বেশী খোলসা করা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি ও ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য রচিত মহাভারতে অনেক স্থানে এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়া (মভা. শাং. ২৩৮. ২১; ২৬১. ৩৩), ব্যাসদেব তাহার গভীর ও ব্যাপক অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। উদাহরণ যথা—উপনিষৎ ও গীতায় সংক্ষেপে কথিত আত্মৌপম্যের এই তত্ত্বই প্রথমে এইরূপ বুঝাইয়াছেন—

আত্মোপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি পুরুষঃ।
ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সুখমেধতে॥

"যে ব্যক্তি আপনার মতো পরকে মনে করে এবং যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় করিয়াছে সে পরলোকে সুখলাভ করে" (মভা. অনু. ১১৩.৬)। এক ব্যক্তি অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না করিয়া পরে বলিয়াছেন—

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্ম্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে॥

"আপনার যাহা প্রতিকূল অর্থাৎ দুঃখকারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ ব্যবহার অন্য লোকের সহিত করিবে না, ইহাই সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতির সার, বাকী সমস্ত ব্যবহার লোভমূলক" (মভা. অনু. ১১৩. ৮)। শেষে বৃহস্পতি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি॥
যথাপরঃ প্রক্রমতে পরেষু তথা পরে প্রক্রমন্তেঽপরস্মিন্‌।
তথৈব তেষূপমা জীবলোকে যথা ধর্ম্মো নিপুণেনোপদিষ্টঃ॥

"সুখ কিংবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ—এই সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কিরূপ অনুভব করে তাহা দেখিয়া অন্যের সম্বন্ধে অনুমান করিবে। একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, সেইরূপ অন্য লোক তাহার সহিত ব্যবহার করে; তাই, এই উপমা লইয়াই এই জগতে আত্মৌপম্যের দৃষ্টিতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম বলিতে হইবে" (অনু. ১১৩. ১. ১০)। "ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ-প্রতিকূলং যদাত্মনঃ" এই শ্লোক বিদুরনীতিতেও আছে (উদ্যো. ৩৬. ৭২); এবং পরে শান্তিপর্ব্বে (শাং. ১৬৭. ৯) পুনর্ব্বার বিদুর এই তত্ত্বই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্তু আত্মৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে দুঃখ দিও না, কারণ তোমার যাহা দুঃখজনক তাহাই অন্য লোকেরও দুঃখজনক হইয়া থাকে। এখন ইহার উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয়-স্থায়ী হইবে যে, ইহা হইতে এই নিশ্চয়াত্মক অনুমান কিরূপ বাহির হইতেছে যে, তোমার যাহা সুখজনক বলিয়া মনে হয় তাহাই অন্য লোকেরও সুখজনক, এবং এইজন্য অন্য লোকেরও যাহা সুখকর হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর? এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মলক্ষণ বলিবার সময় ইহা অপেক্ষা বেশী খোলসা করিয়া এই নিয়মের দুই অংশের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তৎ পরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ॥

জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্‌যদাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্মিন্নপি চিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ আমার সহিত অন্যলোক যেরূপ ব্যবহার করিবে না বলিয়া আমি ইচ্ছা করি সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুঝিয়া আমি অন্য লোকের সহিতও সেরূপ ব্যবহার করিব না। আমি নিজে জীবিত থাকিব বলিয়া যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে অন্যকে বধ করিব কি প্রকারে? যাহা আমি চাহি তাহা অপরেও চাহে ইহা মনে রাখিতে হইবে" (শাং. ২৫৮. ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে এই নিয়মই বলিবার সময় এই 'অনুকূলে' কিংবা 'প্রতিকূল' বিশেষণ প্রয়োগ না করিয়া যে কোন প্রকারের ব্যবহার বিষয়ে সাধারণতঃ বিদুর বলিয়াছেন—

তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা।
তথা চ সর্ব্বভূতেষু বর্তিতব্যং যথাত্মনি॥

"ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের সহিত ব্যবহার করিবে। এবং আপনারই ন্যায় সমস্ত ভূতের সহিত ব্যবহার করিবে" (শাং. ১৬৭. ৯)। কারণ, শুকানুপ্রশ্নে ব্যাস বলেন—

যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

"আমার শরীরের মধ্যে যতখানি আত্মা, অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা যে সর্ব্বদা জানে সে-ই অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।" (মভা. শাং. ২৩৮. ২২)। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন না; ন্যূনকল্পে, আত্মবিচারের ব্যর্থ গোলযোগের মধ্যে পড়িও না, এইরূপ তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন। তথাপি বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বলিবার সময় বুদ্ধও আত্মৌপম্য-দৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন -

যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং।
অত্তানং (আত্মানং) উপমং (কৃত্বা) ন হনেয্যং ন ঘাতয়ে॥

"যেমন আমি তেমনি ইহারা, (এইরূপ) নিজের সমান বুঝিয়া (কাহাকেও) বধ করিবে না এবং বধ করাইবে না" (সুত্তনিপাত, নালকসুত্ত ২৭ দেখ)। ধম্মপদ নামক আর এক পালী বৌদ্ধগ্রন্থেও (ধর্ম্মপদ, ১২৯ ও ১৩০) উক্ত শ্লোকেরই দ্বিতীয় চরণ দুইবার অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহার পর, তখনই মনুস্মৃতি (৫. ৪৫.) ও মহাভারত (অনু. ১১৩. ৫.) এই দুই গ্রন্থে লিখিত শ্লোকের নিম্নলিখিত অনুবাদ পালিভাষায় করা হইয়াছে—

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো (ইচ্ছন্) পেচ্চ সো ন লভতে সুখং॥

"(আপনারই ন্যায়) সুখের ইচ্ছাকারী অন্য প্রাণীদিগের যে ব্যক্তি আপনার (অত্তনো) সুখের জন্য দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহার সুখ হয় না" (ধর্ম্মপদ ১৩১। আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও আত্মৌপম্যের এই ভাষা যখন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তখন বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা এই বিচার যে বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। থাকু, ইহার বিস্তৃত বিচার পরে করা যাইবে। উপরি-উক্ত বিচার হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইরূপ যাহার অবস্থা হইয়াছে সে ব্যক্তি অন্যের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আত্মৌপম্য-বুদ্ধিতেই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং এইরূপ ব্যবহারের ইহাই এক মুখ্য নৈতিক তত্ত্ব—এইরূপ আমরা প্রাচীনকাল হইতে বুঝিয়া আসিয়াছি। সমাজে এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার নির্ণয়ে, আত্মৌপম্যবুদ্ধির এই সূত্র, "অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দোষ, নিঃসন্দিগ্ধ, ব্যাপক, স্বল্প ও অজ্ঞান মনুষ্যদিগেরও সহজে বোধগম্য হইবার যোগ্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।* ধর্ম্মাধর্ম্ম-শাস্ত্রের এই রহস্য (এষ সংক্ষেপতো ধর্ম্মঃ) কিংবা মূলতত্ত্বের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যেরূপ উপপত্তি হয় কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশীল আধিভৌতিকবাদে সেরূপ হয় না। এবং সেইজন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রধান নিয়মকে, কর্ম্মযোগের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যাঁহারা বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই। অধিক কি, আত্মৌপম্যদৃষ্টির সূত্র এক্‌পাশে সরাইয়া রাখিয়া, তাঁহারা সমাজবন্ধনের উপপত্তি "অধিকাংশের অধিক সুখ" ইত্যাদি দৃশ্যতত্ত্বপ্রয়োগেই লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপনিষদে, মনুস্মৃতিতে, গীতায় মহাভারতে অন্যান্য প্রকরণে এবং কেবল বৌদ্ধধর্ম্মেই নহে, প্রত্যুত অন্যান্য দেশে ও ধর্ম্মের আত্মৌপম্যের এই সহজ নীতিতত্ত্বকেই সর্ব্বত্র অগ্রস্থান প্রদত্ত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে "তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনারই মত প্রীতি কর' (লেভি. ১৯. ১৫; মাথু. ২২. ৩৯) এই যে অনুজ্ঞা আছে তাহা এই নিয়মেরই রূপান্তর। খৃষ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার ন্যায় মূল্যবান নিয়ম বলেন, কিন্তু আত্মৈক্যের উপপত্তি উহাদের ধর্ম্মে নাই। "তুমি

* 'সূত্র' শব্দের ব্যাখ্যা 'অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" এইরূপ করা হইয়া থাকে। গানের সুবিধার জন্য কোন মন্ত্রে যে সকল অনর্থক অক্ষর বসানো হয় তাহাকে স্তোভাক্ষর বলে। সূত্রে এইরূপ অনর্থক অক্ষর থাকে না। তাই, এই লক্ষণে 'অস্তোভম্' এই পদ আসিয়াছে।

নিজের সহিত অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, তাহাদের সহিত তোমার নিজেরও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত (লা, ৭. ১২ ; লূ. ৬. ৩১), খৃষ্টের এই উপদেশও আত্মৌপম্যসূত্রের এক অংশ মাত্র : গ্রীসদেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থে মনুষ্যদিগের পরস্পরব্যবহারের এই তত্ত্বই অক্ষরশঃ কথিত হইয়াছে। অ্যারিষ্টটল্ খৃষ্টের প্রায় দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অ্যারিষ্টটলেরও ন্যূনাধিক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চিনীয় তত্ত্বজ্ঞানী খুঁ-ফু-ৎসে (ইংরেজী অপভ্রংশ কন্ফ্যুশিয়স্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি আত্মৌপম্যের উপরিউক্ত নিয়ম চিনীয় ভাষার রীতি অনুসারে এক শব্দেই বলিয়াছেন ! কিন্তু আমাদের এখানে এই তত্ত্ব কন্ফুশিয়সেরও বহুপূর্ব্বে উপনিষদে (ঈশ. ৬ ; কেন. ১৩) এবং পরে মহাভারতে, গীতায় এবং "আত্মবৎ পরাবে তে*। মানীত জাবে* ॥" আত্মবৎ পরকে মনে করিবে"—এই ভাবে (দাস. ১২. ১০. ২২) সাধুমণ্ডলীর গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ; আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে" এইরূপ প্রচলিত কথাও আছে। শুধু ইহাই নহে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ইহার আধ্যাত্মিক উপপত্তিও দিয়াছেন। বৈদিকেতর ধর্ম্মে নীতিধর্ম্মের এই সর্ব্বমান্য সূত্রটি প্রদত্ত হইলেও উহার উপপত্তি বিবৃত হয় নাই, এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই এই সূত্রের উপপত্তি ঠিক্ লাগ-সই হয় না, এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে গীতোক্ত আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

সমাজে মনুষ্যেরা পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে এই সম্বন্ধে আত্মৌপম্য বুদ্ধির নিয়ম এত সুলভ, ব্যাপক সুবোধ ও বিশ্বতোমুখ যে, সমস্ত ভূতে এইরূপ আত্মৌপম্য উপলব্ধি করিয়া "আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত ব্যবহার কর" এইরূপ একবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থাপন করিলে পর, লোকের উপর দয়া কর, তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য কর, তাহাদিগের কল্যাণ কর, তাহাদিগের উন্নতিসাধন কর, তাহাদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের বিরক্তি উৎপাদন করিও না, তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদের সহিত ন্যায় ও সমতার সহিত ব্যবহার কর, কাহাকেও ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ কিংবা হিংসা করিও না, কাহারও নিকট মিথ্যা কথা বলিও না, অধিকাংশের অধিক কল্যাণ করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পোষণ কর, অথবা সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত ভাইয়ের মত ব্যবহার কর ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করা আর আবশ্যকই হয় না। যে-ই হউক না কেন তাহার নিজের সুখদুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহা সে স্বভাবত সহজেই বুঝিতে পারে ; এবং সংসারে ব্যবহার করিবার সময় "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি"

অথবা "অর্দ্ধং ভার্য্যা শরীরস্য" এইরূপ ভাবিয়া, আপনার ন্যায়ই আপন স্ত্রীপুত্র-দিগেরও প্রতি প্রীতি করা উচিত, এই বিষয়ের অনুভবও পারিবারিক ব্যবস্থার দ্বারা তাহার হইয়া থাকে। কিন্তু পরিবারের প্রতি প্রীতি করা আত্মৌপম্যবুদ্ধি শিক্ষার প্রথম পাঠ ; ইহাতেই সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া না থাকিয়া, পরে মিত্র, আপ্ত, গোত্রজ, গ্রামবাসী, জ্ঞাতিবন্ধু এবং শেষে সমস্ত মনুষ্য, সমস্ত প্রাণীর প্রতি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির উপযোগ করা কর্ত্তব্য, এই প্রকারে প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের আত্মৌপম্যবুদ্ধি অধিকাধিক ব্যাপক করিয়া, আমার মধ্যে যে আত্মা আছে তাহাই সমস্ত ভূতে আছে ইহা উপলব্ধি করা এবং শেষে সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—ইহাই জ্ঞানের ও আশ্রমব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা অথবা মনুষ্যমাত্রের সাধ্যসীমা। ইহাই আত্মৌপম্যবুদ্ধিরূপ সূত্রের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এবং এই পরমাবস্থা অর্জ্জন করিবার যোগ্যতা যেই যেই যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্ম্ম্য, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে কর্ত্তব্য, ইহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির প্রকৃত অর্থ স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করা, এবং ইহারই জন্য গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মকে স্মৃতিকারেরা বিহিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম ইহাই। অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযোগশাস্ত্র সকলকে বলিতেছেন যে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" ইহাতেই আত্মার ব্যাপ্তির সঙ্কোচ না করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলব্ধি কর যে, "লোকো বৈ অয়মাত্মা" ; এবং "উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—উদার ব্যক্তিদিগের বসুধাই কুটুম্ব, প্রাণীমাত্রই তাঁহাদের পরিবার—এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেকে নিজের ব্যবহার নিয়মিত করিবে। এই বিষয়ে আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্র অন্য দেশের প্রাচীন কিংবা অর্ব্বাচীন কোন কর্ম্মযোগশাস্ত্রের নিকট হার মানে না ; শুধু তাহাই নহে, উহাদিগকে উদরস্থ করিয়াও পরমেশ্বরের ন্যায় 'দশ অঙ্গুলী' বেশী থাকিবে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, আত্মৌপম্যভাবের দ্বারা "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এইরূপ বেদান্তী ও ব্যাপক দৃষ্টি হইলে পর, দেশাভিমান, কুলাভিমান, ধর্ম্মাভিমান প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণের ফলে কোন বংশ কিংবা রাষ্ট্র এক্ষণে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত সদ্গুণই যে কেবল বিনষ্ট হয় তাহা নহে, প্রত্যুত কোন আততায়ীকে বধ করিবার কিংবা কষ্ট দিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও "নির্বৈরঃ সর্ব্ব-ভূতেষু" (গী. ১১. ৫৫) এই গীতাবাক্য অনুসারে তাহাকে ফিরিয়া দুষ্টবুদ্ধিতে না মারাই আমার ধর্ম্ম হইবে (ধম্মপদ ৩৩৮ দেখ), কাজেই দুষ্টের দমন না হওয়ায় তাহাদের দুষ্কর্ম্মের নিকট সাধু পুরুষদিগের বলিদান ঘটিবে। এই প্রকারে দুষ্টদিগের প্রাবল্য হইলে সমস্ত সমাজ কিংবা সমুদয় রাষ্ট্রের নাশও হইবে। মহাভারতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ" (মভা. বন. ২০৬. ৪৪)—দুষ্টের প্রতি দুষ্ট হইবে না, তাহার সহিত সাধু ব্যবহারই করিবে ; কারণ, দুষ্ট ব্যবহারের দ্বারা কিংবা বৈরতার দ্বারা বৈরতা কখনই বিনষ্ট হয় না—"ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যুপশাম্যতি"। বরং যাহাকে আমরা পরাজয় করি সে ব্যক্তি স্বভাবতই দুষ্ট হওয়ায় পরাজিত হইলে তাহার মনে আরও কড়া পড়িয়া যায় এবং সে পুনর্ব্বার শোধ তুলিবার সুযোগ দেখিয়া থাকে—"জয়ো বৈরং প্রসৃজতি ;" তাই দুষ্টদিগকে শান্তির দ্বারাই নিবারণ করা যুক্তিসিদ্ধ (মভা. উদ্যো ৭১. ৫৯ ও ৬৩)। মহাভারতের এই শ্লোকই বৌদ্ধগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে (ধম্মপদ ৫ ও ২০১ ; মহাবগ্গ ১০. ২ ও ৩ দেখ), এবং এইরূপই "তুমি নিজের

শত্রুকে প্রীতি কর" (মাথু, ৫. ৪৪), এবং "এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল বাড়াইয়া দাও" (মাথু ৫. ৩৯; লূক. ৬. ২৯,। এইরূপই খৃষ্টও এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াছেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে চিনীয় তত্ত্বজ্ঞ লা-ও-ৎসেও এইরূপ বলিয়াছেন; আমাদের ভারতের সাধুমন্ডলীর মধ্যে তো একনাথ মহারাজার ন্যায় সাধুপুরুষদিগের এইরূপ আচরণ করিবার অনেক কথাই আছে। ক্ষমা কিংবা শান্তির পরাকাষ্ঠা-উৎকর্ষ যাঁহারা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তের পবিত্র যোগ্যতার লাঘব করা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। সত্যেরই ন্যায় ক্ষমাধর্ম্মও শেষে অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থায় অব্যভিচারী ও নিত্যরূপে থাকিয়া যাইবে ইহাতে সংশয় নাই। অধিক-কি, সমাজের এখনকার অপূর্ণ অবস্থাতেও বহু প্রসঙ্গে শান্তির দ্বারা যে কাজ হয় তাহা ক্রোধের দ্বারা হয় না, এইরূপ নজরে আসে। অর্জ্জুন যখন দেখিতে লাগিলেন যে, দুষ্ট দুর্যোধনকে সহায্য করিবার জন্য কোন্ কোন্ যোদ্ধা আসিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে পিতামহ ও গুরুর ন্যায় পূজ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার নজরে পড়িতেই, দুর্যোধনের দুষ্টতার প্রতিকারার্থ শুধু কর্ম্মে নহে, প্রত্যুত অর্থেও যাঁহারা আসক্ত হইয়া গিয়াছেন, সেই গুরুজনদিগকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করিবার দুষ্কর কর্ম্মও আমাকে করিতে হইবে (গী ২. ৫) এই কথা তিনি বুঝিলেন; এবং "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" এই নীতি অনুসারে—দুর্যোধন দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সহিত দুষ্ট ব্যবহার করা আমার উচিত নয়, "তাঁহারা আমাকে বধ করিলেও (গী. ১. ৪৬) 'নির্ব্বৈর' অন্তঃকরণে শান্তভাবে আমার বসিয়া থাকা উচিত" এইরূপ অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন। এই সংশয়ের নিবারণার্থই গীতাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং সেই জন্য গীতায় এই বিষয়ের যেরূপ খোলসা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। উদাহরণ যথা—বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই দুই ধর্ম্মই নির্বৈরত্বের তত্ত্ব বৈদিক ধর্ম্মেরই অনুরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু (লোকসংগ্রহের প্রতি কিংবা আত্মরক্ষণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া) সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাহার ব্যবহার এবং (বুদ্ধি অনাসক্ত ও নির্ব্বৈর হইলেও সেই অনাসক্ত ও নির্ব্বৈর বুদ্ধিতে) যে কর্ম্মযোগী ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সর্ব্বাংশে যে একই প্রকার হইতে পারে না, সে কথা বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলা হয় নাই। বরং, খৃষ্টপ্রদত্ত উপরি-উক্ত নির্বৈরত্বের উপদেশ এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমন্বয় কিরূপে করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; * এবং নিৎশে নামক আধুনিক জর্ম্মন পণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থে টিপ্পনীসহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্ব্বৈরত্বের এই ধর্ম্মতত্ত্ব দাসত্বের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঘাতক ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং খৃষ্টধর্ম্ম সেই ধর্ম্মতত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সমস্ত য়ুরোপকে নির্বীর্য্য করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিলে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই ধর্ম্মমার্গের মধ্যে এই বিষয়ে ভেদ করা আবশ্যক, এই কথা শুধু গীতার নহে মনুরও অবগত ও সম্মত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, "ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ"—ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্টা ক্রোধ করিবে না (মনু. ৬ ৪৮)—এই নিয়ম, মনু গার্হস্থ্য কিংবা রাজধর্ম্মের মধ্যে না বলিয়া কেবল যতিধর্ম্মের মধ্যেই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ বচনটি কোন্ মার্গের, কিংবা তাহার কোথায় উপযোগ করিবে, ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত মিলাইয়া ফেলিয়া একত্র বলিবার যে পদ্ধতি এখনকার

* See Paulsen's *System of Ethics*, Book III. Chap. X (Eng. Trans.) and Nietzsche's *Anti-Christ*.

টীকাকারেরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দরুন অনেক সময় কর্ম্মযোগের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বে পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি। গীতার টীকাকারদিগের এই গোলমেলে পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলে ভাগবতধর্ম্মী কর্ম্মযোগী 'নির্ব্বৈর' শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহা সহজেই জানা যায়। কারণ, কর্ম্মযোগী গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে দুষ্টের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, পরম ভগবদ্‌ভক্ত প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত! পণ্ডিতৈরপবাদিতা" (মভা. বন. ২৮. ৮)—এই জন্যই বাপু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন। আমার যাহা দুঃখজনক হইবে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া অন্যকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে, ইহা আত্মৌপম্যদৃষ্টির সাধারণ ধর্ম্ম—সত্য বটে; কিন্তু মহাভারতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আমাকে দুঃখ দেওয়া অন্যেরও উচিত নহে, এইরূপ এই ধর্ম্মেরই অনুরূপ যে আর এক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনকারী লোক যে সমাজে নাই সেই সমাজে কেবল এক জন এই ধর্ম্ম পালন করিলে কোন লাভ হইবে না। সমতা এই শব্দই দুই ব্যক্তির সম্বন্ধসাপেক্ষ। তাই, আততায়ী পুরুষকে মারিয়া ফেলিলে যেমন অহিংসার লাঘব হয় না, সেইরূপ দুষ্টের উচিত শাসনকারী সাধু পুরুষদিগের আত্মৌপম্যবুদ্ধিতে কিংবা নির্ব্বৈরিতাতেও কোন লাঘব ঘটে না। বরং দুষ্টদিগের অন্যায়াচরণের প্রতিকার করিয়া অন্যকে বাঁচাইবার শ্রেয় তাঁহারা লাভ করেন। যে পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বুদ্ধি অধিক সম নহে সেই পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ ও দুষ্টদিগের বিনাশার্থ যদি সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া লোকসংগ্রহ করিয়া থাকেন (গী. ৪. ৭ ও ৮) তবে অন্য ব্যক্তির কথাই কি? "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এইরূপ দৃষ্টি হইলে কিংবা ফলাশা ছাড়িলে, পাত্রাপাত্রভেদ কিংবা যোগ্যাযোগ্যভেদ বিলুপ্ত হইবে—এ কথা ভ্রান্তিমূলক। ফলাশায় মমত্ব-বুদ্ধিই প্রধান হইয়া থাকে এবং তাহা না ছাড়িলে পাপপুণ্য হইতে মুক্তি নাই, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন না থাকিলেও, যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে এমন কোন বস্তু লইতে দেন যাহা তাহার যোগ্য নহে, তাহা হইলে সেই সিদ্ধ পুরুষের দুষ্ট কিংবা অযোগ্য লোকদিগের সাহায্য করিবার, এবং যোগ্য সাধুলোকদিগেরও ক্ষতি করিবার পাপ না হইয়া যায় না। কুবেরের ন্যায় কোটিপতি মহাজন বাজারে শাকসব্‌জি খরিদ করিতে গেলে, এক বস্তা ধানের-চালের জন্য যেরূপ তিনি লাখ টাকা দেন না, সেইরূপ পূর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত ব্যক্তি কোনও কার্য্যের যোগ্য তারতম্যের কথা বিস্মৃত হন না। তাঁহার বুদ্ধি সম তো থাকেই; কিন্তু গরুর ঘাস মনুষ্যকে এবং মনুষ্যের অন্ন গরুকে দিবে—সমতা শব্দের এরূপ অর্থ নহে; এবং ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন যে, 'দাতব্য' বলিয়া যে সাত্ত্বিক দান তাহাও "দেশে কালে চ পাত্রে চ" অর্থাৎ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে (গী.১৭. ২০)। সাধুপুরুষদিগের সাম্যবুদ্ধির বর্ণনা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ তাহার সহিত পৃথিবীর উপমা দিয়াছেন। এই পৃথিবীর আর এক নাম 'সর্ব্বংসহা'; কিন্তু এই 'সর্ব্বংসহা' দেবীও, তাঁহাকে কেহ পদাঘাত করিলে, যে পা লাথি মারে সেই পায়ের তলায় ততটা জোরে প্রতিঘাত করিয়া নিজের সমতাবুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া থাকেন! মনে বৈর না থাকিলেও (অর্থাৎ নির্বৈর) প্রতিকার কিরূপে করা যাইতে পার, ইহার দ্বারা সুন্দর ব্যক্ত হয়। কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ায় বলিয়া আসিয়াছি যে, এই কারণেই ভগবানও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (গী. ৪. ১১) যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপেই ফল প্রদান করি—এইরূপ করিয়াও "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য" দোষ হইতে অলিপ্ত থাকেন। এইরূপ ব্যবহারে, কিংবা আইনেও খুনী মনুষ্যের প্রতি ফাঁসির আদেশদাতা বিচারপতির বৈরিভাব আছে

এ কথা কেহ বলিবে না ; অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি নিষ্কাম হইয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছিলে সেই মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও ক্ষতি করেন না, উঁহার দ্বারা যদি অন্যের ক্ষতিই হয় তবে সে তাহারই কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে, ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের কোনই দোষ নাই ; কিংবা নিষ্কাম বুদ্ধিবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ এইরূপ প্রসঙ্গে যে কর্ম্ম করেন—তাহা মাতৃবধ কিংবা গুরুবধের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হউক না কেন—তাহার শুভাশুভ ফলের বন্ধন অথবা স্পর্শ তাঁহাকে লাগে না, (গী.৪.১৪ ; ৯. ২৮ ও ১৮. ১৭ দেখ)। ফৌজদারী আইনে আত্মসংরক্ষণের যে নিয়ম আছে, তাহা এই তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা আছে যে, লোকেরা তাঁহাকে রাজা হইবার জন্য যখন মিনতি করিল তখন "অনাচারী লোকদিগকে শাসন করিবার জন্য রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমি পাপে পতিত হইতে ইচ্ছা করি না" তিনি প্রথমে এই উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন লোকেরা তাঁহাকে বলিল—"তমব্রুবন্ প্রজাঃ মা ভীঃ কর্তৃনেনো গমিষ্যতি" (মভা. শাং. ৬৭.২৩)—ভয় করিও না, যাহার পাপ তাহাকেই লাগিবে, তুমি কেবল রক্ষা করিবার পুণ্যই লাভ করিবে ; এবং "প্রজারক্ষণার্থ যে ব্যয় হইবে তাহা নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা কর দিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, তখন মনু প্রথম রাজা হইতে স্বীকার করিলেন। সার-কথা, অচেতন জগতের যেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় এই নিয়ম আছে যে, 'যতটা আঘাত ততটাই প্রত্যাঘাত', সেইরূপই সচেতন জগতে ঐ নিয়মের রূপান্তর এই যে, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'। যাহাদের বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে নাই এইরূপ সাধারণ লোক, এই কর্ম্মবিপাকের নিয়মের মধ্যে নিজের মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করে এবং ক্রোধে বা হিংসায় আঘাত অপেক্ষা অধিক প্রত্যাঘাত করিয়া আঘাতের সুদ লইয়া থাকে ; কিম্বা আপনার অপেক্ষা কেহ দুর্ব্বল হইলে তাহার সামান্য অথবা কাল্পনিক দোষের জন্য প্রতিকারবুদ্ধিতে তাহার দ্রব্য লুট করিয়া আপনার লাভ করিয়া লইতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় সুদগ্রহণবুদ্ধি, বৈরবুদ্ধি, অভিমানবুদ্ধি, ক্রোধ লোভ কিংবা দ্বেষবশতঃ দুর্ব্বলের দ্রব্য হরণ করিবার বুদ্ধি অথবা জেদবশতঃ নিজের পরাক্রমবুদ্ধি, বড়াই করিবার বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য দেখাইবার বুদ্ধি যাঁহার মনে থাকে না সেই ব্যক্তির গায়ের উপর পড়া খেলিবার গোলা শুধু ফিরাইয়া দিবার বুদ্ধির ন্যায় শান্ত নির্ব্বৈর ও সমবুদ্ধি বিচলিত হয় না ; বরং দুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে বৃদ্ধি পাইয়া গরীবলোকের যাহাতে কষ্ট না হয় সে জন্য এই প্রকার প্রত্যাঘাতরূপ কর্ম্ম করাই লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য (গী. ৩. ২৫)। এইরূপ প্রসঙ্গে সমবুদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধর্ম্ম্য ও শ্রেয়স্কর, ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার। সকলের সহিত নির্ব্বৈরভাবে ব্যবহার করিবে, দুষ্টের সহিত দুষ্ট ব্যবহার করিবে না, ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি ধর্ম্মতত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীর মান্য নহে এরূপ নহে ; কিন্তু 'নির্ব্বৈর' শব্দের অর্থে নিষ্ক্রিয় কিংবা প্রতিকারশূন্য, নিছক্ সন্ন্যাসমার্গের এই মত তাঁহার মান্য নহে ; বৈর অর্থাৎ মনের দুষ্ট বুদ্ধি ত্যাগ করিবে, নির্ব্বৈরপদের এই অর্থই বুঝেন ; এবং কেহই যখন কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবেই না, তখন লোকসংগ্রহ কিম্বা প্রতিকারার্থ যাহা আবশ্যক ও সম্ভব সেইটুকু কর্ম্ম মনে দুষ্ট বুদ্ধি না রাখিয়া, কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ-বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইরূপ কর্ম্মযোগের উক্তি (গী. ৩. ১৯)। তাই এই শ্লোকে (গী. ১১. ৫৫) শুধু 'নির্ব্বৈর' পদ প্রয়োগ না করিয়া—

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ ॥

তৎপূর্ব্বেই 'মৎকর্ম্মকৃৎ' অর্থাৎ আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে সমস্ত কর্ম্ম করে' এই আর একটা গুরুতর রকমের বিশেষণ দিয়া

ভগবান্ গীতায় নির্ব্বৈরত্ব ও কর্ম্মের ভক্তিদৃষ্টিতে জোড়া-নৌকা ভাসাইয়াছেন। এই জন্যই এই শ্লোকে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারভূত তাৎপর্য্য আসিয়াছে, ইহা শাঙ্করভাষ্যে এবং অন্যান্য টীকাতেও কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে নির্ব্বৈর করিবার জন্য কিংবা নির্ব্বৈর হইবার পরেও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবে গীতায় এরূপ কোথাও বলা হয় নাই। এইপ্রকার প্রতিকারার্থ কর্ম্ম নির্ব্বৈরত্ব সহকারে ও পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিলে কর্ত্তাকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ তো করেই না, বরঞ্চ প্রতিকারের কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর যে দুষ্টের দমন করা হইল, তাহারই আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে কল্যাণ চিন্তা করিবার বুদ্ধিও বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ যথা, রাবণের দুষ্কর্ম্মের জন্য নির্ব্বৈর ও নিষ্পাপ রামচন্দ্র যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলে পর, উত্তরক্রিয়া করিবার সময় বিভীষণ যখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে বুঝাইয়াছেন—

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥

"বৈর (রাবণের মনের) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আমার (দুষ্ট নাশ করিবার) কাজ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে এ যেমন তোমার (ভাই) তেমনি আমারও। এই জন্য ইহার অগ্নিসংস্কার কর" (বাল্মীকিরা. ৬. ১০৯. ২৫)। রামায়ণের এই তত্ত্ব ভাগবতেও এক স্থানে (ভাগ. ৮. ১৯. ১৩) উক্ত হইয়াছে ; এবং ভগবান যে দুষ্টের সংহার করিয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়া তাহারই সদ্গতি করিয়াছেন এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও যে কথা আছে, তাহার অন্তর্গত বীজও ইহাই। এই সকল বিচার করিয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী বলিয়াছেন "উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিবে" ; এবং মহাভারতে ভীষ্ম পরশুরামকে বলিয়াছেন—

যো যথা বর্ত্ততে যস্মিন্ তস্মিন্নেবং প্রবর্ত্তয়ন্।
নাধর্ম্মং সমবাপ্নোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি ॥

"আমার সহিত যে যেইরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত আমি সেইরূপ ব্যবহার করিলে অধর্ম্ম (অনীতি) ঘটে না এবং অকল্যাণও হয় না" (মভা. উদ্যো. ১৭৯. ৩০)। এবং পরে শান্তিপর্ব্বের সত্যানৃতাধ্যায়ে ঐ উপদেশই পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া হইয়াছে—

যস্মিন্ যথা বর্ত্ততে যো মনুষ্যঃ তস্মিংস্তথা বর্ত্তিতব্যং স ধর্ম্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ ॥

"আমার সহিত যে যেইরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্মনীতি ; মায়াবী পুরুষের সহিত মায়াবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সহিত সাধু-ভাবেই ব্যবহার করা উচিত (মভা. শাং ১০৯. ২৯ এবং উদ্যো. ৩৬. ৭)। সেইরূপ আবার, ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে মায়াবী দোষ না দিয়া তাঁহার স্তুতিগানই করা হইয়াছে "ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং ··· বৃত্রম্ অর্দয়ঃ।" (ঋ. ১০. ১৪৭. ২ ; ১. ৮০. ৭)—হে নিষ্পাপ ইন্দ্র, মায়াবী বৃত্রকে তুমি মায়ার দ্বারাই বধ করিয়াছ। ভারবি কবি স্বকীয় কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যেও ঋগ্বেদতত্ত্বেরই অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন—

ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবং।
ভবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ ॥

"মায়াবীর সহিত যাহারা মায়াবী হয় না তাহারা বিনাশ পায়" (কিরা. ১. ৩০)। কিন্তু এই স্থানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, দুষ্ট পুরুষের প্রতিকার সাধুতা দ্বারা সাধ্য হইলে প্রথমে তাহা সাধুতার দ্বারাই করিবে। কারণ, অন্য

মনুষ্য দুষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে আমারও দুষ্ট হওয়া উচিত নহে—এক জনের নাক কাটা গেলে সমস্ত গ্রাম-কে-গ্রাম নিজের নাক কাটিয়া ফেলে না। অধিক-কি, ইহা ধর্ম্মও নহে। "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" এই সূত্রের প্রকৃত ভাবার্থ ইহাই; এবং এই কারণেই, বিদুরনীতিতে প্রথমে "ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ" নিজের যাহা প্রতিকূল বলিয়া মনে কর, সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করিবে না—এই নীতিতত্ত্বই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন। ইহার পরই বিদুর বলিতেছেন—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥

"(অন্যের) ক্রোধ (নিজের) শান্তির দ্বারা জয় করিবে, দুষ্টকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বারা জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা অনৃতকে জয় করিবে" (মভা. উদ্যো. ৩৮. ৭৩, ৭৪)। পালীভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মীয় ধম্মপদ নামক নীতিগ্রন্থে (ধম্মপদ. ২৩৩ দেখ) এই শ্লোকেরই অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥

শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার সময় ভীষ্মও—

কর্ম্ম চৈতদসাধুনাম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
ধর্ম্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্ম্মণা ॥

"দুষ্টের অসাধুতা অর্থাৎ দুষ্ট কর্ম্ম সাধুতা দ্বারা নিবারণ করিবে; কারণ পাপ-কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ জয় অপেক্ষা ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ নীতির দ্বারা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" (শাং. ৯৫. ১৬) এইরূপে এই নীতিতত্ত্বেরই মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সাধুতা দ্বারা দুষ্টের দুষ্কার্য্য নিবারণ না হইলে কিংবা সামোপচার ও শিষ্টতার কথা দুষ্টদের পছন্দ না হইলে, "কন্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতি অনুসারে, পুল্টিসের দ্বারা যে কাঁটা বাহির হয় না তাহা সাদাসিদা লোহার কাঁটা অর্থাৎ ছুঁচের দ্বারাই বাহির করিতে হয় (দাস, ১৯. ৯. ১২-৩১)। কারণ, যখনই হউক না কেন, লোকসংগ্রহার্থ দুষ্টের নিগ্রহ করা, ভগবানের ন্যায়, ধর্ম্মদৃষ্টিতে সাধুপুরুষদিগেরও প্রথম কর্ত্তব্য। "সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে" এই বাক্যেই অসাধুতার জয় কিংবা নিবারণ করাই সাধুপুরুষদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য এই কথাই প্রথমে ধরিয়া লইয়া পরে তৎসিদ্ধ্যর্থ প্রথমে কি উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাধুতা দ্বারা তাহার নিবারণ অসাধ্য হইলে, 'যাহার যেমন তাহার তেমন' হইয়া দুষ্টের দমন করিতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কখনও বাধা দেন না; সাধুপুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া দুষ্টতার নিকট আপনাদিগকে বলি দিবে, তাঁহারা ইহা কোথাও প্রতিপাদন করেন নাই। আপনার দুষ্ট কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যের গলা কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্য লোক সাধুভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে এইরূপ বলিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। অধিক কি, সাধু পুরুষেরা এইরূপ কোন অসাধু কর্ম্ম করিতে যখন বাধ্য হন, তখন সেই কর্ম্মের দায়িত্ব শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধুপুরুষের উপর না দিয়া সেই কর্ম্ম দুষ্ট পুরুষের দুষ্কর্ম্মেরই পরিণাম হওয়ায়, তাহার জন্য দুষ্ট পুরুষকেই দায়ী করিতে হয়, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মনু. ৮. ১৯ ও ৩৫১)। স্বয়ং বুদ্ধ দেবদত্তকে যে শাসন করিয়াছেন তাহার উপপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থকারেরাও এই তত্ত্ব ধরিয়াই প্রয়োগ করিয়াছেন (মিলিন্দ প্র. ৪. ১. ৩০-৩৪ দেখ) জড়জগতের ব্যবহারে এই ঘাতপ্রতিঘাতরূপ ক্রিয়া নিত্য ও একেবারে কড়ায়গণ্ডায় ঠিক্ হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের ব্যবহার তাহার ইচ্ছাধীন; এবং উপরে যে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, দুষ্টের উপর তাহার

ব্যবহার বিষয়ে নিশ্চিত বিচার যে ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই ধর্ম্মজ্ঞানও অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাই আমরা যাহা করিতে ইচ্ছা করি তাহা যোগ্য কি অযোগ্য, ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য, এই সম্বন্ধে বড় বড় লোকদিগেরও প্রসঙ্গবিশেষে ধোঁকা লাগে—কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ (গী. ৪. ১৬)। এইরূপ প্রসঙ্গে, শুদ্ধ বিদ্বানদিগের কিম্বা নিয়ত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত ব্যক্তিদিগের পাণ্ডিত্যের উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সারাসার-বিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়া, পূর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের শুদ্ধ বুদ্ধিরই আশ্রয় লইয়া সেই গুরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া মানিবে। কারণ, শুদ্ধ তর্কমূলক পাণ্ডিত্য যত অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্তিও অধিকাধিক বাহির হইবে; তাই শুদ্ধ বুদ্ধি ব্যতীত শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা এইরূপ বিকট প্রশ্নের কখনই প্রকৃত ও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় না; সে মীমাংসা শুদ্ধ ও নিষ্কাম বুদ্ধির গুরুকেই করিতে হইবে। যে শাস্ত্রকার অত্যন্ত সর্ব্বমান্য হইয়াছেন তাঁহারই বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ" (গী. ১৬. ২৪)—কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয়করণে তোমার শাস্ত্রকে প্রমাণ মানিতে হইবে, এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। তথাপি কালমানানুসারে শ্বেতকেতুর ন্যায় পরবর্ত্তী সাধুপুরুষেরা এই শাস্ত্রেতেও পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

নির্ব্বৈর ও শান্ত সাধু পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে লোকদিগের এক্ষণে যে ভুল ধারণা দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, কর্ম্মযোগমার্গ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং সমস্ত সংসারই ত্যাজ্য এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসমার্গের এক্ষণে চতুর্দ্দিকে বিস্তারবৃদ্ধি হইয়াছে। নির্ব্বৈর হইলে পর নিষ্প্রতিকারও হওয়া চাই, গীতার ইহা উপদেশ কিংবা উদ্দেশ্যও নহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তি ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহার পক্ষে জগতে দুষ্টের প্রাবল্য হইল কি হইল না, অথবা নিজের প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় উপনীত কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত নির্ব্বৈরভাবে ব্যবহার করিলেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে পাত্রাপাত্রের সারাসার বিচার করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে কখনো ভুলেন না; এবং এইরূপে কৃত কর্ম্মপ্রযুক্ত কর্ত্তার সাম্যবুদ্ধিরও লাঘব হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগের উক্তি। গীতাধর্ম্মের অন্তর্ভূত কর্ম্মযোগের এই তত্ত্ব স্বীকার করিলে, কুলাভিমান দেশাভিমান ইত্যাদি কর্ত্তব্যধর্ম্মেরও কর্ম্মযোগশাস্ত্রানুসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে। সমগ্র মানবজাতির, এমন কি প্রাণীমাত্রেরই যাহাতে হিত হয় তাহাই ধর্ম্ম, ইহা চরম সিদ্ধান্ত হইলেও এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, ধর্ম্মাভিমান, দেশাভিমান প্রভৃতি আরোহণের উপর্য্যুপরি পৈঠার আবশ্যকতা কখনই বিনষ্ট হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ সগুণোপাসনা আবশ্যক সেইরূপ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যভিমান, ধর্ম্মাভিমান, দেশাভিমান প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক; এবং সমাজের প্রত্যেক বংশ এই সিঁড়ি দিয়া আরোহণ করে বলিয়া এই সিঁড়িকে নিয়ত বজায় রাখিতে হয়। এইরূপই আমাদের চারিপাশের লোক কিংবা অপর রাষ্ট্র যখন নীচের পৈঠায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র যদি চাহে যে, তাহারাই কেবল বরাবর উপরের পৈঠায় থাকিবে, তাহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরস্পর ব্যবহারে "যাহার যেমন, তাহার তেমন" এই নীতিসূত্র অনুসারে উপর-উপর পৈঠার লোকদিগের দ্বারা নীচের-নীচের পৈঠার লোকের অন্যায়ের প্রতিকার করা প্রসঙ্গবিশেষে আবশ্যক হয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। জগতের সমস্ত মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি

হইতে হইতে প্রাণিমাত্র কোন না কোন সময়ে সর্বভূতাত্মৈক্য উপলব্ধি পর্যন্ত-পৈঠায় আসিয়া পৌঁছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অন্ততঃ ঐরূপ অবস্থা মনুষ্যমাত্রই অর্জন করিতে পারে এরূপ আশা করা অসঙ্গতও নহে। কিন্তু আত্মোন্নতির এই চূড়ান্ত অবস্থা যে পর্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত অন্য রাষ্ট্র কিম্বা সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধুপুরুষেরা দেশাভিমানাদি ধর্মেরই এরূপ উপদেশ দেন যাহা আপন আপন সমাজের পক্ষে তৎ-তৎকালে শ্রেয়স্কর হয়। তাহা ছাড়া ইহাও মনে রাখা উচিত যে, গৃহের উপর-উপর তলা গড়িয়া তুলিলেও নীচের তলাকে যেরূপ ছাঁটিয়া ফেলা যায় না, কিংবা তলোয়ার গড়িলেও কোদালের, অথবা সূর্য্য থাকিলেও অগ্নির আবশ্যকতা যেরূপ নষ্ট হয় না, সেইরূপ সর্বভূতহিতের চরম পৈঠায় পৌঁছিলেও শুধু দেশাভিমানের নহে, কুলাভিমানেরও আবশ্যকতা বজায় থাকে। কারণ, সমাজসংস্কারের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কুলাভিমান যে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশাভিমানের দ্বারা হয় না, এবং দেশাভিমানের কাজ নিছক্ সর্বভূতাত্মৈক্য-দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থাতেও সাম্যবুদ্ধিরই ন্যায়, দেশাভিমান ও কুলাভিমান ইত্যাদি ধর্মেরও সর্বদাই আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু কেবল আপনারই দেশের অভিমানকে পরম সাধ্য মনে করিলে যেমন এক রাষ্ট্র নিজের লাভের জন্য অন্য রাষ্ট্রের যতটা পারে ক্ষতি করিতে প্রস্তুত হয়, সর্বভূতহিতকে পরমসাধ্য মনে করিলে সেরূপ হয় না। কুলাভিমান, দেশাভিমান, এবং শেষে সমস্ত মানবজাতির হিত, ইহাদের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে নীচের নীচের আদর্শের ধর্মকে উপর-উপর পৈঠার ধর্মের জন্য ত্যাগ করিবে, সাম্যবুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ নীতিধর্মের এই মহৎ ও বিশিষ্ট উক্তি। যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, অতএব দুর্যোধনের জেদ বজায় রাখিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের ভাগ না দেওয়া অপেক্ষা, দুর্যোধন কথা না শুনিলে, (আপন পুত্র হইলেও) একা তাহাকে ত্যাগ করাই উচিত, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ করিবার সময় তৎসমর্থনার্থ এই শ্লোক বলিয়াছেন—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

"কুলের (রক্ষণের) জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে, সমস্ত জনপদের জন্য গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে ছাড়িবে" (মভা. আদি. ১১৫. ৩৬; মভা. ৬১. ১১)। এই শ্লোকের প্রথম তিন চরণের তাৎপর্য্য ইহাই; চতুর্থ চরণে আত্মসংরক্ষণের তত্ত্ব বলিয়াছেন। 'আত্ম' শব্দ সাধারণ সর্বনাম, ইহা হইতে আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রেরও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং কুলের জন্য এক ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য কুলকে, দেশের জন্য গ্রামকে ছাড়িবার ক্রমশঃ উত্থানশীল এই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্ম শব্দের অর্থ এই সকলের অপেক্ষা এইস্থানে অধিক গুরুত্বসূচক, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। তথাপি কোন কোন মৎলবী কিংবা শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক এই চরণের কখন কখন বিপরীত অর্থাৎ নিছক্ স্বার্থপর অর্থ করিয়া থাকে; তাই, আত্মসংরক্ষণের এই তত্ত্ব স্বার্থপরতার তত্ত্ব নহে, এই কথা এখানে বলা আবশ্যক। কারণ, যে শাস্ত্রকারেরা নিছক্ স্বার্থসাধু চার্বাক-পন্থাকে রাক্ষসী স্থির করিয়াছেন (গী. অ. ১৬ দেখ) তাঁহারা স্বার্থের জন্য জগৎকে উচ্ছন্ন করিতে কাহাকেও বলিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। উপরিউক্ত শ্লোকের 'অর্থে' শব্দের অর্থ নিছক্ স্বার্থপর নহে; "সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণার্থ"

এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোষকারেরাও এই অর্থই দিয়াছেন। আত্মোদর-পরতা ও আত্মসংরক্ষণের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কামোপভোগের ইচ্ছা কিংবা লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের ক্ষতি করা আত্মোদরপরতা। ইহা অমনুষ্যোচিত ও গর্হিত। একজনের হিত অপেক্ষা বহুলোকের হিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই উক্ত শ্লোকের প্রথম তিন চরণে উক্ত হইয়াছে। তথাপি সর্বভূতে একই আত্মা থাকায়, প্রত্যেকের সুখে থাকিবার সমান নৈসর্গিক অধিকার আছে; এবং এই সর্বমান্য মহৎ ও নৈসর্গিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, জগতের কোনও এক ব্যক্তির বা সমাজের ক্ষতি করিবার অধিকার, অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজ নীতিদৃষ্টিতে প্রাপ্ত হয় না—সেই সমাজ শক্তিতে কিংবা সংখ্যায় যতই বড় হউক না কেন, কিংবা তাহার নিকট পরাভব করিবার সাধন অন্যের অপেক্ষা যতই অধিক থাকুক না কেন! একজন অপেক্ষা অথবা অল্প লোক অপেক্ষা বহুলোকের হিত অধিক যোগ্য, এইরূপ যুক্তিবাদের দ্বারা সংখ্যায় অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাজের আত্মমৎলবী আচরণ যদি কেহ সমর্থন করে তবে সেই যুক্তিবাদকে রাক্ষসী বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্য লোক যদি অন্যায় ব্যবহার করে, তবে বহুলোকের কেন, সমস্ত পৃথিবীর হিত অপেক্ষাও আত্মসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে বাঁচাইবার নৈতিক অধিকার আরও বলবত্তর হয়; ইহাই উক্ত চতুর্থ চরণের ভাবার্থ; এবং প্রথম তিন চরণে বর্ণিত অর্থেরই জন্য মহত্ত্বপূর্ণ অপবাদসূত্রেই উহাদেরই সঙ্গে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাছাড়া, আর একটা দেখাও আবশ্যক, আমরা নিজে বাঁচিলে তবে তো লোকের কল্যাণ করিব। তাই, লোকহিতদৃষ্টিতে বিচার করিলেও বিশ্বামিত্রের কথা অনুসারে বলিতে হয়, "জীবন্ ধর্মমবাপ্নুয়াৎ"—আপনি বাঁচিলে তবে ধর্ম; কিংবা কালিদাসের কথা অনুসারে বলিতে হয়, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্" (কুমা. ৫. ৩৩) শরীরই সমস্ত ধর্মের মূলসাধন, অথবা মনুর কথা অনুসারে বলিতে হয়, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—আপনাকে সতত রক্ষা করিবেক। আত্মসংরক্ষণের অধিকার সমস্ত জগতের হিতাপেক্ষা এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও কোন কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের জন্য, ধর্মের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমেই নিজের প্রাণ দান করেন ইহা পূর্বে দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বই উক্ত শ্লোকের প্রথম তিন চরণে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে মনুষ্য আত্মসংরক্ষণরূপ স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকারকেও ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করায় এই কার্য্যের নৈতিক যোগ্যতাও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাপি এইরূপ প্রসঙ্গ কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিরবার পক্ষে শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা তর্কবুদ্ধি যথেষ্ট নহে; এইজন্য যে ব্যক্তি বিচার করিবে তাহার অন্তঃকরণ প্রথম হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহা ধৃতরাষ্ট্রের উল্লিখিত কথা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বিদুরপ্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে না পারিবার মত ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি অল্প ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহার বুদ্ধি সম হইত না, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। কুবেরের যেরূপ লাখটাকার কখনই অভাব হয় না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইয়াছে তাহার কুলাত্মৈক্য, দেশাত্মৈক্য কিংবা ধর্মাত্মৈক্য প্রভৃতি নিম্ন পৈঠার ঐক্যগুলিও কখনও ভাঙ্গিয়া যায় না। ব্রহ্মাত্মৈক্যের মধ্যে এই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; আবার দেশধর্ম, কুলধর্ম ইত্যাদি সংকীর্ণ ধর্মের কিংবা সর্বভূতহিতরূপ ব্যাপক ধর্মের—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা অনুসারে, কিংবা আত্মসংরক্ষণার্থ যে সময়ে যাহার যে ধর্মেরই উপদেশ করিয়া জগতের ধারণপোষণের কাজ সাধু পুরুষ নির্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় দেশাভিমানই মুখ্য সদ্‌গুণ; এবং সুসভ্য রাষ্ট্রও

পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুরাষ্ট্রের অনেক মানুষকে প্রসঙ্গ আসিলে অল্পকালের মধ্যে কিরূপে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার বিচারে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার বিষয়ে নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু স্পেন্‌সর, কোঁৎ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা স্বকীয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কেবল এই একই কারণে দেশাভিমানকেই নীতিদৃষ্টিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না; এবং তাঁহাদের প্রতিপাদিত তত্ত্বের উপর যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না তাহাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ তত্ত্বের উপরেই কেন খাটিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছেলে যখন ছোট থাকে তখন তাহার কাপড় তাহার শরীরের মাপে—বড় জোর, তাহার বাড়ের জন্য কিছু বাড়াইয়া রাখিয়া—যেরূপ ছাঁটিতে হয়, সেইরূপই সবভূতাত্মৈক্য বুদ্ধিরও কথা। সমাজই হউক বা ব্যক্তিই হউক, সর্ব্বাত্মৈক্যবুদ্ধিতে তাহার সম্মুখে যে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহা তাহার অধিকারের অনুরূপ, কিংবা তাহা অপেক্ষা অল্প অগ্রবর্ত্তী হইলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়; তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভাল বিষয় তাহাকে একেবারেই করিতে বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। পরব্রহ্মের কোন সীমা না থাকিলেও উপনিষদে তাঁহার উপাসনার উত্তরোত্তর উচ্চতর পৈঠা নির্দ্দেশ করিবার কারণই এই; যে সমাজে সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ, সেখান ক্ষাত্রধর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও জগতের অন্যান্য সমাজের তৎকালীন অবস্থা মনে করিয়া, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই তত্ত্বের উপরে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থায় ক্ষাত্রধর্ম্মের সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীকতত্ত্বজ্ঞ প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে যে সমাজব্যবস্থাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, নিত্যনিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা যুদ্ধকলায় প্রবীণ শ্রেণীকে সমাজরক্ষকের হিসাবে প্রমুখত্ব দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তত্ত্বজ্ঞানী লোক পরম শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেও তৎ-তৎকালীন অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিচার করিতেও তাঁহারা ভুলেন না।

উপরি-উক্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হয় যে, তিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে নির্বিষয় শান্ত, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর সম রাখেন; এই অবস্থা লাভ হইলে সাধারণ অজ্ঞানী লোকের বিষয়ে বিরক্ত হন না; নিজের সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া এই লোকদিগের বুদ্ধি বিগড়ান না; দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যাহার যেরূপ যোগ্য তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন; নিজের নিষ্কাম কর্ত্তব্যাচরণ দ্বারা সদ্ব্যবহারের যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া সকলকে আস্তে আস্তে যথাসম্ভব শান্তভাবে অথচ উৎসাহসহকারে উন্নতির পথে আনেন; ইহাই জ্ঞানীপুরুষদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম। সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া ভগবানও এই কাজই করিয়া থাকেন; এবং জ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধরিয়াই ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই জগতে আপন কর্ত্তব্য শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যথাশক্তি করিতে থাকা উচিত। সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রকার কর্ত্তব্যপালনে মৃত্যু ঘটিলেও তাহা অতি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে হইবে (গী. ৩. ৩৫), আপন কর্ত্তব্য অর্থাৎ ধর্ম্ম ছাড়িবে না। ইহাকেই লোকসংগ্রহ কিংবা কর্ম্মযোগ বলে। শুদ্ধ বেদান্ত নহে, তাহার ভিত্তি ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মাকর্ম্মের উপরোক্ত জ্ঞানও যখন গীতায় বলা হইয়াছে, তখনই তো প্রথমে যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে প্রস্তুত অর্জ্জুন পরে স্বধর্ম্ম অনুসারে ঘোর যুদ্ধ করিতে—শুদ্ধ ভগবান বলিয়াছেন বলিয়া নহে, প্রত্যুত স্বেচ্ছাক্রমে—প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের, সাম্যবুদ্ধির যে তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই তত্ত্বই

কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে পরাকাষ্ঠানীতিমত্তার উপপত্তি কিরূপে লাগ-সই হয় তাহা বলিয়াছি। আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে সমাজে পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে; 'যে যেমন তাহাকে তেমন' এই নীতিসূত্র অনুসারে কিংবা পাত্রাপাত্রতামূলে পরাকাষ্ঠানীতিধর্ম্মে কিরূপ প্রভেদ হয়, অথবা অপূর্ণাবস্থায় সমাজে ব্যবহারকালে সাধুপুরুষকেও অপবাদাত্মক নীতিধর্ম্মকে কেন স্বীকার করিতে হয়, ইত্যাদি কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ আমি এই প্রকরণে করিয়াছি। এই যুক্তিবাদেরই ন্যায়, পরোপকার, দান, দয়া, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি নিত্যধর্ম্মে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এখনকার অপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রসঙ্গানুসারে এই নীতি-ধর্ম্মের কি ভাবে কোন্ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক তাহা দেখাইবার জন্য এই ধর্ম্মসমূহের মধ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিলেও এই বিষয় শেষ হইবার নহে; এবং ভগবদ্‌গীতার মুখ্য উদ্দেশ্যও তাহা নহে। অহিংসা ও সত্য, সত্য ও আত্মসংরক্ষণ, আত্মসংরক্ষণ ও শান্তি ইত্যাদির মধ্যে পরস্পরবিরোধ ঘটিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয় প্রসঙ্গবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকরণেই তাহার আভাস দিয়াছি। এইরূপ প্রসঙ্গে সাধুপুরুষ "নীতিধর্ম্ম, লোকযাত্রাব্যবহার, স্বার্থ ও সর্ব্বভূতহিত" প্রভৃতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তাহার পর কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করিয়া থাকেন ইহা নির্ব্বিবাদ; মহাভারতে শ্যেন শিবিরাজাকে এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সিজবিক নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই অর্থই বিস্তারপূর্ব্বক অনেক উদাহরণ দিয়া বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থের সারাসার বিচার করাই নীতি-নির্ণয়ের তত্ত্ব, কিন্তু তাহা আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কখনই মান্য হয় নাই। কারণ আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, এই সারাসারবিচার অনেক সময় এত সূক্ষ্ম ও অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনেকগুলি অনুমান নিষ্পন্ন করে, যে, "যেমন আমি অন্যলোকও তেমনি" এই সাম্যবুদ্ধি প্রথম হইতেই মনে ষোল আনা মুদ্রিত না হইলে শুদ্ধ তার্কিক সারাসার-বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সর্ব্বদা অভ্রান্ত নির্ণয় হইতে পারে না; এবং তাহার পর, "ময়ূর নাচিতেছে বলিয়া মুর্গীও নাচিতেছে," এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ "দেখাদেখি সাধ যোগ, নাশে দেহ বাড়ে রোগ" এই প্রবাদ অনুসারে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং সমাজের হানি হইবে। মিল প্রভৃতি উপযুক্ততাবাদী পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের উপপাদনে ইহাই তো মুখ্য অপূর্ণতা আছে। গরুড় ছোঁ মারিয়া আপন থাবায় ভেড়াকে ধরিয়া উচ্চ আকাশে উঠাইয়া লইলে কাকও যদি সেইরূপ করিতে যায়, তবে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতেই হয়। এই জন্য গীতা বলিয়াছেন যে, সাধুপুরুষ-দিগের শুদ্ধ বাহ্য সাধনের উপর নির্ভর করিও না, অন্তঃকরণের সতত-জাগ্রত সাম্যবুদ্ধিকেই শেষে আশ্রয় করিতে হইবে; সাম্যবুদ্ধিই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রকৃত মূল। আধুনিক আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ স্বার্থকে কেহ বা পরার্থকে অর্থাৎ 'অধিক লোকের অধিক হিতকে" নীতির মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন। কিন্তু আমি চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, কর্ম্মের কেবল বাহ্য পরিণামে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করিলে সর্ব্বত্র কাজ চলে না; কর্ত্তার বুদ্ধি কতটা শুদ্ধ তাহারও বিচার অবশ্যই করিতে হয়। কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের সারাসার বিচার করা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার লক্ষণ বটে; কিন্তু দূরদর্শিতা ও নীতি এই দুই শব্দ সমানার্থক নহে। তাই, কেবল বাহ্য কর্ম্মের সারাসারবিচাররূপ এই নিছক

ব্যাপারী ক্রিয়ার মধ্যে সদাচরণের প্রকৃত বীজ নাই ; সাম্যবুদ্ধিরূপ **পরমার্থই** নীতির মূলভিত্তি, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। মনুষ্যের অর্থাৎ জীবাত্মার পূর্ণ অবস্থার উচিত বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। লোভবশতঃ কাহারও দ্রব্যাহরণ করিতে অনেক মানুষই খুব বুদ্ধির পরিচয় দেয় ; কিন্তু এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়, ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভের যোগ্য নিছক ব্রহ্মজ্ঞানকেই এই জগতে প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহই বলে না। যাহার মন কিংবা অন্তঃকরণ শুদ্ধ তাহাকেই উত্তম ব্যক্তি বলিতে হয়। এমন কি, যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল, নির্বৈর ও শুদ্ধ নহে সে যদি কেবল বাহ্য কর্ম্মের লোকদেখানো আচরণে নিমগ্ন হইয়া তদনুসারই চলে তবে সেই ব্যক্তির ভণ্ড হইয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপও বলিতে পারা যায় (গী. ৩. ৬. দেখ)। কর্ম্মযোগশাস্ত্রে সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়া মানিলে এই দোষ থাকে না। সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ মানিলে বলিতে হয় যে, বিশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ার্থ সাধুপুরুষদিগেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। কোন উৎকট রোগ হইলে বৈদ্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার নিদানও চিকিৎসা হওয়া যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংশয়ের উৎকট প্রসঙ্গে যদি কেহ সৎপুরুষের সাহায্য না লয়, এবং এই অভিমান রাখে যে আমি "অধিক লোকের অধিক হিত" এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধর্ম্মাধর্ম্মের অভ্রান্ত নির্ণয় করিয়া লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সাম্যবুদ্ধি বাড়াইবার অভ্যাস প্রত্যেকের করা উচিত ; এবং এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষ্যের বুদ্ধি যখন পূর্ণ সাম্যাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে তখনই সত্যযুগ আবির্ভূত হইয়া মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ হইবে কিংবা সকলেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্র এইজন্যই প্রবর্ত্তিতও হইয়াছে ; এবং সেইজন্য তাহার ইমারৎও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই খাড়া করিতে হইবে। কিন্তু এতটা তলাইয়া না দেখিয়া নীতিমত্তার শুদ্ধ লৌকিক কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতেই বিচার করিলেও গীতার সাম্যবুদ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কিংবা আধিদৈবত পন্থা অপেক্ষা অধিক যোগ্য ও মার্মিক বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই বিষয় পরে ১৫শ প্রকরণে কৃত তুলনাত্মক আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্যনিরূপণের একটা যে গুরুতর অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাই তৎপূর্ব্বে শেষ করিয়া ফেলিব।

ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ প্রকরণ

ভক্তিমার্গ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ * গীতা ১৮. ৬৬।

এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিয়াছি যে, সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিই কর্ম্মযোগের ও মোক্ষেরও মূল ; এই শুদ্ধ বুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এই শুদ্ধ বুদ্ধিরই দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজন্ম করিতে হইবে। কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না কারণ, যদিও ইহা নিঃসন্দেহ যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই কেবল সত্য ও চরম সাধ্য, এবং "তাহার সমান পবিত্র বস্তু জগতে আর কিছুই নাই" (গী. ৪ ৩৮) ; তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে সকলই বুদ্ধিগম্য। তাই সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্কা হয় যে তাহার পূর্ণ ধারণা করিবার মত তীব্র বুদ্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে ; এবং যদি কাহারও বুদ্ধি তীব্র না হয়, তবে সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হাত হইতে ঝাড়িয়া বসিবে ? সত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে হয় না। যদি কেহ বলে—"বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরূপাত্মক মায়ায় আচ্ছন্ন তোমার সেই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় 'নেতি নেতি' বলিয়া ঢোক্ গিলিতে থাকেন তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক কি প্রকারে পরব্রহ্মকে জানিবে ? এইজন্য, তোমার এই গহন ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের স্বল্প ধারণাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে আসিতে পারে এরূপ কোন সুলভ বিধি কিংবা মার্গ যদি থাকে ত বলো" ;—তাহাতে তাহার দোষ কি ? আশ্চর্য্য হইয়া আত্মার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) বক্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও তাঁহার জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহা গীতায় এবং কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (গী. ২. ২৯ ; কঠ. ২. ৭)। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগ্রন্থে এক বোধপ্রদ কথাও প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথার মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, যখন বাষ্কলি বাহ্বকে বলিলেন যে, "ভগবন্ ব্রহ্ম কি, আমাকে কৃপা করিয়া বলুন", তখন বাহ্ব কিছুই বলিলেন না। বাষ্কলি আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তবুও বাহ্ব নীরব ! এইরূপ চারি পাঁচবার হইলে পর শেষে বাহ্ব বাষ্কলিকে বলিলেন "বাপু ! তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি সেই অবধিই দিয়া আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পার নাই—আমি কি করিব ? ব্রহ্মস্বরূপ কোন প্রকারেই বলা যায় না ; অতএব শান্তভাবে থাকা অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকাই প্রকৃত ব্রহ্মলক্ষণ ! বুঝিলে" ? (বেসূ. শাং ভা. ৩. ২. ১৭)। সারকথা, —মুখ বুঁজিয়া থাকিলেও যাঁহার বিষয়ে বলা যায়, চক্ষুর প্রত্যক্ষ না করাইলেও যাঁহাকে দেখা যায়, এবং জ্ঞানগম্য না হইলেও যাঁহাকে জানা যায় (কেন. ২. ১১), এইরূপ এই দৃশ্যজগৎ হইতে ভিন্ন অনির্ব্বাচ্য ও অচিন্ত্য যে পরব্রহ্মের বর্ণনা আছে, তাঁহাকে সাধারণ বুদ্ধির মনুষ্য উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে, এবং তাঁহা দ্বারা সাম্যাবস্থা

* "সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির সাধন ছাড়িয়া একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" এই শ্লোকের অর্থের ব্যাখ্যা এই প্রকরণের শেষে করা হইয়াছে—তাহা দেখুন।

প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিরূপে সদ্গতি লাভ হইবে? সচরাচর জগতের একই আত্মা, এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের অনুভবাত্মক ও যথার্থজ্ঞান হইলেই মনুষ্যের পূর্ণ উন্নতি হইবে; এবং যদি এই উন্নতিসাধনকল্পে তীব্র বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন মার্গই না থাকে, তবে জগতের লক্ষ কোটী মনুষ্যকে ব্রহ্মলাভের আশা ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! কারণ, বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রায় অল্পই থাকে। বুদ্ধিমান পুরুষ যাহা বলেন, তাহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিলেই চলিবে যদি বলেন, তবে তাঁহাদের মধ্যের অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাজ চলিয়া যায় যদি বলেন, তবে এই গহন জ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষে 'বিশ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা রাখা'ও বুদ্ধির অতিরিক্ত অন্য কোন মার্গ এই কথা উহা হইতে আপনিই সিদ্ধ হইতেছে। সত্য জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অথবা ফলদাতৃত্ব শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় না। সমস্ত জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন মনোবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক হয় না, ইহা কেবল তর্কপ্রধান শাস্ত্রের আজন্ম অধ্যয়নজনিত কর্কশবুদ্ধি পণ্ডিতদিগের বৃথাভিমান মাত্র। উদাহরণার্থ এই সিদ্ধান্ত ধর যে, কাল সকালে সূর্য্য পুনর্ব্বার উদয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে আমরা অত্যন্ত নিশ্চিত মানি। কেন? উত্তর ইহাই যে, আমরা ও আমাদের পূর্ব্বজেরা এই ক্রমকে সর্ব্বদা অবাধিত দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, 'আমি ও আমার পিতৃপিতামহেরা এখন পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে সূর্য্যোদয় দেখিয়া আসিয়াছেন' ইহা কাল সকালে সূর্য্যোদয় হইবার কারণ কখনই হইতে পারে না; কিংবা রোজ আমার দেখিবার নিমিত্ত অথবা তোমার দেখার দরুণই কিছু সূর্য্য উদিত হয় না; প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যোদয়ের আরও কোন কারণ আছে। ভাল, এখন যদি 'আমার সূর্য্যকে রোজ দেখা' কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের কারণ না হয়, তাহা হইলে কাল সূর্য্যোদয় যে হইবে তহার প্রমাণ কি? দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুর ক্রম একই প্রকার অবাধিত আছে দেখিতে পাইলে ঐ ক্রম পরেও ঐ প্রকারই নিত্য চলিতে থাকিবে মনে করাও একপ্রকার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই। আমি যদিও তাহার 'অনুমান' এইরূপ একটা অনেক বড় প্রসিদ্ধ নাম দিয়াছি, তবু এই অনুমান বুদ্ধিগম্য কার্য্যকারণাত্মক নহে, কিন্তু উহার মূল স্বরূপ শ্রদ্ধাত্মকই তাহা মনে রাখা আবশ্যক। চিনি রামের মিষ্টি লাগিতেছে বলিয়া শ্যামেরও তাহা মিষ্ট লাগিবে, এই যে নিশ্চয় আমরা করিয়া থাকি, তাহাও আসলে এই ধরণের; কারণ, যখন কেহ বলে যে, চিনি আমার মিষ্ট লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের অনুভব তাহার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ হয় সত্য, কিন্তু তাহারও বাহিরে গিয়া সমস্ত মানুষেরই চিনি মিষ্ট লাগে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন বুদ্ধির সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ না হইলে কাজ চলে না। রেখাগণিত বা ভূমিতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন দুই রেখা হইতে পারে, যাহাদিগকে যতই বাড়াও না কেন তবু তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে না। ভূমিতিশাস্ত্রের এই তত্ত্বকে নিজের ধ্যানে আনিবার জন্য আমাকে কেবল শ্রদ্ধার দ্বারাই প্রত্যক্ষ অনুভবকেও যে ছাড়াইয়া যাইতে হয় তাহা বলিতে হইবে না। তাছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার শ্রদ্ধাপ্রেমাদি নৈসর্গিক মনোবৃত্তির দ্বারাই চলিয়া থাকে; এই বৃত্তিসকলকে আটকানো ছাড়া বুদ্ধি আর কোন কাজ করে না, এবং বুদ্ধি কোন বিষয়ের ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত করিলে পর, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কাজ মনের দ্বারা অর্থাৎ মনোবৃত্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারেই বলা হইয়াছে। সার কথা এই যে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য এবং পরে আচরণে ও কার্য্যে তাহার ফলদ্রূপতা সম্পাদনের জন্য এই জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধা-দয়া-বাৎসল্য-কর্ত্তব্য-প্রেম ইত্যাদি নৈসর্গিক মনোবৃত্তির

অপেক্ষায় থাকিতে হয়; এবং যে জ্ঞান এই মনোবৃত্তিসমূহকে শুদ্ধ ও জাগ্রত করে না, এবং যে জ্ঞান তাহাদের সাহায্যের অপেক্ষা রাখেনা, তাহা শুষ্ক, অপূর্ণ, কর্কশ, মিথ্যা, অকেজো' ও কাঁচা জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বারুদ ব্যতীত কেবল গুলির দ্বারা যেরূপ বন্দুক ছোঁড়া যায় না, সেইরূপ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনোবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। উদাহরণার্থ ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত এই কথা ধর (ছাং ৬, ১২):—অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মই সমস্ত দৃশ্য জগতের মূল কারণ, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য একদিন শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন যে, বটগাছের এক ফল আন এবং তাহাতে কি আছে দেখ। শ্বেতকেতু সেই ফল ভাঙ্গিয়া দেখিয়া 'ভিতরে ক্ষুদ্র অনেক বীজ বা দানা আছে' বলিলেন। তাঁহার পিতা উহাদের মধ্য হইতে একটা বীজ লও এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দেখিয়া বল যে উহাতে কি আছে' এইরূপ আবার বলিলেন। শ্বেতকেতু এক বীজ ভাঙ্গিয়া 'এখন কিছুই দেখিতেছি না', এই উত্তর দিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন—"বাপু! এই যে তুমি 'কিছুই দেখিতেছি না' বলিতেছ, তাহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বটগাছ হইয়াছে"; এবং শেষে এই উপদেশ দিলেন যে, 'শ্রদ্ধৎস্ব'—ইহার উপর বিশ্বাস রাখো—অর্থাৎ কোন কল্পনা শুধু বুদ্ধিতে রাখিয়া কেবল মুখে 'হাঁ' না বলিয়া তাহার বাহিরেও চল অর্থাৎ এই তত্ত্বকে নিজের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া আচরণে বা কার্য্যে পরিণত কর। সারকথা, সূর্য্য কাল সকালে উদয় হইবে এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইবার জন্যও যদি শেষে শ্রদ্ধা আবশ্যক হয়, তবে ইহাও নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, সমস্ত জগতের মূলীভূত মূলতত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও চৈতন্যরূপ, ইহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রথমে আমাদিগের যতটা সম্ভব বুদ্ধিরূপ বটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু পরে তাহার অনুরোধক্রমে কতকদূর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। দেখ, আমি যাহাকে মা বলিয়া দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ও পূজনীয় মনে করি তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, কিংবা নৈয়ায়িকদিগের শাস্ত্রীয় শব্দাড়ম্বর অনুসারে "গর্ভধারণপ্রসবাদিস্ত্রীত্বসামান্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিবিশেষঃ" মনে করিয়া থাকে। এই এক ক্ষুদ্র ব্যবহারিক উদাহরণ হইতে, শুধু তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করিলে তাহাতে কি প্রভেদ হয়, তাহা যে কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে। এই কারণেই কর্ম্মযোগীদিগের মধ্যেও শ্রদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৬ ৪৭); এবং "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ চিন্তয়েৎ"—ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা যায় না তাহার স্বরূপের নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা করিতে বসিবে না—এইরূপ পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রেও করা হইয়াছে।

যদি ইহাই এক বাধা হয় যে, নির্গুণ পরব্রহ্মকে জানা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কঠিন, তবে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে। কারণ, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে অধিক বিশ্বসনীয় হইবে তাহারই বচনের উপর শ্রদ্ধা রাখিলেই আমার কাজ চলিবে (গী. ১৩. ২৫)। তর্কশাস্ত্রে এই মার্গকে "আপ্তবচনপ্রমাণ', বলে। 'আপ্ত' অর্থ বিশ্বসনীয় পুরুষ। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার লোক আপ্তবাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আপন ব্যবহার চালাইয়া থাকে। দুই পাঁচে দশের বদলে সাত কেন হয় না, কিংবা একের পর আর একটী একের অঙ্ক বসাইলে দুই না হইয়া এগারো কেন হয়, ইহার উপপত্তি কিংবা কারণ বলিতে পারে এরূপ ব্যক্তি খুবই কম। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার

সহিত সত্য মনে করিয়াই জগতের ব্যবহার চলিতেছে। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতা পাঁচ মাইল কি দশ মাইল—ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি হিমালয়ের উচ্চতা কত, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে; স্কুলের ভূগোল পুস্তকে পঠিত "তেইশ হাজার ফুট" এই অঙ্ক আমাদের মুখ হইতে চট্ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে! সেইরূপ কেহ 'ব্রহ্ম কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 'নির্গুণ' এই উত্তর দিতে বাধা কি? ব্রহ্ম সত্যসত্যই নির্গুণ কি না, তাহার সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাধকবাধক প্রমাণের মীমাংসা করিবার মত সাধারণ লোকের বুদ্ধি না থাকিলেও, শ্রদ্ধারূপ মনোধর্ম্মটি এরূপ নহে যে, তাহা কেবল মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিতেই পাওয়া যায়। নিতান্ত অজ্ঞান মনুষ্যেরও শ্রদ্ধার অভাব হয় না। এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই যখন তাহারা একশো সাংসারিক ব্যবহার করে, তখন সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্গুণ মানিয়া লইবার পক্ষে কোনই প্রত্যবায় দেখা যায় না। মোক্ষধর্ম্মের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানীপুরুষ ব্রহ্মস্বরূপের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম নির্গুণ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই, মনুষ্য কেবল আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন-এক অনাদ্যন্ত, অমৃত, স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব আছে; এবং মনুষ্য সেই সময় অবধি কোন না-কোন আকারে উপাসনা করিয়া আসিতেছে। এই জ্ঞানের উপপত্তি সেই সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রেও প্রথমে অনুভব তাহার পর তাহার উপপত্তি—এই ক্রমই দেখা যায়। উদাহরণ যথা—ভাস্করাচার্য্যের মনে পৃথিবীর (কিংবা শেষে নিউটনের মনে সমস্ত বিশ্বের) গুরুত্বাকর্ষণের কল্পনা আসিবার পূর্ব্বেই গাছের ফল নীচে পৃথিবীর উপরে পড়ে, এই কথা অনাদিকাল হইতে সকলেরই জানা ছিল। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এই নিয়মসূত্রের প্রয়োগ হয়। শ্রদ্ধার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ছাঁকিয়া তাহার উপপত্তির খোঁজ করা বুদ্ধির কাজ সত্য; কিন্তু সম্যগ্‌রূপে যোগ্য উপপত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র, এ কথা বলা যায় না।

যাক্। ব্রহ্ম নির্গুণ ইহা বুঝিলেই যদি আমার কাজ চলিয়া যায় তবে উপরিউক্ত অনুসারে এই কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই (গী. ১৩. ২৫)। কিন্তু নবম প্রকরণের শেষে বলিয়াছি যে, এই জগতে ব্রাহ্মী স্থিতি কিংবা সিদ্ধাবস্থাই মনুষ্যের পরম সাধ্য বা অন্তিম ধ্যেয় এবং তাহা পাইতে হইলে ব্রহ্ম নির্গুণ এই শুষ্কজ্ঞানে কাজ চলে না। দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা ও নিত্য সাধনের দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া চাই এবং আচরণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবুদ্ধিরই দেহস্বভাব হইয়া যাওয়া চাই; এইরূপ হইতে হইলে পরমেশ্বর-স্বরূপকে প্রীতিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া মনকে তদাকারে পরিণত করাই এক সুলভ মার্গ। এই মার্গ কিংবা সাধন আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; ইহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে। "সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে" —ঈশ্বরের প্রতি পরা অর্থাৎ নিরতিশয় যে প্রীতি তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তির এই লক্ষণ শাণ্ডিল্যসূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. সূ. ২)। পরা অর্থে কেবল নিরতিশয়ই নহে; কিন্তু ভাগবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে সেই প্রেম অহেতুক, নিষ্কাম ও নিরন্তর হওয়া চাই—"অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" (ভাগ. ৩. ২৯. ১২)। কারণ, "হে পরমেশ্বর, আমাকে অমুক দাও"—ভক্তি যখন এই প্রকার সহেতুক হইয়া থাকে, তখন বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের ন্যায় তাহাও কতকটা ব্যাপারের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভক্তি হিসাবী অর্থাৎ রাজসিক উক্ত হয়, এবং তাহার দ্বারা

চিত্তশুদ্ধি পুরাপুরি হয় না। চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও যে বাধা আসিবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। অধ্যাত্মশাস্ত্রের পূর্ণ নিষ্কামত্বের তত্ত্ব ভক্তিমার্গেও এইরূপ বজায় থাকে বলিয়া গীতায় ভগবদ্‌ভক্তের চারি বর্গ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'অর্থার্থী' অর্থাৎ কোন হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে যে ভক্তি করে এইরূপ ভক্ত নীচের পৈঠার; এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে যে 'জ্ঞানী' পুরুষ স্বয়ং নিজের জন্য কিছু অর্জ্জন করিবার ইচ্ছা না রাখিয়া (গী. ৩. ১৮) নারদাদির ন্যায় কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই পরমেশ্বরকে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. ১৬—১৮)। এই ভক্তি ভাগবত পুরাণ অনুসারে নয় প্রকার (ভাগবত ৭, ৫, ২৩), যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং:সখ্যং আত্মনিবেদনম্॥

নারদের ভক্তিসূত্রে ভক্তিরই একাদশ ভেদ করা হইয়াছে (না. সূ. ৮২)। কিন্তু ভক্তির এই সমস্ত প্রকার-ভেদ মারাঠী দাসবোধ প্রভৃতি অনেক ভাষাগ্রন্থে বিস্তৃতরূপে নিরূপিত হওয়ায় আমি তৎসম্বন্ধে এখানে বিশেষরূপে আলোচনা করিব না। ভক্তি যে প্রকারেরই হউক না কেন, পরমেশ্বরের উপর নিরতিশয় ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়া স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পরিণত করা, ভক্তির এই যে সাধারণ কাজ, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে হইবে, ইহা সুস্পষ্ট। ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধিনামক অন্তরিন্দ্রিয় কেবল ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিংবা কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করা ব্যতীত আর কিছু করে না; বাকী সমস্ত মানসিক কাজ মনকেই করিতে হয়। অর্থাৎ এক্ষণে মনেরই দুই ভেদ হইতেছে—এক, যে মন ভক্তি করে এবং দ্বিতীয় তাহার উপাস্য অর্থাৎ যাহার উপর প্রেম স্থাপন করিতে হইবে সেই বস্তু। উপনিষদে যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অনন্ত, নির্গুণ ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' হওয়ায়, সেই স্বরূপ হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে না. কারণ, যখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয় তখ মন স্বতন্ত্র থাক না কিন্তু উপাস্য ও উপাসক কিংবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দুই-ই একরূপ হইয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম চরম সাধ্য বস্তু, সাধন নহে; এবং কোন কোন প্রকারে সাধনের দ্বারা যে পর্য্যন্ত নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একাকার হইবার যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সাধন হিসাবে যে উপাসনা করিতে হয় তাহার জন্য যে ব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক এই ভেদের দ্বারা মনের গোচর হয়, অর্থাৎ সগুণই হয়; এবং সেই জন্য উপনিষদে যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে সেখানে উপাস্য ব্রহ্ম অব্যক্ত হইলেও সগুণরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। উদাহরণ যথা,—শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্ম অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছা, ৩. ১৪) যে, তিনি প্রাণশরীর, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বকর্ম্ম, অর্থাৎ মনের গোচর সমস্তর গুণের দ্বারাই যুক্ত। মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে সগুণ হইলেও অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার। কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক গঠন এরূপ যে,

সগুণ বস্তুর মধ্যেও যে বস্তু অব্যক্ত অর্থাৎ কোন প্রকার বিশিষ্ট আকার প্রভৃতি না থাকায় যাহা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার উপর প্রেম স্থাপন করা অথবা তাহার নিত্য চিন্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে স্থির রাখিয়া বৃত্তিকে তদাকার করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এমন কি দুঃসাধ্য। কারণ, মন স্বভাবতই চঞ্চল হওয়ায় ইন্দ্রিয়গোচর কোন স্থির বস্তু আধাররূপে মনের সম্মুখে না থাকিলে কাহাতে স্থির রাখিবে তাহাই মন পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যায়। চিত্তস্থৈর্য্যের এই মানসিক কর্ম্ম বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরও দুষ্কর মনে হয়, সাধারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাক্। তাই, ভূমিতিশাস্ত্র শিখাইবার সময় যেরূপ অনাদি, অনন্ত ও বিস্তৃতিহীন (অবক্ত) কিন্তু যাহা দৈর্ঘ্য গুণ থাকায় সগুণ, এইরূপ রেখার কল্পনা মনে আনিতে হইলে সেই রেখার একটি ছোট টুক্‌রা নমুনাস্বরূপ শ্লেটের উপর কিংবা কাষ্ঠফলকের উপর আঁকিয়া দেখাইতে হয়, সেইরূপ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ (সুতরাং সগুণ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপর প্রেম স্থাপন করিয়া তাঁহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের সম্মুখে কোনপ্রকার 'প্রত্যক্ষ' নামরূপাত্মক বস্তু না থাকিলে সাধারণ লোকদিগের কাজ চলিতে পারে না।* এমন কি, প্রথমে কোন প্রকার ব্যক্ত বস্তু না দেখিলে অব্যক্তের কল্পনাই মনুষ্যের মনে জাগ্রত হইতে পারে না। উদাহরণ যথা—লাল, সবুজ ইত্যাদি ব্যক্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও অব্যক্ত কল্পনা মনুষ্যের মনে জাগ্রত হয়; নতুবা রঙের এই অব্যক্ত কল্পনা হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে মানব-মনের স্বভাবই বলুন কিংবা দোষই বলুন; যাহাই বলুন না কেন, মনের এই স্বভাব যে পর্য্যন্ত দেহধারী মনুষ্য বাহির করিয়া ফেলিতে না পারে সে পর্য্যন্ত উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভক্তির জন্য নির্গুণ হইতে সগুণে—এবং তাহাতেও অব্যক্ত সগুণাপেক্ষা ব্যক্ত সগুণেই আসা ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যক্তোপসনার মার্গ অনাদি কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, রামতাপনীয়াদি উপনিষদে মনুষ্যরূপ-ধারী ব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে —

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

"অব্যক্তের উপর চিত্তের (মনের) একাগ্রতা যে করে তাহার অনেক কষ্ট হয়; কারণ, দেহেন্দ্রিয়ধারী মনুষ্যের এই অব্যক্তগতি লাভ করা স্বভাবতই কষ্টকর" (গী. ১২. ৫)। এই 'প্রত্যক্ষ' মার্গকেই 'ভক্তিমার্গ' বলে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া পরব্রহ্মের অব্যক্তস্বরূপে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের মনকে স্থির করিতে পারে। কিন্তু

* এই বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠের বলিয়া প্রসিদ্ধ এক শ্লোকে বলা হইয়া থাকে,—

অক্ষরাবগমলব্ধয়ে যথা স্থূলবর্ত্তুলদৃষৎপরিগ্রহঃ।
শুদ্ধবুদ্ধপরিলব্ধয়ে তথা দারুমৃন্ময়শিলাময়ার্চ্চনম্ ॥

"অক্ষর পরিচয়ের জন্য ছোট ছেলেদের সম্মুখে যেরূপ স্থূল কাষ্ঠবর্ত্তুল সাজাইয়া অক্ষরের আকার দেখান হয় সেইরূপ (নিত্য) শুদ্ধ বুদ্ধ পরব্রহ্মের জ্ঞান সম্পাদনের জন্য, মাটি কিংবা কাষ্ঠ বা প্রস্তরের মূর্ত্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে"। কিন্তু এই শ্লোক বৃহৎ যোগবাসিষ্ঠে পাওয়া যায় না।

এই প্রণালীতে অব্যক্তের উপর 'মন'কে আসক্ত করিবার কাজও তো শেষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হয়, তাই এই মার্গেও শ্রদ্ধা ও প্রেমের আবশ্যকতা চলিয়া যায় না। সত্য বলিলে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে প্রেমমূলক ভক্তিমার্গের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপাসনারও সমাবেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রহ্মস্বরূপ কেবল অব্যক্ত ও বুদ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া এই ক্রিয়ার 'ভক্তিমার্গ' নাম না দিয়া ইহাকে অধ্যাত্মবিচার, অব্যক্তোপাসনা কিংবা শুদ্ধ উপাসনা, অথবা জ্ঞানমার্গ বলিবার রীতি আছে। এবং উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ হইলেও তাঁহার অব্যক্তের বদলে ব্যক্ত—এবং বিশেষ ভাবে মনুষ্য-দেহধারী—রূপ স্বীকার করিলে তাহাকে ভক্তিমার্গ বলা হয়। এই প্রকারে মার্গ দুই হইলেও ঐ দুইয়েতে একই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয় এবং শেষে একই সাম্যবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হয়; তাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির ন্যায় প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে এই দুই (জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ) অনাদিসিদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ রহিয়াছে; এই মার্গের ভিন্নতার কারণে চরম সাধ্য অথবা ধ্যেয় বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না। তন্মধ্যে একটি সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীয়টির প্রথম ধাপ শ্রদ্ধা ও প্রেম; এবং যে সোপান দিয়াই উঠ না কেন, শেষে একই পরমেশ্বরের একই প্রকার জ্ঞান হয় এবং একই প্রকার মোক্ষও লাভ হয়। তাই, "অনুভাবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ নাই" এই সিদ্ধান্তই দুই মার্গে সমানই বজায় থাকে। তার পর জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ বা ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ, এই বৃথা বিবাদ করিয়া লাভ কি? এই দুই সাধন প্রথম অবস্থায় অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পরিণামরূপে একই যোগ্যতাবিশিষ্ট; এবং গীতায় উভয়েরই 'অধ্যাত্ম' এই নাম দেওয়া হইয়াছে (গী. ১১. ১.)। এখন সাধন হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই যদিও একই যোগ্যতার হয়, তবু এই দুয়ের মধ্যে গুরুতর ভেদ এই যে, ভক্তি কখনও নিষ্ঠা হয় না, কিন্তু জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। অধ্যাত্মবিচার কিংবা অব্যক্তোপাসনা দ্বারা পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় তাহাই ভক্তির দ্বারাও হইতে পারে (গী. ১৮. ৫৫.) ইহা সত্য; কিন্তু এই জ্ঞান হইলে পর যদি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে, তবে গীতা অনুসারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ' বলিতে হইবে, 'ভক্তিনিষ্ঠ' নহে। কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তির ক্রিয়া বজায় থাকে সে পর্য্যন্ত উপাস্য-উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে; এবং চরম ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় তো শুদ্ধ ভক্তি কেন, অন্য কোন প্রকারের উপাসনাই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির পর্য্যবসান বা ফল জ্ঞান; ভক্তি উহার সাধন মাত্র,—উহা কিছু চরম সাধ্য বস্তু নহে। সার কথা, অব্যক্তোপাসনার দৃষ্টিতে জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, আবার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অপরোক্ষানুভবের দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই ভেদ স্পষ্টরূপে দেখানো যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্গ' ও 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এই দুই শব্দ সমানার্থে ব্যবহার না করিয়া অব্যক্তোপাসনার সাধনাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞানমার্গ' শব্দের এবং জ্ঞানলাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই নিমগ্ন থাকিবার সিদ্ধাবস্থায় স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞাননিষ্ঠা' শব্দের উপযোগ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ অব্যক্তোপাসনা কিংবা অধ্যাত্মবিচার অর্থে জ্ঞানকে একবার সাধন

(জ্ঞানমার্গ) আবার অপরোক্ষানুভব অর্থে তাহাকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগরূপ চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের সম্বন্ধেও এই একই কথা। শাস্ত্রোক্ত সীমা অনুসারে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা সাধনমাত্র। এই কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে জ্ঞান ও শান্তি লাভ করা যায়; কিন্তু পরে এই জ্ঞানেতেই নিমগ্ন না হইয়া শান্তভাবে আমরণ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টিতে উহার এই কর্ম্মকে নিষ্ঠা বলা যাইতে পারে (গী. ৩. ৩)। এই কথা ভক্তির বিষয়ে বলা যায় না; কারণ ভক্তি শুদ্ধ এক মার্গ বা উপায় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনমাত্র—উহা নিষ্ঠা নহে। তাই, গীতার আরম্ভে জ্ঞান (সাংখ্য) ও যোগ (কর্ম্ম) এইরূপ দুই নিষ্ঠারই উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠার সিদ্ধির উপায়, সাধন, বিধি কিংবা মার্গের বিচার করিবার সময় (গী. ৭. ১), অব্যক্তোপাসনা (জ্ঞানমার্গ) এবং ব্যক্তোপাসনার (ভক্তিমার্গ)—অর্থাৎ যে দুই সাধন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাহার—বর্ণনা করিয়া গীতায় কেবল এইটুকু বলা হইয়াছে যে এই দুয়ের মধ্যে অব্যক্তোপাসনা অনেক ক্লেশময় এবং ব্যক্তোপাসনা কিংবা ভক্তি অধিক সুলভ, অর্থাৎ এই সাধন সকলের সাধ্যায়ত্ত—কিংবা "ভুজহবাবা আছে হেবা তরি হা সুলভ উপায়"—হে দেব তোমাকে পাইবার এই সুলভ উপায়—(গা. ৩০০২)। প্রাচীন উপনিষদে জ্ঞানমার্গেরই বিচার করা হইয়াছে এবং শাণ্ডিল্যাদি সূত্রে, এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তিমার্গেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধন-দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের যোগ্যতানুসারে ভেদ দেখাইয়া, শেষে দুয়েরই নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত মিল স্থাপনের কাজ গীতার ন্যায় সমবুদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

'সর্ব্বভূতে একই পরমেশ্বর' ঈশ্বরস্বরূপের এই যথার্থ ও অনুভবাত্মক জ্ঞান পাইতে হইলে, দেহেন্দ্রিয়ধারী মনুষ্যের কি করা আবশ্যক? উপরি-উক্ত অনুসারে এই প্রশ্নের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ অনাদি অনন্ত অচিন্ত্য ও 'নেতি নেতি' হইলেও উহা নির্গুণ, অজ্ঞেয় ও অব্যক্তও বটে; এবং যখন উহার অনুভব হয় তখন উপাস্য ও উপাসক এই দুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, উহা হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে না। উহা তো কেবল চরম সাধ্য—সাধন নহে; এবং তদাকার হইবার যে অদ্বৈত অবস্থা তাহা লাভ করিবার কেবল এক সাধন বা উপায় উপাসনা। তাই এই উপাসনার জন্য যে বস্তু স্বীকার করিতে হয় তাহার সগুণই হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু উহা কেবল বুদ্ধিগম্য ও অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়া প্রযুক্ত উহার উপাসনা ক্লেশময় হইয়া থাকে। এইজন্য পরমেশ্বরের এই দুই স্বরূপ অপেক্ষা যে পরমেশ্বর অচিন্ত্য, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান জগদাত্মা হইয়াও আমাদের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিবেন, আমাদের উপর মমতা করিবেন, আমাদিগকে সৎ মার্গে আনিয়া সদ্গতি দিবেন, যাঁহাকে আমরা 'আপনার' বলিতে পারি, আমাদের সুখদুঃখের সহিত যাঁহার সহানুভূতি হইবে কিংবা যিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যাঁহার সহিত আমাদিগের 'আমি তোমার এবং তুমি আমার' এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে যিনি, আমাকে পিতার ন্যায় লক্ষ্য করিবেন এবং মাতার ন্যায় ভালবাসিবেন;

অথবা যিনি 'গতির্ভর্ত্তা প্রভু, আমার সাক্ষী, আমার শরণ ও সুহৃদ;—এবং এইরূপ বলিয়া সন্তানের ন্যায় আমি যাঁহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিব, এইরূপ সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, পরম পবিত্র পরমোদার, পরমকারুণিক, পরমপূজ্য, সর্ব্বসুন্দর, সকল-গুণনিধন, কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে প্রাণপ্রিয় সগুণ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপধারী সুলভ পরমেশ্বরকেই 'ভক্তির জন্য' সকল মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বীকার করে, ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মেই দেখা যায়। যে পরব্রহ্ম মূলে অচিন্ত্য ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাঁহার উক্ত প্রকার অন্তিম দুই স্বরূপকেই (অর্থাৎ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনোময় নেত্রের দ্বারা মনুষ্যের গোচর স্বরূপকেই) বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় 'ঈশ্বর' বলা হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও সীমাবদ্ধ হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সাধু তুকারাম এক কবিতায় দিয়াছেন—

হরি তুকা ক্ষণে অবঘা একলা।
পরি হা ধাকুলা ভক্তী সাঠী" ॥

অর্থাৎ—তুকা বলে, হরি সর্ব্বত্র এক, কিন্তু ভক্তের জন্যই ছোট হন (গা. ৩৮ ৭)। বেদান্তসূত্রেও এই সিদ্ধান্তই প্রদত্ত হইয়াছে (১. ২. ৭)। উপনিষদেও যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার বর্ণনা আছে সেই সেইখানে প্রাণ, মন ইত্যাদি সগুণ ও কেবল অব্যক্ত বস্তুসমূহেরই নির্দ্দেশ না করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্য (আদিত্য), অন্ন ইত্যাদি সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থেরও উপাসনা কথিত হইয়াছে (তৈ. ৩, ৩-৬ ; ছাং ৭)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আবার "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বে. ৪. ১০) —প্রকৃতিরই নাম মায়া এবং এই মায়ার যে অধিপতি তিনিই মহেশ্বর—'ঈশ্বরের' এইরূপ লক্ষণ বলিয়া তাহার পর "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—এই দেবতাকে জানিলে সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (৪. ১৬), এইরূপ গীতারই ন্যায় (গী. ১০. ৩) সগুণ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই যে নামরূপাত্মক বস্তু উপাস্য পরব্রহ্মের চিহ্ন, পরিচয় অবতার, অংশ কিংবা প্রতিনিধিরূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, উহাকেই বেদান্তশাস্ত্রে 'প্রতীক' বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক) শব্দের ধাত্বর্থ এই—প্রতি আপনার দিকে, ইক=ঝোঁকা ; কোন বস্তুর যে পার্শ্বটা প্রথমে আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্শ্বকে কিংবা সেই ভাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন, ভাগ, বা অংশরূপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। উদাহরণ যথা—মহাভারতে ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে, ব্যাধ ব্রাহ্মণকে প্রথমে অনেক অধ্যাত্মজ্ঞান বলিবার পর, শেষে "প্রত্যক্ষং মম যো ধর্ম্মস্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম" (বন. ২১৩. ৩)—এই কথা বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে ব্যাধ আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—ইঁহারই আমার 'প্রত্যক্ষ দেবতা' এবং এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ইহাদের সেবা করাই আমার 'প্রত্যক্ষ' ধর্ম্ম। এই অভিপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, নিজের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার কথা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ এই মার্গ "সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ও গুহ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য) ; ইহা উত্তম, পবিত্র, প্রত্যক্ষগম্য, ধর্ম্মানুকূল, সুখসাধ্য ও অক্ষয়" (গী. ৯. ২)। এই শ্লোকে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য এই দুইটি সামাসিক শব্দ আছে ; ইহাদের বিগ্রহ এই— 'বিদ্যানাং রাজা' ও 'গুহ্যানাং রাজা' (বিদ্যাদিগের রাজা ও গুহ্যদিগের রাজা) ; এবং যখন সমাস হইল তখন সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'রাজ' শব্দ প্রথমে আসিল। কিন্তু ইহার বদলে 'রাজ্ঞাং বিদ্যা (রাজাদিগের বিদ্যা) এইরূপ বিগ্রহ করিয়া কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, যোগবাসিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে (যো. ২. ১১, ১৬-১৮) প্রাচীনকালে ঋষিরা রাজাদিগকে যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রহ্মবিদ্যা কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞানকেই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য বলা হইত, তাই এই দুই শব্দের দ্বারা গীতাতেও ঐ অর্থই অধ্যাত্মজ্ঞান—ভক্তি নহে—বিবক্ষিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। গীতার উপদিষ্ট মার্গও মনু, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজপরম্পরাক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (গী. ৪. ১) ; তাই, রাজবিদ্যা' ও 'রাজগুহ্য, এই দুই শব্দ 'রাজাদিগের বিদ্যা' ও 'রাজাদিগের গুহ্য' অর্থাৎ রাজমান্য বিদ্যা ও গুহ্য এই অর্থে গীতায় প্রযুক্ত হয় নাই এরূপ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলেও এই স্থলে এই শব্দ জ্ঞানমার্গের বর্ণনায় প্রযুক্ত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, গীতার যে অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আসিয়াছে উহাতে ভক্তিমার্গই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে (গী. ৯. ২২-৩১ দেখ) ; এবং চরম সাধ্য ব্রহ্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাত্মবিদার সাধনাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল 'বুদ্ধিগম্য' অতএব 'অব্যক্ত' ও 'দুঃখকারক' বলিয়া কথিত হইয়াছে (গী. ১২. ৫) ; এই অবস্থায় ইহা অসম্ভব মনে হয় যে, ভগবান্ এক্ষণে ঐ জ্ঞানমার্গকেই 'প্রত্যক্ষাবগমং অর্থাৎ ব্যক্ত, ও 'কর্তুং সুসুখং' অর্থাৎ সুখসাধ্য বলিবেন। তাই প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গেরই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত 'প্রত্যক্ষাবগমং' ও 'কর্তুং সুসুখং এই পদদ্বয়ের উপযোগিতার কারণে—অর্থাৎ এই দুই কারণে – রাজবিদ্যা শব্দে ভক্তিমার্গই এই শ্লোকে বিবক্ষিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। 'বিদ্যা' শব্দ কেবল ব্রাহ্মজ্ঞানবাচক নহে ; কিন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার যে সাধন বা মার্গ তাহারও উপনিষদে 'বিদ্যা' নামই দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দবিদ্যা ইত্যাদি। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপনিষদে বর্ণিত এই প্রকার অনেক বিদ্যার অর্থাৎ সাধনের বিচার করা হইয়াছে। উপনিষদপাঠে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল বিদ্যাকে গুপ্ত রাখিয়া কেবল শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে ঐ সকল উপদেশ দেওয়া হইত না। তাই যে কোন বিদ্যাই ধর না কেন, তাহা গুহ্য হইবেই। কিন্তু ব্রহ্মলাভের সাধনীভূত এই যে গুহ্য বিদ্যা বা মার্গ অনেক হইলেও সেই সমস্তই সমস্তের মধ্যে গীতোক্ত ভক্তিমার্গরূপে বিদ্যা অর্থাৎ সাধন শ্রেষ্ঠ (গুহ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজা) ; কারণ, আমার মতে উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানমার্গীয় বিদ্যার ন্যায় উহা (ভক্তিমার্গরূপ সাধন) 'অব্যক্ত, নহে, উহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর এবং সেইজন্য উহা সুখসাধ্য। গীতায় যদি কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞানমার্গই প্রতিপাদ্য হইত তাহা হইলে বৈদিক ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ একশো বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে সেরূপ আগ্রহ থাকিত কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে মাধুর্য্য ও প্রেম বা রসে গীতা পরিপূর্ণ

তাহা তৎপ্রতিপাদিত ভক্তিমার্গেরই পরিণাম। প্রথমে তো পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা বলিয়াছেন ; এবং তাহার ভিতরেও আর একটি কথা এই যে, ভগবান অজ্ঞেয় পরব্রহ্মের শুষ্ক জ্ঞানের কথা না বলিয়া স্থানে স্থানে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ করিয়া নিজের সগুণ ও ব্যক্ত স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, "আমাতে এই সমস্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে" (৭. ৭), "এই সমস্ত আমারই মায়া" (৬. ১৪), "আমা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই" (৭. ৭) "আমার নিকট শত্রু মিত্র উভয়ই সমান" (৯. ২৯), "আমিই এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছি" (৯. ৪), "আমিই ব্রহ্মের ও মোক্ষের মূল" (গী. ১৪. ২৭) কিংবা "আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলে" (গী. ১৫. ১৮), এবং শেষে অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি এক আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" (১৮. ৬৬)। ইহাতে শ্রোতার মনে এই ধারণা হয় যে, আমি সমদৃষ্টি, পরমপূজ্য ও প্রেমময় এইরূপ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের সম্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং তখন আত্মজ্ঞানে তাহার নিষ্ঠা খুব দৃঢ় হয়। শুধু তাহাই নহে ; কিন্তু একবার জ্ঞান ও একবার ভক্তি এইরূপ গীতার অধ্যায়সমূহের পৃথক পৃথক বিভাগ না করিয়া, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে এবং ভক্তির সহিত জ্ঞানকে গাঁথিয়া দেওয়ার ফল হইয়াছে এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কিংবা বুদ্ধি ও প্রেমের মধ্যে পরস্পর বিরোধ না থাকিয়া পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমরসেরও অনুভব হয় এবং সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া শেষে চিত্ত বিলক্ষণ শান্তিসমাধান ও সন্তোষসুখ লাভ করে। দুধে চিনির মতো ইহাতে কর্ম্মযোগও আসিয়া মিলিয়া গেল। তাহার পর, গীতোক্ত জ্ঞান ঈশাবাস্যোপনিষদের উক্তি অনুসারে মৃত্যু ও অমৃত অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই শ্রেয়স্কর, আমাদের পণ্ডিতেরা এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ভক্তিমার্গ কি, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য কোথায়, ভক্তিমার্গকে রাজমার্গ (রাজবিদ্যা) অথবা সরল সোপান কেন বলা হয়, এবং গীতায় ভক্তিকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়া কেন স্বীকার করা হয় নাই তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু জ্ঞানলাভের এই সুলভ অনাদি ও প্রত্যক্ষমার্গেও ধোঁকার যে এক জায়গা আছে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক, নতুবা এই পথের পথিকের অসাবধানতা বশতঃ খানায় পড়িবার সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্গীতায় এই খানার স্পষ্ট বর্ণনা আছে : এবং বৈদিক ভক্তিমার্গ অন্য ভক্তিমার্গ অপেক্ষা যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই। পরব্রহ্মে মনকে আসক্ত করিয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সাম্যবুদ্ধি লাভ করিবার জন্য পরব্রহ্মের 'প্রতীক' সদৃশ কোন-কিছু সগুণ ও ব্যক্ত বস্তু সাধারণ মানুষের সম্মুখে থাকা আবশ্যক, নতুবা চিত্ত স্থির হইতে পারে না ; এই কথা সকলে স্বীকার করিলেও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রতীকের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক সময় বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এই জগতে এমন স্থান নাই যেখানে পরমেশ্বর নাই। ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুন "তোমার কোন্ কোন্ বিভূতির রূপ অবলম্বনে তোমাকে ভজনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বল" (গী. ১০. ১৮), এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে পর ১০ম অধ্যায়ে ভগবান এই স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত আপনার অনেক বিভূতির বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, "আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, স্থাবরের

মধ্যে হিমালয়, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ, সর্পের মধ্যে বাসুকি, দৈত্যের মধ্যে প্রহলাদ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যম্যা গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, অক্ষরের মধ্যে অকার, এবং আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু" ; এবং শেষে বলিলেন—

যদ্‌যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌ ॥

"হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু বৈভব, লক্ষ্মী ও প্রভাবের দ্বারা যুক্ত তাহা আমারই তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে" (১০. ৪১) ; আর বেশী কি বলিব ? আমার এক অংশের দ্বারা আমি এই সমস্ত ব্যাপিয়া আছি"। এইটুকু বলিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জ্জুনকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ও জন্মাইয়া দিলেন। জগতে দৃষ্টিগোচর সমস্ত বস্তু কিংবা গুণই যদি পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ প্রতীক হইল, তবে তন্মধ্যে কোন এক বস্তুর মধ্যেই পরমেশ্বর আছেন অন্যের মধ্যে নাই এ কথা কে বলিবে, আর কেমন করিয়া বলিবে ? ন্যায়ত ইহাই বলিতে হয় যে, তিনি দূরেও আছেন নিকটেও আছেন, তিনি সৎ ও অসৎ হইলেও ঐ উভয়ের অতীত অথবা তিনি গরুড় ও সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাতা, বিঘ্নকর্ত্তা ও বিঘ্নহর্তা ভয়দাতা ও ভয়নাশন, ঘোর ও অঘোর, শিব ও অশিব, বৃষ্টিদাতা ও বৃষ্টিরোধক—এই সকলই (গী. ৯. ১৯ ও ১০. ৩২) তিনিই। তাই ভাগবদ্‌ভক্ত তুকারাম বাবাও এই অর্থেই বলিয়াছেন—

তুকা ক্ষণে যেঁ যেঁ বোলা।
তেঁ তেঁ সাজে যা বিঠ্‌ঠলা ॥

"তুকা বলে, যাহা যাহা আছে, এই বিঠোলা দেব সেই-সেই রূপে সজ্জিত" (তু. গা. ৩০৬৫. ৪)। এই প্রকার বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু অংশত পরমেশ্বরেরই স্বরূপ ; তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ একেবারেই যিনি মনে আনিতে পারেন না, তিনি যদি এই অব্যক্ত ও শুদ্ধ রূপ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অনেক বস্তুর মধ্যে কোন একটি বস্তুকে সাধন কিংবা প্রতীক বুঝিয়া তাহার উপাসনা করেন তাহাতে হানি কি ? কেহ মনের উপাসনা করিবে, কেহ বা দ্রব্যযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ করিবে। কেহ গরুড়কে ভক্তি করিবে, কেহ বা ওঁকার এই মন্ত্রাক্ষরেরই জপ করিতে বসিবে। কেহ বিষ্ণুর, কেহ বা শিবের, কেহ বা গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা করিবে। কেহ নিজের পিতামাতার চরণে পরমেশ্বর-বুদ্ধি রাখিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে, এবং কেহ তাহা হইতেও ব্যাপক সর্ব্বভূতাত্মক বিরাটপুরুষের উপাসনা পছন্দ করিবে। কেহ বলিবে সূর্য্যকে পূজা কর এবং কেহ বলিবে সূর্য্যাপেক্ষা কৃষ্ণ কিংবা রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন অজ্ঞান বা মোহবশতঃ এই দৃষ্টি চলিয়া যায় যে, "সমস্ত বিভূতির মূলে একই পরব্রহ্ম" কিংবা যখন কোন ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্তই এই ব্যাপক দৃষ্টি না থাকে, তখন অনেক প্রকার উপাস্যবিষয়ে বৃথা অভিমান ও অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মারামারি কাটা-কাটিতে পর্য্যবসিত হয়। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমানী ধর্ম্মের পরস্পর-বিরোধ একপাশে সরাইয়া রাখিয়া কেবল খৃষ্টধর্ম্মই আলোচনা করিলে য়ুরোপখণ্ডের

ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও ব্যক্ত খৃষ্টের উপাসকদিগেরও মধ্যে বিধিভেদের কারণে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত একসময়ে হইয়াছিল। এই দেশের সগুণ উপাসকদিগের মধ্যেও এখন পর্য্যন্ত এই বিরোধ দেখা যায় যে, এক জনের দেবতা নিরাকার হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ! ভক্তিমার্গে উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় আছে কি নাই ? যদি থাকে তবে সে উপায়টি কি ? ইহার ঠিক ঠিক বিচার না হইলে ভক্তিমার্গকে খটকাশূন্য বা ধোঁকারহিত বলা যায় না। তাই, গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার করিব। হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই প্রশ্নের সমুচিত বিচার করা খুবই দরকার ইহা বলা বাহুল্য।

সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য মনকে স্থির করিয়া পরমেশ্বরের অনেক সগুণ বিভূতির মধ্যে কোন এক বিভূতির স্বরূপ প্রথমতঃ চিন্তা করা, অথবা উহাকে প্রতীক বুঝিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা—ইত্যাদি সাধন প্রাচীন উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে ; শেষে রামতাপনীর ন্যায় উত্তরকালের উপনিষদে কিংবা গীতাতেও মানবরূপধারী সগুণ পরমেশ্বরের প্রতি অসীম ও ঐকান্তিক ভক্তিকেই পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধন হিসাবে গীতা বাসুদেবভক্তির প্রাধান্য দিলেও আধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে বেদান্তসূত্রের ন্যায় (বে. সূ. ৪. ১. ৪.) গীতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, 'প্রতীক' একপ্রকার সাধন—উহা সত্য, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর হইতে পারে না। অধিক কি বলিব ? নামরূপাত্মক ও ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ বস্তুসমূহের মধ্যে যে কোনও এক বস্তু গ্রহণ কর, তাহা মায়া মাত্র ; সত্য পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি দেখিতে চাহে তাহার স্বীয় দৃষ্টিকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। ভগবানের যে অনেক বিভূতি আছে তন্মধ্যে অর্জ্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অপর কোনও বিভূতিই হইতে পারে না। কিন্তু যখন এই বিশ্বরূপই ভগবান নারদকে দেখাইলেন, তখন তিনি বলিয়াছেন "তুমি আমার এই যে রূপ দেখিতেছ ইহা সত্য নহে, ইহা মায়ামাত্র ; আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে ইহার ও বাহিরে তোমায় যাইতে হইবে" (শা. ৩৩৯, ৪৪) ; গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥

আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে মূর্খ লোকেরা ব্যক্ত (গী. ৭. ২৪) অর্থাৎ মনুষ্যদেহধারী মনে করে (গী. ৯. ১১) ; কিন্তু ইহা সত্য নহে ; আমার অব্যক্ত স্বরূপই সত্য। সেইরূপ আবার, উপনিষদেও—মন, বাক্য, সূর্য্য আকাশ ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মপ্রতীক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, শেষে বলা হইয়াছে যে, যাহা বাক্য চক্ষু কিংবা কর্ণের গোচর হয় তাহা ব্রহ্ম নহে—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্‌।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

"মনের দ্বারা তাহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু মনই যাঁহার মননশক্তিতে উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জান ; লোকে যাহার (প্রতীকরূপে) উপাসনা করে তাহা (প্রকৃত) ব্রহ্ম নহে" (কেন. ১. ৫-৮)। "নেতি নেতি" সূত্রেরও ইহাই অর্থ। মন ও

আকাশ ধর ; কিংবা ব্যক্তোপাসনামার্গ অনুসারে শালগ্রাম, কিংবা শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারদিগের অথবা সাধুপুরুষদিগের ব্যক্ত মূর্ত্তি চিন্তা কর ; মন্দিরসমূহে শিলাময় বা ধাতুময় দেবমূর্তি দেখ ; কিংবা মূর্তিহীন মন্দির বা মসজিদই ধর ;—এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিশুদের খেলা গাড়ীর ন্যায় মনকে স্থির করিবার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত করিবার সাধনমাত্র। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ ইচ্ছা ও অধিকার অনুসারে উপাসনার জন্য কোন এক প্রতীককে গ্রহণ করে : এই প্রতীক যতই চিত্তপ্রিয় হউক না কেন, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর এই সকল "প্রতীক নাই"—"ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বে, সূ. ৪. ১. ৪)—তিনিই ইহার অতীত, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই জন্য "আমার মায়া যাহারা অবগত নহে সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে জানে না" ভগবদ্‌গীতাতেও এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী. ৭. ১৩—১৫ দেখ)। ভক্তিমার্গে মনুষ্যকে ত্রাণ করিবার যে শক্তি আছে তাহা কোন সজীব বা নির্জীব মূর্ত্তিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই ; উক্ত প্রতীকের উপর উপাসক আপনার সুবিধার জন্য যে ঈশ্বর-ভাবনা রাখে তাহাই প্রকৃত তারক হয়। প্রতীক কাঠের, ধাতুর কিংবা অন্য যে কোন পদার্থেরই হউক না কেন ; 'প্রতীক অপেক্ষা তাহার যোগ্যতা কখনই অধিক হইতে পারে না। এই প্রতীকের উপর তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভক্তির ফল পরমেশ্বর—প্রতীক নহে—তোমাকে দিয়া থাকেন। তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, কি আমার প্রতীক ভাল এইরূপ ঝগড়া করিয়া লাভ কি ? তোমার মনের ভাব যদি শুদ্ধ না হয় তবে প্রতীক যতই ভাল হউক না কেন, তাহাতে লাভ কি হইবে ? সমস্ত দিন লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় কিংবা কোন রবিবারে দেবালয়ে দেবদর্শনের জন্য কিংবা কোন নিরাকার দেবতার মন্দিরে উপাসনার জন্য গমন করিলে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না। পুরাণ শুনিবার জন্য যাহারা দেবালয়ে যায়, রামদাস স্বামী তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন—

বিষয়ী লোক শ্রবণা যেতী।
তে বায়কোঁ কডে পহাতী॥
চোরটে লোক চোরূণ জাতী।
পাদরক্ষা॥

"কোন কোন বিষয়ী লোক পুরাণ শুনিবার সময় স্ত্রীলোকদিগেরই কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় ; চোরেরা পাদত্রাণ (জুতা) চুরি করে" (দাস. ১৮. ১০. ২৬)। শুদ্ধ দেবালয়ে কিংবা দেবের মূর্ত্তিতেই যদি তারকত্ব থাকে, তাহা হইলে এই সকল লোকদিগেরও মুক্তি হওয়া উচিত। কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে, কেবল মোক্ষেরই জন্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু যাহারা ব্যবহারিক কিংবা স্বার্থসম্বন্ধ বস্তু প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করিতে হয়। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কতক লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া থাকে, ইহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে (গী. ৭. ২০)। কিন্তু গীতাও পরে এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা বুঝিয়া তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা যায় না যে, এই দেবতাদিগের আরাধনা করিলে তাঁহারা স্বয়ং কোন ফল প্রদান করেন (গী. ৭. ২১)। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত (বেসূ. ৩. ৩৮-৪১) এবং এই সিদ্ধান্তই গীতারও মান্য (গী. ৭. ২২) যে,

যে-কোন বাসনা মনে পোষণ করিয়া তুমি যে-কোন দেবতাকেই আরাধনা কর না কেন, উক্ত আরাধনার ফল প্রদান করেন সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর—দেবতা নহে। ফলদাতা পরমেশ্বর এই প্রকার একই হইলেও প্রত্যেকের ভালমন্দ ভাবনা অনুসারে তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করেন (বেসূ, ২. ৯, ৩৪-৩৭), তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কিংবা প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

"মনুষ্য শ্রদ্ধাময় ; প্রতীক যাহাই হউক না কেন, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয় (গী. ১৭. ৩ ; মৈত্রু, ৪. ৬) ; কিংবা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

'দেবভক্ত দেবলোকে, পিতৃগণভক্ত পিতৃলোকে, ভূতভক্ত ভূতগণের মধ্যে এবং আমার ভক্ত আমার নিকট উপনীত হয়" (গী. ৯. ২৫) ; অথবা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"আমাকে যে যেরূপ ভজনা করে, সেইরূপই আমি তাহাদিগকে ভজনা করি" (গী. ৪. ১১)। সকলেই জানে যে শালগ্রাম একটা পাথর মাত্র। তাহাতে বিষ্ণুর ভাব রাখিলে বিষ্ণুলোক পাইবে ; এবং সেই প্রতীকের উপর যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের ভাবনা স্থাপন করিলে, তুমি ভূতলোকই প্রাপ্ত হইবে। ফল তোমার ভাবনার, প্রতীকের নহে—এই সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্ত শাস্ত্রকারদিগেরই সম্মত। লৌকিক ব্যবহারে কোন মূর্ত্তির পূজা করিবার পূর্ব্বে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার যে রীতি আছে, তাহারও মর্ম্ম ইহাই। যে দেবতার ভাবনা দ্বারা ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঐ মূর্তিতে করা হইয়া থাকে। কোন মূর্ত্তিতে পরমেশ্বরের ভাবনা না রাখিয়া, এই মূর্ত্তি কোন বিশেষ আকারের মাটী, কাঠ বা ধাতু ভাবিয়া কেহ তাহার পূজা করে না। এবং করিলেও গীতার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে নিঃসন্দেহ মাটী কিংবা কাঠের কিংবা ধাতুর গতিই প্রাপ্ত হইবে। প্রতীক এবং প্রতীকে স্থাপিত বা আরোপিত মনোভাব—এই প্রকার ভেদ করিলে প্রতীক যাহাই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিবার কারণ থাকে না ; কারণ, এখন তো প্রতীকই দেবতা, এই ভাব থাকে না। সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতা ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের দৃষ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে। তাই, "দেব ভাবাচা ভূকেলা" অর্থাৎ দেবতা ভাবেরই জন্য ক্ষুধিত, প্রতীকের জন্য নহে—এইরূপ তুকারাম বাবা বলিয়াছেন॥ ভক্তিমার্গের এই তত্ত্ব যাহার বিদিত আছে তাহার মনে "আমি যে ঈশ্বরস্বরূপের বা প্রতীকের উপাসনা করিতেছি তাহাই সত্য এবং অন্য সকলই মিথ্যা' এই দুরাগ্রহ না থাকিয়া "যাহার প্রতীক যাহাই হউক না কেন, তদ্‌দ্বারা পরমেশ্বরকে যে ভজনা করে সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত হয়"—এইরূপ উদার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং তখন ভগবানের এই উক্তি তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ বিধি অর্থাৎ বাহ্যোপচার বা সাধন শাস্ত্রানুযায়ী না হইলেও, যাহারা অন্য

দেবতাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ তাহাদের উপর শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাব রাখিয়া) যজন করে তাহারা (পর্যায়ক্রমে) আমারই যজন করিয়া থাকে" (গী. ৯. ২৩)। ভাগবতেও এই অর্থই অল্প শব্দভেদে বর্ণিত হইয়াছে (ভাগ. ১০ পূ. ৪০. ৮-১০); শিবগীতায় তো উক্ত শ্লোক অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে (শিব. ১২. ৪); এবং "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ. ১৬৪. ৪৬) এই বেদ-বচনের তাৎপর্য্যও ইহাই। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্ত্ব বৈদিক ধর্ম্মে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; এবং এই তত্ত্বেরই এই ফল যে, আধুনিককালে শ্রীশিবাজী মহারাজের ন্যায় বৈদিকধর্ম্মীর বীরপুরুষের স্বভাবে, তাঁহার পরম উৎকর্ষের সময়েও, পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা দোষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহা মনুষ্যের শোচনীয় মূর্খতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এমন কি তাহারও অতীত অর্থাৎ অচিন্ত্য, এই প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মায়ের পেটে অমুক বর্ণের নামের বা আকৃতির তিনি যে ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই কেবল সত্য, এইরূপ নামরূপাত্মক মিথ্যা অভিমান পোষণ করে, এবং অভিমানে পড়িয়া তলোয়ারের দ্বারা পরস্পরের প্রাণ পর্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত হয়। গীতার ভক্তিমার্গের সংজ্ঞা 'রাজবিদ্যা' সত্য; কিন্তু ইহা যদি অনুসন্ধান করা যায় যে, যে প্রকার স্বয়ং ভগবান 'আমার দৃশ্য স্বরূপও মায়াময়, আমার প্রকৃত স্বরূপও দেখিতে হইলে এই মায়াকে ছাড়াইয়া যাও" এই যথার্থ উপদেশ করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে দিয়াছেন এবং 'অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই সাত্ত্বিক জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ভক্তিমার্গের মিথ্যা বাদবিতণ্ডার মূলই যিনি সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন সেই ধর্ম্মগুরু সর্ব্বপ্রথম কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার মতাবলম্বী লোক কোথায় অধিক, তাহা হইলে আমাদের ভারতভূমিকেই অগ্রস্থান দিতেই হয়। আমাদের দেশবাসীরা রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যের এই প্রত্যক্ষ পরশপাথর অনায়াসেই পাইয়াছেন; কিন্তু যখন আমি দেখি যে, আমাদেরই মধ্যে কোন কোন লোক অজ্ঞানের চস্‌মা নিজেদের চোখে লাগাইয়া উহাকে চকমকি পাথর মাত্র বলিতে প্রস্তুত তখন ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব!

প্রতীক যাহাই হউক না কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা স্থাপন করি, ভক্তিমার্গের ফল তাহাতেই হয়, প্রতীকে নহে; এবং সেইজন্য ইহা সত্য যে, প্রতীক সম্বন্ধে বিবাদ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রতীকের উপর বেদান্তদৃষ্টিতে যে শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাবনা রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের পক্ষে তাহাদের প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে কিংবা অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঠিকঠিক করিতে পারা প্রায় অসম্ভব; এই অবস্থায় এই সকল লোকের পক্ষে প্রতীকের উপর শুদ্ধ ভাবনা স্থাপন পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কি উপায়? 'ভক্তিমার্গে জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিয়া লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বারা কিংবা শ্রদ্ধার দ্বারা শুদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের ধারণা করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবনা স্থাপন কর—তোমার ভাবনা সফল হইবে'—এই কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, কোন একটা ভাবনা স্থাপন করা মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধর্ম্ম হইলেও, বুদ্ধির ন্যূনাধিক সাহায্য ব্যতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনোধর্ম্মের ন্যায় শুদ্ধ শ্রদ্ধা বা প্রেমও

এক প্রকার অন্ধই; কোন্ বিষয়ের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্ বিষয়ের উপর করিবে না, অথবা কাহার উপর প্রেম স্থাপন করা উচিত কিংবা অনুচিত, ইহা শুদ্ধ প্রেম কিংবা শ্রদ্ধা দ্বারা জানা যায় না। এই কাজ প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধি দ্বারাই করিতে হয়; কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধি ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সার কথা, কাহারও বুদ্ধি অতিশয় তীব্র না হইলেও উহাতে শ্রদ্ধা, প্রেম বা বিশ্বাস কোথায় স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জানিবারও ত সামর্থ্য থাকা চাই; নতুবা, অন্ধ শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভুল পথে গিয়া উভয়েই গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইবে। উল্টাপক্ষে ইহাও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারহিত শুদ্ধ বুদ্ধিই যদি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিছক যুক্তিবাদ ও তার্কিকতার মধ্যে পড়িয়া সে কোন্ দিকে ঝুঁকিবে তাহার ঠিকানা নাই; বুদ্ধি যতই তীব্র হইবে। ততই অধিক বিভ্রান্ত হইবে। তাহাছাড়া এই প্রকরণের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে কর্ত্তৃত্বশক্তি উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সর্ব্বদা মিলন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন ও বুদ্ধি এই দুইই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরই বিকার হওয়ায়, উহাদের প্রত্যেকের জন্মতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ হইতে পারে; এবং উহাদের মিলন স্থায়ী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে যে পরিমাণে উহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্যের স্বভাব, ধারণা ও ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এই বুদ্ধিই কেবল জন্মত অশুদ্ধ, রাজসিক কিংবা তামসিক হইলে, উহার কৃত ভালমন্দের নির্ণয় ভ্রান্তিমূলক হওয়া প্রযুক্ত, অন্ধ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেও ভ্রমে পতিত হইবে। ভাল, শ্রদ্ধাই যদি জন্মত অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলেও কোন লাভ নাই, কারণ এই অবস্থায় বুদ্ধির হুকুম মানিয়া চলিবার জন্য শ্রদ্ধা প্রস্তুতই থাকে না। কিন্তু সাধারণত এই অনুভব হয় যে, মন ও বুদ্ধি ইহারা পৃথক্ পৃথক অশুদ্ধ থাকে না; যাহার বুদ্ধি জন্মত অশুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ শ্রদ্ধাও প্রায় ন্যূনাধিক অশুদ্ধই হইয়া থাকে; এবং তাহার পর অশুদ্ধ বুদ্ধি স্বভাবতই অশুদ্ধ শ্রদ্ধাকে অধিকাধিক ভ্রমে পতিত করে। এই অবস্থার কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা উপদেশ করিলেও উহা তাহার মনে ভাল করিয়া বসে না; কিংবা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে অনেক সময়ে—বিশেষতঃ শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি দুইই জন্মতঃ অপক্ক ও স্বল্পবল হইলে—উপদেশের বিপরীত অর্থ করিয়া থাকে। খৃষ্টান্ ধর্মোপদেষ্টা আফ্রিকার কালো-কুচকুচে, অসভ্য হাপ্‌সীকে, যখন খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই হাপ্‌সী "স্বর্গের পিতা" কিংবা খৃষ্টেরও যথার্থ কল্পনা কিছুই করিতে পারে না। তাহাকে যাহা বলা হয়, সে নিজের অপক্ক বুদ্ধি অনুসারে তাহা অযথার্থভাবে গ্রহণ করে। এবং সেই জন্য, উন্নত ধর্ম্ম বুঝিবার যোগ্যতা এই সব লোকের আনিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে আধুনিক মনুষ্যের যোগ্যতা আনয়ন করা উচিত, এইরূপ এক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন।* ভবভূতির এই উক্তিরও অর্থ ইহাই—গুরু এক হইলেও

* And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e. g. an Australian savage, or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations

শিষ্যে শিষ্যে ভেদ দেখা যায়, এবং সূর্য্য এক হইলেও তাহার আলোকে কাচের মণি হইতে আগুন বাহির হয় কিন্তু মাটি ঢিবির উপর কোন পরিণাম ঘটে না (উ. রাম. ২. ৪)। প্রায় এই কারণেই প্রাচীনকালে শূদ্রাদি অজ্ঞজাতি দেবশ্রবণে অনধিকারী বিবেচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ মনে হয়। ‡ গীতাতেও (১৮শ অধ্যায়ে) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে; বুদ্ধির যেরূপ স্বভাবতই সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হয় (১৮. ৩০-৩২) সেইরূপ শ্রদ্ধারও স্বভাবতই সাত্ত্বিকাদি তিন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় (১৭. ২)। এইরূপ আরম্ভে বলিবার পর, প্রত্যেকের দেহস্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধাও স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় (১৭. ৩) সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি দেবতার উপর, রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বভাবতই যক্ষ-রাক্ষসের উপর এবং তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি ভূত-পিশাচাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইরূপ ভগবান্ বলিয়াছেন যে (গী. ১৭. ৪-৬)। মনুষ্যের শ্রদ্ধার ভালমন্দত্ব যদি এইরূপ জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, যথাশক্তি ভক্তির দ্বারা এই শ্রদ্ধা উন্নত হইতে হইতে কোনো-না কোনো সময়ে পূর্ণ শুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে কি না? জ্ঞানার্জ্জন কার্য্যে মনুষ্য স্বাধীন কি না এইরূপ কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার যে প্রশ্ন আছে তাহা এবং ভক্তিমার্গের উক্ত প্রশ্নের স্বরূপ এক সমান। এবং বলিতে হইবে না যে এই দুই প্রশ্নের উত্তরও একই। আমার শুদ্ধ স্বরূপের উপর তোমার মন স্থাপন কর—"ময্যের মন আধৎস্ব" (গী. ১২. ৮.)—এইরূপ অর্জ্জুনকে প্রথমে উপদেশ করিয়া তাহার পর "আমার স্বরূপের উপর যদি চিত্ত স্থাপন করিতে না পার তবে অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার প্রযত্ন কর; অভ্যাসও যদি না করিতে না পার, তবে আমার জন্য চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম কর; এবং তাহাও যদি না পার, তবে কর্ম্মফল ত্যাগ কর এবং তদ্দ্বারা আমাকে লাভ কর" পরমেশ্বরস্বরূপকে মনে স্থির করিবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বিভিন্ন মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন (গী. ১২. ৯. ১১; ভাগ, ১১.১১. ২১-২৫)। মূল দেহস্বভাব কিংবা প্রকৃতি তামসিক হইলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির করিবার উদ্যোগ একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল হইবার নহে। কিন্তু কর্ম্মযোগের ন্যায় ভক্তিমার্গেও কিছুই ব্যর্থ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

একবার ভক্তিমার্গে আসিয়া পড়িলে এ জন্মে, না হয় পরজন্মে, পরজন্মে না হয় তাহার পরের জন্মে কখনো-না-কখনো "এই সমস্ত বাসুদেবাত্মকই" এইরূপ পরমেশ্বস্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বারা শেষে মোক্ষও লাভ করে (গী. ৭. ১৯)। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অভ্যাসের উদ্দেশে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (৬. ৪৫), এইরূপ উক্ত হইয়াছে; ভক্তিমার্গেও এই নীতিই প্রয়োগ করা যাইতে

they would have to undergo a gradual process of humani-zation before they could attain to the capacity of civilization.'' Dr. Maudsley's Body and Mind Ed. 1873. P, 57.

‡ See Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy, PP, 72, 73.

পারে। ভক্ত চাহে যে, প্রতীকের মধ্যে যে দেবতার ভাবনা স্থাপন করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ নিজের দেহস্বভাবানুসারে প্রথম হইতেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ মনে করিতে হইবে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নহে) দিয়া থাকেন (৭. ২২)। কিন্তু তাহার পর চিত্তশুদ্ধির জন্য অন্য কোন সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না। পরমেশ্বরে সেই ভক্তিই যথামতি সর্ব্বদা বজায় রাখিলে তাহার দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণের ভাবনা আপনাআপনি উন্নত হয় তাহার পর পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া শেষে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এইরূপ মনের অবস্থা দাঁড়াইয়া উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও আর থাকে না, এবং শেষে শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে আত্মা বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্য কেবল আপনার প্রযত্নের মাত্রা কম না করিলেই হইল। সার কথা, কর্ম্মযোগের জিজ্ঞাসা মনে আসিলেই মনুষ্য চরকার মুখে পড়িবার মত ধীরে ধীরে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে স্বাভাবতই যেরূপ আকৃষ্ট হয় (গী. ৬. ৪৪), সেইরূপ গীতাধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত যে, ভক্তিমার্গেও ভক্ত একবারে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে ভগবানই আপনার স্বরূপে পূর্ণ জ্ঞানও তাহার জন্মাইয়া দেন (গী. ৭. ২১; ১০. ১০)। সেই জ্ঞানের দ্বারা (শুধু শুষ্ক ও অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নহে) অবশেষে ভগবদ্ভক্তের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। ভক্তিমার্গে এই প্রকার উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের চরম অবস্থা—এই দুই অবস্থা একই হওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনার সহিত এক, ইহা গীতার পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই দুই মার্গ আরম্ভে ভিন্ন হইলেও যখন অধিকারভেদে কেহ প্রথম, কেহ বা দ্বিতীয় মার্গ অনুসরণ করে, তখন এই দুই মার্গ শেষে একত্র মিলিয়া যায় এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত হয়, ভক্তও সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমার্গে প্রথমেই বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বরস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ভক্তিমার্গে এই স্বরূপই শ্রদ্ধার দ্বারা গ্রহণ করা হইয়া থাকে—এই দুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু প্রারম্ভের এই ভেদ পরে বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি॥

"শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রযত্ন করিলে, তাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ জ্ঞানের অপরোক্ষানুভব ঘটিয়া সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার শীঘ্রই পূর্ণ শান্তি লাভ হয়" (গী. ৪. ৩৯.); কিংবা—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

"ভক্তির দ্বারা আমার স্বরূপের তাত্ত্বিক জ্ঞান হয়; এবং এই জ্ঞান হইবার পর (পূর্ব্বে নহে) সেই ভক্ত আমাতে আসিয়া মিলিত হয়" (গী, ১৮. ৫৫ এবং ১১. ৫৪ দেখ)।

* এই শ্লোকের অন্তর্গত 'অভি' উপসর্গের উপর জোর দিয়া ভক্তি জ্ঞানের সাধন নহে, উহা স্বতন্ত্র সাধ্য বা নিষ্ঠা এইরূপ দেখাইবার জন্য শাণ্ডিল্যসূত্রে সূ. ১৫.) প্রযত্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ অন্য সাম্প্রদায়িক অর্থের ন্যায় গরজমূলক. সরল নহে।

পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার পক্ষে এই দুই পন্থা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা নাই। তাই' যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে ব্যক্তি—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" (গী. ৪. ৪০)—একেবারে বিনাশ পায় জানিবে এইরূপ গীতায় পরে সুস্পষ্ট-রূপে উক্ত হইয়াছে।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা শেষে পূর্ণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হয়। এই সম্বন্ধেই কোন কোন তার্কিক এই তর্ক তুলেন যে, উপাস্য ভিন্ন ও উপাসক ভিন্ন—এই দ্বৈতভাবের দ্বারাই ভক্তিমার্গের যদি আরম্ভ হয় তবে শেষে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপে অদ্বৈত জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? কিন্তু এই আপত্তি নিছক ভ্রান্তিমূলক। ঐক্য জ্ঞান হইলে পর ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়,—ইহাই যদি আপত্তির বিষয় হয় তাহা হইলে উহাতে কোন আপত্তি দেখি না। কারণ, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটীর লয় হইলে পর, ব্যবহারে যাহাকে ভক্তি বলে সেই ভক্তিব্যাপারে বন্ধ হইয়া যায়—ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়। কিন্তু দ্বৈতমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা শেষে অদ্বৈতের জ্ঞান হইতেই পারে না, এইরূপ যদি এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপত্তি শুদ্ধ তর্ক-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারাও মিথ্যা সিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরে কোন ভক্তের চিত্ত যেরূপ অধিকাধিক সমাহিত হইবে, সেই অনুসারে তাহার মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চলিয়া যাইবে—তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্টি হয় না। ব্রহ্মের সৃষ্টিতেও আমি দেখি যে, আরম্ভে পারার গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরে উহারা একত্র মিলিত হয়; সেইরূপ অন্য পদার্থেও একীকরণের ক্রিয়ার আরম্ভ প্রাথমিক ভিন্নতা হইতেই সুরু হয়; এবং ভৃঙ্গি কীটের দৃষ্টান্ত তো সকলেরই বিদিত আছে। এ বিষয়ে তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা সাধুপুরুষদিগের প্রত্যক্ষ অনুভূতিবেই অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভক্ত-শিরোমণি তুকারাম বাবার ন্যায় ব্যক্তির অনুভব আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তুকারাম বাবার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কাহাকে বলিতে হইবে না। তথাপি তাঁহার গাথার মধ্যে প্রায় ৫০০ অভঙ্গ অদ্বৈত অবস্থার বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" (গী. ৭. ১৯), কিংবা বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "সর্বমাত্মৈবাভূৎ" এই ভাবই স্বানুভূতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদাহরণার্থ তাঁহার এক অভঙ্গের ভাব দেখ (গা. ৩৬২৭)—

গোড়পণেঁ জৈসা গুল।
তৈসা দেব জালা সকল।
আতাঁ ভজোঁ কোণে পরী।
দেব সবাহ্য অন্তরীঁ॥
উদকা বেগলা।
নটেব তরঙ্গ নিরালা।
হেম অলংকারা নামী।
তুকা ক্ষণে তৈসে আম্হী॥

ইহার মধ্যে, প্রথম দুই চরণ, অধ্যাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সহিত উহার অর্থের সম্পূর্ণ সাম্য আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। স্বয়ং তুকারাম বাবা স্বানুভূতির

দ্বারা ভক্তদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা করিবার পর, কোন তার্কিক 'ভক্তিমার্গের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারে না' কিংবা 'দেবতার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই' ইত্যাদি অসংযত কথা বলিতে সাহসী হইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য!

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম সাধ্য একই; এবং "পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়" এই সিদ্ধান্ত দুই মার্গে বজায় থাকে শুধু নহে—বরঞ্চ অধ্যাত্মপ্রকরণে এবং কর্ম্মবিপাকপ্রকরণে প্রথমে অন্য যে-যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, সে সমস্তও গীতার ভক্তিমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ভাগবত ধর্ম্মে বাসুদেবরূপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন হয় এবং পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ মন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার হইয়াছে, এইরূপ চতুর্ব্যূহরূপ জগতের উৎপত্তি কেহ কেহ প্রতিপাদন করিয়াছেন; আবার কেহ বা এই চারি ব্যূহের মধ্যে তিন, দুই কিংবা একটীকে মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মতটি সত্য নহে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জীব সনাতন পরব্রহ্মেরই সনাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের আধারে বেদান্তসূত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (বেসূ. ২. ৩. ১৭; ও ২. ২. ৪২-৪৫ দেখুন)। তাই শুধু ভক্তিমার্গের উক্ত চতুর্ব্যূহের কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া জীবসম্বন্ধে বেদান্তসূত্রকারদিগেরই উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ২. ২৪; ৮. ২০; ১৩. ২২; ও ১৫. ৭ দেখুন)। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বাসুদেবভক্তি ও কর্ম্মযোগ এই দুই তত্ত্ব গীতায় ভাগবতধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হইলেও, ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাত্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও মূঢ় কল্পনাকে গীতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে গীতায় ভক্তি ও অধ্যাত্ম, কিংবা শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রাখিবার প্রযত্ন থাকিলেও, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গে গ্রহণ করিলে ন্যূনাধিক শব্দভেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের এই শব্দভেদ প্রযুক্ত কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতায় একবার ভক্তিদৃষ্টিতে ও একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে কথিত সিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, অতএব সেই পরিমাণে গীতা অসম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের মতে এই বিরোধ বস্তুত সত্য নহে; অধ্যাত্ম ও ভক্তি, ইহাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করাতেই এইরূপ বিরোধ প্রতীয়মান হয়। তাই, এই সম্বন্ধে এখানে কিছু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে একই আত্মা নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত, এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হওয়ায় "যে আত্মা আমাতে তাহাই সর্ব্বভূতে"—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (গী ৬. ২৯), কিংবা "এই সকলই আত্মা"—"ইদং সর্ব্বমাত্মৈব" এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্র-দৃষ্টিতে আমরা বলিয়া থাকি; এবং ইহাকে অনুসরণ করিয়াই "তুকা ক্ষণে যেঁ যেঁ ভেটে। তেঁ তেঁ বাটেমী ঐসে॥" অর্থাৎ—তুকা ভণে যাহা কিছু দেখি, তাহা আমিই—এইরূপ মনে করি—(গা. ৪৪৪৪. ৪) এইরূপ তুকারাম বাবা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমার্গে অব্যক্ত পরমেশ্বরকেই ব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ দেওয়া যায়; তাই, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্তের স্থানে এইরূপ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—"যো মাং

পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি"—আমি (ভগবান্) সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে আছে (৬. ২৯), কিংবা "বাসুদেবঃ সর্বমিতি"—যাহা কিছু সমস্তই বাসুদেবময় (৭. ১৯), কিংবা "সর্বভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি"—জ্ঞান হইলে পর, সমস্ত ভূত তুমি আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধ্যেও দেখিবে (গী. ৪. ৩৫), । এই কারণেই ভাগবত পুরাণেও—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

"আমি ভিন্ন, ভগবান্ ভিন্ন ও লোকেরা ভিন্ন এইরূপ ভেদবুদ্ধি মনে না রাখিয়া, আমি ও ভগবান্ একই, এই ভাবনা যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত ভূত ভগবানের মধ্যে ও আপনার মধ্যেও আছে এইরূপ বুঝে, সে-ই ভাগবতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"—এইরূপ ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (ভাগ. ১১, ২. ৪৫ ও ৩. ২৪. ৪৬)। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'অব্যক্ত পরমাত্মা' শব্দের স্থানে 'ব্যক্ত পরমেশ্বর' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—এইটুকুই যাহা কিছু প্রভেদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্মা অব্যক্ত হইবার কারণে সমস্ত জগৎ আত্মময়। কিন্তু ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত বিভূতির বর্ণনা করিয়া এবং অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরময় (আত্মময়) এই বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে (গী. অ. ১০ ও ১১)। অধ্যাত্মশাস্ত্রে কর্ম্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সগুণ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই; তিনিই জ্ঞান, তিনিই কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্ত্তা, কর্ম্মসম্পাদক এবং ফলদাতাও তিনি; এইরূপ ভক্তিমার্গের তত্ত্ব হওয়ায় সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কর্ম্মভেদের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া ভক্তিমার্গ অনুসারে ইহা প্রতিপাদন করা যাইতেছে যে, কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি দিতে, কর্ম্মফল বিধান করিতে এবং কর্ম্মের ক্ষয়সাধন করিতে একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন। উদাহরণ যথা—তুকারাম দেবতাকে একান্তে প্রার্থনা করিয়া স্পষ্টভাবে কিন্তু প্রেমের সহিত বলিতেছেন—

ঐক্য পণ্ডুরঙ্গা এক মতে।
কাঁহী বোলণে আছে একান্ত।
আর্যা জরী তারীল সঞ্চিত।
তরী উচিত কায় তুঝে ॥ (গা. ৪৯৯)

এই ভাবই ভিন্ন শব্দে অন্যস্থানে (গা. ১০২৩) এইরূপ বলা হইয়াছে যে—

প্রারব্ধ ক্রিয়মাণ। ভক্তাঁ সঞ্চিত নাহী জ্ঞান।
অবঘা দেবচী জালা পাহী। ভরোনিয়াঁ অন্তর্বাহী ॥

"প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিতের ঝগড়া ভক্তের জন্য নহে; দেখ, যাহা কিছু সকলই ঈশ্বর, তিনিই সর্ব্বব্যাপী।" ভগবদ্গীতাতে ভগবান ইহাই বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (১৮. ৬১) ঈশ্বরই সমস্ত লোকের হৃদয়ে বাস করিয়া তাহাদের দ্বারা যন্ত্রের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ায় এইরূপ সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জ্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আত্মার আছে। কিন্তু

তাহার বদলে ভক্তিমার্গে ইহা বলা হয় যে, এই বুদ্ধিও পরমেশ্বরই বিধান করেন—"তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্" (গী. ৭. ২৭); কিংবা "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" (গী. ১০. ১০)। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরেরই সত্তা-বলে হইতেছে, তাই ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাঁহারই ভয়ে বায়ু বহিতেছে, এবং তাঁহারই শক্তিতে সূর্য্যচন্দ্র চলিতেছে (কঠ. ৬. ৩; বৃ. ৩. ৮. ৯); এমন কি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটী পত্র পর্য্যন্ত নড়ে না। সেইজন্যই ভক্তিমার্গে উক্ত হয় যে, মনুষ্য কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াই সম্মুখে থাকে (গী. ১১. ৩৩) এবং তাহার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরই তাহার হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহার দ্বারা করাইয়া থাকেন। সাধু তুকারাম বাবা বলেন (গা, ২৩১০. ৪)—

নিমিত্তালা ধনী বেলা আসে প্রাণী।
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা ॥

"এই প্রাণী কেবল নিমিত্তেরই কারণে স্বাধীন; 'আমার আমার' বলিয়া বৃথাই ইহা নিজের সর্ব্বনাশ করে।" এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা আবশ্যক; কিন্তু অজ্ঞানী লোক যেইপ্রকার এই কর্ম্ম 'আমার' বলিয়া করিয়া থাকে সেইরূপ না করিয়া জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবেক—এইরূপ ঈশাবাস্যোপনিষদের যে তত্ত্ব তাহাই উক্ত উপদেশের সার। এই উপদেশেই এই শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"তুমি যাহা কিছু করিবে, খাইবে, হবন করিবে, দিবে কিংবা তপস্যা করিবে সে সমস্ত আমাকে অর্পণ কর" (গী. ৯. ২৭)—তাহা হইলে কর্ম্ম তোমার বন্ধন হইবে না। ভগবদ্গীতার এই শ্লোক শিবগীতায় (১৪. ৪৫) গৃহীত হইয়াছে; ভাগবতের এই শ্লোকেও ঐ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাঽনুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

"কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা আত্মা ইহাদের প্রকৃতিবশতঃ কিংবা স্বভাবানুসারে যাহা কিছু আমরা করি তৎসমস্ত পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে" (ভাগ. ১১. ২. ৩৬)। সার কথা—অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষ, ফলাশা ত্যাগ, কিংবা ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম বলে (গী, ৪. ২৪; ৫. ১০; ১২ ১২) তাহাই ভক্তিমার্গে 'কৃষ্ণার্পণ-পূর্ব্বক কর্ম্ম' এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভক্তিমার্গের লোকেরা ভোজনের সময় গ্রাস লইবার পূর্ব্বে 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এইরূপ যে বলে, কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিই তাহার বীজ। আমার সমস্ত ব্যবহার লোকোপযোগের জন্য নিষ্কামবুদ্ধিতে নির্ব্বাহ হয়—এইরূপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন; ভগবদ্ভক্তও নিজের আহারপানাদি সমস্ত ব্যবহার কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতেই করিয়া থাকেন। ব্রতউদ্যাপন, ব্রাহ্মণভোজন অথবা অন্য ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করিলে শেষে 'ইদং কৃষ্ণার্পণমস্তু' কিংবা "হরির্দাতা হরির্ভোক্তা" এইরূপ বলিয়া

জলত্যাগ করিবার যে রীতি আছে তাহার মূলতত্ত্ব ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকে আছে। কানের গহনা নষ্ট হইলে যেমন কানের ছিদ্রই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ আজকাল ব্যবহারে উক্ত সঙ্কল্পের অবস্থা হইয়াছে; কারণ পুরোহিত তাহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল তোতাপাখীর মত তাহা আওড়ায় এবং যজমান বধিরের ন্যায় জলত্যাগ করিবার কাওয়াজ করে! কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার তত্ত্ব আছে; এবং ইহাকে উপহাস করিলে শাস্ত্রের কোন বৈগুণ্য হয় না, উপহাসকারীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। জীবনের সমস্ত কর্ম্ম—এমন কি জীবন-ধারণ পর্য্যন্ত—এইরূপ কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিলে পর, পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং কুকর্ম্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংবা লোকোপযোগার্থ কর্ম্ম কর, লোকহিতার্থ আত্মসমর্পণ কর, এইরূপ উপদেশেরও দরকার আর কেন হইবে? তখন তো 'আমি' ও 'লোক' এই দুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং এই দুয়েতে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং "জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাচ্যা বিভূতি। দেব কষ্টবিতী উপকারে" তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম যে করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধা পড়ে না, ইহা যুক্তিবাদের দ্বারা পূর্ব্ব প্রকরণে সিদ্ধ করা হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গের পথিককে "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গী. ৯. ২২) এইরূপ স্বয়ং ভগবান্ গীতাতে আশ্বাস দিয়াছেন। যিনি শ্রেষ্ঠ পৈঠায় পৌঁছিয়াছেন সেই জ্ঞানী পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের বুদ্ধিভেদ না করিয়া তাহাদিগকে সৎমার্গে আনয়ন করাই কর্ত্তব্য (গী. ৩. ২৬) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ঠ ভক্তেরও নিম্ন পৈঠায় ভক্তদিগের শ্রদ্ধাকে লণ্ডভণ্ড না করিয়া তাহাদের অধিকার অনুসারে তাহাদিগকে উচ্চতর পৈঠায় উঠাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে এবং কর্ম্মবিপাকে যে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সে সমস্তই এই প্রকারে অল্প শব্দভেদে ভক্তিমার্গেও বজায় রাখা হইয়াছে; এবং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে মিলন স্থাপন করিবার এই পদ্ধতি আমাদের এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে।

কিন্তু যে স্থলে শব্দভেদের দ্বারা অর্থের অনর্থ ঘটিবার ভয় থাকে, সেখানে উপরি-উক্ত শব্দভেদও করা হয় না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয়। উদাহরণ যথা—জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ন করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহা কর্ম্ম-বিপাকক্রিয়ার সিদ্ধান্ত। যদি ইহাতে শব্দের কোন ভেদ করিয়া বলা যায় যে, এই কাজও পরমেশ্বরই করেন, তবে মূঢ় লোকেরা অলস হইয়া যাইবে। এই জন্য "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু (গী. ৬. ৫)—এই তত্ত্ব ভক্তিমার্গে প্রায় যেমনটি তেমনি অর্থাৎ শব্দভেদ না করিয়া বলা হয়। "যে যে কোণাচে কায বা গেলে। জ্যাচে ত্যানে অনহিত কেলে" (গা. ৪৪৪৮), এই তুকারামের অভঙ্গ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

নাহিঁ দেবা পাঁশী নোক্ষাচে গাঠোলে।
আণুনি নিবালে দ্যাবে হাতীঁ।

ইন্দ্রিয়াঁচা জয় সাধুনিয়া মন।
নির্ব্বিষয় কারণ অসে তেথে॥ (গা. ৪২৯৭)।

অর্থাৎ "দেবতার কাছে মোক্ষের গাঁট্‌রী নাই যে তিনি তাহা তোমার হাতে আনিয়া দিবেন। এখানে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মনকে নির্ব্বিষয় করাই মোক্ষলাভের মুখ্য উপায়।" ইহা কি "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" এই উপনিষদের মন্ত্রেরই সহিত একার্থক নহে? পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কর্ত্তা ও কারয়িতা সত্য; তথাপি তাঁহার প্রতি নির্দয়তা ও পক্ষপাতিত্বের দোষ না আসে, এইজন্য কর্ম্মবিপাকক্রিয়ার এই সিদ্ধান্ত যে যাহার যেইরূপ কর্ম্ম তাহাকে সেইরূপ তিনি ফল প্রদান করেন; এই কারণেই এই সিদ্ধান্তও শব্দভেদ না করিয়াই ভক্তিমার্গে গৃহীত হয়। সেইরূপ আবার, উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে ব্যক্ত বলিয়া মানিলেও, যাহা কিছু ব্যক্ত সে সমস্ত মায়া এবং সত্য পরমেশ্বর তাহার অতীত—অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তও আমাদের এখানকার ভক্তি-মার্গে কখনও পরিত্যক্ত হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জন্যই গীতায় বেদান্তসূত্র-প্রতিপাদিত জীবের স্বরূপকেই বজায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যক্ষের দিকে কিংবা ব্যক্তের দিকে মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সহিত তত্ত্বজ্ঞানের গহন সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধর্ম্মের এই নিপুণতা অন্য কোন দেশের ভক্তিমার্গে দেখা যায় না। অন্য দেশবাসীদিগের এই রীতি দেখা যায় যে, তাহারা একবার পরমেশ্বরের কোন সগুণ বিভূতি স্বীকার করিয়া ব্যক্তের পক্ষ গ্রহণ করিলে তাহাতেই আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহারা দেখিতেই পায় না এবং তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ সগুণ প্রতীক সম্বন্ধে বৃথাভিমান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভক্তিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্যা ভেদ করিবার যত্ন করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, গীতাধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বৈদিক জ্ঞানমার্গ শ্রদ্ধাপূত এবং বৈদিক ভক্তিমার্গ জ্ঞানপূত হইয়াছে; এবং সেইজন্য মনুষ্য যে-কোন মার্গই অনুসরণ করুক, শেষে সে একই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত জ্ঞান ও ব্যক্ত ভক্তি, ইহাদের মিলনের এই মহত্ত্ব, নিছক্ ব্যক্ত খৃষ্টেই জড়িত ধর্ম্মের পণ্ডিতদিগের উপলব্ধিতে আসে না, এবং তাই তাঁহাদিগের একদেশদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানের ভাবে অপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতাধর্ম্মে উহাদের মধ্যে বিরোধ প্রতিভাত হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ইহাই যে বৈদিক ধর্ম্মের এই গুণ গ্রহণ না করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অনুকরণপ্রিয় লোক আজকাল ইহাকেই মন্দ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়! মাঘ-কাব্যের (১৯. ৪৩) এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ—"অথ বাহভির্নিবিষ্ট-বুদ্ধিষু। ব্রজতি ব্যর্থকতাং সুভাষিতম্!" মিথ্যা ধারণায় মন একবার অধিকৃত হইলে, ভালো কথাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

স্মার্ত্তমার্গে চতুর্থাশ্রমের যে মহত্ত্ব, তাহা ভক্তিমার্গে কিংবা ভাগবতধর্ম্মে নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণনা ভাগবতধর্ম্মেও করা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ধর্ম্মের মুখ্য কটাক্ষ ভক্তির উপরেই হওয়ায়, যাহার ভক্তি উৎকট সে-ই সকলের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হয়—সে গৃহস্থই হউক, বা বানপ্রস্থীই হউক বা বৈরাগীই হউক; এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্মে কোন বিধি-নিষেধ মানা হয় না (ভাগ, ১১ ১৮. ১৩. ১৪ দেখুন)। সন্ন্যাসাশ্রম স্মার্ত্তধর্ম্মের এক

আবশ্যকীয় ভাগ, ভাগবত ধর্ম্মের নহে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মী কখনই বিরক্ত হইবেক না এইরূপ কোন নিয়ম নাই ; গীতাতেই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই-ই মোক্ষদৃষ্টিতে একই যোগ্যতার, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাই চতুর্থাশ্রম স্বীকার না করিলেও সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে বৈরাগী হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ভক্তিমার্গেও পাওয়া যায়। এই কথা পূর্ব্বকাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তখন এই লোকদিগের প্রাধান্য ছিল না ; এবং একাদশ প্রকরণে আমি এই বিষয় স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, ভগবদ্গীতায়, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগেরই অধিক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে। কালান্তর হইতে কর্ম্ম-যোগের এই মহত্ত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়িয়া বিরক্ত হইয়া কেবল ভক্তিতেই নিমগ্ন থাকিবে ভাগবতধর্ম্মীয় লোকদিগেরও এইরূপ ধারণা হইয়াছে। তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ কি, ভক্তিদৃষ্টিতে এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা পুনর্ব্বার করা আবশ্যক। ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতমার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ ভগবানই। এই ভগবান নিজেই যদি সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা হয়েন এবং সাধুদিগের রক্ষণার্থ ও দুষ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের ধারণ-পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তবে ভগবদ্ভক্তকেও লোকসংগ্রহার্থক তাঁহারই অনুকরণ করা আবশ্যক ইহা পৃথক করিয়া বলিতে হইবে না। হনুমান রামচন্দ্রের মহাভক্ত ছিলেন ; কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে রাবণাদি দুষ্টের শাসন করিবার কাজ কিছু ছাড়িয়া দেন নাই। পরম ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে ভীষ্মকেও গণনা করা হইয়া থাকে ; কিন্তু তিনি নিজে আমরণ ব্রহ্মচারী হইলেও স্বধর্ম্মানুসারে আত্মীয় লোকের এবং রাজ্যের সংরক্ষণ কার্য্য মৃত্যু পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তের নিজের হিতের জন্য কোন কিছু লাভ করা অবশিষ্ট থাকে না সত্য ; কিন্তু প্রেমমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা দয়া, কারুণ্য, কর্ত্তব্য, প্রীতি প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে না ; বরং সেগুলি অধিকতর শুদ্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না যে কর্ম্ম করিবে কি করিবে না। বরং তাঁহাকেই ভগবদ্ভক্ত বলিব, যাঁহার মনে এই প্রকার অভেদভাব উৎপন্ন হয়—

জ্যাসি আপঙ্গিতা নাহীঁ।
ত্যাসি ধরীঁ জে হৃদয়ীঁ।
দয়া করণে জে পুত্রাসী।
ডেঁচি দাসা আণি দাসী॥

অর্থাৎ—"যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে তাহার প্রতি পুত্রের ন্যায় যে দয়া করে,—সে-ই দাস ও দাসী" (গা. ৯৬০)। এই অবস্থাতেই সহজভাবেই ঐ লোকদিগের বৃত্তি লোকসংগ্রহেরই অনুকূল হইয়া উঠে ; ইহা একাদশ প্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি—"সাধু-দিগের বিভূতি জগতের কল্যাণের জন্যই হয় ; তাঁহারা পরোপকারের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দেন।" পরমেশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন এইরূপ বলিলে, সেই জগতের ব্যবহার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি যে ব্যবস্থা আছে তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (গী, ৪. ১৩) এইরূপ ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারানুসারে সমাজের এই কাজ

লোকসংগ্রহার্থ করিবে। ইহার পরে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে তাহার কোন বিশিষ্ট অংশ কোন মনুষ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ করাইবার জন্য পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেন ; এবং পরমেশ্বরকর্ত্তৃক তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজ মনুষ্য যদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই অবজ্ঞা করিবার পাপ হইবে। এই কর্ম্ম 'আমার' কিংবা 'আমি' আপন স্বার্থের জন্য উহা করিতেছি এইরূপ অহংকারবুদ্ধি যদি তোমার মনে থাকে, তবে সেই কর্ম্মের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু 'পরমেশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে দিয়াই কার্য্য করাইতেছেন' (গী. ১১. ৩৩) এইরূপ ভাবনা মনে পোষণ করিয়া পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কেবল স্বধর্ম্ম জানিয়া এই কর্ম্ম যদি তুমি কর, তাহা হইলে ইহাতে অসঙ্গত বা অযোগ্য কিছুই থাকে না ; বরং এই প্রকার স্বধর্মাচরণ হইতেই সর্ব্ব-ভূতান্তর্গত পরমেশ্বরের প্রতি একপ্রকার সাত্ত্বিক ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ গীতার উক্তি। "সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন ; তাই আমি অমুক কর্ম্ম ছাড়িতেছি কিংবা অমুক কর্ম্ম করিতেছি, এই দুই ভাবনাই মিথ্যা ; ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে করিতে থাক ; এই কর্ম্ম আমি করিব না এইরূপ তুমি জেদ করিলেও প্রকৃতিধর্ম্মানুসারে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, এইজন্য সমস্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে বিলীন করিয়া পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোগে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার লোকসংগ্রহার্থ তোমাকে করিতেই হইবে ; আমিও তাহাই করিতেছি ; আমার দৃষ্টান্ত দেখ এবং তদনুরূপ কার্য্য কর"—আপনার সমস্ত উপদেশের এই তাৎপর্য্যার্থ ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে উপসংহাররূপে বলিয়াছেন। জ্ঞানের এবং নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে যেরূপ বিরোধ নাই, সেইরূপই ভক্তি ও কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্মের মধ্যেও বিরোধ উৎপন্ন হয় না। মহারাষ্ট্রের ভগবদ্ভক্তশিরোমণি তুকারাম বাবাও ভক্তিমূলে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (কঠ. ২. ২০ ; গী. ৮. ৯)—পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ—হইতেও বৃহৎ এই পরমেশ্বরস্বরূপের সহিত নিজের তাদাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

অনুরণীয়াঁ থোক্‌ডা। তুকা আকাশা এবঢা।
গিলুনি সাঁডিলেঁ কলিবর। ভবভ্রমাচা আকার॥
সাঁডিলী ত্রিপুটী। দীপ উজললা ঘটী।
তুকা ক্ষণে আতাঁ। উরলোঁ উপকার পুরতা॥

(গা. ৩৫৮৭)

"এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রহিয়াছি"। সন্ন্যাসমার্গীয়দিগের ন্যায় আমার এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই ; বরঞ্চ তিনি বলিয়াছেন—

ভিক্ষাপাত্র অবলম্বণেঁ।
জলো জিণেঁ লাজির বাণেঁ।
ঐসিয়াসী নারায়ণে।
উপেক্ষিজে সর্বথা। (গা. ২৫৯৫)

"ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন লজ্জাস্পদ—উহা নষ্ট হউক ; নারায়ণ এইপ্রকার মনুষ্যকে সর্ব্বথা উপেক্ষাই করেন।" কিংবা—

সত্যবাদী করী সংসার সকল।
অলিপ্ত জলী জৈসে।
ঘতে জ্যা উপকার ভূতাঁচি তে দয়া।
আত্মস্থিতি তয়া অঙ্গী বসে॥

(গা. ৬৭৮০. ২, ৩)

"সত্যবাদী মনুষ্য সংসারের সমস্ত কার্য্য করে এবং জলে কমলপত্রের ন্যায় অলিপ্ত থাকে ; যে উপকার করে এবং প্রাণীদিগের উপর দয়া করে, তাহারই অন্তরে আত্মস্থিতির নিবাস জানিবে।" এই অভঙ্গের মধ্যে তুকারাম বাবার এই বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও তাঁহার মনের গতি অল্পস্বল্প কর্ম্মত্যাগেরই দিকে ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষণ কিংবা গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই হইবে ; তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী মহারাজকে যে "সদ্‌গুরুর শরণ" লইতে বলিয়াছিলেন সেই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর দাসবোধ গ্রন্থের নিকটেই তাহাকে যাইতে হইবে। রামদাস স্বামী অনেকবার বলিয়াছেন যে, ভক্তির দ্বারা কিংবা জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যে সিদ্ধপুরুষ কৃতকৃত্য হইয়াছেন তিনি "শহাণে করুণ সোডাবে। বহুত জন" (দাস. ১৯. ১০. ১৪) "সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য" নিস্পৃহভাবে আপনার কার্য্য যথাধিকার কিরূপ বরাবর করিয়া যান, তাহা দেখিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ ব্যবহার করিতে শিখিবে ; কারণ "কেল্যারিণে কাঁহীঁচ হোত নাহী"—"না করিলে কিছুই হয় না"—(দাস. ১৯. ১০. ২৫ ; ১২. ৯. ৬ ; ১৮. ৭. ৩) ; এইরূপ অনেকবার বলিয়া শেষের দশকে রামদাস স্বামী ভক্তির তারকত্বের সহিত কর্ম্মসামর্থ্যের সম্পূর্ণ মিল এইপ্রকারে করিয়া দিয়াছেন—

সামর্থ্য আছে চলবলেচে।
জো জো করীল ত্যাচেঁ।
পরন্তু যেথে ভগবন্তাচেঁ।
অধিষ্ঠান পাহিজে॥ (দাস. ২০. ৪. ২৬)

গীতার ৮ম অধ্যায়ে "মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ" (গী. ৮. ৭), আমাকে নিত্য স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর—অর্জ্জুনকে এই যে উপদেশ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য, এবং কর্ম্মযোগীদিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ (গী. ৬. ৪৭) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে এই যাহা বলা হইয়াছে যে, তাহারও তাৎপর্য্য একই। গীতার ১৮শ অধ্যায়েও ভগবান ইহাই বলিয়াছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যিনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিজের স্বধর্ম্মানুরূপ নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারা (কেবল বাক্য কিংবা পুষ্পের দ্বারা নহে) পূজা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে" (গী. ১৮. ৪৬)। অধিক কি, এই শ্লোকের এবং সমস্ত গীতারও ইহাই ভাবার্থ

যে, স্বধর্ম্মানুরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে সর্ব্বভূতান্তর্গত বিরাটরূপী পরমেশ্বরের একভাবে ভক্তি, পূজা কিংবা উপাসনাই হয়। "নিজের ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূজা কর" এইরূপ বলিলে, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি নববিধ ভক্তি গীতার মান্য নহে এইরূপ বুঝিবে না। তবে গীতার উক্তি এই যে, কর্ম্মকে গৌণ ভাবিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া নববিধ ভক্তির মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে ; শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত নিজের সমস্ত কর্ম্ম যথারীতি করিতেই হইবে ; উহা 'নিজের' বলিয়া না ভাবিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া "তাঁহার সৃষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ তাঁহারই এই কর্ম্ম" এইরূপ নির্ম্মম-বুদ্ধিতে করিবে ; তাহা হইলে কর্ম্মের লোপ না হইয়া বরং এই কর্ম্মের দ্বারাই পরমেশ্বরের সেবা, ভক্তি কিংবা উপাসনা সম্পন্ন হইবে, এই কর্ম্মজনিত পাপপুণ্য আমাকে স্পর্শ করিবে না এবং শেষে সদ্‌গতিও লাভ হইবে। গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা করিয়া গীতার ভক্তিপর টীকাকার গীতায় ভক্তিকেই প্রধান এবং কর্ম্মকে গৌণ বলিয়া মানা হইয়াছে, এইরূপ ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গীর টীকাকারদিগের ন্যায় ভক্তিপর টীকাকারদিগের এই তাৎপর্য্যার্থও একদেশদর্শী। গীতার ভক্তিমার্গ কর্ম্মপ্রধান ; তাহার মুখ্য তত্ত্ব এই যে, কেবল পুষ্পের দ্বারা কিংবা পাঠের দ্বারা নহে, স্বধর্ম্মোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাও পরমেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পূজা প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং কর্ম্মময় ভক্তির এই তত্ত্ব গীতার ন্যায় যখন অন্য কোথাও প্রতিপাদিত হয় নাই, তখন ইহাকেই গীতার ভক্তিমার্গের বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে।

এইপ্রকার কর্ম্মযোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সমন্বয় হইলেও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গে যে এক বড়-রকম বিশিষ্টতা আছে তাহাও এক্ষণে শেষে স্পষ্টরূপে বলা আবশ্যক। ইহা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানমার্গ কেবল বুদ্ধিগম্য হওয়ায় অল্পবুদ্ধির সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ক্লেশময় ; এবং ভক্তিমার্গ শ্রদ্ধামূলক, প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়া প্রযুক্ত তদনুসারে আচরণ করা সকলের পক্ষে সহজ। কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক বাধা আছে। জৈমিনীয় মীমাংসা কিংবা উপনিষৎ বা বেদান্তসূত্র দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সকলে শ্রৌত যাগযজ্ঞাদির অথবা কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক "নেতি নেতি" স্বরূপ পরব্রহ্মেরই বিচার আলোচনা পূর্ণ ; এবং শেষে ইহাই নির্ণয় করা হইয়াছে যে, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত শ্রৌত যাগাদি কর্ম্ম করিবার অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক উপনিষদাদি বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকারও প্রথম তিন বর্ণেরই অন্তর্গত পুরুষদিগেরই আছে (বেসূ. ১. ৩. ৩৪-৩৮)। এই তিন বর্ণের অন্তর্ভূত স্ত্রীলোক কিংবা চাতুর্ব্বর্ণ্যানুসারে সমস্ত সমাজের হিতকারী কৃষক, কিংবা অন্য ব্যবসায়াবলম্বী সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে ঐসকল গ্রন্থে তাহার বিচার করা হয় নাই। ভাল, বেদ এইরূপে স্ত্রীশূদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না এইরূপ যদি বল, তবে উপনিষদে এবং পুরাণেইতো বর্ণনা পাওয়া যায় যে, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বিদুর প্রভৃতি শূদ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (বেসূ. ৩. ৪. ৩৬-৩৯)। এই অবস্থায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কেবল, প্রথম তিন বর্ণের পুরুষেরাই মুক্তি লাভ করিবে ; এবং স্ত্রী-শূদ্র সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ মানিলে, তাহাদের

জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, 'বিশেষানুগ্রহশ্চ' (বেসূ. ৩. ৪. ৩৮) অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহই উহার এক সাধন; এবং ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মমূলক ভক্তিমার্গের রূপে এই বিশেষানুগ্রহাত্মক সাধনই "স্ত্রীশূদ্র কিংবা (কলিযুগের) নামধারী ব্রাহ্মণদিগের বেদাদি শ্রুতি শ্রুতিগোচর না হওয়ায়, মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও নিরূপিত হইয়াছে" (ভাগ, ১. ৪, ২৫)। এই মার্গে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এক হইলেও, এখন স্ত্রীপুরুষ কিংবা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রসম্বন্ধীয় কোন ভেদ অবশিষ্ট থাকে না এবং এই মার্গের বিশেষ গুণ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র কিংবা অন্ত্যজাদি যে সকল পাপযোনি তাহারাও পরম সিদ্ধি লাভ করে" (গী. ৯, ৩২); এই শ্লোকই মহাভারতের অনুগীতা পর্ব্বেও প্রদত্ত হইয়াছে; (মভা, অশ্ব. ১৯ ৬১); এবং এইরূপ কথাও আছে যে, বনপর্ব্বের অন্তর্গত ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে মাংসবিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণের নিকট, এবং শান্তিপর্ব্বে তুলাধারী অর্থাৎ বণিক, জাজলি নামক ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট স্বধর্ম্মানুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়াই মোক্ষ কিরূপে লাভ করা যায় তাহার নিরূপণ শুনাইয়াছিল (মভা, বন. ২০৬-২১৪; শাং, ২৬০-২৬৩)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই শ্রেষ্ঠ; তা সে ব্যবসায়ে স্বর্ণকারই হউক, ছুতারই হউক, বেণেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক। কোন মনুষ্যেরই যোগ্যতা তাহার ব্যবসায় কিংবা জাতির উপর নির্ভর করে না—সমস্তই তাহার অন্তঃকরণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, এবং ভগবানের অভিপ্রায়ও ইহাই। সমাজের সমস্ত লোকের নিকট এইরূপে মোক্ষের দ্বার খুলিয়া দিলে, সমাজে যে এক বিশেষ জাগৃতি উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাষ্ট্রীয় ভাগবতধর্ম্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে দেখা যায়। কি স্ত্রী, কি চণ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের নিকট সকলেই সমান, "দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত", প্রতীকের জন্য নহে, কালো সাদা বর্ণের জন্য নহে এবং স্ত্রীপুরুষাদি কিংবা ব্রাহ্মণচণ্ডালাদি ভেদাভেদির জন্যও নহে। তুকারাম বলেন (গা, ২৩৮২.৫. ৬)—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শূদ্র। চাণ্ডলাঁ আছে অধিকার।
বালে নারীনর। আদিকরোনি বেশ্যাহী ॥
তুকা ক্ষণে অনুভবেঁ। আম্হী পাড়িয়লেঁ ঠাবেঁ।
আণিকহী দৈবেঁ। সুখ ঘেতী ভাবিকেঁ ॥

আর অধিক কি বলিব? গীতাশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, "মনুষ্য যতই দুরাচারী হউক না, নিদেন অন্তকালেও অনন্যমনে সে যদি ভগবানের শরণ লয় তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন না" (গী. ৯. ৩০; ও ৮. ৫-৮ দেখুন)। 'বেশ্যা' এই শব্দ উপরি-উক্ত অভঙ্গে দেখিয়া, পবিত্রতার ভাণকারী অনেক বিদ্বান লোকের বোধ হয় খারাপ লাগিবে। কিন্তু এই সব লোক প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানেন না, এইরূপ বলিতে হয়। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে (মিলিন্দ প্রশ্ন, ৩.

৭. ২)। বুদ্ধ আম্রপালী নামক বেশ্যাকে এবং অঙ্গুলীমাল নামক চোরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ কথা আছে। খৃষ্টের সহিত এক সঙ্গে বধস্তম্ভের উপর আরোহিত দুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খৃষ্টের শরণ লওয়ায় খৃষ্ট তাহাকে সদ্গতি দিয়াছিলেন এইরূপ খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকেও বর্ণনা আছে (লূক, ২৩, ৪২ ও ৪৩)। আমার ধর্ম্মের উপর যাহার শ্রদ্ধা আছে সেই বেশ্যাও মুক্তিলাভ করে, খৃষ্টেই এইরূপ একস্থানে বলিয়াছেন (মেথ্যু, ২১-৩১; লূক্ ৭. ৫০); অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হয় এইরূপ আমি পূর্ব্বে ১০ম প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই ধর্ম্মতত্ত্ব শাস্ত্রতঃ নির্ব্বিবাদ হইলেও যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারেই কাটিয়াছে তাহার শুদ্ধ অন্তকালেই অনন্যভাবে ভগবানের শরণ লইবার বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় অন্তকালের যাতনার মধ্যে, কেবল যান্ত্রিকভাবে 'রা' বলিয়া পরে বিলম্বে 'ম' বলিয়া মুখ খুলিবার এবং বন্ধ করিবার পরিশ্রম ব্যতীত বেশী আর কিছুই লাভ হয় না। এই জন্য কেবল মরণসময়েই নহে, সমস্ত জীবন সর্ব্বদা আমার স্মরণ মনোমধ্যে স্থির রাখিয়া, স্বধর্ম্মানুসারে আপনার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিয়া যাও তাহার পর তুমি যে-জাতিই হওনা কেন, কর্ম্ম করিয়াই তুমি মুক্ত হইবে, এইরূপ ভগবান সকলকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিয়াছেন (গী. ৯. ২৬-২৮ ও ৩০-৩৪ দেখুন)।

এইপ্রকারে বর্ণের, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্ত্রীপুরুষাদিরও ভেদ না রাখিয়া, এবং ব্যবহার লোপ না করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান আবালবৃদ্ধ সকলেরই সুলভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতোক্ত ভক্তিমার্গের এই সামর্থ্য ও সমতার প্রতি লক্ষ্য করিলে "সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি একান্তভাবে আমারই শরণ লও, আমি সর্ব্ব পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান গীতাশাস্ত্রের যে উপসংহার করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সুস্পষ্ট হয়; সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকিয়াও পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তিরূপ আত্মশ্রেয়ঃসম্পাদন করিবার যে প্রত্যক্ষ মার্গ কিংবা উপায় তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দের এইস্থানে উপযোগ করা হইয়াছে। অনুগীতায় গুরুশিষ্যসংবাদে অহিংসাধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, ব্রত ও উপবাস, জ্ঞান, যাগযজ্ঞ, দান, কর্ম্ম, সন্ন্যাস ইত্যাদি যে অনেক প্রকার মুক্তির উপায় অনেক লোক প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধন কোন্‌টি তাহা আমাদিগকে বল, এইরূপ ঋষিরা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (অশ্ব. ৪৯); এবং শান্তিপর্ব্বে (শাং. ৩৫৪) উঞ্ছবৃত্তি উপাখ্যানেও এই প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে যে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বানপ্রস্থধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মাতৃ-পিতৃসেবাধর্ম্ম, রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মরণ, ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায় ইত্যাদি যে অনেক ধর্ম্ম কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাহ্য ধর্ম্ম কোন্‌টি। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমার্গ কিংবা ধর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু শাস্ত্রকার এই সকল প্রত্যক্ষ মার্গের যোগ্যতা একই মনে করেন; কারণ সর্ব্বভূতে সাম্যবুদ্ধি এই যে চরম সাধ্য তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে কোনও এক ধর্ম্মের উপর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে একাগ্র না করিলে পাওয়া যায় না। তথাপি এই নানা মার্গের অথবা প্রতীকোপাসনার গোলযোগের মধ্যে পড়িলে মন হতবুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুদ্ধ অর্জ্জুনকে নহে,

অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন যে, এই অনেক ধর্ম্মমার্গ ছাড়িয়া "তুমি শুধু একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না"। তুকারাম বাবাও সর্ব্বধর্ম্ম নিরসন করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন—

... ...

জলো তে জপীব জলো তে শাহানীব।
রাহো মাঝা ভাব বিঠ্ঠল পাথীঁ।

... ...

জলো তো আচার জলো তো বিচার।
বাহোমন স্থির বিঠ্ঠল পায়ীঁ॥ (গা. ৩৪৬৪)

নিশ্চয়পূর্ব্বক উপদেশ বা প্রার্থনা এই চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ সুবর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অন্নের মধ্যে 'ভক্তি'রূপ এই অন্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর। ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ডূষ করিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্।

ইতি ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ

গীতাধ্যায় সঙ্গীত

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ।*

মহাভারত, শান্তি. ২১৭. ২

কর্ম্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কিংবা ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাত্মৈক্যরূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া সংসারে• শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ কিংবা জীবনযাপনের উত্তম মার্গ, ইহাই ভগবান্ কর্ত্তৃক গীতা, উপনিষদ, ভগবদ্গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা উপলব্ধ হইবে। কিন্তু যে ক্রম অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রন্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায় ভগবদ্গীতায় ইহার কিরূপ বিন্যাস করা হইয়াছে, এইখানে তাহারও একটু আলোচনা করা আবশ্যক। কোনও বিষয়ের নিরূপণ দুই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে পারে; এক শাস্ত্রীয়, আর-এক পৌরাণিক; তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য বিষয় হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তর্কশাস্ত্রানুসারে সাধক-বাধক প্রমাণ যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্ত্রীয় পদ্ধতি। ভূমিতিশাস্ত্র এই পদ্ধতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ; ন্যায়সূত্র কিংবা বেদান্তসূত্র—ইহাদের উপপাদনও এই বর্গের মধ্যে আসে। তাই ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে উহার বিষয়টি হেতুযুক্ত ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" (গী ১৩. ৪)। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিরূপণ সশাস্ত্র হইলেও উহা এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে করা হয় নাই। ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া তাহার পর "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" এইরূপ গীতানিরূপণের স্বরূপদ্যোতক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিরূপণের প্রভেদ স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিরূপণকেই 'পৌরাণিক' নাম দিয়াছি। সাত শত শ্লোকের এই সম্বাদাত্মক বা পৌরাণিক নিরূপণে "ধর্ম্ম" এই ব্যাপক শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহাদের সকলগুলির সবিস্তর বিচার আলোচনা করা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু যত সংক্ষেপেই হউক

* "নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্মকে প্রবৃত্তিমূলক বলিয়াছেন।" নর ও নারায়ণ এই দুই ঋষিদের মধ্যেই এই নারায়ণ ঋষি ছিলেন; এবং এই দুয়েরই অনুক্রমে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার, নারায়ণীয় ধর্ম্মই গীতার প্রতিপাদ্য—এই সম্বন্ধে মহাভারতের বচনও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

না কেন) গীতায় অনেক বিষয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন করিয়া হইল ইহাই আশ্চর্য্য ! ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি ব্যক্ত হইতেছে ; এবং অনুগীতার আরম্ভে যে বলা হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ "অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে কথিত হইয়াছে" তাহারও সত্যতায় বিশ্বাস হয়। অর্জ্জুন যাহা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন তাহা পুনর্ব্বার সবিস্তর বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিব কি না, এবং করিলেও কিরূপে করিব ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তরে দুএকটি যুক্তি দেখাইতে থাকিলে, অর্জ্জুন সেই সম্বন্ধে কোন-না-কোন আপত্তি উত্থাপন করিতেছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদে গীতার বিচার-আলোচনা স্বভাবতই কখনো ভাঙ্গাভর্ত্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর কখনো বা পুনরুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ যথা,—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের বর্ণনা স্বল্পভেদে দুইস্থানে (গী. অ. ৭ ও ১৪) করা হইয়াছে ; আবার স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভূত—ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও, বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে। উল্টাপক্ষে, 'অর্থ ও কাম যদি ধর্ম্মকে না ছাড়ে তবেই তাহা গ্রাহ্য হয়, এই তত্ত্বের—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি" (৭. ১১) এই একটি বচনেই গীতা ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা হইলেও শ্রৌতধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, সাংখ্যশাস্ত্র, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, কর্ম্মবিপাক, ইত্যাদির যে সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের আধারের উপর গীতার জ্ঞানের নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাদের পরম্পরা যে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়া যায়। এবং গীতার প্রতিপাদনের রীতি ঠিক্ ঠিক্ উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদিগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, গীতা একপ্রকার ভেল্কীবাজি, অথবা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্য গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞানই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সংশয়নিবৃত্তির জন্য টীকা দেখিলেও বিশেষ লাভ হয় না ; কারণ, তাহা অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টীকাকারদিগের মতসম্বন্ধীয় পরস্পর-বিরোধের সমন্বয় করা দুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন অধিকাধিক বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন সুপ্রবুদ্ধ পাঠকও এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন আমি জানি। এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস করিয়া এ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এস্থলে আর একটু এই বলিতে চাহি যে, এই বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে অর্জ্জুনের প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিলে এই বিচার আলোচনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্ত্তী প্রকরণে সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা সহজ হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ও পূর্ণস্বরাজ্যের সুখ সম্ভোগ করিতেছিল, তখন এক সর্ব্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী যশস্বী ও পরমপূজ্য ক্ষত্রিয় আর একজন মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধর্ম্মানুযায়ী স্বকর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জৈন

ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ, এই দুইজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহাঁরা উভয়েই বৈদিক ধর্ম্মের কেবল সন্ন্যাসমার্গকে স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত বর্ণের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ করেন নাই ; কারণ, ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ এই যে, শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্মণদিগকেও নিবৃত্তিমার্গের শান্তির সঙ্গেসঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে। যে কোন উপদেশই হউক না কেন, তাহার কোন-না-কোন কারণ অবশ্যই থাকে ; এবং সেই উপদেশের সফলতা চাহিলে, শিষ্যের মনে উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকা আবশ্যক। তাই, এই দুই বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্যই ব্যাসদেব গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইয়াছিল, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। কৌরব ও পান্ডবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব আছে ; ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের মাঝখানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যাঁহাদের সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে দেখ"। তখন অর্জ্জুন উভয় সৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপনারই বাপ, কাকা, পিতামহ, মাতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভৃতি দুইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ! যুদ্ধ করা পূর্ব্বে হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেরই সৈন্যসংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার ন্যায় মহাযোদ্ধারও মনে বিষাদ আসিল এবং তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল "রাজ্যলাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমরা করিতে বসিয়াছি ; ইহা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়স্কর নহে ?" এবং পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে "শত্রুরা আমার প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা বা কুলক্ষয়ের ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।" অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হাত-পা শিথিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, এবং বিষণ্ণ বদনে হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া বেচারা রথে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন—এই কথা প্রথম অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে "অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ" বলে। কারণ, সমস্ত গীতায় ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত (কর্ম্ম-) যোগশাস্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাকে এই কর্ম্মযোগশাস্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয়াই প্রত্যেক অধ্যায়কে তাহার বিষয়ানুসারে অর্জ্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত 'যোগ' একত্র হইলে পর তাহাই "ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্র" হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ত্ব কি, তাহা আমি এই গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহা ঠিক না জানিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যক্‌রূপে আমার মনে আসে না। "সাংসারিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনেই প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা",—ইহাই যদি গীতার তাৎপর্য্য বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া ভিক্ষা মাগিতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাঁহাকে এই উপদেশ দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রথম অধ্যায়েরই শেষে "বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিয়াছ; তোমার এই উপরতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! চল, আমরা দুজনেই এই কর্ম্মময় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!" এইরূপ অর্থের দুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিয়া সেইখানেই গীতা সমাপ্ত করা উচিত ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়া গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বৎসর কাল (মভা. আ. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর দুর্ব্যহার করিতেন তাহা হইলে তাহার দোষ বেচারী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অর্জ্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, কিন্তু যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্পই ভয় করিবে! জগতের লোক যাহাই বলুক' না; "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জা. ৪)—যখনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব করিবে না—উপনিষদে তো ইহাই উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক ছিল না, মোহমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই তো হইয়াছিল; তাহা হইলেই অর্দ্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই উপরতিকেই পূর্ণ জ্ঞানমূলক করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিলে সেই বিতৃষ্ণার দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাহরণ ভক্তিমার্গে বা সন্ন্যাসমার্গেও আছে। অর্জ্জুনেরও এই প্রকার দশা হইত। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বস্ত্র গেরুয়া করিবার জন্য এক মুঠা গেরুয়া মাটি কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তাল মৃদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে।

কিন্তু সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"অর্জ্জুন, তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি কি করিয়া আসিল? এই ক্লৈব্য তোমার শোভা পায় না! ইহা তোমার কীর্ত্তিনাশ করিবে! অতএব এই দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও!" তথাপি অর্জ্জুন কাপুরুষের ন্যায় পুনর্ব্বার প্রথমেই কান্নার সুর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন—"আমি ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে কি করিয়া বধ করিব? মরা ভাল কি মারা ভাল, এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বল; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি"। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জ্জুন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন; এবং একটু হাসিয়া "অশোচ্যানন্বশোচস্তবং" ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং কর্ম্মসন্ন্যাসের কথাও পাড়িয়াছিলেন। তাই, জগতে "'কর্ম্মত্যাগ' ও 'কর্ম্মসাধন'—জ্ঞানীপুরুষদিগের এই যে দুই আচরণ-পন্থা অর্থাৎ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেই ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটি নিষ্ঠা গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল করিতেছ ইহাই অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের প্রথম উক্তি। তাহার পর, যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যনিষ্ঠার উপরে, অর্জ্জুন কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে "এষা তেঽভিহিতা

বুদ্ধিঃ" (গী, ২. ১১-৩৯) পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেন; এবং আবার অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, কর্ম্মযোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য এইরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" এইরূপ শ্লোক "অশোচ্যানন্বশোচস্তবং" এই শ্লোকের পূর্ব্বে যদি আসিত তাহা হইলে এই অর্থই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্ভাষণের প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমার্গের প্রতিপাদন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে—"ইহাতো সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদিত হইল; এক্ষণে যোগমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করিতেছি।" যাহাই হউক না কেন, কিন্তু অর্থ একই। সাংখ্য (বা সন্ন্যাস) এবং যোগ (বা কর্ম্মযোগ) ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১শ প্রকরণে প্রথমেই আমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। অতএব তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানলাভ হইলে পর মোক্ষের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্যমার্গ' বলে; এবং কর্ম্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ বলে।

ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞানানুসারে আত্মা অমর ও অবিনাশী হওয়ায় "ভীষ্মদ্রোণাদিকে আমি বধ করিব" তোমার এই ধারণাটাই মিথ্যা; কারণ, আত্মা মরেও না, মারেও না। মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্ত্র বদলায় সেইরূপই আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র; কিন্তু সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে। ভাল; "আমি বধ করিব" এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধ কেন করিব এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত না হওয়াই ক্ষাত্রধর্ম্ম; এবং যখন এই সাংখ্যমার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ? 'আমি মারিব', 'সে মরিবে' এই নিছক কর্ম্মদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধর্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে তুমি আপন প্রবাহপতিত কার্য্য কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গানুসারে এই উপদেশ হইল। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় থাকিয়া যায় যে, উপরতি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ ছাড়িয়া (সম্ভব হইলে) তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা কি ভাল নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়া তাহার পর বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে এইরূপ মন্বাদি স্মৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, যখনই হউক সন্ন্যাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা হইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই উপনিষদেও "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" (জা. ৪) এইরূপ বচন পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় সেই গতিই প্রাপ্ত হয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥

"হে পুরুষব্যাঘ্র ! সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে দুইজন গমন করেন ; এক যোগযুক্ত সন্ন্যাসী, আর এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হইয়া মরে". এইরূপ মহাভারতে (উদ্যো, ৩২. ৬৫) উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থাৎ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও এই অর্থের এক শ্লোক আছে—

যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি ।
ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ ॥

"স্বর্গেচ্ছু ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও ছাড়াইয়া যায়" ;—অর্থাৎ শুদ্ধ তপস্বী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগযজ্ঞদীক্ষিতেরাও যে গতি প্রাপ্ত হয়, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতিই লাভ করে, (কৌটি ১০. ৩. ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং, ৯৮-১০০ দেখুন)। যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্‌ঘাটিত হয় ; যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে পৃথিবীর রাজ্য পাওয়া যায়" (২. ৩২. ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য্যও ইহাই। অতএব, ইহাও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে, সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা যুদ্ধ কর, ফল একই। কিন্তু 'যাই বল না কেন, যুদ্ধ করিতেই হইবে' এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে ভগবান্ কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্মযোগেরই—অর্থাৎ কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কর্ম্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয়, তাহার বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোনও কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্ম্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা কর্ত্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে,—ইহাই কর্ম্মযোগতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব (গী. ২. ৪৯)। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ইহা স্থির করাও শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্ব্বাচনকারী বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না। এই জন্য সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কেও স্থির করা আবশ্যক, (গী. ২. ৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে প্রতীত হয় যে, অনেক লোক স্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য সুখ লাভ করিবার জন্যই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য কর্ম্মের বৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি—আজ এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল হইয়া থাকে। এই সব লোকেরা স্বর্গসুখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কর্ম্ম-যোগমার্গের রহস্য অর্জ্জুনকে এই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্ম্মের কাম্য উদ্যোগ ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে শিখ ; কর্ম্ম করিবার অধিকার তোমার আছে ; কর্ম্মের ফল পাওয়া কি না পাওয়া—ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নহে

(২. ৪৭) ; ফলদাতা পরমেশ্বর, ইহা মনে করিয়া, কর্ম্মের ফল পাওয়া যাক্ বা নাই যাক্ দুইই সমান. এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়াই যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের পাপপুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না : অতএব এই সমবুদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর ; এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ না লাগে এইরূপ কর্ম্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে ; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম্ম করিলেও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে ; মোক্ষের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসই করিতে হইবে এরূপ নহে (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় (২. ৫৩), তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, "স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা আমাকে বল"। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে এইরূপ বলা হইয়াছে। সারকথা, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য "কর্ম্মত্যাগ" (সাংখ্য) ও "কর্ম্মসাধন" (যোগ) এই দুই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে ; এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে তাহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগমার্গানুসারে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে ; এবং এই কর্ম্মযোগের স্বল্পাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যন্ত লইয়া চলিলেন যে, কর্ম্ম-যোগমার্গে কর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাক্ যে, পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগমার্গেও-কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় সম করিলেই হইল ; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কেন তবে বলিতেছ ?" ইহার কারণ এই যে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলেই, "যুদ্ধ কেন করিবে ? বুদ্ধিকে সম রাখিয়া উদাসীন হইয়া কেন বসিয়া থাকিবে না," এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় না। বুদ্ধিকে সম রাখিয়াও কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারা যায় না এইরূপ নহে। তারপর, সমবুদ্ধি পুরুষের সাংখ্যমার্গানুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধা কি ? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ এইরূপ দিতেছেন যে, পূর্ব্বে তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি সত্য ; কিন্তু ইহাও মনে রেখো যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবেই ; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্ম ছাড়িতেই পারে না, তখন ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকা অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম্ম কর ; কর্ম্ম না করিলে তোমার খাওয়া পর্য্যন্ত চলিবে না (৩. ৩-৮)। পরমেশ্বরই কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন ; মনুষ্য নহে। ব্রহ্মদেব যখন জগৎ ও প্রজা সৃষ্টি করিলেন সেই সময়েই তিনিই 'যজ্ঞে'রও সৃষ্টি

করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কর্ম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য ও কর্ম্ম দুই-ই এক সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু এই কর্ম্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং যজ্ঞ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এই কারণে এই কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা সত্য যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হইয়াছেন তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না ; এবং লোকদিগের নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না যে, কর্ম্ম করিবে না ; কারণ, কর্ম্ম হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না বলিয়া ইহাই অনুমান করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না করিলেও সেই কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে করা আবশ্যক (গী. ৩. ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং আমিও করিতেছি ; তাহাছাড়া ইহাও মনে রাখি যে, 'লোকসংগ্রহ' করা অর্থাৎ নিজের আচরণের দ্বারা লোকদিগকে ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী পুরুষদিগের অন্যতম মুখ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউন না কেন, প্রকৃতির ব্যবহার হইতে তাঁহার মুক্তি হয় না : অতএব কর্ম্মত্যাগ করা ত দূরের কথা, কর্ত্তব্য বলিয়া স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতে থাকা এবং আবশ্যক হইলে যদি তাহাতে মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর (৩. ৩০-৩৫) ; তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন দেখিয়া মনুষ্যের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ; তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কাম-ক্রোধাদি বিকার বলপূর্ব্বক মনকে ভ্রষ্ট করে ; অতএব ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি সমতাপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না ; অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে—এইরূপে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করা হইয়াছে ; এবং ভক্তিমার্গের "আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কর" (৩. ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার তত্ত্বেরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে।

কিন্তু এই বিচার-আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা কেবল অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই নূতন রচিত এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয় ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে এই কর্ম্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের ত্রেতাযুগবাহী পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আদিতে কিংবা যুগারম্ভে আমিই এই কর্ম্মযোগমার্গ বিবস্বান্‌কে, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে ইহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঐ যোগই (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি এক্ষণে তোমাকে পুনর্ব্বার বলিলাম ; তখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে তুমি কি করিয়া আসিবে ? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান বলিলেন যে, সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্ম্মের স্থাপনা করাই আমার অনেক অবতারের প্রয়োজন ; এবং এইরূপ লোকসংগ্রহ

কারক কর্ম্ম আমি করিলেও আমার তাহাতে আসক্তি না থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ করে না। এই প্রকারে কর্ম্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ত্ব জানিয়াই জনকাদিও পূর্ব্বে কর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়া তুমিও সেইরূপই কর্ম্ম কর, ভগবান অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার এইরূপ উপদেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে যে, "যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না" তাহাই পুনর্ব্বার বলিয়া 'যজ্ঞের' বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইয়াছে যে, কেবল তিল-তণ্ডুল দগ্ধ করা কিংবা পশু বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ সত্য, কিন্তু এই দ্রব্যময় যজ্ঞ হাল্‌কা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দগ্ধ করা কিংবা 'ন মম' বলিয়া, ব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দেওয়া উচ্চ পৈঠার যজ্ঞ। তাই সেই উচ্চদরের যজ্ঞের জন্য ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম কর অর্জ্জুনকে এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। তাই, যজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলেও তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ এই দুইই বন্ধন হয় না। শেষে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূত আপনাতে বা ভগবানে আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি। এবং এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্ত্তায় অর্শে না। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের লয় হয় ; কর্ম্ম স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই বন্ধনের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ কর এবং কর্ম্মযোগকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সারকথা, কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধিরূপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে, তাহার কারণসমূহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথা বলিয়া কর্ম্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বারংবার বলা হইয়াছে, তাই এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টি তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক। কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান বলিলেও পরিণাম হইবে এই যে, যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে মিশ্রিতভাবে আমাকে না বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টী তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে যদি বল, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার সুবিধা হয়"। ইহার উত্তরে ভগবান স্পষ্টরূপে ইহা বলিয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিলেন যে, দুই মার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষপ্রদ হইলেও, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেরই মহত্ত্ব অধিক—"কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে"—(৫. ২)। এই সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়ীকরণার্থ ভগবান্ আরও বলিলেন যে, সন্ন্যাস বা সাংখ্যনিষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কর্ম্মযোগের দ্বারাও লাভ হয়ই ; শুধু তাহাই নহে ; কর্ম্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না ; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে

পর, যোগমার্গে কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মলাভ না হইয়া যায় না। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি—যে, সাংখ্য ও যোগ ইহারা ভিন্ন ? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আঘ্রাণ করা ইত্যাদি শত শত কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শান্তি ও মোক্ষ লাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম কর এইরূপও বলেন না, আর কর্ম্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতিরই খেলা ; এবং বন্ধন মনের ধর্ম্ম ; এই কারণে সমবুদ্ধি কিংবা 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধা হয় না। অধিক কি, এই অধ্যায়ের শেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী— ইহাদের সম্বন্ধে যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া আপনার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়া চলিয়াছে ; এবং এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক সমবুদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া সংসারের প্রাপ্ত কর্ম্ম করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী ; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। তাহার পর, ভগবান্ আত্মস্বাতন্ত্র্যের এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে ; তাহা না করিলে তাহার দোষ অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার পরে, এই অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, পাতঞ্জল দৃষ্টিতে, মুখ্যরূপে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু যম-নিয়ম-আসনপ্রাণায়ামাদি সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেই কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না ; সেই কারণে আত্মৈক্যজ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরে সেই ব্যক্তির বৃত্তি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" কিংবা "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্ব্বভূতে সম হওয়া চাই। ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এই সাম্যবুদ্ধিরূপ যোগ এক জন্মে সিদ্ধ না হইলে আবার অন্য জন্মেও আরম্ভ হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে—এবং পুনর্ব্বার সেই দশাই হইবে—এবং এই প্রকার যদি এই চক্র ক্রমাগতই চলিতেই থাকে, তবে এই মার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার থাকিয়া যায় এবং তাহার সহায়তায় অন্য জন্মে অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শেষে সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, কর্ম্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ সুসাধ্য হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশা না ছাড়িয়া) কর্ম্ম করা, তপশ্চর্য্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা

—এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগমার্গের আচরণ কর।

কাহারো কাহারো মত এই যে, এইস্থলে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহার পর জ্ঞান ও ভক্তিকে 'স্বতন্ত্র' নিষ্ঠা মানিয়া ভগবান উহার বর্ণন করিয়াছেন—অর্থাৎ এই দুই নিষ্ঠা পরস্পর নিরপেক্ষ বা কর্ম্মযোগেরই তুল্যমূল্য ; কিন্তু উহা হইতে পৃথক এবং উহার পরিবর্ত্তে বিকল্পস্বরূপে আচরণীয় ; সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তি এবং পরে শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন ; এবং এই প্রকারে আঠারো অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভের শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, "সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং যুদ্ধই করিতে হইলে তাহার পাপ কি করিয়া এড়াইব", যখন অর্জ্জুনের এই মুখ্য সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন "জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং তাহা কর্ম্মের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভক্তি নামে এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে" এইরূপ 'ধরাছাড়া' ও নিষ্ফল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতেই পারিত না। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুন যখন একমাত্র নিশ্চয়াত্মক মার্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও চতুর শ্রীকৃষ্ণ আসল কথা ছাড়িয়া তাঁহাকে তিনি স্বতন্ত্র ও বিকল্পাত্মক মার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় 'সন্নাস' ও 'কর্ম্মযোগ' এই দুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫. ১) ; তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ যে অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা তো কোথাও বলাই হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের নিজের মনগড়া ; এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার করা হইয়াছে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা থাকায় এই তিন নিষ্ঠার কথা কদাচিৎ ভাগবত হইতেই তাঁহাদের মনে আসিয়াছে (ভাগ. ১১. ২০. ৬) কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্‌গীতার তাৎপর্য্য যে এক নহে, সে কথা টীকাকারদিগের মনে হয় নাই। শুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের জন্য জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও মান্য। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত, ভাগবতকার এ কথাও বলেন যে, জ্ঞান ও নৈষ্কর্ম্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও ঐ দুই-ই (অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) ভক্তি ব্যতীত শোভা পায় না—'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্' (ভাগ. ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ২. ১২)। এইরূপে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগবতকার কেবল ভক্তিকেই প্রকৃত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদ অবস্থা মনে করেন। ভগবদ্‌ভক্তেরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবেনই না, ভাগবত এরূপও বলেন না এবং করিতেই হইবে, এ কথাও বলেন না। নিষ্কাম কর্ম্ম কর বা না কর, এ সমস্ত ভক্তিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩. ২৯. ৭-১৯), ভক্তি না থাকিলে সমস্ত কর্ম্মযোগ পুনর্ব্বার সংসারে অর্থাৎ জন্মমরণের ফেরে আনিয়া ফেলে (ভাগ. ১. ৫. ৩৪. ৩৫), ভাগবত কেবল এই কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই থাকায়, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেও ভক্তিযোগেই ঠেলিয়া দিয়া

এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই প্রকৃত নিষ্ঠা। কিন্তু ভক্তিই গীতার কিছু মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত বা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম লাগাইবার মত অনুচিত। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তি আর কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনে ভক্তি এক সহজ মার্গ—এ কথা গীতার সম্পূর্ণ মান্য। কিন্তু এই মার্গের সম্বন্ধে আগ্রহ না রাখিয়া, মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রাপ্তি যাহার মার্গ সহজ হইবে সেই মার্গের দ্বারা সে করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন। শেষে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম্ম করিবে কি করিবে না—ইহাই তো গীতার মুখ্য বিষয়। তাই, সংসারে কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা—জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনে এই যে দুই মার্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ দুই মার্গ হইতেই গীতার আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ভাগবতকারের মত গীতা প্রথম মার্গের 'ভক্তিযোগ' এই নূতন নাম না দিয়া, নারায়ণীয় ধর্ম্মে প্রচলিত প্রাচীন নামই অর্থাৎ ঈশ্বরাপর্ণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'কর্ম্মনিষ্ঠা' এবং জ্ঞানোত্তর কর্ম্মত্যাগকে 'সাংখ্য' বা 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এই নামই গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে। গীতার এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমান ভক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না। কারণ, 'কর্ম্ম করা' ও 'না করা অর্থাৎ ছাড়া' (যোগ ও সাংখ্য) এই অস্তি-নাস্তিরূপ দুই পক্ষের অতিরিক্ত কর্ম্মসম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে না। তাই, ভক্তিমান্ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে লাগিয়াছে, কেবল ইহা ধরিয়াই তাহার নির্ণয় না করিয়া, সেই ব্যক্তি কর্ম্ম করে কি করে না তাহারই বিচার করা আবশ্যক। ভক্তি পরমেশ্বরপ্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থে যদি ভক্তিকেই 'যোগ' বলা যায় (গী. ১৪. ২৬) তথাপি তাহা চরম 'নিষ্ঠা' হইতে পারে না। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কেহ কর্ম্ম করিলে তাহাকে কর্ম্মনিষ্ঠ এবং না করিলে তাহাকে সাংখ্যনিষ্ঠ বলিতে হয়। তন্মধ্যে কর্ম্ম করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়স্কর, ভগবান্ আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয়ই না, তাই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেই হইবে;—সন্ন্যাসমার্গীর কর্ম্মসম্বন্ধে এই একটা বড় আপত্তি আছে। এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্ন্যাস মার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কর্ম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী ৫, ৫), তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোনও খোলসা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তাই কর্ম্ম করিতে করিতেই শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট ও মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন। এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ভক্তি নামক এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি এইরূপ না বলিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

"হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ অর্থাৎ

কর্ম্মযোগ সাধন করিবার সময় 'যথা' অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় পূর্ণ জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি) তুমি শোন" (গী ৭. ১); এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 'জ্ঞানবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে (গী, ৭, ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি প্রদত্ত 'ময্যাসক্তমনাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে 'যোগং যুঞ্জন্' অর্থাৎ "কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে" এই পদের খুবই গুরুত্ব আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টীকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 'যোগং' অর্থাৎ সেই কর্ম্মযোগ, যাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে থাকিলে যে প্রকার বিধি বা রীতিতে ভগবানসম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথা এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেওয়া হইয়াছে। তাই এই শ্লোকের অর্থের প্রতি উপেক্ষা করিয়া 'প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভক্তিনিষ্ঠা স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে' এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ বিপরীত অর্থ যাহাতে কেহ না করে এইজন্যই এই শ্লোকে "যোগং যুঞ্জন্" পদ ইচ্ছা করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; এবং তাহার পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক সেই পাতঞ্জল যোগের সাধন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কর্ম্মযোগের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের এক প্রকার কসরত করানো। এই অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অধীনে রাখা যায় সত্য; কিন্তু মনুষ্যের বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্দ্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোনও লাভ হয় না। কারণ দেখা যায় যে, বাসনা দুষ্ট হইলে কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ দুষ্কর্ম্মে এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সিদ্ধিরই উপযোগ করিয়া থাকে। তাই ষষ্ঠ অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এইভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই (গী. ৬. ২৯); এবং বাসনার এই শুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি ব্যতীত হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, কর্ম্মযোগে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিলেও 'রস' অর্থাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইতে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা বিষয়বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরসম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হওয়া চাই। এই কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (গী ২. ৫৯)। তাই, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতেই পরমেশ্বরের এই জ্ঞান যে রীতি অথবা বিধির দ্বারা হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন। 'কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে' এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কর্ম্মযোগ যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে না; এবং সেইজন্য ভক্তি ও জ্ঞানকে কর্ম্মযোগের পরিবর্ত্তে বিকল্প হিসাবে মানিয়া এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বলা হইয়াছে, এ কথাও নির্মূল হইয়া পড়ে। গীতার কর্ম্মযোগ ভাগবতধর্ম্ম হইলেই গৃহীত হওয়ায়, কর্ম্মযোগে জ্ঞানলাভ বিধির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধর্ম্ম কিংবা নারায়ণীয় ধর্ম্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা

এবং এই অভিপ্রায়েই শান্তিপর্ব্বের শেষে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, “প্রবৃত্তিমূলক নারায়ণীয় ধর্ম্ম এবং তাহার বিধি ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত হইয়াছে” (প্রথম প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত শ্লোক দেখুন)। বৈশম্পায়নের উক্তি অনুসারে সন্ন্যাসমার্গের বিধিও ইহারই অন্তর্ভূত। কারণ, ‘কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা’—এই ভেদেই এই দুই মার্গের মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক ; সেইজন্য দুই মার্গেরই জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু “কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে” এইরূপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি-উক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ মুখ্যতঃ কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তির জন্য করা হইয়াছে, উহার ব্যাপকতার কারণে উহাতে সন্ন্যাসমার্গেরও বিধিসমূহের সমাবেশ হয়, কর্ম্মযোগ ছাড়িয়া কেবল সাংখ্যনিষ্ঠার সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান বলা হয় নাই। ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে, সাংখ্য-মার্গী জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্ম্ম বা ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না ; এবং গীতাতে তো ভক্তিকে সুগম ও প্রধান বলা হইয়াছে—ইহাই বা কেন ; বরঞ্চ অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণনা করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, ‘তুমি কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ কর’ (গী. ৮. ৭ ; ১১. ৩৩ ; ১৬. ২৪ ; ১৮. ৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ হইয়াছে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মযোগেরই পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্যই বলা হইয়াছে ; এখানে কেবল সাংখ্যনিষ্ঠা বা ভক্তির স্বতন্ত্র সমর্থন বিবক্ষিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরস্পর-স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে ; কিন্তু এখন বুঝা যাইবে যে, এই মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) শুধু কাল্পনিক ও সুতরাং মিথ্যা। তাঁহারা বলেন যে, “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যে তিনটিই পদ আছে এবং গীতার অধ্যায়ও আঠারো ; তাই, “তিন ছয় আঠারো” এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় অধ্যায়ের তিন সমান বিভাগ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায়ে ‘ত্বম্’ পদের, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘তৎ’ পদের এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘অসি’ পদের বিচার করা হইয়াছে। এই মতকে কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিবার কারণ এই যে, গীতায় কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাকাব্যের বিবৃতির বাহিরে গীতায় আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শী পক্ষই এক্ষণে আর দাঁড়াইতে পারে না।

ভগবদ্‌গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের সঙ্গতি সহজে অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবর্জ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞদৃষ্টিতে করা আবশ্যক, এবং তাহা হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, যে তত্ত্ব পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কখনও ব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গোচর) হয়, আর কখন ও বা অব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তাহার পর, এই দুই স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

কোন্‌টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই নিরূপণে করা আবশ্যক হয়। সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ করিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল, তাহারও নির্ণয় করা অতি আবশ্যক হয়। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানো আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারো অধ্যায়ের যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার মোটেই করা হয় নাই এ কথা আমি বলি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠা স্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল বুঝিয়া গীতার আঠারো অধ্যায়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে যে সমান ভাগবণ্টন করা হইয়া থাকে তাহা উচিত নহে ; কিন্তু জ্ঞানমূলক ও ভক্তি-প্রধান কর্ম্মযোগ রূপে একই নিষ্ঠা গীতার প্রতিপাদ্য ; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান বা ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদ্‌গীতায় আছে তাহা কেবল কর্ম্মযোগনিষ্ঠার পূর্ত্তি ও সমর্থনার্থ আনুষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তানুরে কর্ম্মযোগের পরিপূর্ত্তি ও সমর্থনের জন্য কথিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভাগ গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপ করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক্‌।

সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিচার আরম্ভ করিয়া ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, যে এই সমস্ত সৃষ্টিকে—পুরুষ ও প্রকৃতিকে—আমারই পর ও অপর স্বরূপ জানে, এবং যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করিয়া আমাকে ভজনা করে, তাহার বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্‌গতি দিই ; এবং পুনরায় তিনি আপন স্বরূপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত কর্ম্ম, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম আমিই, আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। তাহার পর, অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত কি, তাহার অর্থ আমাকে বল, অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকে আমি কখনও বিস্মৃত হই না। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী বা অক্ষর তত্ত্ব কি ; সমস্ত জগতের সংহার কখন্‌ ও কিরূপে হয় ; এবং পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় ; এবং জ্ঞান ব্যতীত শুধু কাম্য কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্‌ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধ্যায়েও ঐ বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া অনন্যভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ বা রাজমার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্যা বা রাজগুহ্য বলে। তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মমার্গের এই প্রধান তত্ত্ব ভগবান বলিতে বিস্মৃত হন নাই। উদাহরণ যথা ঃ—“তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ” এই জন্য সর্ব্বদা

নিজের মনে আমাকে স্মরণ রেখো এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৮. ৭) ; আবার "সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে" এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৯. ২৭, ২৮)। সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা আমারই রূপ, উপরে এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়া অর্জ্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বস্তু আমারই বিভূতি'। অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া (আমিই) পরমেশ্বরই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এই কথার সত্যতা অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার সত্যতা উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া এবং 'সমস্ত কর্ম্ম আমিই করাইতেছি' অর্জ্জুনের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই বলিলেন যে, "প্রকৃত কর্ত্তা তো আমিই, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ কর" (গী. ১১. ৩৩)। জগতে একই পরমেশ্বর আছেন, ইহা এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও অনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত স্বরূপকেই মুখ্য মানিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকেরা আমাকে ব্যক্ত মনে করে" (৭. ২৪) : "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" (৮. ১১) বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলে ; "অব্যক্তকেই অক্ষর বলে" (৮. ২১) ; "আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া আমি মনুষ্য-দেহধারী এইরূপ মূঢ় লোকেরা মনে করে" (৯. ১১) ; "বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ" (১০. ৩২) ; এবং অর্জ্জুনের কথন অনুসারে "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ" (১১. ৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 'পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে ব্যক্তের অথবা অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে'? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা সুগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যেইরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগবদ্‌ভক্তের অবস্থার বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ না করা হইলেও, সপ্তম অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান এই দুই পৃথক্ বিভাগ সহজেই হয়, এইরূপ কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতও যে সত্য নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সপ্তম অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভক্তি হইতে নহে। এবং যদি বলা যায় যে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তবে আমি দেখি যে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তির বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন যে, যে বুদ্ধির দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হয় নাই সে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক "অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার ধ্যান করিবে" (গী. ১৩. ২৫), "যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সেই ব্রহ্ম-ভূত হয়" (১৪. ২৬), "যে আমাকেই পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্তি করে" (গী ১৫. ১৯) ; এবং শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে, "সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি আমাকে ভজনা কর" (গী. ১৮. ৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যায়ীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ

আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র, ভগবানের যদি এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া (৪. ৩৪-৩৭), সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উপরি-উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক ষড়ধ্যায়ীর আরম্ভে ভগবান বলিতেন না যে, সেই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' তোমাকে এখন বলিতেছি (৭. ২) ; ইহার পরে নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষাবগম্য ভক্তিমার্গের কথা বলিয়াছেন সত্য ; কিন্তু অধ্যায়ের আরম্ভেই "বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি" (৯. ১) এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গীতাতে জ্ঞানের মধ্যেই ভক্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন উহাকেই 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন (১১. ১) ; এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তস্বরূপের শ্রেষ্ঠতাও আসিয়াছে, ইহাও উপরে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় হইতেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলেন যে, উপাসনা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হইবে? তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইরূপ উত্তর দিয়া ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 'জ্ঞানের' কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভের ন্যায়, চতুর্দ্দশতম অধ্যায়ের আরম্ভেও বলিলেন যে, "পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" (১৪. ১)—পুনর্ব্বার তোমাকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিয়া বলিতেছি। এই জ্ঞানের কথা বলিবার সময়, ভক্তির সূত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভক্তির কথা পৃথক্‌ভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা করিয়া বলা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না ; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই দুইটীকে একত্র গাঁথা হইয়াছে। ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা বলা সেই সেই সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত উক্তি ; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তি-মার্গেও আবশ্যক হয় ; কিন্তু ব্যক্ত—উপাসনাতে (ভক্তিমার্গে) আরম্ভে ঐ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩. ২৫), তাই ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং সাধারণতঃ সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯. ২), এবং জ্ঞানমার্গ (বা অব্যক্তোপাসনা) কষ্টকর (১২. ৫)—ইহা ছাড়া এই দুই সাধনের মধ্যে গীতা আর কোন ভেদ করেন নাই। পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিকে সম করা—কর্ম্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহা এই দুই সাধনের দ্বারা সমানই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্তোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, দুই-ই ভগবানের সমান গ্রাহ্য। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার ন্যূনাধিক আবশ্যকতা থাকায়, চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়া (গী. ৭. ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। যাই হোক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা যখন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গক্রমে এক-আধ অধ্যায়ে ব্যক্তোপাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত-উপাসনার বিশেষ বর্ণনা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ সন্দেহ যেন না হয় যে, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে ব্যক্তস্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্তের

বর্ণনা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে ভক্তির আবশ্যকতা বলিতে ভগবান ভুলেন নাই। এখন বিশ্বরূপের ও বিভূতির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ায় এই তিন চার অধ্যায়কে (ষড়ধ্যায়ীকে নহে) মোটামুটিভাবে 'ভক্তিমার্গ' নাম দেওয়া যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু যাহাই বল না কেন, ইহা নিশ্চিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক করা হইয়াছে, না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থই মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের জ্ঞান হওয়া চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক বা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক, সুগমতা ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যান্ত, সমস্ত বিষয়েরই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' বা 'অধ্যাত্ম' এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

যাক্; পরমেশ্বরই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জ্জুনের 'চর্ম্মচক্ষুর' প্রত্যক্ষ অনুভব করাইবার পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মারূপে যে অবস্থিত এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যে পরমেশ্বরেরও (পরমাত্মারও) জ্ঞান, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' নামক সাংখ্যবিচারে অন্তর্ভূত হইয়াছে; এবং শেষে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' ভেদ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বগত নির্গুণ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা' দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। কিন্তু তাহার মধ্যেও কর্ম্মযোগের এই সূত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, "সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতি করে, আত্মা কর্ত্তা নহে—ইহা জানিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না" (১৩. ২৯); এবং "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি" (১৩. ২৪) ভক্তির এই সূত্রও বজায় রহিয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানেরই কথা সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে বর্ণন করা হইয়াছে যে, একই আত্মা বা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র থাকিলেও সত্ত্ব, রজ। ও তম প্রকৃতির গুণসমূহের ভেদপ্রযুক্ত জগতে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। পরে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্ত্তা নহে উপলব্ধি করিয়া ভক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের সেবা করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রিগুণাতীত কিংবা মুক্ত। শেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উপর স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভক্তিমান পুরুষের অবস্থার সমানই ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিগ্রন্থসমূহে পরমেশ্বরের কখনো কখনো বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভে তাহারই বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, 'প্রকৃতির বিস্তার' বলে, এই অশ্বথ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়; এবং শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম তাঁহাকে জানিয়া তাঁহাকেই 'ভক্তি' করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিভেদপ্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় সেইরূপই মনুষ্যের মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আসুরী সম্পত্তিবিশিষ্ট, এই দুই ভেদ হয়; এইরূপ বলিয়া, তাহাদের কর্ম্মের বর্ণনা এবং তাহারা কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা

করা হইয়াছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলে পর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য প্রযুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহা শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি কর্ম্মের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, 'ওঁতৎসৎ' এই ব্রহ্মনির্দ্দেশের 'তৎ' পদের অর্থ 'নিষ্কামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম', এবং 'সৎ' পদের অর্থ 'ভাল, কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম', এবং এই অর্থ অনুসারে ঐ সাধারণ ব্রহ্মনির্দ্দেশও কর্ম্মযোগেরই অনকূল। সারকথা, সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে চতুর্দ্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন—তুমি তাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শনেই উপলব্ধি কর কিংবা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞও তিনিই এবং ক্ষর-জগতে অক্ষরও তিনিই; তিনিই দৃশ্যজগৎ ভরিয়া আছেন এবং তাহার বাহিরেও কিংবা অতীতও তিনি; তিনি এক হইলেও প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নানাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এই মায়া হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, তপঃ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্ত্বের উপাসনার দ্বারা—আবার সেই উপাসনা, ব্যক্তেরই হউক বা অব্যক্তেরই হউক—প্রত্যেকের আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া সেই নিষ্কাম, সাত্ত্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই সংসারে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবহার জগতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে হইবে। এই জ্ঞানবিজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর প্রতিপাদিত করিয়াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসারই এই প্রকরণে দিয়াছি—অধিক বিস্তৃতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই জন্য যেটুকু অবশ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের যে 'জ্ঞানবিজ্ঞান' আবশ্যক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ের নিরূপণ—করা হইল, যে অধিকার-ভেদানুসারে ব্যক্তের কিংবা অব্যক্তের উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে পর, বুদ্ধি স্থৈর্য্য ও সমতা প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও শেষে মোক্ষ লাভ হয়। ইহার সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেরও বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশা ছাড়িয়া লোক-সংগ্রহার্থ আবরণ কর্ম্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা ভগবান্ নিশ্চিত-রূপে বলিয়াছেন (গী. ৫. ২)। তাই স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সন্ন্যাসাশ্রম' এই কর্ম্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ ও কর্ম্মযোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এই সংশয় মনে উপস্থিত করিয়া 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ'—এই দুয়ের রহস্য কি, অর্জ্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল অর্থ 'ত্যাগ করা' হওয়ায় এবং কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও ফলাশা ত্যাগ করা হইয়া থাকে বলিয়া

কর্ম্মযোগ তত্ত্বতঃ সন্ন্যাসই ; কারণ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়া ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্মৃত্যুক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিষ্কাম রাখা—কর্ম্মযোগেও বজায় থাকে। কিন্তু ফলাশা চলিয়া গেলে স্বর্গলাভেরও আশা না থাকায় আর এক সংশয় এখানে উপস্থিত হয় যে, এই অবস্থায় যাগযজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্ম করিবার আবশ্য-কতা কি ? ইহার উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হওয়ায় তাহাও অন্য কর্ম্মের সঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া লোক-সংগ্রহার্থ যজ্ঞচক্র সর্ব্বদা বজায় রাখা আবশ্যক। অর্জ্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া হইলে পর, প্রকৃতি-স্বভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিয়া গুণ-বৈচিত্র্যে বিষয়টি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার পর স্থির করা হইয়াছে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ত্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্তিসম্ভূত সুখ এবং "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আত্মৈক্যজ্ঞানই সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্ব অনুসারেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত কর্ম্ম সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়া শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ করে। শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন যে, কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় তাহা ছাড়িব মনে করিলেও ছাড়া যায় না ; তাই, পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা ইহা বুঝিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক ; আমিই সেই পরমেশ্বর, আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবান গীতার প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোক ও পরলোক এই দুয়েরই বিচার করিয়া জ্ঞানবান ও শিষ্ট ব্যক্তির প্রচারিত 'সাংখ্য' ও 'কর্ম্মযোগ', এই দুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে ; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের নির্ণয় অনুসারে যে কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব অধিক, যে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, যে কর্ম্মযোগের আচরণবিধির বর্ণনা পরবর্ত্তী এগারো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্যন্ত) পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানপূর্ব্বক সবিস্তর করা হইয়াছে এবং ইহা বলা হইয়াছে যে ঐ বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হয় এবং শেষে মোক্ষলাভ হয়, সেই কর্ম্মযোগেরই সমর্থন অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে ; এবং মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হইয়া পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে স্বধর্ম্মানুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম করিবার যে এই যোগ বা যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবৎপ্রণীত উপপাদন অর্জ্জুন যখন শুনিলেন, তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এক্ষণে—কেবল ভগবান্ বলিতেছেন বলিয়া নহে, কিন্তু—কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই গীতার আরম্ভ হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপই হইয়াছে (গী. ১৮. ৭৩)।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সঙ্গতি উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, গীতা কিছু কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে ; কিংবা উহা তুলা রেশম ও জরির সেলাই করা কাঁথা নহে ; বরং দেখা যাইবে যে, তুলা, রেশম ও জরির বিভিন্ন সূত্র যথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাইয়া কর্ম্মযোগ নামক মূল্যবান ও মনোহর গীতারূপ বস্ত্রখণ্ড প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 'অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা' ঠাসবুনানি হইয়াছে। নিরূপণের পদ্ধতি কথোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষা উহা একটু শিথিল হইয়াছে সত্য। কিন্তু কথোপকথনমূলক নিরূপণের দ্বারা শাস্ত্রীয় পদ্ধতির রুক্ষতার পরিবর্ত্তে গীতা সুলভতা ও প্রেমিকতায় পূর্ণ হইয়াছে, তাহা মনে করিলে শাস্ত্রীয়পদ্ধতির হেতু-অনুমানের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য ও নীরস কথার অনস্তিত্ব কাহারও তিলমাত্র খারাপ লাগিবে না। সেইরূপ আবার, গীতানিরূপণের পদ্ধতি পৌরাণিক কিংবা সংবাদাত্মক হইলেও মীমাংসকদিগের গ্রন্থ-বিচারের সমস্ত কষ্টিপাথর অনুসারে গীতার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে কোনও বাধা হয় না। ইহা এই গ্রন্থের সমস্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। গীতার প্রারম্ভ দেখিলে, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত অর্জ্জুন যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচিকিৎসার চক্রের মধ্যে পড়িলেন, তখন বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মযোগ ধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইয়াছেন এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায় ; এবং গীতার উপসংহার ও ফল উভয়ই এই প্রকারের অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলকই ইহা প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছি। ইহার পর আমি বলিয়াছি যে, গীতায় অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে "তুমি যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মই কর" এইরূপ স্পষ্টরূপে দশবারোবার ও পর্য্যায়ক্রমে অনেকবার (অভ্যাস) বলা হইয়াছে ; এবং আমি ইহাও বলিয়াছি যে, সংস্কৃত-সাহিত্যে কর্ম্মযোগের উপপত্তি গীতা ছাড়া অপর কোন গ্রন্থে না-থাকায় **অভ্যাস** ও **অপূর্ব্বতা** এই দুই প্রমাণের দ্বারা গীতায় কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই অধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকগণ গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ যে সকল কষ্টিপাথরের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে অর্থবাদ ও **উপপত্তি** এই দুই অবশিষ্ট থাকিয়া গিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার অধ্যায়ক্রম অনুসারে এই প্রকরণে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে 'কর্ম্মযোগ'ই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে মীমাংসকদিগের গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের সমস্ত নিয়ম প্রয়োগ করিলে গীতাগ্রন্থে জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ নাই যে, ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপর্য্য সাম্প্রদায়িক। এই সকল তাৎপর্য্য সাম্প্রদায়িক হইলেও এই প্রশ্ন করা যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদায়িক অর্থ—বিশেষতঃ সন্ন্যাসমূলক অর্থ—সন্ধান করিবার কৌশল কেমন করিয়া কতক লোক পাইল ? এই প্রশ্নেরও বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক অর্থের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল, বলা যায় না। তাই এই সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা গীতার সন্ন্যাসমূলক অর্থ কিরূপে করেন, এক্ষণে তাহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব।

মনুষ্য বুদ্ধিমান্ প্রাণী হওয়ায় পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব উপলব্ধি করাই তাহার মুখ্য কার্য্য কিংবা পুরুষার্থ, ইহা আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত ; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকেই 'মোক্ষ' বলে। কিন্তু দৃশ্যজগতের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিয়া শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষার্থ চারি প্রকার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এইস্থলে 'ধর্ম্ম' শব্দে ব্যবহারিক সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন পুরুষার্থ এইরূপ চতুর্ব্বিধ স্বীকার করিলে পর তাহার চারি অঙ্গ বা ভাগ পরস্পরের পোষক কিংবা পোষক নহে এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়। এই জন্য যেন মনে থাকে যে, পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে তত্ত্ব আছে তাহার জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না ; ফের সেই জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক্ না কেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাব্দিক মতভেদ থাকিলেও তত্ত্বতঃ মতভেদ নাই। অন্ততঃ গীতাশাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথাই গ্রাহ্য। সেইরূপ আবার, অর্থ ও কাম এই দুই পুরুষার্থ সম্পাদন করিতে হইলে উহাও নীতিধর্ম্মের দ্বারাই করিতে হইবে গীতার এই তত্ত্বও সম্পূর্ণ মান্য। এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম (অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম) ও মোক্ষের পরস্পর-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বাকী আছে। তন্মধ্যে, ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষের কথা বলাই ব্যর্থ, ধর্ম্মবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদসম্মত। কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধি করিতে অনেক সময় লাগে ; তাই, মোক্ষদৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহাই সিদ্ধ হয় যে, তৎপূর্ব্বে, সর্ব্বপ্রথম 'ধর্ম্মের দ্বারা' সংসারের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে (মনু. ৬. ৩৫-৩৭)। সন্ন্যাস অর্থে 'ত্যাগ করা' ; এবং ধর্ম্মের দ্বারা যাহার এই সংসারে কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ করিবেই বা কি ? অথবা যে ব্যক্তি 'প্রপঞ্চ'ই (সাংসারিক কর্ম্ম) ঠিক্ ঠিক্ সাধন করিতে পারে না, সেই "হতভাগ্য" পরমার্থও কি প্রকারে সাধন করিবে (দাস. ১২. ১. ১-১০ এবং ১২. ৮. ২১-৩১) ? কাহারও চরম উদ্দেশ্য বা সাধ্য সাংসারিকই হউক বা পারমার্থিকই হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রযত্ন মনোনিগ্রহ ও সামর্থ্য ইত্যাদি গুণের সমানই হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিলেও কেহ কেহ ইহা হইতে সম্মুখে চলিয়া বলেন যে, যখন দীর্ঘপ্রযত্ন ও মনোনিগ্রহের দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, তখন শেষে জগতের বিষয়োপভোগরূপ সমস্ত ব্যবহার অসার বলিয়া মনে হয় ; এবং সর্প যেরূপ আপন অব্যবহার্য চর্ম্ম ফেলিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষও সমস্ত ঐহিক বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বর-স্বরূপেই লীন হইয়া থাকেন (বৃ. ৪. ৪. ৭)। জীবনযাত্রার এই মার্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিয়া শেষে কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসনিষ্ঠাও বলা হয়। কিন্তু ইহার উল্টা গীতাশাস্ত্র বলেন যে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য 'ধর্ম্ম' আবশ্যক তো বটেই, কিন্তু পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরও—নিজের জন্য বিষয়োপভোগরূপ ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও—ঐ সমস্ত ব্যবহারই কেবল স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক। জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ না করিলে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার কেহই থাকিবে না এবং সংসার বিনষ্ট হইবে। এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না ; এবং বুদ্ধি নিষ্কাম হইলে কোন কর্ম্মই মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। তাই সংসারের কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত

ব্যবহার বিরক্তবুদ্ধিতে আমরণ করাই জ্ঞানীপুরুষেরও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। জীবন-যাত্রার গীতোপদিষ্ট এই মার্গকেই কর্ম্মনিষ্ঠা কিংবা কর্ম্মযোগ বলে। কিন্তু কর্ম্ম-যোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার জন্য গীতাতে কোথাও সন্ন্যাস-মার্গের নিন্দা করা হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, জগতের আরম্ভে সনৎকুমারাদি এবং পরে শুকযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি যে মার্গ স্বীকার করিয়াছে তাহাকে ভগবানও সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য কিরূপে বলিবেন ? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট নীরস বা মিষ্ট লাগা অংশত উহার প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের উপর নির্ভর করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ না হইলে নিষ্কৃতি নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই এই প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে প্রাপ্তজন্ম-স্বভাব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ায় তিনি যদি সংসার ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধপুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিত্র হইয়াছে তিনি অন্য কিছু করুন বা না করুন ; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে তিনি মানববুদ্ধির শুদ্ধতার পরম সীমা, এবং স্বভাবতই বিষয়লুব্ধ দুর্দ্ধর মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে রাখিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেন। তাঁহার এই কাজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও ছোট নহে। সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদরবুদ্ধি আছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ ; এবং মোক্ষ দৃষ্টিতে গীতারও ইহাই অভিমত। কিন্তু শুধু জন্মস্বভাবের প্রতি অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মেরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যিনি পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানী পুরুষ এই কর্ম্মভূমিতে কিরূপ ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে বিচার করিলে, কর্ম্মত্যাগ পক্ষ গৌণ এবং জগতের আরম্ভে মরীচি প্রভৃতি এবং পরে জনকাদির আচরিত কর্ম্মযোগই জ্ঞানী-পুরুষ লোকসংগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। কারণ, এক্ষণে ন্যায়ত ইহাই বলিতে হয় যে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতের পরিচালন কার্য্যও জ্ঞানীপুরুষেরই করিতে হইবে, এবং এই মার্গে জ্ঞানসামর্থ্যের সঙ্গেই কর্ম্ম-সামর্থ্যও অবিরোধে মিলিত থাকিবার কারণে, এই কর্ম্মযোগ শুধু সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কোথাও অধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ আছে তাহার উক্ত রীতি অনুসারে বিচার করিলে সাংখ্য + নিষ্কামকর্ম্ম = কর্ম্মযোগ, এই সমীকরণ নিষ্পন্ন হয় ; এবং বৈশম্পায়নের উক্তি অনুসারে গীতার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনে সাংখ্যনিষ্ঠার নিরূপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায় (মভা. শাং ৩৪৮. ৫৩)। এবং সেইজন্যই গীতার সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকারদিগের ইহা দেখাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতার যে শ্লোকগুলিতে কর্ম্ম শ্রেয়স্কর নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে, সেই শ্লোকগুলির প্রতি উপেক্ষা করিলে, অথবা সে সমস্ত অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ও প্রশংসাত্মক এইরূপ নিজের ইচ্ছামত টিপ্পনী কাটিলে কিংবা অন্য কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত সমীকরণের 'নিষ্কাম কর্ম্ম'কে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে ঐ সমীকরণের সাংখ্য = কর্ম্মযোগ এই রূপান্তর হইয়া যায় ; এবং গীতায় সাংখ্যমার্গই

প্রতিপাদিত, এইরূপ বলিবার সুযোগ হয়। কিন্তু এই রীতিতে গীতার যে অর্থ করা হয় তাহা গীতার উপক্রমোপসংহারের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; এবং আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে, গীতায় কর্ম্মযোগকে গৌণ এবং সন্ন্যাসকে মুখ্য মনে করা, গৃহকর্ত্তার গৃহে গৃহকর্ত্তাকে অতিথি এবং অতিথিকে গৃহকর্ত্তা মনে করা যেরূপ অসঙ্গত, সেইরূপ অসঙ্গত। যাঁহাদের মত এই যে, গীতাতে নিছক্ বেদান্ত, কেবল ভক্তি কিংবা শুদ্ধ পাতঞ্জল-যোগই প্রতিপাদিত হইয়াছে তাঁহাদের এই মতের খণ্ডন আমি করিয়াই আসিয়াছি। গীতায় কোন্ বিষয় নাই ? বৈদিক-ধর্ম্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন বা মার্গ আছে তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের কোন-না-কোন অংশ গীতায় গৃহীত হইয়াছে ; এবং ইহার পরেও "ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থঃ" (গী. ৯. ৫) এই নীতি অনুসারে গীতার প্রকৃত রহস্য এই সমস্ত মার্গ হইতে ভিন্নই হইয়াছে। জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না সন্ন্যাসমার্গের অর্থাৎ উপনিষদের এই তত্ত্ব গীতার গ্রাহ্য ; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত তাহা জুড়িয়া দেওয়ায় গীতার ভাগবত ধর্ম্মেই যতিধর্ম্মেরও সমাবেশ সহজেই হইয়াছে। তথাপি গীতায় সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস এইরূপ বলিয়া শেষে উপনিষৎকারদিগের কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অধিক শ্রেয়স্কর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কেবল যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান করিলে বন্ধন হয় না, কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগের এই মতও গীতার মান্য। কিন্তু গীতা 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিয়া উক্ত মতে এই এক সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া সম্পাদিত সমস্ত কর্ম্মই এক বৃহৎ যজ্ঞ হওয়ায় বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে সতত করাই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। জগদুৎপত্তিক্রমবিষয়ে উপনিষৎকারদিগের অপেক্ষা সাংখ্যদিগের মতকে গীতা প্রাধান্য দিয়াছেন ; তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষেতেই না থামিয়া জগদুৎপত্তিক্রমের পরম্পরাকে উপনিষদের নিত্য পরমাত্মা পর্য্যন্ত আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জন করা ক্লেশকর হওয়ায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা উহা অর্জ্জন করিবার বিধি ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবভক্তির সেই বিধি গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়েও ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বাংশে নকল না করিয়া, বরঞ্চ বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হইয়াছে, ভাগবতধর্ম্মোক্ত জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মত বেদান্তসূত্রের ন্যায় গীতাও ত্যাজ্য স্থির করিয়া ভাগবতধর্ম্মোক্ত ভক্তির এবং উপনিষদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য সাধন পাতঞ্জল যোগ। কিন্তু পাতঞ্জল যোগই জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য ইহা গীতার বক্তব্য না হইলেও, বুদ্ধিকে সম করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক হওয়ায় সেইটুকুরই জন্য পাতঞ্জল যোগের যমনিয়মাসনাদির উপযোগ করিয়া লও এইরূপ গীতা বলিয়াছেন। সারকথা, বৈদিকধর্ম্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যে যে সাধন কথিত হইয়াছে সেই সমস্তই কর্ম্মযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ আলোচনা করিবার সময় প্রসঙ্গানুসারে ন্যূনাধিক অংশে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনাকে স্বতন্ত্র বলিলে অসঙ্গতি উৎপন্ন হইয়া গীতার সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী এইরূপ প্রতীয়মান হয় ;

এবং এই বিশ্বাস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকা হইতে আরও দৃঢ় হইয়া যায়। কিন্তু আমার উপরি-কথিত আলোচনা অনুসারে যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তির মিলন করাইয়া শেষে তদ্দ্বারা কর্ম্মযোগের সমর্থন করাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলে এই সমস্ত বিরোধ বিলুপ্ত হয় ; এবং গীতাতে যে অলৌকিক কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মযোগের যথোচিত মিল করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। গঙ্গায় গিয়া অন্য যত নদী মিলুক না কেন, তথাপি গঙ্গার স্বরূপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার গীতারও কথা। তাহাতে যাহা কিছু সমস্ত থাকিলেও কর্ম্মযোগই তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ম্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষধর্ম্মের মর্ম্মও উহাতে সুন্দররূপে নিরূপিত হওয়ায় কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ার্থ কথিত এই গীতাধর্ম্মই—'স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে' (মভা. অশ্ব. ১৬. ১২)—ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দিতেও পূর্ণ সমর্থ ; এবং অনুগীতার আরম্ভে ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই মার্গের অনুসরণকারীর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন অনুষ্ঠানেরই আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক সমস্ত কর্ম্মের ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রতিপাদন যাহারা করে সেই সন্ন্যাসমার্গের লোকদিগের আমার এই উক্তি ভাল লাগিবে না, তাহা আমি জানি ; কিন্তু তাহার উপায় নাই। গীতাগ্রন্থ সন্ন্যাসমার্গেরও নহে কিংবা অন্য কোন নিবৃত্তিমূলক পন্থারও নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্ম্মসন্ন্যাস কেন করিবে না তাহার ব্রহ্মজ্ঞান-দৃষ্টিত সযুক্তিক উত্তর দিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। তাই, সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী-দিগের উচিত যে, তাঁহারা গীতাকেও 'সন্ন্যাস দিবার' গোলযোগে না ফেলিয়া 'সন্ন্যাসপ্রতিপাদক' অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। অথবা গীতায় সন্ন্যাসমার্গকেও ভগবান্ যে নিরভিমান বুদ্ধিতে নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন সেই সমবুদ্ধিতেই সাংখ্যমার্গীদিগেরও ইহাই বলা উচিত যে, "শুদ্ধ যাহাতে জগতের কাজ চলে এইজন্যই পরমেশ্বর ; এবং যখন তিনি সময়ে সময়ে এই জন্যই অবতার-রূপ ধারণ করেন, তখন জ্ঞানোত্তর নিষ্কামবুদ্ধিতে ব্যবহারিক কর্ম্ম করিতে থাকিবার যে মার্গের উপদেশ ভগবান গীতায় করিয়াছেন সেই মার্গই কলিকালে যুক্তি-সঙ্গত" এবং এইরূপ বলাই উঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

ইতি চতুর্দ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ

উপসংহার

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।" *

গী. ৮. ৭।

গীতার অধ্যায়গুলির সঙ্গতিই দেখুন কিংবা তদন্তর্গত বিষয়গুলির মীমাংসকদিগের পদ্ধতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিচারই করুন। যে দিক্ দিয়াই দেখুন না কেন, শেষে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই বুঝা যাইবে যে, "জ্ঞানভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগই" গীতার সার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ কর্ম্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়া গীতার অনেক প্রকার যে সকল তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন সেইগুলি যথার্থ নহে; কিন্তু উপনিষদান্তর্গত অদ্বৈত বেদান্তকে ভক্তির সহিত জুড়িয়া দিয়া তদ্দ্বারা বড় বড় কর্ম্মবীর পুরুষদিগের চরিত্রের রহস্য—বা তাঁহাদের জীবনক্রমের উপপত্তি—ব্যাখ্যা করাই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য। মীমাংসকদিগের উক্তি অনুসারে শুদ্ধ শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকা শাস্ত্রোক্ত হইলেও, জ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠিত কেবল তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের সন্তোষ হয় না; এবং উপনিষদের ধর্ম্মও যদি দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, উহা কেবল জ্ঞানময় হওয়ায় অল্পবুদ্ধি লোকের ধারণা করা কঠিন। তাহা ছাড়া আর এক কথা এই যে, উপনিষদের সন্ন্যাসধর্ম্ম লোকসংগ্রহের বাধাও বটে। তাই, বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রেম (ভক্তি) ও কর্ত্তব্যের সমুচিত মিলন হইয়া, মোক্ষের কোন বাধা না ঘটিয়া, যাহার দ্বারা লোকব্যবহারও সুচারুরূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান ও নিষ্কাম কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম, যাহা আমরণ পালন করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মবিষয়ে ভগবান্ গীতায় উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতেই কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। অধিক কি, এই ধর্ম্ম অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারই মূল কারণ, ইহা গীতার উপক্রমোপসংহার হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য, পুণ্যপ্রদ, ন্যায্য বা শ্রেয়স্কর, এবং কোন্ কর্ম্ম তাহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম্য পাপপ্রদ অন্যায্য বা গর্হিত, এই বিষয়ের বিচার দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম রীতি এই যে, কর্ম্মের উপপত্তি, কারণ বা মর্ম্ম না বলিয়া, অমুক কাজ অমুক প্রকারে করিলে শুদ্ধ এবং অমুক প্রকারে করিলে অশুদ্ধ—এইরূপ শুদ্ধ বিধান করা। হিংসা করিও না, চুরি করিও না, সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ কর, এই সমস্ত বিধান এই প্রথম শ্রেণীর। মন্বাদি স্মৃতিতে ও উপনিষদে এই সকল বিধি, আজ্ঞা কিংবা আচার স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান প্রাণী, তাই উপরি-কথিত শুদ্ধ বিধি-বিধানের দ্বারা তাহার সন্তোষ জন্মে না: এই সকল নিয়ম স্থাপনের কারণ কি, তাহাও বুঝিবার জন্য স্বভাবতই তাহার ইচ্ছা হয়; এবং এই জন্য বিচার করিয়া সে এই সকল নিয়মের নিত্য ও মূলতত্ত্ব কি, তাহার সন্ধান করিয়া থাকে—ব্যস্, ইহাই কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপ প্রভৃতি বিচার করিবার দ্বিতীয়

* "অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর"। যুদ্ধ কর—এই কথা প্রসঙ্গক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহার অর্থ, শুধুই 'যুদ্ধ কর' নহে 'যথাধিকার কর্ম্ম কর' এইরূপ বুঝিতে হইবে।

রীতি। ব্যবহারিক ধর্ম্মের অন্ত এই রীতিতে দেখিয়া উহার মূলতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা শাস্ত্রের কাজ; এবং ঐ বিষয়ের শুদ্ধ নিয়ম একত্র করিয়া বলাকে **আচারসংগ্রহ** বলে। কর্ম্মমার্গের আচার-সংগ্রহ স্মৃতিগ্রন্থাদিতে আছে; এবং ভগবদ্‌গীতায় সেই সকল আচারের মূলতত্ত্ব কি, তাহার সংবাদাত্মক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। তাই, ভগবদ্‌গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়কে শুদ্ধ কর্ম্মযোগ বলা অপেক্ষা কর্ম্মযোগশাস্ত্র বলাই উচিত ও অধিক প্রশস্ত; এবং এই **যোগশাস্ত্র** শব্দই ভগবদ্‌গীতার অধ্যায়-পরিসমাপ্তিসূচক সংকল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। পারলৌকিক দৃষ্টিকে যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা উহাকে গৌণ বলিয়া মানেন, তাঁহারা গীতার প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রকেই সদ্‌ব্যবহারশাস্ত্র, সদাচারশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নীতিমীমাংসা, নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব, কর্ত্তব্যশাস্ত্র, কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি, সমাজধারণশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের নীতিমীমাংসার পদ্ধতিও লৌকিকই থাকে; এই জন্যই এই প্রকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা হয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে সদাচরণের কিংবা নীতির মূলতত্ত্বের কোন বিচার আলোচনাই হয় নাই। তাঁহারা বলেন যে, "আমাদের দেশের গহন তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে একমাত্র বেদান্ত। ভাল; বর্ত্তমান বেদান্তগ্রন্থ দেখিলে দেখা যায় যে উহা সাংসারিক কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই অবস্থায় কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রের কিংবা নীতির বিচার কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে তো এই বিচার আসিতেই পারে না; এবং স্মৃতিগ্রন্থাদিতে ধর্ম্মশাস্ত্রের সংগ্রহের বাহিরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার মোক্ষেরই গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায়, সদাচরণের কিংবা নীতিধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিচার আলোচনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন"। কিন্তু মহাভারত এবং গীতা মনোযোগপূর্ব্বক অনুশীলন করিলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে পারে। ইহার পরেও কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হওয়ায় তাহা পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ মনে রাখা বড়ই কঠিন; এবং গীতা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও উহাতে সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের অভিপ্রায় অনুসারে কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিরই জ্ঞান বলা হইয়াছে। কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ আমাদের দেশে বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্ন্যাসমার্গীয় লোক অপেক্ষা কর্ম্মযোগেরই অনুযায়ীদিগের সংখ্যা সহস্রগুণ অধিক হয়; এবং পুরাণ-ইতিহাসে যে সকল কর্ম্মশীল মহাপুরুষদিগের অর্থাৎ কর্ম্মবীরদিগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগমার্গেরই অনুসরণকারী ছিলেন। যদি এই সমস্ত কথা সত্য হয়, তবে এই কর্ম্মবীরদিগের মধ্যে কি একজনেরও কর্ম্মযোগমার্গ সমর্থন করিবার বুদ্ধি হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেই ছিল এবং বেদান্তী ব্রাহ্মণ কর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন থাকায় কর্ম্মযোগসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, এইরূপ কারণ যদি কেহ দেখায়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। কারণ, উপনিষদের কালে, এবং তদনন্তর ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও জনক-শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন; এবং ব্যাসের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা বড় বড় ক্ষত্রিয়ের ইতিহাসও

লিখিয়াছেন। এই ইতিহাস লিখিবার সময়, যে সকল মহাপুরুষদিগের ইতিহাস আমরা লিখিতেছি তাঁহাদের চরিত্রের মর্ম্ম বা রহস্যও ব্যক্ত করিতে হইবে তাহা কি তাঁহাদের বিবেচনায় আসে নাই? এই কর্ম্ম বা রহস্যকেই কর্ম্মযোগ কিংবা ব্যবহার-শাস্ত্র বলে; এবং তাহা বলিবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণীভূত সদাচারের অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিচার মোক্ষদৃষ্টিকে ত্যাগ না করিয়া গীতায় করা হইয়াছে। অন্য পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু গীতার তেজের সম্মুখে অন্য সমস্ত বিচার-আলোচনা ফিকা হইয়া যায়, এই কারণেই ভগবদ্‌গীতা কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি তাহার সবিস্তার বিচার করিয়াছি। তথাপি গীতায় বর্ণিত কর্ম্মাকর্ম্মের আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রতিপাদিত নীতির মূলতত্ত্বের কতটা মিল হয় তাহার তুলনা যতক্ষণ না করি ততক্ষণ গীতাধর্ম্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই তুলনা করিবার সময় দুইপক্ষের অধ্যাত্মজ্ঞানেরও তুলনা করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা সর্ব্বমান্য যে, পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড় এখন পর্য্যন্ত আমাদের বেদান্তকে ছাড়াইয়া বেশীদূর যায় নাই; তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের তুলনা করিবার বিশেষ কোনই আবশ্যকতা থাকে না*। এই অবস্থায় এখন কেবল সেই নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের তুলনারই বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার সম্বন্ধে কাহারো কাহারো ধারণা আছে এই যে, এই বিষয়ের উপপত্তি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই। কিন্তু এই একটা বিষয়েরই বিচারও এত বিস্তৃত আছে যে, তাহার পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থই লিখিতে হয়। তথাপি এই গ্রন্থে এই বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া, একটু আভাস দিবার জন্য তদন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এই উপসংহারে আলোচনা করিতেছি।

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, সদাচরণ ও দুরাচরণ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায় বলিয়া, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্ম্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির মধ্যে থাকে। "ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ"—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যের অর্থাৎ বুদ্ধিমান প্রাণীদিগেরই বিশিষ্ট গুণ—এই বচনের তাৎপর্য্য ও ভাবার্থও এই। কোন গাধা বা ষাঁড়ের কার্য্য দেখিয়া আমরা উহাকে উপদ্রবী বলি সত্য; কিন্তু উহা ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালিস করে না; এই প্রকারই কোন নদীতে বাণ আসিয়া ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেলেও, "অধিক লোকের

* বেদান্ত ও পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে তুলনা প্রোফেসর ডায়সনের *The Elements of Metaphysics* নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে "On The Philosophy Of Vedanta" এই বিষয়ের উপর এক ব্যাখ্যানও মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৩ অব্দে প্রো. ডায়সন যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বোম্বায়ের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। তাছাড়া *The Religion and philosophy of the Upanishads* নামক ডায়সন সাহেবের গ্রন্থও এই বিষয় সম্বন্ধে পাঠ করিবার যোগ্য।

অধিক ক্ষতি" হইল বলিয়া কেহ নদীকে ভয়ঙ্কর বলিলেও উহাকে কেহ দুরাচার কিংবা দস্যু বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম মনুষ্যের ব্যবহারেরই যদি উপযুক্ত হয় তবে মনুষ্যের কর্ম্মের ভালমন্দ বিচারও কেবল তাহার কর্ম্ম অনুসারেই করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন নহে। অচেতন বস্তু ও পশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ় যোনিসম্ভূত প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া মনুষ্যেরই কার্য্যের বিচার করিলেও দেখা যায় যে, যখন কেহ মূঢ়তা কিংবা অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তখন সে সংসারে এবং আইনের দ্বারা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্যেরও কর্ম্মাকর্ম্মের ভালমন্দ স্থির করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তার বুদ্ধিরই অর্থাৎ সে কিহেতু সেই কর্ম্ম করিয়াছিল এবং উক্ত কর্ম্মের পরিণামের জ্ঞান তাহার ছিল কি না, প্রথমে অবশ্যই তাহার বিচার করিতে হয়। কোন ধনী গৃহস্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে দানধর্ম্ম করা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু এই কার্য্যটি 'ভালো' হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মূল্য উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনী গৃহস্থের বুদ্ধি সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কি না তাহাও দেখিতে হয়। এবং ইহার নির্ণয় করিবার জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ যদি না থাকে, তবে এই দানের যোগ্যতা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত দানের সমান মনে করা যায় না; অন্ততঃ সন্দেহ করিবার যোগ্য কারণ থাকিয়া যায়। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হইলে পর মহাভারতে এক উপাখ্যানে এই বিষয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে পর তিনি যে বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্নসন্তর্পণ ও দানকর্ম্মের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, "তোমার প্রশংসা বৃথাই করা হইতেছে। পূর্ব্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ ক্ষেত্রে পতিত শস্যের দানা খুঁটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এইরূপ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন নিজে ও তাহার স্ত্রীপুত্র কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী থাকিলেও, ঠিক ভোজনের সময় অকস্মাৎ গৃহে আগত ক্ষুধিত অতিথিকে সে নিজের ও স্ত্রীপুত্রদের সম্মুখস্থ সমস্ত ছাতু সমর্পণ করিয়া যে আতিথ্য করিয়াছিল, তুমি যতই বৃহৎ যজ্ঞ কর না কেন—উহা তাহার কাছেও যাইতে পারে না" (মভা. অশ্ব. ৯০)। এই নকুলের মুখ ও অর্দ্ধাঙ্গ সোনার ছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যোগ্যতা ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইরূপ বলিবার কারণ সে বলিল যে, "ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার মুখ ও অর্দ্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-মণ্ডপের উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার বাকী অঙ্গ সোনার হয় নাই!" এস্থলে কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের দিকেই নজর দিয়া, অধিক লোকের অধিক হিত কিরূপে হয় তাহার বিচার যদি আমরা করি তাহা হইলে, এক অতিথিকে তৃপ্ত করা অপেক্ষা লক্ষ লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগ্যতা লক্ষগুণে অধিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধর্ম্মদৃষ্টিতেই নহে, নীতিদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত

ঠিক হইবে কি? কাহারও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করা, কিংবা পরোপকারের জন্য বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া, শুধু তাহার সদাচারেরই উপর নির্ভর করে না। সেই গরীব ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার যথাসাধ্য স্বল্পকার্য্যের নৈতিক কিংবা ধর্ম্মমূলক মূল্য কি কম মনে করা যাইবে? কখনও নহে। কম মনে করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের ন্যায় নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক হইবার কখনই আশা করিতে পারে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুসারে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা ঐ ব্রাহ্মণের আয়ত্তাধীন ছিল; এবং তাহার স্বল্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকারবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরেরই ন্যায় শুদ্ধ ছিল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহা হইলে তাহার ও তাহার স্বল্প কার্য্যের নৈতিক মূল্য, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার আড়ম্বরময় যজ্ঞের সমতুল্যই মনে করিতে হইবে। অধিক কি, একথাও বলা যাইতে পারে যে, কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী হইলেও, অন্নসন্তর্পণের দ্বারা অতিথির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি অধিকতর ব্যক্ত হইতেছে। ইহা তো সকলেই জানে যে, ধৈর্য্যাদি গুণের ন্যায় শুদ্ধ বুদ্ধির প্রকৃত পরীক্ষা সংকটকালেই হয়; এবং সংকটের সময়েও যাহার শুদ্ধ বুদ্ধি (নৈতিক সত্ত্ব) টলে না সে-ই প্রকৃত নীতিমান্ ইহাই কাণ্টও আপন নীতিগ্রন্থের আরম্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত নকুলের অভিপ্রায়ও এইরূপ ছিল। কিন্তু রাজ্যারূঢ় হইলে পর সম্পৎকালে অনুষ্ঠিত শুধু এক অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাই যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা হইতে পারিত না; তাহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ আপৎকালে অনেক বাধাবিঘ্নের প্রসঙ্গে উহার পূর্ণ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল; তাই, ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারেও যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক ইহাই মহাভারত-কারের সিদ্ধান্ত। বলা বাহুল্য যে, তিনি নকুলকে নিন্দুক বলিয়াছেন। এস্থলে আর এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞকারী যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই গতিই ঐ ব্রাহ্মণও পাইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ঐ ব্রাহ্মণের কর্ম্মের যোগ্যতা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক না হইলেও, মহাভারতকার উভয়ের নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল্য একইরূপ মনে করেন তাহা নিঃসন্দেহ। ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যখন কোন লক্ষপতি কোন ধর্ম্মকার্য্যে হাজার টাকা চাঁদা দেন এবং কোন গরীব লোক একটাকা চাঁদা দেয় তখন আমরা ঐ উভয়ের নৈতিক মূল্য একই মনে করি। 'চাঁদা' শব্দ প্রয়োগে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইতে পারেন; কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই, কারণ উক্ত নকুলের কথা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে বলা হইয়াছে ঃ—

সহস্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ।
দদ্যাদপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ব্বে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ "হাজার-ওয়ালা শত মুদ্রা, একশো-ওয়ালা দশ মুদ্রা, এবং কেহ যথাশক্তি একটু জল দিলেও তুল্যফল হয় অর্থাৎ এই সমস্তের যোগ্যতা এক সমান" (মভা. অশ্ব. ৯০, ৯৭); এবং "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" (গী ৯. ২৯) এই গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই। আমাদের ধর্ম্মই কেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। "যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট অনেক প্রত্যাশা করা যায়" (লুক. ১২. ৪৮) একস্থানে খৃষ্ট এইরূপ বলিয়াছেন। একদিন যখন তিনি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে ধর্ম্মার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজ সুরু হইলে পর, এক অত্যন্ত গরীব বিধবা যে দুইটি পয়সা তাহার কাছে ছিল তাহা ধর্ম্মার্থে দিল দেখিয়া "এই স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে" এইরূপ উক্তি খৃষ্টের মুখ হইতে বাহির হইল—এই কথা বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (মার্ক. ১২. ৪৩ ও ৪৪)। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, কর্ম্মের যোগ্যতা কর্ত্তার বুদ্ধি হইতেই নির্দ্ধারণ করিতে হয়; এবং কর্ত্তার বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে, অনেক ক্ষুদ্র কর্ম্মও অনেক সময় বড় বড় কর্ম্মের নৈতিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এই কথা খৃষ্টেরও মান্য ছিল। উল্টাপক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্ম্মের নৈতিক যোগ্যতার বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হত্যা করা কর্ম্মটা একই হইলেও আত্মরক্ষার্থ অন্যকে মারা এবং কোন ধনী পথিককে ধনের জন্য পথে হত্যা করা, এই দুই ব্যাপার নীতিদৃষ্টিতে অত্যন্ত ভিন্ন। জর্ম্মন কবি শিলর এই ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় "উইলিয়ম টেল" নামক নাটকের শেষে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং সেখানে বাহ্যতঃ দেখিতে সমান দুই কার্য্যের মধ্যে তিনি বুদ্ধির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতামূলক যে ভেদ দেখাইয়াছেন তাহাই স্বার্থত্যাগ ও স্বার্থের কারণে হত্যা এই দুয়ের মধ্যেও আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, কর্ম্ম ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, তাহার মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে যে ভেদ হয় সেই ভেদ কর্ত্তার হেতুমূলেই হইয়া থাকে। এই হেতুকেই উদ্দেশ্য, বাসনা কিংবা বুদ্ধি বলে। কারণ, 'বুদ্ধি' শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ 'ব্যবসায়াত্মক ইন্দ্রিয়' হইলেও জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়-ব্যাপারেরই ফল, অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নামে অভিহিত করিবার রীতি আছে; এবং স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধিতে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা ও বাসনাত্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা এই দুয়েরই সমাবেশ হয় ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যুদ্ধ করিলে কত মনুষ্যের কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষতি হইবে তাহা দেখ, ভগবান অর্জ্জুনকে এইরূপ বলেন নাই; বরং ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, তুমি যুদ্ধ করিলে ভীষ্ম মরিবে কি দ্রোণ মরিবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ; তুমি কোন্ বুদ্ধিতে (হেতুতে বা উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই হইল মুখ্য প্রশ্ন। তোমার বুদ্ধি যদি স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধ হয় এবং যদি সেই শুদ্ধ ও পবিত্র বুদ্ধি অনুসারে তুমি আপন কর্ত্তব্য করিতে থাক, তবে ভীষ্ম কিংবা দ্রোণ মরিলেও তাহার পাপ তোমাতে বর্ত্তিবে না। **ভীষ্মকে মারিবার ফলাশায় তো তুমি যুদ্ধ করিতেছ না।** তোমার জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ তুমি চাহিয়াছ এবং যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া সামোপচারের দ্বারা মধ্যস্থতাও করিয়াছ (শাং. অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্তু যখন চেষ্টা দ্বারা এবং সাধুতা দ্বারা মিলন ঘটিল না, তখন নিরুপায় হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে স্থির করিলে।

ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। কারণ স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার হইলেও যেমন কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে দুষ্ট লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করাই কর্ত্তব্য সেইরূপ প্রসঙ্গ আসিলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য (মভা. উ. ২৮ ও ৭২; বন. ৩৩ ৪৮ ও ৫০)। ভগবানের উক্ত যুক্তিবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারাই পরে শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন (শাং. অ. ৩২ ও ৩৩)। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ বুদ্ধিকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও শুদ্ধ বুদ্ধি কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। কারণ, মন ও বুদ্ধি এই দুই প্রকৃতির বিকার; তাই উহা স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার হইতে পারে। তাই বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার স্বরূপকে যে জানে এবং তাহা সুর্ব্বভূতে একই ইহা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্যাকার্য্যের যে নির্ণয় করে তাহারই বুদ্ধিকে গীতা-শাস্ত্রে শুদ্ধ বা সাত্ত্বিক বলা হইয়াছে। এই সাত্ত্বিক বুদ্ধিকেই সাম্যবুদ্ধিও বলে; এবং তাহার মধ্যে 'সাম্য' শব্দের অর্থ "সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মার একত্ব বা সাম্য উপলব্ধি করা"। যে বুদ্ধি এই সাম্যকে উপলব্ধি করে না তাহা শুদ্ধও নহে, সাত্ত্বিকও নহে। নীতি-নির্ণয়ের কাজে সাম্যবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিলে, বুদ্ধির এই সমতা কিংবা সাম্য কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়; কারণ, বুদ্ধি অন্তরিন্দ্রিয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ চক্ষে দেখা যায় না। এই জন্য, বুদ্ধি সম ও শুদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার জন্য প্রথমে মনুষ্যের বাহ্য আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক; নতুবা, আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বলিয়া যে কোন মনুষ্য যাহা খুসি তাহা করিতে থাকিবে। তাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে তাহার স্বভাবের দ্বারাই চেনা যায়, শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বলা যায় না, এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অন্য লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই মুখ্যরূপে ভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে; এবং ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যাও এইরূপ—অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের কি পরিণাম ঘটে—করা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বাহ্য কর্ম্মের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে না, গীতা ইহা কখনও বলেন নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাহারও,—বিশেষতঃ অজ্ঞান মনুষ্যের—বুদ্ধি সম কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যদিও তাহার বাহ্য কর্ম্ম বা আচরণই—এবং তন্মধ্যেও সংকট সময়ের আচরণই—মুখ্য সাধন, তথাপি কেবল এই বাহ্য আচরণের দ্বারাই নীতিমত্তার অভ্রান্ত পরীক্ষা সর্ব্বদা হইতে পারে না। কারণ, প্রসঙ্গবিশেষে বাহ্য কর্ম্ম ক্ষুদ্র হইলেও তাহার নৈতিক মূল্য বড় কর্ম্মেরই তুল্য হইয়া থাকে, ইহা নকুলোপাখ্যান হইতে সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কর্ম্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে একেরই সুখ হউক বা অনেকের হউক, তাহাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ মানিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা তাহাকে অধিক মহত্ত্ব না দিয়া, এই বাহ্য কর্ম্মানুসারে কর্ত্তার বুদ্ধি কতটা শুদ্ধ তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে; এবং শেষে এই প্রকারে ব্যক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারেই উক্ত কর্ম্মের নীতিমত্তার নির্ণয় করিতে হইবে; শুধু বাহ্য কর্ম্ম অনুসারে নীতিমত্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না। কারণ এই যে,

'কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ' (গী. ২. ৪৯), এইরূপ বলিয়া গীতার কর্ম্মযোগে সম ও শুদ্ধ বুদ্ধিকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্র নামক ভাগবত ধর্ম্মের গীতা অপেক্ষাও অর্ব্বাচীন এক গ্রন্থ আছে; উহাতে মার্কণ্ডেয় নারদকে বলিতেছেন যে—

মানসং প্রাণিনামেব সর্ব্বকর্মৈককারণম্।
মনোনুরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ॥

অর্থাৎ "প্রাণীদিগের মনই সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র (মূল) কারণ; মনের অনুরূপই বাক্য নির্গত হয়, বাক্যের দ্বারা মন প্রকাশ পায়" (না পং. ১. ৭. ১৮)। সার কথা, সর্ব্বপ্রথম মন (অর্থাৎ মনের নিশ্চয়), তাহার পর সমস্ত কর্ম্ম ঘটিতে থাকে। তাই কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ গীতার শুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্তই বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—ধম্মপদ নামক বৌদ্ধধর্ম্মীদিগের প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থের আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে—

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেঠ্ঠা (শ্রেষ্ঠা) মনোময়া।
মনসা চে পদুঠ্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কনু বহতো পদং॥

অর্থাৎ "মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ; এইরূপ ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ; তাই এই সমস্ত ধর্ম্মকে মনোময়ই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কর্ত্তার মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার তাহার বাক্য ও কর্ম্মও ভাল বা মন্দ হয় এবং তদনুসারে পরে তাহার সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়।" * এই প্রকারে উপনিষদ্ ও গীতার এই অনুমানও (কৌষী. ৩. ১ এবং গীতা ১৮. ১৭) বৌদ্ধদিগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন একবার শুদ্ধ ও নিষ্কাম হয় সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কোন পাপই ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকেন। এই জন্য 'অর্হৎ' অর্থাৎ পূর্ণাবস্থায় উপনীত ব্যক্তি সর্ব্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, এইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে (ধর্ম্মপদ ২৯৪ ও ২৯৫; মিলিন্দ-প্র ৪. ৫. ৭)।

পাশ্চাত্যদেশে নীতিনির্ণয়ের জন্য দুই পন্থা আছে—প্রথম আধিদৈবত পন্থা, যাহাতে সদসদ্বিবেক-দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আধিভৌতিক পন্থা, যাহাতে "অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়" এই বাহ্য কষ্টিপাথর অনুসারেই নীতিনির্ণয় করিতে বলা হয়। কিন্তু এই দুই-ই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপূর্ণ ও একদেশদর্শী এইরূপ উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে। কারণ, সদসদ্বিবেকশক্তি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা দেবতা নাই; কিন্তু উহা ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও স্বভাবানুসারে উহার সদসদ্বিবেকবুদ্ধিও সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক হয়। এই অবস্থায় উহার কার্য্যাকার্য্যনির্ণয় দোষরহিত হইতে পারে না; এবং কেবল "অধিক লোকের অধিক

* এই পালী শ্লোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্লোক কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ার্থ মন কিরূপ তাহা দেখিতে হয়, এই তত্ত্বের উপরেই রচিত হইয়াছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ধম্মপদের ইংরেজী ভাষান্তরে এই শ্লোকের উপর টিপ্পনী দেখ। S. B. E. Vol. X. pp. 3, 4

সুখ" কিসে হয় এই বাহ্য আধিভৌতিক কষ্টিপাথরের দিকেই লক্ষ্য করিয়া নীতিমত্তার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কর্ম্মকারী ব্যক্তির বুদ্ধির কোনও বিচার হইতে পারিবে না। তখন কোন ব্যক্তি যদি চুরি কিংবা ব্যভিচার করে এবং তাহার বাহ্য অনিষ্টকর পরিণাম কমাইবার বা লুকাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া কুটিল সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে তাহার দুষ্কর্ম্ম আধিভৌতিক নীতি দৃষ্টিতে সেই পরিমাণে গর্হিত নহে। তাই কেবল বৈদিক ধর্ম্মেই কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতার আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে (মনু. ১২. ৩-৮ ; ৯. ২৯) এইরূপ নহে ;— বাইবেলেও ব্যভিচারকে কেবল কায়িক পাপ মনে না করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিংবা পরপুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের কুদৃষ্টিপাতকেও ব্যভিচারের মধ্যে ধরা হইয়াছে (মাথু. ৫ ২৮) ; এবং বৌদ্ধধর্ম্মে কায়িক অর্থাৎ বাহ্যিক শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতারও আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে (ধম্ম. ৯৬ এবং ৩৯১ দেখ)। তাহাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য সুখই পরম সাধ্য মনে করিলে তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য মনুষ্যে-মনুষ্যে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে রেষারেষি হইয়া ঝগড়া বাধিবারও সম্ভাবনা থাকে ; কারণ বাহ্য সুখার্জ্জনের জন্য যে যে বাহ্য সাধন আবশ্যক, সে সমস্তই প্রায় অন্যের দুঃখজনক কর্ম্ম না করিলে নিজের লাভ হয় না। কিন্তু সাম্য বুদ্ধির বিষয়ে তাহা বলা যায় না। এই অন্তঃসুখ আত্মবশ, অর্থাৎ ইহা অন্য কোন মনুষ্যের সুখের অন্তরায় না হইয়া প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। শুধু তাই নহে, আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত সমভাবে ব্যবহার করা যাহার দেহস্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দ্বারা গুপ্ত বা প্রকাশ্য কোন উপায়েই কোন দুষ্ট কর্ম্ম ঘটিবার সম্ভাবনাই থাকে না ; এবং "অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় সর্ব্বদা তাহাই দেখিয়া চল" একথা তাহাকে বলা আবশ্যকই হয় না। কারণ, যে মনুষ্যনামের যোগ্য, সে যে-কোন কাজই করুক্ না, তাহা সারাসার বিচার করিয়াই করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। কেবল নৈতিক কর্ম্মের নির্ণয়ার্থই সারাসার বিচার করিতে হইবে এরূপ নহে। সারাসার বিচার করিবার সময় অন্তঃকরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই গুরুতর প্রশ্ন উঠে। কারণ, সকলের অন্তঃকরণ এক রকম হয় না। তাই "অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই সাম্যবুদ্ধি জাগ্রত রাখা উচিত" এই কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আবার অধিকাংশ লোকের কিংবা সমস্ত ভূতের হিতসম্বন্ধে সারাসার বিচার কর, ইহা আর পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা তো আছেই, কিন্তু মূক পশুদিগের সম্বন্ধেও মনুষ্যের কিছু কর্ত্তব্য আছে যাহার সমাবেশ কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রের মধ্যে করা উচিত—পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এখন এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে "অধিক লোকের অধিক হিত" অপেক্ষা "সর্ব্বভূতহিত" শব্দই অধিক ব্যাপক ও উপযুক্ত, এবং 'সাম্যবুদ্ধি'র মধ্যে এই সমস্তেরই সমাবেশ হয়, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। উল্টাপক্ষে, কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম নহে এইরূপ মনে করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় তাহা স্থির করিবার হিসাব অভ্রান্ত হইলেও, নীতিধর্ম্মের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোন সৎকার্য্যের দিকে প্রবৃত্তি হওয়া শুদ্ধ মনেরই গুণ, হিসাবী মনের নহে। "হিসাবী মনুষ্যের স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার

নাই, তোমার কেবল দেখিতে হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই হিসাবে কেবল এইটী দেখিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয় হইয়া তোমার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে কি না" এই কথা যদি কেহ বলে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। কারণ, সুখ ও দুঃখ কি, তাহা সাধারণত সকলেরই জানা থাকিলেও, সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখের তারতম্যের হিসাব করিবার সময় কোন্ সুখ-দুঃখের কত মূল্য, তাহার পরিমাণ ঠিক করা প্রথমে আবশ্যক হয় ; কিন্তু এই গণনা করিবার জন্য, উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত বাহ্য সাধন এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাই সুখদুঃখের উচিত মূল্য স্থির করিবার অর্থাৎ উহার গুরুত্ব বা যোগ্যতা নির্ণয় করিবার কাজ প্রত্যেকের নিজের নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। কিন্তু 'আমারই মত অন্য লোক' এই আত্মৌপম্য বুদ্ধি যাহার মনে পূর্ণরূপে জাগ্রত হয় নাই, সে পরের সুখদুঃখের তীব্রতা কখনই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না ; এইজন্য এই সুখদুঃখের প্রকৃত মূল্যও সে কখনও স্থিরই করিতে পারে না ; এবং ফের তারতম্য নির্ণয়ার্থ তাহার অনুমিত সুখদুঃখের মূল্যে ভুল হইবে এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবও ভুল হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তাই বলিতে হয়, 'অধিক লোকের অধিক সুখ দেখা' এই বাক্যে 'দেখা' কেবল হিসাব করিবার বাহ্য ক্রিয়া, উহাতে অধিক গুরুত্ব না দিয়া, যে আত্মৌপম্য ও নির্লোভ বুদ্ধির দ্বারা (অনেক) অপর লোকের সুখদুঃখের যথার্থ মূল্য প্রথমে স্থির করা যায় সেই সর্ব্বভূতে সম ও শুদ্ধবুদ্ধিই নীতিমত্তার প্রকৃত বীজ। মনে রেখো, নীতিমত্তা নির্ম্মম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, বা (সংক্ষেপে বলিতে হইলে) সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ; ইহা শুধু সারাসার বিচারের ফল নহে। এই সিদ্ধান্ত এই কথা হইতে আরও স্পষ্ট হইবে—ভারতীয় যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে যখন পুত্রদিগের পরাক্রমে কুন্তী কৃতার্থ হইলেন, তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন। তখন 'অধিক লোকের কল্যাণ কর', এইরূপ লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া "মনস্তে মহদস্তু চ" (মভা অশ্ব. ১৭. ২১)—তোমার মন মহৎ হোক্ ইহাই শেষে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। "অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় তাহা দেখাই নীতিমত্তার প্রকৃত, শাস্ত্রীয় ও সহজ কষ্টিপাথর। এইরূপ যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদেরই মত অন্য সমস্ত লোক শুদ্ধ মনোবিশিষ্ট, প্রথমেই ইহা ধরিয়া লইয়া তাহার পর নীতির নির্ণয় কি প্রকারে করিতে হইবে তাহা অপর সকলকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই পণ্ডিতগণের মানিয়া লওয়া কথাটি সত্য হইতে পারে না, তাই তাঁহাদের নীতিনির্ণয়ের তত্ত্ব একদেশদর্শী ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে ; তাঁহাদের লেখার দরুণ এইরূপ ভ্রমও উৎপন্ন হয় যে, মন, স্বভাব বা শীল যথার্থত অধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীরু করিবার চেষ্টা-উদ্যোগের পরিবর্ত্তে, যদি কেহ নীতিমান হইবার জন্য নিজকৃত কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের হিসাব করিতে শিখে তাহাই যথেষ্ট হইবে ; এবং তাহার পর, যাহার স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, সেই সব লোক চক্রী, কু-মৎলবী কিংবা ভণ্ড (গী. ৩. ৬) হইয়া সমস্ত সমাজেরই ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। তাই কেবল নীতিমত্তার কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতে দেখিলেও,

কর্ম্মের শুধু বাহ্য পরিণাম বিচারের মার্গ অপূর্ণ ও হীন প্রতীত হয়। অতএব আমার মতে 'বাহ্য কর্ম্মের দ্বারা পরিব্যক্ত এবং সঙ্কটকালেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাম্যবুদ্ধিরই এই কাজে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে শরণ হইতে হইবে, এবং 'জ্ঞানযুক্ত পূর্ণ শুদ্ধবুদ্ধি কিংবা শীলই সদাচরণের প্রকৃত কষ্টিপাথর', গীতার এই সিদ্ধান্তই পাশ্চাত্য আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকপক্ষীয় মতাপেক্ষা অধিক মার্ম্মিক, ব্যাপক, যুক্তিসঙ্গত ও নির্দ্দোষ।

নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক গ্রন্থ ছাড়িয়া অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁহারা নীতির বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতেও নীতিমত্তার নির্ণয়কার্য্যে গীতার ন্যায় কর্ম্মাপেক্ষা শুদ্ধবুদ্ধিরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা—প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্টের 'নীতির আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব' এবং নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ। কাণ্ট* সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের সিদ্ধান্তটি না দিলেও, ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক বুদ্ধিরই সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তিনি এই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কর্ম্মেরই নৈতিক মূল্য উক্ত কর্ম্ম হইতে কত লোকের সুখ হইবে এই বাহ্য ফলের উপর স্থির না করিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা মনুষ্যের 'বাসনা' কতটা শুদ্ধ তাহা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে; (২) মনুষ্যের এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধির আদেশে (অর্থাৎ এই বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের নিয়মানুসারে) চলিলে, উহাকে শুদ্ধ, পবিত্র ও স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিবে; (৩) এইরূপে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া যাহার বাসনা শুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তির জন্য কোন নীতিনিয়মের বন্ধন আবশ্যক হয় না—এই নিয়ম তো সাধারণ মনুষ্যেরই জন্য হইয়া থাকে; (৪) বাসনা এইরূপে শুদ্ধ হইলে, উহা যে কোন কর্ম্ম করিতে বলে তাহা "আমার নিজের মত যদি অন্যেরাও করে তবে পরিণাম কি হইবে" এইরূপ বিচার করিয়াই বলিয়া থাকে; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রতার উপপত্তি কর্ম্মজগত ছাড়িয়া ব্রহ্মজগতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্মজগৎ সম্বন্ধে কাণ্টের বিচার কিছু অপূর্ণ; এবং গ্রীন্ সাহেব কাণ্টেরই অনুযায়ী হইলেও তিনি স্বকীয় "নীতিশাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাতে" বাহ্যজগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অগম্য যে তত্ত্ব আছে তাহাই আত্মারূপ পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহে অংশতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়া তাহার পর তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, * মানব-দেহে এক নিত্য ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব (অর্থাৎ আত্মা) আছে যাহার এই দুর্দ্ধর ইচ্ছা হয় যে, সর্ব্বভূতান্তর্গত স্বীয় সামাজিক পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেই হইবে; এবং এই ইচ্ছাই মনুষ্যকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই মনুষ্যের নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং বিষয়সুখ অনিত্য। সারকথা, কাণ্ট ও গ্রীন এই দুইজনেরই দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও, গ্রীন ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির

* Kant's *Theory of Ethics*, trans, by Abbot, 6th Ed. এই পুস্তকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্ত ১০, ১২, ১৬ এবং ২৪ পৃষ্ঠায়; দ্বিতীয় ১১২ এবং ১১৭পৃষ্ঠায় ৩১, ৫৮, ১২১ ও ২৯০ পৃষ্ঠায়; চতুর্থ ১৮, ৩৮, ৫৫ ও ১১৯ পৃষ্ঠায়; এবং পঞ্চম ৭০-৭৩ ও ৮০ পৃষ্ঠায় পাঠক দেখিতে পাইবেন।

* Green's *Prolegomena to Ethics* § § 99, 174-179 and 223 232,

ব্যাপারেই জড়িত না থাকিয়া, কর্ম্মাকর্ম্মবিবেচনার ও বাসনাস্বাতন্ত্র্যের উপপত্তিকে পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে ঐকত্বের দ্বারা ব্যক্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কাণ্ট্ ও গ্রীনের ন্যায় আধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞের এই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত গীতাপ্রতিপাদিত কোন সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুইটি অক্ষরে অক্ষরে এক না হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সমতা আছেই। দেখুন, গীতার সিদ্ধান্ত এই—(১) বাহ্য কর্ম্মাপেক্ষা কর্ত্তার (বাসনাত্মক) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ; (২) ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয় ও সম হইলে, তাহার পর বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়; (৩) এই প্রকারে যাহার বুদ্ধি সম ও স্থির হইয়াছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা বিধিনিয়মাদির অতীত হইয়া থাকেন; (৪) এবং তাঁহার আচরণ ও তাঁহার আত্মৈক্যবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ নীতিনিয়ম সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে মান্য ও প্রমাণ হইয়া থাকে; এবং (৫) পিণ্ডে অর্থাৎ দেহে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সৃষ্টিতে একই আত্মস্বরূপী তত্ত্ব আছে, দেহা-ন্তর্ভূত আত্মা স্বকীয় শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকে এবং এই শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হইলে পর সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যদৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহা চিন্তার যোগ্য যে, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, আত্মস্বাতন্ত্র্য, ব্রহ্মাত্মৈক্য, কর্ম্মবিপাক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, কাণ্ট্ ও গ্রীন্‌কেও ছাড়াইয়া যাওয়ায় ও অধিকতর নিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত উপনিষদের বেদান্ত অনুসারে গীতায় যে কর্ম্মযোগের বিচার করা হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অসন্দিগ্ধ, পূর্ণ ও দোষরহিত হইয়াছে; এবং এখনকার বেদান্তী জর্ম্মন পণ্ডিত প্রোফেসার ডায়সন নীতিবিচারের এই পদ্ধতিকেই স্বকীয় "অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব" গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ডায়সন শোপেনহোয়েরের অনুগামী; বাসনাই "সংসারের মূল কারণ হওয়ায় তাহার ক্ষয় না করিলে দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব বাসনা ক্ষয় করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য"। শোপেনহোয়েরের এই সিদ্ধান্ত তাঁহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য; এবং এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই নীতির উপপত্তির বিচার তিনি স্বকীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্পষ্টরূপে করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাসনা ক্ষয় হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্ম্মত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই; বরঞ্চ 'বাসনার পূর্ণ ক্ষয় হইয়াছে কি না' তাহা পরোপকারার্থ কৃত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যেরূপ ব্যক্ত হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই ব্যক্ত হয় না বলিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম বাসনাক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইরূপ দেখাইয়া তিনি বাসনার নিষ্কামতাই সদাচারের ও নীতিমত্তারও মূল এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং তাহার শেষে "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" (গী. ৩. ১৯) গীতার এই শ্লোকটি প্রদত্ত হইয়াছে।* ইহা হইতে মনে হয় যে, গীতা হইতেই এই উপপত্তির জ্ঞান তাঁহার মনে হয়তো আসিয়াছে। যাই হোক; ইহা কম গৌরবের কথা নহে যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহোয়ের, ও কাণ্ট—ইঁহাদের পূর্ব্বে, এমন কি, অ্যারিস্টটলেরও শত শত বর্ষ পূর্ব্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিবার শুষ্ক চেষ্টার উপদেশ দেন,

* See Deussen's ***Elements of Metaphysics***, Eng, Trans, 1909 p, 304,

এইরূপ আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে ; কিন্তু এই কল্পনা ঠিক নহে। জগতে যাহা কিছু চক্ষে দেখা যায় তাহার বাহিরে যাইয়া বিচার করিলে এই প্রশ্ন উঠে যে, "আমি কে, সৃষ্টির গোড়ায় কি তত্ত্ব আছে, এই তত্ত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার এই জগতে পরমারাধ্য বা চরম ধ্যেয় কি, এবং এই সাধ্য বা ধ্যেয় উপলব্ধি করিবার জন্য জীবনযাত্রার কোন্ মার্গ স্বীকার করা আবশ্যক, কিংবা কোন্ মার্গে কোন্ ধ্যেয় সিদ্ধ হইবে ?" এবং এই গহন প্রশ্নসমূহের যথাশক্তি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবার জন্যই বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সমস্ত নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরস্পরের সহিত ব্যবহারসংক্রান্ত বিচার ঐ গহন শাস্ত্রেরই এক অঙ্গ, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। সারকথা, কর্ম্মযোগের উপপত্তি বেদান্তশাস্ত্রের উপরেই করা যাইতে পারে ; এবং এইক্ষণে সন্ন্যাসমার্গীয় লোকেরা যাহাই বলুন, গণিতশাস্ত্রের যেইরূপ শুদ্ধ গণিত ও ব্যবহারিক গণিত এই দুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রেরও শুদ্ধ বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা ব্যবহারিক বেদান্ত এই দুই ভেদ আছে, ইহা নির্ব্বিবাদ। কাণ্ট্ এইটুকু বলেন যে, "আমি জগতে কিরূপ ব্যবহার করিব ? কিংবা আমার এই জগতে প্রকৃত কর্ত্তব্য কি" এই নীতিপ্রশ্নের বিচার করিতে করিতেই 'পরমেশ্বর' (পরমাত্মা) 'অমৃতত্ব' এবং (ইচ্ছা) স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গূঢ় প্রশ্ন মনুষ্যের মনে উদ্ভূত হইয়াছে ; এবং এই প্রশ্নসমূহের উত্তর না দিয়া নীতির উপপত্তি শুধু কোনো বাহ্য সুখের হিসাবে করিলে, মনুষ্যের মনকে যে পশুবৃত্তি স্বভাবত বিষয়সুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশুবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া প্রকৃত নীতিমত্তার মূল ভিত্তির উপরেই কুড়াল আঘাত করা হয়।* এখন কর্ম্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদান্ত কেমন করিয়া ও কেন আসিল তাহা পৃথক্ করিয়া বলা আবশ্যক নাই। কাণ্ট্ এই বিষয়ের উপর "শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা" এবং "ব্যবহারিক (বাসনাত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা" নামক দুই পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞানানুসারে ভগবদ্গীতাতেই, এই দুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এমন কি, শ্রদ্ধামূলক ভক্তিমার্গেরও বিচার-আলোচনা তাহারই মধ্যে করা হইয়াছে বলিয়া, গীতা সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য ও প্রমাণভূত হইয়াছে।

মোক্ষধর্ম্মকে ক্ষণকালের জন্য একপাশে রাখিয়া কেবল কর্ম্মাকর্ম্মের পরীক্ষার নৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিতেও যখন "সাম্যবুদ্ধিই" শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেছে, তখন

* Empiricism, on the contrary, cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only, consists the high worth that man can and ought to give themselves)...Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle... is for that reason much more dangerous," Kant's *Theory of Ethics*, pp. 163, and 236-238. See also Kant's *Critique of Pure Reason*, (trans. by Max-Muller) 2nd Ed. pp 640, 657,

গীতার আধ্যাত্মিক পক্ষ ব্যতীত নীতিশাস্ত্রে অন্য পথ কি করিয়া ও কেন প্রস্তুত হইয়াছে তাহারও কিছু বিচার করা আবশ্যক। ডা. পল. কেরস্ * নামক এক প্রসিদ্ধ আমেরিকান গ্রন্থকার স্বকীয় নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন যে, "পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে মনুষ্যের যে মত হইয়া থাকে তদনুসারে তাহার নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারের রং বদলায়। সত্য বলিতে কি, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে কোন একটা নিশ্চিত মত না থাকিলে নৈতিক প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা বিষয়ে পাকা কোন মত না থাকিলেও আমাদের নৈতিক আচরণ সম্ভবতঃ চলিতে পারে ; কিন্তু এই আচরণ স্বপ্নাবস্থাব্যাপারের মত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক না বলিয়া দেহধর্ম্মানুসারে সংঘটিত কেবল কায়িক চেষ্টাই বলা উচিত।" উদাহরণ যথা—বাঘিনী আপনার বাচ্চাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় ; কিন্তু বাঘিনীর এই আচরণকে নৈতিক না বলিয়া উহার জন্মসিদ্ধ স্বভাবই বলিয়া থাকি। নীতিশাস্ত্রের উপপাদনে অনেক পথ কেন বাহির হইয়াছে, এই উত্তর হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়। "আমি কে, জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, আমার এই জগতে কি উপযোগ হইতে পারে" ইত্যাদি গূঢ় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যে তত্ত্বের দ্বারা হইবে, সেই তত্ত্ব অনুসারেই আমি আপন জীবনকালে অন্য লোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি শেষে তাহারও সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব গূঢ় প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন কালে ও বিভিন্নদেশে একই প্রকার হইতে পারে না। য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে, দেখা যায় যে, মনুষ্যের ও জগতের কর্ত্তা বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এবং তিনিই সর্বপ্রথম জগৎ উৎপন্ন করিয়া সদাচরণের নিয়ম কিংবা আদেশ মনুষ্যকে দিয়াছেন ; এবং গোড়ায় খৃষ্টপাণ্ডিতদিগের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল যে, বাইবেলে বর্ণিত পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উক্ত নীতিনিয়মই নীতিশাস্ত্রের মূল। পরে এই নিয়ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ ইহা যখন দৃষ্টিগোচর হইল, ইহার পূর্ণতার জন্য কিংবা স্পষ্টীকরণার্থ পরমেশ্বরই সদসদ্বিবেকশক্তি মনুষ্যকে দিয়াছেন এইরূপ প্রতিপাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু চোরের ও সাধুর সদসদ্বিবেকশক্তি এক হয় না, ইহা পরে লক্ষ্য হওয়ায়, পরমেশ্বরের ইচ্ছা নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হইলেও, এই ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্বরূপ জানিবার জন্য অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই বিচার করিতে হইবে—ইহা ব্যতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, এই মত প্রচারিত হইল। বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বরই জগতের কর্ত্তা এবং মনুষ্য নীতি-অনুসারে ব্যবহার করিবে ইহা তাঁহারই ইচ্ছা কিংবা আজ্ঞা,—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের এই যে ধারণা, সেই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই উক্ত মত সকল

* See *The Ethical Problem*, by Dr. Carus, 2nd Ed. P. III "Our propostion is that the leading principle *in* ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world conception a man has, can alone give character to the principle *in* his ethics. Without any world conception we can have no ethics (i. e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its *raison d'etre*".

অবস্থিত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মপুস্তকের জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, আধিভৌতিক শাস্ত্রসমূহের উন্নতি ও বুদ্ধির সঙ্গে যখন ইহা নজরে আসিল তখন পরমেশ্বরের সমান জগতের কোন কর্ত্তা আছেন কি নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপর কি প্রকারে খাড়া করা যাইতে পারে এই বিচার সুরু হইল। সেই অবধি অধিক লোকের অধিক সুখ বা কল্যাণ, কিংবা মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, এই প্রত্যক্ষ তত্ত্বই নীতিশাস্ত্রের মূল এইরূপ স্বীকৃত হইতে লাগিল। এই প্রতিপাদনে, অধিক লোকের অধিক হিত মনুষ্য কেন করিবে তাহার উপপত্তি বা কারণ না দিয়া, ইহা মনুষ্যের এক বর্দ্ধনশীল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইহাই বলা হইল। কিন্তু মানবস্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্রবৃত্তিও থাকিতে দেখা যায়, তাই এই পন্থায়ও পুনর্ব্বার ভেদ হইতে আরম্ভ হইল। নীতিমত্তার এই উপপত্তিগুলি কিছু সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ নহে। কারণ "জগতের দৃশ্য পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় কোনরূপ অব্যক্ত তত্ত্ব আছেই এই সিদ্ধান্তের উপর এই পন্থার সমস্ত পণ্ডিতদিগেরই সমান অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে, এই কারণে উঁহাদের বিষয় প্রতিপাদনে যতই দুরূহ বাধা উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা কেবল বাহ্য ও দৃশ্য তত্ত্বের দ্বারাই কিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। নীতি সকলেরই দরকার ও চাই কিন্তু জড়-ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকায়, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রবিষয়ক উপপত্তিতে সর্ব্বদাই কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, উপরোক্ত উক্তি হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। এই কারণে জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক মতানুসারে আমি নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদনের (তৃতীয় প্রকরণে) তিন ভেদ করিয়া পরে প্রত্যেক পন্থার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি। সমস্ত দৃশ্য জগৎ সগুণ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মপুস্তকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা কিংবা তাঁহারই শক্তিতে উৎপন্ন সদসদ্‌বিবেচনাশক্তিরূপ দেবতার বাহিরে নীতিশাস্ত্রের কোন বিচার করেন না। এই পন্থাকে আমি 'আধিদৈবিক' নাম দিয়াছি ; কারণ, সগুণ পরমেশ্বরও তো এক দেবতাই। এখন, দৃশ্য জগতের আদিকারণ কোন অদৃশ্য মূল তত্ত্ব নাই, কিংবা থাকিলেও তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ যাঁহাদিগের মত, তাঁহারা 'অধিক লোকের অধিক কল্যাণ' কিংবা 'মনুষ্যত্বের পরম উৎকর্ষ এই দৃশ্য তত্ত্বের উপরেই নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করিয়া থাকেন, এবং এই বাহ্য ও দৃশ্য তত্ত্বের বাহিরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে করেন। এই পন্থার আমি 'আধিভৌতিক' নাম দিয়াছি। নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতের মূলে আত্মার ন্যায় নিত্য ও অব্যক্ত কোন তত্ত্ব অবশ্যই আছে এইরূপ যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, তাঁহারা স্বকীয় নীতি-শাস্ত্রের উপপত্তিকে আধিভৌতিক উপপত্তিরও বাহিরে লইয়া যান ; এবং আত্মজ্ঞান ও নীতি বা ধর্ম্মের মিল করিয়া জগতে মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহার নির্ণয় করেন। এই পন্থাকে আমি "আধ্যাত্মিক" সংজ্ঞা দিয়াছি। এই তিন পন্থারই আচার-নীতি একই ; কিন্তু জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক পন্থার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের স্বরূপ প্রত্যেক পন্থায় অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্র যেরূপ নূতন ভাষা গঠন না করিয়া ব্যবহারে যে ভাষা প্রচলিত তাহারই নিয়ম বাহির করিয়া ভাষার অভিবৃদ্ধিকল্পে সাহায্য করে, নীতিশাস্ত্রেরও পদ্ধতি ঠিক সেইরূপ। যে

দিন মনুষ্য এই জগতে উৎপন্ন সেই দিন হইতে নিজের বুদ্ধি-অনুসারেই সে আপন আচরণকে দেশকালানুসারে শুদ্ধ রাখিবার চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছে ; এবং সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ ধারণা অনুসারে আচার-শুদ্ধির জন্য প্রেরণারূপ অনেক নিয়মও স্থাপন করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্র এই সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়া নূতন নিয়ম স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। হিংসা করিও না, সত্য কহ, পরোপকার কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এখন ইহাই দেখা নীতিশাস্ত্রের কার্য্য যে, নীতির উন্নতির সুবিধা করিবার জন্য এই নীতির নিয়মান্তর্ভূত মূলতত্ত্ব কি। এবং সেই জন্য নীতিশাস্ত্রের যে কোন পন্থা গ্রহণ করিলেই বর্ত্তমান-প্রচলিত নীতির প্রায় সমস্ত নিয়মই সকল পন্থায় একইরূপ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হয় সেই ভেদ উপপত্তির স্বরূপভেদের কারণে ; এবং তাই প্রত্যেক পন্থায় জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘটিবার মুখ্য কারণ—ডা পল্ কেরস্ এই যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্, স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক পন্থার আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থকারেরা আত্মৌপম্যদৃষ্টির সুলভ ও ব্যাপক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া "সর্ব্বভূতহিত" কিংবা "অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক ও বাহ্য তত্ত্বের উপরেই নীতির ইমারৎ খাড়া করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা জড়ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রাচীন মত হইতে ভিন্ন বলিয়াই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই নূতন মত স্বীকার না করিয়া, 'আমি কে ; জগৎ কি ; আমার এই জগতের জ্ঞান কি প্রকারে হয় ; যে জগৎ আমা হইতে বাহির তাহা স্বতন্ত্র কি না ; স্বতন্ত্র হইলে তাহার মূল তত্ত্ব কি ; এই তত্ত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ; এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন কেন করিবে ; "যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু" এই নীতি অনুসারে যে পৃথিবীর উপরে আমরা আছি, সমস্ত প্রাণীসমেত তাহার আমারও কোন-না-কোন সময়ে নাশ হইবে ইহা যদি নিশ্চিত হয়, তবে নশ্বর পরবর্ত্তী বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ বিসর্জ্জন কেন করিব', ইত্যাদি প্রশ্ন যাঁহারা স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার করিতে চান—কিংবা "পরোপকার প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই কর্ম্মময় অনিত্য দৃশ্যজগতের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই"— এই উত্তরে যাঁহাদের পূর্ণ সন্তোষ হয় না ; এবং এই প্রবৃত্তির মূল কি, ইহা যাঁহারা জানিতে চান, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের নিত্যতত্ত্বজ্ঞানের শরণ লওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। এবং এই কারণেই গ্রীন স্বকীয় নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন, যে আত্মার জড়জগতের জ্ঞান হয় সেই আত্মা জড়জগৎ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে—এই তত্ত্ব হইতে এবং কাণ্ট্ প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির বিচার করিয়া পরে বাসনাত্মক বুদ্ধির ও নীতিশাস্ত্রের মীমাংসা করিয়াছেন। 'মনুষ্য নিজের সুখের জন্য কিংবা অধিক লোকের সুখের জন্যই জন্মিয়াছে' এই কথাটা বাহ্যতঃ বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে। একটু যদি বিচার করিয়া দেখা যায় যে, কেবল সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাত্মা প্রস্তুত থাকেন, ভবিষ্যদ্‌বংশের আধিকারিক বিষয়সুখই হইবে, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কিনা, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নিজের কিংবা অন্য লোকের অনিত্য, আধিভৌতিক সুখাপেক্ষা আরও কিছু বড় এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য আছে।

এই সাধ্য বিষয়টি কি? জড়ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপাত্মক (সুতরাং) নশ্বর, (কিন্তু) দৃশ্যস্বরূপের দ্বারা সমাচ্ছাদিত আত্মস্বরূপী নিত্য তত্ত্ব যাঁহারা আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, আমাদের আত্মার অমর, শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই বিরাম লাভ করা—এই নশ্বর জগতে জ্ঞানবান মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের উপলব্ধি হইয়া এই জ্ঞান যাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই জগৎ নশ্বর বা নিত্য তাহার বিচার করিতে না বসিয়া, সর্ব্বভূতহিতের চেষ্টায় স্বতই প্রবৃত্ত হন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্ত্তক হন; কারণ অবিনাশী ত্রিকালাবাধিত সত্যটি কি, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন। মনুষ্যের এই আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই সমস্ত নীতিনিয়মের মূল উৎস; ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বলা হয়। যে কোন নীতিই গ্রহণ কর না কেন, তাহা এই চরম সাধ্য হইতে পৃথক থাকিতে পারে না; তাই নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের আলোচনা করিবার সময় শেষে এই তত্ত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সর্ব্বাত্মৈক্যরূপ অব্যক্ত মূলতত্ত্বেরই এক ব্যক্ত স্বরূপ সর্ব্বভূতহিতেচ্ছা; এবং সগুণ ও দৃশ্যজগৎ উভয়ই সর্ব্বভূতান্তর্গত সর্ব্বব্যাপী ও অব্যক্ত আত্মারই ব্যক্ত রূপ। এই ব্যক্ত স্বরূপের বাহিরে গিয়া অব্যক্ত আত্মার জ্ঞানলাভ না করিলে জ্ঞানের পূর্ণতা তো হয়ই না; কিন্তু এই জগতে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ণাবস্থায় উপনীত করিবার প্রত্যেকের যে কর্ত্তব্য আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত তাহাও সিদ্ধ হয় না। নীতি বল, ব্যবহার বল, ধর্ম্ম বল, কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রই বল, "সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—অধ্যাত্মজ্ঞানই সকলের চরম গতি। আমাদের ভক্তিমার্গও এই তত্ত্বজ্ঞানেরই অনুসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন সাম্যবুদ্ধিরূপী তত্ত্বই মোক্ষের ও সদাচরণের মূল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে। জ্ঞান-প্রাপ্তির পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত, কোন কোন বেদান্তীর এই যে ধারণা আছে, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ উক্ত তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি। তাই, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ নাই ইহা দেখাইয়া, বাসনাক্ষয় হইলেও, পরমেশ্বরার্পণ-পূর্ব্বক বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ কেবল কর্ত্তব্য বলিয়াই জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মযোগের এই সিদ্ধান্ত গীতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু সেই উপদেশ কেবল তৎকালীন প্রসঙ্গ দেখিয়াই করা হইয়াছিল (গী. ৮. ৭)। উক্ত উপদেশের ইহাই ভাবার্থ জানা যায় যে, অর্জ্জুনেরই ন্যায় কৃষক, স্বর্ণকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, ব্যবসাদার, ব্যাপারী, ব্রাহ্মণ, কেরানী, উদ্যোগী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে চালাইয়া জগতের ধারণ-পোষণ করিতে থাকুক; যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় নিসর্গতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহা নিষ্কাম বুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলে, কর্ত্তাকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ করিবে না; সমস্ত কর্ম্ম একই সমান; দোষ কর্ত্তার বুদ্ধিতে, কর্ম্মে নহে; তাই বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে, পাপ স্পর্শ করে না এবং শেষে সিদ্ধিও লাভ হয়। কিন্তু যাহাদের (বিশেষতঃ আধুনিক কালে) দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে যে, যাহাই হউক না কেন

এই নশ্বর দৃশ্যজগতের বাহিরে যাইয়া আত্মানাত্মবিচারের গভীর জলে প্রবেশ করা উচিত নহে, তাহারা ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ চরমসাধ্যের উচ্চ পৈঠা ছাড়িয়া দিয়া মানবজাতির কল্যাণ কিংবা সর্ব্বভূতহিত ইত্যাদি নিম্ন পৈঠার আধিভৌতিক দৃশ্য (কিন্তু অনিত্য) তত্ত্ব হইতেই স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের আলোচনা সুরু করিয়া থাকে। মনে রেখো যে কোন গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে সেই গাছকে যেরূপ নূতন বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের গঠিত নীতিশাস্ত্র অঙ্গহীন বা অপূর্ণ হইলেও নূতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে, ব্রহ্মাত্মৈক্য স্বীকার না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যাঁহারা মানেন সেই সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের ধারণ-পোষণ ও বিনাশ কোন্ কোন্ গুণের দ্বারা হয় তাহা দেখিয়া, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন; এবং তন্মধ্যে সাত্ত্বিক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং তাহা দ্বারাই মনুষ্য ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতার ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে কিছু হেরফের করিয়া এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে।* বস্তুত, সাত্ত্বিক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষই বল, কিংবা (আধিভৌতিক মতবাদ অনুসারে) পরোপকার বুদ্ধির ও মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিই বল, উভয়ের অর্থ একই। মহাভারতে ও গীতায় এই সমস্ত আধিভৌতিক তত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ তো আছেই; এমন কি মহাভারতে ইহাও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়মের লৌকিক বা বাহ্য উপযোগের বিচার করিলে জানা যায় যে, এই নীতিধর্ম্ম সর্ব্বভূতহিতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের কোন অব্যক্তের উপর বিশ্বাস না থাকায়, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় পক্ষে আধিভৌতিক তত্ত্ব অপূর্ণ ইহা জানিলেও নিরর্থক শব্দজাল বাড়াইয়া ব্যক্ত তত্ত্বের দ্বারাই কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লয়েন। গীতাতে সেরূপ না করিয়া, এই তত্ত্বপরম্পরাকে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের মূল অব্যক্ত ও নিত্য তত্ত্ব পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া মোক্ষ, নীতিধর্ম্ম ও ব্যবহারেরও (এই তিনেরও) তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবান্ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন; এবং তৎপ্রযুক্ত অনুগীতার আরম্ভে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ার্থ যে ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রদানেও সমর্থ (মভা. অশ্ব, ১৬. ১২)। মোক্ষধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র, কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞান ও নীতি—ইহাদের জোড় বাঁধিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ যাহাদিগের মত, তাহারা এই উপপাদনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা এই সম্বন্ধে উদাসীন নহে তাহারা গীতার কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনকে আধিভৌতিক বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় অধ্যাত্ম-জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাচীনকালে অন্য কোথাও হয় নাই বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অন্য কোন দেশেই কর্ম্মযোগের এইপ্রকার আধ্যাত্মিক উপপাদন হইতে পারে নাই এবং ইহা জানাই আছে যে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় না।

এই সংসার অশাশ্বত হওয়ায় ইহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক, (গী. ৯. ৩৩)

* বাবু কিশোরীলাল এম-এ, বি-এল্—The Hindu System of Moral Science নামক যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এই প্রকার অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে।

ইহা স্বীকার করিলেও গীতাতে এই যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে "কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ"—সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম কোন-না-কোন সময়ে ত্যাগ করা অপেক্ষা, সেই কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোককল্যাণার্থ করাই অধিক শ্রেয়স্কর (গী. ৩. ৮ ; ৫. ২)—তাহার সাধক বাধক কারণের বিচার পূর্ব্বে একাদশ প্রকরণে করা হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগের সহিত গীতার এই কর্ম্মযোগের, কিংবা পাশ্চাত্য কর্ম্মত্যাগ-পক্ষের সহিত আমাদের প্রাচ্য সন্ন্যাসমার্গের তুলনা করিবার সময় উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু বেশী খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে হয়। দুঃখময় ও অসার সংসার হইতে নিবৃত্ত না হইলে মোক্ষলাভ হয় না, এই মত বৈদিক ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম উপনিষৎকারেরা ও সাংখ্যেরা প্রচলিত করেন। তৎপূর্ব্বের বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই ছিল। কিন্তু বৈদিকেতর ধর্ম্মের-বিচার করিলে, তন্মধ্যে অনেকের প্রথম হইতেই সন্ন্যাসমার্গ স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমূলক ; খৃষ্টের উপদেশও ঐরূপই। "সংসার ত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং তাহাদের সহিত কথাও কহিবে না" বুদ্ধ নিজ শিষ্যদের প্রতি এই যে উপদেশ দিয়াছেন (মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত ৫. ২৩), মূল খৃষ্টধর্ম্মেরও উক্তি ঠিক সেইরূপ। "তুমি আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতই প্রীতি করিবে" এইরূপ খৃষ্ট বলিয়াছেন সত্য (মাথ্যু. ১৯.১৯) আবার "তুমি যাহা আহার কর, যাহা পান কর, যাহা কিছু কর, সে সমস্ত ঈশ্বরের জন্য কর" এইরূপ পল্ বলিয়াছেন সত্য (১ কোরিন্ ১০, ৩১) ; এবং এই দুই উপদেশ আত্মৌপম্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ গীতায় আছে, তাহারই সদৃশ (গী ৬. ২৯. এবং ৯. ২৭)। কিন্তু কেবল ইহা দ্বারাই গীতাধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্ম যে প্রবৃত্তিমূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না ; কারণ, অমৃতত্ব লাভ করিয়া মনুষ্য মুক্ত হউক—ইহা খৃষ্টধর্ম্মেরও চরম সাধ্য ; এবং উহাতে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই সাধ্য ঘরদ্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অতএব খৃষ্টের মূল ধর্ম্ম সন্ন্যাস মূলকই বলিতে হইবে। খৃষ্ট নিজে শেষপর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এক সময়ে এক গৃহস্থ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল যে, "পিতামাতাকে কিংবা প্রতিবেশীকে প্রীতি করিবার ধর্ম্ম আমি এখন পর্য্যন্ত পালন করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে অমৃতত্ব লাভের কি উপায় আছে তাহা আমাকে বল"। তখন ঘরদ্বার বেচিয়া ফেলিয়া কিংবা গরীবদিগকে দান করিয়া তুমি আমার ভক্ত হও" এইরূপ খৃষ্ট তাহাকে স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন (মাথ্যু. ১৯. ১৬-৩০ এবং মার্ক. ১৯. ২১-৩১) ; এবং তিনি তখনই নিজ শিষ্যদের দিকে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন যে "উট ছুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়াও গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীদের প্রবেশ লাভ করা কঠিন।" "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ. ২. ৪. ২)—অর্থের দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবার আশা নাই—এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাহারই নকল এরূপ বলিতে বাধা নাই। অমৃতত্ব লাভের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগের আবশ্যকতা নাই, তাহা নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলেই হইল, গীতার ন্যায় খৃষ্ট কোথাও এরূপ উপদেশ করেন নাই। বরং ইহার বিপরীতে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, ঐহিক সম্পত্তি ও পরমেশ্বর এই দুয়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ আছে (মাথ্যু ৬. ২৪) বলিয়া "পিতামাতা, ঘরদ্বার, স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন

এমন কি নিজের জীবনেরও প্রতি দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আমার অনুগামী হয় না, সে আমার ভক্ত কখনই হইতে পারে না" (লূক, ১৪. ২৬-৩৩)। আবার "স্ত্রীলোককে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করাই উত্তমকল্প" (১ কোরিং ৭ ১) খৃষ্টের শিষ্য পলেরও এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ আছে। সেইরূপ আমি প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে, "আমার জননী* মাতা আমার কে ? আমার চতুস্পার্শ্বস্থ ঈশ্বরভক্ত লোকেরাই আমার পিতা মাতা ও বন্ধু" (ম্যাথ্যু ১২ ৪৬. ৫০) খৃষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের সন্ন্যাসবিষয়ক বচন (বৃ. ৪. ৪. ২২) এই দুয়ের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে। স্বয়ং বাইবেলেরই এই বাক্যসমূহ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মও আরম্ভে সংসারত্যাগবাদী অর্থাৎ সন্ন্যাসমূলক ; এবং খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস দেখিলেও ইহাই দেখা যায় যে,• 'খৃষ্টভক্তেরা পয়সাকড়ি না রাখিয়া অবস্থিতি করিবে" (ম্যাথ্যু. (১০ ৯. ১৫) খৃষ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক বৈরাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মোপদেশকদিগের এবং খৃষ্টভক্তদিগের মধ্যে গৃহস্থধর্ম্মানুসারে সংসারে থাকিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা অনেক পরবর্ত্তী সংস্কারের ফল। মূল খৃষ্টধর্ম্মের স্বরূপ নহে। অদ্যাপিও শোপেনহোয়েরের ন্যায় বিদ্বান সংসার দুঃখময় অতএব ত্যাজ্য ইহাই প্রতিপাদন করেন ; এবং গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে তত্ত্ববিচারেই নিজের জীবন অতিবাহিত করা, কিংবা লোককল্যাণার্থ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করা শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সারকথা—পাশ্চাত্যদিগের এই কর্ম্মত্যাগ মতবাদ এবং আমাদিগের সন্ন্যাসমার্গ কোন কোন অংশে একই ; এবং এই মার্গের সমর্থন করিবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিও একই। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মমার্গ শ্রেষ্ঠ কেন,—আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার যে কারণ দেখাইয়া থাকেন তাহা গীতায় প্রদত্ত প্রবৃত্তিমার্গের প্রতিপাদন হইতে ভিন্ন হওয়ায়, এখন উহাদের ভেদও এখানে বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্ম্মমার্গীদিগের বক্তব্য এই যে, জগতের সমস্ত মনুষ্যের কিংবা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ—অর্থাৎ ঐহিক সুখ—ইহাই এই জগতে পরম সাধ্য ; অতএব সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করিতে

* সন্ন্যাসমার্গীয়দিগের ইহাই নিত্য উপদেশ। "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ" শঙ্করাচার্য্যের এই শ্লোক প্রসিদ্ধ ; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (৬. ৪৫) বুদ্ধের মুখ দিয়া কাহং মাতুঃ ক সা মম" এইরূপ উক্তি বাহির হইবার বর্ণনা আছে।

• See Paulson's *System of Ethics*, (Eng, trans.) Book I. Chap. 2-3. esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country…their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life and their frequent predictiens of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect." *Historian's History of the World*, Vol. VI, P. 318. জর্ম্মন কবি গয়টের Faust (ফৌষ্ট) নামক কাব্যে "Thou shalt renounce! That is the eternal song whieh rings in everyone's ears; which, our whole life-long every hour is hoarsely singing to us" এই উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইয়াছে। (*Faust*, part I. II. 1195-1198). মূল খৃষ্টধর্ম্ম সন্ন্যাসমূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

থাকিয়া নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য ; এবং ইহার পুষ্টির জন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, সংসারে দুঃখ অপেক্ষা সাকল্যে সুখই অধিক। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পাশ্চাত্য কর্ম্মমার্গের লোক, "সুখপ্রাপ্তির আশায় সাংসারিক কর্ম্ম করিতে চাহে" এবং পাশ্চাত্য কর্ম্ম-ত্যাগমার্গের লোক, "সংসারে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে," এইরূপ বলিতে হয় ; এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহাদিগকে যথাক্রমে 'আশাবাদী' ও 'নিরাশা-বাদী' নামে অভিহিত করা হয়। * কিন্তু ভগবদ্গীতায় যে দুই নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে ভিন্ন। নিজেরই জন্য হউক,, বা পরোপকারের জন্য হউক, যাহাই হউক না কেন, যে ঐহিক বিষয়সুখের লালসায় সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সাম্যবুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিকবৃত্তির কিছু-না-কিছু হ্রাস না হইয়া যায় না। তাই গীতায় বলা হইয়াছে যে, সংসার দুঃখময় হউক বা সুখময় হউক, সাংসারিক কর্ম্ম যখন ছাড়েই না, তখন উহার সুখদুঃখের বিচার করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, মানবদেহ লাভ করাই একটা মহদ্ভাগ্য মনে করিয়া, কর্ম্মজগতের এই অপরিহার্য্য কার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু প্রসঙ্গানুসারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অন্তঃকরণে নৈরাশ্য আসিতে না দিয়া, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (গী. ২ ৫৬) এই নীতি অনুসারে, সাম্যবুদ্ধি সহকারে সহ্য করা এবং (অপর কাহারও জন্য নহে, কিন্তু জগতের ধারণপোষণার্থ) আপন অধিকারানুসারে যে কোন কর্ম্ম শাস্ত্রতঃ নিজের ভাগে পড়িবে, তাহা নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। গীতার কালে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা আমলে আসিয়াছিল এই কারণেই এই সামাজিক কর্ম্ম চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগানুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে ইহা বলা হইয়াছে ; এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুণকর্ম্মবিভাগশঃ এই ভেদ নিষ্পন্ন হয় তাহাও বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ৪১-৪৪)। কিন্তু ইহা হইতে গীতার নীতিতত্ত্ব যে চাতুর্ব্বর্ণ্যরূপ সমাজব্যবস্থার উপরেই অবলম্বিত, এইরূপ যেন মনে করা না হয়। অহিংসাদি নীতিধর্ম্মের ব্যাপ্তি কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্যের জন্যই নহে—এই ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই জন্য এক সমান, এই কথা মহাভারতকারও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে (শাং ৬৫. ১২-২২ দেখুন) যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের বহির্ভূত যে অনার্য্য লোকদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম অনুসারেই রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ গীতোক্ত নীতির উপপত্তি চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি কোন এক বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া, সর্ব্বজনমান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বনিয়াদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মমাত্রই নিষ্কাম ও

* জেম্‌স সলি (James Sully) স্বকীয় *Pessimism* নামক পুস্তকে Optimist ও Pessimist এই দুই পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে Optimist অর্থে "উৎসাহী, আনন্দিত' এবং Pessimist অর্থে 'সংসার হইতে ভীত' ; এবং আমি পূর্ব্বে এক টিপ্পনীতে (পৃ. ৩০৭ দেখ) বলিয়াছি যে এই দুই শব্দ গীতার 'যোগ' ও 'সাংখ্য' শব্দের সর্ব্বাংশে সমানার্থক নহে। 'দুঃখনিবারণেচ্ছু' বলিয়া যে এক তৃতীয় পন্থা পরে বর্ণিত হইয়াছে—সলি তাহার নাম দিয়াছেন—Meliorism।

আত্মৌপম্যবুদ্ধিতে সম্পাদন করা উচিত ইহাই গীতার নীতিধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য ; এবং সর্ব্বদেশের লোকের জন্য ইহা একই প্রকার উপযোগী। কিন্তু আত্মৌপম্য-দৃষ্টির ও নিষ্কাম কর্ম্মাচরণের এই সাধারণ নীতিতত্ত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা যে কর্ম্মের উপযোগী সেই কর্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহারও স্পষ্ট বিচার করা আবশ্যক ছিল। এই কথা বলিবার জন্যই, তৎকালের উপ-যোগী সহজ উদাহরণের হিসাবে, গীতায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং সেই সঙ্গে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে সমাজব্যবস্থার উপপত্তিও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থাই কিছু গীতার মুখ্য ভাগ নহে ইহাও মনে রাখা উচিত। চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা যদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে কিংবা পঙ্গুভাবে অবস্থিত করে তাহা হইলে সেস্থলেও তৎকালপ্রচলিত সমাজব্যবস্থানুসারে সমাজের ধারণপোষণের যে যে কর্ম্ম নিজেদের ভাগে আসিবে, তাহা লোকসংগ্রহার্থ ধৈর্য ও উৎসাহসহকারে এবং নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ত্তব্যবোধে করিতে থাকা উচিত, কারণ এই কার্য্যই সম্পাদনা করিবার জন্য মনুষ্যের জন্ম, কেবল সুখ-ভোগার্থ নহে—ইহাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত। গীতার নীতিধর্ম্ম কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্যমূলক এইরূপ কেহ কেহ যে বলেন ; তাহা ঠিক নহে। সমাজ হিন্দুরই হউক বা ম্লেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক বা অর্ব্বাচীন হউক, প্রাচ্য হউক বা পাশ্চাত্য হউক, সেই সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে তদনুসারে, কিংবা অন্য সমাজব্যবস্থা জারী থাকিলে তদনুসারে, যে কর্ম্ম নিজের ভাগে পড়ে, অথবা যাহা আমি নিজের রুচি অনুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ করি তাহাই আমার স্বধর্ম্ম হইয়া যায়। এবং গীতা বলেন যে, কোনও কারণে এই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সুবিধামত অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মদৃষ্টিতে ও সর্ব্বভূতহিতদৃষ্টিতে নিন্দনীয় "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গী. ৩. ৩৫)—স্বধর্ম্মপালনে মরণও শ্রেয়স্কর কিন্তু পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ, এই গীতাবচনের ইহাই তাৎপর্য্য। এই নীতি অনুসারেই জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও যিনি তৎকালীন দেশকালের অনুরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই মহাত্মা মাধবরাও পেশোয়াকে রামশাস্ত্রী বাবা "স্নান-সন্ধ্যা ও পূজা-পাঠে সমস্ত সময় নষ্ট না করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে প্রজা-সংরক্ষণে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিলেই তোমার উভয়ত্র কল্যাণ হইবে" এই উপদেশ করিয়াছিলেন—এই কথা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। সমাজধারণের জন্য কোন্ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বলা গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, সেই ব্যবস্থার মধ্যে যথাধিকার প্রাপ্ত কর্ম্ম উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতহিতরূপ আত্মশ্রেয়ঃ সাধন কর, ইহাই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই প্রকারে কর্ত্তব্য বলিয়া গীতাবর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন তাহা স্বভাবতই লোককল্যাণকর হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্ম্মমার্গ এবং গীতার কর্ম্মযোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের মনে, আমার কর্ম্মের দ্বারা আমি লোককল্যাণ করিতেছি এই অভিমান-বুদ্ধি থাকেই না, বরং সাম্যবুদ্ধি তাঁহার দেহস্বভাবই হইয়া পড়ায়, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থানুসারে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে যে কাজ করেন সে সমস্ত স্বভাবতঃ লোককল্যাণকর হইয়া থাকে ; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ সংসারকে সুখময়

মনে করিয়া এই সংসারসুখ প্রাপ্তির জন্য সমস্ত লোককে লোককল্যাণকর কর্ম্ম করিতে বলেন।

তথাপি পাশ্চাত্য আধিভৌতিক আধুনিক কর্ম্মযোগী সকলেই কিছু সংসারকে সুখময় মনে করেন না। সোপেনহৌয়েরের মত সংসারকে দুঃখপ্রধান স্বীকার করিবার পণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাঁহারা প্রতিপাদন করেন যে, যথাশক্তি লোকের দুঃখ নিবারণ করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য হওয়ায়, তাঁহার সংসার ত্যাগ না করিয়া লোকের দুঃখ হ্রাস করিবার জন্য প্রযত্ন করা উচিত। এখন তো পাশ্চাত্য দেশে দুঃখনিবারণেচ্ছু কর্ম্ম-যোগীদিগের এক পৃথক পন্থাই হইয়া গিয়াছে। গীতার কর্ম্মযোগের সহিত তাহার খুবই সাম্য আছে। "সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাত্র সংশয়"—সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক—মহাভারতের যেখানে উক্ত হইয়াছে সেইখানেই মনু বৃহস্পতিকে এবং নারদ শুককে বলিয়াছেন (শাং, ২০৫. ৫ এবং ৩৩০. ১৫)

ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্ ॥

"যে দুঃখ সার্ব্বজনিক তাহার জন্য শোক করিতে বসা উচিত নহে ; তাহার জন্য কাঁদিতে না বসিয়া তাহার প্রতীকারার্থ (জ্ঞানীপুরুষের) কোন উপায় করা উচিত"। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসার দুঃখময় হইলেও সমস্ত লোকের দুঃখ কমাইবার জন্য জ্ঞানীপুরুষের উদ্যোগ করা উচিত, এই তত্ত্ব মহাভারতকারেরও গ্রাহ্য। কিন্তু ইহা কিছু আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ নহে। ঐহিক সুখাপেক্ষা আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-সম্ভূত সুখকে অধিক মহত্ত্ব দিয়া, এই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদের সুখকে পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়াই (অর্থাৎ লোকের দুঃখ আমি হ্রাস করিব এইরূপ রাজসিক অভিমান-বুদ্ধি মনে না রাখিয়া) সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবার উপদেশকর্ত্তা গীতার কর্ম্ম-যোগের সমান করিবার জন্য দুঃখনিবারণেচ্ছু পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগেও এখনও অনেক সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে এই কথা জাগিয়া থাকে যে, নিজের কিংবা সকল লোকের ঐহিক সুখই মনুষ্যের এই সংসারে পরম সাধ্য —চাই তাহা সুখের সাধনের বৃদ্ধি করিয়াই পাওয়া যাক্, কিংবা দুঃখের লাঘব করিয়াই পাওয়া যাক্। এই কারণে ; সংসার দুঃখময় হইলেও তাহা অপরিহার্য্য মনে করিয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থই সংসারের কর্ম্ম করিবে, গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের এই উপদেশ তাঁহাদের শাস্ত্রে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ই কর্ম্মমার্গী সত্য ; কিন্তু শুদ্ধ নীতিদৃষ্টিতে দেখিলে উহাদের মধ্যে ইহাই ভেদ উপলব্ধি হইবে যে, পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগী সুখেচ্ছু বা দুঃখনিবারণেচ্ছু হয়—যাহাই বল না কেন কিন্তু সে 'ইচ্ছু' অর্থাৎ 'সকাম' নিশ্চয়ই, এবং গীতার কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা ফলসম্বন্ধে নিষ্কাম হইয়া থাকেন। এই অর্থই অন্য শব্দে ব্যক্ত করিতে হইলে বলা যায় যে, গীতার কর্ম্মযোগ সাত্ত্বিক এবং পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগ রাজসিক—(গীতা, ১৮. ২৩. ২৪ দেখুন)।

কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কাজ করিতে থাকিয়া তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের যজন কিংবা উপাসনা আমরণান্ত বজায় রাখিবার এই যে গীতা প্রতিপাদিত জ্ঞানযুক্ত প্রবৃত্তিমার্গ কিংবা কর্ম্মযোগ, ইহাকেই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলে। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (গী, ১৮. ৪৫) ইহাই এই মার্গের রহস্য।

মহাভারতের বনপর্ব্বে, ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-কথায় (বন. ২০৮) এবং শান্তিপর্ব্বে তুলাধার-জাজলি-সংবাদে (শাং ২৬১) এই ধর্ম্মেরই নিরূপণ করা হইয়াছে ; এবং মনুস্মৃতিতেও (মনু ৬. ৯৬. ৯৭) যতিধর্ম্মের নিরূপণান্তর এই মার্গকেই বেদসন্ন্যাসীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়া বিহিত ও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। 'বেদসন্ন্যাসিক' পদ হইতে এবং বেদের সংহিতা-সমূহ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই মার্গ আমাদের দেশে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নতুবা এই দেশ কখনই এত বৈভবশালী হইত না ; কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপূর্ণ হইতে গেলে তথাকার কর্ত্তা বা বীর পুরুষ কর্ম্মমার্গেরই প্রবর্তক হয়েন। কেহ কর্ত্তা বা বীর পুরুষ হইলেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান না ছাড়িয়া উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য স্থির রাখাই আমাদের কর্ম্মযোগের মুখ্য তত্ত্ব ; এবং এই বীজভূত তত্ত্বেরই সব্যবস্থিত আলোচনা করিয়া শ্রীভগবান্ এই মার্গের পুষ্টিকরণ ও প্রসার করা প্রযুক্ত এই প্রাচীনমার্গই পরে 'ভাগবত ধর্ম্ম' এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উল্টাপক্ষে, উপনিষৎসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, কখন-না-কখনও কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গতি প্রথম হইতেই স্বভাবতঃ সন্ন্যাসমার্গের দিকেই থাকিত ; কিংবা নিদানপক্ষে প্রথমে গৃহস্থাশ্রম করিয়া শেষে সন্ন্যাসগ্রহণের বুদ্ধি মনে জাগৃত হইত—চাই তাঁহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহণ করুন বা নাই করুন। তাই সন্ন্যাসমার্গকেও নতুন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু স্বভাব-বৈচিত্র্যাদি কারণপ্রযুক্ত এই দুই মার্গ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত হইলেও ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককালে লোকের মধ্যে মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গেরই বিশেষ প্রাবাল্য হইয়াছিল, এবং কৌরবপাণ্ডবদিগের কালে আবার কর্ম্মযোগ সন্ন্যাস-মার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছিল। কারণ এই যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে কুরুপাণ্ডবদিগের কালের পর অর্থাৎ কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম নিষিদ্ধ ; এবং "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ" (মভা. অনু. ১৪৯ ১৩৭ ; মনু, ১. ১০৮) এই বচনানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র যখন প্রায় আচারকেই অনুসরণ করিয়া থাকে, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র-কারেরা এই নিষেধ স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই লোকাচারে সন্ন্যাসমার্গের গৌণত্ব আসিয়া-ছিল ইহা সহজে সিদ্ধ হয়। * কিন্তু কর্ম্মযোগের এইরূপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম যদি নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন এইস্থানে স্বভাবতই উত্থিত হয় যে, যাহা একবার সবলে প্রচলিত হইতে সুরু হইয়াছিল সেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগের অবনতি হইয়া এখনকার ভক্তিমার্গেও সন্ন্যাসপক্ষই একমাত্র শ্রেষ্ঠ এই মত কি করিয়া প্রবেশ করিল ? কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যই এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই উপপত্তি ঠিক্ নহে উপলব্ধি হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের (১) মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতজ্ঞান এবং (২) কর্ম্মসন্ন্যাসধর্ম্ম, এইরূপ দুইবিভাগ আছে ইহা আমি প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। এখন অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদে সন্ন্যাসধর্ম্মেরও প্রতিপাদন হইলেও, এই দুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ না থাকায় অদ্বৈত্য বেদান্তমত স্বীকার করিলে সন্ন্যাসমার্গও অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে তাহা বলা যায় না। উদাহরণ যথা—যাজ্ঞবল্ক্যাদি হইতে অদ্বৈতবেদান্তে পূর্ণরূপে শিক্ষিত জনকাদি নিজে কর্ম্মযোগী

* পূর্ব্বে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে প্রদত্ত বচন দেখুন।

ছিলেন শুধু নহে, উপনিষদের অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও গীতাতে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সন্ন্যাসের পরিবর্ত্তে কর্ম্মযোগেরই সমর্থন করা হইয়াছে। তাই প্রথমে মনে রাখা আবশ্যক যে, সন্ন্যাসধর্ম্মে উত্তেজন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শাঙ্কর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনা হয়, তাহা সেই সম্প্রদায়ের অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে উপযুক্ত না হইয়া শুধু তদন্তর্গত সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধেই উপযোগী হইতে পারে। এই সন্ন্যাসমার্গ শ্রীশঙ্করাচার্য্য নূতন বাহির না করিলেও, উহা কলিযুগে বর্জ্জনীয়ের মধ্যে পড়ায় উহাতে যে গৌণত্ব আসিয়াছিল তাহা তিনি অবশ্য দূর করিয়াছেন। কিন্তু যদি ইহারও পূর্ব্বে অন্য কারণে সন্ন্যাসমার্গের প্রতি লোকের অনুরাগ উৎপন্ন না হইত, তবে আচার্য্যের সন্ন্যাসমূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিনা সন্দেহ। 'এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল বাড়াইয়া দিবে' (লূক, ৬. ২৯) ইহা খৃষ্ট বলিয়াছেন ধরা গেল। কিন্তু এই মতানুযায়ী লোক য়ুরোপীয় খৃষ্টান রাষ্ট্রে কত আছে তাহার বিচার করিলে দেখা যায় যে, কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা কোন বিষয় ভালো বলিলেই তাহা প্রচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, বরং লোকের মন সেই দিকে যাইবার জন্য সেই উপদেশের পূর্ব্বেই কোন প্রবল কারণ ঘটিয়া থাকে, এবং তখন আবার লোকাচারের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া তদনুরূপই পরিবর্ত্তন ধর্ম্মনিয়মের মধ্যেও ঘটিতে থাকে। আচার ধর্ম্মের মূল—এই স্মৃতিবচনের তাৎপর্য্যও ইহাই। শোপেনহৌয়ের গত শতাব্দীতে জর্ম্মনিতে সন্ন্যাসধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রোপিত বীজ অদ্যাপি সেখানে ভালরূপ জমিতে পায় নাই এবং নিৎসেরই মত এক্ষণে সেখানে অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। অমোদের দেশেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসমার্গ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদিককালেই বাহির হইলেও তাহা সে সময়ে কর্ম্মযোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই। স্মৃতিগ্রন্থাদি শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাকেও পূর্ব্ব আশ্রমগুলির কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ দেওয়াই হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে কর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষ প্রতিপাদ্য হইলেও, তাঁহার নিজের জীবন হইতেই সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তির এবং সন্ন্যাসীরও ধর্ম্মসংস্থাপনের ন্যায় লোকসংগ্রহের কাজ যথাধিকার করিবার পক্ষে তাঁহার দিক হইতে কোন মানাই ছিল না (বেসূ, শাং ভা. ৩. ৩. ৩২)। সন্ন্যাসমার্গের প্রাবল্যের কারণ যদি শঙ্করাচার্য্যের স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ই হইত, তবে আধুনিক ভাগবত সম্প্রদায়ের রামানুজাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যেরই মত কর্ম্মযোগকে গৌণ বলিয়া মানিতেন না। কিন্তু যে কর্ম্মযোগ একবার বহুল প্রচলিত ছিল তাহা যখন ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিবৃত্তিমূলক ভক্তিকে পিছনে হটাইয়া দিয়াছে, তখন তো ইহাই বলিতে হয় যে, উহার পশ্চাতে পড়িবার পক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি কিংবা সমস্ত দেশের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় ও প্রসার প্রথম ও মুখ্য কারণ, কারণ এই দুই ধর্ম্মই চারি বর্ণের সম্মুখে সন্ন্যাসমার্গের দ্বার খুলিয়া দেওয়ায় ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেও সন্ন্যাসধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে কর্ম্মরহিত সন্ন্যাসমার্গেরই উপদেশ করিলেও, গীতার কর্ম্মযোগানুসারে বৌদ্ধধর্ম্মে শীঘ্রই এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ

যতিরা গণ্ডারের মত বনের মধ্যে এককোণে বসিয়া না থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার ও পরোপকার চেষ্টায় নিরত থাকিবেন (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখুন)। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই সংস্কার প্রযুক্তই উদ্যোগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ উত্তরে তিব্বৎ, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান, দক্ষিণে লঙ্কা এবং পশ্চিমে তুর্কিস্থান এবং তাহার সংলগ্ন গ্রীস প্রভৃতি য়ুরোপের প্রান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শালিবাহন শকের ন্যূনাধিক ছয়সাতশত বৎসর পূর্ব্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করেন এবং শালিবাহন শকের ছয় শত বৎসর পরে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। এই কালের মধ্যে বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘের অপূর্ব্ব বৈভব সমস্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে থাকায় যতিধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের একপ্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি শঙ্করাচার্য্য জন্মিবার পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের খণ্ডন করিলেও যতিধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তিনি নাশসাধন না করিয়া তাহাকেই বৈদিক রূপ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অনেক উদ্যোগী বৈদিক সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিলেন। এই সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসীর দণ্ড ও গেরুয়া বস্ত্রও গ্রহণ করিত; কিন্তু নিজেদের গুরুর মত ইহারাও বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপনের কাজ পরে চালাইয়াছিল। যতিসংঘের এই নূতন প্রতিরূপ (বৈদিক সন্ন্যাসীদের সংঘ) দেখিয়া সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, শাঙ্কর মত ও বৌদ্ধমতে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে তাহা কি? এবং প্রতীতি হয় যে, প্রায় সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "বৌদ্ধ-যতিধর্ম্ম ও সাংখ্য-যতিধর্ম্ম উভয়ই বেদ-বহির্ভূত ও মিথ্যা এবং আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্মই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সত্য" (ছাং. শাংভা. ২. ২৩. ১)। যাহাই হউক; ইহা নির্ব্বিবাদ যে, কলিযুগে সর্ব্বপ্রথম যতিধর্ম্মের প্রচার বৌদ্ধ ও জৈনেরাই করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধযতিরাও ধর্ম্মপ্রচারার্থ এবং লোকসংগ্রহার্থ পরে উপযুক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে বৈদিক যতিসঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারাও কর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া না দিয়া আপন উদ্যোগেই বৈদিকধর্ম্মের পুনঃস্থাপনা করিয়াছিল। অনন্তর শীঘ্রই এই দেশের উপর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হইল; এবং যখন এই পরচক্র হইতে পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়া দেশের ধারণপোষণকারী ক্ষত্রিয় রাজাদিগের কর্ত্তৃত্বশক্তির মুসলমানদিগের সময়ে হ্রাস হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে সন্ন্যাসমার্গই সাংসারিক লোকদিগের অধিকাধিক গ্রাহ্য হইয়া থাকিবে, কারণ "হরি হরি" বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার একদেশীয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মনে হইত এবং এখন তো তৎকালীন বাহ্য পরিস্থিতির জন্যও ঐ মার্গই বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল না; কারণ শূদ্র কমলাকরের মধ্যে গৃহীত বিষ্ণুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পায়—

অপহায় নিজং কর্ম্ম কৃষ্ণকৃষ্ণেতিবাদিনঃ।
তে হরের্দ্বেষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ ॥ *

অর্থাৎ "নিজের (স্বধর্ম্মোক্ত) কর্ম্ম ছাড়িয়া (কেবল) যাহারা 'হরি হরি' বলে সেই সব লোক হরির দ্বেষ্টা ও পাপী, কারণ স্বয়ং হরির জন্মও তো ধর্ম্মরক্ষণার্থই হইয়াছে"। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই সমস্ত লোক সন্ন্যাসনিষ্ঠও নহে, কর্ম্মযোগীও নহে; কারণ ইহারা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জ্ঞান বা তীব্র বৈরাগ্য-যোগে সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়ে না; এবং সংসারে থাকিয়াও কর্ম্মযোগানুসারে শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত আপন কর্ত্তব্য নিষ্কামবুদ্ধিতে করে না। তাই, এই বাচিক সন্ন্যাসীদের গণনা এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে করিতে হইবে—তাহা গীতায় বর্ণিত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোকেরা এই প্রকারে তৃতীয় প্রকৃতিগ্রস্ত হইলে শেষে ধর্ম্মেরও নাশ না হইয়া যায় না। ইরাণের পার্শীধর্ম্ম পশ্চাতে পড়িবার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াছিল; এবং ইহা হইতে ভারতেরও বৈদিকধর্ম্মের "সমূলং তু বিনশ্যতি" হইবার সময় আসিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের পর, বেদান্তের সঙ্গেই গীতার ভাগবতধর্ম্মের যে পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তাহার দরুণ আমাদের দেশে এই দুষ্পরিণাম ধর্ম্মে নাই। দৌলতাবাদের হিন্দুরাজ্য মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ভগবদ্গীতাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে পরিণত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে মহারাষ্ট্রপ্রান্তে অতি সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও সেই সময়েই অনেক সাধুসন্ত গীতার ভক্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। যবন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদিকে সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানমূলক গীতাধর্ম্মের জাজ্জল্যমান উপদেশ (চাই তাহা বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপেই হোক না কেন) চতুর্দ্দিকে একই সময়ে প্রচলিত থাকায় হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ হ্রাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে; তাহার অল্পস্বল্প প্রভাব মুসলমানধর্ম্মের উপরেও পড়িতেছিল, যাহার ফলে কবীরের মত সাধু এই দেশের সন্তমণ্ডলীর মধ্যে মান্য হইয়াছিলেন এবং ঔরংজেবের বড় ভাই শাহজাদা দারা উপনিষদের ফার্সি ভাষান্তর এই সময়েই আপন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বৈদিক ভক্তিধর্ম্ম অধ্যাত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া যদি শুধু তান্ত্রিক শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই খাড়া হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ সামর্থ্য থাকিতে পারে কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মুসলমানদিগেরই সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে কেবল ভক্তিপর অর্থাৎ একদেশদর্শী হইয়া, মূল ভাগবতধর্ম্মোক্ত কর্ম্মযোগের যে স্বতন্ত্র মহত্ত্বের একবার হ্রাস হইয়াছিল, তাহা আর সেই মহত্ত্ব ফিরিয়া পাইল না। ফলতঃ এই সময়কার ভাগবতধর্ম্মীয় সন্তমণ্ডলী, পণ্ডিত ও আচার্য্যেরাও পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ন্যাসমার্গীদিগের ন্যায় কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ বা সাধন না বলিয়া উহাকে ভক্তিমার্গের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে কেবল শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী নিজের 'দাসবোধ' গ্রন্থে, আমি যতদূর জানি, বিচার করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গের প্রকৃত মহত্ত্ব শুদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষায় যাহা বলা

* বোম্বায়ে মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণের সংস্করণে এই শ্লোক আমি পাই নাই; তথাপি কমলাকরের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় ইহা অমূলক বলিয়াও মনে করা যায় না।

হইয়াছে তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ, বিশেষতঃ তাহারই উত্তরার্দ্ধ তাঁহার পাঠ করা উচিত। শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কর্ম্মযোগের তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন শাণ্ডিল্যসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বদলে মহাভারতের গদ্যাত্মক ভাষান্তর হইয়া 'বখর' নামক ইতিহাসের আকারে তাহার অনুশীলন সুরু হইল। এই ভাষান্তর তঞ্জোরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল অবাধিতভাবে চলিত তাহা হইলে গীতার একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ সমস্ত টীকা পিছনে পড়িয়া মহাভারতীয় সমস্ত নীতির সার গীতোক্ত কর্ম্মযোগে উক্ত হইয়াছে, এই কথা কালক্রমে পুনর্ব্বার সকলের গোচরে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু কর্ম্মযোগের এই পুনরুজ্জীবন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিন টিঁকে নাই।

যাক্। ভারতের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা করিবার ইহা স্থান নহে। উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্ম্মের যে এক প্রকার সজীবতা, তেজ বা সামর্থ্য আছে, তাহা সন্ন্যাসধর্ম্মের যে প্রাদুর্ভাব মধ্যকালে দৈববলে হইয়াছিল তাহা হইতেও সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে পায় নাই। ধর্ম্মশব্দের ধাত্বর্থ "ধারণাদ্ধর্ম্মঃ" এবং সাধারণতঃ উহার এই দুই ভেদ হয় 'পারলৌকিক' ও 'ব্যবহারিক', কিংবা 'মোক্ষধর্ম্ম' ও 'নীতিধর্ম্ম,' ইহা আমি তৃতীয় প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধর্ম্মই বল, কিংবা খৃষ্টধর্ম্মই বল, জগতের ধারণপোষণ হইয়া শেষে মনুষ্য যাহাতে সদ্গতি পায় ইহাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রত্যেক ধর্ম্মে মোক্ষধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই, ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্মেরও আলোচনা আসিয়াছে। অধিক কি, প্রাচীনকালে মোক্ষধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও ব্যবহারিকধর্ম্ম স্বতন্ত্র এই ভেদই করা হইত না বলিলেও চলে; কারণ, সে সময়ে পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে হইলে ইহলোকেও আচরণকে শুদ্ধই রাখা চাই সকলেরই এই ধারণাই ছিল। এই লোকেরা গীতার উক্তি অনুসারে পারলৌকিক ও ঐহিক কল্যাণের ভিত্তিও একই মনে করিত। কিন্তু আধিভৌতিক জ্ঞানের প্রসার হইলে পর আজকাল পাশ্চাত্যদেশে এই ধারণা বজায় থাকিতে পারে নাই, এবং মোক্ষধর্ম্মবর্জ্জিত নীতির অর্থাৎ যে সকল নিয়মের দ্বারা জগতের ধারণ পোষণ হয় সেই সকল নিয়মের উপপত্তি বলিতে পারা যায় কি না এই বিচার সুরু হইয়া কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত ভিত্তির উপরেই সমাজধারণশাস্ত্রের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উপর এই প্রশ্ন আসে যে, শুধু ব্যক্তের দ্বারাই মনুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া? গাছ, মানুষ এই সকল জাতিবাচক শব্দ পর্য্যন্ত অব্যক্ত অর্থই প্রকাশ করে। আমগাছ, গোলাপগাছ এই সকল বিশিষ্ট দৃশ্য পদার্থ বটে; কিন্তু 'গাছ' এই সাধারণ শব্দ কোনও দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত বস্তুকে দেখাইতে পারে না। এইরূপেই আমাদের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, অব্যক্তের কল্পনা মনে জাগ্রত হইবার জন্য প্রথমে কোন-না-কোন ব্যক্ত বস্তু চোখের সম্মুখে থাকা চাই; কিন্তু ইহাও তেমনি নিশ্চিত যে, ব্যক্তই কিছু শেষের পৈঠা নহে; এবং অব্যক্তের আশ্রয় ব্যতীত একপদও না আমরা অগ্রসর হইতে পারি আর না, কোন বাক্যই সম্পূর্ণ করিতে পারি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ পরব্রহ্মের অব্যক্ত কল্পনাকে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি যদি না স্বীকার করেন, তথাপি উহার স্থলে "সমস্ত মানবজাতি"কে অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত বস্তুকেই শেষে দেবতার মত পূজা করিতে হয়। আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, "সমস্ত মানবজাতি"তে পূর্ব্ববংশের ও পরবংশেরও সমাবেশ করিলে অমৃতত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তৃপ্ত হওয়া উচিত; এবং এক্ষণে

তো প্রায় তাঁহারা সকলেই খুব আগ্রহের সহিত উপদেশ করিতে সুরু করিয়াছেন যে, প্রীতির সহিত অনন্যভাবে এই (মানবজাতিরূপ) শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসনা করা, তাহার সেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা, এবং তাহার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বলিদান করাই এই জগতে প্রত্যেক মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য। ফরাসী পণ্ডিত কোঁৎ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের ইহাই সার এবং এই ধর্ম্মকেই স্বকীয় গ্রন্থে তিনি "সমস্ত-মানবজাতিধর্ম্ম" বা সংক্ষেপে "মানব-ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। * আধুনিক জর্ম্মন পণ্ডিত নিৎসেরও এই কথা। ইনি তো স্পষ্টই বিধান দিয়াছেন যে, ঊনবিংশতি শতাব্দীতে "পরমেশ্বর গতাসু হইয়াছেন" এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র সমস্তই মিথ্যা। তথাপি তিনি আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই কর্ম্মবিপাক ও পুনর্জন্মের চক্র স্বীকার করিয়া স্বকীয় সমস্ত গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন করা উচিত যাহা জন্ম-জন্মান্তরেও করিতে পারা যায় এবং সমাজের এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, তাহার ফলে ভবিষ্যতে এমন মনুষ্য জন্মিবে যাহার সমস্ত মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে—ইহাই এই জগতে মনুষ্যমাত্রের পরম কর্ত্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রকে যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকেও কর্ম্মাকর্ম্মের আলোচনা করিবার সময় কোন-না-কোন পরমসাধ্য মানিতেই হয়—এবং তাহা একপ্রকার "অব্যক্ত"ই। কারণ, সমস্ত মানবজাতিরূপ মহাদেবতার উপাসনা করিয়া সমস্ত মনুষ্যের হিতসাধন করাই বলুন, কিংবা ভবিষ্যতে কোন-না-কোন সময়ে অত্যন্ত পূর্ণাবস্থায় উপনীত মনুষ্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করাই বলুন—আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের এই দুই ধ্যেয় থাকিলেও যাহাদিগকে এই দুই ধ্যেয় সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, তাহাদিগের দৃষ্টিতে উহা অগোচর বা অব্যক্তই থাকিয়া যায়। কোঁৎ কিংবা নিৎসের এই উপদেশ খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুদ্ধ আধিদৈবত ভক্তিমার্গের বিরোধী হইলেও, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণাবস্থার ভিত্তির উপর যে ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্রের কিংবা নীতিশাস্ত্রের পরম ধ্যেয় স্থাপিত, তাহার মধ্যে সমস্ত আধিভৌতিক সাধ্যের সমাবেশ অবিরোধে ও সহজেই হইয়া থাকে। সেইজন্য অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিপূত বৈদিকধর্ম্ম উক্ত উপদেশ হইতে কখন পিছাইয়া পড়িবে এরূপ ভীতি মনোমধ্যে পোষণ করিবার কোনই কারণ নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি অব্যক্তকেই পরমসাধ্য মানিতে হয়, তবে কেবল মানবজাতির জন্যই কেন মানা যায়? অর্থাৎ উহাকে সংকুচিত করা হয় কেন? পূর্ণাবস্থাকেই যদি পরম সাধ্য মানিতে হয় তবে পশু ও মনুষ্য এই দুয়ের পক্ষেই যাহা সাধারণ এরূপ আধিভৌতিক সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন সমস্ত চরাচর সৃষ্টির এক অনির্ব্বাচ্য পরমতত্ত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। আধুনিককালে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, এবং দৃশ্যজগৎসম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং 'যার যেমন, তার তেমন' এই নীতি অনুসারে যে প্রাচীন রাষ্ট্র এই আধিভৌতিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবে না, তাহার সুসংস্কৃত নূতন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সম্মুখে টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব, ইহাও নির্ব্বিবাদ। কিন্তু

* কোঁৎ স্বকীয় ধর্ম্মের নাম দিয়াছেন—Religion of Humanity; এবং "*A System of Positive Polity*" (Eng. trans in four Vols) নামক তাঁহার গ্রন্থে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ কিরূপে করা যাইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার উত্তম আলোচনা করা হইয়াছে।

আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জগতের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য মনুষ্যমাত্রের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুদ্ধ আধিভৌতিকবাদে তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। কেবল ব্যক্তজগতের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এই কারণে স্পেন্সরের মত উৎক্রান্তিবাদীও স্পষ্টরূপে স্বীকার করেন যে, নামরূপাত্মক দৃশ্যজগতের মূলে কোন অব্যক্ত তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন যে, এই নিত্য তত্ত্বের স্বরূপ জানা অসম্ভব বলিয়া তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্ত্রের উপপত্তি করা যাইতে পারে না। জর্ম্মনতত্ত্ববেত্তা কান্টও অব্যক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন; তথাপি নীতিশাস্ত্রের উপপত্তি এই অগম্য তত্ত্বের ভিত্তিতেই করিতে হইবে এই-রূপ তাঁহার মত। শোপেনহোয়ের ইহাও ছাড়াইয়া গিয়া, এই অগম্য তত্ত্ব বাসনারূপী এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রীনের মতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব আত্মারূপে অংশত মনুষ্যের দেহে আবির্ভূত হইয়াছে। গীতা তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। আমাদের উপনিষৎকারদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জগতের মূলে অবস্থিত এই অব্যক্ত তত্ত্ব নিত্য, একমাত্র, অমৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মরূপ—বস্; এই সম্বন্ধে ইহা হইতে অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই সিদ্ধান্তেরও পরে মানব-জ্ঞানের গতি কখনও যাইবে কি না। কারণ, জগতের মূল অব্যক্ত তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ নির্গুণ হওয়ায় উহার বর্ণন, গুণ, বস্তু বা ক্রিয়াপ্রদর্শক কোন শব্দের দ্বারাই হইতে পারে না; এবং সেই জন্যই উহাকে 'অজ্ঞেয়' বলা হয়। কিন্তু অব্যক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা শব্দের দ্বারা অধিক বলিতে না পারিলেও, এবং সেই জন্য দেখিতে উহা অল্প মনে হইলেও, উহাই মানবীয় জ্ঞানের সর্ব্বস্ব এবং তাই লৌকিক নীতিমত্তার উপপত্তিও উহারই ভিত্তিতে বলিতে হয়; এবং এইরূপ উপপত্তি উচিত পদ্ধতিতে বলিবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না, ইহা গীতার আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। দৃশ্যজগতের সহস্র সহস্র ব্যবহার কোন্ পদ্ধতিতে চালাইবে—যেমন মনে কর, বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকারে করিবে, কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, রোগীকে কোন্ ঔষধ কখন দিবে, সূর্য্যচন্দ্রাদির ব্যবধান কিরূপে গণনা করিবে—এই সমস্ত ঠিক জানিবার জন্য নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই নিত্য প্রয়োজন হইবে; এবং এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অধিকাধিক নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য নামরূপাত্মক আধিভৌতিক শাস্ত্রেরও যে বেশী বেশী অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা গীতার বিষয় নহে। গীতার মুখ্য বিষয় তো ইহাই যে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মনুষ্যের পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থাটি কি তাহা বলিয়া, তাহারই ভিত্তিতে কর্ম্মাকর্ম্মরূপ নীতিধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহাই স্থির করা। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরমসাধ্য (মোক্ষ) সম্বন্ধে আধিভৌতিক পন্থা উদাসীন হইলেও, অপর বিষয়ের অর্থাৎ কেবল নীতিধর্ম্মের মূলতত্ত্বনির্ণয়েও আধিভৌতিক পক্ষ অসমর্থ। এবং ইহা আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্য, নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব, এবং অমৃতত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গূঢ় বিষয়ের সিদ্ধান্ত আধিভৌতিক পথে নিষ্পন্ন হইতে পারে না—ইহার জন্য শেষে আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতেই হয়। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রের কাজ এইখানেই শেষ হয় না। জগতের মূলভূত অমৃতত্ত্বের নিত্য উপাসনার দ্বারা এবং অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা মানবাত্মা একপ্রকার বিশিষ্ট শান্তিলাভ করিলে তাহার শীল-স্বভাবে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই সদাচরণের মূল; তাই ইহাও

মনে রাখিতে হইবে যে, মানব-জাতির পূর্ণাবস্থাবিষয়েও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহায়তায় যেইরূপ উত্তম নির্ণয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কেবল আধিভৌতিক সুখবাদের দ্বারা হয় না। কারণ, ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তার প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কেবল বিষয়সুখ তো পশুদিগের সাধ্য, উহা দ্বারা জ্ঞানবান মনুষ্যের বুদ্ধির কখনও পূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে না ; সুখ-দুঃখ অনিত্য এবং ধর্ম্মই নিত্য। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার পারলৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিধর্ম্ম উভয়ই জগতের মূল, নিত্য ও অমৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত হওয়ায় এই পরম অবস্থার গীতাধর্ম্ম, মনুষ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জন্তু, এই দৃষ্টিতে মানবীয় সমস্ত কার্য্যের বিচার যে আধিভৌতিক শাস্ত্র করে, সেই নিছক্ আধিভৌতিক শাস্ত্রের নিকট কখনও হার মানিতে পারে না। কারণ আমাদের গীতাধর্ম্ম নিত্য ও অভয় হইয়া গিয়াছে এবং স্বয়ং ভগবানই উহাতে এমন সুনিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধর্ম্মের বা মতের দিকে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানের নিরূপণ করিবার পর "অভয়ং বৈ প্রাপ্তোহসি"—এখন তুমি অভয় হইলে—(বৃ. ৪. ২. ৪) এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য যাহা জনকরাজকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গীতাধর্ম্মের জ্ঞানসম্বন্ধেও অনেকার্থে অক্ষরশঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গীতাধর্ম্ম কিরূপ ? উহা সর্ব্বোপরি নির্ভয় ও ব্যাপক ; উহা সম অর্থাৎ বর্ণ, জাতি, দেশ বা অন্য কোন ভেদের মধ্যে না নামিয়া সকলকেই একই দাঁড়িপাল্লার দ্বারা সমান সদ্‌গতি দেয়, উহা অন্য সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথোচিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে ; উহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযুক্ত ; অধিক কি, উহা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর ও অমৃত ফল। বৈদিকধর্ম্মে গোড়ায় দ্রব্যময় বা পশুময় যজ্ঞের অর্থাৎ নিছক্ কর্ম্মকাণ্ডেরই অধিক মাহাত্ম্য ছিল ; কিন্তু পরে উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা এই নিছক্ কর্ম্মকাণ্ডমূলক শ্রৌতধর্ম্ম গৌণ বিবেচিত হইতে লাগিল এবং সেই সময়েই সাংখ্যশাস্ত্রেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই জ্ঞান সাধারণ লোকের অগম্য ছিল এবং ইহার টানও কর্ম্মসন্ন্যাসের দিকেই বিশেষরূপে ছিল, তাই কেবল ঔপনিষদিক ধর্ম্মের দ্বারা কিংবা উভয়ের স্মার্ত্তসমন্বয়ের দ্বারাও সাধারণ লোকের পূর্ণ সন্তোষ হইতে পারে নাই। এই জন্য উপনিষদের নিছক বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রেমগম্য ব্যক্ত-উপাসনার রাজগুহ্য সংযুক্ত করিয়া, কর্ম্মকাণ্ডের প্রাচীন পরম্পরা-অনুসারেই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাধর্ম্ম সকলকে মুক্তকণ্ঠে ইহাই বলিতেছেন যে, "তুমি নিজ যোগ্যতানুরূপ নিজের সাংসারিক কর্ত্তব্য লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বুদ্ধিতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে ও উৎসাহ সহকারে যাবজ্জীবন করিতে থাক ; এবং তদ্দ্বারা জড় ব্রহ্মাণ্ডে ও সর্ব্বভূতে একভাবে ব্যাপ্ত নিত্য পরমাত্মদেবতার সর্ব্বদা উপাসনা কর, তাহাতেই তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক কল্যাণ"। ইহা দ্বারা কর্ম্ম, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রেম (ভক্তি) এই তিনের মধ্য হইতে বিরোধ অন্তর্হিত হয়, এবং সমস্ত জীবনকেই যজ্ঞময় করিবার জন্য উপদেশদাতা একমাত্র গীতাধর্ম্মে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের সার আসে। এই নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া, সর্ব্ব-ভূতহিতার্থ যত্নবান শত শত মহাত্মা ও কর্ত্তা বা বীরপুরুষ যখন এই পবিত্র ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন এই দেশ পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র হইয়া শুধু জ্ঞানের নহে, ঐশ্বর্য্যেরও শিখরে পৌঁছিয়াছিল ; এবং ইহা কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, যখন অবধি উভয় লোকের সাধক এই শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল সেই অবধিই এই দেশের নিকৃষ্ট অবস্থা সুরু হইল। এই জন্য ভগবানের নিকট আশাপূর্ণ শেষ প্রার্থনা এই যে, ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বের

যথোচিত মেলনকারী এই সম ও তেজস্বী গীতাধর্ম্মের অনুসারে পরমেশ্বরের ভজনপূজনসাধক সৎপুরুষ এই দেশে আবারও উৎপন্ন হউন। এবং শেষে উদার পাঠকগণের নিকটে নিম্নোক্ত মন্ত্র (ঋ. ১০. ১৯১. ৪) দ্বারা এই মিনতি করিয়া গীতার এই রহস্যালোচনা এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও ভ্রমবশত। কিছু ন্যূনাধিক কথা থাকিলে তাহা সমদৃষ্টি দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবেন—

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥
যথা বঃ সুসহাসতি ॥*

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

---

* এই মন্ত্র ঋগ্‌বেদ সংহিতার শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত লোকদিগের উদ্দেশে এই অভিভাষণ। অর্থ—"তোমাদের অভিপ্রায় সমান হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক ; যাহাতে তোমাদের সুসহা অর্থাৎ সংঘশক্তির দৃঢ়তা হইবে"। অসতি = অস্তির বৈদিক রূপ। 'যথা বঃ সুসহাসতি' ইহার দ্বিরুক্তি গ্রন্থের সমাপ্তি দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট প্রকরণ

গীতার বহিরঙ্গ-আলোচনা

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাঽপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ ॥* স্মৃতি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলিয়াছি যে, যখন ভারতীয় যুদ্ধে কুলক্ষয় ও জ্ঞাতিক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ সর্ব্বপ্রথম নেত্রসমক্ষে আসিল, তখন অর্জ্জুন স্বকীয় ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যত হইলেন এবং সেই সময়ে তাঁহাকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন করিলেন যে, কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, কর্ম্মযোগে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এইজন্য ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান কিংবা পরমেশ্বরভক্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া সেই বুদ্ধি দ্বারা স্বধর্ম্মানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের জন্য আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই; এবং এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। গীতার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। গীতাগ্রন্থ কেবল বেদান্তবিষয়ক ও নিবৃত্তিমূলক, এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের দরুণ "মহাভারতের ভিতর গীতাকে সন্নিবিষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই" ইত্যাদি যে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও এক্ষণে সহজে নিরাকৃত হয়। কারণ কর্ণপর্ব্বে সত্যানৃতের আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেইরূপ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠির-বধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেশও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং কাব্যদৃষ্টিতে দেখিলেও, ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মহাভারতে অনেক স্থলে এই প্রকারই অন্য যে সকল প্রসঙ্গ আসিয়াছে সেই সমস্তের মূলতত্ত্ব কোথাও-না-কোথাও বলা আবশ্যক ছিল, তাই উহা ভগবদ্গীতাতে বলিয়া ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতির নিরূপণের পূর্ণতা গীতাতেই করা হইয়াছে। বনপর্ব্বের ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদান্তের ভিত্তিতে "আমি মাংসবিক্রয়ের ব্যবসায় কেন করিতেছি" তাহার বিচার করিয়াছে; এবং শান্তিপর্ব্বের তুলাধার-জাজলি-সংবাদেও ঐ প্রকারেই তুলাধার স্বকীয় বাণিজ্যব্যবসায়ের সমর্থন করিয়াছে (বন, ২০৮-২১৫ ও শাং ২৬০-২৬৩)। কিন্তু এই উপপত্তি সেই সেই বিশিষ্ট ব্যবসায়েরই করা হইয়াছিল। এই প্রকার অহিংসা, সত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদর্শী অর্থাৎ সেই সেই বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই হইয়াছিল, তাই উহাকে মহাভারতের প্রধান ভাগ ধরা যাইতে পারে না। এইরূপ একদেশদর্শী আলোচনা দ্বারা ইহাও নির্ণয় করা যায়

* "কোন মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দৈবত ও বিনিয়োগ না জানিয়া (উক্ত মন্ত্র) যে শিক্ষা দেয় কিংবা তাহার জপ করে সে পাপী হয়।" ইহা কোন এক স্মৃতিগ্রন্থের বচন; কিন্তু কোন্ গ্রন্থের তাহা জানি না। হাঁ, তাহার মূল আর্ষেয়ব্রাহ্মণ (আর্ষেয়. ১) শ্রুতিগ্রন্থে আছে; তাহা এই—"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্তং বা প্রতিপদ্যতে।" কোন মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গ; উহা না জানিয়া মন্ত্র বলিবেক না। এই নীতিই গীতার ন্যায় গ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়।

না যে, যে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাণ্ডবদিগের মহৎ কার্য্যসমূহের বর্ণনা করিবার জন্য ব্যাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা ব্যক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ ধরিয়া মনুষ্য সেই প্রকার আচরণ করিবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এক সময়ে সন্ন্যাস-গ্রহণই শ্রেষ্ঠ যদি ধরা হয় তবে স্বভাবত এই প্রশ্ন আসে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের এত ঝঞ্ঝাটে পড়িবার কারণ কি ছিল? এবং যদি তাঁহাদের প্রযত্নের কোন কারণ স্বীকারও করা যায়, তবে লোকসংগ্রহার্থ তাঁহাদের গৌরবকীর্ত্তন করিয়া ব্যাসের তিন বৎসরকাল সমান পরিশ্রম করিয়া (মভা. আ. ৬২. ৫২) এক লাখ শ্লোকের বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? বর্ণাশ্রমকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়, কেবল এইটুকু বলিলেই এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হয় না; কারণ, যাহাই বল না কেন, স্বধর্ম্মাচরণ কিংবা জগতের অন্য সমস্ত ব্যবহার তো সন্ন্যাসদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই মানা হয়। এই জন্য মহাভারত যে মহাপুরুষদিগের চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষদিগের আচরণের উপর "মূলে কুঠার" নীতি-অনুযায়ী আপত্তির নিরসন করিয়া উক্ত গ্রন্থে কোন-না-কোন স্থানে সবিস্তার ইহা বলা আবশ্যক ছিল যে, সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইবে কি না; এবং করিতে হইবে বলিলেও প্রত্যেক মনুষ্য কিরূপে সংসারে নিজ নিজ কর্ম্ম চালাইলে সেই সব কর্ম্ম মোক্ষলাভের অন্তরায় হইবে না। নলোপাখ্যান, রামোপাখ্যান প্রভৃতি যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ, এইরূপ করিলে সেই উপাঙ্গগুলির ন্যায় এই আলোচনাও গৌণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। সেইরূপ বনপর্ব্ব কিংবা শান্তিপর্ব্বের অনেক বিষয়ের খিচুড়ীর মধ্যে গীতাকেও সন্নিবিষ্ট করিলে উহার মহত্ত্বের লাঘব না হইয়া যাইত না। তাই, উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া মহাভারতের প্রধান কার্য্য—ভারতীয় যুদ্ধ—আরম্ভ হইবার ঠিক প্রসঙ্গেই, সেই সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছে, যাহা নীতিধর্ম্মদৃষ্টিতে অপরিহার্য্য দেখায় এবং সেইখানেই এই কর্ম্মাকর্ম্মবিচারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র উপপত্তির সহিত কথিত হইয়াছে। সার কথা, পাঠক কিছু বিলম্বের কারণে যদি এই পরম্পরাগত কথা ভুলিয়া যান যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধারম্ভেই অর্জ্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি এই বুদ্ধিতেই বিচার করেন যে, মহাভারতে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণার্থ বিরচিত ইহা এক আর্ষ মহাকাব্য, তথাপি ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার জন্য মহাভারতে যে স্থান নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাই গীতার মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য কাব্যদৃষ্টিতেও সঙ্গত হইয়াছে। গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং মহাভারতে কোন্ স্থানে গীতা বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের ঠিক্ ঠিক্ উপপত্তি যখন বুঝা গেল তখন এই সকল প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব দেখা যায় না যে "গীতোক্ত জ্ঞান রণভূমিতে বিবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ পরে মহাভারতে ঢুকাইয়া দিয়া থাকিবে! অথবা ভগবদ্গীতার দশ শ্লোকই মুখ্য কিংবা শত শ্লোকই মুখ্য?" কারণ অন্য প্রকরণসমূহ হইতেও উপলব্ধি হইবে যে, যখন একবার ইহা স্থির হইল যে ধর্ম্ম-নিরূপণার্থ 'ভারত'কে 'মহাভারত' করিবার জন্য অমুক বিষয় মহাভারতে অমুক কারণে অমুক স্থানে সন্নিবেশ করা আবশ্যক, তখন মহাভারতকার সেই বিষয়ের নিরূপণে কত স্থান লাগিবে তাহার জন্য কোন চিন্তা করেন না। তথাপি গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা সম্বন্ধে অন্য যে সকল তর্ক উপস্থিত করা হয় তাহার উপরেও এক্ষণে প্রসঙ্গানুসারে বিচার করিয়া তাহার মধ্যে কতটা তথ্য আছে তাহা দেখা আবশ্যক, তাই তন্মধ্যে (১) গীতা ও মহাভারত, (২) গীতা ও উপনিষৎ, (৩) গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, (৪) ভাগবত ধর্ম্মের উদয় ও গীতা, (৫) বর্ত্তমান গীতার কাল, (৬) গীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭) গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল,—এই সাত বিষয়ের

আলোচনা এই প্রকরণের সাত ভাগে যথাক্রমে করা হইয়াছে। স্মরণ থাকে যেন, এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারত, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা বহিরঙ্গ-সমালোচক করিয়া থাকেন, অতএব আমিও সেই দৃষ্টিতেই এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সমূহের বিচার করিব।

ভাগ ১—গীতা ও মহাভারত

উপরে এই অনুমান করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষদিগের চরিত্রের নৈতিক সমর্থনার্থ কর্ম্মযোগমূলক গীতা মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়া উচিত। সেই অনুমানই এই দুই গ্রন্থের রচনা তুলনা করিলেই অধিক দৃঢ় হয়। কিন্তু তুলনা করিবার পূর্ব্বে, এই দুই গ্রন্থের বর্ত্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে একটু বিচার করা আবশ্যক প্রতীত হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যের আরম্ভে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গীতাগ্রন্থে সাত শত শ্লোক আছে। এবং অধুনাপ্রাপ্ত সমস্ত সংস্করণেও অতগুলি শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাত শত শ্লোকের মধ্যে ১ শ্লোক ধৃতরাষ্টের' ৪০ সঞ্জয়ের, ৮৪ অর্জ্জুনের এবং ৫৭৫ ভগবানের। কিন্তু বোম্বাই নগরে গণপত কৃষ্ণজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত গীতার আঠারো অধ্যায়ের পর যে অধ্যায় আরম্ভ হয়, তাহার (অর্থাৎ ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ তম অধ্যায়ের) আরম্ভে সাড়ে পাঁচ শ্লোকে গীতামহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাতে উক্ত হইয়াছে—

> ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
> অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ।
> ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ "গীতায় কেশবের ৬২০, অর্জ্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১; মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে।" মাদ্রাজ এলাকার প্রচলিত পাঠানুসারে কৃষ্ণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংস্করণেও এই শ্লোক পাওয়া যায়; কিন্তু কলিকাতায় মুদ্রিত মহাভারতে ইহা পাওয়া যায় না; এবং ভারতটীকাকার নীলকণ্ঠ তো এই ৫॥০ শ্লোক "গৌড়ৈঃ ন পঠ্যন্তে" এইরূপ লিখিয়াছেন। তাই উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও গীতার মধ্যে ৭৪৫ শ্লোক (অর্থাৎ অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের অতিরিক্ত ৪৫ শ্লোক) কে কবে জুড়িয়া দিয়াছে তাহা বলা যায় না। মহাভারত বহুবিস্তৃত গ্রন্থ হওয়ায় তাহাতে মধ্যে মধ্যে অন্য শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়া কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একথা গীতার সম্বন্ধে বলা যায় না। গীতাগ্রন্থ সর্ব্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের ন্যায় সমস্ত গীতাও কণ্ঠস্থ করিতে পারিত পূর্ব্বে এরূপ অনেক লোকও ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত কেহ কেহ আছে! এই কারণে বর্ত্তমান গীতার বেশী পাঠান্তর দেখা যায় না, এবং অল্প যে-কিছু ভিন্ন পাঠ আছে, তাহা টীকাকারেরা জানেন। তাছাড়া, এরূপ বলিতেও বাধা নাই যে, এই কারণেই গীতাগ্রন্থে বরাবর ৭০০ শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে যে উহার মধ্যে কেহ-ফেরফার করিতে না পারে। এখন প্রশ্ন এই যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণেই ৪৫ শ্লোক—এবং, সে সমস্তও ভগবানেরই—বেশী কোথা হইতে আসিল? সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা বর্ত্তমান সংস্করণে এবং এই গণনাতে একই অর্থাৎ ১২৪; এবং একাদশ অধ্যায়ের "পশ্যামি দেবান্" (১১. ১৫-৩১) ইত্যাদি ১৭ শ্লোকের সঙ্গে মতভেদের

কারণে অন্য দশ শ্লোকও সঞ্জয়ের বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব, তাই বলা যাইতে পারে যে, সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা একই হইলেও প্রত্যেকের শ্লোকগুলি পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিতে অল্প পার্থক্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণে ভগবানের যে ৫৭৫ শ্লোক আছে, তাহার বদলে ৬২০ অর্থাৎ ৪৫ অধিক শ্লোক কোথা হইতে আসিল তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না! গীতার 'স্তোত্র' বা 'ধ্যান' বা এই প্রকার অন্য কোন প্রকরণের সমাবেশ উহার মধ্যে করা হইয়া থাকিবে ইহা যদি বল, তবে দেখি যে বোম্বায়ে মুদ্রিত মহাভারতের গ্রন্থে ঐ প্রকরণ নাই শুধু নহে, ঐ গ্রন্থের গীতাতেও সাত শত শ্লোকই আছে। অতএব বর্ত্তমান সাতশত শ্লোকের গীতাকেই প্রমাণ মানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা হইল গীতার কথা। কিন্তু মহাভারতের দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই বিরোধ কিছুই নহে। স্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতসংহিতার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু রাওবাহাদুর চিন্তামনি রাও বৈদ্য মহাভারতসম্বন্ধীয় স্বকীয় টীকাগ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে অতগুলি শ্লোক পাওয়া যায় না; এবং বিভিন্ন পর্ব্বের অধ্যায়সংখ্যাও ভারতের আরম্ভে প্রদত্ত অনুক্রমণিকা অনুসারে নাই। এই অবস্থায়, গীতা ও মহাভারতের তুলনা করিবার জন্য এই গ্রন্থসমূহের কোন এক বিশেষ পুস্তক অবলম্বন করা ভিন্ন কাজ চলিতে পারে না; তাই, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত সপ্তশতশ্লোকী গীতাকে এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত মহাভারতের পুস্তককে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া আমি এই দুই গ্রন্থের তুলনা করিয়াছি; এবং আমার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থাননির্দ্দেশও কলিকাতার মুদ্রিত উক্ত মহাভারতের অনুসারেই করিয়াছি। এই শ্লোকগুলিকে বোম্বায়ের পুস্তকে কিংবা মাদ্রাজের পাঠক্রম অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত কৃষ্ণাচার্য্যের সংস্করণে দেখিতে হইবে, এবং যদি উহা আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পাওয়া যায়, তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ অনুসন্ধান করিলেই উহা পাওয়া যাইবে।

সাতশো শ্লোকের গীতা এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত মহাভারত তুলনা করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবদ্‌গীতা মহাভারতেরই এক অংশ; এবং স্বয়ং মহাভারতেই কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম উল্লেখ আদিপর্ব্বের আরম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত অনুক্রমণিকায় করা হইয়াছে। "পূর্ব্বোক্তং ভগবদ্‌গীতাপর্ব্ব ভীষ্মবধস্ততঃ (মভা. আ. ২. ৬৯) এইরূপ পর্ব্ববর্ণনায় প্রথমে বলিয়া তাহার পর আঠারো পর্ব্বের অধ্যায় সমূহের এবং শ্লোকসমূহের সংখ্যা বলিবার সময় ভীষ্মপর্ব্বের বর্ণনায় পুনর্ব্বার ভগবদ্‌গীতার স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে—

> কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
> মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ ॥

"যাহাতে মোক্ষগর্ভ কারণ দেখাইয়া বাসুদেব অর্জ্জুনের মনের মোহজ কশ্মল নাশ করিয়াছিলেন" (মভা. আ. ২. ২৪৭)। এই প্রকার আদিপর্ব্বের (১. ১৭৯) প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যেক শ্লোকের আরম্ভে "যদাশ্রৌষং" বলিয়া, যখন ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধনাদির জয়-প্রাপ্তিসম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রকারে আমার নিরাশা হইতেছে, তখন এই বর্ণনা আছে যে, "যখনই শুনিলাম যে, অর্জ্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তখনই আমি জয়-সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম।" আদিপর্ব্বের এই তিন উল্লেখের পর শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় ধর্ম্ম বলিবার সময় গীতার পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। নারায়ণীয়,

সাত্বত, ঐকান্তিক ও ভাগবত, এই চারি নাম সমানার্থক। নারায়ণীয়োপাখ্যানে (শাং. ৩৩৪-৩৫১) নারায়ণ ঋষি কিংবা ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে নারদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমূলক প্রবৃত্তিমার্গ বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেবকে একান্তভাবে ভক্তি করিয়া জাগতিক ব্যবহার স্বধর্ম্মানুসারে করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ভাগবতধর্ম্মের এই তত্ত্ব আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে বলিয়া আসিয়াছি; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার ভগবদ্গীতাতেও কর্ম্মযোগই সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নারায়ণীয় ধর্ম্মের পরম্পরা বর্ণনা করিবার সময় বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে নারদ প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্ম্মই "কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পতঃ" (মভা. শাং. ৩৪৬.১০) হরিগীতা কিংবা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার পরে ৩৪৮অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥

কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অর্জ্জুনকে ভগবান ঐকান্তিক অথবা নারায়ণ-ধর্ম্মের এই বিধিসমূহের উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্ব যুগে স্থিত নারায়ণ-ধর্ম্মের পরম্পরা বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম্ম এবং যতিদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম দুই-ই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে (মভা. শাং, ৩৪৮. ৫৩)। আদিপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে প্রদত্ত এই ছয় উল্লেখের অতিরিক্ত অশ্বমেধ পর্ব্বের অন্তর্ভূত অনুগীতাপর্ব্বেও আর একবার ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকেরও পরে আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন একত্র বসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "এখন এখানে আমার থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই; দ্বারকায় যাইবার ইচ্ছা আছে"; ইহার উত্তরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, পূর্ব্বে যুদ্ধের আরম্ভে তুমি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি, সেই জন্য পুনর্ব্বার সেই উপদেশ আমাকে দাও (অশ্ব. ১৬)। তখন এই অনুরোধ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে অনুগীতা বলিয়াছিলেন। এই অনুগীতার প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন যে "যুদ্ধারম্ভে তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম তুমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। সেই উপদেশ পুনর্ব্বার তোমাকে সেইরূপই বলা এখন আমার পক্ষেও অসম্ভব; তাই, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমাকে বলিতেছি" (মভা. অশ্ব. অনুগীতা. ১৬. ৯-১৩)। ইহা চিন্তার যোগ্য যে, অনুগীতার কোন কোন প্রকরণ গীতার প্রকরণেরই অনুরূপ। অনুগীতার এই নির্দ্দেশ-সমেত মহাভারতে ভগবদ্গীতার সাতবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদ্গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক অংশ ইহা উহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু সংশয়ের গতি নিরঙ্কুশ হয় এইজন্য উপর্যুক্ত সাত নির্দ্দেশ হইতেও কাহারও কাহারও সন্তোষ হয় না। তাঁহারা বলেন যে, এই উল্লেখগুলিও ভারতে যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় নাই তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই প্রকারে উঁহাদিগের মনে এই সংশয় যেমন-তেমনই-থাকিয়া যায় যে, গীতা মহাভারতের এক অংশ কি না। গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে, আমি পূর্ব্বেই তাহা সবিস্তার দেখাইয়াছি; সুতরাং বস্তুত দেখিতে গেলে এই সন্দেহের কোন অবসরই থাকে না। তথাপি এই প্রমাণের উপরই নির্ভর না করিয়া, অন্য প্রমাণের দ্বারাও এই সন্দেহ কিরূপে

মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা এক্ষণে বলিতেছি। কোন দুই গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কি না এইরূপ সন্দেহ হইলে, কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য এই দুই বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্যে শুদ্ধ শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্তু উহাতে ভাষারীতিরও সমাবেশ করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল কতটা তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রচনার ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—কর্ণপর্ব্বে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণনা দেখিলে, তাহার ভাষার ধরণ অন্য প্রকরণান্তর্গত ভাষা হইতে ভিন্ন লক্ষিত হইবে। তাই, মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল আছে কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। তথাপি সাধারণতঃ বিচার করিয়া দেখিলে পরলোকগত কাশীনাথপন্ত তৈলঙ্গ * যেরূপ বলেন তদনুসারে গীতার ভাষা ও ছন্দোরচনা আর্ষ কিংবা প্রাচীন বলিতে হয়। উদাহরণ, যথা—কাশীনাথপন্ত দেখাইয়াছেন যে, অন্ত (গী. ২. ১৬), ভাষা (গী. ২. ৫৪), ব্রহ্ম (=প্রকৃতি গী. ১৪. ৩), যোগ (=কর্ম্মযোগ), পাদপূরক অব্যয় 'হ' (গী. ২. ৯) প্রভৃতি শব্দ গীতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সে অর্থে উহা কালিদাসাদির কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এবং পাঠভেদবশতই হউক না কেন, কিন্তু গীতার ১১. ৩৫ শ্লোকের 'নমস্কৃত্বা' এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরূপ গী. ১১. ৪৮ শ্লোকে 'শক্য অহং' এইরূপ অ-পাণিনীয় সন্ধিও আছে। সেইরূপ আবার "সেনানীনামহং স্কন্দঃ" (গী. ১০. ২৪) ইহাতে 'সেনানীনাং' এই ষষ্ঠিকারকও পাণিনি-অনুসারে শুদ্ধ নহে। আর্ষবৃত্তরচনার উদাহরণ ৺তৈলঙ্গ স্পষ্ট করিয়া বুঝান নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ-বর্ণনার (গী. ১১. ১৫-৫০) ৩৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গীতার ছন্দোরচনাকে আর্ষ বলিয়া থাকিবেন। এই শ্লোকগুলির প্রত্যেক চরণে এগারো অক্ষর আছে, কিন্তু গণনার কোন নিয়ম নাই; এক চরণ ইন্দ্রবজ্রা হয় তো দ্বিতীয়টি উপেন্দ্রবজ্রা, তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থটি অন্য কোন প্রকারের। এইরূপ উক্ত ৩৬ শ্লোকে অর্থাৎ ১৪৪ চরণে বিভিন্ন জাতীয় মোটে এগারো চরণ পাওয়া যায়। তথাপি সেখানে এই নিয়মও দেখা যায় যে, প্রত্যেক চরণে এগারো অক্ষর আছে, এবং উহাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, অষ্টম এবং শেষের দুই অক্ষর গুরু; এবং ষষ্ঠ অক্ষর প্রায়ই লঘু। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, ঋগ্বেদ ও উপনিষদের ত্রিষ্টুপবৃত্তের ঢং অনুসারেই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যে এইরূপ ১১ অক্ষরের বিষমবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। হাঁ, শকুন্তলা নাটকে "অমী বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ" এই শ্লোক এই ছন্দেরই; কিন্তু কালিদাসই উহাকে 'ঋকছন্দ' অর্থাৎ ঋগ্বেদের ছন্দ বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আর্ষবৃত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্যত্রও এইরূপ আর্ষশব্দ ও বৈদিক-বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত এই দুই গ্রন্থের ভাষাসাদৃশ্যের

* ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গকৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজী ভাষান্তর মোক্ষমূলর সাহেব সম্পাদিত প্রাচ্যধর্মপুস্তকমালার মধ্যে (Sacred Books of the East Series, Vol. VIII.) ছাপা হইয়াছে। এই গ্রন্থে ইংরাজি ভাষাতেই গীতাসম্বন্ধে এক টীকাত্মক প্রবন্ধ প্রস্তাবনার আকারে সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রকরণে ৺তৈলঙ্গের মতানুসারে যে উল্লেখ আছে তাহা (এক জায়গা ছাড়া) এই প্রস্তাবনাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃঢ় প্রমাণ এই যে, মহাভারত ও গীতাতে একই রকম অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত শ্লোক অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্যে গীতায় কতগুলি আসিয়াছে, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করা কঠিন। তথাপি মহাভারত পড়িবার সময় উহাতে যে শ্লোক ন্যূনাধিক পাঠভেদে গীতার শ্লোকের অনুরূপ আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহারও সংখ্যা বড় কম নহে; এবং উহার ভিত্তিতে ভাষাসাদৃশ্যের প্রশ্নের সিদ্ধান্তও সহজেই হইতে পারে। নিম্নপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ, গীতা ও মহাভারতে (কলিকাতা সংস্করণ) শব্দশঃ কিংবা দুই-এক শব্দের ভেদে একই রকম পাওয়া যায়—

গীতা	মহাভারত
১. ৯ নানাশস্ত্রপ্রহরণা—শ্লোকার্দ্ধ।	ভীষ্মপর্ব্ব (৫১. ৪); গীতার মতই দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট স্বীয় সৈন্যের বর্ণনা করিতেছেন।
১. ১০ অপর্যাপ্তং—সমস্ত শ্লোক।	ভীষ্ম. ৫১. ৬
১.১২-১৯ পর্য্যন্ত আট শ্লোক।	ভীষ্ম. ৫১.২২-২৯ অল্প শব্দভেদে শেষ গীতার শ্লোকেরই মত।
১.৪৫ অহোবত মহৎপাপং—শ্লোক।	দ্রোণ. ১৯৭. ৫০ অল্প শব্দভেদে শেষ গীতার শ্লোকের মত।
২.১৯ উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২২৪. ১৪ অল্প পাঠভেদে বলিবাসব-সংবাদে ও কঠোপনিষদে (২. ১৮) আছে।
২.২৮ অব্যক্তাদীনি ভূতানি—শ্লোক।	স্ত্রী. ২.৬ ; ৯.১১ ; 'অব্যক্ত' ইহার বদলে 'অভাব', বাকী একই।
২.৩১ ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ঃ—শ্লোকার্দ্ধ।	ভীষ্ম. ১২৪.৩৬ ভীষ্ম কর্ণকে ইহাই বলিতেছেন।
২.৩২ যদৃচ্ছয়া—শ্লোক ;	কর্ণ. ৫৭.২ 'পার্থ'র বদলে 'কর্ণ' পদ রাখিয়া দুর্যোধন কর্ণকে বলিতেছেন।
২ ৪৬ যাবান্ অর্থ উদপানে—শ্লোক।	উদ্যোগ. ৪৫.২৬ সনৎসুজাতীয় প্রকরণে অল্প শব্দভেদে আসিয়াছে।
২.৫৯ বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে—শ্লোক।	শান্তি. ২০৪. ১৬ মনু-বৃহস্পতি-সংবাদে অক্ষরশ আসিয়াছে।
২.৬৭ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং—শ্লোক।	বন. ২১৪.২৬ ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে এবং প্রথমে রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে।
২.৭০ আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং—শ্লোক	শান্তি. ২৫০.৯ শুকানুপ্রশ্নের মধ্যে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৩.৪২ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ—শ্লোক।	শান্তি. ২৪৫. ৩ ও ২৪৭. ২ অল্প পাঠভেদে শুকানুপ্রশ্নে দুইবার আসিয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকের মূল কঠোপনিষদে (কঠ. ৩.১০)।
৪.৭ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য—শ্লোক।	বন. ১৮৯ ২৭ মার্কণ্ডেয় প্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে।

গীতা	মহাভারত
৪.৩১ নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২৬৭.৪০ গো-কাপিলীয়াখ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ যজ্ঞবিষয়কই।
৪.৪০ নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো—শ্লোকার্দ্ধ।	বন. ১৯৯. ১১০ মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বে শব্দশঃ প্রদত্ত হইয়াছে।
৫.৫. যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং—শ্লোক।	শান্তি. ৩০৫.১৯ ও ৩১৬.৪ এই দুই স্থানে অল্প পাঠভেদে বসিষ্ঠ-করাল ও যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে আসিয়াছে।
৫.১৮ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—শ্লোক।	শান্তি. ২৩৮. ১৯ শুকানুপ্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.৫ আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ—শ্লোকার্দ্ধ এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্দ্ধ।	উদ্যোগ.৩৩.৬৩-৬৪ বিদুর-নীতিতে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.২৯ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২৩৮.২১ শুকানুপ্রশ্ন, মনুস্মৃতি (মনু. ১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ্ (৬) ও কৈবল্য উপনিষদে (১.১০) অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.৪৪ জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য—শ্লোকার্দ্ধ	শান্তি. ২৩৫. ৭ শুকানুপ্রশ্নে অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে।
৮.১৭ সহস্রযুগপর্য্যন্তং—এই শ্লোক প্রথমে যুগের অর্থ না বলিয়া গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে।	শান্তি. ২৩১.৩১ শুকানুপ্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে (মনু. ১.৭৩)।
৮.২০ যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু—শ্লোকার্দ্ধ	শান্তি. ৩৩৯. ২৩ নারায়ণীয় ধর্ম্মে অল্প পাঠভেদে দুইবার আসিয়াছে।
৯.৩২ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা—এই সমস্ত শ্লোক এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।	অশ্ব. ১৯. ৬১ ও ৬২ অনুগীতায় অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে।
১৩.১৩ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং—শ্লোক।	শান্তি. ২৩৮.২৯. অশ্ব. ১৯. ৪৯ ; শুকানুপ্রশ্ন, অনুগীতা এবং অন্যত্রও অক্ষরশ আসিয়াছে। এই শ্লোকের মূল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (শ্বে. ৩.১৬)।
১৩.৩০ যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবং—শ্লোক।	শান্তি. ১৭.২৩ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে এই শব্দই বলিয়াছেন।
১৪.১৮ ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা—শ্লোক।	অশ্ব. ৩৯. ১০ অনুগীতার গুরু-শিষ্যসংবাদে অক্ষরশ প্রদত্ত হইয়াছে।
১৬.২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং—শ্লোক।	উদ্যোগ. ৩২. ৭০ বিদুরনীতিতে অক্ষরশ আসিয়াছে।
১৭.৩ শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ—শ্লোকার্দ্ধ	শান্তি. ২৬৩.১৭ তুলাধার-জাজলি-সংবাদে শ্রদ্ধা প্রকরণে আসিয়াছে।
১৮.১৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা—শ্লোক।	শান্তি. ৩৪৭.৮৭ নারায়ণীয় ধর্ম্মে অক্ষরশ আসিয়াছে।

উক্ত তুলনা হইতে বুঝা যায় যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১২ শ্লোকার্দ্ধ গীতা ও মহাভারতের বিভিন্ন প্রকরণে কখনও কখনও অক্ষরশ এবং কখনও বা অল্প পাঠভেদে একই; এবং ভাল করিয়া খুঁজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ পাওয়া সম্ভব। যদি ইহা দেখিতে চাও যে, দুই দুই কিংবা তিন তিন শব্দ অথবা শ্লোকের চতুর্থাংশ (চরণ) গীতা ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে, তাহা হইলে উপরের তালিকা খুবই বাড়াইতে হয়।* কিন্তু এই শব্দসাম্যের অতিরিক্ত কেবল উপরি-উক্ত তালিকার শ্লোকসাদৃশ্যই বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ এবং গীতা যে একই হাতের, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রত্যেক প্রকরণ ধরিয়া বিচার করিলেও উক্ত ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ মার্কণ্ডেয়প্রশ্নে, ½ মার্কণ্ডেয়সমস্যাতে, ১ ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে, ২ বিদুরনীতিতে, ১ সনৎসুজাতীয়ে, ১ মনুবৃহস্পতিসংবাদে, ৬½ শুকানুপ্রশ্নে, ১ তুলাধার-জাজলিসংবাদে, ১ বসিষ্ঠকরাল ও যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে ১½ নারায়ণীয় ধর্ম্মে, ২ অনুগীতায় এবং বাকি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও স্ত্রীপর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানে এই শ্লোক পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে,—প্রক্ষিপ্ত নহে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাও প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্লোক গীতাতেই সমারোপদৃষ্টিতে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—"সহস্রযুগপর্য্যন্ত্যং" (গী. ৮. ১৭) এই শ্লোক স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য প্রথমে বৎসর ও যুগের ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক ছিল; এবং মহাভারতে (শাং. ২৩১) ও মনুস্মৃতিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গীতায় এই শ্লোক যুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উক্ত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই শ্লোক গীতা হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; এবং এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই সমস্ত শ্লোক গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব গীতা ও মহাভারতের এই সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যক্তি, ইহাই অনুমান করিতে হয়। ইহাও এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, মনুস্মৃতির অনেক শ্লোক যেরূপ মহাভারতে পাওয়া যায়,** সেইপ্রকার গীতার "সহস্রযুগপর্য্যন্তং" (৮. ১৭) এই পুরো শ্লোকটি অল্প পাঠ-ভেদে এবং "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (গী. ৩. ৩৫ ও গী. ১৮. ৪৭) এই শ্লোকার্দ্ধ—'শ্রেয়ান্' এর বদলে 'বরং' এই পাঠভেদে এবং

* সমস্ত মহাভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতা ও মহাভারতে সমান শ্লোকপাদ অর্থাৎ চরণ একশতেরও অধিক পাওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতেছি—কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা (গী. ১. ৩২), নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে (গী ২. ৩), ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ (২. ৪০), অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ (২. ৬৬), উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ (৩. ২৪), মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ (৬. ৩৫), মমাত্মা ভূতভাবনঃ (৯. ৫), মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণঃ (৯. ১২), সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (৯. ২৯). দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (১১. ১৭), সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (১২. ৪), তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (১২. ১৯), সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ (১২. ১৯), সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (১৪. ২৪) ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (১৮. ১৮), নির্ম্মমঃ শান্তঃ (১৮. ৫৩), ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (১৮. ৫৩) ইত্যাদি।

** মনুস্মৃতির কোন্ কোন্ শ্লোক মহাভারতে পাওয়া যায় তাহার এক তালিকা, বুহ্লর সাহেবের প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তক মালায়' মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষান্তরে যোজিত হইয়াছে তাহা দেখুন (S. B. E. Vol XXV. pp.533.‡‡)

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" এই শ্লোকার্দ্ধও (গী. ৬. ২৯) "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" এই রূপভেদে মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায় (মনু. ১. ৭৩; ১০. ৯৭; ১০. ৯১)। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে আবার "মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং" (অনু, ৪৭. ৩৫) এইরূপ মনুস্মৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

শব্দসাদৃশ্যের বদলে অর্থসাদৃশ্য দেখিলেও এই অনুমানই দৃঢ় হয়। গীতার কর্ম্মযোগমার্গ ও প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের সাম্য আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মদেব, ব্যক্ত সৃষ্টির উপপত্তির এই যে পরম্পরা নারায়ণীয় ধর্ম্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গীতায় গৃহীত হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত ইহাও সত্য যে, গীতাধর্ম্ম ও নারায়ণীয় ধর্ম্মে অনেক ভেদ আছে। কিন্তু চতুর্ব্যূহ পরমেশ্বরের কল্পনা গীতার মান্য না হইলেও গীতার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, গীতাধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম একই প্রকারের। সিদ্ধান্তটি এই—একব্যূহ বাসুদেবের প্রতি ভক্তিই রাজমার্গ, অন্য কোন দেবতার প্রতি ভক্তি গেলেও তাহা বাসুদেবেরই প্রতি অর্পিত হয়; ভক্ত চারি প্রকারের হইয়া থাকে; ভগবদ্ভক্তকে স্বধর্ম্মানুসারে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞচক্র বজায় রাখিতেই হইবে এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিবস্বান্‌মনু-ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি সম্প্রদায়পরম্পরাও উভয় দিকে একই। সেইরূপ আবার সনৎসুজাতীয়, শুকানুপ্রশ্ন, যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদ, অনুগীতা ইত্যাদি প্রকরণ পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদান্ত বা অধ্যাত্মজ্ঞানেরও উক্ত প্রকরণসমূহে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিল আছে। কাপিল-সাংখ্যশাস্ত্রের ২৫ তত্ত্ব ও গুণোৎকর্ষের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও ভগবদ্‌গীতা যে প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষেরও অতীত কোন নিত্য তত্ত্ব আছে বলিয়া মানিয়া থাকেন, সেইরূপই শান্তি-পর্ব্বের বসিষ্ঠ-করালসংবাদে ও যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে সবিস্তার ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সাংখ্যদিগের ২৫ তত্ত্বের অতীত আর এক 'ষড়্‌বিংশতিতম' তত্ত্ব আছে, যাহার জ্ঞান না হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচারসাম্য কেবল কর্ম্মযোগ বা অধ্যাত্ম এই দুই বিষয়ের সম্বন্ধেই দেখা যায় না; কিন্তু এই দুই মুখ্য বিষয়ের অতিরিক্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই সদৃশ প্রকরণও মহাভারতে কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—গীতার প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভেই দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় সৈন্যের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই পরে ভীষ্মপর্ব্বের ৫১ অধ্যায়ে তিনি পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যেরই নিকট করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের উত্তরার্দ্ধে অর্জ্জুনের যেরূপ বিষাদ হইয়াছিল, সেইরূপই শান্তিপর্ব্বের আরম্ভে যুধিষ্ঠিরের হইয়াছিল; এবং যখন ভীষ্ম ও দ্রোণের "যোগবলে" নিহত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অর্জ্জুনের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐরূপই বিষাদপূর্ণ কথা বাহির হইয়াছিল (ভীষ্ম. ৯৭. ৪-৭; ১০৮. ৮৮-৯৪)। অর্জ্জুন গীতার আরম্ভে বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের জন্য বিষয়োপভোগ করিতে হইবে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেই বা কি ফল (গী. ১. ৩২. ৩৩); আবার, যখন যুদ্ধে সমস্ত কৌরবের ক্ষয় হইল তখন ঐ কথাই দুর্য্যোধনের মুখ হইতেও বাহির হইয়াছে (শল্য.৩১. ৪২-৫১)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে যেমন সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপই নারায়ণীয়-ধর্ম্মে এবং শান্তিপর্ব্বের জাপকোপাখ্যানে ও জনক-সুলভাসংবাদেও এই নিষ্ঠার বর্ণনা আছে (শাং. ১৯৬ ও ৩২০)। তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম না করিলে পেটও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্ব্বের আরম্ভে দ্রৌপদী

যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন (বন.৩২); এবং এই তত্ত্বেরই উল্লেখ অনুগীতাতেও পুনর্ব্বার করা হইয়াছে। শ্রৌতধর্ম্ম বা স্মার্তধর্ম্ম যজ্ঞময়, যজ্ঞ ও প্রজা ব্রহ্মদেব একসঙ্গেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইত্যাদি গীতার প্রবচন নারায়ণীয় ধর্ম্ম ছাড়া শান্তিপর্ব্বের অন্য স্থানে (শাং. ২৬৭) এবং মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৩); এবং স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মসাধনে পাপ নাই এই বিচার তুলাধার-জাজলি-সংবাদে ও ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদেও প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. ২৬০-২৬৩ এবং বন, ২০৬-২১৫)। এতদ্ব্যতীত, গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগদুৎপত্তির যে অল্প কিছু বর্ণনা আছে, তাহারই অনুরূপ বর্ণনা শান্তিপর্ব্বের শুকানুপ্রশ্নেও আছে (শাং. ২৩১); এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের আসনের যে বর্ণনা আছে, তাহাই পুনর্ব্বার শুকানুপ্রশ্নে (শান্তি. ২৩৯) ও পরে শান্তিপর্ব্বের ৩০০ অধ্যায়ে এবং অনুগীতাতেও সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে (অশ্ব. ১৯)। অনুগীতার গুরুশিষ্যসংবাদে কৃত মধ্যম-উত্তম বস্তুসমূহের বর্ণনা (অশ্ব. ৪৩ ও ৪৪) এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতি-বর্ণনা, এই উভয়ের প্রায় একই অর্থ, এরূপ বলিতে বাধা নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তাহাই সন্ধিপ্রস্তাবের সময় দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগকে এবং পরে যুদ্ধ শেষ হইলে দ্বারকায় ফিরিয়া যাইবার পথে উত্তঙ্ককে, এবং নারায়ণ নারদকে এবং দাশরথি রাম পরশুরামকে দেখাইয়াছিলেন (উ. ১৩০; অশ্ব. ৫৫; শাং. ৩৩৯; বন.৯৯)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, গীতার বিশ্বরূপ-বর্ণনা এই চারি স্থানের বর্ণনাপেক্ষা সরস ও বিস্তৃত; কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, অর্থসাদৃশ্যের দৃষ্টিতে সেগুলিতে কিছুই নূতনত্ব নাই। গীতার চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণপ্রযুক্ত জগতের মধ্যে বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই গুণত্রয়ের লক্ষণ কি, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব গুণেরই, আত্মার নহে; ঠিক এই প্রকার এই তিন গুণের বর্ণনা অনুগীতায় (অশ্ব. ৩৬-৩৯) এবং শান্তিপর্ব্বেও অনেকস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. ২৮৫ ও ৩০০-৩১১)। সারকথা, গীতার প্রসঙ্গ অনুসারে গীতায় কোন কোন বিষয়ের আলোচনা বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে এবং গীতার বিষয়-বিচারপদ্ধতিও কিছু ভিন্ন, তথাপি দেখা যায় যে, গীতার সমস্ত বিচারের অনুরূপ বিচার মহাভারতেও পৃথক্ পৃথক্ কোথাও-না-কোথাও ন্যূনাধিক পরিমাণে পাওয়াই যায়; এবং বিচারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দেরও ন্যূনাধিক সাম্য স্বতই সংঘটিত হয়, ইহা বলা বাহুল্য। মার্গশীর্ষ মাসের সম্বন্ধে সাদৃশ্য তো বিলক্ষণই আছে। গীতায় "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" (গী. ১০. ৩৫) বলিয়া এই মাসকে যে প্রকার প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপই অনুশাসনপর্ব্বের দানধর্ম্মপ্রকরণে যেখানে উপবাসের জন্য মাসগুলির নাম বলিবার প্রসঙ্গ দুইবার আসিয়াছে, সেইখানে প্রত্যেকবার মার্গশীর্ষ হইতেই মাসগুলির গণনা সুরু করা হইয়াছে (অনু. ১০৬ ও ১০৯)। গীতার আত্মৌপম্যের কিংবা সর্ব্বভূতহিতের দৃষ্টি, অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদ, এবং দেবযান ও পিতৃযান গতির উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রকরণসমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করিলাম না।

ভাষাসাদৃশ্যই ধরুন, বা অর্থসাদৃশ্যই ধরুন, কিংবা গীতাসম্বন্ধে মহাভারতে যে ছয় সাত বার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপর বিচার করুন; এইরূপ অনুমান না করিয়া থাকা যায় না, গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্ত্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ

উপেক্ষা করিয়া কিংবা কোন প্রকারে উহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন ব্যক্তি গীতাকে প্রক্ষিপ্ত দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু যাঁহারা বাহ্য প্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য। মহাভারতের মধ্যে গীতাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্তিই যদি প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু (এই প্রকরণের আরম্ভে যেমন বলা হইয়াছে) গীতা নিছক বেদান্তমূলক কিংবা ভক্তিমূলক নহে, কিন্তু যে প্রমাণভূত মহাপুরুষদিগের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের চরিত্রের নীতিতত্ত্ব বা মর্ম্ম বলিবার জন্য মহাভারতে কর্ম্মযোগমূলক গীতার নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; এবং বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহা বিবৃত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কাব্যদৃষ্টিতে উহার উল্লেখের জন্য অধিকতর কোন যোগ্যস্থল দেখা যায় না। ইহা সিদ্ধ হইলে পর, গীতা মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে ও যোগ্যস্থানেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বজায় থাকে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও একটি সর্ব্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর্ষ মহাকাব্য; এবং তাহাতেও কথাপ্রসঙ্গানুসারে সত্য, পুত্রধর্ম্ম, মাতৃধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম প্রভৃতির মর্ম্মস্পর্শী আলোচনা আছে। কিন্তু ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই যে, নিজের কাব্যকে মহাভারতের ন্যায় "অনেক সময়ান্বিত, সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক নীতিতত্ত্বে পূর্ণ, এবং সমস্ত লোকের শীল ও সচ্চরিত্র-শিক্ষাবিধানে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ" করা বাল্মীকি ঋষির মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্যাকার্য্যের বা নীতির দৃষ্টিতে, মহাভারতের যোগ্যতা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক। মহাভারত শুদ্ধ আর্ষ কাব্য বা শুদ্ধ ইতিহাস নহে; কিন্তু উহা ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মপ্রসঙ্গের নির্ণয়কারী এক সংহিতা; এবং এই ধর্ম্মসংহিতার মধ্যে যদি কর্ম্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথায় করা যাইতে পারে? শুধু বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই বিচার-আলোচনা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মসংহিতাই উহার উপযুক্ত স্থান; এবং মহাভারতকার যদি এইরূপ আলোচনা না করিতেন তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই পরিমাণেই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই ত্রুটি পূর্ণ করিবার জন্যই ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যসত্যই ইহা আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, এই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের সমর্থন করিতে বেদান্তশাস্ত্রের সমানই ব্যবহারেতেও অত্যন্ত নিপুণ মহাভারতকারের ন্যায় এক উত্তম সৎপুরুষকে আমরা লাভ করিয়াছি। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, বর্ত্তমান ভগবদ্গীতা প্রচলিত মহাভারতেরই এক অংশ। এখন উহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। ভারত ও মহাভারত এই দুই শব্দ আমরা সমানার্থক মনে করি; কিন্তু বস্তুত এই দুই শব্দ বিভিন্ন। ব্যাকরণদৃষ্টিতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে সেই গ্রন্থই 'ভারত' নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপই; এই রীতিতে যে গ্রন্থে ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা আছে তাহাকে শুধু 'ভারত' বলিলেই যথেষ্ট হয়, সেই গ্রন্থ যতই বিস্তৃত হোক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রামায়ণ গ্রন্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে; কিন্তু তাহাকে কেহ মহা-রামায়ণ বলে না। তবে ভারতেরই নাম 'মহাভারত' কেন হইল? মহত্ত্ব ও গুরুত্ব এই দুই গুণপ্রযুক্ত এই গ্রন্থ 'মহাভারত' নাম পাইয়াছে, ইহা মহাভারতের শেষে উক্ত হইয়াছে (স্বর্গ. ৫. ৪৪)। কিন্তু সরল শব্দার্থে 'মহাভারত' অর্থে 'বড় ভারত' হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্রশ্ন উঠে যে, 'বড়' ভারতের পূর্ব্বে কোন 'ছোট' ভারতও ছিল কি? এবং তাহার

মধ্যে গীতা ছিল কি না? বর্ত্তমান মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার (আ. ১. ১০১); এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে ইহার নাম 'জয়' ছিল (আ. ৬২.২০)। 'জয়' শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয়; এবং ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে 'জয়' নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। অশ্বালয়নগৃহ্যসূত্রের ঋষিতর্পণে—'সমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত--ধর্ম্মাচার্য্যাঃ' (আ. গৃ.৩.৪. ৪)—ভারত ও মহাভারত এই দুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাহা হইতেও এই অনুমানই দৃঢ় হয়। এই প্রকার বড় ভারতের মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, কিছুকাল বাদে ক্ষুদ্র 'ভারত' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ না থাকায় স্বভাবতঃ লোকদিগের এই ধারণা হইল যে, কেবল 'মহাভারত'ই এক ভারতগ্রন্থ। বর্তমান মহাভারতের এই সংস্করণে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ব্যাস প্রথমে আপন পুত্র শুককে, এবং তাহার পর অন্য শিষ্যদিগকে ভারত পড়াইয়াছিলেন (আ. ১. ১০৩); এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, সমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য পাঁচ বিভিন্ন ভারতসংহিতা বা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন (আ. ৬৩. ৯০)। এই বিষয়ে এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পায়নের মহাভারতকে এবং জৈমিনীয় মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পর্ব্বমাত্র ব্যাসদেব রাখিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে এখন ইহাও বুঝা যায় যে, ঋষিতর্পণে 'ভারত-মহাভারত' শব্দের পূর্ব্বে সমন্তু প্রভৃতি নাম কেন রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই বিষয়ে এত গভীর বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। রা.ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য মহাভারতের স্বকীয় টীকাগ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই আমার মতে সযুক্তিক। তাই এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা যে মহাভারত বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এরূপ ছিল না; ভারতের বা মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, এবং শেষে তাহার যে স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান মহাভারত। মূল-ভারতেও গীতা ছিল না এরূপ বলা যায় না। হাঁ, ইহা সুস্পষ্ট যে, সনৎসুজাতীয়, বিদুরনীতি, শুকানুপ্রশ্ন, যাজ্ঞবল্ক্যজনক-সংবাদ, বিষ্ণুসহস্রনাম, অনুগীতা, নারায়ণীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্ত্তমান গীতাকেও মহাভারতকার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহের ভিত্তির উপরেই লিখিয়াছেন—নূতন রচনা করেন নাই। তথাপি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, মহাভারতকার মূল গীতাতে কিছু ফেরফার করেন নাই। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, বর্ত্তমান সাতশত-শ্লোকী গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ; উভয়েরই রচনা একই হাতের, এবং বর্ত্তমান মহাভারতে বর্ত্তমান গীতা কেহ পরে ঢুকাইয়া দেয় নাই। বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ কাল, এবং মূল গীতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কি তাহাও পরে বলা যাইবে।

ভাগ ২—গীতা ও উপনিষদ্

এক্ষণে দেখা যাক্ যে, গীতা ও বিভিন্ন উপনিষদের পরস্পর সম্বন্ধ কি। বর্ত্তমান মহাভারতেই স্থানে স্থানে সাধারণভাবে উপনিষদের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে (বৃ. ১. ৩; ছা. ১. ২) প্রাণেন্দ্রিয়দিগের যুদ্ধের বৃত্তান্তও অনুগীতায় (অশ্ব. ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং "ন মে স্তেনো

জনপদে" ইত্যাদি কৈকেয়-অশ্বপতি রাজার মুখের শব্দও (ছাং. ৫. ১১. ৫) শান্তিপর্ব্বে উক্ত রাজার কথা বলিবার সময় ঠিক ঠিক আসিয়াছে (শাং ৭৭. ৮)। সেইরূপ আবার, শান্তিপর্ব্বের জনক পঞ্চশিখসংবাদে "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" অর্থাৎ মরিয়া যাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞা থাকে না কারণ সে ব্রহ্মে মিশিয়া যায়, বৃহদারণ্যকের এই বিষয় (বৃ. ৪. ৫. ১৩) পাওয়া যায়; সেইখানেই শেষে, প্রশ্ন এবং মুণ্ডক উপনিষদের (প্রশ্ন. ৬, ৫; মুং. ৩. ২. ৮) নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণকে ঘোড়া বলিয়া ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে (বন. ২১০) এবং অনুগীতায় বুদ্ধির সহিত সারথির যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কঠোপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে (ক. ১. ৩. ৩); শান্তিপর্ব্বে (১৮৭. ২৯ ও ৩৩১. ৪৪) দুই স্থানে "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা" (কঠ. ৩. ১২) এবং "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" (কঠ. ২. ৪) কঠোপনিষদের এই দুই শ্লোকও স্বল্পভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরের "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য শেষ হয় নাই; ইহা ব্যতীত উপনিষদের আরও অনেক বাক্য মহাভারতের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ইহাই কেন, মহাভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান প্রায় উপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে ইহাও বলিতে বাধা নাই।

গীতারহস্যের নবম ও ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, মহাভারতের ন্যায়ই ভগবদ্গীতার অধ্যাত্মজ্ঞানও উপনিষদ্কে অবলম্বন করিয়া আছে; শুধু তাহা নহে, গীতার ভক্তিমার্গও এই জ্ঞান হইতে নহে। তাই, তাহার পুনরুক্তি এখানে না করিয়া সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মার অশোচ্যত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-ব্রহ্মস্বরূপ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং বিশেষ করিয়া 'জ্ঞেয়' পরব্রহ্মের স্বরূপ—এই সমস্ত বিষয় গীতায় অক্ষরশঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে। কোন উপনিষৎ গদ্যে এবং কোন উপনিষৎ পদ্যে রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি তেমনি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে; তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, 'যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা নাই' (গী ২. ১৬), "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" (গী. ৮. ৬.) ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে; এবং "ক্ষীণে পুণ্যে" (গী. ৯. ২১) "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (গী. ১৩. ১৭), এবং "মাত্রাস্পর্শাঃ" (গী. ২. ১৪) ইত্যাদি বিচার ও বাক্য বৃহদারণ্যক হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু গদ্যাত্মক উপনিষৎ ছাড়িয়া পদ্যাত্মক উপনিষদ্ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। কারণ, এই পদ্যাত্মক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক যেমন-তেমনটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—কঠোপনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিংবা অল্প শব্দভেদে গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি" (২. ২৯) শ্লোক, কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর "আশ্চর্য্যো বক্তা" (কঠ. ২. ৭) শ্লোকের সমান; এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (গী. ২. ২০) শ্লোক এবং "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (গী. ৮. ১১) এই শ্লোকার্দ্ধ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ একই (কঠ. ২. ১৯; ২. ১৫)। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" (গী. ৩. ৪২) গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হইতে গৃহীত (কঠ. ৩. ১০) ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইরূপ গীতার পনেরো অধ্যায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপকটি কঠোপনিষদ হইতে এবং

"ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো" (গী. ১৫. ৬) শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে অল্প শব্দভেদে গৃহীত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অনেক কল্পনা ও শ্লোকও গীতায় আছে। নবম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে মায়া শব্দ প্রথম প্রথম শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রদত্ত হয় এবং তাহা হইতেই গীতা ও মহাভারতে উহা গৃহীত হইয়া থাকিবে। শব্দসাদৃশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" (গী. ৬ ১১) এইরূপ যে যোগাভ্যাসের যোগ্য স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহা "সমে শুচৌ" ইত্যাদি (শ্বে. ২. ১০) মন্ত্র হইতে এবং "সমং কায়শিরোগ্রীবং" (গী. ৬. ১৩) এই শব্দ "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" (শ্বে. ২. ৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ আবার, "সর্বতঃ পাণিপাদং" শ্লোক এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধও, গীতায় (১৩. ১৩) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শব্দশঃ পাওয়া যায় (শ্বে. ৩. ১৬) এবং "অণোরণীয়াংসং" এবং "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পদও গীতায় (৮. ৯) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একই আছে (শ্বে, ৩. ৯. ২০)। ইহা ব্যতীত গীতার ও উপনিষদের শব্দসাদৃশ্য দেখিতে গেলে "সর্বভূতস্থমাত্মানং" (গী. ৬ ২৯) এবং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" (গী ১৫. ১৫) এই দুই শ্লোকার্দ্ধ কৈবল্যোপনিষদে (কৈ. ১. ১০ ; ২. ৩) যেমনটি তেমনি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দসাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, গীতার বেদান্ত, উপনিষৎ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উপনিষদের আলোচনা এবং গীতার আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না, এবং থাকিলে কোন্ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হইবে। তাই, এখন সেই বিষয়েরই অভিমুখে যাওয়া যাক।

উপনিষদ অনেক। তন্মধ্যে কোন কোনটির ভাষা এতটা অর্ব্বাচীন যে, সেই উপনিষৎগুলি ও পুরাতন উপনিষৎ যে সমকালীন নহে তাহা সহজেই দেখা যায়। তাই গীতা ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিবার সময়, ব্রহ্মসূত্রে যে সকল উপনিষদের উল্লেখ আছে সেই উপনিষৎগুলিকেই মুখ্যরূপে আমি এই প্রকরণে তুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি। এই উপনিষদ সমূহের অর্থ এবং গীতার অধ্যাত্ম যখন মিলাইয়া দেখি, তখন প্রথম ইহাই মনে হয় যে, নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নির্গুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি বর্ণনা করিবার সময়, 'অবিদ্যা' শব্দের বদলে 'মায়া' বা 'অজ্ঞান' শব্দই গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। নবম প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, 'মায়া' শব্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আসিয়াছে ; এবং নামরূপাত্মক অবিদ্যারই ইহা অন্য পর্য্যায়শব্দ ; ইহাও পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রথম অনুমান এই হয় যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাং. ৩ ১৪. ১) বা "সর্বমাত্মানং পশ্যতি" (বৃ. ৪. ৪. ২৩) অথবা "সর্বভূতেষু চাত্মানং" (ঈশ. ৬)—এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিষদের সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞান গীতায় সংগৃহীত হইলেও নামরূপাত্মক অবিদ্যার উপনিষদেই 'মায়া' প্রচলিত হইবার পর গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে উপনিষদের ও গীতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গীতায় কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই দুই উপনিষদ জ্ঞানপ্রধান, কিন্তু উহাদের মধ্যে তো সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাওয়া যায় না ; এবং কঠাদি উপনিষদে অব্যক্ত, মহান্ ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও ইহা সুস্পষ্ট যে,

তাহাদিগকে অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে না করিয়া বেদান্তের পদ্ধতিতেই করিতে হইবে। মৈত্র্যুপনিষদের উপপাদনেও ঐ কথাই খাটে। এইরূপ সাংখ্যপ্রক্রিয়ার বহিষ্করণ এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, বেদান্তসূত্রে পঞ্চীকরণের বদলে ছান্দোগ্যোপনিষদের মতানুযায়ী ত্রিবিৎ-করণ তত্ত্বানুসারেই জগতের নামরূপাত্মক বৈচিত্র্যের উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে (বেসূ. ২, ৪, ২০)। সাংখ্যকে একেবারে পৃথক করিয়া অধ্যাত্মের অন্তর্ভূত ক্ষরাক্ষর-বিচার করিবার এই পদ্ধতি গীতায় স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত যেমনটি-তেমনি গীতায় গৃহীত হয় নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে, গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব অনুসারে, সমস্ত ব্যক্ত জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল সেই সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত, এবং পুরুষ নির্গুণ হইয়া দ্রষ্টা, এই মতও গীতার গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু দ্বৈত-সাংখ্যজ্ঞানের উপর অদ্বৈতবেদান্তের প্রথমে এই প্রকার প্রাবল্য স্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহে—ঐ উভয়ই উপনিষদের আত্মরূপ একই পরব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ বিভূতি ; এবং পুনরায় সাংখ্যদিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার গীতায় বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মৈকারূপ অদ্বৈত মতের সহিত স্থাপিত দ্বৈতী সাংখ্যদিগের সৃষ্টি-উৎপত্তিক্রমের এই সম্মিলন, গীতার ন্যায় মহাভারতের অন্যান্য স্থানের অধ্যাত্মবিচারেও পাওয়া যায়। এবং এই সম্মিলন হইতে, গীতা ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে এই যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহা আরও দৃঢ় হয়।

উপনিষৎ অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়রকমের যে বিশিষ্টতা আছে তাহা ব্যক্তোপাসনা কিংবা ভক্তিমার্গ। ভগবদ্‌গীতার ন্যায় উপনিষদেও কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু ব্যক্ত মানব-দেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রাচীন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না। অব্যক্ত ও নির্গুণ পরব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন হওয়ায়, মন, আকাশ, সূর্য্য. অগ্নি, যজ্ঞ ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা করা আবশ্যক, এই তত্ত্ব উপনিষৎকারদিগের মান্য। কিন্তু উপাসনার জন্য প্রাচীন উপনিষদে যে সকল প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরস্বরূপের প্রতীক ধরা হয় নাই। রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ এই সমস্ত পরমাত্মারই রূপ ইহা মৈত্র্যুপনিষদে (মৈ. ৭. ৭) উক্ত হইয়াছে ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'মহেশ্বর' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" (শ্বে. ৫. ১৩) এবং "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" (শ্বে. ৬. ২৩) প্রভৃতি বচনও শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বচনে নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দে বিষ্ণুর মানবদেহধারী অবতারই যে বিবক্ষিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ, রুদ্র ও বিষ্ণু এই দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ প্রাচীন ; তখন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" (তৈ সং. ১. ৭. ৪) ইত্যাদি প্রকারে যাগযজ্ঞকেই বিষ্ণু-উপাসনার যে স্বরূপ পরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই উপর্যুক্ত উপনিষদের অভিপ্রেত নহে ? ভাল, যদি কেহ বলেন যে, মানব-দেহধারী অবতারের কল্পনা সেই সময়েও ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কারণ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যে 'ভক্তি' শব্দ আছে তাহা যজ্ঞরূপ উপাসনা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে হয় না। ইহা সত্য যে, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদের বচন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বচন অপেক্ষাও কোথাও অধিক স্পষ্ট, তাই উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন অবসরই থাকে না। কিন্তু এই উপনিষদের কাল নিশ্চিতরূপে স্থির করিবার কোন উপায় না থাকায়, বৈদিকধর্ম্মে মানবরূপধারী বিষ্ণুর-উপাসনার কখন্ আবির্ভাব

হইল এই প্রশ্নের মীমাংসা এই উপনিষদ্‌সমূহের ভিত্তিতে ঠিক করিয়া করা যাইতে পারে না। তথাপি বৈদিক ভক্তিমার্গের প্রাচীনতা অন্য প্রকারে বেশ সিদ্ধ হয়। পাণিনির এক সূত্র আছে "ভক্তিঃ"—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি হয় (পা. ৪. ৩. ৯৫); ইহার পরে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" (পা. ৪. ৩. ৯৮) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বাসুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 'বাসুদেবক' এবং অর্জ্জুনের প্রতি যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 'অর্জ্জুনক' বলিবে; এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উপর টীকা করিবার সময় উক্ত হইয়াছে যে, এই সূত্রে 'বাসুদেব' ক্ষত্রিয়ের বা ভগবানের নাম। এই সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাষ্য খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ ভাণ্ডারকর সিদ্ধ করিয়াছেন; এবং পাণিনির কাল ইহা অপেক্ষাও যে অধিক প্রাচীন, এই সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাছাড়া, বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থেও ভক্তির উল্লেখ আছে; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানপন্থায় ভক্তিতত্ত্ব প্রবেশের কারণ হওয়া সম্ভব ইহা আমি পরে সবিস্তার দেখাইয়াছি। তাই ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রায় ছয় শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে, আমাদের এখানে ভক্তিমার্গ পুরামাত্রায় স্থাপিত হইয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র বা শাণ্ডিল্য অথবা নারদের ভক্তিসূত্র তদুত্তরকালীন। কিন্তু ইহা হইতে ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না। গীতারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাচীন উপনিষদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের ভক্তিমার্গ নিঃসৃত হইয়াছে; পাতঞ্জলযোগে চিত্ত স্থির করিবার জন্য কোন-না-কোন ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সম্মুখে রাখা আবশ্যক হয় বলিয়া উহা হইতে ভক্তিমার্গের আরও পুষ্টিসাধন হইয়াছে; ভক্তিমার্গ অন্য কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আনা হয় নাই—এবং আনিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। নিজ ভারতবর্ষে এই প্রকারে প্রাদুর্ভূত ভক্তিমার্গের ও বিশেষতঃ বাসুদেব-ভক্তির উপনিষদে বর্ণিত বেদান্তের দৃষ্টিতে সমর্থন করাই গীতার প্রতিপাদনের একটি বিশেষ অংশ।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গীতার অধিক মহত্ত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে কর্ম্মযোগের সহিত, ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের মিলন ঘটাইয়া দেওয়াই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম কিংবা শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম উপনিষদে গৌণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, কোন কোন উপনিষৎকার বলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেই হইবে এবং চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি অনেক উপনিষদেরই প্রবণতা সাধারণতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসেরই দিকে, ইহা বলিতে পারা যায়। ঈশাবাস্যোপনিষদের ন্যায় অপর কোন কোন উপনিষদেও আমরণান্ত কর্ম্ম করা সম্বন্ধে "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি" এইরূপ বচন পাওয়া যায়; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাংসারিক কর্ম্মের বিবাদ দূর করিয়া দিয়া প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এই কর্ম্মযোগের সমর্থন গীতায় যেমন করা হইয়াছে তেমন আর কোন উপনিষদে পাওয়া যায় না। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত অধিকাংশ উপনিষৎকারের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করায় এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া জায়গা নষ্ট করি নাই।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগসাধনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে পাতঞ্জলসূত্রে তাহার সবিস্তার ও পদ্ধতিযুক্ত আলোচনা পাওয়া যায়; এবং এক্ষণে পাতঞ্জলসূত্রই এই বিষয়ের প্রমাণগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এইরূপ যোগের ব্যাখ্যা করিয়া

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই নিরোধ সাধিত হয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার পর, যমনিয়মাসন প্রাণায়ামাদি যোগসাধনের বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'অসংপ্রজ্ঞাত' অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা অণিমা লঘিমাদি অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তি কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সমাধির দ্বারা শেষে কিরূপে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয় তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতাতেও প্রথমে চিত্তনিরোধ করিবার আবশ্যকতা (গী. ৬. ২০) বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুই সাধনের দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবে (গী. ৬. ৩৫) বলা হইয়াছে, এবং শেষে নির্ব্বিকল্প সমাধি কিরূপে করিতে হইবে তাহা বলিয়া তাহাতে কি সুখ তাহা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বলিতে পারা যায় না যে, পাতঞ্জল যোগমার্গ ভগবদ্‌গীতার অভিমত কিংবা পাতঞ্জলসূত্র ভগবদ্‌গীতা অপেক্ষা প্রাচীন। পাতঞ্জলসূত্রের ন্যায় ভগবান্ কোথাও বলেন নাই যে, সমাধিসিদ্ধ হইবার জন্য নাক ধরিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে। কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির সমতা হওয়া চাই এবং এই সমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য চিত্ত-নিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশ্যক, অতএব কেবল সাধন বলিয়া গীতায় চিত্তনিরোধ ও সমাধির বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই বলিতে হয় যে, এই বিষয়ে পাতঞ্জলসূত্র অপেক্ষা শ্বেতাশ্বতর কিংবা কঠোপনিষদের সহিত গীতার অধিক সাম্য আছে। ধ্যানবিন্দু, ছুরিকা, এবং যোগতত্ত্ব এই উপনিষদ্‌গুলিও যোগসংক্রান্তই বটে; কিন্তু উহাদের যোগই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং ঐগুলিতে কেবল যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হওয়ায়, যে গীতা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেই গীতার সহিত এই একপক্ষীয় উপনিষদ্‌গুলির সর্ব্বাংশে মিল স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং সেরূপ মিল হইতেই পারে না। টমসন্ সাহেব ইংরাজীতে গীতার যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহার উপোদ্‌ঘাতে তিনি বলিয়াছেন যে, গীতার কর্ম্মযোগ পাতঞ্জলযোগেরই এক রূপান্তর; কিন্তু ইহা অসম্ভব। এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার 'যোগ' শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ এদিকে গীতার কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তিমূলক এবং ওদিকে পাতঞ্জলযোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক। তাই এই দুই গ্রন্থের একটির অপর হইতে উদ্ভূত হওয়া কখনও সম্ভব নহে; এই গীতাতেও সে কথা কোন স্থানে বলা হয় নাই। অধিক কি, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যোগ শব্দের পুরাতন অর্থ 'কর্ম্মযোগ'ই ছিল এবং সম্ভবত পাতঞ্জলসূত্রের 'পর ঐ শব্দই 'চিত্তনিরোধরূপ যোগ' অর্থে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, প্রাচীনকালে জনকাদির আচরিত নিষ্কাম কর্ম্মমার্গেরই সদৃশ গীতার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গও; এবং মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ভাগবত ধর্ম্ম হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে—পাতঞ্জলযোগ হইতে উহা উৎপন্ন হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্ম্ম ও উপনিষদ এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোন্ কোন্ বিষয়ে আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতেছি যে, গীতায় ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষৎ অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ না করিয়া, তাহার ভিতর বাসুদেবভক্তি এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগদুৎপত্তিক্রম অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরজ্ঞানের কথাও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এবং সাধারণ লোকের সহজসাধ্য এবং উভয় লোকের যাহা শ্রেয়স্কর সেই বৈদিক কর্ম্মযোগ ধর্ম্মই গীতায় মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষৎ হইতে গীতায় যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই। তাই

ব্রহ্মজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও সন্ন্যাসমূলক উপনিষদের সহিত গীতার মিল স্থাপন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে টানাবোনা করিয়া গীতার অর্থ করা উচিত নহে। উভয়েতেই অধ্যাত্মজ্ঞান একই প্রকার সত্য; কিন্তু অধ্যাত্মরূপ মস্তক এক হইলেও সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ বৈদিকধর্ম্মপুরুষের দুই তুল্যবল হস্ত আছে; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্যোপনিষদের ন্যায় গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই মুক্তকণ্ঠে প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি।

ভাগ ৩—গীতা ও ব্রহ্মসূত্র

জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান ও যোগপ্রধান উপনিষদ্‌সমূহের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার যে সাদৃশ্য ও ভেদ আছে, তাহার এইরূপ বিচার করিবার পর প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মসূত্র ও গীতার তুলনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক বিবৃত অধ্যাত্মসিদ্ধান্তসমূহের পদ্ধতিবদ্ধ বিচার আলোচনা করিবার জন্যই বাদরায়ণাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়, তাই উহাতে উপনিষদ্‌ হইতে ভিন্ন কোন বিচার আসিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করিবার সময় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে,—

> ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্‌।
> ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥

অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের "অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে (অনেক) ঋষি পৃথক পৃথক এবং হেতুযুক্ত ও পূর্ণনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও বিচার করিয়াছেন" (গী. ১৩. ৪); এবং যদি এই ব্রহ্মসূত্র ও বর্তমান বেদান্তসূত্র এক বলিয়াই মনে করিতে হয় তবে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্রের পর বর্ত্তমান গীতা রচিত হইয়া থাকিবে। তাই গীতার কালনির্ণয় করিবার দৃষ্টিতে ব্রহ্মসূত্র কোন্‌টি, তাহার বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক। * কারণ, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্র নামক দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না এবং তাহার বিষয় কোথাও কথিতও হয় নাই। এবং ইহা বলা তো কোন প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রের পর গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, কারণ, গীতার প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। ইহা প্রতীত হয় যে, প্রায় এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাঙ্করভাষ্যে "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ"র অর্থ "শ্রুতির কিংবা উপনিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য" করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতে শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি এবং রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি গীতার, অন্যান্য ভাষ্যকার বলেন যে, এস্থলে "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" শব্দে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বাদরায়ণাচার্য্যের এই ব্রহ্মসূত্রেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং শ্রীধর স্বামীর উভয় অর্থ অভিপ্রেত। অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমাকে স্বতন্ত্র রীতিতেই স্থির করিতে হইবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিচার সম্বন্ধে "ঋষিরা অনেক প্রকারে পৃথক্‌" বলিয়াছেন; এবং তাহা ব্যতীত (চৈব) "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্র-পদের দ্বারাও" ঐ অর্থই কথিত হইয়াছে; এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা "চৈব" (আরও) এই পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দুই স্থল শুধু ভিন্ন নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক কৃত বর্ণনা "বিবিধ ছন্দে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিচ্ছিন্ন ও অনেক

* এই বিষয়ের বিচার তৈলঙ্গ করিয়াছেন; তাছাড়া ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর অধ্যাপক তুকারাম রামচন্দ্র অমল নেরকর বি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকারের" এবং 'ঋষিভিঃ' (এই বহুবচন তৃতীয়ান্ত পদ) দ্বারা উহা যে অনেক ঋষিদিগের কৃত, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এবং ব্রহ্মসূত্রপদের অপর বর্ণনা "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক"। এই প্রকারে এই দুই বর্ণনার বিশেষ প্রভেদ এই শ্লোকেই স্পষ্ট করা হইয়াছে। 'হেতুমৎ' শব্দ মহাভারতের কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহার অর্থ—"নৈয়ায়িক পদ্ধতি অনুসারে, কার্য্যকারণভাব দেখাইয়া প্রতিপাদন করা"। উদাহরণ—জনকের নিকট সুলভা যে কথা বলিয়াছিলেন, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্যস্থতা করিতে কৌরবদিগের সভায় গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই ধর। মহাভারতেই প্রথম কথাকে "হেতুমৎ ও অর্থবৎ" (শাং ৩২০,১৯১) এবং দ্বিতীয় কথাকে 'সহেতুক' (উদ্যো, ১৩১,২) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যে প্রতিপাদনে সাধক-বাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষে কোন একটি অনুমান নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ করা হয় তাহার সম্বন্ধেই "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; একস্থানে এক রকম অন্যস্থানে অন্য রকম, উপনিষদের এরূপ কোন সংকীর্ণ প্রতিপাদনসম্বন্ধে এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। তাই, 'ঋষিভিঃ বহুধা বিবিধৈঃ পৃথক্‌' এবং "হেতুমদ্ভি বিনিশ্চিতৈঃ" এই পদগুলির বিরোধাত্মক স্বারস্য যদি বজায় রাখিতে হয়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, গীতার উক্ত শ্লোকে "ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে কৃত অনেক প্রকারের পৃথক্‌", বিচার হইতে বিভিন্ন উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্‌ বাক্যই অভিপ্রেত, এবং "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্রপদ" এই পদগুলি হইতে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষ সিদ্ধান্ত যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সেই বিচার অভিপ্রেত। আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে. উপনিষদের সমস্ত বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, অর্থাৎ অনেক ঋষিদের যেমন যেমন মনে আসিয়াছিল তেমনি-তেমনিই উক্ত হইয়াছিল, তাহার ভিতর কোন বিশেষ পদ্ধতি বা ক্রম নাই; অতএব সেই বিচারসমূহের সমন্বয় না করিলে উপনিষদের ভাবার্থ ঠিক অবগত হওয়া যায় না। তাই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রন্থে কার্য্যকারণহেতু দেখাইয়া উহাদের (অর্থাৎ উপনিষদসমূহের) সমন্বয় করা হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা বেদান্তসূত্রেরও (ব্রহ্মসূত্রের) উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল।

গীতার শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, উপনিষদ্‌ ও ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখ্য উপনিষৎ সম্বন্ধে কোন বিবাদই নাই; কারণ, এই উপনিষদসমূহের অনেক শ্লোক গীতায় শব্দশ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্ম-সূত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার স্থান আছে; কারণ, ব্রহ্মসূত্রসমূহে 'ভগবদ্‌গীতা' শব্দটি সাক্ষাৎভাবে না আসিলেও, ভাষ্যকার মনে করেন যে, অন্ততঃ কতকগুলি সূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদ্‌গীতারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে ব্রহ্মসূত্রগুলিতে শাঙ্করভাষ্য অনুসারে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নপ্রদত্ত সূত্রগুলিই মুখ্য :—

ব্রহ্মসূত্র—অধ্যায়, পাদ ও সূত্র	গীতা—অধ্যায় ও শ্লোক
১. ২. ৬ স্মৃতেশ্চ।	গীতা ১৮. ৬১ "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" আদি শ্লোক।
১. ৩. ২৩ অপি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ১৫. ৬ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদি।
২. ১. ৩৬ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ	গীতা ১৫. ৩ "ন রূপমস্যেহ তথোপ-লভ্যতে" ইত্যাদি।

২. ৩. ৪৫ অপি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ১৫. ৭ "মমৈবাংশো জীবলোকঃ জীবভূতঃ" ইত্যাদি।
৩. ২. ১৭ দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে	গীতা ১৩. ১২ "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি।
৩. ৩. ৩১ অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্	গীতা ৮. ২৬ "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে" ইত্যাদি।
৪. ১. ১০ স্মরন্তি চ।	গীতা ৬. ১১ শুচৌ দেশে" ইত্যাদি।
৪. ২. ২১ যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ৮. ২৩ "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ" ইত্যাদি

উপরি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করিলেও আমার মতে, চতুর্থ (ব্রসূ. ২. ৩. ৪৫) ও অষ্টম (বসূ. ৪. ২. ২১) এই দুই স্থলে কোন সন্দেহ নাই ; এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই বিষয়ে শংকরাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য এই চারি ভাষ্যকারদিগের মত একই প্রকার। ব্রহ্মসূত্রের উক্ত দুই স্থলের (ব্রসূ. ২. ৩. ৪৫ এবং ৪. ২. ২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করিবার সময় প্রথমে জগতের অন্য পদার্থের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (ব্রসূ. ২. ৩. ১৭) এই সূত্রের দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে ; পরে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২. ৩. ৪৩) এই সূত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ, ইহা বলা হইয়াছে, এবং পরে "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" (২. ৩. ৪৪) এইরূপ শ্রুতির প্রমাণ দিয়া শেষে "অপিচ স্মর্য্যতে" (২. ৩. ৪৫) "স্মৃতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে", এই সূত্রের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সকল ভাষ্যকারেরাই বলিয়াছেন যে, ইহা স্মৃতি অর্থাৎ গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী. ১৫. ৭) এই বচন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা শেষের স্থলটি (অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র ৪. ২. ২১) আরও অধিক নিঃসন্দেহ। দেবযান ও পিতৃযান এই দুই গতিতে ক্রমানুসারে উত্তরায়ণের ছয়মাস এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস হয়, এবং উহাদের অর্থ কালমূলক না করিয়া বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, ঐ শব্দগুলি হইতে তৎতৎকালাভিমানী দেবতা অভিপ্রেত (বেসূ. ৪. ৩. ৪), ইহা পূর্ব্বেই দশম প্রকরণে আমি বলিয়াছি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ শব্দদ্বয়ের কালবাচক অর্থ কি কখনই গ্রহণ করা যায় না? এই জন্য "যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে" (ব্রসূ. ৪. ২. ২১) অর্থাৎ এই কাল "স্মৃতিতে যোগীদিগের পক্ষে বিহিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে"—এই সূত্রের প্রয়োগ করা হইয়াছে ; এবং "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ"—(গী. ৮. ২৩) এই গীতাবচনে, এই কাল যোগীদিগের পক্ষে বিহিত, এইরূপ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ভাষ্যকারদিগের কথা অনুসারে অগত্যা বলিতে হয় যে, উক্ত দুই স্থলে ব্রহ্মসূত্রের 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভাগবদ্‌গীতাই বিবক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদ্‌গীতারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে স্বীকার করিলে, উভয়ের মধ্যে কালদৃষ্টিতে বিরোধ উৎপন্ন হয়। তাহা এই ; ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়, এবং ব্রহ্মসূত্রে "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা গীতাই বিবক্ষিত হইয়াছে মনে করিলে, গীতাকে ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হয়। একবার ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী, আর একবার উহা গীতার

পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভাল ; এখন এই মুষ্কিল এড়াইবার জন্য, "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ শব্দে শঙ্কারভাষ্যে প্রদত্ত অর্থ স্বীকার করিলে, "হেতুমদ্‌ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" ইত্যাদি পদের স্বারস্যই (সার্থকতা) থাকে না ; এবং ব্রহ্মসূত্রের "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা গীতা ব্যতীত অন্য কোন স্মৃতিগ্রন্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে মনে করিলে, সমস্ত ভাষ্যকারই ভুল করিয়াছেন বলিতে হয়। ভাল ; তাঁহারা ভুল করিয়াছেন বলিলেও 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা কোন্ গ্রন্থ বিবক্ষিত তাহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। তখন এই মুষ্কিল কাটাইবে কি করিয়া? আমার মতে এই মুষ্কিল হইতে উদ্ধার পাইবার একটিমাত্র পথ আছে। ব্রহ্মসূত্র যিনি রচিয়াছিলেন তিনিই মূল ভারতের এবং গীতার বর্ত্তমান রূপটি প্রদান করিয়া থাকিবেন এইরূপ মনে করিলে, কোন গোলযোগই থাকে না। ব্রহ্মসূত্রকে "ব্যাসসূত্র" বলিবার প্রচলিত রীতি আছে ; এবং "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ, (বেসূ. ৩. ৪. ২) এই সূত্রের উপর শাংকরভাষ্যের টীকায়, আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন যে, জৈমিনি বেদান্তসূত্রকার ব্যাসের শিষ্য ছিলেন ; এবং আরম্ভের মঙ্গলাচরণেও, "শ্রীমদ্‌ব্যাসপয়োনিধির্নিধিরসৌ" এইরূপ তিনি ব্রহ্মসূত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের ভিত্তিতে আমি উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতকার ব্যাসের পৈল, শুক, সুমন্তু, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য ছিলেন ; এবং ব্যাস তাঁহাদিগকে মহাভারত পড়াইয়াছিলেন। এই দুই কথা একত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, মূল ভারত এবং তদন্তর্গত গীতার বর্তমান রূপ প্রদান করা এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা, এই দুই কাজই এক বাদরায়ণ ব্যাসই করিয়া থাকিবেন। এই কথার ইহা অর্থ নহে যে, বাদরায়ণাচার্য্য বর্ত্তমান মহাভারত নূতন রচিয়াছিলেন, আমার উক্তির ভাবার্থ এই যে, মহাভারত গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ হওয়ায় সম্ভবত বাদরায়ণাচার্য্যের সময়ে তাহার কোন কোন অংশ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত কিংবা লুপ্তও হইয়া থাকিবে। এই অবস্থায় তৎকালে প্রাপ্ত মহাভারতের অংশসমূহের অনুসন্ধান করিয়া এবং যেখানে যেখানে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ ও দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখা গিয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহার শুদ্ধি ও পূর্ত্তি করিয়া এবং অনুক্রমণিকা প্রভৃতি জুড়িয়া দিয়া বাদরায়ণাচার্য্য এই গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন করিয়া থাকিবেন কিংবা তাহার বর্ত্তমান রূপ দিয়া থাকিবেন। মারাঠী সাহিত্য জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধিই একনাথ মহারাজ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণমহাভাষ্য একবার প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরাচার্য্যকে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাভারতের অন্য প্রকরণে গীতার শ্লোক কেন পাওয়া যায় তাহার উপপত্তি এক্ষণে ঠিক পাওয়া যাইতেছে ; এবং গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নির্দ্দেশ কেন করা হইল তাহারও মীমাংসা সহজ হইতেছে। গীতার যে ভিত্তিতে বর্ত্তমান গীতা রচিত হইয়াছে তাহা বাদরায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বেও উপলব্ধ ছিল, তাই ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মহাভারতের সংশোধন করিবার সময় গীতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সবিস্তার বিচার ব্রহ্মসূত্রে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গীতায় ব্রহ্মসূত্রের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই অনুরূপ সূত্রগ্রন্থের

---

* ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসম্বন্ধীয় মুখ্যগ্রন্থ এবং সেইরূপ গীতা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে প্রধান—ইহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। এখন ব্রহ্মসূত্র ও গীতা একই ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যাস রচনা করিয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই দুই শাস্ত্রের কর্ত্তা ব্যাসকেই মানিতে হয়। আমি এই কথা অনুমানের দ্বারা উপরে সিদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু কুম্ভকোণস্থ কৃষ্ণাচার্য্য

অন্য উল্লেখ বর্ত্তমান মহাভারতেও আছে। উদাহরণ যথা—অনুশাসনপর্ব্বের অষ্টাবক্রাদিসংবাদে "অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং সূত্রকারো ব্যবস্যতি" (অনু. ১৯. ৬) এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবার, শতপথ ব্রাহ্মণ (শান্তি. ৩১৮. ১৬. ২৩)' পঞ্চরাত্র (শান্তি. ৩৩৯. ১০৭), মনু (অনু. ৩৭. ১৬) এবং যাস্কের নিরুক্ত (শান্তি. ৩৪২. ৭১), ইহাদেরও অন্যত্র স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু গীতার ন্যায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রীতি ছিল না, তাই গীতার অতিরিক্ত মহাভারতে অন্য স্থানে অন্য গ্রন্থের যে উল্লেখ আছে, তাহা কালনির্ণয়ার্থ কতটা বিশ্বসনীয় সে বিষয়ে সহজেই সংশয় উপস্থিত হয়। কারণ, যে অংশ কণ্ঠস্থ করা হয় না, তাহাতে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করা কিছু কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের মতে বর্ত্তমান গীতায় প্রদত্ত ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ একমাত্র বা অপূর্ব্ব সুতরাং অবিশ্বাস্য নহে ইহা দেখাইবার জন্য উপরি-উক্ত অন্য উল্লেখের উপযোগ করা কিছু অনুচিত হইবে না।

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকান্তর্গত পদসমূহের অর্থস্বারস্যের মীমাংসা করিয়া আমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি যে, ভগবদ্‌গীতায় বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রের কিংবা বেদান্তসূত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আসিবার—এবং তাহাও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারেই আসিবার আমার মতে এক মহত্ত্বপূর্ণ ও দৃঢ় কারণ আছে। ভগবদ্‌গীতায় বাসুদেবভক্তিতত্ত্ব মূল ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র-ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইলেও (আমি পূর্ব্বে প্রকরণসমূহে যেমন বলিয়া আসিয়াছি) চতুর্ব্যূহপাঞ্চরাত্র-ধর্ম্মের মূল জীব ও মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত ভগবদ্‌গীতার মান্য নহে যে, বাসুদেব

দাক্ষিণাত্য পাঠানুসারে মহাভারতের যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়াছেন তাহাতে শান্তিপর্ব্বের ২১২ অধ্যায়ে (বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম প্রকরণে) যুগারম্ভে বিভিন্ন শাস্ত্র ও ইতিহাস কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করিবার সময় নিম্নলিখিত ৩৪তম শ্লোকটি দিয়াছেন ঃ—

বেদান্তকর্ম্মযোগং চ বেদবিদ্‌ ব্রহ্মবিদ্‌ বিভুঃ।
দ্বৈপায়নো নিজগ্রাহ শিল্পশাস্ত্রং ভৃগুঃ পুনঃ॥

ইহাতে 'বেদান্তকর্ম্মযোগ' একবচনান্ত পদ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ 'বেদান্ত ও কর্ম্মযোগই' করিতে হয়। অথবা এইরূপও মনে হয় যে, 'বেদান্তং কর্ম্মযোগং চ' ইহাই মূল পাঠ হইবে' এবং লিখিবার সময় কিংবা ছাপিবার সময় 'ন্তং'-এর অনুস্বরটি বাদ পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বেদান্ত ও কর্ম্মযোগ এই দুই শাস্ত্র ব্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভৃগু শিল্পশাস্ত্র পাইয়াছিলেন, এইরূপ এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক বোম্বাই নগরের গণপৎ কৃষ্ণাজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত সংস্করণে এবং কলিকাতার সংস্করণেও পাওয়া যায় না। কুম্ভকোণ-সংস্করণে শান্তিপর্ব্বের ২১২ তম অধ্যায় বোম্বাই ও কলিকাতার সংস্করণে ২১০ তম অধ্যায় হইয়াছে। কুম্ভকোণ-পাঠের এই শ্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কৃষ্ণ গর্দে আমার নজরে আনায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার মতে, এই স্থানে কর্ম্মযোগ শব্দে গীতাই বিবক্ষিত ; এবং গীতা ও বেদান্তসূত্র এই দুয়েরই কর্ত্তৃত্ব এই শ্লোকে ব্যাসকেই প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারতের তিন সংস্করণের মধ্যে কেবল এক সংস্করণেই এই পাঠ পাওয়া যায় বলিয়া এই সম্বন্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাই বল না কেন, উহা হইতে এটুকু তো সিদ্ধ হয় যে, বেদান্ত ও কর্ম্মযোগের কর্ত্তা যে একই, আমাদের এই অনুমান কিছুই নূতন কিংবা ভিত্তিহীন নহে।

হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হইয়াছে। জীবাত্মা অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই (বেসূ. ২, ৩, ১৭), উহা সনাতন পরমাত্মারই নিত্য 'অংশ' (বেসূ. ২. ৩. ৪৩), ইহাই ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত। সেইজন্য, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ হওয়া অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মীয় জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে (বেসূ. ২. ২, ৪২), এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, মন জীবের এক ইন্দ্রিয় হওয়া প্রযুক্ত জীব হইতে প্রদ্যুম্নের (মন) উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব নহে (বেসূ. ২. ২. ৪৩) ; কারণ লোকব্যবহারের দিকে দেখিলে তো ইহাই মনে হয় যে, কর্ত্তা হইতে কারণ বা সাধন উৎপন্ন হয় না। এই প্রকার বাদরায়ণাচার্য্য ভাগবত-ধর্ম্মে বর্ণিত জীবোৎপত্তি যুক্তিপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সম্ভবত এই সম্বন্ধে ভাগবত-ধর্ম্মী এই উত্তর দিবেন যে, আমি বাসুদেব (ঈশ্বর), সংকর্ষণ (জীব), প্রদ্যুম্ন (মন) ও অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) এই চারিজনকেই সমান জ্ঞানী মনে করি এবং এক হইতে অপরের উৎপত্তিকে লাক্ষণিক ও গৌণ বিবেচনা করি। কিন্তু এইরূপ মনে করিলে, এক মুখ্য পরমেশ্বরের স্থানে চারি মুখ্য পরমেশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। তাই এই উত্তরও উপযোগী নহে এইরূপ ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে। এবং পরমেশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হয় এই মত বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, বাদরায়ণাচার্য্য এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. ২. ২. ৪৪. ৪৫)। ভাগবতধর্ম্মের কর্ম্মমূলক ভক্তিতত্ত্ব ভগবদ্‌গীতায় গৃহীত হইয়াছে সত্য বটে ; তথাপি গীতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উহা নিত্য পরমাত্মারই 'অংশ' (গী. ১৫. ৭)। জীবসম্বন্ধীয় এই সিদ্ধান্ত মূল ভাগবতধর্ম্ম হইতে গৃহীত হয় নাই, এই জন্য ইহার আধার কি তাহা বলা আবশ্যক ছিল ; কারণ এইরূপ না করিলে, এই ভুল ধারণা হইতে পারিত যে, চতুর্ব্যূহ ভাগবতধর্ম্মের প্রবৃত্তিমূলক ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উৎপত্তিসংক্রান্ত কল্পনাও গীতার অভিমত। অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যখন জীবাত্মার স্বরূপ বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল তখন অর্থাৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরম্ভেই ইহা স্পষ্ট বলিতে হইল যে, "ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবের স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের মত ভাগবতধর্ম্মের অনুরূপ নহে, বরঞ্চ উপনিষদের ঋষিদিগের মতানুযায়ী।" অধিকন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবত ইহাও বলিতে হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপপাদন করায়, সেই সমস্তের ব্রহ্মসূত্রে কৃত সমন্বয়ই (বেসূ. ২. ৩. ৪৩) আমার গ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভাগবতধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হয় সেই ভাবে ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ করা হইয়াছে। রামানুজাচার্য্য স্বকীয় বেদান্তসূত্রভাষ্যে উক্ত সূত্রের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন (বেসূ. রাভা, ২, ২. ৪২-৪৬ দেখুন)। কিন্তু আমাদের মতে, এই অর্থ ক্লিষ্ট অতএব অগ্রাহ্য। থিবো সাহেবের মনের ঝোঁক রামানুজভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের দিকেই ; কিন্তু থিবোর লেখা পড়িয়া তো ইহাই মনে হয় যে, তিনি এই মতবাদের ঠিক স্বরূপটি বুঝেন নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের শেষ অংশে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবতধর্ম্মের যে বর্ণনা আছে তাহাতে বাসুদেব হইতে জীব অর্থাৎ সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা নাই ; কিন্তু "যিনি বাসুদেব তিনিই (স এব) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ" এইরূপ প্রথমে উক্ত হইয়াছে (শা, ৩৩৪.২৮ ও ২৯ ; এবং ৩৩৯, ৩৯ ও ৭১ দেখুন) ; এবং ইহার পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন পর্য্যন্ত কেবল পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। এক স্থানে তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্ম্মকে কেহ চতুর্ব্যূহ, কেহ ত্রিব্যূহ, কেহ দ্বিব্যূহ এবং শেষে কেহ একব্যূহও মনে করেন (মভা.

শা, ৩৪৮. ৫৭)। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের এই নানা পক্ষ স্বীকার না করিয়া তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের যাহাতে মিল হইতে পারে এইরূপ একটি মতই গীতায় স্থির রাখা হইয়াছে। এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হইবে যে, ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ গীতায় কেন করা হইয়াছে ? অথবা, ইহা বলা বাহুল্য যে, মূল গীতায় এই একটি সংস্কারই সাধিত হইয়াছে।

ভাগ ৪—ভাগবত ধর্ম্মের উদয় ও গীতা

গীতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেরও প্রথমে বলিয়াছি যে, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভক্তির এবং বিশেষতঃ নিষ্কাম কর্ম্মের মিল স্থাপন করিয়া, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্মযোগের পূর্ণ সমর্থন করাই গীতাগ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এত বিষয়ের সমন্বয় করিবার গীতার পদ্ধতিটি যাঁহাদের সম্পূর্ণ হৃদ্গত হয় না, এবং এত বিষয়ের সমন্বয় করাই অসম্ভব বলিয়া যাঁহাদের প্রথম হইতেই ধারণা হয়, তাঁহাদের নিকট গীতার অনেক সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ যথা—এই আপত্তিকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই নির্গুণব্রহ্ম, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই উক্তি—এই সমস্ত সগুণ বাসুদেবই, সপ্তম অধ্যায়ের এই উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী ; এই প্রকার ভগবান একস্থলে বলিতেছেন যে, "আমার নিকট শত্রুমিত্র দুই-ই সমান" ৯.২৯), আবার অন্য স্থানে ইহাও বলিতেছেন যে' "জ্ঞানী ও ভক্তিমান পুরুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়" (৭. ১৭ ; ১২ ; ১২. ১৯)—এই দুই উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ। কিন্তু গীতারহস্যে আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, বস্তুত ইহা বিরোধ নহে, কিন্তু একই বিষয়সম্বন্ধে একবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, আর একবার ভক্তিদৃষ্টিতে বিচার করায়, আপাতত এই বিরোধী বিষয় বলা হইয়াছে মনে হইলেও, শেষে ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতায় উহাদের মিলও স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার পরেও কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্যক্ত পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার মিল স্থাপিত হইলেও মূল গীতায় এই মিল স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ মূলগীতা বর্ত্তমান গীতার ন্যায় পরস্পর বিরোধবহুল ছিল না, তাহার মধ্যে বেদান্তীরা কিংবা সাংখ্যশাস্ত্রাভিমানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ যথা—প্রো. গার্বে বলেন যে, মূল গীতায় কেবল সাংখ্য ও যোগেরই সহিত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তের সহিত এবং মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গের সহিত ভক্তির মিল স্থাপনের কাজ কেহ পরে করিয়াছেন। মূল গীতায় এই প্রকার যে শ্লোক পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার, নিজ মতানুসারে, এক তালিকাও তিনি জর্ম্মন ভাষায় অনুবাদিত নিজের গীতার শেষে দিয়াছেন ! আমার মতে এই সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। বৈদিক ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গের ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং গীতার 'সাংখ্য' ও 'যোগ' এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ ঠিক না বুঝিবার কারণে, এবং বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক খৃষ্টধর্ম্মেরই ইতিহাস উক্ত লেখকদিগের (প্রো. গার্বে প্রভৃতি) সম্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। মূলে খৃষ্টধর্ম্ম নিছক ভক্তিমূলক ছিল ; এবং গ্রীকদিগের এবং অন্যদের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উহার মিল স্থাপন করিবার কার্য্য পরে করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের কথা তাহা নহে। হিন্দুস্থানে ভক্তিমার্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মীমাংসকদিগের যজ্ঞমার্গ, উপনিষৎকারদিগের জ্ঞান, এবং সাংখ্য ও যোগ—এই সমস্ত পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রথম হইতেই

আমাদের দেশবাসীদের স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদিত এমন ভক্তিমার্গ কখনও মান্য হওয়া সম্ভব ছিল না, যাহা এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষত উপনিষদ্সমূহে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পৃথক। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, গীতার ধর্ম্মপ্রতিপাদনের স্বরূপ প্রথম হইতেই প্রায় বর্ত্তমান গীতার প্রতিপাদনের সমানই ছিল ইহা না মানিয়া থাকা যায় না। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টী অত্যন্ত গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া গীতাধর্ম্মের মূলস্বরূপ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আমাদের মতে কোন্ কোন্ বিষয় নিষ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

গীতারহস্যের দশম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ না ছিল ভক্তিপ্রধান, না ছিল জ্ঞানপ্রধান এবং না ছিল যোগপ্রধান ; কিন্তু উহা যজ্ঞময় অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ছিল, এবং বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে বিশেষভাবে এই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মমূলক ধর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরে এই ধর্ম্মই জৈমিনীয় মীমাংসাসূত্রে সুব্যবস্থিতরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম হইল 'মীমাংসকমার্গ'। কিন্তু 'মীমাংসক' এই নাম নূতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাগযজ্ঞাদিধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন ; এমন কি, ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে ইহাকে বৈদিকধর্ম্মের প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। 'মীমাংসকমার্গ' নাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে উহার নাম ছিল ত্রয়ীধর্ম্ম, অর্থাৎ তিন বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম্ম ; এবং এই নামই গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৯. ২০ ও ২১ দেখ)। কর্ম্মময় ত্রয়ীধর্ম্ম এইরূপ বহুল প্রচলিত থাকিলে পর, কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল যাগযজ্ঞাদির বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে ? জ্ঞানলাভ একটা মানসিক অবস্থা হওয়ায় পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার করা ব্যতীত জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, ইত্যাদি বিষয় ও কল্পনা বাহির হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে উহারই মধ্য হইতে ঔপনিষদিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইল। এই বিষয় ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের প্রারম্ভে প্রদত্ত অবতারণা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। এই ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানই পরে 'বেদান্ত' নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মীমাংসা শব্দের ন্যায় বেদান্ত নাম পরে প্রচলিত হইলেও ইহা বলা যায় না যে, ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা জ্ঞানমার্গও নূতন। ইহা সত্য যে, কর্ম্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয়ই প্রাচীন, এ কথা যেন মনে থাকে। 'কাপিল সাংখ্য' এই জ্ঞানমার্গেরই অপর কিন্তু স্বতন্ত্র, শাখা। গীতারহস্যে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতী, ওদিকে সাংখ্য দ্বৈতী ; এবং সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের বিচার মূলে ভিন্ন। কিন্তু ঔপনিষদিক অদ্বৈতী ব্রহ্মজ্ঞান এবং সাংখ্যের দ্বৈতী জ্ঞান, দুই-ই মূলে বিভিন্ন হইলেও কেবল জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দুই মার্গ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী—যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মমার্গের সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের মিল কিরূপে স্থাপন করা যাইবে, এই প্রশ্ন স্বভাবত উত্থিত হইল। এই কারণেই উপনিষদের কালেই এই বিষয়ে দুই পক্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ ও সাংখ্য বলিতে লাগিলেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে পর কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া শুদ্ধ প্রশস্ত নহে, কিন্তু আবশ্যকও। পক্ষান্তরে, ঈশাবাস্যাদি অন্য উপনিষৎ প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পরেও কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, বৈরাগ্যযোগে বুদ্ধিকে নিষ্কাম করিয়া জগতে ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। এই সকল উপনিষদের ভাষ্যসমূহে এই ভেদ দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণের শেষে যে বিচার আছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শাঙ্করভাষ্যের

এই সাম্প্রদায়িক অর্থ টানা-বোনা করিয়া করা ; এবং এইজন্য এই সকল উপনিষদের উপর স্বতন্ত্র রীতিতে বিচার করিবার সময় ঐ অর্থ গ্রাহ্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। শুদ্ধ যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানেরই মধ্যে মিল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে ; কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদের বিচার-আলোচনা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কাপিলসাংখ্যে প্রথম প্রথম স্বতন্ত্ররীতিতে উৎপন্ন ক্ষরাক্ষরজ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের সমন্বয়—যতটা সম্ভব—করিবারও প্রযত্ন এই সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকাদি প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহে কাপিল সাংখ্যজ্ঞানের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদে সাংখ্যদিগের পরিভাষা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, শেষে এক পরব্রহ্ম হইতেই সাংখ্যদিগের চতুর্বিংশ তত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাপি কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রও বৈরাগ্যমূলক অর্থাৎ কর্ম্মের বিরুদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধর্ম্মের তিন দল হইয়াছিল—(১) কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার মার্গ ; (২) জ্ঞান ও বৈরাগ্যযোগে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যমার্গ ; এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈরাগ্য বুদ্ধিতেই নিত্য কর্ম্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের মার্গ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানমার্গ হইতেই পরে অন্য দুই শাখা—যোগ ও ভক্তি—উৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্ম-চিন্তন অত্যন্ত আবশ্যক ; এবং এই চিন্তন, মনন ও ধ্যান করিবার জন্য চিত্তকে একাগ্র করা আবশ্যক ; এবং চিত্তকে স্থির করিবার জন্য পরব্রহ্মের কোন একটি সগুণ প্রতীক প্রথমে চোখের সম্মুখে রাখিবে। এই প্রকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে থাকিলে চিত্তের যে একাগ্রতা হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইতে লাগিল এবং চিত্তনিরোধরূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পড়িল ; এবং যখন সগুণ প্রতীকের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বরের মানবরূপধারী ব্যক্ত প্রতীকের উপাসনা আরম্ভ হইতে লাগিল, তখন শেষে ভক্তিমার্গ বাহির হইল। এই ভক্তিমার্গ ঔপনিষদিক জ্ঞান হইতে পৃথক, মাঝখান হইতে স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হয় নাই ; এবং ভক্তির কল্পনাও অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে নাই। সমস্ত উপনিষদ দেখিলে এই ক্রম দেখা যায় যে, প্রথমে ব্রহ্মচিন্তনের নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গসমূহের কিংবা ওঁকারের, পরে রুদ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি বৈদিক দেবতার, অথবা আকাশাদি সগুণ ব্যক্ত ব্রহ্মপ্রতীকের উপাসনা সুরু হয় ; এবং শেষে এই কারণেই অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই রাম, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব প্রভৃতির ভজনা, অর্থাৎ এক প্রকার উপাসনা, প্রচলিত হইয়াছে। উপনিষদসমূহের ভাষা হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উহাদের মধ্যে যোগতত্ত্বাদি যোগ সম্বন্ধীয় উপনিষদ এবং নৃসিংহতাপনী রামতাপনী প্রভৃতি ভক্তিসম্বন্ধীয় উপনিষৎ ছান্দোগ্যাদি উপনিষৎ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। অতএব ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, সমুচ্চয়ে—এই তিন দলের উদ্ভব হইবার পরেই যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যোগ ও ভক্তি, এই দুই সাধন এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। তাই, যোগপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান উপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের অন্তিম সাধ্য বলা হইয়াছে ; এবং এরূপ বর্ণনাও কয়েক স্থলে পাওয়া যায় যে, যে রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ ও বাসুদেব প্রভৃতির ভজনা করা হয়, তাহাও পরমাত্মার কিংবা পরব্রহ্মের রূপ (মৈত্র্য. ৭. ৭ ; রামপূ. ১৬ ; অমৃতবিন্দু. ২২. প্রভৃতি দেখুন)। সারকথা, বৈদিক ধর্ম্মে সময়ে সময়ে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা যে ধর্ম্মাঙ্গসকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং প্রাচীন কালে প্রচলিত ধর্ম্মাঙ্গের

সহিত নব ধর্ম্মাঙ্গের মিল করাই বৈদিক ধর্ম্মের অভিবৃদ্ধির আরম্ভ হইতে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ; এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিবার এই উদ্দেশ্যকেই স্বীকার করিয়া পরে স্মৃতিকারেরা আশ্রমব্যবস্থাধর্ম্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গসমূহের সমন্বয় করিবার এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ করিলে একমাত্র গীতাধর্ম্মই উক্ত পূর্ব্বাপর পদ্ধতিকে ছাড়িবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বলা সযুক্তিক নহে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, কাপিল সাংখ্য, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও ভক্তি, ইহাই বৈদিকধর্ম্মের মুখ্য মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাদের উৎপত্তিক্রমের সাধারণ ইতিহাস উপরে বলা হইয়াছে। এক্ষণে, গীতায় প্রতিপাদিত এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের মূল কি—অর্থাৎ ঐ প্রতিপাদন সাক্ষাৎ বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে গীতায় গৃহীত হইয়াছে কিংবা মাঝে তাহার আরও দুই এক সোপান আছে—তাহার বিচার করিব। শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারের সময় কঠাদি উপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় যেমনটি তেমনি গৃহীত হইয়াছে এবং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়পক্ষের প্রতিপাদন করিবার সময় জনকাদির ঔপনিষদিক দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। হা হইতে প্রতীত হয় যে, গীতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ অবলম্বনেই রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধর্ম্মের পরম্পরাতে তো কোথাও উপনিষদের উল্লেখ নাই। যেরূপ গীতায় দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ধরা হইয়াছে (গী. ৪. ৩৩), সেইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদেও একস্থানে (ছাং. ৩. ১৬, ১৭) মনুষ্যের জীবন এক প্রকার যজ্ঞই এইরূপ বলিয়া এই প্রকার যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার সময় "এই যজ্ঞবিদ্যা ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি, দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন" ইহাও উক্ত হইয়াছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণ একই মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য উভয়কে একই ব্যক্তি মানিয়া লইলেও, যে গীতা জ্ঞানযজ্ঞকে প্রধান মনে করেন সেই গীতায় ঘোর আঙ্গিরসের কোথাও উল্লেখ নাই এ কথা মনে রাখা উচিত। তাছাড়া, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, জনকের মার্গ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক হইলেও, সে সময়ে এই মার্গে ভক্তির সমাবেশ হয় নাই। তাই, ভক্তিযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পন্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের গণনা করা যাইতে পারে না—এবং তাহা গীতাতেও করা হয় নাই। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে উক্ত হইয়াছে (গী. ৪. ১-৩) যে, গীতাধর্ম্ম যুগারম্ভে ভগবান প্রথমে বিবস্বান্‌কে, বিবস্বান মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কালের হেরফেরে তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তাহা অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার বলিতে হইয়াছিল। গীতাধর্ম্মের পরম্পরা বুঝিবার পক্ষে এই শ্লোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ; কিন্তু টীকা-কারেরা উহাদের শব্দার্থ বলা ছাড়া বেশি কিছু খুলিয়া বলেন নাই ; এবং সেদিকে তাঁহাদের ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, গীতাধর্ম্ম মূলে কোন বিশিষ্ট পন্থার ছিল এরূপ বলিলে, উহা হইতে অন্য ধর্ম্মপন্থার ন্যূনাধিক লাঘব না হইয়া যায় না। কিন্তু আমি গীতারহস্যের আরম্ভে এবং গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকের টীকায় প্রমাণসহ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি যে, গীতার এই পরম্পরার মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে বর্ণিত ভাগবতধর্ম্মের পরম্পরায় অন্তিম ত্রেতাযুগের যে পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিল আছে। ভাগবতধর্ম্মের ও গীতাধর্ম্মের পর-

ম্পরার এই ঐক্য দেখিলে গীতাগ্রন্থকে ভাগবতধর্ম্মেরই গ্রন্থ বলিতে হয় ; এবং সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, "গীতায় ভাগবতধর্ম্মই বিবৃত হইয়াছে" (মভা. শাং. ৩৪৭. ১০) মহাভারতে প্রদত্ত বৈশম্পায়নের এই বাক্য হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। গীতা ঔপনিষদিক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে—উহাতে ভাগবতধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া গীতার যে কোন আলোচনা হইবে তাহা অপূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক হইবে তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব ভাগবতধর্ম্ম কখন্ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার মূলস্বরূপ কি ছিল ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় একালে উপলব্ধ হয়, তাহাদেরও বিচার সংক্ষেপে করিতে হইবে। এই ভাগবত ধর্ম্মেরই অন্য নাম ছিল—নারায়ণীয়, সাত্বত, পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম ইত্যাদি, তাহা গীতারহস্যে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উপনিষৎকালের পর ও বুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে অনেক গুলি লুপ্ত হওয়ায়, ভাগবতধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ যাহা এক্ষণে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গীতা ব্যতীত মুখ্য গ্রন্থ হইতেছে—মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ব্বের শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিরূপিত নারায়ণীয়োপাখ্যান (মভা. শা. ৩৩৪-৩৫১), শাণ্ডিল্যসূত্র, ভাগবত-পুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র, নারদসূত্র এবং রামানুজাচার্য্যাদির গ্রন্থ। তন্মধ্যে রামানুজাচার্য্যের গ্রন্থ তো প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মের বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের সহিত মিল স্থাপনের জন্য ১৩৩৫ বিক্রম সম্বতে (শালিবাহন শকের প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীতে) লিখিত হইয়াছে। তাই, ভাগবতধর্ম্মের মূলস্বরূপ স্থির করিবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায় না ; এবং মাধবাদি অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থেরও এই কথাই। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ; কিন্তু এই পুরাণের আরম্ভেই এই কথা আছে যে, (ভাগ. স্কং. ১ অ. ৪ ও ৫ দেখুন), মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও, নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক ভাগবতধর্ম্মের যে নিরূপণ করা হইয়াছে তাহাতে ভক্তির যথোচিত বর্ণনা নাই, এবং 'ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম্য শোভা পায় না' ইহা দেখিয়া ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া গেল ; এবং নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিপাদক ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই কথার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মূল অর্থাৎ মহাভারতের ভাগবতধর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্যের যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা কালান্তরে হ্রাস হইয়া এবং তাহার স্থানে ভক্তির প্রাধান্য যখন আসিল তখন ভাগবতধর্ম্মের এই অন্য স্বরূপের (অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের) প্রতিপাদন করিবার জন্য এই ভাগবত-পুরাণরূপ সুমধুর পুলীপিঠা পরে রচিত হইয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক ; এবং উহাতে দ্বাদশস্কন্ধীয় ভাগবতপুরাণের এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও মহাভারতের নামতঃ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (না. পং ২. ৭. ২৮-৩২ ; ৩. ১৪. ৭৩ ; এবং ৪. ৩. ১৫৪ দেখুন)। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ভাগবতধর্ম্মের মূলস্বরূপ স্থির করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবতপুরাণ অপেক্ষাও কম উপযোগী। নারদসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্র এই দুই গ্রন্থ নারদপঞ্চরাত্র অপেক্ষাও সম্ভবতঃ কিছু প্রাচীনতর ; কিন্তু নারদসূত্রে ব্যাস ও শুকের (না. সূ. ৮৩) উল্লেখ থাকায় উহা ভারত ও ভাগবতের পরবর্ত্তী ; এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে ভাগবদ্গীতার শ্লোকই গৃহীত হওয়ায় (শা. সূ. ৯. ১৫ ও ৮৩) এই সূত্র নারদসূত্রাপেক্ষা

(না. সূ. ৮৩) প্রাচীন হইলেও গীতা ও মহাভারতের যে পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ভাগবতধর্ম্মের মূল ও প্রাচীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণয় শেষে মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় আখ্যানের ভিত্তিতেই করিতে হয়। ভাগবতপুরাণ (১. ৩. ২৪) এবং নারদ-পঞ্চরাত্র (৪. ৩. ১৫৬-১৫৯ ; ৪. ৮, ৮১) এই দুই গ্রন্থে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণীয় আখ্যানে বর্ণিত দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের গণনা নাই—প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্ণের পর একেবারেই কল্কি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে (মভা. শাং ৩৩৯. ১০০)। ইহা হইতেও সিদ্ধ হয় যে, নারায়ণীয় আখ্যান ভাগবতপুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে প্রাচীন। এই নারায়ণীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পরব্রহ্মেরই অবতার যে নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষি, তাঁহারাই নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহাদের কথামত নারদ ঋষি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে পর সেখানে স্বয়ং ভগবান নারদকে এই ধর্ম্মের উপদেশ করেন। যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান থাকেন সেই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত, এবং সেই ক্ষীরসমুদ্র মেরুপর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত, ইত্যাদি নারায়ণীয় আখ্যানের অন্তর্গত বর্ণনা প্রাচীন পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডবর্ণনারই অনুযায়ী এবং সেই সম্বন্ধে আমাদের এখানে কাহারও কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই কথার বিপর্য্যয় করিয়া এই এক দীর্ঘ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ হইতে অর্থাৎ ভারতবর্ষবহির্ভূত কোন এক দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এবং ভক্তির এই তত্ত্ব তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মে প্রচলিত ছিল না, অতএব খৃষ্টানদেশ হইতেই ভক্তির কল্পনা ভাগবতধর্ম্মীদের মনে আসিয়াছিল। কিন্তু পাণিনি বাসুদেবভক্তিতত্ত্বের কথা অবগত ছিলেন এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেরও ভাগবতধর্ম্মের ও ভক্তির উল্লেখ আছে ; এবং পাণিনি ও বুদ্ধ ইঁহারা দুইজনেই খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন ইহা নির্ব্বিবাদ। এইজন্য বেবরের উক্ত সংশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এখন ভিত্তিহীন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরূপ ধর্ম্মাঙ্গ আমাদের এখানে জ্ঞানমূলক উপনিষদের পরে বাহির হইয়াছে ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই ইহা নির্ব্বিবাদরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জ্ঞানমূলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের পূর্ব্বে বাসুদেব ভক্তিমূলক ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইয়াছে। এখন কেবল ইহাই প্রশ্ন যে, উহা বুদ্ধের কত শতাব্দী * পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে ? পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মক উত্তর দিতে না পারিলেও মোটামুটি ধরণে এই কালের অনুমান করা অসম্ভবও নহে।

* ভক্তিমান্ (পালী—ভত্তিমা) শব্দ থেরগাথায় (শ্লো, ৩৭০) প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি জাতকেও ভক্তির উল্লেখ আছে। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ পালীপণ্ডিত সেনার্ট (Senart) 'বৌদ্ধধর্ম্মের মূল' এই বিষয়ের উপর ১৯০৯ অব্দে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। "No one will claim to derive from Buddhism, Vishnuism or the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower"........."To sum up, if there had not previously existed a religion made up of doctrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu-Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism would not have come to birth at all," সেনার্টের এই প্রবন্ধ, পুণায় প্রকাশিত *The Indian Interpreter* নামক মিশনরী ত্রৈমাসিকের অক্টোবর ১৯০৯ ও জানুয়ারী ১৯১০-এর সংখ্যায়

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহা প্রথমে লুপ্ত হইয়াছিল (গী. ৪. ২.)। ভাগবতধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে পরমেশ্বর বাসুদেব নামে, জীবাত্মা সংকর্ষণ নামে, মন প্রদ্যুম্ন নামে এবং অহঙ্কার অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাসুদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই নাম, সংকর্ষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের, এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের নাম। ইহা ব্যতীত এই ধর্ম্মের 'সাত্বত' বলিয়া যে আরও এক নাম আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবজাতিতে জন্মিয়াছিলেন সেই জাতির নাম। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কুলে ও জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রিয়মিত্র অর্জ্জুনকে উহার উপদেশ করিয়া থাকিবেন ; এবং ইহাই পৌরাণিক কথাতেও উক্ত হইয়াছে। এই কথাও প্রচলিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল না। ভাগবতধর্ম্মের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার ঐতিহাসিক উপপত্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে বোধ হয় তাহা নারায়ণীয় কিংবা পাঞ্চরাত্র নামে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং পরে সাত্বতজাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 'সাত্বত' নাম হইয়া থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণেরই অবতার মানিয়া লোকেরা এই ধর্ম্মকে 'ভাগবতধর্ম্ম' বলিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে। এই বিষয়ে ইহা মনে করিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে, তিন বা চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে এই ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় নিজের দিক হইতে কিছু না কিছু সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বস্তুত এরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণও নাই। মূলধর্ম্মে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট কিংবা মহম্মদ তো স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধর্ম্মের সংস্থাপক হইয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাদের ধর্ম্মে ভালমন্দ অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল ; কিন্তু সেই কারণে কেহ স্বীকার করেন না যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদ একাধিক ছিলেন। সেই প্রকার মূল ভাগবতধর্ম্ম পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগুলি শ্রীকৃষ্ণও হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে মানা যায় ? আমার মতে ইহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। যে কোন ধর্ম্মই হোক না কেন, কালের হেরফেরে তাহার রূপান্তর হওয়া খুবই স্বাভাবিক ; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খৃষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। * কোন কোন

ভাষান্তরে প্রকাশিত হয় ; এবং উপরি-প্রদত্ত বাক্য জানুয়ারীর সংখ্যায় পৃঃ ১৭৭ ও ১৭৮—পাওয়া যাইবে। ডাঃ বুহ্লরও বলিয়াছেন—The ancient Bhagabata, Satvata of Pancha-ratra sect devoted to the worship of Narayan and his deified teacher Krishna—Devakiputra dates from a period long anterior to the rise of Jainas in the 8th Century B. C."—*Indian Antiquary* Vol XXIII, (1894) P, 248, এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশিষ্টেরই ষষ্ঠ ভাগে করিয়াছি।

* শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পরাক্রম, ভক্তি ও বেদান্তের অতিরিক্ত গোপীদিগের রাসক্রীড়ার সমাবেশ হইয়া থাকে এবং এই সকল কথা পরস্পরবিরোধী, তাই মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, এবং গোকুলের কানাই ভিন্ন, এইরূপ আজকাল কতকগুলি বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই

ব্যক্তি—বিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক—এই তর্ক করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, যাদব ও পাণ্ডব, এবং ভারতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, এ সমস্ত কল্পিত কথা এবং কাহারো কাহারো মতে, মহাভারত তো অধ্যাত্মমূলক একটি বৃহৎ ও মহৎ রূপক। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, এই সংশয় যে ভিত্তিহীন তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কথার মূলে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, ইহা নির্ব্বিবাদ। সারকথা, শ্রীকৃষ্ণ চার পাঁচ জন নহে, তিনি কেবল একই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ইহাই আমার মত। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কালসম্বন্ধে বিচার করিবার সময় রা, ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, যাদব, পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ—ইহাদের কাল একই অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ ; পুরাণগণনানুসারে সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক চলিয়া গিয়াছে ; এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত কাল। * কিন্তু পাণ্ডবগণ হইতে শক-কাল পর্য্যন্ত আবির্ভূত রাজাদিগের পুরাণে বর্ণিত বংশাবলী দেখিলে এই কালের মিল দেখা যায় না। তাই, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এই যে বচন আছে, "পরীক্ষিত রাজার জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ কিংবা ১০১৫ বৎসর হয়" (ভাগ. ১২. ২. ২৬ ; ও বিষ্ণু. ৪. ২৪. ৩২), তাহারই প্রমাণমূলে বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও ইহাই কাল ; এবং এই কাল স্বীকার করিলে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ অব্দে অথবা বুদ্ধের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন, এইরূপ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিতে তাঁহার অনেক রূপান্তর দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে শেষে পরব্রহ্মরূপে কল্পিত হয়েন—এই সকল অবস্থার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা কাল অতিবাহিত হইয়া থাকিবে, এবং সেই জন্য ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব কাল এবং ভারতীয় যুদ্ধের কাল এক বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কিন্তু আপত্তি নিরর্থক। 'কাহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে ও কাহাকে মানিবে না' এই সম্বন্ধে আধুনিক তার্কিকদিগের ধারণা এবং দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোকদিগের ধারণার (গী. ১০. ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই রচিত

মতই ডাঃ ভাণ্ডারকর স্বকীয় 'বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি পন্থা' সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঠিক নহে। গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বর্ণনা আছে তাহা পরে আসে নাই, সে কথা নহে ; কিন্তু সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ নামের বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং শুধু কল্পনা ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণও নাই। তাছাড়া, গোপীদের কথা ভাগবত কালেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল এরূপও নহে ; কিন্তু শক-কালের আরম্ভে, অর্থাৎ আনুমানিক বিক্রম ১৩৬ সম্বতে অশ্বঘোষ লিখিত বুদ্ধচরিতে (৪. ১৪) এবং ভাসের বালচরিত নাটকেও (৩. ২) গোপীদের উল্লেখ আছে। অতএব এই বিষয়ে ভাণ্ডারকারের কথা অপেক্ষা, চিন্তামণি রাও বৈদ্যের কথাই আমার নিকট অধিক সযুক্তিক বলিয়া মনে হয়।

* রাওবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্যের এই মত তাঁহার মহাভারতসম্বন্ধীয় টীকাত্মক ইংরেজী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাছাড়া এই বিষয়ের উপরেই এখানকার, ডেক্যান কলেজের আনিভর্সরি প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও ইহার বিচার করা হইয়াছে।

উপনিষদসমূহে এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া যান (বৃ. ৪. ৫. ৬) ; এবং মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ, ইঁহারা ব্রহ্মই (মৈত্র্যু. ৭. ৭)। তবে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই কি ? ইতিহাসের দিকে দেখিলে বিশ্বসনীয় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও দেখা যায় যে, বুদ্ধ আপনাকে 'ব্রহ্মভূত' বলিতেন (সেলসুত্ত. ১৪ ; থেরগাথা ৮৩১) ; তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি দেবতার মান পাইতে আরম্ভ করেন ; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তিনি 'দেবাধিদেবের' কিংবা বৈদিক ধর্ম্মের পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ; এবং তাঁহার পূজাও সুরু হয়। খৃষ্টধর্ম্মের কথাও এইরূপ। ইহা সত্য যে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং ভাগবতধর্ম্মও নিবৃত্তিমূলক নহে। কিন্তু কেবল তাহারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের মূল ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভাগবতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণেরও প্রথম হইতেই ব্রহ্মের কিংবা দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কোনও বাধা উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের কাল এইরূপে স্থির করিলে পর উহাকেই ভাগবতধর্ম্মের ও আবির্ভাবকাল মনে করা প্রশস্ত ও সযুক্তিক। কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ঐরূপ মনে করিতে বিমুখ হইবার আরও কিছু কারণ আছে। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশের অদ্যাপি এই ধারণাই আছে যে, স্বয়ং ঋগ্‌বেদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব আন্দাজ ১৫০০ কিংবা বড় জোর ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। তাই তাঁহাদের নিজেদের দৃষ্টিতে ইহা বলা অসম্ভব মনে হয় যে, ভাগবতধর্ম্ম খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কারণ, বৈদিকধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে এই ক্রম নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, ঋগ্বেদের পর যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রতিপাদক যজুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তাহার পর জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ্ ও সাংখ্যশাস্ত্র এবং শেষে ভক্তিমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এবং শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ দেখিলেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঔপনিষদিক জ্ঞান, সাংখ্যশাস্ত্র, চিত্তনিরোধরূপ যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ, ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। কালের ইচ্ছামত টানাটানি করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, ঋগ্বেদের পর এবং ভাগবতধর্ম্ম উদয় হইবার পূর্ব্বে উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের আবির্ভাব ও বৃদ্ধির মধ্যে অন্যূন দশবারো শতাব্দী চলিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ আপনারই কালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ অব্দে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিলে, উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের অভিবৃদ্ধির পক্ষে উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে উপযুক্ত কালাবকাশ থাকে না। কারণ, এই সকল পণ্ডিত ঋগ্বেদের কালকেই খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ কিংবা ২০০০ অব্দের অধিক প্রাচীন মনে করেন না ; এই অবস্থায় তাঁহাদের ইহা মানিতে হয় যে, ভাগবতধর্ম্ম এক শত কিংবা বড়-জোর পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এইজন্য উপরিউক্ত উক্তি অনুসারে কোন-না-কোন শুষ্ক হেতু দর্শাইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম্মের সমকালীনতা অস্বীকার করেন, এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব বুদ্ধের পরে হইয়া থাকিবে, এইরূপ কথা বলিবার জন্যও উদ্যত। কিন্তু জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেই ভাগবতধর্ম্মের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভাগবতধর্ম্ম বুদ্ধ হইতে প্রাচীন। তাই ডাঃ বুহ্লার বলিয়াছেন যে, ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবকাল বুদ্ধের পরে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার বদলে,

আমার 'ওরায়ন' গ্রন্থের প্রতিপাদন * অনুসারে ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের কালই পিছনে হটাইয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ধাঁ করিয়া যাহা-তাহা একটা অনুমান করিয়া লইয়া বৈদিকগ্রন্থের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ভ্রমমূলক ; বৈদিককালের পূর্ব্ব সীমা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ বৎসরের কম ধরিতে পারা যায় না ; বেদের উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক বাক্যের প্রমাণমূলে এই সকল বিষয় আমি আমার 'ওরায়ন' গ্রন্থে সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছি ; এবং এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য হইয়াছে। ঋগ্বেদকালকে এইরূপে পিছাইয়া লইয়া গেলে বৈদিক ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গের অভিবৃদ্ধির পক্ষে যথোচিত কালাবকাশ পাওয়া যায় এবং ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবকালের সংকোচ করিবার কোনও কারণ থাকে না। মরাঠীভাষায় ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদের পর ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গণনা থাকায় উহাদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৫০০ অব্দ ধরিতে হয়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই যে, উত্তরায়ণ-স্থিতি হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার এই পদ্ধতি উপনিষদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। রামতাপনীর ন্যায় ভক্তিপ্রধান এবং যোগতত্ত্বের ন্যায় যোগ-প্রধান উপনিষদের ভাষা ও রচনা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না,—কেবল এই ভিত্তির উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদই বুদ্ধের অপেক্ষা চারিপাঁচ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। কিন্তু কালনির্ণয়ের উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেখিলে এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। জ্যোতিষের পদ্ধতিতে সমস্ত উপনিষদের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না সত্য, তথাপি মুখ্য মুখ্য উপনিষদের কাল স্থির করিবার পক্ষে এই পদ্ধতিই সর্ব্বাধিক উপযোগী। ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে, মৈত্র্যুপনিষৎ পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন, ইহা প্রোঃ মোক্ষমূলর বলিয়াছেন ; † কারণ এই উপনিষদে এরূপ কতকগুলি শব্দসন্ধির প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহা শুদ্ধ মৈত্রায়ণী সংহিতাতেই পাওয়া যায় এবং যাহার প্রচলন পাণিনির সময়ে রহিত হইয়া গিয়াছিল (অর্থাৎ যাহাকে ছান্দস বলা যায়)। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষৎ কিছু সর্ব্বপূর্ব্ব অর্থাৎ অতি প্রাচীন উপনিষৎ নহে। উহাতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কয়েক স্থানে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ ও ঈশাবাস্য উপনিষদসমূহের বাক্য এবং শ্লোকও উহাতে প্রমাণার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। হাঁ ইহা সত্য যে, এই সকল উপনিষদের নাম মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বাক্যের পূর্ব্বে "এবং হ্যাহ" কিংবা 'উক্তং চ' (=এইরূপ উক্ত হইয়াছে), এইপ্রকার পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই ঐ বাক্যসকল যে অন্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত, মৈত্র্যুপনিষদকারের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ; এবং ঐ সকল বাক্য কোন্ গ্রন্থের তাহা অন্য উপনিষদ্ দেখিলে সহজেই স্থির করা যায়। এক্ষণে এই মৈত্র্যুপনিষদে কালরূপ কিংবা সম্বৎসররূপ ব্রহ্মের বিচার করিবার সময় (মৈত্র্যু. ৬. ১৪) এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, "মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশের উপর আসা পর্য্যন্ত (মঘাদ্যং শ্রবিষ্ঠার্ধং)

---

* ডাঃ বুহ্লর *Indian Antiquary*, September 1894 Vol. XXIII. p 238-249 ইহাতে, 'ওরায়ন' গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা দেখ।

† See Sacred Books of the East series, Vol. XV. Intro pp. xlviii-lii.

দক্ষিণায়ন হয় ; এবং সার্প অর্থাৎ অশ্লেষা নক্ষত্র হইতে বিপরীতক্রমে (অর্থাৎ অশ্লেষা, পুষ্যা, ইত্যাদি ক্রমে) পিছনে গণিত হইলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক এই বচন তৎকালীন উত্তরায়ণ স্থিতিকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা হইতে এই উপনিষদের কালনির্ণয়ও গণিত-পদ্ধতিতে সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। মৈত্র্যুপনিষদে বর্ণিত এই উত্তরায়ণ-স্থিতি বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে কথিত উত্তরায়ণস্থিতির পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে হয় ; এবং মৈত্র্যুপনিষদে উহার আরম্ভ 'ধনিষ্ঠার্দ্ধ' হইতে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, মৈত্র্যুপনিষদের 'শ্রবিষ্ঠার্ধং, শব্দে যে 'অর্ধং' পদ আছে তাহার অর্থ 'ঠিক অর্দ্ধেক' করিতে হইবে, কিংবা "ধনিষ্ঠা ও শত-তারকার মধ্যে কোন স্থানে" এইরূপ করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই বলনা কেন, এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই যে বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্ব্বের উত্তরায়ণস্থিতি মৈত্র্যুপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাই তৎকালীন স্থিতি হইবে। তাই বলিতে হয় যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষকালের উত্তরায়ণ মৈত্র্যুপনিষৎকালীন উত্তরায়ণ অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছনে হটিয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্গণিত অনুসারে ইহা সিদ্ধ হয় যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষে * কথিত উত্তরায়ণস্থিতি খৃষ্টের প্রায় ১২০০ বা ১৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ; এবং উত্তরায়ণের অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িতে প্রায় ৪৮০ বৎসর লাগে ; তাই মৈত্র্যুপনিষৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৮০ হইতে ১৬৮০ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ গণিতের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। নিদানপক্ষে, এই উপনিষৎ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের যে পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন ছান্দোগ্যাদি যে সকল উপনিষদের উদ্ধৃতবাক্য মৈত্র্যুপনিষদে গৃহীত হইয়াছে সেগুলি উহা হইতেও প্রাচীন তাহা বলা বাহুল্য। সার কথা, এই সকল গ্রন্থের কাল নির্ণয় এই ভাবে হইয়া গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ খৃষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ; যজ্ঞযাগাদিবিষয়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থ খৃষ্টের প্রায় ২৫০০ এবং ছান্দোগ্যাদি জ্ঞানপ্রধান উপনিষৎ খৃষ্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। এখন, যে কারণে ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবকালকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই দিকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ আর থাকে না ; এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম্মকে গাভী ও বৎসের নৈসর্গিক যুগলের ন্যায় একই কালরজ্জুতে বাঁধিতে কোন ভয়ই দেখা যায় না ; এবং বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের বর্ণিত এবং অন্য ঐতিহাসিক অবস্থারও সহিত ঠিক্ ঠিক্ মিল হয়। এই সময়ে, বৈদিক কাল শেষ হইয়া সূত্র ও স্মৃতির কাল আরম্ভ হয়।

উপরি-উক্ত-কাল-গণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ অব্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত আটশো বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। এই কাল অতি প্রাচীন ; তথাপি ইহা উপরে বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের কর্ম্মমার্গ ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন এবং উপনিষদের ও সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞানও ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবের

* বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালসম্বন্ধীয় বিচার আমার Orion (ওরায়ণ) নামক ইংরেজী গ্রন্থে এবং মারাঠীতে ৺শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে" (পৃ. ৮৭-৯৪ ও ১২৭-১৩৯) করা হইয়াছে তাহা দেখুন। তাহাতেই উত্তরায়ণ অনুসারে বৈদিক গ্রন্থের কালসম্বন্ধেও বিচার করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়া সর্ব্বমান্য হইয়াছিল। এই অবস্থায় এরূপ কল্পনা করা আমার মতে সর্ব্বথা অনুচিত যে, উক্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মাঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চতুর ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবেন, কিংবা তাহা করিলেও এই ধর্ম্ম তৎকালীন রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের নিকট মান্য হইয়া লোকের মধ্যে উহার প্রসার হইয়া থাকিবে। খৃষ্ট স্বকীয় ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মের উপদেশ সর্ব্বপ্রথম যে ইহুদিলোকের মধ্যে করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রসার না হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাঁহার নিজধর্ম্মের মিল করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবল ইহা দেখাইলে খৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশসম্বন্ধীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারিত যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারে যে কর্ম্মময় ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহারই জন্য তাঁহার ভক্তিমার্গও বাহির হইয়াছে ; এবং তিনি এইটুকু চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের এই বৃত্তান্তের সহিত ভাগবত-ধর্ম্মের ইতিহাস তুলনা করিবার সময় একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভাগবত-ধর্ম্ম যে লোকের মধ্যে এবং যে কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই লোকের মধ্যে সেই কালে শুধু কর্ম্মমার্গই নহে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্য শাস্ত্রেরও পুরা-পুরি পরিচয় ছিল ; এবং তিন ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিতেও তাহারা শিখিয়াছিল। এরূপ লোকের নিকট ইহা বলা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইত না যে, "তোমার কর্ম্মকাণ্ড কিংবা ঔপনিষদিক ও সাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়া দাও, আর কেবল ভাগবত ধর্ম্মই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার কর"। ব্রাহ্মণাদি বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ও তৎকালে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল কি? উপনিষদের কিংবা সাংখ্যশাস্ত্রের জ্ঞান কি নিরর্থক? ভক্তি ও চিত্তনিরোধরূপ যোগের মিল কিরূপে হইতে পারে?—ইত্যাদি প্রশ্ন যাহা সহজভাবে তখন উত্থিত হইয়াছিল তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের প্রসার হওয়াও কখনই সম্ভব ছিল না। তাই ন্যায়তঃ ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ভাগবতধর্ম্মে প্রথম হইতেই করা আবশ্যক ছিল ; এবং মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যান হইতেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। এই আখ্যানে ভাগবতধর্ম্মের সঙ্গে ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান এবং সাংখ্যপ্রতিপাদিত ক্ষরাক্ষর-বিচারের মিল স্থাপন করা হইয়াছে ; এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "চার বেদ এবং সাংখ্য বা যোগ এই পাঁচেরই তাহার (ভাগবতধর্ম্ম) মধ্যে সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম" (মভা. শাং, ৩৩৯. ১০৭) ; এবং "বেদারণ্যকসমেত (অর্থাৎ উপনিষৎসমূহকেও লইয়া) এই সমস্ত (শাস্ত্র) পরস্পরের অঙ্গ" (শাং. ৩৪৮. ৮২)। 'পাঞ্চরাত্র' শব্দের এই নিরুক্তি ব্যাকরণদৃষ্টিতে শুদ্ধ না হইলেও উহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সমন্বয় ভাগবতধর্ম্মে আরম্ভ হইতেই করা হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করাই কিছু ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য বিশেষত্ব নহে। ভক্তির ধর্ম্মতত্ত্ব ভাগবতধর্ম্মই যে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন তাহা নহে। মৈত্র্যুপনিষদের উপরিপ্রদত্ত বাক্য হইতে (মৈত্র্য. ৭. ৭) স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, রুদ্রের কিংবা বিষ্ণুর কোন-না-কোন স্বরূপের উপাসনা ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল ; এবং উপাস্য যাহাই হউক না কেন, উহা ব্রহ্মেরই প্রতীক কিংবা একপ্রকার রূপ, এই কল্পনাও পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল। রুদ্রাদি উপাস্যের পরিবর্ত্তে বাসুদেব উপাস্য বলিয়া ভাগবতধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু ভক্তি যে কোন

দেবতাকে করিলেও তাহা এক ভগবানকেই করা হয়—রুদ্র ও ভগবান বিভিন্ন নহেন, ইহা গীতায় ও নারায়ণীয় উপাখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে (গী ৯. ২৩. ; মভা. শাং. ৩৪১. ২০-৩৬ দেখুন)। তাই, শুদ্ধ বাসুদেবভক্তি ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া মানা যায় না। যে সাত্বতজাতির মধ্যে ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই জাতির সাত্যকি আদি ব্যক্তি, পরম ভগবদ্ভক্ত ভীষ্মার্জ্জুন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও খুব পরাক্রমী ছিলেন এবং অন্যের দ্বারা পরাক্রমের কার্য্য করাইবার লোক ছিলেন। এইজন্য অন্য ভগবদ্ভক্তের উচিত যে, তাহারাও এই আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতুর্ব্বর্ণ্যানুসারে যুদ্ধাদি সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে—ইহাই মূল ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য বিষয় ছিল। ভক্তি-তত্ত্ব স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে সংসারত্যাগী ব্যক্তি তখন একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা কিছু সাত্বতদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব নহে। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর জ্ঞান হইলে পর ভগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের ধারণপোষণার্থ সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সার। উপনিষৎকালে জনক প্রভৃতিই ইহাই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কাম ধর্ম্ম করা অনুচিত নহে। কিন্তু সে সময় তাহার মধ্যে ভক্তির সমাবেশ করা হয় নাই; তাছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর কর্ম্ম করা কিংবা না করা, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্বিত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক বলিয়া ধরা হইত (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। বৈদিক ধর্ম্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্ম্ম এই একটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং স্মার্ত্তধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন কাজ করিয়াছেন যে, উহা (ভাগবতধর্ম্ম) আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবৃত্তি অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মমূলক প্রবৃত্তিমার্গকে (নৈষ্কর্ম্ম্য) অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের সহিত শুদ্ধ নহে, ভক্তিরও সহিত কর্ম্মের উচিত মিলন স্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক নর ও নারায়ণ ঋষিও এইরূপই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের ন্যায় সকলেরই এইরূপ কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য (উদ্যো. ৪৮. ২১, ২২)। নারায়ণীয় আখ্যানে তো ভাগবতধর্ম্মের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, "প্রবৃত্তি-লক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ" (মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১)—অর্থাৎ নারায়ণীয় কিংবা ভাগবতধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বা কর্ম্মমূলক। নারায়ণীয় কিংবা মূল ভাগবতধর্ম্মের যে নিষ্কাম প্রবৃত্তিতত্ত্ব তাহারই নাম 'নৈষ্কর্ম্ম্য', এবং ইহাই মূল ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব। কিন্তু ভাগবত পুরাণে দেখা যায় যে, পরে কালান্তরে এই তত্ত্ব মন্দীভূত হইতে লাগিলে এই ধর্ম্মে বৈরাগ্যমূলক বাসুদেবভক্তিকে শ্রেষ্ঠ মানা যাইতে লাগিল। নারদ-পঞ্চরাত্রে তো ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধর্ম্মে মন্ত্রতন্ত্রেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত এই ধর্ম্মের মূল স্বরূপ নহে, ইহা ভাগবত হইতেই স্পষ্টই প্রকাশ পায়। যেখানে নারায়ণীয় কিংবা সাত্বত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সাত্বত ধর্ম্ম কিংবা নারায়ণ ঋষির ধর্ম্ম (অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম) 'নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণ' বলিয়া ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে (ভাগ ১. ৩. ৮ ও ১১. ৪. ৬)। এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, এই নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্মে ভক্তির যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, ভক্তিপ্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত করা আবশ্যক হইল (ভাগ. ১. ৫. ১২)। ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হয় যে, মূল ভাগবতধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্মপ্রধান অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মপ্রধান ছিল,

কিন্তু পরে কালান্তরে তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তিপ্রধান হইয়া দাঁড়ায়। গীতারহস্যে এইরূপ ঐতিহাসিক প্রশ্নসমূহের বিচার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য মিল-রক্ষাকারী মূল ভাগবতধর্ম্ম ও আশ্রমব্যবস্থারূপ স্মার্ত্তমার্গের ভেদ কি কেবল সন্ন্যাসপ্রধান জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারে ভাগবতধর্ম্মের কর্ম্মযোগ পিছাইয়া পড়িয়া উহা ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির স্বরূপই কিরূপে প্রাপ্ত হইল; এবং বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের পর যে বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় তো শেষে ভগবদ্গীতাকেই সন্ন্যাসপ্রধান, আবার কোন সম্প্রদায় কেবল ভক্তি-প্রধান এবং কতকগুলি বিশিষ্টাদ্বৈত-মূলক স্বরূপ কিরূপে দিয়াছিল।

উপরি-প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হইতে জানা যাইবে যে, বৈদিক ধর্ম্মের সনাতন প্রবাহে ভাগবতধর্ম্মের কবে আবির্ভাব হইল, এবং প্রথমে উহা প্রবৃত্তিপ্রধান বা কর্ম্মপ্রধান হইলেও পরে তাহাতে ভক্তিপ্রধান এবং শেষে রামানুজাচার্য্যের কালে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বরূপ কিরূপে আসিল। ভাগবতধর্ম্মের এই বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মপ্রধান যে স্বরূপ তাহাই গীতাধর্ম্মের স্বরূপ। এক্ষণে এই প্রকার মূল-গীতার কালসম্বন্ধে কি অনুমান করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ ও ভারতীয় যুদ্ধের কাল একই অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ অব্দ হইলেও মূলগীতা ও মূলভারত—ভাগবতধর্ম্মের এই দুই প্রধান গ্রন্থও যে সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না। কোন ধর্ম্মপন্থা বাহির হইলে তখনই তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রস্তুত হয় না। ভারত ও গীতা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান মহাভারতের আরম্ভে আছে যে, ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া গেলে যখন পাণ্ডবদিগের পৌত্র জনমেজয় সর্পসত্র করিতেছিলেন, তখন সেখানে বৈশম্পায়ন তাঁহার নিকট গীতা-সহিত ভারত সর্ব্বপ্রথম বিবৃত করেন; এবং পরে যখন তাহাই সৌতি শৌনককে শোনান, তখন হইতেই ভারত প্রচলিত হয়। সৌতি প্রভৃতি পৌরাণিকদিগের মুখ হইতে বাহির হইয়া পরে ভারতের কাব্যগ্রন্থের স্থায়ী স্বরূপ লাভ করিতে মধ্যে কতকটা সময় যে অতিবাহিত হইয়া থাকিবে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু সে কতটা সময় তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করিবার এখন কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় যদি স্বীকার করা যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধের পর প্রায় পাঁচশো বৎসরের ভিতরেই আর্ষ মহাকাব্যাত্মক মূল ভারত রচিত হইয়া থাকিবে, এরূপ মনে করিতে বিশেষ সাহসের দরকার হইবে না। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর ইহা অপেক্ষাও শীঘ্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন আর্ষ মহাকাব্যে নায়কের শুদ্ধ পরাক্রমেরই বর্ণনা করিলে চলে না; কিন্তু তাহাতে ইহাও দেখাইতে হয় যে, নায়ক যাহা কিছু করেন তাহা উচিত বা অনুচিত; অধিক কি, নায়কের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করা যে আর্ষ মহাকাব্যের এক মুখ্য অংশ—তাহা সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সাহিত্যের এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জানা যায়। অর্ব্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, নায়কের কার্য্যের সমর্থন শুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। কিন্তু প্রাচীন-কালে, ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে পৃথক্ ভেদ মানা যাইত না, অতএব ধর্ম্মদৃষ্টি ব্যতীত উক্ত সমর্থনের অন্য মার্গ ছিল না। আবার, ভারতের নায়কদিগের গ্রাহ্য কিংবা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহারই প্রমাণমূলে তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করাও আবশ্যক ছিল। তাহা ছাড়া, আরও এক কারণ এই যে, ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত তৎকালে প্রচলিত

অন্য বৈদিক ধর্ম্মপন্থা ন্যূনাধিক পরিমাণে কিংবা সর্ব্বাংশে নিবৃত্তিমূলক ছিল, তাই তদন্তর্গত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রমাণে ভারতের নায়কদিগের পরাক্রমের পূর্ণরূপে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। অতএব মহাকাব্যাত্মক মূল ভারতেই কর্ম্মযোগমূলক ভাগবতধর্ম্মের নিরূপণ করা আবশ্যক ছিল। ইহাই মূলগীতা; এবং ভাগবতধর্ম্মের মূল স্বরূপের সোপপত্তিক প্রতিপাদন করিবার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ না হইলেও ইহা আদিগ্রন্থাদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতর এবং ইহার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৯০০ বৎসর হইবে, এই একটা স্থূল অনুমান করিতে কোন বাধা নাই। গীতা এইরূপে ভাগবতধর্ম্মমূলক প্রথম গ্রন্থ না হইলেও উহা মুখ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি; তাই উহাতে প্রতিপাদিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তৎকালে প্রচলিত অন্য ধর্ম্মপন্থার সহিত—অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত, ঔপনিষদিক জ্ঞানের সহিত, সাংখ্যের সহিত, চিত্তনিরোধরূপ যোগের সহিত এবং ভক্তিরও সহিত—অবিরুদ্ধ, ইহা দেখান আবশ্যক হইয়াছিল। অধিক কি, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন বলিলেও চলে। বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হওয়ায় মূল গীতায় উহাদের প্রতিপাদন আসিতে পারে না; এবং এই কারণেই গীতায় বেদান্ত পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ সংশয় করিয়া থাকেন। কিন্তু পদ্ধতিবদ্ধ বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হইলেও উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে খুবই প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ—এবং এই বিষয়ে আমি উপরে বলিয়াছি। তাই এই বিষয় মূল গীতায় আসিলে কালদৃষ্টিতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তথাপি মূল-ভারত যখন মহাভারতে পরিণত হইল তখন মূলগীতায় একেবারেই কোন বদল হয় নাই এ কথাও আমি বলি না। যে কোন ধর্ম্মপন্থা ধর না কেন, তাহার ইতিহাসে তো ইহাই দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ হইয়া অনেক উপপন্থা বাহির হয়। ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। নারায়ণীয় উপাখ্যান এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মভা. শা. ৩৪৮. ৫৭) যে, কোন কোন লোক ভাগবতধর্ম্মকে চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই প্রকার চারি ব্যূহের; আবার কেহ কেহ ত্রিব্যূহ, দ্বিব্যূহ বা এক ব্যূহই মনে করিয়া থাকেন। পরে এই প্রকার আরও অনেক মতভেদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সেইরূপ, ঔপনিষদিক সাংখ্যজ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেই চলিয়াছিল। তাই মূলগীতায় যাহা কিছু বিভিন্নতা আছে, তাহা দূর হইয়া বৃদ্ধিশীল জড়ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানের সহিত ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ মিল হইয়া যায়, এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অস্বাভাবিক কিংবা মূল গীতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধও ছিল না। সেইজন্যই বর্ত্তমান গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আসিয়াছে ইহা পূর্ব্বে "গীতা ও ব্রহ্মসূত্র" শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই প্রকার অন্য পরিবর্ত্তনও মূল গীতায় হইয়া থাকিবে। কিন্তু মূল গীতাগ্রন্থে এই প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়াও সম্ভব ছিল না। বর্ত্তমানে গীতার যে প্রামাণিকতা আছে তাহা হইতে মনে হয় না যে, উহা ঐ বর্ত্তমান মহাভারতের পরে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে "স্মৃতি" শব্দে গীতাকে প্রমাণ ধরা হইয়াছে ইহা উপরে উক্ত হইয়াছে। মূল-ভারত মহাভারত হইবার সময় যদি মূল-গীতাতেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে এই প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কোন বাধা আসিতই। কিন্তু তাহা না হইয়া গীতাগ্রন্থের প্রামাণ্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাই এই অনুমানই করিতে হয় যে, মূল-গীতায় যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বড়

রকমের নহে, কিন্তু মূল গ্রন্থের অর্থ যাহাতে পরিস্ফুট হয় এই প্রকারের হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন পুরাণে বর্ত্তমান ভগবদ্‌গীতার ধরণে যে অনেক গীতা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উক্ত প্রকারে মূল গীতা যে স্বরূপ একবার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে—উহার পরে উহাতে কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। কারণ, এই সমস্ত পুরাণের মধ্যে অতি প্রাচীন পুরাণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই বর্ত্তমান গীতা যদি সম্পূর্ণ প্রমাণভূত (সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়) না হইয়া থাকিত তবে সেই নমুনাদৃষ্টে অন্য গীতা বিবৃত করিবার কল্পনাও মনে আসা সম্ভব ছিল না। সেইরূপ আবার, গীতায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা একই গীতার শব্দসমূহকে টানাবোনা করিয়া, গীতার্থ নিজ নিজ সম্প্রদায়েরই অনুকূল দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও কোন কারণ থাকিত না। বর্ত্তমান গীতার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী দেখিয়া কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতেও পরে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই বিরোধ বাস্তবিক নহে; ধর্ম্মপ্রতিপাদক পূর্ব্বাপর বৈদিক পদ্ধতির স্বরূপটি ঠিক লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি প্রথমেই বলিয়া দিয়াছি। সারকথা, উপর্যুক্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের বিশেষ সমর্থক ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশো বৎসর পরে, (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৯০০ বৎসর) ঐ মূল ভাগবতধর্ম্মেরই প্রতিপাদক মূলভারত ও মূলগীতা রচিত হয়; এবং ভারতের মহাভারত হইবার সময় এই মূল গীতায় তদর্থপোষক কিছু সংস্কার সাধিত হইলেও উহার প্রকৃতস্বরূপ তখনও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই; এবং বর্ত্তমান মহাভারতে গীতা সংযোজিত হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে কোন নূতন পরিবর্ত্তন হয় নাই—এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। মূল গীতা এবং মূল ভারতের স্বরূপ ও কালসম্বন্ধীয় এই নির্ণয় স্বভাবত মোটামুটিভাবে ও আন্দাজে করা হইয়াছে। কারণ এ সময়ে উহার জন্য কোন বিশেষ উপায় আমাদের উপলব্ধ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারত এবং বর্ত্তমান গীতার কথা সেরূপ নহে; কারণ ইহাদের কাল-নির্ণয় করিবার অনেক উপায় আছে। তাই এই বিষয়ের আলোচনা পরবর্ত্তী ভাগে স্বতন্ত্ররূপে করিয়াছি। এখানে পাঠকগণের মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান গীতা ও বর্ত্তমান মহাভারত এই দুইটি সেই গ্রন্থই, যাহার মূলস্বরূপে কালান্তরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং এক্ষণে গীতা ও মহাভারতের আকারে আমরা যাহা পাইয়াছি; এগুলি তৎপূর্ব্বের মূল গ্রন্থ নহে।

ভাগ ৫—বর্ত্তমান গীতার কাল

ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্‌গীতা ভাগবতধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ, এবং এই ভাগবতধর্ম্ম খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়; এবং ইহাও মোটামুটি-ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, কয়েক শতাব্দী পরে মূল গীতা বাহির হইয়া থাকিবে। উহার এবং ইহাও বলিয়াছি যে, মূল ভাগবতধর্ম্ম নিষ্কামপ্রধান হইলেও পরে ভক্তিপ্রধান-স্বরূপ হইয়া শেষে উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতেরও সমাবেশ হইয়াছে। মূল গীতা এবং মূল ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য বিবরণ অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে তো

পাওয়া যায় না ; এবং এই দশাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্ত্তমান গীতারও ছিল। কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকর, ৺ কাশীনাথপন্ত তৈলং, ৺ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এবং রাওবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তিগণের উদ্যোগে বর্ত্তমান মহাভারতের এবং বর্ত্তমান গীতার কালনির্ণয় সম্বন্ধে অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে ; এবং সম্প্রতি, আরও দুই একটা প্রমাণ ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত একত্র করিয়া, এবং আমার ধারণা অনুসারে তাহার মধ্যে আরও যাহা কিছু দিবার আছে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়া পরিশিষ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে লিখিয়াছি। এই পরিশিষ্ট প্রকরণের আরম্ভেই ইহা আমি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্ত্তমান গীতা, এই দুই গ্রন্থ এক হাতেরই রচনা। এই দুই গ্রন্থ একই হাতের সুতরাং একই কালের বলিয়া স্বীকার করিলে, মহাভারতের কাল হইতে গীতার কালও সহজেই নির্ণয় হয়। তাই, এই ভাগে প্রথমে বর্ত্তমান মহাভারতের কাল স্থির করিবার জন্য যে প্রমাণ অত্যন্ত প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর স্বতন্ত্র-রূপে বর্ত্তমান গীতার কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, মহাভারতের কালনির্ণয় করিবার প্রমাণগুলি কেহ সন্দেহমূলক মনে করিলেও তজ্জন্য গীতার কালনির্ণয়ে বাধা কোন হইবে না।

মহাভারত-কালনির্ণয়—মহাভারত-গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং মহাভারতেই লিখিত হইয়াছে যে, উহা লক্ষ শ্লোকাত্মক। কিন্তু রাওবাহাদুর বৈদ্য মহাভারতের স্বকীয় টীকাত্মক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে দেখাইয়াছেন যে, এক্ষণে মহাভারতের যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে এই লক্ষ শ্লোক অপেক্ষা কিছু কমবেশী হইয়া পড়িয়াছে, এবং উহার মধ্যে হরিবংশের শ্লোক সমাবেশ করিলেও লক্ষ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয় না। * তথাপি ভারত মহাভারতে পরিণত হইবার পর যে বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা বর্ত্তমান মহাভারতেরই সদৃশ হইবে এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই। এই মহাভারতে যাস্কের নিরুক্ত ও মনুসংহিতার উল্লেখ এবং ভগবদ্‌গীতাতে আবার ব্রহ্মসূত্রেরও উল্লেখ আছে, ইহা উপরে বলিয়াছি। এক্ষণে ইহা ব্যতীত মহাভারতের কালনির্ণয়ার্থ যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

(১) আঠারো পর্ব্বের এই গ্রন্থ এবং হরিবংশ, এই দুই সম্বৎ ৫৩৫ ও ৬৩৫ অব্দের ভিতর জাবা ও বালীদ্বীপে ছিল, এবং তত্রত্য প্রাচীন 'কবি' নামক ভাষায় তাহার ভাষান্তর হইয়াছিল ; এই ভাষান্তরের আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাসী, মুষল প্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই আট পর্ব্ব বালীদ্বীপে এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটা ছাপাও হইয়াছে। কিন্তু ভাষান্তর 'কবি'-ভাষাতে হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে মহাভারতের মূল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদ্যোগ-পর্ব্বের শ্লোক আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি। ঐ সমস্ত শ্লোক বর্ত্তমান মহাভারতের কলিকাতা সংস্করণের উদ্যোগ পর্ব্বের অধ্যায়ে—মধ্যে মধ্যে ক্রমশঃ—পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পূর্ব্বে প্রায় দুই

* *The Mahabharat : a criticism* P. 185. রা. ব. বৈদ্যের মহাভারতসম্বন্ধীয় যে টীকাত্মক পুস্তকের আমি কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই পুস্তক।

শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাইত। কারণ তাহা না হইলে উহা জাবা ও বালীদ্বীপে' লইয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না। তিব্বতীয় ভাষাতেও মহাভারতের এক ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু ইহা উহার পরবর্ত্তী। *

(২) চেদি-সম্বৎ ১৯৭ অর্থাৎ বিক্রমী ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের সময়ের এক শিলালিপি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, মহাভারত গ্রন্থে তৎকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল ; এবং ইহা হইতে দেখা যায় যে, বিক্রমী ৫০২ সম্বতের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। †

(৩) বর্ত্তমানে ভাস কবির যে নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। সুতরাং সেই সময়ে মহাভারত পাওয়া যাইত এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিত, ইহা সুস্পষ্ট। ভাস কবির বাল-চরিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকথা ও গোপীদিগের উল্লেখ আছে। তাই, বলিতে হয় যে, হরিবংশও তখন পাওয়া যাইত। ভাস কবি যে কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নির্ব্বিবাদ। ভাস কবির নাটক-সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে, ভাস চাণক্যেরও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কারণ, ভাস কবির নাটকের এক শ্লোক চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহা অন্য কাহারও। কিন্তু এই কাল সন্দিগ্ধ মনে করিলেও ভাস কবিকে যে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীর অধিক আধুনিক বলিয়া মানা যাইতে পারে না, তাহা আমার মতে নির্ব্বিবাদ।

(৪) অশ্বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালিবাহন শকের আরম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্যে স্থির হইয়াছে। এই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নামক দুই বৌদ্ধধর্ম্মীয় সংস্কৃত মহাকাব্য ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুয়েতেও ভারতীয় কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া বজ্রসূচিকোপনিষদের উপর ব্যাখ্যানরূপ অশ্বঘোষের আর এক গ্রন্থ আছে ; কিংবা বলিতে হয় যে, এই বজ্রসূচি উপনিষৎ তাঁহারই রচিত। প্রোঃ বেবর এই গ্রন্থ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে হরিবংশের অন্তর্গত শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যের মধ্যে "সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু" (হরি. ২৪. ২০ ও ২১) ইত্যাদি শ্লোক এবং স্বয়ং মহাভারতেরও অন্য কতকগুলি শ্লোক (যথা—মভা. শা. ২৬১. ১৭) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, শকারম্ভের পূর্ব্বে হরিবংশসমেত বর্ত্তমান লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত প্রচলিত ছিল।

(৫) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৩. ৪. ৪.) ভারত এবং মহাভারতের পৃথক পৃথক

* জাভাদ্বীপের মহাভারতসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত *The modern Review*, July 1914 pp, 32. 38-র মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখুন ; এবং তিব্বতী ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধীয় উল্লেখ Rockhill's *Life of the Budha*, p, 228 note-এ আছে।

† এই শিলালিপি *Inscriptionum Indicarum* নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পৃ. ১৩৪-তে সমগ্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে (পৃ. ১০৮) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

উল্লেখ আছে ; এবং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের এক স্থানে (২. ২. ২৬) মহাভারতের অন্তর্গত যযাতি উপাখ্যানের এক শ্লোক পাওয়া যায় (মভা. আ. ৭৮ ১০)। কিন্তু কেবল এই একটি শ্লোকের ভিত্তিতে বৌধায়নের পূর্ব্বে মহাভারত ছিল এই অনুমান দৃঢ় হয় না, এই কথা বুহ্লর সাহেব বলেন।* কিন্তু এই সন্দেহ ঠিক নহে ; কারণ, বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণুসহস্রনামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (বৌ. গৃ. শে. ১. ২২. ৮.) এবং পরে এই সূত্রেই (২. ২২. ৯) গীতার "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকও (গী. ৯. ২৬) পাওয়া যায়। বৌধায়নসূত্রের এই উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথকালে প্রকাশ করেন।† এই সকল উল্লেখ হইতে বলিতে হয় যে, বুহ্লর সাহেবের সন্দেহটা নির্ম্মূল, এবং আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন উভয়েই মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন। বৌধায়ন খৃষ্টের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন, বুহ্লরই তাহা অন্য প্রমাণাদি হইতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

(৬) স্বয়ং মহাভারতে যেখানে বিষ্ণু-অবতারের বর্ণনা আছে, সেখানে বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত নাই ; এবং নারায়ণীয় উপাখ্যানে (মভা. শাং. ৩৩৯. ১০০) যেখানে দশ অবতারের নাম আছে সেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরিয়া এবং কৃষ্ণের পরই একেবারে কল্কির উল্লেখ করিয়া দশসংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বনপর্ব্বে কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, "এড়ুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা" অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবালয়ের বদলে এড়ুক হইবে (মভা. বন. ১৬০. ৩৮)। এড়ুক অর্থে বুদ্ধের কেশ, দাঁত প্রভৃতি কোন স্মারক বস্তুকে জমির ভিতরে পুঁতিয়া তাহার উপর যে স্তম্ভ, মিনার বা ইমারৎ নির্ম্মিত হয়, তাহাই ; এখন ইহাকে "ডাগোবা" বলা হয়। ডাগোবা শব্দ সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' (=পালী ডাগব) শব্দের অপভ্রংশ, এবং 'ধাতু' অর্থে 'ভিতরে রাখা স্মারক বস্তু'। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে এই ডাগোবা পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, বুদ্ধ আবির্ভূত হইবার পরে—কিন্তু তাঁহার অবতার মধ্যে পরিগণিত হইবার পূর্ব্বেই—মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে মহাভারতে, 'বুদ্ধ' ও 'প্রতিবুদ্ধ' শব্দ অনেক স্থানে পাওয়া যায় (শাং. ১৯৪. ৫৮ ; ৩০৭. ৪৭. ; ৩৪৩. ৫২)। কিন্তু এখানে জ্ঞানী, জ্ঞানবান অথবা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি—এই অর্থই ঐ সকল শব্দের অভিপ্রেত। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ঐ শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু এরূপ মনে করিবার বলবৎ কারণও আছে যে, বৌদ্ধেরাই এই শব্দ বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

(৭) মহাভারতে নক্ষত্রগণনা অশ্বিনী প্রভৃতি হইতে নহে, কিন্তু কৃত্তিকা আদি হইতে হইয়াছে (মভা. অনু. ৬৪ ও ৮৯), এবং মেষ বৃষভাদি রাশির কোথাও উল্লেখ নাই—এই কথাটি কালনির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রীক লোকদিগের সহবাসে, মেষ-বৃষভাদি রাশি ভারতবর্ষে

* See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro, p. Xli.

† ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ-কালের সম্পূর্ণ প্রবন্ধ '*The Vedic Magazine and Gurukula Samachar*,' Vol. VII Nos. 6. 7. pp. 528-532 তে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রো. কালে ; উহা ভুল।

আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আলেক্‌জাণ্ডরের পূর্ব্বেই মহাভারত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে—শ্রবণা—আদি নক্ষত্রগণনার কথা। অনুগীতায় (মভা. অশ্ব. ৪৫. ২ ও আদি. ৭১. ৩৪) উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র শ্রবণাদি নক্ষত্রগণনা সুরু করেন ; এবং টীকাকার উহার এই অর্থ করিয়াছেন যে, তখন শ্রবণা নক্ষত্র হইতে উত্তরায়ণের সুরু হইত—ইহা ব্যতীত অন্য অর্থও ঠিক্ হয় না। বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালে উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে হইত। ধনিষ্ঠায় উত্তরায়ণ হইবার কাল জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অনুসারে শকের পূর্ব্বে প্রায় ১৫০০ বৎসর আসে ; এবং জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অনুসারে উত্তরায়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাতে হটিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। এই হিসাবে, শ্রবণারম্ভে উত্তরায়ণ হইবার কাল শকের পূর্ব্বে প্রায় ৫০০ বৎসর হয়। সার কথা, গণিতের দ্বারা দেখাইতে পারা যায় যে, শকের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই অনুমানই করিয়াছেন (ভা. জ্যো. পৃ. ৮৭-৯০. ১১১ ও ১৪৭ দেখুন)। এই প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, এই কারণে বর্ত্তমান মহাভারতের কাল শকপূর্ব্ব ৫০০ বৎসরের অধিক পিছাইয়া লইতেই পারা যায় না।

(৮) রাও বাহাদুর বৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টীকাত্মক ইংরাজী পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের দরবারে (খৃঃ পূঃ প্রায় ৩২০ বৎসর) অবস্থিত মেগস্থনীস্‌ নামক গ্রীক দূতের নিকট মহাভরতের কথা বিদিত ছিল। মেগস্থনীসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা হইতে অন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়া প্রথমে জর্ম্মণ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাকরিণ্ডল তাহারই ইংরাজী ভাষান্তর করিয়াছেন। এই পুস্তকে (পৃঃ ২০০-২০৫) উক্ত হইয়াছে যে, উহাতে বর্ণিত হেরক্লীজই শ্রীকৃষ্ণ এবং মেগস্থনীসের সময় মথুরানিবাসী শৌরসেনী লোকেরা তাঁহার পূজা করিত। * হেরক্লীজ নিজের আদিপুরুষ ডায়োনিসস্‌ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও তাহাতে লিখিত আছে। মহাভারতেও (মভা. অনু. ১৪৭. ২৫-৩৩) এইরূপ বর্ণনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দক্ষপ্রজাপতি হইতে পঞ্চদশ পুরুষ। এবং মেগস্থনীস কর্ণপ্রাবরণ, এক পাদ, ললাটাক্ষ প্রভৃতি অদ্ভুত লোকদিগের কথা (পৃঃ ৭৪), এবং ভূগর্ভ হইতে সোনা বাহির করিবার পিপীলিকার কথা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও মহাভারতেই পাওয়া যায় (মভা. ৫১

* See M'erindle's *Ancient India—Megasthenes and Arrian* pp. 200-205. মেগস্থনীসের এই কথা আজকাল এক গবেষণার দ্বারা আশ্চর্যরূপে দৃঢ় হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের Archeological Department এর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের Progress Report সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এক শিলালিপি আছে, উহা গোয়ালিয়র-রাজ্যের ভিল্‌সা সহরের নিকট বেসনগর গ্রামে খাম্বাবা বলিয়া এক গরুড়ধ্বজ স্তম্ভের উপর পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত স্তম্ভের সম্মুখে বাসুদেবের দেবালয়, হেলিয়োডোরস্ নামক হিন্দু-ভূত এক যবন অর্থাৎ গ্রীক গড়িয়াছিল এবং সেই যবন ভগভদ্র নামক রাজার দরবারে তক্ষশিলার অন্টিয়াল্‌কিডস্ নামক গ্রীক রাজার দূত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ বৎসরে অন্টিয়াল্‌কিডস্ রাজত্ব করিতেন ইহা তাঁহার মুদ্রা হইতে এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে। তখন, এই সময়ে বাসুদেব-ভক্তি প্রচলিত ছিল শুধু নহে, কিন্তু যবনও বাসুদেবের মন্দিরনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। মেগেস্থেনিসের শুধু নহে, বাসুদেবভক্তি পাণিনিরও বিদিত ছিল ইহা পূর্ব্বেই, বলিয়াছি।

৩৫২)। এই কথা এবং অন্য কথা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ নহে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পূজাও মেগাস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল।

উপরিপ্রদত্ত প্রমাণগুলি পরস্পরসাপেক্ষ নহে, স্বতন্ত্র- এই কথা মনে রাখিলে শকপূর্ব্ব প্রায় ৫০০ অব্দে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহা নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি হয়। ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন শ্লোক উহাতে ঢুকাইয়া দিয়া থাকিবে কিংবা উহা হইতে কিছু কিছু বাহির করিয়া দিয়াও থাকিবে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে কোন বিশিষ্ট শ্লোকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই,—প্রশ্ন তো সমগ্র গ্রন্থেরই সম্বন্ধে; এবং এই সমগ্র গ্রন্থ শকাব্দের অন্যূন পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে ইহা প্রমাণিত। এই প্রকরণের আরম্ভেই আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, গীতা সমগ্র মহাভারত গ্রন্থেরই এক অংশ এবং উহা মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অতএব মহাভারতের কাল গীতারও কাল ধরিতে হয়। সম্ভবতঃ মূল গীতা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ, এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি, উহাব পরম্পরা অনেক প্রাচীন-কাল পর্য্যন্ত পিছাইয়া লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু, যাহাই বলুননা কেন, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, গীতাব কালকে মহাভারতের পরে লইয়া যাওয়া যায় না। কেবল উপরি-উক্ত প্রমাণ অনুসারেই এই কথা সিদ্ধ হয় এরূপ নহে; ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রমাণও পাওয়া যায়। সে প্রমাণগুলি কি, এক্ষণে তাহা বলিতেছি।

গীতার কাল নির্ণয়ঃ উপরে যে সকল প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গীতার নামতঃ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হয় নাই। উহাতে গীতার কালনির্ণয় মহাভারতের কাল ধরিয়াই করা হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল প্রমাণে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে, ৺তৈলং গীতাকে আপস্তম্বের পূর্ব্বের অর্থাৎ খৃষ্ট অপেক্ষা অন্যূন তিন শত বৎরের অধিক প্রাচীন স্থির করিয়াছেন; এবং ডাঃ ভাণ্ডারকর স্বকীয় "বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি পন্থা" এই ইংরেজী গ্রন্থে প্রায় এই কালই স্বীকার করিয়াছেন। প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নির্দ্ধারিত কাল ঠিক নহে। তাঁহার মতে মূল গীতা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এবং খৃষ্টের পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐ গীতায় কিছু সংশোধন করা হয়। কিন্তু গার্বের এই কথা যে ঠিক নহে তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ঃ—

(১) গীতার উপর যে টীকা ও ভাষ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অত্যন্ত প্রাচীন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসুজাতীয় প্রকরণেরও ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অনুগীতা, মনু-বৃহস্পতি-সংবাদ এবং শুকানুপ্রশ্ন হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, মহাভারত ও গীতা এই দুই গ্রন্থ তাঁহার কালে প্রমাণ বলিয়া মানা হইত। এক সাম্প্রদায়িক শ্লোকের প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী সম্বৎ (৭১০ শকাব্দ) স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে,

* See Telang's *Bhagabad Gita* S. B. E. Vol. VIII. Intro. pp. 21 and 34; Dr. Bhandarkar's *Vaishnavism, Shaivism and other Sects, P. 13*; Dr. Garbe's *Die Bhagavadgita*, P. 64.

এই কাল আরও একশত বৎসর পিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ মহানুভাব পন্থার 'দর্শনপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "যুগ্মপয়োধিরসান্বিতশাকে" অর্থাৎ ৬৪২ শকে (বিক্রমী সম্বৎ ৭৭৭), শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুহাপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর ছিল; অতএব তাঁহার জন্মকাল ৬১০ শকাব্দ (সম্বৎ ৭৪৫) এইরূপ সিদ্ধ হয়। আমার মতে এই কালই প্রোফেসর পাঠক-নির্দ্ধারিত কাল অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার এখানে করিতে পারা যায় না। গীতার শাঙ্করভাষ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকাংশ টীকাকারদিগের উল্লেখ আছে, এবং উক্ত ভাষ্যের আরম্ভেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সকল টীকাকারদিগের মত খণ্ডন করিয়া আমি নূতন ভাষ্য লিখিয়াছি। অতএব আচার্য্যের জন্মকাল শকাব্দ ৬১০ই ধর, কিংবা ৭১০ই ধর, ইহা তো নির্ব্বিবাদ যে, ঐ সময়ের অন্ততঃ দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০০ শকের কাছাকাছি গীতা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাক্, ইহারও পূর্ব্বে কিরূপে এবং কতটা যাওয়া যাইতে পারে।

(২) গীতা কালিদাস ও বাণভট্টের যে বিদিত ছিল, তাহা ৺তৈলঙ্গ দেখাইয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশে (১০. ৩১) বিষ্ণুস্তুতিতে "অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে" এই শ্লোক আছে, তাহা গীতার "অনবাপ্তমবাপ্তব্যং" (৩. ২২) এই শ্লোকে পাওয়া যায়; এবং বাণভট্টের কাদম্বরীর "মহাভারতমিবানন্তগীতাকর্ণনানন্দিতনরং" এই এক শ্লেষপ্রধান বাক্যে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আসিয়াছে। কালিদাস এবং ভারবির স্পষ্ট উল্লেখ ৬৯১ সম্বতের (শকাব্দ ৫৫৬) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়; এবং এক্ষণে ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বাণভট্ট ৬৬৩ সম্বতের (৫২৮ শকাব্দের) কাছাকাছি হর্ষরাজার নিকটে ছিলেন। ৺পাণ্ডুরং গোবিন্দ শাস্ত্রী পারখী স্বকীয় বাণভট্টসম্বন্ধীয় এক মারাঠী প্রবন্ধে ইহার বিচার করিয়াছেন।

(৩) জাবা দ্বীপে যে মহাভারত এখান হইতে যায় তদন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এক গীতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রায় একশো সওয়া-শো শ্লোক অক্ষরশঃ পাওয়া যায়। কেবল ১২, ১৫, ১৬ ও ১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে নাই। কাজেই এরূপ বলায় কোন প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গীতার স্বরূপ বর্ত্তমানেরই সদৃশ ছিল। কারণ, কবিভাষায় ইহা গীতার অনুবাদ এবং তাহাতে যে সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় তাহা মধ্যে মধ্যে উদাহরণ এবং প্রতীকস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ঐ পরিমিত শ্লোকই যে সে সময়ে গীতায় ছিল এরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ডাঃ নরহর গোপাল সরদেশাই জাবা দ্বীপে যখন গিয়াছিলেন, তখন তিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কলিকাতার "মডর্ণ রিভিউ" নামক মাসিকের ১৯১৪ জুলাই সংখ্যায় এবং তৎপূর্ব্বে পুণার "চিত্রময় জগৎ" মাসিকেও উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ৪০০।৫০০ শকাব্দের পূর্ব্বে অন্যূন ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে গীতা ছিল এবং উহার শ্লোকও এখনকার গীতা-শ্লোকের ক্রমপরম্পরা অনুসারেই ছিল।

(৪) বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবদ্গীতার ধরণে রচিত অন্য যে সকল গীতা দেখা যায় কিংবা উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম

প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তখন ভগবদ্গীতা প্রমাণ ও পূজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই তাহার উক্ত প্রকারে অনুকরণ করা হইয়াছে, এবং ঐরূপ না হইলে কেহই তাহার অনুকরণ করিত না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, এই পুরাণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগবদ্গীতা অন্ততঃ দুই-একশো বৎসর অধিক প্রাচীন অবশ্য হইবে। পুরাণকালের প্রারম্ভ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অপেক্ষা অধিক আধুনিক বলিয়া মনে করা যায় না, অতএব গীতার কাল অন্যূন শকারম্ভের অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

(৫) উপরে বলিয়াছি যে, গীতা কালিদাসের ও বাণের বিদিত ছিল। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবির নাটকগুলি সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কর্ণভার' নামক নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে ঃ—

হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।
উভে বহুমতে লোকে নাস্তি নিষ্ফলতা রণে॥

এই শ্লোক গীতার "হতো প্রাপ্স্যসি স্বর্গং" (গী. ২. ৩৭) এই শ্লোকের সহিত সমানার্থক। এবং যখন ভাসকবির অন্য নাটক হইতে দেখা যায় যে, তাঁহার মহাভারতের সহিত পূর্ণ পরিচয় ছিল, তখন তো ইহা অনুমান করিতে কোনও বাধা নাই যে, উপরি-প্রদত্ত শ্লোকটি লিখিবার সময় গীতার শ্লোকটি তাঁহার মনের সম্মুখে নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভাসকবির পূর্ব্বেও মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিত টি গণপতি শাস্ত্রী স্থির করিয়াছেন যে, ভাস কবির কাল শকপূর্ব্ব দুই-তিনশত বৎসর হইবে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার কাল শকাব্দের দুই একশো বৎসর পরে হইবে। এই দ্বিতীয় মতকে ঠিক মনে করিলেও উপরিউক্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, ভাসের অন্যূন একশো দুশো বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শককালের আরম্ভে মহাভারত ও গীতা এই দুই গ্রন্থ সর্ব্বমান্য হইয়াছিল।

(৬) কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারগণ কর্তৃক গীতার শ্লোক গ্রহণ করিবার আরও বলবত্তর প্রমাণ ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে গুরুকুলের 'বৈদিক ম্যাগাজিন' নামক ইংরেজী মাসিক পুস্তকে (পুস্তক ৭. সংখ্যা ৬।৭ পৃ. ৫২৮-৫৩১, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, সংবৎ ১৯৭০) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এইরূপ ধারণা ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংবা পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীণ কোন গ্রন্থে (উদাহরণার্থ সূত্রগ্রন্থেও) গীতার উল্লেখ পাওয়া যায় না; এবং সেইজন্য বলিতে হয় যে, সূত্রকালের পর, অর্থাৎ বড় জোর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ৺কালে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত। বৌধায়ন গৃহ্যশেষসূত্রে (২. ২২. ৯) গীতার (৯. ২৬) শ্লোক "তদাহ ভগবান্" বলিয়া স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে, যথা— দেশাভাবে দ্রব্যাভাবে সাধারণে কুর্য্যান্মনসা বার্চয়েদিতি। তদাহ ভগবান্—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ইতি

এবং পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিনম্র হইয়া এই মন্ত্র বলিবে—"ভক্তিনম্রঃ এতান্

মন্ত্রানধীয়ীত"। এই গৃহ্যশেষসূত্রেরই তৃতীয় প্রশ্নের শেষে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় যে, বৌধায়নের পূর্ব্বে গীতা প্রচলিত ছিল এবং বাসুদেব-পূজাও সর্ব্বমান্য হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বৌধায়নের পিতৃমেধসূত্রের তৃতীয় প্রশ্নের আরম্ভেই এই বাক্য আছে ঃ—

জাতস্য বৈ মনুষ্যস্য ধ্রুবং মরণমিতি বিজানীয়াত্তস্মাজ্জাতে
ন প্রহৃষ্যেন্মৃতে চ ন বিষীদেত।

ইহা হইতে সহজেই দেখা যায় যে, ইহা গীতার "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি" এই শ্লোক হইতে সূচিত হইয়া থাকিবে; এবং উহার সহিত উপরিপ্রদত্ত "পত্রং পুষ্পং" এই শ্লোক যোগ দিলে তো কোন সংশয়ই থাকে না। উপরে বলিয়াছি যে, স্বয়ং মহাভারতের এক শ্লোক বৌধায়নসূত্রে পাওয়া যায়। বুহ্লার সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, * বৌধায়নের কাল আপস্তম্বের দুই একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে এবং আপস্তম্বের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শত বৎসরের কম হইতে পারে না। কিন্তু আমার মতে উহাকে একটু এদিকে পিছানো উচিত: কারণ মহাভারতে মেষবৃষভাদি রাশি নাই এবং কালমাধবে তো বৌধায়নের "মীনমেষয়োর্মেষ-বৃষভয়োর্বা বসন্তঃ" এই বচন প্রদত্ত হইয়াছে—এই বচনই ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রেও (পৃঃ ১০২) গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতেও ইহাই নিশ্চিত অনুমান হয় যে, মহাভারত বৌধায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। শকপূর্ব্ব নিবেদন চারি শত বৎসর বৌধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকারম্ভের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। ৺কালে বৌধায়নের কালকে খৃষ্টপূর্ব্ব সাত আট শত অব্দ ধরিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বুঝা যায় যে, বৌধায়নের রাশিসম্বন্ধীয় বচন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

(৭) উপরি-উক্ত প্রমাণাদি হইতে যে কোন ব্যক্তিরই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, শকপূর্ব্ব প্রায় পাঁচশত অব্দে বর্ত্তমান গীতার অস্তিত্ব ছিল; উহা বৌধায়ন ও আশ্বলায়নেরও বিদিত ছিল; এবং তখন হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত উহার পরম্পরা অবিচ্ছিন্নরূপে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত। এক্ষণে সম্মুখে চলিয়া যে সকল প্রমাণ দেওয়া যাইবে সেগুলি বৈদিকেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহিত্যের। ইহা দ্বারা, গীতার উপরি-উক্ত প্রাচীনত্ব স্বতন্ত্রভাবে আরও অধিক বলবৎ ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেই ভাগবতধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহ্লার ও প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনাটের মত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান প্রকরণের পরবর্ত্তী ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের বৃদ্ধি কিরূপে হইল, এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের বিচার স্বতন্ত্ররূপে করা হইবে। এখানে কেবল গীতার কালসম্বন্ধেই যাহা উল্লেখ করা আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে। ভাগবতধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের

* See Sacred Books of the East Series. Voi il. Intro P. Xliii. and also the same Series Vol XIV. Intro p. xliii.

পূর্ব্ববর্ত্তী, কেবল এইটুকু বলিলেই, গীতাও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ভাগবতধর্ম্ম ও গীতাগ্রন্থের আবির্ভাব যে এক সঙ্গেই হইয়াছিল ইহা বলিবার কোন প্রমাণ নাই। অতএব দেখা আবশ্যক যে, বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ গীতাগ্রন্থের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করিয়াছেন কিনা। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, বুদ্ধের সময়ে চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, নিঘণ্টু প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। তাই বৈদিক ধর্ম্ম বুদ্ধের পূর্ব্বেই যে পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পর বুদ্ধ যে নূতন পন্থা চালাইয়াছেন তাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনাত্মবাদী ছিল, কিন্তু উহাতে—যাহা পরবর্ত্তী ভাগে বলা যাইবে—আচরণদৃষ্টিতে উপনিষদের সন্ন্যাসমার্গেরই অনুকরণ করা হইয়াছিল। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও পরোপকারের কাজ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও গ্রীস পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে এই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, বনবাস ছাড়িয়া লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্য বৌদ্ধ যতি কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন ? বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থ দেখ। সুত্তনিপাতের খগ্‌গবিসাণসুত্তে উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু পূর্ণ অর্হৎ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তিনি কিছু না করিয়া গণ্ডারের মত বনে বাস করুন। এবং মহাবগ্‌গে (৫. ১. ২৭) বুদ্ধের শিষ্য সোনকোলীবিসের কথায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে "যে ভিক্ষু নির্ব্বাণাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার না কিছুই করিবার থাকে, আর না তাঁহাকে কৃত কর্ম্মই ভোগ করিতে হয়—'কতস্স পটিচয়ো নত্থি করণীয়ং ন বিজ্জতি'। ইহা শুদ্ধ সন্ন্যাসমার্গ। এবং আমাদিগের ঔপনিষদিক সন্ন্যাসমার্গের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। "করণীয়ং ন বিজ্জতি" এই বাক্য "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই গীতাবাক্যের সহিত শুদ্ধ সমানার্থক নহে, কিন্তু শব্দশও একই। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুর যখন এই মূল সন্ন্যাসমূলক আচার পরিবর্ত্তিত হইল এবং যখন উঁহারা পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন তখন পুরাতন ও নূতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল ; পুরাতন লোকেরা আপনাদিগকে 'থেরবাদ' (বৃদ্ধপন্থা) বলিতে লাগিল, এবং নূতন মতের লোকেরা আপন পন্থার 'মহাযান' এই নাম দিয়া পুরাতন পন্থাকে 'হীনযান' (অর্থাৎ হীন পন্থা) বলিতে লাগিল। অশ্বঘোষ মহাযান পন্থাবলম্বী ছিলেন ; এবং বৌদ্ধ যতিরা পরোপকারের কাজ করিবে এই মত তাঁহার গ্রাহ্য ছিল ; তাই, সৌন্দরানন্দ (১৮. ৪৪) কাব্যের শেষে নন্দ অর্হৎ অবস্থায় পৌঁছিলে তাঁহাকে বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হইয়াছে—

অবাপ্তকার্য্যোঽসি পরাং গতিং গতঃ
ন তেঽস্তি কিঞ্চিৎ করণীয়মণ্বপি।

অর্থাৎ "তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে ; উত্তম গতি তুমি লাভ করিয়াছ, এখন তোমার (নিজের) তিলমাত্র কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট নাই" ; এবং পরে এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন যে,—

বিহায় তস্মাদিহ কার্য্যমাত্মনঃ
কুরু স্থিরাত্মন্‌ পরকার্য্যমপ্যথো ॥

"অতএব এখন তুমি আপন কার্য্য ছাড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরকার্য্য করিতে থাক" (সৌ. ১৮. ৫৭)। বুদ্ধের কর্ম্মত্যাগমূলক উপদেশ—যাহা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়—এবং সৌন্দরানন্দ কাব্যে অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন সেই উপদেশ, এই দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভিন্নতা আছে। আবার অশ্বঘোষের এই উক্তিসমূহে এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে যুক্তিপ্রয়োগ আছে, উহাতে 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর' (গী. ৩. ১৭, ১৯) অর্থাৎ তোমার কিছুই বাকী নাই, তাই যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, তাহাই তুমি নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর—কেবল অর্থদৃষ্টিতে নহে, শব্দশও সাম্য আছে। অতএব ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশ্বঘোষ এই যুক্তি গীতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও মহাভারত ছিল। কিন্তু ইহা কেবল অনুমানমাত্র নহে। বুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী তারানাথ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তিব্বতী ভাষায় যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বকালীন সন্ন্যাসমার্গে মহাযান পন্থা যে কর্ম্মযোগমূলক সংস্কার করিয়াছিল উহা 'জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ' হইতে মহাযানপন্থার প্রধান প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনের গুরু রাহুলভদ্র জানিতেন। এই গ্রন্থ রুষীয় ভাষার মধ্য দিয়া জর্ম্মন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে, ইংরাজীতে হয় নাই। ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহাতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উদ্ধৃতাংশ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। * এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নামে ভগবদ্‌গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ কের্ণেরও মত। মহাযানপন্থার বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' নামক গ্রন্থেও ভগবদ্‌গীতার শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্তু এই সমস্ত এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের বিচার পরবর্ত্তী ভাগে করা যাইবে। এখানে কেবল বলিতে হইবে যে, বৌদ্ধগ্রন্থকারদিগেরই মতে মূল বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসপ্রধান হইলেও উহাতে ভক্তিপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান মহাযানপন্থার উৎপত্তি ভগবদ্‌গীতারই কারণে হইয়াছে ; এবং অশ্বঘোষের কাব্য ও গীতার মধ্যে যে সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতেও এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। মহাযানপন্থার প্রথম প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন শকপূর্ব্ব প্রায় একশো দেড়শো অব্দে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন, এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন ; এবং এই পন্থার বীজারোপণ অশোকের আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে, স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে, মহাযান-বৌদ্ধপন্থা বাহির হইবার পূর্ব্বে—অশোকেরও পূর্ব্বে—অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেই ভগবদ্‌গীতার অস্তিত্ব ছিল।

এই সকল প্রমাণের উপর বিচার করিলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ভগবদ্‌গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। ডাঃ ভাণ্ডারকর, ৺তৈলঙ্গ, রাও বাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য এবং ৺দীক্ষিত, ইঁহাদের মতও অনেকটা এইরূপই এবং উহাই এই প্রকরণে গ্রাহ্য বলিয়া মানিতে হইবে। প্রোঃ গার্ব্বের মত

* See Dr. Kern's *Manual of India Buddhism*. Grundriss III, 8, P, 122. মহাযান পন্থার 'অমিতায়ুসুত্ত' নামক মুখ্য গ্রন্থ চিনীয় ভাষায় আনুমানিক ১৪৮ সনে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

অন্যরূপ। তাঁহার মতের প্রমাণস্বরূপে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার শ্লোকের মধ্যে, 'যোগো নষ্টঃ' যোগ নষ্ট হইল—এই বাক্য ধরিয়া 'যোগ শব্দের অর্থ 'পাতঞ্জল যোগ' করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্দের অর্থ সেখানে 'পাতঞ্জল যোগ' নহে, 'কর্ম্মযোগ'। অতএব প্রোঃ গার্ব্বের মত ভ্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান গীতার কাল শালিবাহন শকের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের অপেক্ষা আর কম স্বীকার করা যায় না, ইহা নির্ব্বিবাদ। পূর্ব্বভাগে ইহা বলিয়াই আসিয়াছি যে, মূলগীতা ইহা অপেক্ষাও আরও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন হইবে।

ভাগ ৬—গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ

বর্ত্তমান গীতার কালনির্ণয়ের জন্য উপরে যে বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ বা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার করা আবশ্যক। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করেন—ইহাই গীতাধর্ম্মের বিশেষত্ব, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল একপাশে রাখিয়া, এইরূপ পুরুষের কেবল মানসিক ও নৈতিক গুণসমূহেরই বিচার করিলে, গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫. ৭২), ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯-২৩; ৫. ১৮-২৮) এবং ভক্তিযোগী পুরুষের (১২. ১৩-১৯) যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সব লক্ষণ এবং নির্ব্বাণ-পদের অধিকারী অর্হৎদিগের অর্থাৎ পূর্ণ অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে সেই সব লক্ষণ—এই উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে দেখিতে পাওয়া যায় (ধম্মপদ শ্লো. ৩৬০-৪২৩ ও সুত্তনিপাতের মধ্যে মুনিসুত্ত ও ধম্মিকসুত্ত দেখুন)। অধিক কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্দসাম্য হইতে দেখা যায় যে স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ভক্তিমান ব্যক্তির সমানই প্রকৃত ভিক্ষুও 'শান্ত', 'নিষ্কাম', 'নির্ম্মম', 'নিরাশী' (নিরিস্সিত), 'সমদুঃখসুখ', 'নিরারম্ভ', 'অনিকেতন', বা 'অনিবেশন' অথবা 'সমনিন্দাস্তুতি', এবং 'মানাপমান ও লাভালাভে সমদর্শী' হইয়া থাকে (ধম্মপদ ৪০, ৪১, ও ৯১ সুত্তনি. মুনিসুত্ত. ১. ৭ ও ১৪; দ্বয়তানুপস্সনসুত্ত ২১-২৩; ও বিনয়পিটক চুল্লবগ্গ. ৭. ৪. ৭ দেখুন)। জ্ঞানী পুরুষের নিকট যাহা আলোক অজ্ঞানের নিকট তাহাই অন্ধকার, দ্বয়তানুপস্সনসুত্তের ৪০ শ্লোকের বিচার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী" (গী. ২. ৬৯) গীতার এই বিচারের অনুরূপ; এবং "অরোসনেয্যো ন রোসেতি"—অর্থাৎ নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেয় না, মুনিসুত্তের ১০ম শ্লোকের এই বর্ণনা গীতার "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" (গী. ১২. ১৫) এই বর্ণনার সদৃশ। সেইরূপ সল্লসুত্তের "যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু" এবং "ভূতদিগের আদি ও অন্ত অব্যক্ত হওয়ায় তাহার জন্য শোক করা বৃথা সল্লসুত্ত. ১ ও ৯ এবং গী. ২. ২৭ ও ২৮) ইত্যাদি বিচার অল্প শব্দভেদে গীতারই বিচার। গীতার দশম অধ্যায়ে কিংবা অনুগীতার (মভা. অশ্ব. ৪৩. ৪৪) "জ্যোতিষ্মান্-

পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ছোট-খাটো শব্দসাদৃশ্য, ও অর্থসাদৃশ্য, ৺তৈলং স্বকীয় গীতার ইংরাজী ভাষান্তরের টিপ্পনীতে দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন উঠে যে, এই সাদৃশ্য কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই বিচার মূলে বৌদ্ধদিগের, বা বৈদিক ধর্ম্মের? এবং ইহা হইতে কি অনুমান হয়? কিন্তু এই প্রশ্নসমূহের নির্ণয় করিবার জন্য সে সময়ে যে সাধন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অপূর্ণ থাকায় উপরিউক্ত আশ্চর্য্য শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা আর বেশী কিছু এই বিষয়ে ৺তৈলং লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল নানা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে বলিয়া এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। ৺তৈলং-কৃত গীতার ইংরাজী ভাষান্তর যাহা 'প্রাচ্যধর্ম্মগ্রন্থমালায়' প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় প্রায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ উপস্থাপিত বৌদ্ধগ্রন্থের স্থলনির্দ্দেশও এই সকল ভাষান্তরেরই অনুযায়ী করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পালী শব্দ ও বাক্য মূল পালী গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও াপন বৈদিক ধর্ম্মরূপ পিতারই পুত্র, যে নিজের সম্পত্তির অংশ লইয়া কোন কারণে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ উহা পরকীয় নহে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এখানে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ছিল, উহারই এখানেই উৎপন্ন এক শাখা। সিংহলদ্বীপের মহাবংস কিংবা দীপবংসাদি পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুদ্ধের পরবর্ত্তী রাজাদিগের ও বৌদ্ধ আচার্য্য-পরম্পরার যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে হিসাব করিয়া দেখিলে নিষ্পন্ন হয় যে, ৮০ বৎসর বয়সে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে, গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি কথা অসম্বদ্ধ আছে; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষমূলর এই গণনাসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বুদ্ধের প্রকৃত নির্ব্বাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৩ অব্দে হইয়াছিল বলিয়াছেন; এবং ঐ কালই অশোকের শিলালিপি হইতে সিদ্ধ হয় ইহা বুহ্লারও দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রোঃ রিজডেভিড্স্ এবং ডাঃ কের্ণ-এর ন্যায় কোন কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ী, ইহা অপেক্ষা ৬৫ ও ১০০ বৎসর আরও পরের দিকে হটাইতে চাহেন। প্রোঃ গায়গর সম্প্রতিই এই সমস্ত মতের বিচার করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৮৩ * অব্দকে বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কালই স্বীকার করুন না কেন, বুদ্ধের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই বৈদিকধর্ম্ম পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এবং শুধু উপনিষদ্ নহে, কিন্তু ধর্ম্মসূত্রের ন্যায় গ্রন্থও তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহা নির্ব্বিবাদ। কারণ, পালী ভাষার প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম- গ্রন্থসমূহেই লিখিত আছে যে, "চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও নিঘণ্টু" প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী সাত্ত্বিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে এবং জটাধারী তপস্বী-দিগকে গৌতম বুদ্ধ তর্ক করিয়া আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন (সুত্তনিপাতের

প্রোঃ মোক্ষমূলর স্বকীয় ধর্ম্মপদের ইংরাজী ভাষান্তরের প্রস্তাবনায় বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল-সম্বন্ধীয় বিবরণ দিয়াছেন S. B.E. Vol. X. Intro. PP. Xxxv-xiv এবং ডাঃগায়গর ১৯১২ অব্দে প্রকাশিত স্বীয় মহাবংসের ভাষান্তরের প্রস্তাবনায় উহার সমালোচনা করিয়াছেন—তাহা দেখুন (The *Mahavamsa* by Dr· Geiger Pali Text Society Intro P· xxiif),

মধ্যে সেলসুত্তের সেলের বর্ণনা ও বথ্থু গাথা ৩০-৪৫)। কঠাদি উপনিষদে (কঠ. ১. ১৮ ; মুণ্ড. ১. ২ ১০) ; এবং উহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গীতায় (২. ৪০-৪৫ ৯, ২০, ২১) যাগ-যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্মের যেরূপ লঘুতা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্দেরই দ্বারা তেবিজ্জসুত্তে (ত্রৈবিদ্য সূত্রে) বুদ্ধও স্বমতানুসারে 'যাগযজ্ঞাদিকে' অনুপযোগী ও ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ যাহাকে 'ব্রহ্মসহব্যতায়' (ব্রহ্মসহব্যতায় = ব্রহ্মসাযুজ্যতা) বলেন সেই অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—কিংবা গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ও সন্ন্যাসধর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুই শাখা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পর, তাহার সংস্কার-সাধনের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাতে পূর্ব্বের কোন কোন বিষয় বজায় থাকে এবং কোন কোন বিষয় পরিবর্ত্তিত হয়। তাই এই নিয়মানুসারে, বৌদ্ধধর্ম্মে বৈদিকধর্ম্মের কোন্ কোন্ কথা বজায় রাখা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। এই বিচার গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সন্ন্যাস এই দুইয়ের পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিতে করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে সন্ন্যাসমার্গীয় কিংবা নিবৃত্তিপ্রধানই হওয়ায় প্রথমে দুইয়ের সন্ন্যাসমার্গের বিচার করিয়া তাহার পর উভয়ের গার্হস্থ্যধর্ম্মের তারতম্য সম্বন্ধে বিচার করিব।

বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে যে, কর্ম্মময় জগতের সমস্ত ব্যবহার তৃষ্ণামূলক সুতরাং দুঃখময় ; উহা হইতে অর্থাৎ জন্মমরণের ভবচক্র হইতে আত্মার চিরমুক্তি সাধনের জন্য মনকে নিষ্কাম ও বিরক্ত করিয়া উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে অবস্থিত আত্মস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মে সমাধান পূর্ব্বক সাংসারিক কর্ম্মসকল সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত ; এই আত্মনিষ্ঠ অবস্থাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকা সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব। দৃশ্যজগৎ নামরূপাত্মক ও নশ্বর ; এবং তাহার অখণ্ডিত ব্যাপার কর্ম্মবিপাক-প্রযুক্তই বরাবর বজায় আছে।

কম্মনা বত্ততী লোকো কম্মনা বত্ততী পজা (প্রজা)।
কম্মনিবন্ধনা সত্তা (সত্ত্বানি) রথস্সাহণীব যায়তো ॥

অর্থাৎ "কর্ম্মের দ্বারাই লোক ও প্রজা বজায় আছে ; চল্তি গাড়ী যেরূপ রথের কীলকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইপ্রকার প্রাণীমাত্র কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে" (সুত্তনি, বাসেঠসুত্ত, ৬১)। বৈদিকধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের উক্ত তত্ত্ব, অথবা জন্ম-মরণের চক্র বা ব্রহ্ম, ইন্দ্র, মহেশ্বর, ঈশ্বর, যম প্রভৃতি অনেক দেবতা এবং উহাদের বিভিন্ন স্বর্গ-পাতালাদি লোকসমূহের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বর্ণিত অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য ছিল ; এবং সেইজন্য নামরূপ, কর্ম্মবিপাক, অবিদ্যা উপাদান ও প্রকৃতি প্রভৃতি বেদান্ত বা সাংখ্যশাস্ত্রের শব্দ ও ব্রহ্মাদি বৈদিক দেবতাদিগের কথাও (বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া) ন্যূনাধিক ভেদে বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্য জগৎ নশ্বর ও অনিত্য এবং উহার ব্যবহার কর্ম্মবিপাকনিবন্ধন চলিতেছে, ইত্যাদি কর্ম্মজগৎসংক্রান্ত বৈদিক ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বুদ্ধের মান্য হইলেও নামরূপাত্মক নশ্বর জগতের মূলে নামরূপের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের

সমান এক নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী বস্তু আছে, বৈদিক ধর্ম্মের অর্থাৎ উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই গুরুতর প্রভেদ। গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তুত কিছু নাই—কেবল ভ্রম ; তাই আত্মানাত্মবিচারে বা ব্রহ্মচিন্তনের গোলযোগে পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করা কাহারও উচিত নহে (সব্বাসবসুত্ত. ৯-১৩ দেখুন)। আত্মার সম্বন্ধে কোন প্রকার কল্পনাই বুদ্ধের মান্য ছিল না, ইহা দীঘ্‌ঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসুত্ত হইলেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।"*

এই সকল সুত্তে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক কি দুই ; আবার এই প্রকার ভেদই বলিবার সময় আত্মার ৬২প্রকার বিভিন্ন কল্পনার কথা বলিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সমস্তই মিথ্যা 'দৃষ্টি' ; এবং মিলিন্দ-প্রশ্নেও বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে "আত্মা বলিয়া কোন যথার্থ বস্তু নাই" এইরূপ নাগসেন গ্রীক মিলিন্দকে (Minander) স্পষ্ট বলিয়াছেন (মি. প্র. ২. ৩. ৬. ও ২. ৭. ১৫)। আত্মা ও তদ্বৎ ব্রহ্ম দুইই ভ্রম, সত্য নহে, এইরূপ স্বীকার করিলে তো ধর্ম্মের ভিত্তিই ধসিয়া যায়। কারণ, তাহা হইলে তো সমস্ত অনিত্য বস্তুই অবশিষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখ বা সেই সুখের ভোক্তাও কেহ থাকে না ; এবং এই কারণেই তর্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশঙ্করাচার্য্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কি, এইজন্য এই তর্ক এইখানেই ছাড়িয়া দেখিব যে, বুদ্ধ স্বকীয় ধর্ম্মের কি উপপত্তি বলিয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কর্ম্মবিপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহকে (আত্মকে নহে) নশ্বর জগতের প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং (২) পুনর্জন্মের এই চক্র বা সমস্ত সংসারই দুঃখময়, এই দুই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন ; ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরন্তন শান্তি বা সুখ অর্জ্জন করা অত্যাবশ্যক। এই প্রকার সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব এবং তন্নিবারণের আবশ্যকতা, এই দুই বিষয় স্বীকার করিলে বৈদিক ধর্ম্মের এই প্রশ্নটি সমান থাকিয়া যায় যে, দুঃখ নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখলাভের পন্থাটি কি ; এবং উহার কোন-না-কোন সন্তোষজনক ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। উপনিষৎকারেরা বলিয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা ভবচক্র হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না এবং বুদ্ধ আরও একটু বেশী অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত কর্ম্মকে হিংসাত্মক সুতরাং সর্ব্বথা ত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। সেইরূপ স্বয়ং 'ব্রহ্মকেই' এক মহা ভ্রম বলিয়া মনে করিলে, দুঃখনিবারণার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের মার্গকেও ভ্রান্তিমূলক ও অসম্ভব বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে দুঃখময় ভবচক্র হইতে মার্গটি কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দূর করিতে হইলে সেই রোগের মূল কি তাহা স্থির করিয়া সেই মূল কারণকেই উন্মূলিত করিবার জন্য সৎ-বৈদ্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাংসারিক দুঃখের রোগ দূর করিবার জন্য (৩) উহার কারণ অবগত হইয়া (৪) সেই কারণকেই দূর করিবার মার্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্বন করা উচিত। এই কারণসমূহের বিচার করিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বা বাসনাই এই জগতের সমস্ত দুঃখের মূল ; এবং এক এক নাম-রূপাত্মক দেহের নাশ হইলে, অবশিষ্ট এই বাসনাত্মক কাজ হইতেই অন্যান্য নামরূপাত্মক দেহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* ব্রহ্মজালসুত্তের ভাষান্তর ইংরাজীতে হয় নাই, কিন্তু তাহার সংক্ষিপ্তসার রিজ-ডেভিড্‌স্ S. B. E. Vol XXVI Intro, PP, XXIII xxv-এ দিয়াছেন তাহা দেখ।

এবং তাহার পর বুদ্ধ স্থির করিয়াছেন যে, পুনর্জন্মের দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধ্যান ও বৈরাগ্যের দ্বারা তৃষ্ণার সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হওয়াই এক প্রকৃত মার্গ, এবং এই বৈরাগ্যযুক্ত সন্ন্যাস হইতেই চিরন্তন শান্তি ও নিত্য সুখ লাভ করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যাগযজ্ঞাদির এবং আত্মানাত্ম-বিচারের গোলযোগে না পড়িয়া, নিম্নোক্ত চারি প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম খাড়া করা হইয়াছে—সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব, তাহার কারণ, তাহার নিরোধ বা নিবারণ করিবার আবশ্যকতা, এবং উহা সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বৈরাগ্যরূপ সাধন ; কিংবা বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে অনুক্রমে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধর্ম্মের এই চারি মূলতত্ত্বকেই বুদ্ধ 'আর্যসত্য' নাম দিয়াছেন। উপনিষদের আত্মজ্ঞানের বদলে চারি আর্যসত্যের প্রত্যক্ষ ভিত্তির উপর এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মকে দাঁড় করাইলেও নিত্য শান্তি বা সুখ লাভ করিবার জন্য তৃষ্ণা কিংবা বাসনার ক্ষয় করিয়া মনকে নিষ্কাম করিবার যে মার্গ বুদ্ধের উপদিষ্ট সেই মার্গ (চতুর্থ সত্য), এবং মোক্ষলাভের জন্য উপনিষদের বর্ণিত মার্গ—এই দুই মার্গ বস্তুত একই হওয়ায়, দুই ধর্ম্মের চরম দৃশ্য-সাধ্য মনের নির্ব্বিষয় অবস্থাই, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম ও আত্মাকে যাঁহারা এক বলিয়া মানেন সেই উপনিষৎকারেরা মনের এই নিষ্কাম অবস্থাকে 'আত্মনিষ্ঠা', 'ব্রহ্মসংস্থা', 'ব্রহ্মভূততা', 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' (গী. ৫. ১৭-২৫ ; ছাং ২. ২৩. ১), অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আত্মার লয় হওয়া, ইত্যাদি চরম আধারসূচক নাম দিয়াছেন এবং বুদ্ধ উহাকে কেবল 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ "বিরাম পাওয়া বা প্রদীপ নিভিবার ন্যায় বাসনার নাশ হওয়া" এই ক্রিয়াপ্রদর্শক নাম দিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্মা ভ্রম, ইহা বলিবার পর এই প্রশ্নই আর থাকে না যে, "বিরাম কে পায়, ও কেমন করিয়া পায়" (সুত্তনিপাতে রতনসুত্ত ১৪ ও বঙ্গীসসুত্ত ১২ ও ১৩ দেখুন) ; এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই গূঢ় প্রশ্নের বিচারও করা উচিত নহে, ইহা বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন (সব্বাসবসুত্ত ৯-১৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪. ২. ৪ ও ৫ দেখুন)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই জন্য এক দেহের নাশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হইবার সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'মরণ' শব্দের উপযোগ বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসারে 'নির্ব্বাণ' সম্বন্ধে করিতেও পারা যায় না। নির্ব্বাণ তো 'মরণের মরণ' কিংবা উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে "মৃত্যু পার হইবার পথ" —শুধু মরণ নহে। সাপ যেরূপ আপন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিতে ভয় পায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় উপনীত মনুষ্য নিজের শরীরের জন্য ভাবে না, বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪. ৪.৭) এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত বৌদ্ধভিক্ষুর বর্ণনা করিবার সময় সুত্তনিপাতের অন্তর্গত উরগসুত্তের প্রত্যেক শ্লোকে গৃহীত হইয়াছে। "আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাপপুণ্যে সর্ব্বদাই অলিপ্ত থাকায় (বৃ. ৪. ৪. ২৩) মাতৃবধ কিংবা পিতৃবধের সদৃশ পাতকেরও দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না", বৈদিক ধর্ম্মের এই তত্ত্ব (কৌষী. ব্রা, ৩. ১) ধম্মপদে শব্দশঃ যেমনটি-তেমনি বলা হইয়াছে (ধম্ম. ২৯৪ ও ২৯৫ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪. ৫. ৭. দেখুন)। সার কথা, ব্রহ্ম ও আত্মার, অস্তিত্ব বুদ্ধ স্বীকার না করিলেও মনকে শান্ত, বিরক্ত ও নিষ্কাম করা প্রভৃতি মোক্ষলাভের যে সকল সাধন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল সাধনই বুদ্ধের মতে নির্ব্বাণলাভের পক্ষেও আবশ্যক এই জন্য বৌদ্ধ যতি ও বৈদিক সন্ন্যাসীর বর্ণনা মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে

একই রকমের ; এবং সেই কারণেই পাপপুণ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এবং জন্ম-মরণের চক্র হইতে মুক্তিলাভ, বিষয়ে বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মের সিদ্ধান্তই বৌদ্ধধর্ম্মেও বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায়, এই বিচার আসলে যে বৈদিক ধর্ম্মেরই সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বৈদিক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মের ভেদাভেদ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাক্। আত্মানাত্মবিচারের তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাধান্য না দিয়া সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব প্রভৃতি দৃশ্য ভিত্তির উপরেই বৌদ্ধধর্ম্মকে খাড়া করা হইলেও, মনে থাকে যেন, কোঁতের ন্যায় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিছক্ আধিভৌতিক ধর্ম্মের সদৃশ—কিংবা গীতাধর্ম্মেরও মত—বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে প্রবৃত্তিমূলক নহে। ইহা সত্য যে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের তাত্ত্বিক 'দৃষ্টি' বুদ্ধের মান্য নহে, কিন্তু "সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া মনকে নির্ব্বিষয় ও নিষ্কাম করাই এই জগতে মনুষ্যের একমাত্র পরম কর্ত্তব্য", বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের এই সিদ্ধান্ত (বৃ. ৪. ৪. ৬) বৌদ্ধধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা হইয়াছে। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে কেবল সন্ন্যাসপ্রধান হইয়াছে। সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেবল গৃহস্থাশ্রমেই থাকিলে, পরম সুখ ও অর্হতাবস্থা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বুদ্ধের সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহাতে গার্হস্থ্যবৃত্তির কিছুমাত্র বিচারই নাই। ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সংঘ বা মণ্ডলী —এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি", এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বারা যাহারা ঐ তিনের শরণাপন্ন হয়, বৌদ্ধগ্রন্থে তাহাদিগকে 'উপাসক' বলা হয়। ইহারাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ। এই উপাসকেরা স্বকীয় গার্হস্থ্যবৃত্তি কিরূপে নির্ব্বাহ করিবে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বয়ং বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপদেশ করিয়াছেন। (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত. ১. ২৪)। বৈদিক গার্হস্থ্যধর্ম্মের মধ্যে হিংসাত্মক শ্রৌত যাগযজ্ঞ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদ বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিলে, স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দানাদি পরোপকারধর্ম্ম ও নৈতিক আচরণ করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য থাকিয়া যায় ; এবং গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণনা করিবার সময় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে কেবল এই সকল বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়। পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ অর্থাৎ উপাসকের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, সর্ব্বভূতে দয়া ও (আত্মা স্বীকৃত না হইলেও) আত্মৌপম্যদৃষ্টি, শৌচ বা মনের পবিত্রতা, এবং বিশেষ করিয়া সৎপাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সংঘকে অন্নবস্ত্রাদি দান করা প্রভৃতি নীতিধর্ম্মের পালন বৌদ্ধ উপাসককে করিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহাকেই 'শীল' বলে ; এবং উভয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে পঞ্চমহাযজ্ঞের ন্যায় এই নীতিধর্ম্মও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধর্ম্মসূত্র এবং প্রাচীন স্মৃতি-গ্রন্থ (মনু. ৬ ৯২ ও ১০, ৬৩ দেখুন) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। * অধিক কি স্বয়ং বুদ্ধ এই আচরণ বিষয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ধম্মিকসুত্তে প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের স্তুতি করিয়াছেন, এবং মনুস্মৃতির কতক শ্লোক তো ধম্মপদে অক্ষরশঃ পাওয়া যায় (মনু. ২. ১২১ ও ৫. ৪৫ এবং ধর্ম্মপদ ১০৯ ও ১৩১ দেখুন) বৈদিকগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে কেবল পঞ্চমহাযজ্ঞ

* See Dr. Kern's *Manual of Buddhism* (Grundriss III, 8) b. 68.

ও নীতিধর্ম্মই লওয়া হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ মোক্ষলাভ কখনও হয় না, বৈদিকধর্ম্মে পূর্ব্বে কোন কোন উপনিষৎকার কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত এই মতও বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা—সুত্তনিপাতের ধম্মিকসুত্তে ভিক্ষুর সঙ্গে উপাসকের তুলনা করিয়া বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উত্তম শীলের দ্বারা গৃহস্থ বড় জোর 'স্বয়ং-প্রকাশ' দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু জন্মমরণের চক্র হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের জন্য সংসার ও পুত্রকলত্রাদি ত্যাগ করিয়া শেষে উহাকে ভিক্ষু-ধর্ম্মই স্বীকার করিতে হইবে (ধম্মিকসুত্ত ১৭. ২৯ ; ও বৃ. ৪. ৪. ৬ ও মভা. বন. ২. ৬৩ দেখুন)। তেবিজ্জসুত্তে বর্ণিত হইয়াছে (তে. সু. ১. ৩৫ ; ৩. ৫) যে কর্ম্মমার্গীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় নিজের উক্ত সন্ন্যাসপ্রধান মত সিদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধ "তোমার ব্রহ্মের যদি স্ত্রীপুত্র ও ক্রোধ-লোভ নাই, তবে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে থাকিয়া ও যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম করিয়া তোমাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে" এই প্রকার যুক্তিবাদ করিতেন। এবং এই কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধ যৌবনকালেই নিজের স্ত্রী-পুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম অঙ্গীকার করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের সমকালীন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, মহাবীর নামক শেষ জৈন তীর্থঙ্করেরও উপদেশ এইরূপই। কিন্তু তিনি বুদ্ধের ন্যায় অনাত্মবাদী ছিলেন না ; এবং এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, বস্ত্রপ্রাবরণাদি ঐহিক সুখত্যাগ এবং অহিংসা ব্রত প্রভৃতি ধর্ম্মপালন জৈন যতি বৌদ্ধভিক্ষু অপেক্ষা অধিক কড়াক্কড়িভাবে পালন করিতেন এবং অদ্যাপি পালন করিয়া থাকেন। আহারেরই জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মারা হয় নাই এইরূপ প্রাণীদিগের 'পবত্ত' (সং. প্রবৃত্ত) অর্থাৎ 'তৈয়ারী মাংস' (হাতী, সিংহ প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীকে বর্জন করিয়া) বুদ্ধ স্বয়ং খাইতেন এবং 'পবত্ত' মাংস ও মৎস্য বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে তিনি খাইতে অনুমতি দিয়াছেন ; এবং বস্ত্র ব্যতীত নগ্ন হইয়া ভ্রমণ করা বৌদ্ধভিক্ষুধর্ম্মের নিয়মানুসারে দোষ (মহাবগ্গ ৬. ৩১. ১৪ ও ৮. ২৮. ১)। সারকথা, অনাত্মবাদী ভিক্ষু হও, ইহা বুদ্ধের নিশ্চিত উপদেশ হইলেও, কায়ক্লেশময় উগ্র তপ সম্বন্ধে বুদ্ধের অভিমত ছিল না (মহাবগ্গ ৫. ১. ১৬ ও গী. ৬. ১৬); বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বিহারের অর্থাৎ তাহাদের থাকিবার মঠের সমস্ত ব্যবস্থাও এরূপ রাখা হইত যাহাতে শরীরের বেশি কষ্ট না হয় এবং প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস সহজে হইতে পারে। তথাপি অর্হতাবস্থা বা নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্তির জন্য গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই হইবে, এই তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে পুরাপুরি বজায় থাকায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে সন্ন্যাসপ্রধান, ইহা বলিতে কোন প্রত্যবায় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানাত্ম বিচার ভ্রমের একটা বড় জালমাত্র, ইহাই যদিও বুদ্ধের স্থির মত ছিল, তথাপি এই প্রত্যক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ দুঃখময় সংসারচক্র হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শান্তি ও সুখলাভ করিবার জন্য উপনিষদে বর্ণিত সন্ন্যাসমার্গীদিগের সাধন—বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নির্ব্বিষয় করা—তাঁহার স্বকৃত হইয়াছিল। এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদ ও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে বৈদিক গার্হস্থ্যধর্ম্মের নীতিনিয়মই অল্প হেরফেরে গৃহীত হইয়াছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইল, তখন যদি উপনিষদ ও মনুস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে বৈদিক সন্ন্যাসীদিগের যে বর্ণনা আছে তাহা, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা অর্হতদিগের বর্ণনা অথবা অহিংসাদি নীতিধর্ম্ম, দুই ধর্ম্মে একই সমান—কখন কখন

শব্দশও একই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এই সমস্ত কথা মূল বৈদিক ধর্ম্মেরই। কিন্তু কেবল এই বিষয়গুলিই বৌদ্ধেরা বৈদিকধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত দশরথজাতকের মত বৌদ্ধধর্ম্মের জাতকগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুরাণ-ইতিহাসকথার বৌদ্ধধর্ম্মানুকূল করিয়া রচিত রূপান্তরমাত্র। শুধু বৌদ্ধেরা কেন, জৈনেরাও স্বকীয় অভিনব পুরাণসমূহে বৈদিক কথা-সকলের এইরূপ রূপান্তর করিয়াছে। খৃষ্টের পর আবির্ভূত মহম্মদীয় ধর্ম্মে খৃষ্টচরিত্রের এইরূপ এক বিপর্য্যয় করা হইয়াছে, ইহা সেল সাহেব লিখিয়াছেন *। আধুনিক গবেষণা হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত সৃষ্টির উৎপত্তি, প্রলয় ও নোয়া প্রভৃতির কথা, প্রাচীন খাল্দীয় জাতির ধর্ম্মকথার এইরূপ রূপান্তর করিয়া ইহুদীরা বর্ণনা করিয়াছে। উপনিষৎ, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র ও মনুস্মৃতিতে বর্ণিত কথা কিংবা বিচার যখন বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ—অনেক সময় একেবারে শব্দশঃ—গৃহীত হইয়াছে, তখন সহজেই এই অনুমান হয় যে, ইহা আসলে মহাভারতেরই। বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা এই সকল উহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন। বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থের যে ভাব ও শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—"জয়ের দ্বারা বৈরতা বৃদ্ধি হয় ; বৈরতা দ্বারা বৈরতার উপশম হয় না" (মভা. উদ্যো. ৭১. ৫৯ ও ৬৩) "অন্যের ক্রোধকে শান্তির দ্বারা জয় করিবে" ইত্যাদি বিদুরনীতির উপদেশ (মভা. উদ্যো. ৩৮. ৭৯.), এবং জনকের এই উক্তি—"আমার এক বাহু চন্দনে চর্চ্চিত করা ও অন্য বাহু কাটিয়া ফেলা আমার নিকট উভয়ই সমান" (মভা শাং ৩২০ ৩৬) ; ইহার অতিরিক্ত মহাভারতের আরও অনেক শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে শব্দশঃ পাওয়া যায় (ধম্মপদ ৫ ও ২২৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৭ ৩ ৫)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও মনুস্মৃতি প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বুদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন, তাই উহাদের যে সকল শ্লোক বা বিচার বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা সেগুলি উক্ত বৈদিক গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পারা যায় না। মহাভারতেই বৌদ্ধ 'ডাগোবাদিগের' যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ সংস্করণ বুদ্ধের পরে হইয়াছে। অতএব কেবল শ্লোকসাদৃশ্য হইতে স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, বর্ত্তমান মহাভারত বৌদ্ধগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়ায় ঐ ন্যায়ই গীতাসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহাছাড়া, গীতাতেই ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমতের খণ্ডন আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে (বৈদিক ও বৌদ্ধ) উভয়ের সাদৃশ্য ছাড়িয়া দিয়া এখানে বিচার করিব যে, উক্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে নির্ব্বিবাদরূপে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত করিবার জন্য বৌদ্ধগ্রন্থে অন্য কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবৃত্তিমূলক, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টিঁকে নাই। ভিক্ষুদিগের আচার

* See Sale's *Koran* "To the Reader" (Preface) P. x and the Preliminary Discourse, Sec. IV. P. 58 (Chandos Classics Ed.)

গঠিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ উৎপন্ন হইল। আজকাল কেহ কেহ এই তর্কও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, 'আত্মা নাই' এই উক্তি দ্বারা এই কথা বলাই বুদ্ধের মনোগত অভিপ্রায় যে, "অচিন্ত্য আত্মজ্ঞানের শুষ্ক তর্কের মধ্যে না গিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিষ্কাম করিতে প্রথমে চেষ্টা কর, আত্মা থাক্ বা নাই থাক্; মনোনিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রথমে করা আবশ্যক"; ব্রহ্ম বা আত্মার আদৌ অস্তিত্ব নাই এরূপ বলা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, তেবিজ্জসুত্তে স্বয়ং বুদ্ধ 'ব্রহ্মসহব্যতায়' অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেলসুত্তে ও থের-গাথাতে "আমি ব্রহ্মভূত" এইরূপ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন (সেলসু. ১৪; থেরগা. ৮৩১ দেখুন)। কিন্তু মূল কারণ যাহাই হোক, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, এই প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থা তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে রচিত হইয়া প্রচার করিতেছিল যে, 'আত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে কোন নিত্য বস্তুই জগতের মূলে নাই, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ক্ষণিক বা শূন্য" অথবা "যাহা কিছু দেখা যায় তাহা জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়া জগতে কিছুই নাই" ইত্যাদি (বেসূ. শাং ভা. ২. ২. ১৮—২৬ দেখুন)। এই নিরীশ্বর ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধ মতকেই ক্ষণিকবাদ, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। এই সমস্ত পন্থার এখানে বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রশ্ন ঐতিহাসিক। তাই, উহার মীমাংসা পক্ষে 'মহাযান' নামক পন্থার বর্ণনা যতটুকু আবশ্যক তাহাই এখানে করা হইয়াছে। বুদ্ধের মূল উপদেশে আত্মা বা ব্রহ্মের (অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের) অস্তিত্বই অস্বীকৃত কিংবা গৌণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদেশ করা সম্ভব ছিল না; এবং তাঁহার ভব্য মূর্ত্তি ও চরিত্র লোকদিগের চক্ষের সম্মুখে যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল সেই পর্য্যন্ত এই মার্গের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কিন্তু পরে ইহা আবশ্যক হইল যে, এই ধর্ম্ম সাধারণ লোকের প্রিয় হউক এবং ইহার আরও বেশী প্রচারও হউক। অতএব সংসার ত্যাগ করিয়া ও ভিক্ষু হইয়া মনোনিগ্রহের দ্বারা স্বস্থানে থাকিয়াই নির্ব্বাণ লাভ করিবার—কিসে তাহা না বুঝিয়া—এই নিরীশ্বর নিবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যক্ষ-মার্গের প্রয়োজন হইল। খুব সম্ভব যে, সাধারণ বুদ্ধভক্তেরা তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ভক্তিমার্গের অনুকরণ করিয়া, আপনারাই বুদ্ধের উপাসনা প্রথম প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে। অতএব বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর শীঘ্রই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বুদ্ধকেই "স্বয়ম্ভূ ও অনাদ্যনন্ত পুরুষোত্তমের" রূপ প্রদান করেন; এবং তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ পাওয়াও বুদ্ধেরই লীলা; "প্রকৃত বুদ্ধের কখনও বিনাশ হয় না—তাঁহার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী"। সেইরূপ আবার, বৌদ্ধগ্রন্থে প্রতিপাদিত হইতে লাগিল যে, প্রকৃত বুদ্ধ "সর্ব্বজগতের পিতা এবং লোকেরা তাঁহারই সন্তান" অতএব তিনি সকলের প্রতিই "সমদৃষ্টি, কাহাকেও তিনি প্রীতি করেন না, কাহাকেও তিনি দ্বেষও করেন না", "ধর্ম্মের ব্যবস্থা বিগড়াইয়া গেলে তিনি 'ধর্ম্মকার্য্যের' জন্যই সময়ে সময়ে বুদ্ধের রূপে প্রকট হইয়া থাকে" এবং এই দেবাদিদেব বুদ্ধের প্রতি "ভক্তি করিলে, তাঁহার গ্রন্থের পূজা করিলে এবং তাঁহার ডাগোবার সম্মুখে কীর্ত্তন করিলে" অথবা "তাঁকে ভক্তি-পূর্ব্বক দুই-চারি কমল বা একটি ফুল দিলেই" মনুষ্য সদ্গতিলাভ করে (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক ২. ৭৭-৯৮; ৫. ২২; ১৫. ৫-২২ ও

মিলিন্দপ্রশ্ন ৩. ৭. দেখুন)। * মিলিন্দপ্রশ্নে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "মনুষ্যের সমস্ত জীবিতকাল দুরাচরণে অতিবাহিত হইলেও মৃত্যুসময়ে যদি সে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহা হইলে তাহার স্বর্গলাভ না হইয়া যায় না" (মি. প্র. ৩. ৭. ২); এবং সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত লোকের "অধিকার, স্বভাব ও জ্ঞান একই প্রকার না হওয়ায়, অনাত্মপর নিবৃত্তিপ্রধান মার্গ ব্যতীত ভক্তির এই মার্গ (যান) বুদ্ধই কৃপা করিয়া স্বকীয় 'উপায়কুশলতা দ্বারা' নির্ম্মাণ করিয়াছেন"। নির্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিক্ষুধর্ম্মকেই স্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধ স্বয়ং এই যে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ, তাহা করিলে বুদ্ধের মূল উপদেশেই হরতাল লাগানো হইত। কিন্তু ইহা বলা কিছু অনুচিত ছিল না যে, ভিক্ষু হইল তো কি হইল, অরণ্যে 'গণ্ডারের' মত একাকী ও উদাসীনভাবে না থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারাদি লোকহিতকর ও পরোপকার-কার্য্য 'নিরিস্সিত' বুদ্ধিতে করাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্ত্তব্য †; এই মতই মহাযান পন্থার সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকাদি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং নাগসেন মিলিন্দকে বলিয়াছেন যে. "গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করা একেবারেই অসম্ভব নহে,—এবং ইহার অনেক উদাহরণও আছে" (মি. প্র. ৬. ২. ৪)। ইহা যে-কোন-লোকের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এই বিচার অনাত্মবাদী ও নিছক্ সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্মের নহে, অথবা শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিয়াও ইহার উপপত্তি জানা যায় না; এবং প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মীর নিজেদেরই মনে হইত যে এই বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এই নূতন মতটিই স্বভাবত অধিকাধিক লোকপ্রিয় হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধের মূল উপদেশ অনুসারে যাহারা চলিত তাহাদের নাম হইল "হীনযান" (হাল্কা মার্গ) এবং এই নূতন পন্থার নাম হইল 'মহাযান' (বড় মার্গ)। ‡ চীন, তিব্বত ও জাপান প্রভৃতি দেশে আজকাল যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা মহাযান পন্থার; এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে মহাযানপন্থী ভিক্ষু-সংঘের দীর্ঘ উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্ম্মের এত শীঘ্র বিস্তার হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা শালিবাহন শকের

* সদ্ধর্মপুণ্ডরীক গ্রন্থের প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাষান্তর হইয়াছে। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এক্ষণে মূল সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থও ছাপা হইয়াছে।

† সুত্ত-নিপাতে খগ্গ-বিসাণসুত্তের ৪১ শ্লোকের ধ্রুবপদ "একো চরে খগ্গবিসাণ কপ্পো" এইরূপ আছে। খগ্গবিসাণ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহারই ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বনে একাকী বাস করিতে হয়, উহার এই অর্থ।

‡ হীনযান ও মহাযান এই দুই পন্থার ভেদ-বর্ণনা-কালে ডাঃ কের্ণ বলেন—Not the Arhat who has shaken off all human feeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been pre pared by Hinduism andMahayanism,"—*Manual of Indian Buddhism*. 69: Southern Buddhism অর্থাৎ হীনযান। মহাযানপন্থায় ভক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল। Mahayanism lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of *Bhakti*." *Ibid* P. 124

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিবে এইরূপ ডাঃ কের্ণ স্থির করিয়াছেন। * কারণ, শক-রাজা কনিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে এক মহাপরিষৎ বসিয়াছিল উহাতে মহাযানপন্থার ভিক্ষুরা উপস্থিত ছিল, এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই মহাযানপন্থার 'অমিতায়ুসুত্ত' নামক প্রধান সূত্রগ্রন্থের চিনীয় ভাষায় ভাষান্তর প্রায় ১৪৮ খৃষ্টাব্দে করা হয়; তাহা এখন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মতে, এই কাল ইহা হইতেও প্রাচীন হইবে। কারণ, খৃষ্টের প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত অশোকের শিলালিপিতে সন্ন্যাসমূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহাতে সর্ব্বত্র প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, তৎপূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান পন্থায় প্রবৃত্তিপ্রধান স্বরূপ আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ যতি নাগার্জ্জুন এই পথের মুখ্য প্রবর্ত্তক ছিলেন, মূল সংস্থাপক নহে।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, উপনিষদের মতানুসারে কেবল নিবৃত্তি-মার্গের মনকে নির্ব্বিষয় করিবার উপদেশ যে মূল নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেই পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপর প্রবৃত্তিমার্গ বাহির হওয়া কখনও কি সম্ভব ছিল; এই জন্য বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর, শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্ম যে এই কর্ম্মপ্রধান ভক্তির স্বরূপপ্রাপ্ত হইল, ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার জন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বাহিরের তৎকালীন কোন-না-কোন অন্য কারণ থাকিবে; এবং এই কারণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবদ্‌গীতার উপর দৃষ্টি না পড়িয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে তৎকালে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে জৈন ও উপনিষদ্‌ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিপরই ছিল, ইহা আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি; এবং বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত পাশুপত কিংবা শৈব প্রভৃতি পন্থা ভক্তিপর হইলেও প্রবৃত্তিমার্গ ও ভক্তির মিলন ভগবদ্‌গীতা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না। গীতায় ভগবান আপনাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই বিচার ভগবদ্‌গীতাতেই আসিয়াছে যে, "আমি পুরুষোত্তমই সমস্ত লোকের 'পিতা' ও 'পিতামহ' (৯. ১৭); আমার নিকট সকলেই সমান ('সম'), আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই (৯. ২৯); আমি অজ ও অব্যয় হইয়াও ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করি (৪. ৬-৮); মনুষ্য যতই দুরাচারী হোক্ না, আমাকে ভজনা করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯. ৩০), কিংবা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ফুল, পত্র কিংবা একটু জলও দিলে আমি তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করি (৯. ২৬.); এবং অজ্ঞলোকের জন্য ভক্তি এক সুলভ মার্গ" (১২. ৫); ইত্যাদি। এই প্রকারই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লোকসংগ্রহার্থ প্রবৃত্তিধর্ম্মকেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এই তত্ত্ব গীতা ছাড়া অন্য কোথাও সবিস্তার প্রতিপাদিত হয় নাই। তাই, এইরূপ অনুমান অগত্যা করিতে

* Sree Dr. Kern's *Manual of Indian Buddhism*. PP. 6, 69 and 119, মিলিন্দ (মিনণ্ডর নামক গ্রীক রাজা) প্রায় খৃঃ পূঃ ১৪০ কিংবা ১৫০ অব্দে ভারতবর্ষের বায়ুকোণে ব্যাকট্রিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে নাগসেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন ইহা মিলিন্দপ্রশ্নে উক্ত হইয়াছে। মহাযানপন্থার লোকেরাই বৌদ্ধধর্মের এই প্রচারকার্য্য করিত, তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, মহাযানপন্থা তখন আবির্ভূত হইয়াছিল।

হয় যে, মূল বৌদ্ধধর্ম্মে যেরূপ বাসনাক্ষয়ের নিছক্ নিবৃত্তিপর মার্গ উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপই পরে মহাযানপন্থা বাহির হইলে পর উহাতে প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিতত্ত্বও ভগবদগীতা হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথাটা কিছু অনুমানের উপরেই অবলম্বিত নহে। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মী তারানাথের যে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, মহাযানপন্থার মুখ্য প্রবর্ত্তকের অর্থাৎ "নাগার্জ্জুনের গুরু রাহুলভদ্র নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ এই ব্রাহ্মণের (মহাযানপন্থার) কল্পনা উদ্রেক করিবার কারণ হইয়াছিলেন"। ইহা ব্যতীত অন্য এক তিব্বতীয় গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখই পাওয়া যায়।* তারানাথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য; কিন্তু উহার বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থের ভিত্তি ছাড়িয়া হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য। কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার স্বকীয় ধর্ম্মপন্থার তত্ত্ব বলিবার সময় বিনা, কোন কারণে পরধর্ম্মীর এই প্রকার উল্লেখ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বয়ং বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ভগবদ্গীতা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণোক্ত অন্য প্রবৃত্তিপর ভক্তিগ্রন্থ বৈদিক ধর্ম্মেই নাই; অতএব ইহা হইতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় যে, মহাযানপন্থার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শুধু ভাগবতধর্ম্ম নহে, ভাগবতধর্ম্মসম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদ্‌-গীতাও সে সময়ে প্রচলিত ছিল; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত সমর্থন করেন। গীতার অস্তিত্ব যখন বৌদ্ধধর্ম্মীয় মহাযানপন্থার পূর্ব্ববর্তী স্থির হইল, তখন মহাভারতও উহার সঙ্গে ছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সত্বরই তাঁহার মত সকল একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থও সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল। মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত বর্ত্তমান বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু উহাতে পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা হইবে প্রোফেসর রিস্-ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের নির্ব্বাণের অন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বেও বোধ হয় রচিত হয় নাই। এবং বুদ্ধের শত বৎসর পরে, বৌদ্ধধর্ম্মীয় ভিক্ষুদের যে দ্বিতীয় পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে সিংহল-দ্বীপের পালিভাষায় লিখিত বিনয়পিটকাদি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, এই পরিষদের পরে

* See Dr. Kern's *Manual of Indian Buddhism* p. 122. "He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted to sage Krishna and still more to Ganesha. This quasi-historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagabadgita and more even to Shaivism." 'গণেশ' শব্দে ডাঃ কের্ণ শৈবপন্থা বুঝিয়াছেন মনে হয়। ডাঃ কের্ণ, প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তক-মালায় সদ্ধর্মপুণ্ডরীকগ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছেন এবং তাহার প্রস্তাবনায় এই মতই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন (S. B. E. Vol. XXI. Intro. pp. xxv-xxviii.)

তিনি কৃষ্ণ বলিতে Sage Krishna বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন এইখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উদ্দিষ্ট। কোন ঋষি কৃষ্ণ নহে। পরম্পরাগত জ্ঞানের অভাবেই প্রতীচ্য সমালোচকদের ঈদৃশ প্রমাদ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়। —বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক

† See S. B. E. Vol. XI. Intro. pp. xv XX and p. 58.

রচিত। এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাই বলিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খৃঃ পূঃ প্রায় ২৪১ অব্দে সিংহল দ্বীপে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় এই গ্রন্থও সেখানে গিয়াছে, এবং তাহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ইহা সেখানে সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাকারে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিবার রীতি ছিল, তৎপ্রযুক্ত মহেন্দ্রের কাল হইতে উহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহা মনে করিলেও, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্ব্বপ্রথম রচিত রচিত হয় তখন, অথবা পরে মহেন্দ্র বা অশোকের কাল পর্য্যন্ত, তৎকালে প্রচলিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই? অতএব মহাভারত বুদ্ধের পরে হইলেও অন্য প্রমাণ হইতে উহার, অলেক্জণ্ডর বাদশার পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সিদ্ধ হয়; এইজন্য মনুস্মৃতির শ্লোকের ন্যায় মহাভারতের শ্লোকও মহেন্দ্রের সিংহলে নীত পুস্তকসমূহের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। সার কথা, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার ধর্ম্মের প্রসার হইতেছে দেখিয়া শীঘ্রই প্রাচীন বৈদিক গাথা ও কথাসমূহ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ করা হয়; উহার যে শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে শব্দশঃ পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতকার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে, বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা এই সকল শ্লোক মহাভারত হইতে না লইয়া মহাভারতেরও আধারভূত কিন্তু এক্ষণে বিলুপ্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদি হইতে লইয়া থাকিবেন; এবং সেইজন্য মহাভারতের কালনির্ণয় উপর্য্যুক্ত শ্লোকসাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি নিম্নোক্ত চারি বিষয় হইতে ইহা তো নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মে মহাযানপন্থার প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে কেবল ভাগবতধর্ম্মই প্রচলিত ছিল না, বরং সে সময় ভগবদ্-গীতাও সর্ব্বমান্য হইয়াছিল, এবং এই গীতারই আধারে মহাযানপন্থা বাহির হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রণীত গীতার তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হয় নাই। ঐ চারিটি বিষয় হইতেছে—(১) নিছক্ অনাত্মবাদী ও সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপ্রধান ও প্রবৃত্তিপ্রধান তত্ত্ব বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযান-পন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (৩) মহাযানপন্থার মতের সহিত গীতার ভক্তিপর ও প্রবৃত্তিপর তত্ত্বের অর্থতঃ ও শব্দশঃ সাদৃশ্য আছে, এবং (৪) বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য জৈন ও বৈদিক পন্থায় প্রবৃত্তিপর ভক্তিমার্গের প্রচার ছিল না। উপর্য্যুক্ত প্রমাণসমূহ হইতে বর্ত্তমান গীতার যে কাল নির্ণীত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

ভাগ ৭—গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪ শতাব্দীতে হইয়াছিল, এবং খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিতত্ত্বের প্রবেশ, বৌদ্ধগ্রন্থকারদিগেরই মতে, শ্রীকৃষ্ণপ্রণীত গীতারই কারণে হইয়াছে। গীতার অনেক সিদ্ধান্ত খৃষ্টানদিগের নূতন বাইবেলেও পাওয়া যায়: বস্, এই ভিত্তির উপরেই খৃষ্টধর্ম্ম হইতে এই সকল তত্ত্ব

গীতায় গৃহীত হইয়া থাকিবে, এইরূপ কতকগুলি পাদ্রি স্বকীয় গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং বিশেষতঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লরিনসর গীতার জর্ম্মন অনুবাদগ্রন্থে যাহা কিছু প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার নির্ম্মূলত্ব এক্ষণে স্বতই সিদ্ধ হয়। লরিনসর স্বকীয় পুস্তকের (গীতার জর্ম্মন ভাষান্তরের) শেষে ভগবদ্গীতা ও বাইবেলের—বিশেষতঃ নূতন বাইবেলের প্রায় শতাধিক স্থলে শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ ও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্যও আছে। উদাহরণ যথা—"সেইদিন তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমি আমার পিতার মধ্যে, তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি" (জন ১৪. ২০), এই বাক্য গীতার "যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (গীতা. ৪ ৩৫), এবং "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি" (গী. ৬. ৩০) এই বাক্যগুলির সহিত কেবল সমানার্থকই নহে, প্রত্যুত শব্দশও একই। সেইরূপ জনের পরবর্ত্তী "যে আমাকে প্রীতি করে আমিও তাহাকে প্রীতি করি" এই বাক্য (১৪. ২১), গীতার "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ" (গী. ৭. ১৭) এই বাক্যের সহিত সর্ব্বাংশেই সদৃশ। এই বাক্য এবং এই প্রকার অন্য সদৃশ বাক্য হইতে ডাক্তার লরিনসর এইরূপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদিত ছিল, এবং গীতা খৃষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাকিবে। ডাঃ লরিনসরের পুস্তকের এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ 'ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি'র দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং ৺তৈলং ভগবদ্গীতার যে পদ্যাত্মক ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় তিনি লরিনসরের মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। * ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না, এবং সংস্কৃত অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের জ্ঞান ও অভিমান তাঁহার অধিক ছিল। তাই, তাঁহার মত, শুধু ৺তৈলঙ্গের নহে, কিন্তু মোক্ষমূলার প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-দিগেরও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। বেচারা লরিনসরের এ কল্পনাও হয় তো আসে নাই যে, একবার যখন গীতার কাল নিঃসংশয়রূপে খৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া স্থির হইল, তখনই গীতা ও বাইবেলের মধ্যে যে শত শত অর্থসাদৃশ্য ও শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছি তাহা ভূতের মতো উল্টা আমারই ঘাড়ে চাপিবে। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহা কখনও স্বপ্নেরও গোচর হয় না, তাহাই কখন কখন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া খাড়া হয় ও সত্য সত্য প্রত্যক্ষ হয়, তবে এখন ডাঃ লরিনসরের কথার উত্তর দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তথাপি কোন কোন বড় ইংরাজী গ্রন্থে এখনও এই মিথ্যা মতেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই এখানে এই সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার পর যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে হয়। প্রথমে ইহা মনে রাখা উচিত যে, যখন কোন দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত একরকম হয়, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তের সাম্য হইতেই কোন্ গ্রন্থটি প্রথম এবং কোন্টি পরবর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কারণ এস্থলে এই দুই-ই সম্ভব যে, (১) এই দুয়ের মধ্যে প্রথম গ্রন্থের বিচার দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতে, কিম্বা (২) দ্বিতীয় গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। তাই প্রথমে যখন দুই গ্রন্থের

* See *Bhagavadgita* translated into English Blank Verse With Notes & c. by K. T. Telang, 1875 (Bombay). This book is different from the translation in the S. B. E. Series.

কাল স্বতন্ত্রভাবে করিয়া লওয়া হয়, তখন আবার বিচারসাদৃশ্য হইতে স্থির করিতে হয় যে, অমুক গ্রন্থকার অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাছাড়া, একই রকম বিচার দুই বিভিন্ন দেশের দুই গ্রন্থকারের মনে স্বতন্ত্রভাবে একই কালে কিংবা অগ্রপশ্চাতে উদয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে ; এই জন্য, ঐ দুই গ্রন্থের সাম্য দেখিবার সময় ইহাও বিচার করিতে হয় যে, উহার উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হওয়া সম্ভব কি না ; এবং যে দুই দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইল, তাহাদের মধ্যে তৎকালে যাতায়াত বা কারবার থাকায় এক দেশ হইতে এই বিচার অপর দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল কি না। এই প্রকার সকল দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে কোন বিষয়ই গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল না ; বরঞ্চ গীতার তত্ত্বসমূহের ন্যায় যে কিছু তত্ত্ব খৃষ্টীয় বাইবেলে পাওয়া যায়, সেগুলি বাইবেলেই, অন্তত বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে—অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে গীতা বা বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই—খৃষ্ট কিংবা তাঁহার শিষ্যদের কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়াই খুব সম্ভব ; এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক্ষণে ইহা স্পষ্টরূপে বলিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রকারে দাঁড়িপাল্লা অন্যদিকে ঝুঁকিয়াছে দেখিয়া গোঁড়া খৃষ্টভক্তেরা আশ্চর্য্য হইবেন এবং এই কথা অস্বীকারের দিকেই যদি তাঁহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ইঁহাদিগকে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই প্রশ্ন ধর্ম্মঘটিত নহে, ইহা ঐতিহাসিক ; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে অধুনা উপলব্ধ বিষয়সমূহের শান্তভাবে বিচার করা আবশ্যক। তার পর ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষতঃ বিচারসাদৃশ্যের প্রশ্ন যাঁহারা প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের সহিত ও পক্ষপাতরহিত বুদ্ধিতে গ্রহণ করাই ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ।

ইহুদী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রতিপাদিত প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের সংস্করণ হিসাবে খৃষ্টধর্ম্মের নব-বিধান বাহির হইয়াছে। ইহুদী ভাষায় ঈশ্বরকে 'ইলোহা' ('আরবী 'ইলাহ') বলে। কিন্তু মোজেসের (Moses) স্থাপিত নিয়মানুসারে ইহুদীধর্ম্মের মুখ্য উপাস্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল 'জিহোভা'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই 'জিহোভা' শব্দ মূলে ইহুদী শব্দ নহে ; খাল্দীয় ভাষার 'যবে' (সংস্কৃত যহ্ব) শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহুদীরা মূর্ত্তিপূজক নহে। অগ্নিতে পশু বা অন্য বস্তুর হোম করা ; ঈশ্বরের ব্যাখ্যাত নিয়ম-সকল পালন করা এবং তাঁহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ সাধন করা—ইহাই উহাদের ধর্ম্মের মুখ্য আচার। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে, ইহুদী ধর্ম্মকেও যজ্ঞময় ও প্রবৃত্তিপর বলা যায়। ইহার বিরুদ্ধে অনেক স্থানে খৃষ্টের উপদেশ আছে যে, 'আমি (হিংসাকারক) যজ্ঞ চাহি না, আমি (ঈশ্বরের) কৃপা চাই' (মাথ্যু, ৯. ১৩), 'ঈশ্বর ও দ্রব্য উভয়ের সাধন এক-সঙ্গে হইতে পারে না' (মাথ্যু, ৬. ২৪), 'যে অমৃতত্ব লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হইতে হইবে' (মাথ্যু ১৯. ২১) ; এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ যখন দেশবিদেশে প্রেরণ করেন, তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের এই নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য খৃষ্ট তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন যে, "তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, রূপা কিংবা অনাবশ্যক বস্ত্রাচ্ছাদনও রাখিবে না" (মাথ্যু, ১০. ৯-১৩)। ইহা সত্য

যে, আধুনিক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসকল খৃষ্টের এই সমস্ত উপদেশ গুটাইয়া তাকে উঠাইয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু আধুনিক শঙ্করাচার্য্য হাতী ঘোড়া ব্যবহার করিলে শাঙ্কর সম্প্রদায়কে যেরূপ দরবারী বলা যায় না, সেইরূপ আধুনিক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসমূহের এই আচরণের জন্য মূল খৃষ্টধর্ম্মও প্রবৃত্তিপর ছিল, একথা বলা যায় না। মূল বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডাত্মক হইলে পরও, যেইপ্রকার তাহার মধ্যে পরে জ্ঞানকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেইপ্রকারই ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মেরও সম্বন্ধ। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে ক্রমশঃ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি শত শত বৎসর পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে ; কিন্তু একথা খৃষ্টধর্ম্মে খাটে না। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টের অনধিক প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এসী বা এসীন নামক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ইহুদীদিগের দেশে সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল। এই এসী লোকেরা ইহুদী-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া উহারা কোন নির্জ্জনস্থানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিত, এবং জীবিকার জন্য বড় জোর কৃষিকার্য্যের মত কোন নিরুপদ্রব ব্যবসায় করিত। অবিবাহিত থাকা, মদ্যমাংস বর্জ্জন করা, শপথ গ্রহণ না করা, সংঘের সহিত মঠে থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমস্ত সংঘের সামাজিক লাভ মনে করা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মুখ্য তত্ত্ব ছিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে চাহিলে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারী করিয়া তাহার পর কতকগুলি নিয়ম পালন করিব বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। উহাদের মুখ্য মঠ মৃতসমুদ্রের পশ্চিমধারে এঙ্গদীতে ছিল ; সেখানেই উহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তিতে অবস্থিতি করিত। স্বয়ং খৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যেরা নববিধান বাইবেলে এসী সম্প্রদায়ের মতের যেরূপ সম্মান পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মাথ্যু, ৫. ৩৪ ; ১৯. ১২ ; জেম্স্ ৫. ১২ ; কৃত্য. ৪. ৩২-৩৫), তাহা হইতে দেখা যায় যে, যিশুখৃষ্ট এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ; এবং এই পন্থার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তিনি অধিক প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টের সন্ন্যাসপর ভক্তিমার্গের পরম্পরা এই প্রকারে এসী-সম্প্রদায়ের পরম্পরার সহিত মিলাইয়া দিলেও মূল কর্ম্মময় ইহুদী ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসপর এসী সম্প্রদায়ই বা কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহার কোন-না-কোন সযুক্তিক উপপত্তি বলা আবশ্যক। খৃষ্ট এসীন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এখন ইহা সত্য বলিয়া মনে করিলেও বাইবেলের নববিধানে যে সন্ন্যাসপর ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম্মপ্রধান ইহুদী-ধর্ম্মে তাহার আবির্ভাব সহসা কিরূপে হইল এই প্রশ্নটিকে এড়াইতে পারা যায় না। ইহাতে কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, এসীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের বদলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ, এক্ষণে সমাজশাস্ত্রের এই মামুলী সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে যে, কোনও বিষয় কোথাও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহা আস্তে আস্তে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; এবং যেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধি নজরে না আসে, সেস্থলে প্রায়ই উহা পরকীয় দেশ হইতে কিংবা পরকীয় লোক হইতে গৃহীত হইয়া থাকে।" এই কঠিন সমস্যা প্রাচীন খৃষ্টীয় গ্রন্থকারদিগের নজরে যে আসে নাই এরূপ নহে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞানগোচরে আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ী খৃষ্টীয় বিদ্বানদিগের এই মত ছিল যে, গ্রীক ও ইহুদি লোকদিগের পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ ঘটিলে পর গ্রীকলোকদিগের—বিশেষতঃ

পাইথাগোরসের—তত্ত্বজ্ঞানের কল্যাণে কর্ম্মময় ইহুদীধর্ম্মে এসী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-মার্গের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা হইতে এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানা যায় না। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞময় ইহুদী ধর্ম্মেই একা এক সন্ন্যাসপর এসী-ধর্ম্মের বা খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হওয়া স্বভাবতঃ সম্ভব ছিল না, এবং তাহার জন্য ইহুদীধর্ম্মের বাহিরে উহার অন্য কোন-না-কোন কারণ হইয়াছিল—এই কল্পনাটি নূতন নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খৃষ্টান পণ্ডিতদিগেরও এই মত গ্রাহ্য হইয়াছিল।

কোলব্রুক * বলিয়াছেন যে, পাইথাগোরসের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের কোথাও অধিক সাম্য আছে; তাই উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে করিলেও বলা যাইতে পারে যে, এসী-সম্প্রদায়ের জনকত্ব পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষেই আসে। কিন্তু এতটা ঘোর-ফের করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধগ্রন্থ ও বাইবেলের নববিধান তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, পাইথাগোরীয় মণ্ডলীর সহিত এসী বা খৃষ্ট ধর্ম্মের যত সাম্য আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সাম্য বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শুধু এসী-ধর্ম্মেরই নহে, কিন্তু খৃষ্টচরিত্র ও খৃষ্ট-উপদেশেরও আছে। খৃষ্টকে ভুলাইবার জন্য যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং যে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় খৃষ্ট যেরূপ ৪০ দিন উপবাস করিয়াছিলেন, সেইরূপই বুদ্ধকেও মারের ভয় দেখাইয়া মোহমুগ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং সেই সময় বুদ্ধ ৪৯ দিন (সাত সপ্তাহ) উপবাসী ছিলেন, ইহা বুদ্ধচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারেই পূর্ণশ্রদ্ধার প্রভাবে জলের উপর দিয়া চলা, মুখের দেহের কান্তি সম্পূর্ণ সূর্য্যের সদৃশ করা, অথবা শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকেও সদ্‌গতি দেওয়া, ইত্যাদি কথা বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের চরিত্রে একই সমান পাওয়া যায়; এবং "তুমি আপন প্রতিবেশীকে এবং বৈরীকেও প্রীতি করিবে" প্রভৃতি খৃষ্টের যে মুখ্য মুখ্য নৈতিক উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন একেবারে অক্ষরশঃ মূল বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টের পূর্ব্বেই আসিয়াছে। উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভক্তির তত্ত্ব মূল বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল না; কিন্তু তাহাও পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের ন্যূন দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই, মহাযান বৌদ্ধপন্থায় ভগবদ্‌গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ আর্থর লিলী স্বকীয় পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সাম্য শুধু এইটুকু বিষয়েই পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা ব্যতীত খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আরও শত শত ছোট খাটো বিষয়ে এইরূপই সাম্য আছে। অধিক কি, খৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইয়া বধ করিবার দরুণ খৃষ্টানদিগের নিকট ক্রুশের চিহ্ন পবিত্র ও পূজ্য সেই ক্রুশের চিহ্নকে 'স্বস্তিক' আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের লোকেরা খৃষ্টের শত শত বৎসর পূর্ব্বাবধিই শুভদায়ক বলিয়া মনে করিত; এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি পৃথিবীর পুরাতন খণ্ডের দেশেই শুধু নহে, কিন্তু কলম্বসের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার পেরু ও মেক্সিকো দেশেও স্বস্তিক-চিহ্ন শুভাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তারা স্থির করিয়াছেন †। ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টের পূর্ব্বেই স্বস্তিক চিহ্ন সমস্ত লোকের পূজ্য ছিল, পরে খৃষ্টভক্তেরা কোন-এক বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ

* See Colebrooke's *Miscellaneous Essays*, Vol. 1, pp. 399-400.

† See *The Secret of the Pacific* by C. Reginald Enock, 1912, pp. 248-252.

করিয়া লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশকদিগের, বিশেষত প্রাচীন পাদ্রীদিগের, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও অনেক সাম্য অছে। উদাহরণ যথা, 'ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্‌'-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্নানোত্তর দীক্ষা দিবার অনুষ্ঠানও খৃষ্টের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দূর-দূর দেশে ধর্ম্মোপদেশক পাঠাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার পদ্ধতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের পূর্ব্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়াছিল।

এই প্রশ্ন যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের চরিত্র ও নৈতিক উপদেশে এবং এই দুই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিধির মধ্যে এই যে অসাধারণ ও ব্যাপক সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? * বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুশীলনের ফলে এই সাম্য যখন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যদিগের নজরে পড়িল, তখন কোন খৃষ্টীয় পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন যে, বৌদ্ধেরা এই তত্ত্ব 'নেষ্টোরিয়ন' নামক আসিয়া-খণ্ডে প্রচলিত খৃষ্টীয় পন্থা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর নহে; কারণ, নেষ্টার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকই খৃষ্টের প্রায় সওয়া চারি শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং এখন অশোকের শিলালিপি হইতে নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, খৃষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে—এবং নেষ্টারের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে—বুদ্ধের জন্ম হইয়া গিয়াছিল। অশোকের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের অন্তত আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ও আশপাশের দেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল; এবং বুদ্ধ-চরিত্রাদি গ্রন্থও তখন রচিত হইয়াছিল। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব যখন নির্ব্বিবাদ, তখন খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তৎসম্বন্ধে দুই পক্ষ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; (১) ঐ সাম্য স্বতন্ত্র ভাবে দুইদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিংবা (২) বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে এই সকল তত্ত্ব খৃষ্ট বা খৃষ্টের শিষ্যেরা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। প্রোঃ রিস-ডেভিড্‌স্‌ বলেন যে, এই বিষয়ে বুদ্ধ ও খৃষ্টের পরিস্থিতির ঐক্য নিবন্ধন, উভয়ের মধ্যেই এই সাম্য, স্বভাবতই স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে †। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক নহে। কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়, তখন উহা ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে এবং সেইজন্য উহার উন্নতির ক্রমও আমরা বলিতে পারি। উদাহরণ যথা—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষৎ হইতেই পরে ভক্তি, পাতঞ্জল যোগ কিংবা শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম কেমন করিয়া নিঃসৃত হইল, যুক্তিসহকারে তাহার ক্রমপরম্পরা ঠিক দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যজ্ঞময় ইহুদীধর্ম্মে সন্ন্যাসপর এসী বা খৃষ্টধর্ম্মের উদ্ভব এই প্রকারে হয় নাই। উহা একেবারেই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং

* এই সম্বন্ধে মিঃ আর্থর লিলী *Buddhism in Christendom* এই নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন: তাছাড়া স্বকীয় মত সংক্ষেপে *Buddha and Buddhism* নামক গ্রন্থের শেষ চার ভাগে স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিশিষ্টের এই ভাগে যে বিচার আলোচনা করিয়াছি তাহা মুখ্যরূপে এই দ্বিতীয় গ্রন্থের আধারেই করিয়াছি। *Buddha and Buddhism* গ্রন্থ The world's Epoch-makers Series-এ-১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রায় ৫০ টা সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

† See *Buddhist Suttas*, S, B, E, Series Vol XI. p, 163.

উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন খৃষ্টান পণ্ডিতও ইহা মানিতেন যে, এইভাবে উহার একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছু কারণ ইহুদীধর্ম্মের বাহিরে ঘটিয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া, খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তাহা এত অসাধারণ ও সম্পূর্ণ যে, সেইরূপ সাম্য স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না। ইহা যদি সপ্রমাণ হইয়া গিয়া থাকিত যে, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের কথা ইহুদীদিগের জানাই সর্ব্বথা অসম্ভব ছিল, তবে সে কথা স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আলেকজাণ্ডরের পরবর্ত্তী সময়ে—এবং বিশেষতঃ অশোকের সময়েই (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব 'প্রায় ২৫০ বৎসরে)—বৌদ্ধ যতিরা পূর্ব্বদিকে ইজিপ্টের অন্তর্গত আলেক্‌জান্দ্রিয়া এবং গ্রীস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। অশোকের এক শিলা লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ইহুদী-লোকদিগের এবং আশপাশের দেশসমূহের গ্রীক রাজা আণ্টিওকসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেইরূপ বাইবেলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে (মাথ্যু. ২. ১) যে, খৃষ্ট যখন জন্মিয়াছিলেন তখন পূর্ব্বাঞ্চলের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি জেরুজলেমে গিয়াছিলেন, খৃষ্টানেরা বলেন যে এই জ্ঞানী পুরুষেরা 'মগী' অর্থাৎ সম্ভবত ইরাণীধর্ম্মের লোক হইবেন,—ভারতবর্ষের নহে। কিন্তু যাহাই বল না কেন, উভয়ের অর্থ তো একই। কারণ, এই কালের পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার কাশ্মীর ও কাবুলে হইয়া গিয়াছিল; এবং উহা পূর্ব্বদিকে ইরান ও তুর্কিস্থান পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছিল, ইহা ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায়। তাহাছাড়া, খৃষ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক যতি লোহিতসমুদ্রের উপকূলে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার আশপাশের প্রদেশে প্রতিবৎসর আসিতেন, এইরূপ প্লুটার্ক স্পষ্ট লিখিয়াছেন। * তাৎপর্য্য খৃষ্টের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই, ইহুদীদের দেশে বৌদ্ধ যতিগণ যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় নাই; এবং গতিবিধি যখন সপ্রমাণ হইল, তখন ইহুদীলোকের মধ্যে সন্ন্যাসপর এসী ধর্ম্মের এবং পরে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তি প্রধান খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হইবার পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ইংরাজ গ্রন্থকার লিলীও ইহাই অনুমান করিয়াছেন †; এবং ইহার সমর্থনে ফরাসী পণ্ডিত এমিল্ বুর্ণুফ্ এবং রোস্নীর এই প্রকার মত আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনদেশে লিপজিকের তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রোঃ সেডন এই বিষয়সংক্রান্ত স্বকীয় গ্রন্থে এই মতই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জর্ম্মন প্রোফেসর শ্রডর তাঁহার এক নিবন্ধে বলেন যে, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সমান নহে; দুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাম্য থাকিলেও অন্য বিষয়ে বৈষম্যও অনেক আছে এবং সেইজন্য খৃষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম

* See *Plutarch's Morals—Theosophical Essays*, translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96, 97. পালীভাষায় মহাবংশে (২৯. ৩৯) যবনদিগের অর্থাৎ গ্রীকদিগের অলসন্দা (যোননগরাহলসন্দা) নামক নগরের উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে এক দেবালয়ের নির্ম্মাণকালে অনেক বৌদ্ধ যতি উৎসব উপলক্ষে গিয়াছিল। মহাবংশের ইংরাজী অনুবাদক অলসন্দা শব্দে ইজিপ্টদেশের অলেকজান্দ্রিয়া নগর গ্রহণ না করিয়া, কাবুলের মধ্যে এই নামে অলেকজান্দার এক যে গ্রাম স্থাপন করেন, অলসন্দা শব্দে এই স্থানই বিবক্ষিত এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, এই ক্ষুদ্র গ্রামকে কেহই যবনদিগের নগর বলিত না। তাছাড়া উপরি-উক্ত অশোকের শিলালিপিতেই যবনদিগের রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠাইবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

† See Lillie's *Buddha and Buddhism* pp. 158. ff.

হইতে নিঃসৃত এই মত গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু এই কথা আসল বিষয়ের বহির্ভূত হওয়ায় এই কথার কোন মূল্য নাই। খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বাংশে একই, এ কথা কেহই বলে না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে এই দুই ধর্ম্ম ভিন্ন বলিয়া ধরা হইত না। মুখ্য প্রশ্ন তো এই যে, যখন মূলে ইহুদি ধর্ম্ম নিছক কর্ম্মময়, তখন উহাতে সংস্কারের আকারে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তিমার্গপ্রতিপাদক খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের সম্ভবতঃ কি কারণ হইয়াছিল। এবং খৃষ্টধর্ম্মাপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম নিঃসংশয়ে প্রাচীন; উহার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্ন্যাসপর ভক্তি ও নীতির তত্ত্ব খৃষ্ট স্বতন্ত্ররূপে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই কথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কি করিতেন অথবা কোথায় ছিলেন এই সম্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, এই কাল তিনি সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধর্ম্মচিন্তনে ও প্রবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাঁহার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না তাহা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? কারণ, বৌদ্ধ যতিদিগের গতিবিধি সেই সময়ে গ্রীস দেশ পর্য্যন্ত ছিল। নেপালের এক বৌদ্ধ মঠের গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, যিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। নিকোলস নোটোভিশ নামক এক রুসিয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় তাহার ভাষান্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন। নোটোভিশের ভাষান্তর ভাল হইলেও মূল গ্রন্থ পরে কোন মিথ্যুক মিথ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে, এইরূপ অনেক খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন। উক্ত গ্রন্থ এই পণ্ডিতেরা সত্য মনে করুন বলিয়া আমারও বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। নোটোভিশ যে গ্রন্থ পাইয়াছেন তাহা সত্যই হউক বা প্রক্ষিপ্তই হউক, কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমি যে বিচার-আলোচনা উপরে করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, খৃষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে বাইবেলের নববিধানে তাঁহার চরিত্রলেখক ভক্তদিগের বৌদ্ধধর্ম্মের কথা জানা অসম্ভব ছিল না; এবং ইহা যদি অসম্ভব না হয় তবে খৃষ্ট এবং বুদ্ধের চরিত্র ও উপদেশে যে অসাধারণ সাম্য পাওয়া যায়, উহার স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। * সার কথা, মীমাংসকদিগের নিছক্ কর্ম্মমার্গ, জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগ (নৈষ্কর্ম্ম্য), উপনিষৎ-কারদিগের ও সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্ঠা ও সন্ন্যাস, চিত্ত নিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগ, এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি—এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গ ও তত্ত্বই মূলে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত। তন্মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে ছাড়িয়া, চিত্ত-নিরোধরূপ যোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এই দুই তত্ত্বেরই ভিত্তিতে বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম আপন

* রমেশচন্দ্র দত্তেরও এইরূপ মত; তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। Romesh Chandra Dutt's *History of Civilization in Ancient India* Vol. II, Chap. xx. p. 328-340.

স্বামী বিবেকানন্দ এই মতই পোষণ করিতেন। তাঁহারই দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতের হিমিশ মঠে গিয়া ঐ পুঁথি উদ্ধার করিয়া বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। স্বামী শংকরানন্দের এতদ্ বিষয়ক গ্রন্থ রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।—বর্তমান সম্পাদক

সন্ন্যাসপর ধর্ম্ম চারি বর্ণকে উপদেশ করেন : কিন্তু পরে উহাতেই ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম মিলাইয়া দিয়া বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁহার ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রকার প্রচার হইলে পর, নিছক কর্ম্মপর ইহুদীধর্ম্মে সন্ন্যাস-মার্গের তত্ত্ব প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয় ; এবং শেষে উহাতেই ভক্তি মিলাইয়া দিয়া খৃষ্ট স্বকীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। ইতিহাস হইতে নিষ্পন্ন এই পরম্পরা দেখিলে, ডাঃ লরিন্‌সরের এই উক্তি তো অসত্য সিদ্ধ হয় যে, গীতাতে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে কোন কিছু গৃহীত হইয়াছে, বরং বিপরীতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টি, সন্ন্যাস, নির্ব্বৈরত্ব ও ভক্তির যে সকল তত্ত্ব বাইবেলের নববিধান-ভাগে পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ পরম্পরা-ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে খৃষ্টধর্ম্মে গৃহীত হওয়া খুব সম্ভবমাত্র নহে, বরঞ্চ গৃহীত হওয়াই বিশ্বাসযোগ্য। এবং ইহার জন্য হিন্দুদিগকে অপরের মুখের দিকে তাকাইবার কোনও আবশ্যকতা ছিলই না, ইহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়।

এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত সাত প্রশ্নের বিচার শেষ হইল। এক্ষণে ইহারই সঙ্গে কতকগুলি এইরূপ গুরুতর প্রশ্ন উদিত হয় যে, ভারতবর্ষে যে ভক্তিপন্থা আজকাল প্রচলিত আছে উহার উপর ভগবদ্‌গীতার কি পরিণাম ঘটিয়াছে ? কিন্তু এই সকল প্রশ্নকে গীতাগ্রন্থসম্বন্ধীয় বলা অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত এইরূপ বলাই সঙ্গত, সেইজন্য, এবং বিশেষতঃ এই পরিশিষ্ট প্রকরণ অল্প অল্প করিলেও আমার নির্দ্দিষ্ট সীমা অনেক অতিক্রম করিয়াছে ; অতএব গীতার বহিরঙ্গের বিচার-আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল।

ইতি পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

গীতার মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও রহস্য

উপোদ্ঘাত

জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহকারে, ইহার মধ্যেও বিশেষতঃ ভক্তির সুগম রাজমার্গ অবলম্বনে যতদূর সম্ভব, সমবুদ্ধি করিয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে নিজ নিজ কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই প্রত্যেক মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য ; ইহাতেই উহার ঐহিক ও পারলৌকিক পরম কল্যাণ নিহিত ; এবং উহার মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিবার অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। গীতারহস্যে প্রকরণক্রমে সবিস্তার ইহার প্রতিপাদন করিয়াছি, এবং ইহাই গীতাশাস্ত্রের ফলিতার্থ। এই প্রকার চতুর্দ্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ঐ উদ্দেশে গীতার আঠারো অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া যায় ; এবং এই কর্ম্মযোগ-প্রধান গীতাধর্ম্মে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্ কোন্ অংশ কি প্রকারে আসিল। এই সকল করিবার পর, বস্তুতঃ গীতার শ্লোক-সমূহের যথাক্রমে আমার মতানুসারে (দেশীয়) ভাষাতে সরল অর্থ বলার অতিরিক্ত কোন কাজ বাকী থাকে না। কিন্তু গীতারহস্যের সাধারণ আলোচনায় গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বিভাগ কি প্রকার হইয়াছে, কিংবা টীকাকারগণ নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন বিশেষ শ্লোকের পদগুলির কি প্রকার টানাবোনা করিয়াছেন, তাহা বলিবার সুবিধা হয় নাই। এই কারণে এই দুই বিষয়ের বিচার করিবার জন্য, এবং যেখানকার সেইখানেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখাইয়া দিবার জন্যও, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কিছু টিপ্পনী দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের কেবল দিগ্‌দর্শন করাইয়া দিয়াছি, এবং গীতারহস্যের যে প্রকরণে ঐ বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ করিয়াছি। শ্লোকের অনুবাদ, যতদূর সম্ভব, শব্দশঃ করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলেই মূলেরই শব্দ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং "অর্থাৎ"এর সহিত জুড়িয়া দিয়া উহার অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং ছোট-খাটো টিপ্পনীর কাজ অনুবাদ হইতেই বাহির করা হইয়াছে। এই সমস্ত করিলে পরও, সংস্কৃত ভাষার এবং (দেশীয়) ভাষার প্রণালী বিভিন্ন হইবার কারণে, মূল সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ণ অর্থও (দেশীয়) ভাষাতে ব্যক্ত করিবার জন্য কিছু বেশী শব্দ অবশ্য প্রয়োগ করিতে হয়, এবং অনেক স্থলে মূলের শব্দসমূহ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই শব্দসমূহের উপর দৃষ্টি দেওয়াইবার জন্য ( ) এইরূপ কোষ্ঠকে (ব্র্যাকেটে) ইহা রাখা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে শ্লোকের সংখ্যা শ্লোকের শেষে থাকে ; কিন্তু অনুবাদে আমি এই সংখ্যা প্রথমেই, আরম্ভেই রাখিয়াছি। অতএব কোন শ্লোকের অনুবাদ দেখিতে হইলে অনুবাদে ঐ সংখ্যার পরবর্ত্তী বাক্য পড়িতে হইবে। অনুবাদের রচনা প্রায় এমন করা হইয়াছে যে, টিপ্পনী ছাড়িয়া নিছক্ অনুবাদই পড়িলেও অর্থে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এই প্রকার যেখানে মূলে একই বাক্য, একাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে সেই কয়টি শ্লোকেরই অনুবাদে ঐ অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অতএব কতকগুলি শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়াই

পড়িতে হইবে। এইরূপ শ্লোক যেথানে যেথানে আছে, সেথানে সেথানে শ্লোকের অনুবাদে পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (।) দাঁড়ি দেওয়া হয় নাই। আর ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই। আমি নিজের অনুবাদে গীতার সরল, স্পষ্ট ও মুখ্য অর্থ আনিবার চেষ্টা করিয়াছি সত্য, কিন্তু সংস্কৃত শব্দে এবং বিশেষতঃ ভগবানের প্রেমযুক্ত, রসপূর্ণ, ব্যাপক ও প্রতিক্ষণে নবরুচিপ্রদ বাক্যে লক্ষণা দ্বারা নানা ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন করিবার যে সামর্থ্য আছে, তাহা একটুও না কমাইয়া বাড়াইয়া অন্য শব্দে যেমনটি-তেমনটি আরোপ করা অসম্ভব; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, তিনি অনেক স্থলে লক্ষণা দ্বারা গীতার শ্লোকসমূহের যেরূপ উপযোগ করিবেন, গীতার নিছক অনুবাদ যিনি পড়িবেন, তিনি সেরূপ করিতে পারিবেন না। অধিক কি বলিব, তাঁহার হাবুডুবু খাইবারও সম্ভাবনা আছে। **অতএব সকলের নিকট আমার সাগ্রহ মিনতি এই যে, গীতাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যয়ন করুন;** এবং অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই মূল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় জানিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের—অধ্যায়ক্রমে প্রত্যেক শ্লোকের—অনুক্রমণিকাও পৃথক দিয়াছি। এই অনুক্রমণিকা বেদান্তসূত্রের অধিকরণমালার অনুকরণে করিয়াছি। প্রত্যেক শ্লোক পৃথক্ পৃথক্ না পড়িয়া অনুক্রমণিকার এই ভিত্তিতে গীতার শ্লোক একত্র পড়িলে পর, গীতার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহা কোন কোন অংশে দূর হইতে পারে। কারণ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ গীতার শ্লোকসমূহের টানাবোনা করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতক শ্লোকের যে পৃথক্ অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রায় এই সন্দর্ভের পৌর্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—গীতা ৩. ১৯; ৬. ৩; এবং ১৮. ২ দেখুন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিবার কোনই বাধা নাই যে, গীতার এই অনুবাদ এবং গীতারহস্য, পরস্পর পরস্পরের পূর্ণতাসাধক। এবং যিনি আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝিতে চাহেন, তাঁহাকে এই দুই অংশেরই প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাই উহাতে, গুরুতর পাঠভেদ কোথাও পাওয়া যায় না। আরও, ইহা বলা আবশ্যক যে, **বর্ত্তমানকালে প্রাপ্ত গীতাভাষ্যসমূহের মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, সেই শাঙ্কর ভাষ্যেরই মূল পাঠকে আমি প্রমাণ মানিয়াছি।**

গীতার অধ্যায়সমূহের শ্লোকশঃ

বিষয়ানুক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়—অর্জ্জুন-বিষাদযোগ

১ সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। ২-১১ দুর্য্যোধনের দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুই দলের সৈন্যবর্ণনা। ১২-১৯ যুদ্ধের আরম্ভে পরস্পরের অভিনন্দনের জন্য শঙ্খধ্বনি। ২০-২৭ অর্জ্জুনের রথ সম্মুখে আসিলে সৈন্যনিরীক্ষণ। ২৮-৩৭ উভয় সেনাদলে নিজেরই বান্ধব আছেন, ইঁহাদিগকে মারিলে কুলক্ষয় হইবে—ইহা চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ আসিল। ৩৮-৪৪ কুলক্ষয় প্রভৃতি পাপের পরিণাম। ৪৫-৪৭ যুদ্ধ না করা অর্জ্জুনের অভিপ্রায় এবং ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য-যোগ

১-৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনা। ৪-১০ অর্জ্জুনের উত্তর, কর্ত্তব্যমূঢ়তা এবং কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। ১১-১৩ আত্মার আশোচ্যত্ব। ১৪, ১৫ দেহ ও সুখ-দুঃখের অনিত্যতা। ১৬-২৫ সদসদ্বিবেক এবং আত্মার নিত্যত্বাদি স্বরূপ-কথনের দ্বারা উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন। ২৬, ২৭ আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর। ২৮ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে ব্যক্ত ভূতসকলের অনিত্যত্ব ও অশোচ্যত্ব। ২৯, ৩০ লোকসকলের আত্মা দুর্জ্ঞেয় বটে; কিন্তু তুমি সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোক করা ছাড়িয়া দাও। ৩১-৩৮ ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা। ৩৯ সাংখ্যমার্গ অনুসারে বিষয়-প্রতিপাদনের সমাপ্তি, এবং কর্ম্মযোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ। ৪০ কর্ম্মযোগের স্বল্প আচরণও শুভজনক। ৪১ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা। ৪২-৪৪ কর্ম্মকাণ্ডের অনুযায়ী মীমাংসকদিগের অস্থির বুদ্ধির বর্ণনা। ৪৫, ৪৬ স্থির ও যোগস্থ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার উপদেশ। ৪৭ কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী। ৪৮-৫০ কর্ম্মযোগের লক্ষণ এবং কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ৫১-৫৩ কর্ম্মযোগের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি। ৫৪-৭০ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে, কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; এবং উহাতেই প্রসঙ্গানুসারে বিষয়াসক্তি হইতে কাম প্রভৃতির উৎপত্তির ক্রম। ৭১, ৭২ ব্রাহ্মী স্থিতি।

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্ম-যোগ

১, ২ অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন—কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত, বা করিতে থাকা উচিত; কোন্‌টী ঠিক? ৩-৮ সাংখ্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগ দুই নিষ্ঠা থাকিলেও কর্ম্ম কেহ ছাড়িতে পারে না, তাই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে ইহাই আচরণ করিবার জন্য নিশ্চিত উপদেশ। ৯-১৬ মীমাংসকদিগের যজ্ঞার্থ কর্ম্মকেও আসক্তি ছাড়িয়া করিবার উপদেশ, যজ্ঞচক্রের অনাদিত্ব এবং জগতের ধারণার্থ উহার আবশ্যকতা। ১৭-১৯ জ্ঞানী পুরুষে স্বার্থ থাকে না, তাই তিনি প্রাপ্ত কর্ম্ম নিঃস্বার্থ

অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন, কারণ কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারে না। ২০-২৪ জনক প্রভৃতির উদাহরণ; লোকসংগ্রহের মহত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত। ২৫-২৯ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মে ভেদ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীকে সদাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন। ৩০ জ্ঞানীপুরুষের ন্যায় পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ। ৩১, ৩২ ভগবানের এই উপদেশ অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করা অথবা না করার ফল। ৩৩, ৩৪ প্রকৃতির বল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ৩৫ নিষ্কাম কর্ম্মও স্বধর্ম্মেরই করিবে, উহাতে মৃত্যু হইলেও কোনই ভয় নাই। ৩৬-৪১ কামই মনুষ্যকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করিবার জন্য উত্তেজিত করে, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা উহার নাশ। ৪২, ৪৩ ইন্দ্রিয়সকলের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এবং আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক উহাদের নিয়মন।

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ

১-৩ কর্ম্মযোগের সম্প্রদায়পরম্পরা। ৪-৮ জন্মরহিত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা দিব্য জন্ম অর্থাৎ অবতার কখন্ এবং কি কারণে গ্রহণ করেণ—তাহার বর্ণন। ৯, ১০ এই দিব্য জন্মের এবং কর্ম্মের তত্ত্ব জানিলে পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি। ১১, ১২ অন্য প্রণালীতে ভজনা করিলে ঐরূপ ফল, উদাহরণার্থ এই লোকের ফল পাইবার জন্য দেবতাদের উপাসনা। ১৩-১৫ ভগবানের চাতুর্বর্ণ্য প্রভৃতি নির্লিপ্ত কর্ম্ম, উহার তত্ত্ব জানিলে কর্ম্মবন্ধের নাশ এবং ঐরূপ কর্ম্ম করিবার উপদেশ। ১৬-২৩ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের ভেদ, অকর্ম্মই নিঃসঙ্গ কর্ম্ম। উহাই প্রকৃত কর্ম্ম এবং উহা দ্বারাই কর্ম্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৩ অনেক প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণন; এবং ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে কৃত যজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা। ৩৪-৩৭ জ্ঞাতা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ, জ্ঞানের দ্বারা আত্মৌপম্যদৃষ্টি এবং পাপপুণ্যের নাশ। ৩৮-৪০ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়—বুদ্ধি (-যোগ) ও শ্রদ্ধা ইহার অভাবে নাশ। ৪১, ৪২ (কর্ম্ম-) যোগ ও জ্ঞানের পৃথক উপযোগ বলিয়া, উভয়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিবার উপদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাস-যোগ

১, ২ এই স্পষ্ট প্রশ্ন—সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ বা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে ভগবানের এই নিশ্চিত উত্তর যে, উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ৩-৬ সংকল্প ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসীই হয়, এবং কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাসও সিদ্ধ হয় না। এইজন্য বস্তুত উভয়ই এক। ৭-১৩ মন সর্ব্বদাই সন্ন্যস্ত থাকে, এবং কেবল ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্ম করে, তাই কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা অলিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত থাকে। ১৪, ১৫ প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকৃতির, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আত্মার অথবা পরমেশ্বরের মনে হয় ১৬, ১৭ এই অজ্ঞানের নাশে পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি। ১৮-২৩ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত সমদর্শিত্ব, স্থির বুদ্ধি এবং সুখদুঃখের ক্ষমতা বর্ণন। ২৪-২৮ সর্ব্বভূতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মযোগী এই লোকেই সর্ব্বদাই ব্রহ্মভূত, সমাধিস্থ ও মুক্ত থাকেন। ২৯ (কর্ত্তৃত্ব নিজের উপর না লইয়া) পরমেশ্বরকে যজ্ঞ-তপের ভোক্তা ও সর্ব্বভূতের মিত্র জানিবার ফল।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যান-যোগ

১, ২ ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য যে করে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসীর অর্থ নিরগ্নি ও অক্রিয় নহে। ৩, ৪ কর্ম্মযোগীর সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় শম এবং কর্ম্মের কার্য্যকারণের পরিবর্ত্তনের এবং যোগারূঢ়ের লক্ষণ। ৫, ৬ যোগ সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মার স্বাতন্ত্র্য। ৭-৯ জিতাত্মা যোগযুক্তের মধ্যেও সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ১০-১৭ যোগ সাধনের জন্য আবশ্যক আসন ও আহারবিহারের বর্ণন। ১৮-২৩ যোগীর, ও যোগসমাধির, আত্যন্তিক সুখের বর্ণন। ২৪-২৬ মনকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ শান্ত ও আত্মনিষ্ঠ কিরূপে করিতে হইবে? ২৭, ২৮ যোগীই ব্রহ্মভূত ও অত্যন্ত সুখী। ২৯-৩২ প্রাণীমাত্রে যোগীর আত্মৌপম্যবুদ্ধি। ৩৩-৩৬ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনের নিগ্রহ। ৩৭-৪৫ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যোগভ্রষ্ট অথবা জিজ্ঞাসুরও জন্মজন্মান্তরে উত্তম ফল মিলিলে শেষে পূর্ণসিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় সেই বিষয়ের বর্ণন। ৪৬, ৪৭ তপস্বী, জ্ঞানী ও নিছক্ কর্ম্মী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী—এবং উহাদেরও মধ্যে ভক্তিমান কর্ম্মযোগী—শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জ্জুনকে (কর্ম্ম-) যোগী হইবার বিষয়ে উপদেশ।

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

১-৩ কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপণ আরম্ভ। সিদ্ধির জন্য প্রযত্নকারীদিগের স্বল্পপ্রাপ্তি। ৪-৭ ক্ষরাক্ষরবিচার। ভগবানের অষ্টধা অপরা ও জীবরূপী পরা প্রকৃতি; ইহার পরে সমস্ত বিস্তার। ৮-১২ বিস্তারের সাত্ত্বিক আদি সমস্ত অংশে গ্রথিত পরমেশ্বর-স্বরূপের দিগ্‌দর্শন। ১৩-১৫ পরমেশ্বরের ইহাই গুণময়ী ও দুস্তর মায়া, এবং উঁহারই শরণাগত হইলে মায়া হইতে উদ্ধার হয়। ১৬-১৯ ভক্ত চতুর্ব্বিধ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। অনেক জন্মে জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কাম্য ফলের জন্য দেবতাদিগের উপাসনা; কিন্তু ইহাতেও উহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ফল ভগবানই দেন। ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বরূপ অব্যক্ত; কিন্তু মায়ার কারণে ও দ্বন্দ্বমোহের কারণে উহা দুর্জ্ঞেয়। মায়ামোহের নাশে স্বরূপের জ্ঞান। ২৯, ৩০ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সমস্ত এক পরমেশ্বরই—ইহা জানিলে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানসিদ্ধি হয়।

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

১-৪ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ও অধিদেহ, ইহাদের ব্যাখ্যা। ঐ সকলে একই ঈশ্বর আছেন। ৫-৮ অন্তকালে ভগবৎ-স্মরণে মুক্তি। কিন্তু যাহা মনে নিত্য থাকে, তাহাই অন্তকালেও থাকে; অতএব সর্ব্বদাই ভগবানকে স্মরণ করিবার এবং যুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ ৯-১৩ অন্তকালে পরমেশ্বরের অর্থাৎ ওঙ্কারের সমাধিপূর্ব্বক জ্ঞান ও তাহার ফল। ১৪-১৬ ভগবানের নিত্য চিন্তনে পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি। ব্রহ্মলোকাদি গতি নিত্য নহে। ১৭-১৯ ব্রহ্মার দিনরাত, দিনের আরম্ভে অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি এবং রাত্রির আরম্ভে উহাতেই লয়। ২০-২২ এই অব্যক্তেরও অতীত অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ। ভক্তি দ্বারা

তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার প্রাপ্তিতে পুনর্জন্মনিবৃত্তি। ২৩-২৬ দেবযান ও পিতৃযানমার্গ; প্রথম পুনর্জন্মনাশক এবং দ্বিতীয় তাহার বিপরীত। ২৭, ২৮ এই দুই মার্গের তত্ত্ব যে যোগী জানে, তাহার অত্যুত্তম ফল লাভ হয়, অতএব তদনুসারে সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার উপদেশ।

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ

১-৩ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রত্যক্ষ ও সুলভ; অতএব রাজমার্গ। ৪-৬ পরমেশ্বরের অপার যোগসামর্থ্য। প্রাণীমাত্রে থাকিয়াও তাহাতে থাকেন না, এবং প্রাণীমাত্রও তাঁহাতে থাকিয়াও থাকে না। ৭-১০ মায়াত্মক প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি ও সংহার ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়। এত করিলেও তিনি নিষ্কাম, অতএব অলিপ্ত। ১১, ১২ ইহা না বুঝিলে মোহে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরের অবজ্ঞাকারী মূর্খ ও আসুরী। ১৩-১৫ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অনেক প্রকারের উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, তিনিই জগতের পিতামাতা, স্বামী, পোষক এবং ভালমন্দের কর্ত্তা। ২০-২২ শ্রৌত যাগযজ্ঞ প্রভৃতির দীর্ঘ উদ্যোগ স্বর্গপ্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য। যোগক্ষেমের জন্য ইহা আবশ্যক মনে করিলেও উহা ভক্তি দ্বারাও সাধ্য। ২৩-২৫ অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি পর্য্যায়ক্রমে পরমেশ্বরেরই প্রতি ভক্তি, কিন্তু যে প্রকার ভাবনা হইবে এবং যে প্রকার দেবতা হইবে, ফলও সেই প্রকারই প্রাপ্ত হইবে। ২৬ ভক্তি থাকিলে পরমেশ্বর ফুলের পাপড়িতেও সন্তুষ্ট হন। ২৭, ২৮ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার উপদেশ। ইহা দ্বারাই কর্ম্মবন্ধনমোচন ও মোক্ষ। ২৯-৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই। দুরাচারী হউক বা পাপযোনি হউক, স্ত্রী হউক বা বৈশ্য বা শূদ্র হউক, নিঃসীম ভক্ত হইলে সকলেরই একই গতি লাভ হয়। ৩৪ এই মার্গই স্বীকার করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ।

দশম অধ্যায়—বিভূতি-যোগ

১-৩ জন্মরহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং ঋষিগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা জানিলে পাপনাশ হয়। ৪-৬ ঐশ্বরিক বিভূতি ও যোগ। ঈশ্বর হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি ভাবসমূহের সপ্তর্ষিদিগের, এবং মনুর এবং পরম্পরাক্রমে সকলের উৎপত্তি। ৭-১১ যে ভগবদ্ভক্ত ইহা জানে, তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি; কিন্তু তাহারও বুদ্ধি-সিদ্ধি ভগবানই দেন। ১২-১৮ নিজের বিভূতি এবং যোগ বুঝাইবার জন্য ভগবানের নিকট অর্জ্জুনের প্রার্থনা। ১৯-৪০ ভগবানের অনন্ত বিভূতির মধ্য হইতে মুখ্য-মুখ্য বিভূতির বর্ণন। ৪১, ৪২ যে কিছু বিভূতিশালী, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে সমস্ত পরমেশ্বরের তেজ; কিন্তু আংশিক।

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শন-যোগ

১-৪ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত স্বকীয় ঐশ্বরিক রূপ দেখাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। ৫-৮ এ আশ্চর্য্যকারক ও দিব্যরূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টি-জ্ঞান। ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জয়কৃত বর্ণন। ১৫-৩১ বিস্ময় ও ভয়ে নম্র হইয়া অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপস্তুতি, এবং প্রসন্ন হইয়া 'আপনি কে' বলুন, এই প্রার্থনা। ৩২-৩৪ প্রথমে 'আমি কাল' ইহা বলিয়া পরে পূর্ব্ব হইতেই এই কালের দ্বারা গ্রস্ত বীরগণকে তুমি নিমিত্ত হইয়া নিহত কর অর্জ্জুনকে এই উৎসাহজনক উপদেশ প্রদান। ৩৫-৪৬ অর্জ্জুনকৃত স্তব, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং পূর্ব্বের সৌম্য রূপ দেখাইবার জন্য মিনতি। ৪৭-৫১ অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ দুর্লভ। পুনরায় পূর্ব্বস্বরূপধারণ। ৫২-৫৪ ভক্তি বিনা বিশ্বরূপদর্শন দেবতাদেরও সম্ভব নহে। ৫৫ অতএব ভক্তি পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বৈর হইয়া পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে সর্ব্বার্থসারভূত চরম উপদেশ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তি-যোগ

১ পূর্ব্ব অধ্যায়ের সারভূত উপদেশের উপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন—ব্যক্তোপাসনা শ্রেষ্ঠ অথবা অব্যক্তোপসনা শ্রেষ্ঠ? ২-৮ উভয়েতেই একই গতি; কিন্তু অব্যক্তোপাসনা ক্লেশকারক, এবং ব্যক্তোপাসনা সুলভ ও শীঘ্রফলপ্রদ। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মপূর্ব্বক ব্যক্তোপাসনা করিবার বিষয়ে উপদেশ। ৯-১২ ভগবানে চিত্তকে স্থির করিবার অভ্যাস, জ্ঞানধ্যান প্রভৃতি উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। ১৩-১৯ ভক্তিমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবৎপ্রিয়তা। ২০ এই ধর্ম্মের আচরণকারী শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ

১, ২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা। ইহার জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান। ৩, ৪ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের। ৫, ৬ ক্ষেত্র-স্বরূপলক্ষণ। ৭-২১ জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান। ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বরূপ লক্ষণ। ১৮ এই সমস্ত জানিবার ফল। ১৯-২১ প্রকৃতি-পুরুষবিবেক। করিতে-ধরিতে প্রকৃতি, পুরুষ অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা দ্রষ্টা ইত্যাদি। ২২, ২৩ পুরুষই দেহেতে পরমাত্মা। এই প্রকৃতিপুরুষজ্ঞান হইতে পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়। ২৪, ২৫ আত্মজ্ঞানের মার্গ—ধ্যান, সাংখ্যযোগ, কর্ম্ম-যোগ ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণের দ্বারা ভক্তি। ২৬-২৮ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি; ইহার মধ্যে যে অবিনশ্বর আছেন তিনিই পরমেশ্বর। নিজের চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে লাভ। ২৯, ৩০ করিবার, ধরিবার কর্ত্তা প্রকৃতি এবং আত্মা অকর্ত্তা; সমস্ত প্রাণীই একেতে আছে এবং এক হইতে সমস্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয়। ইহা জানিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ৩১-৩৩ আত্মা অনাদি ও নির্গুণ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক হইলেও নির্লিপ্ত। ৩৪ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিলে পরম সিদ্ধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ

১,২ জ্ঞানবিজ্ঞানান্তর্গত প্রাণি-বৈচিত্র্যের গুণভেদে বিচার। ইহাও মোক্ষপ্রদ। ৩, ৪ প্রাণিমাত্রের পিতা পরমেশ্বর এবং তাঁহার অধীনে প্রকৃতি মাতা। ৫-৯ প্রাণিমাত্রে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের পরিণাম। ১০-১৩ এক-এক গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কোন দুইটি চাপিয়া তৃতীয়ের বৃদ্ধি ; এবং প্রত্যেকের বৃদ্ধির লক্ষণ। ১৪-১৮ গুণ-প্রবৃদ্ধি অনুসারে কর্ম্মের ফল, এবং মৃত্যুর পর প্রাপ্ত গতি। ১৯, ২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি। ২১-২৫ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উপর ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার বর্ণন। ২৬, ২৭ একান্তভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমস্ত মোক্ষের, ধর্ম্মের এবং সুখের চরম স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তম-যোগ

১, ২ অশ্বত্থরূপী ব্রহ্মবৃক্ষের বেদোক্ত ও সাংখ্যোক্ত বর্ণনার মিল। ৩-৬ অসঙ্গের দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতীত অব্যয় পদপ্রাপ্তির মার্গ। অব্যয় পদ-বর্ণনা। ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ। জ্ঞানীর নিকট প্রত্যক্ষ। ১২-১৫ পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা। ১৬,১৮ ক্ষরাক্ষর লক্ষণ। ইহার অতীত পুরুষোত্তম। ১৯, ২০ এই গুহ্য পুরুষোত্তমজ্ঞান হইতে সর্ব্বজ্ঞতা ও কৃতকৃত্যতা।

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ-যোগ

১-৩ দৈবী সম্পত্তির ছাব্বিশ গুণ। ৪ আসুরী সম্পত্তির লক্ষণ। ৫ দৈবী সম্পত্তি মোক্ষপ্রদ এবং আসুরী বন্ধনকারণ। ৬-২০ আসুরী লোকদিগের বিস্তৃত বর্ণন। উহাদিগের জন্ম-জন্ম অধোগতি লাভ। ২১, ২২ নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই সকল হইতে দূরে থাকিলে মঙ্গল ২৩, ২৪ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য অকার্য্যের নির্ণয় ও আচরণ করিবার বিষয়ে উপদেশ।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

১-৪ অর্জ্জুনকে প্রশ্ন করিলে প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বর্ণন। যেমন শ্রদ্ধা তেমনি পুরুষ। ৫, ৬ ইহা হইতে ভিন্ন আসুর। ৭-১০ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস আহার। ১১-১৩ ত্রিবিধ যজ্ঞ। ১৪-১৬ তপস্যার তিন ভেদ—শারীর, বাচিক ও মানস। ১৭-১৯ ইহারা প্রত্যেকে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভেদে ত্রিবিধ। ২০-২২ সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দান। ২৩ ওঁতৎসৎ ব্রহ্মনির্দ্দেশ। ২৪-২৭ তন্মধ্যে ওঙ্কারে আরম্ভসূচক, 'তৎ' পদে নিষ্কাম এবং 'সৎ' পদে প্রশস্ত কর্ম্মের সমাবেশ হয়। ২৮ শেষ অর্থাৎ অসৎ ইহলোকে ও পরলোকে নিষ্ফল।

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষসন্ন্যাস-যোগ

১, ২ অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে সন্ন্যাস ও ত্যাগের কর্ম্মযোগমার্গের অনুগত ব্যাখ্যা। ৩-৬ কর্ম্মের ত্যাজ্য-অত্যাজ্য বিষয় নির্ণয় ; যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করাই কর্ত্তব্য ৭-৯ কর্ম্মত্যাগের তিন ভেদ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ; ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ১০, ১১ কর্ম্মফলত্যাগীই সাত্ত্বিক ত্যাগী, কারণ কেহই কর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। ১২ কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষের বন্ধনকারণ হয় না। ১৩-১৫ কোনও কর্ম্ম হইবার পাঁচ কারণ, কেবল মনুষ্যই কারণ নহে। ১৬, ১৭ অতএব আমি করিতেছি, এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে কর্ম্ম করিলেও অলিপ্ত থাকে। ১৮, ১৯ কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মসংগ্রহের সাংখ্যোক্ত লক্ষণ, এবং উহার তিন ভেদ। ২০-২২ সাত্ত্বিক আদি গুণভেদে জ্ঞানের তিন ভেদ। 'অবিভক্তং বিভক্তেষু' ইহা সাত্ত্বিক জ্ঞান। ২৩-২৫ কর্ম্মের ত্রিবিধতা। ফলাশারহিত কর্ম্ম সাত্ত্বিক। ২৬-২৮ কর্ত্তার তিন ভেদ। নিঃসঙ্গ কর্ত্তা সাত্ত্বিক। ২৯-৩২ বুদ্ধির তিন ভেদ। ৩৩-৩৫ ধৃতির তিন ভেদ। ৩৬-৩৯ সুখের তিন ভেদ। আত্ম বুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন সুখ সাত্ত্বিক। ৪০ গুণভেদে সমস্ত জগতের তিন ভেদ। ৪১-৪৪ গুণভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবোৎপন্ন কর্ম্ম। ৪৫, ৪৬ চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিহিত স্বকর্ম্মাচরণেই চরম সিদ্ধি। ৪৭-৪৯ পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বকর্ম্ম সদোষ হইলেও অত্যাজ্য ; সমস্ত কর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসারে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিলেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। ৫০-৫৬ সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় তাহার নিরূপণ। ৫৭, ৫৮ এই মার্গই স্বীকার করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ। ৫৯-৬৩ প্রকৃতিধর্ম্মের সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে না। ঈশ্বরেরই শরণাগত হইতে হইবে। এই গুহ্য বিষয় বুঝিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশ। ৬৪-৬৬ সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া "আমার আশ্রয় লও," সমস্ত পাপ হইতে "আমি তোমাকে মুক্ত করিব" ভগবানের এই চরম আশ্বাস দান। ৬৭-৬৯ কর্ম্ম-যোগমার্গের পরম্পরা পরে প্রচলিত রাখিবার শ্রেয়। ৭০, ৭১ উহার ফলমাহাত্ম্য। ৭২, ৭৩ কর্ত্তব্য-মোহ নষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়া। ৭৪-৭৮ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইবার পর সঞ্জয়কৃত উপসংহার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ

ভারতীয় যুদ্ধের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হইল, এই বিষয়ের পরম্পরা বর্ত্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে—যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথম ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, যদি তোমার যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি"। তদনন্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, আমি নিজের কুলক্ষয় নিজচক্ষে দেখিতে চাহি না। তখন একই স্থানে বসিয়া বসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য সঞ্জয় নামক সূতকে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঞ্জয়ের দ্বারা যুদ্ধের অবিকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন (মভা. ভীষ্ম. ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীষ্ম আহত হন, এবং উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রথমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন, তখন ভীষ্মের নিমিত্ত শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমস্ত বিষয় বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের সৈন্যদিগের বর্ণনা করিলেন; এবং পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে গীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে এই সকল কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীষ্মপর্ব্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২তম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই গীতাই কথিত হইয়াছে। এই পরম্পরা অনুসারে—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে একত্রিত আমার এবং পাণ্ডুর যুদ্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করিল?

রহস্যঃ হস্তিনাপুরের চতুর্দ্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্ত্তমান দিল্লীনগর এই ময়দানের উপরেই সংস্থাপিত। কৌরব-পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ কুরু নামক রাজা এই ময়দানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত হলচালনা করিয়াছিলেন; তাই ইহাকে ক্ষেত্র (বা ক্ষেত) বলা হয়। যখন ইন্দ্র কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে, বা যুদ্ধে, প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, তখন তিনি এই ক্ষেত্রে হলচালনা পরিত্যাগ করিলেন (মভা. শল্য. ৫৩)। ইন্দ্রের এই বরদানের কারণেই এই ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বা পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই ময়দানের বিষয়ে এই কথা প্রচলিত আছে যে, এইখানে পরশুরাম একুশবার সমস্ত পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া

পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন; এবং আধুনিক কালেও এই ক্ষেত্রেই বড় বড় লড়াই হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে কুরুক্ষেত্র দিল্লী হইতে কিছু দূরে হরিয়াণা রাজ্যে অবস্থিত। ট্রেণে বা মোটরে ৪ ঘণ্টার পথ। ইদানীং একটি বিশ্ববিদ্যালয় কুরুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধার্ম্মিক কর্ম্মযোগী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের প্রচেষ্টায় কুরুক্ষেত্রস্থিত প্রাচীন তীর্থসমূহ এবং সরোবরাদির সংস্কার সাধিত হইয়াছে। হিন্দুমিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ গীতোপদেশ স্থান উদ্ধার করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। নিকটেই থানেশ্বর। সেইখানে স্থাণ্বীশ্বর শিবের মন্দির এখনো বিরাজ করিতেছে।—বর্ত্তমান সম্পাদক

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ সঞ্জয় বলিলেন—(২) সেই সময়ে পাণ্ডবসেনাকে ব্যূহরচিত (দণ্ডায়মান) {যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত} দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন (দ্রোণ) আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন যে—

রহস্যঃ মহাভারতে (মভা. ভী. ১৯. ৪-৭; মনু ৭. ১৯১) গীতার পূর্ব্বলিখিত অধ্যায়সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন কৌরবসেনার ভীষ্মরচিত ব্যূহ পাণ্ডবগণ দেখিলেন এবং যখন তাহারা নিজসৈন্য কম দেখিলেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা অনুসারে বজ্র নামক ব্যূহ রচনা করিয়া নিজসৈন্যদিগকে দাঁড় করাইলেন। যুদ্ধে প্রতিদিন এই ব্যূহ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ (৩) হে আচার্য্য! পাণ্ডুপুত্রদিগের এই বৃহৎ সেনা দেখুন, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) এই সেনার ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। (৪) ইহার মধ্যে শূর, মহাধনুর্ধর; ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের সমান যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ, (৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও বীর্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, (৬) এই প্রকারই পরাক্রমশীল যুধামন্যু ও বীর্য্যবান উত্তমৌজা, এবং সুভদ্রার পুত্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর (পাঁচ) পুত্র—এই সকল মহারথীই আছেন।

রহস্যঃ দশ হাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথী

বলে। উত্তরদিকের সেনাদলে যে সকল রথী, মহারথী অথবা অতিরথী ছিলেন, উদ্যোগপর্ব্বের (১৪১ হইতে ১৪৭ পর্য্যন্ত) আট অধ্যায়ে তাঁহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইখানে বলা হইয়াছে যে, ধৃষ্টকেতু শিশুপালের পুত্র। এই প্রকারই, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ, ইহা দুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নহে। যে কুন্তিভোজ রাজাকে কুন্তী পালন করিয়াছিলেন, পুরুজিৎ তাঁহার ঔরস পুত্র ছিলেন, এবং কুন্তিভোজ তাঁহার কৌলিক নাম; এবং ইহাও বর্ণিত দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম্ম, ভীম এবং অর্জ্জুনের মামা ছিলেন (মভা. উ. ১৭১. ২)। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, উভয়েই পাঞ্চাল্য ছিলেন, এবং চেকিতান একজন যদুবংশীয় ছিলেন। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, এই দুইজন অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। শৈব্য শিবিদেশের রাজা ছিলেন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥

অনুবাদ: (৭) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আমার দিকে যে সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি আছেন, তাঁহাদের নামও আমি আপনাকে শুনাইতেছি; অবহিত হইয়া শুনুন। (৮) আপনি এবং ভীষ্ম, কর্ণ এবং রণজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ (দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতর), এবং সোমদত্তের পুত্র (ভূরিশ্রবা), (৯) এবং ইঁহারা ব্যতীত অন্যান্য অনেক শূর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, এবং সকলেই নানাবিধ শস্ত্রচালনে নিপুণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ। (১০) এই প্রকার স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমার এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত বা অগণ্য; কিন্তু ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ পাণ্ডবদিগের সেনা পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত।

রহস্য: এই শ্লোকে 'পর্য্যাপ্ত' ও অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'পর্য্যাপ্ত'র সাধারণ অর্থ 'ব্যস্' বা 'যথেষ্ট'; তাই কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, "পাণ্ডবদিগের সেনা যথেষ্ট আছে এবং আমার যথেষ্ট নাই," কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্ব্বে উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য বর্ণন করিবার সময় উক্ত মুখ্য মুখ্য সেনাপতিদের নাম বলিয়া, দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, "আমার সেনা বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন, এই কারণে আমারই জয় হইবে" (উ. ৫৪, ৬০-৭০)। এই প্রকারই পরে ভীষ্মপর্ব্বে, যখন দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুর্য্যোধন পুনরায় সেনার বর্ণন করিতেছিলেন, সেই সময়েও গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুলির সহিত একই ভাবের শ্লোক তিনি নিজমুখে যেমনটি তেমনই বলিয়াছেন (ভীষ্ম. ৫১. ৪-৬)। এবং, তৃতীয় কথা এই যে, সমস্ত সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জনাই আহ্লাদের সহিত এই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, এই স্থানে 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের "অসংখ্য, অপার বা অসীম" ব্যতীত

অন্য কোনও অর্থই হইতে পারে না। 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের ধাত্বর্থ "চারি দিকে (পরি-) বেষ্টন করিবার যোগ্য (আপ্ = প্রাপণে)"। কিন্তু "অমুক কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত" বা "অমুক মনুষ্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত" এই প্রকার পর্য্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে, চতুর্থী অর্থের অন্য শব্দ যোগ করিয়া দিলে পর্য্যাপ্ত" শব্দের এই অর্থ হয়—"ঐ কার্য্যের জন্য বা মনুষ্যের জন্য যথেষ্ট বা সমর্থ"। এবং যদি 'পর্য্যাপ্ত'র পশ্চাতে অপর কোন শব্দ না রাখা যায়, তবে কেবল 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ হয় "ভরপুর, পরিমিত বা যাহা গণিতে পারা যায়"। আলোচ্য শ্লোকে পর্য্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে অপর কোনও শব্দ নাই, তাই এই স্থলে উহার উপরি-উক্ত দ্বিতীয় অর্থই (পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত) বিবক্ষিত; এবং মহাভারতের অতিরিক্ত অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, দুর্য্যোধন ভয়ে নিজের সৈন্যকে 'অপর্য্যাপ্ত' অর্থাৎ 'যথেষ্ট নহে' বলিতেছেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ দুর্য্যোধনের ভয় পাইবার কথা কোথাও বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু ইহার বিপরীতে ইহা বর্ণিত দেখা যায় যে, দুর্য্যোধনের সুবৃহৎ সেনা দেখিয়া পাণ্ডবগণ বজ্র নামক ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেনা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল (মভা, ভীষ্ম, ১৯. ৫ ও ২১. ১)। পাণ্ডবসেনার সেনাপতি ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, কিন্তু "ভীম রক্ষা করিতেছেন" বলিবার কারণ এই যে প্রথম দিনে পাণ্ডবগণ বজ্র নামক যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য ঐ ব্যূহের অগ্রভাগে ভীমকেই নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব সেনারক্ষক হিসাবে ভীমকেই দুর্য্যোধন সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন (মভা. ভীষ্ম. ১৯. ৪-১১, ৩৩, ৩৪); এবং এই অর্থেই এই উভয় সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে "ভীমনেত্র" ও "ভীষ্মনেত্র" উক্ত হইয়াছে (মভা. ভী. ২০, ১ দেখুন।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১ ।

অনুবাদ: (১১) (তবে এখন) নিয়োগ অনুসারে সকল অয়নে অর্থাৎ সেনার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে থাকিয়া আপনারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ভীষ্মকেই সকল দিক হইতে রক্ষা করুন।

রহস্য: সেনাপতি ভীষ্ম স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং কাহা হইতেও পরাজিত হইবার লোক ছিলেন না। 'সকল দিক হইতেই সকলের উঁহাকেই রক্ষা করিতে হইবে', এই উক্তির কারণস্বরূপে দুর্য্যোধন অন্যস্থলে (মভা. ভী. ১৫. ১৫-২০; ৯৯. ৪০, ৪১) এই কথা আনিয়াছেন যে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমি শিখণ্ডীর প্রতি শস্ত্র চালাইব না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীষ্মের নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। অতএব সকলকে সাবধান করিতে হইবে—

অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং।
মা সিংহ জম্বুকেনেব ঘাতয়েথাঃ শিখণ্ডিনা ॥

"মহাবলবান সিংহকে রক্ষা না করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে বধ করিবে; অতএব জম্বুক-সদৃশ শিখণ্ডীর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।" শিখণ্ডী ব্যতীত অপর সকলকে

চেঁচাইবার জন্য ভীষ্ম একাকীই সমর্থ ছিলেন, কাহারও সহায়তার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইত না।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১২) (ইতোমধ্যে) দুর্য্যোধনের আনন্দ জন্মাইয়া প্রতাপান্বিত বৃদ্ধ কৌরব-পিতামহ (সেনাপতি ভীষ্ম) সিংহের ন্যায় মহা গর্জন করিয়া (লড়াইয়ের শিষ্টাচার হিসাবে) নিজের শঙ্খ বাজাইলেন। (১৩) ইহারই সঙ্গে অনেক শঙ্খ, ভেরী (নওবত), পণব, আনব ও গোমুখ (এই সকল যুদ্ধের বাদ্য) একেবারে বাজিয়া উঠিল এবং এই সমস্ত বাদ্যের ধ্বনি চারিদিকে অত্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। (১৪) অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিষ্ট মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) ও পাণ্ডব (অর্জ্জুন) (প্রত্যুত্তর স্বরূপে নিজ পক্ষও যে প্রস্তুত আছে, তাহাই জানাইবার জন্য) দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। (১৫) হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য (নামক শঙ্খ), অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীষণকর্ম্মা বৃকোদর অর্থাৎ ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ বাজাইলেন; (১৬) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক, (১৭) মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, (১৮) দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর (পঞ্চ) পুত্র, এবং মহাবাহু সৌভদ্র (অভিমন্যু), ইঁহারা সকলে, হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র)! চারিদিকে নিজের নিজের শঙ্খ পৃথক্ পৃথক্ বাজাইলেন। (১৯) আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুমুল শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) অনন্তর কৌরবদিগের ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি শস্ত্রপাতের সময় আসিলে পর, কপিধ্বজ পাণ্ডব অর্থাৎ অর্জ্জুন,

অর্জ্জুন উবাচ

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ (২১) হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলেন—অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! আমার রথ উভয় সেনাদলের মধ্যে চালাইয়া লইয়া দাঁড় করাও, (২২) ইতোমধ্যে যুদ্ধেচ্ছায় প্রস্তুত এই লোকদিগকে আমি দেখি; এবং আমাকে এই রণ-সংগ্রামে কাহাদের সঙ্গে লড়িতে হইবে, এবং (২৩) যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের কল্যাণকামনায় এখানে মিলিত সংগ্রামার্থীদিগকে আমি দেখিয়া লই। সঞ্জয় বলিলেন—(২৪) হে ধৃতরাষ্ট্র! গুড়াকেশ অর্থাৎ আলস্যজয়ী অর্জ্জুন এই প্রকার বলিলে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ (অর্জ্জুনের) উত্তম রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন; এবং—

রহস্য ঃ হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের যে অর্থ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা টীকাকারদিগের মতানুযায়ী। নারদপঞ্চরাত্রেরও 'হৃষীকেশের' এই নিরুক্তি আছে যে হৃষীক=ইন্দ্রিয়গণ এবং উহাদের প্রভু=স্বামী (না-পঞ্চ, ৫. ৮. ১৭); এবং ক্ষীরস্বামীকৃত অমরকোষটীকায় লিখিত আছে যে, হৃষীক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) শব্দ হৃষ্ =আনন্দ দেওয়া এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয়সকল মনুষ্যকে আনন্দ দেয় তাই উহাদিগকে হৃষীক বলে। তথাপি সন্দেহ হয় যে, হৃষীকেশ ও গুড়াকেশের উপরিপ্রদত্ত অর্থ ঠিক কি না। কারণ হৃষীক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) এবং গুড়াকা (অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য) এই শব্দ অপ্রচলিত; হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্য প্রণালীতেও স্থির করা যাইতে পারে। হৃষীক+ঈশ এবং গুড়াকা+ঈশ ইহার পরিবর্ত্তে হৃষী+কেশ এবং গুড়া+কেশ এই প্রকার পদচ্ছেদও করা যাইতে পারে; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে যে, হৃষী অর্থাৎ আনন্দে দণ্ডায়মান বা প্রশস্ত যাঁহার কেশ (চুল) তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, এবং গুড়া অর্থাৎ গূঢ় বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অর্জ্জুন। ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গুড়াকেশ শব্দের এই অর্থ গী. ১০. ২০ সম্বন্ধীয় নিজের টীকায় বিকল্পে ইঙ্গিত করিয়াছেন; এবং সূতের পিতার রোমহর্ষণ নাম অপেক্ষা হৃষীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিকেও অসম্ভব বলা যায় না। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বান্তর্গত নারায়ণীয়োপাখ্যানে বিষ্ণুর মুখ্য মুখ্য নামের নিরুক্তি দিতে দিতে এই অর্থ করা হইয়াছে যে হৃষী অর্থাৎ আনন্দদায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বলা হইয়াছে যে, সূর্য-চন্দ্ররূপ নিজের বিভূতিসমূহের কিরণ দ্বারা সমস্ত জগৎকে আনন্দ প্রদান করেন, তাই উঁহাকে হৃষীকেশ বলা

হয় (শান্তি. ৩৪১. ৪৭ এবং ৩৪২. ৬৪, ৬৫ দেখুন ; উদ্যো. ৬৯ ৯) ; এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শব্দও কেশ অর্থাৎ কিরণ শব্দ হইতে উৎপন্ন (শা. ৩৪১. ৪৭)। তন্মধ্যে যে কোন অর্থ গ্রহণ করুন না কেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই নাম রাখিবার সর্ব্বাংশে যোগ্য কারণ বলা যাইতে পারে না। তবে এই দোষ নিরুক্তিকারদিগের নহে। যে ব্যক্তিবাচক বা বিশেষ নাম অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে, তাহার নিরুক্তিব্যাখ্যাকালে এই প্রকার আপত্তি আসা বা মতভেদ হওয়া খুবই সহজ কথা।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬ ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্টেবমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতং ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ : (২৫) ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদের সম্মুখে (তিনি) বলিলেন যে, "অর্জ্জুন! এই স্থলে একত্রিত এই কৌরবদিগকে দেখ"। (২৬) তখন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, ঐস্থলে একত্রিত (নিজেরই) অতিবৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্য্য, মামা, ভাই, পুত্র, নাতি, মিত্র (২৭) শ্বশুর এবং স্নেহপাত্র সকলে উভয় সেনাদলেই আছে ; (এবং এই প্রকার) একত্রিত ঐ সকলেই আমার বান্ধব, ইহা দেখিয়া কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন (২৮) পরম করুণাগ্রস্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন—

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ ॥
ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা ॥ ৩২ ॥
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহা।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি হতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিন্য স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ : অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছায় (এখানে) একত্রিত এই স্বজনগণকে দেখিয়া (২৯) আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে ; (৩০) গাণ্ডীব (ধনুক) হাত হইতে স্খলিত হইতেছে এবং সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে ; দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না এবং আমার মন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। (৩১) এই প্রকার হে কেশব! (আমি সমস্ত) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং স্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ (হইবে এরূপ) দেখিতেছি না। (৩২) হে কৃষ্ণ! আমার জয়লাভের ইচ্ছা নাই, রাজ্যও চাহি না আর সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! রাজ্য, উপভোগ বা প্রাণ থাকিলেই বা আমার তাহাতে কি প্রয়োজন? (৩৩) যাহাদের জন্য রাজ্যের, উপভোগের এবং সুখের ইচ্ছা করিতে হইত, সেই এই সকল লোকেরাই জীবন ও সম্পদের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। (৩৪) আচার্য্য, অতিবৃদ্ধ, বালক, দাদা, মামা, শ্বশুর, নাতি, শালা ও সম্বন্ধী (৩৫) যদিও ইহারা (আমাকে) মারিবার জন্য দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুসূদন! ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যও আমি (ইহাদিগকে) মারিবার ইচ্ছা করি না ; পৃথিবীর জন্য তো দূরের কথা। (৩৬) হে জনার্দ্দন! এই কৌরবদিগকে মারিয়া আমার কি-ইবা ভাল হইবে? যদিও ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার পাপই হইবে। (৩৭) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবদিগকে আমার মারা উচিত নহে, কারণ হে মাধব! স্বজনদিগকে মারিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইব?

রহস্য : অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ (বসিষ্ঠস্মৃ. ৩. ১৬) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য আগত, বিষদাতা, শস্ত্রহস্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পত্তিহরণকারী এবং স্ত্রী বা ক্ষেত্রের অপহারক—এই ছয়জন আততায়ী। মনুও বলেন যে, এই দুষ্টদিগকে বেধড়ক মারিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোন পাপ নাই (মনু ৮. ৩৫০, ৩৫১)

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদঃ (৩৮) লোভেতে নষ্টবুদ্ধি উহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ যদিও না দেখে, (৩৯) তথাপি হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়ের দোষ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, অতএব এই পাপ হইতে পরাঙ্মুখ হইবার বিষয় আমার মনে কি প্রকারে না আসিয়া থাকিতে পারে?

রহস্যঃ প্রথম হইতেই যুদ্ধে গুরুবধ, সুহৃদ্বধ ও কুলক্ষয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ হইলে পর যুদ্ধসম্বন্ধীয় স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে অর্জ্জুনের যে সংশয় আসিয়াছিল, তাহার মূল কি? গীতাতে যাহা পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? এবং ঐ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের মহত্ত্ব কি? এই সকল প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের প্রথম এবং পরে চতুর্দ্দশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহা দেখুন। এই স্থলে এমন সাধারণ যুক্তিরই উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহা দ্বারা লোভেতে বুদ্ধিনাশের কারণে দুষ্টেরা নিজেদের দুষ্টভাব জানিতে না পারিলেও দুষ্টদিগের ফাঁদে চতুর ব্যক্তিগণের পড়িয়া দুষ্ট হওয়া উচিত নহে—ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ—উহাদিগের নীরব থাকা উচিত। এই সাধারণ যুক্তিসকল এইরূপ প্রসঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, অথবা প্রয়োগ করা উচিত? ইহাও উপরের সমানই এক গুরুতর প্রশ্ন, এবং গীতার অনুযায়ী ইহার উত্তর আমি গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৪৩) নিরূপণ করিয়াছি। গীতার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে যে বিচার আছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের যে সন্দেহ আসিয়াছিল, সেই সন্দেহ নিবৃত্তি করিবার জন্য করা হইয়াছে; এই কথার উপর মনোযোগ রাখিলে গীতার তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে বিরোধ বিবাদ আসিয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর মরিতে-মারিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এই কারণেই উক্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। আধুনিক ইতিহাসে যেখানে যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেইখানে সেইখানে এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে। থাক্; পরে কুলক্ষয় হইতে যে যে অনর্থ হয়, অর্জ্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।

অনুবাদঃ (৪০) কুলক্ষয়ের ফলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, এবং (কুল-) ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সমুদয় কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়; (৪১) হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের প্রসার

হইলে কুল-স্ত্রীগণ বিপথগামী হয়; হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীলোকেরা বিপথগামী হইলে বর্ণসঙ্কর আসে। (৪২) এবং বর্ণসঙ্কর আসিলে উহা কুলঘাতককে ও (সমগ্র) কুলকে নিশ্চয়ই নরকে লইয়া যায়; এবং পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়াসকল লুপ্ত হইলে তাহাদের পিতৃগণও পতিত হয়। (৪৩) কুলঘাতকদিগের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষের ফলে পুরাতন জাতি ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; (৪৪) এবং হে জনার্দ্দন। আমি শুনিয়া আসিতেছি যে, যে মনুষ্যগণ কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদের নিশ্চয়ই নরকবাস হয়।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদঃ (৪৫) দেখ, আমি রাজ্যসুখের লোভে স্বজনহত্যায় উদ্যত হইয়াছি বটে, (সত্যই) ইহা দ্বারা আমি বড়ই পাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি! (৪৬) ইহা অপেক্ষা নিঃশস্ত্র হইয়া প্রতীকার করা ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই) শস্ত্রধারী কৌরব আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে। সঞ্জয় বলিলেন—(৪৭) রণভূমিতে এইপ্রকার বলিয়া, শোকব্যথিতচিত্ত অর্জ্জুন (হাতের) ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথে স্বস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

রহস্যঃ রথে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার প্রণালী ছিল, অতএব "রথে স্বস্থানে বসিয়া পড়িলেন" এই শব্দ হইতে, খিন্ন হইবার কারণে উহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, এই অর্থই অধিক ব্যক্ত হইতেছে। মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ প্রায় দুই চাকার হইত; বড় বড় রথে চার-চার ঘোড়া জোতা যাইত এবং রথী ও সারথী—উভয়ে সম্মুখ ভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর এক প্রকার বিশেষ ধ্বজা লাগানো হইত। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, অর্জ্জুনের ধ্বজার উপর স্বয়ং হনুমানই বসিয়া থাকিতেন।

গীতারহস্যের প্রথম (পৃষ্ঠা ৩), তৃতীয় (পৃষ্ঠা ৫৩), এবং একাদশ (পৃষ্ঠা ৩০৪) প্রকরণে এই সংকল্পের অর্থ করা হইয়াছে এই যে, গীতাতে কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই নহে, কিন্তু উহাতে ব্রহ্মবিদ্যামূলক কর্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সংকল্প মহাভারতে না থাকিলেও ইহা গীতার উপর সন্ন্যাসমার্গীর টীকা রচিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে; কারণ সন্ন্যাসমার্গের কোন পণ্ডিতই এইরূপ সংকল্প লিখিবেন না। এবং ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, গীতাতে সন্ন্যাসমার্গ প্রতিপাদিত হয় নাই; কিন্তু কর্ম্মযোগের, শাস্ত্র বুঝিয়া, সংবাদরূপে আলোচনা হইয়াছে। সংবাদাত্মক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির ভেদ গীতারহস্যের চতুর্দ্দশ প্রকরণের আরম্ভে উক্ত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥
ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—(১) এই প্রকার করুণাচ্ছন্ন অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) ইহা বলিলেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন—(২) হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটকালে তোমার (মনে) এই মোহ (কশ্মল) কোথা হইতে আসিল? আর্য্য অর্থাৎ সাধুপুরুষেরা (কখনও) এরূপ আচরণ করেন নাই, ইহা অধোগতিতে লইয়া যায়, এবং অপকীর্ত্তিসাধক। (৩) হে পার্থ। এরূপ কাপুরুষ হইও না! ইহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। হে শত্রুগণের তাপদাতা! মনের এই ক্ষুদ্র দৌর্বল্য ছাড়িয়া (যুদ্ধের জন্য) দাঁড়াও!

রহস্য ঃ এই প্রসঙ্গে আমি পরন্তপ শব্দের অর্থ তো করিয়া দিয়াছি; কিন্তু অনেক টীকাকারের এই মত আমার নিকট যুক্তিসংগত বোধ হয় না যে, অনেক স্থানের বিশেষণরূপী সম্বোধন বা কৃষ্ণার্জ্জুনের নাম গীতায় হেতুগর্ভিত অথবা বিশেষ অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমার মত এই যে, পদ্যরচনায় অনুকূল নামসমূহের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব কয়েক বার আমি শ্লোকে প্রযুক্ত নামগুলিরই হুবহু অনুবাদ না করিয়া 'অর্জ্জুন' বা 'শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ সাধারণ অনুবাদ করিয়া দিয়াছি।

"আর্য্য" শব্দটি জাতি বা গোষ্ঠীবোধকরূপে সংস্কৃতে কখনো ব্যবহৃত হয় নাই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কিছু ইংরেজ এবং তাঁহাদের অনুসরণে কতিপয় ইংরেজভাবদাস পণ্ডিত "আর্য্য" শব্দকে জাতিবোধক ভাবে ব্যবহার করিয়া প্রাচীন ভারতের সমুন্নত মানবগোষ্ঠীকে বহিরাগত বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন। 'আর্য্য' শব্দটি সংস্কৃত এবং তাহার অর্থ হইতেছে সদাচারপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সজ্জন

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামম্ অকর্ত্তব্যম্ অনাচরন্ ।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ, স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥ — বর্ত্তমান সম্পাদক

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(৪) হে মধুসূদন! আমি (পরম) পূজ্য ভীষ্ম

ও দ্রোণের সঙ্গে হে শত্রুনাশন! যুদ্ধে বাণের দ্বারা কি প্রকারে লড়িব? (৫) মহাত্মা গুরুলোকদিগকে না মারিয়া এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়া উদরপূর্ত্তিও শ্রেয়স্কর; কিন্তু অর্থলোলুপ (হইলেও) গুরুলোকদিগকে মারিলে ইহজগতেই আমাকে উঁহাদিগের রক্তমাখা ভোগ ভোগ করিতে হইবে।

রহস্য ঃ 'গুরুলোকদিগকে' এই বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা 'খুব বৃদ্ধদিগের'ই অর্থ লইতে হইবে। কারণ বিদ্যাশিক্ষাদাতা গুরু এক দ্রোণাচার্য্য ছাড়িয়া সৈন্যমধ্যে আর কেহ ছিলেন না। যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্ব্বে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যের ন্যায় গুরুলোকদিগের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়া নম্রভাবে তাঁহার নিকটে গেলেন, তখন শিষ্টসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য পালনকর্ত্তা যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করিয়া সকলে বুঝাইলেন যে, দুর্য্যোধনের পক্ষে তাঁহারা কেন লড়িবেন।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ ।
ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥

"ইহাই তো সত্য যে, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; অতএব হে যুধিষ্ঠির মহারাজ! কৌরবেরা আমাকে অর্থের দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়াছে" (মভা. ভী. অ. ৪৩. শ্লো. ৩৫. ৫০. ৭৬)। উপরে যে "অর্থলোলুপ" শব্দ আছে, তাহা এই শ্লোকেরই অর্থদ্যোতক।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ (৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে (উঁহারা) জয় করেন—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে মারিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই এই কৌরবেরাই (যুদ্ধের জন্য) সম্মুখে অবস্থিত করিতেছে!

রহস্য ঃ 'গরীয়ঃ' শব্দ প্রকাশ পাইতেছে যে, অর্জ্জুনের মনে "অধিকাংশ লোকের অধিক সুখের" ন্যায় কর্ম্ম ও অকর্ম্মের লঘুত্ব-গুরুত্ব বুঝিবার কষ্টি ছিল; কিন্তু ঐ কষ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। গীতারহস্য পৃঃ ৭৫-৭৮ দেখুন।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢচেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) দীনতাবশতঃ আমার স্বাভাবিক বৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে,

(আমার নিজের) ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা যথার্থ শ্রেয়স্কর, তাহাই আমাকে বল। আমি তোমার শিষ্য। শরণাগত আমাকে বুঝাও। (৮) কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য বা দেবতাদিগের (স্বর্গের) রাজত্ব পাইলেও আমার দৃষ্টিতে এমন কোন (সাধন) পড়িতেছে না, যাহা ইন্দ্রিয়শোষক আমার এই শোক দূর করিয়া দেয়। সঞ্জয় বলিলেন — (৯) এই প্রকার শত্রুসন্তাপী গুড়াকেশ অর্থাৎ অর্জ্জুন হৃষীকেশ- শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন; এবং "আমি লড়িব না" বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। (১০) (আবার) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র)! উভয় সেনার মধ্যে বিষণ্ণোপবিষ্ট অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাসিয়া বলিলেন।

রহস্য: এক দিকে তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম এবং অপরদিকে গুরুহত্যা ও কুলক্ষয়-জনিত পাপের ভয়—এই টানাটানির মধ্যে "মরি কি মারি" এই গোলযোগে পড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জ্জুনকে এখন ভগবান এই জগতে উহার প্রকৃত কর্ত্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। অর্জ্জুনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্মের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই জন্য, যে সকল উদার পুরুষ পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের আত্মার পূর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গীতোক্ত উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন যে, সংসারের চালচলন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের জীবন-নির্ব্বাহের অনাদিকাল হইতে দুই মার্গ চলিয়া আসিতেছে (গী. ৩.৩; ও গী. র.প্র. ১১ দেখুন)। আত্মজ্ঞান লাভের পর শুকের ন্যায় পুরুষ সংসার ছাড়িয়া আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আত্মজ্ঞানী জ্ঞানলাভের পরেও স্বধর্ম্মানুসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতবিধ ব্যবহারে নিজের সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্যনিষ্ঠা বলে এবং দ্বিতীয়কে কর্ম্মযোগ বা যোগ বলে (শ্লো. ৩৯ দেখুন)। যদিও উভয় নিষ্ঠাই প্রচলিত আছে, তথাপি উহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই অধিকতর শ্রেয়ঃ—গীতার এই সিদ্ধান্ত পরে বলা যাইবে (গী. ৫.২)। এই উভয় নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে অর্জ্জুনের মন সন্ন্যাসনিষ্ঠার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে প্রথমে অর্জ্জুনের ভুল তাঁহাকে বুঝানো গেল; এবং পরে ৩৯তম শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন করা ভগবান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাংখ্যমার্গী পুরুষ জ্ঞানলাভের পরে কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান এবং কর্ম্মযোগের ব্রহ্মজ্ঞান কিছু বিভিন্ন নহে। তখন সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে দেখিলেও আত্মা যদি অবিনাশী ও নিত্য হয়, তবে "আমি অমুককে কি প্রকারে মারিব" এই বকাবকি বৃথা। এইরূপ কিছু উপহাসের সহিত অর্জ্জুনকে ভগবান প্রথমে বলিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ: শ্রীভগবান বলিলেন—(১১) যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি

তাহারই জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ! কাহারও প্রাণ (চাই) যাক বা (চাই) থাক, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জন্য শোক করেন না।

রহস্য: এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার জন্য শোক করেন না। তন্মধ্যে যাইবার জন্য শোক করা তো মামুলী কথা, উহা না করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু টীকাকারগণ, প্রাণ থাকিবার জন্য শোক কিরূপ এবং কেন করিতে হয়, সেই সংশয় করিয়া অনেক বিচার করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্খ ও অজ্ঞানী লোকদের প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ। কিন্তু এইটুকু চুলের গিঁট খুলিতে থাকা অপেক্ষা 'শোক করা' শব্দেরই 'ভাল বা মন্দ লাগা' অথবা 'পরোয়া করা' এইরূপ ব্যাপক অর্থ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। এখানে এইটুকুই বক্তব্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ: (১২) দেখ না, এরূপ তো হয়ই না যে, আমি (পূর্ব্বে) কখনও ছিলাম না; তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ (পূর্ব্বে) ছিলেন না; এবং এমনও হইতে পারে না যে, আমরা সকলে ইহার পরে থাকিব না।

রহস্য: এই শ্লোকের উপর রামানুজভাষ্যে যে টীকা আছে, তাহাতে লিখিত আছে,—এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং "তুমি ও রাজন্যবর্গ" অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যদি পূর্ব্বে (অতীতকালে) ছিল এবং পরে হইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্মা, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও নিত্য। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে, ইহা সাম্প্রদায়িক জেদের। কারণ এই স্থলে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সকলই নিত্য; উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এখানে বলা হয় নাই এবং বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত (গী. ৮.৪; ১৩.৩১) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্মা আমি অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ: (১৩) যে প্রকার দেহধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারই (পরে) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। (অতএব) এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না।

রহস্য: অর্জ্জুনের মনে ইহাই তো বড় ভয় বা মোহ ছিল যে, "অমুককে আমি কিরূপে মারি।" এই হেতু উহা দূর করিবার জন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে ভগবান প্রথমে মরা কি আর মারা কি, ইহারই তত্ত্ব বুঝাইতেছেন (শ্লোক ১১-৩০)। মনুষ্য কেবল নিছক দেহরূপী বস্তুই নহে, বরং দেহ ও আত্মার সমুচ্চয়। তন্মধ্যে 'আমি'—অহঙ্কাররূপে ব্যক্ত আত্মা নিত্য ও অমর। উহা আজ আছে, কাল ছিল এবং কালও থাকিবেই। অতএব মরা বা মারা শব্দ উহার জন্য উপযুক্ত ধরাই যায় না এবং উহার

জন্য শোক করা উচিত নহে। এখন অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা যে অনিত্য ও নশ্বর, তাহা তো সুস্পষ্ট। আজ নহে তো কাল, কাল নহে তো শত বর্ষেই হইল, উহার তো বিনাশ হইবেই—**অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ** (ভাগ. ১০. ১. ৩৮); এবং এক দেহ ছাড়িয়া গেলেও তো কর্ম্মানুসারে পরে আর এক দেহ না আসিয়া থাকিতে পারে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে। সারকথা, দেহ বা আত্মা, উভয় দৃষ্টিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা পাগলামী। ভাল, পাগলামীই হইল, কিন্তু একথা তো নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে যে, বর্ত্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে ক্লেশ হয়, উহার জন্য শোক কেন না করি? অতএব এক্ষণে ভগবান এই কায়িক সুখদুঃখের স্বরূপ বলিয়া দেখাইতেছেন যে, উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ (১৪) হে কুন্তিপুত্র! শীতোষ্ণ বা সুখদুঃখপ্রদ মাত্রাসকল অর্থাৎ বাহ্য জগতের পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের সহিত) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপত্তি হয় এবং ধ্বংস হয়; (অতএব) উহা অনিত্য অর্থাৎ বিনশ্বর। হে ভারত! (শোক না করিয়া) উহা তুমি সহ্য কর। (১৫) কারণ হে নরশ্রেষ্ঠ! সুখ ও দুঃখ যে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সমান, এবং যিনি ইহাতে ব্যথা প্রাপ্ত হন্ না, তিনিই অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত ব্রহ্মের অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন।

রহস্যঃ যে ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই যে নামরূপাত্মক জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানে না, সে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত শীতোষ্ণ প্রভৃতি বা সুখদুঃখ প্রভৃতি বিকারসকল সত্য মনে করিয়া আত্মাতে উহার অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে দুঃখ পীড়া দেয়। কিন্তু যিনি জানিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিকারই প্রকৃতির, আত্মা অকর্ত্তা ও অলিপ্ত, তাঁহার নিকট সুখ ও দুঃখ একই। এখন অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন যে, এই সমবুদ্ধি দ্বারা তুমি উহা সহ্য কর। এবং এই অর্থই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যে 'মাত্রা' শব্দের অর্থ এই প্রকার করা হইয়াছে—'**মীয়তে এভিরিতি মাত্রাঃ**' অর্থাৎ যাহা দ্বারা বাহিরের পদার্থ পরিমাপ করা যায় বা জানা যায়, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা যায়। কিন্তু মাত্রার ইন্দ্রিয় অর্থ না করিয়া, কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপা যায় যে শব্দ-রূপ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ তাহাদিগকে মাত্রা বলে এবং উহাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত যে স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয়, তাহাকে মাত্রাস্পর্শ বলে। এই অর্থই আমি স্বীকার করিয়াছি। কারণ এই শ্লোকের বিচার গীতায় পরে যেখানে আসিয়াছে (গী. ৫. ২১-৩৩) সেখানে 'বাহ্য-স্পর্শ' শব্দ আছে; এবং 'মাত্রাস্পর্শ' শব্দের সংস্কৃত অর্থের সদৃশ অর্থ করিলে এই দুই শব্দের অর্থ একই হইয়া যায়। যদিও এই প্রকারে এই দুই শব্দ মিলিয়া-জুলিয়া আছে, তথাপি মাত্রাস্পর্শ শব্দ প্রাচীন দেখা যাইতেছে।

কারণ মনুস্মৃতিতে (৬. ৫৭) এই অর্থেই মাত্রাসঙ্গ শব্দ আসিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরিলে পর জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার মাত্রাসকলের সহিত অসংসর্গ (মাত্রাঽসংসর্গঃ) হয় অর্থাৎ উহা মুক্ত হইয়া যায়, এবং উহাতে সংজ্ঞা থাকে না (বৃ. মাধ্যং. ৪. ৫. ১৪; বেসূ. শাংভা. ১. ৪. ২২)। শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখ পদ উপলক্ষণাত্মক, ইহাতে রাগ-দ্বেষ, সদসৎ ও মৃত্যু-অমরত্ব প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ দ্বন্দ্বসমূহের সমাবেশ হয়। এই সকল মায়া-জগতের দ্বন্দ্ব। এইজন্য সুস্পষ্ট যে, অনিত্য মায়াজগতের এই দ্বন্দ্বসকল শান্তভাবে সহ্য করিয়া এই সকল দ্বন্দ্ব হইতে বুদ্ধিকে না পৃথক করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না (গী. ২. ৪৫; ৭. ২৮ ও গী. র. প্র. ৯ পৃ. ১৯৮ ও ২২১ দেখুন)। এখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অর্থই ব্যক্ত করিয়া দেখাইতেছেন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদঃ (১৬) যাহা নাই (অসৎ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে (সৎ) তাহার অভাব হয় না; তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ 'সৎ ও অসৎ' উভয়ের অন্ত দেখিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ অন্ত দেখিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

রহস্যঃ এই শ্লোকের 'অন্ত' শব্দের অর্থ এবং 'রাদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্ত' ও 'কৃতান্ত' শব্দসমূহের (গী. ১৮. ১৩) 'অন্ত' শব্দের অর্থ একই। শাশ্বতকোষে (৩৮১) 'অন্ত' শব্দের এই অর্থ আছে—"স্বরূপপ্রান্তয়োরন্তমন্তিকেঽপি প্রযুজ্যতে"। এই শ্লোকে সৎ-এর অর্থ ব্রহ্ম এবং অসৎ-এর অর্থ নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎ (গী. র. প্র. ৯ পৃ. ১৯৫-১৯৬; এবং ২১১-২১৩ দেখুন)। স্মরণ থাকে যেন, "যাহা আছে উহার অভাব হয় না' ইত্যাদি তত্ত্ব দেখিতে যদিও সৎকার্য্যবাদের ন্যায় দেখা যায়, তথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক। যেখানে এক বস্তু হইতে অপর বস্তু নির্ম্মিত হয়—উদা. বীজ হইতে বৃক্ষ—সেখানে সৎকার্য্যবাদের তত্ত্ব উপযোগী হয়। বর্ত্তমান শ্লোকে এই ধরণের প্রশ্ন হয় নাই, বক্তব্য এইটুকু যে, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, উহার অস্তিত্ব (ভাব) ও অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই উহার অভাব, এই দুই নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই বজায় আছে। এই প্রকার ক্রমে দুইয়ের ভাব-অভাবকে নিত্য মানিয়া লইলে পরে আবার স্বতই কহিতে হয় যে, যাহা সৎ' উহার নাশ হইয়া উহারই 'অসৎ' হয় না। কিন্তু এই অনুমান, এবং সৎকার্য্যবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর কার্য্যকারণরূপ উৎপত্তি, এই দুই এক নহে (গী. র. প্র. ৭ পৃ. ১৩৬ দেখুন)। মাধ্ব ভাষ্যে এই শ্লোকের 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' এই প্রথম চরণের 'বিদ্যতে ভাবঃ' ইহার 'বিদ্যতে + অভাবঃ' এইরূপ পদচ্ছেদ আছে এবং উহার এই অর্থ করা হইয়াছে যে, অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভাব অর্থাৎ নাশ হয় না। এবং যখন দ্বিতীয় চরণে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, সতেরও নাশ হয় না, তখন নিজের দ্বৈতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলেন যে, সৎ ও অসৎ উভয় নিত্য! কিন্তু এই অর্থ সরল নহে, ইহাতে টানাবুনা আছে। কারণ স্বাভাবিক রীতিতে দেখা যায় যে, পরস্পরবিরোধী অসৎ ও সৎ শব্দের সমানই অভাব ও ভাব এই দুই বিরোধী শব্দও এইস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' এস্থলে

'নাভাবো'তে যদি অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহা স্পষ্ট যে, প্রথম চরণে ভাব শব্দই থাকা উচিত। ইহার অতিরিক্ত, অসৎ ও সৎ উভয়ই নিত্য, একথা বলিবার জন্য 'অভাব' ও 'বিদ্যতে' এই পদগুলিকে দুইবার প্রয়োগ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের উক্তি অনুসারে যদি এই দ্বিরুক্তিকে আদরার্থক স্বীকার করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ব্যক্ত বা দৃশ্য জগতে আগত মনুষ্যের শরীর নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদ্গীতা অনুসারে দেহকেও নিত্য স্বীকার করা যায় না ; স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে যে, একটি নিত্য এবং অপরটি অনিত্য। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কি প্রকার টানাবুনা করা হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি নমুনাস্বরূপে এখানে এই শ্লোকের মধ্বভাষ্যানুযায়ী অর্থ লিখিয়া দিয়াছি। হোক, যাহা সৎ তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, অতএব সৎ-স্বরূপ আত্মার জন্য শোক করা উচিত নহে ; এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে নামরূপাত্মক দেহ প্রভৃতি অথবা সুখদুঃখ প্রভৃতি বিকার মূলেই নশ্বর, অতএব উহাদের নাশের জন্য শোক করাও উচিত নহে। ফলত আরম্ভে অর্জ্জুনকে এই যে বলা হইয়াছে যে 'যাহার বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক করিতেছ', উহা সিদ্ধ হইল। এক্ষণে 'সৎ' ও 'অসৎ'-এর অর্থই পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে আরও স্পষ্টরূপে বলা হইতেছে—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ : (১৭) স্মরণ থাকে যেন, এই সম্পূর্ণ (জগৎ) যিনি ব্যক্ত করিয়াছেন অথবা ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তিনি (মূল আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম) অবিনশ্বর। এই অব্যয় তত্ত্ব বিনষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে।

রহস্য : পূর্ব্বের শ্লোকে যাহাকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহারই এই বর্ণন। ইহা বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই 'নিত্য' শ্রেণীতে আসে। এখন বলিতেছেন যে, অনিত্য বা অসৎ কাহাকে বলিতে হইবে—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ : (১৮) বলা হইয়াছে যে, শরীরের স্বামী যে (আত্মা) তাহা নিত্য অবিনাশী ও অচিন্ত্য, উহা যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। অতএব হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর।

রহস্য : সারকথা, এই প্রকার নিত্য-অনিত্য বিচার করিলে তো এই ভাবই মিথ্যা হয় যে, "আমি অমুককে মারিতেছি" এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য অর্জ্জুন যে কারণ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নির্মূল হয়। এই অর্থই এক্ষণে আরও অধিক স্পষ্ট করিতেছেন—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতে নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ : (১৯) (শরীরের প্রভু বা আত্মা)কেই যে হন্তা বলে বা মনে করে যে উহা মরিতেছে, এই উভয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। (কারণ) এই (আত্মা) না মারেন, আর না নিহতও হন।

রহস্য : কারণ এই আত্মা নিত্য ও স্বয়ং অকর্ত্তা, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতিরই। কঠোপনিষদে ইহা এবং পরবর্ত্তী শ্লোক আসিয়াছে (কঠ. ২. ১৮. ১৯)। ইহা ব্যতীত মহাভারতের অন্য স্থানেও এইরূপ বর্ণন আছে যে, কাল কর্ত্তৃক সমস্ত গ্রস্ত, এই কালের ক্রীড়াই এই "মারা ও মরা"র লৌকিক নামে উক্ত হয় (শাং. ২৫. ১৫)। গীতাতেও (১১. ৩৩) পরে ভক্তিমার্গের ভাষায় এই তত্ত্বই ভগবান অর্জ্জুনকে আবার বলিয়াছেন যে, ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতিকে কালস্বরূপে আমিই পূর্ব্বে মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত হও।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১ ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অনুবাদ : (২০) এই (আত্মা) কখনও জন্মায় না, আর মরেও না ; ইহাও নহে যে, ইহা (একবার) হইয়া আর হইবে না ; ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং শরীর নিহত হইলেও মরিয়া যায় না। (২১) হে পার্থ ! যে জানিয়াছে যে, এই আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যক্তি কাহাকে কি প্রকারে বধ করাইবে এবং কাহাকে কি প্রকারে বধ করিবে ? (২২) যে প্রকার (কোন) মনুষ্য পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন গ্রহণ করে, সেই প্রকারই দেহী অর্থাৎ শরীরের স্বামী আত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর ধারণ করে।

রহস্য : বস্ত্রের এই উপমা প্রচলিত। মহাভারতের একস্থানে এক গৃহ (শালা) ছাড়িয়া অপর গৃহে যাইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (শাং ১৫. ৫৬) ; এবং এক মার্কিন গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নূতন কাপড় বাঁধিবার দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বের ত্রয়োদশ শ্লোকে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, এই তিন অবস্থার প্রতি যে ন্যায় প্রযুক্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরীরের বিষয়ে করা গেল।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽয়মশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : (২৩) ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে শস্ত্র কাটিতে পারে না, ইহাকে অগ্নি

দাহ করিতে পারে না, সেইরূপই ইহাকে জল ভিজাইতে বা গলাইতে পারে না। এবং বায়ু শুষ্কও করিতে পারে না। (২৪) (সর্ব্বতোভাবে) অকাট্য অচ্ছেদ্য), অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য এই (আত্মা) নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন। (২৫) এই আত্মাকেই অব্যক্ত (অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না), অচিন্ত্য (অর্থাৎ যাহা মনের দ্বারাও জানা যায় না), এবং অবিকার্য্য (অর্থাৎ যাহার কোনও বিকারের উপাধি নাই) বলা হয়। এইজন্য এই (আত্মাকে) এই প্রকার বুঝিয়া, উহার জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে।

রহস্য ঃ এই বর্ণনা উপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই বর্ণনা নির্গুণ আত্মার, সগুণের নহে। কারণ অবিকার্য্য বা অচিন্ত্য বিশেষণ সগুণের প্রতি লাগিতে পারে না (গী. র. প্র. ৮ দেখুন)। আত্মার বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রের যে চরম সিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তিতে শোক না করিবার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ এই পূর্ব্বপক্ষ করে যে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে করি না, এইজন্য তোমার যুক্তি আমার গ্রাহ্য নহে; তবে এই পূর্ব্বপক্ষের প্রথম উল্লেখ করিয়া ভগবান উহার এই উত্তর দিতেছেন যে,—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ঃ (২৬) অথবা, যদি তুমি স্বীকার কর যে, এই আত্মা (নিত্য নহে, শরীরের সঙ্গেই) সর্ব্বদা জন্মায় বা সর্ব্বদা মরে, তাহা হইলেও হে মহাবাহু! উহার জন্য শোক করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। (২৭) কারণ যে জন্মায় উহার মৃত্যু নিশ্চিত, এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত; এইজন্য (এই) অপরিহার্য্য বিষয়ে (উপরোক্ত তোমার মতানুসারেও) শোক করা উচিত নহে।

রহস্য ঃ মনে রাখিবেন যে, উপরের দুই শ্লোকে ব্যাখ্যাত উপপত্তি সিদ্ধান্তপক্ষের নহে। এই 'অথ চ=অথবা' শব্দের দ্বারা মধ্যস্থলেই উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হইতেছে। আত্মাকে নিত্য বা অনিত্য মান, এইটুকুই দেখাইতে হইবে যে, উভয় পক্ষেই শোক করিবার প্রয়োজন নাই। গীতার এই সত্য সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা, সৎ, নিত্য, অজ, অবিকার্য্য ও অচিন্ত্য বা নির্গুণ। হৌক; দেহ অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে; ইহারই সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে আর এক উপপত্তি বলা হইতেছে—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৮) সকল ভূত আরম্ভে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং মরণকালে আবার অব্যক্ত হয়; (ইহাই যদি সকলেরই অবস্থা হয়) তবে হে ভারত! উহাতে কোন্ বিষয়ের জন্য শোক করিবে?

রহস্য ঃ 'অব্যক্ত' শব্দেরই অর্থ—'ইন্দ্রিয়ের অ-গোচর'। মূল এক অব্যক্ত দ্রব্য হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অব্যক্তেই লয় হয় (গী. ৮. ১৮); এই সাংখ্য সিদ্ধান্তই এই শ্লোকের নজীর হইতেছে। সাংখ্যবাদীর এই সিদ্ধান্ত গীতারহস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে খুলিয়া বলা হইয়াছে। কোনও পদার্থের ব্যক্ত অবস্থা যদি এই প্রকার কখন-না-কখন নষ্ট হয়, তবে যে ব্যক্ত স্বরূপ স্বভাবতই নশ্বর, তাহার জন্য শোক করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই শ্লোকই 'অব্যক্ত' শব্দের বদলে 'অভাব' শব্দযুক্ত হইয়া মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বে (মভা. স্ত্রী. ২. ৬) আসিয়াছে। পরে "অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥" (স্ত্রী. ২. ১৩) এই শ্লোকে 'অদর্শন' অর্থাৎ 'দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়া' এই শব্দেরও মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্র অনুসারে শোক করা যদি ব্যর্থ সিদ্ধ হইল, এবং আত্মাকে অনিত্য মানিলেও যদি এই কথাই সিদ্ধ হইল, তবে আবার লোকে মৃত্যুর বিষয়ে শোক কেন করে? আত্মস্বরূপসম্বন্ধীয় অজ্ঞানই ইহার উত্তর। কারণ—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) জান, কেহ আশ্চর্য্য (অদ্ভুত বস্তু) মনে করিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি করে, কেহ আশ্চর্য্য হইয়া ইহার বর্ণন করে, এবং কেহ বা আশ্চর্য্য মনে করিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু (এই প্রকার দেখিয়া, বর্ণন করিয়া এবং) শুনিয়াও (ইহাদের মধ্যে) কেহই ইঁহাকে (তত্ত্বতঃ) জানে না।

রহস্য ঃ অপূর্ব্ব বস্তু মনে করিয়া বড় বড় লোক আশ্চর্য্য হইয়া আত্মার বিষয়ে যতই কেন বিচার করুন না, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার লোক খুবই অল্প। এই কারণেই অনেক লোক মৃত্যুর বিষয়ে শোক করে। অতএব তুমি এরূপ না করিয়া পূর্ণ বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপকে ঠিকভাবে জান এবং শোক পরিত্যাগ কর। ইহার ইহাই অর্থ। কঠোপনিষদে (২. ৭) আত্মার বর্ণনা এই প্রকার আছে।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ (৩০) সকলের শরীরে (অবস্থিত) শরীরের স্বামী (আত্মা) সর্ব্বদা অবধ্য অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না; অতএব হে ভারত (অর্জ্জুন)! সমস্ত অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে।

রহস্য ঃ এখন পর্য্যন্ত ইহা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, সংখ্যা বা সন্ন্যাস মার্গের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে আত্মা অমর এবং দেহ তো স্বভাবতই অনিত্য, অতএব কেহ মরে বা মারে, তাহার জন্যে 'শোক' করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কেহ ইহা হইতে এই অনুমান করে যে, কেহ কাহাকে যদি বধ করে, তবে তাহাতেও 'পাপ' নাই; তাহা গুরুতর ভুল হইবে। মরা বা মারা, এই দুই শব্দের অর্থের ইহা পৃথককরণ, মরিতে বা মারিতে যে ভয় হয় তাহাকে প্রথমে দূর করিবার জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া

হইল। মনুষ্য তো আত্মা ও দেহের সম্মিলন। তন্মধ্যে আত্মা অমর, এইজন্য মরা বা মারা এই দুই শব্দ উহার প্রতি উপযুক্ত হয় না। অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা তো স্বভাবতই অনিত্য, যদি উহার ধ্বংস হয় তবে শোক করিবার যোগ্য কিছুই নাই। কিন্তু যদৃচ্ছা বা কালের গতিতে কেহ মরিলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহার সুখ-দুঃখ স্বীকার না করিয়া শোক করা পরিত্যাগ করিলেও এই প্রশ্নের কিনারা হয় না যে, জানিয়া শুনিয়া যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি। কারণ দেহ অনিত্য হইলেও আত্মার খাঁটি মঙ্গল বা মোক্ষ সম্পাদনের জন্য দেহই তো এক সাধন, অতএব আত্মহত্যা করা অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অপর কাহাকে বধ করা, এই উভয়ই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপই। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ করিবে কেন, তাহার কোন-না-কোন ভাল কারণ দেওয়া আবশ্যক। ইহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক এবং গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা সাংখ্যমার্গেরই সম্মত, তদনুসারেও যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মরা-মারার জন্য শোক করিও না; কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ যুদ্ধে মরা বা মারা এই দুই-ই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে তোমার আবশ্যকই—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদঃ (৩১) ইহা ব্যতীত স্বধর্ম্মের দিকে দেখিলেও (এ সময়ে) সাহস হারানো তোমার উচিত নহে। কারণ ধর্ম্মানুগত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

রহস্যঃ স্বধর্ম্মের এই উপপত্তি পরেও দুইবার (গী ৩. ৩৫ এবং ১৮. ৪৭) বলা হইয়াছে। সন্ন্যাস অথবা সাংখ্যমার্গ অনুসারে যদিও কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ চতুর্থ আশ্রম শেষ সোপান, তথাপি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ বলেন যে, ইহার পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রম পূর্ণ করা চাই, অতএব এই শ্লোকের এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, গৃহস্থাশ্রমী অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা আবশ্যক।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥
অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদঃ (৩২) এবং হে পার্থ! এই যুদ্ধ স্বত-উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারই; এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়দিগেরই ভাগ্যে ঘটে। (৩৩) অতএব যদি তুমি (নিজের) ধর্ম্মের অনুকূল এই যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হারাইয়া পাপ সংগ্রহ করিবে;

(৩৪) শুধু ইহাই নহে কিন্তু (সমস্ত) লোক তোমার অক্ষয় দুষ্কীর্ত্তি গাহিতে থাকিবে! এবং সম্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।

রহস্যঃ শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্বই উদ্যোগপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছেন (মভা. উ. ৭২. ২৪.। সে স্থলে এই শ্লোক আছে "কুলীনস্য চ যা নিন্দা বধো বাঽমিত্রকর্ষণং। মহাগুনো বধো রাজন্ ন তু নিন্দা কুজীবিকা॥" কিন্তু গীতাতে ইহা অপেক্ষা এই অর্থ সংক্ষেপে আছে; এবং গীতা গ্রন্থের প্রচারও অধিক, এই কারণে গীতার "সম্ভাবিতস্য" ইত্যাদি বাক্যের চলিত কথার ন্যায় প্রয়োগ হইতে লাগিল। গীতার আরও অনেক শ্লোক ইহারই ন্যায় সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দুষ্কীর্ত্তির স্বরূপ বলিতেছেন—

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদঃ (৩৫) (সকল) মহারথী বুঝিবে যে, তুমি ভয়ে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, এবং যাঁহাদের নিকট (আজ) তুমি বহুমান্য হইয়া আছ, তাঁহারাই তোমার যোগ্যতা কম ঠাওরাইবেন। (৩৬) এই প্রকারেই তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া, তোমার শত্রু এমন এমন অনেক কথা (তোমার বিষয়ে) বলিবে, যাহা বলা উচিত নহে। ইহার অধিক দুঃখের বিষয় আর আছেই বা কি? (৩৭) মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং জিতিলে তো পৃথিবী (-র রাজ্য) ভোগ করিবে! অতএব হে অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ!

রহস্যঃ উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্যজ্ঞানের অনুসারে মরিবার-মারিবার জন্য শোক করা উচিত নহে; প্রত্যুতে ইহাও সিদ্ধ হইল যে, স্বধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। তথাপি এক্ষণে এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের 'পাপ' কর্ত্তাকে লাগে কি না। বস্তুত এই উত্তরের যুক্তিগুলি কর্ম্মযোগমার্গের, এইজন্য ঐ মার্গের প্রস্তাবনা এইখানেই হইয়াছে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদঃ (৩৮) সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া ফের যুদ্ধে লাগিয়া যাও। এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই) পাপ লাগিবে না।

রহস্যঃ সংসারে জীবন যাপানের দুই মার্গ আছে—এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে যে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্জ্জুন

যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসমার্গের
তত্ত্বজ্ঞান অনুসারেই আত্মার জন্য বা দেহের জন্য শোক করা উচিত নহে। ভগবান
অর্জ্জুনকে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখ সমবুদ্ধিতে সহ্য করিতে
হইবে এবং স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, এবং সমবুদ্ধিতে
যুদ্ধ করিলে কোনই পাপ লাগে না। কিন্তু এই মার্গের (সাংখ্য) মত এই যে, কখনও
না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই প্রত্যেক মনুষ্যের ইহ-জগতে পরম
কর্ত্তব্য ; অতএব ইষ্ট জ্ঞান হইলে এখনই যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস কেন গ্রহণ না করিবে
অথবা স্বধর্ম্মের পালনই কেন করিবে ইত্যাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্যজ্ঞান হইতে
হয় না ; এবং এই কারণেই বলিতে পারি যে, অর্জ্জুনের মূল আপত্তি যেমনটি-তেমনই
রহিল। অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসনিষ্ঠা অনুসারে তোমাকে এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান বা উপপত্তি বলা হইয়াছে। এখন যে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইলে (কর্ম্ম না ছাড়িলেও) হে পার্থ! তুমি কর্ম্মবন্ধন ছাড়িবে, সেইরূপই এই (কর্ম্ম-) যোগের বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বলিতেছি)।

রহস্য ঃ ভগবদ্‌গীতার রহস্য বুঝিবার জন্য এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্য শব্দের দ্বারা কপিলের সাংখ্য বা নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল যোগ এস্থলে উদ্দিষ্ট নহে—সাংখ্য অর্থে সন্ন্যাসমার্গ এবং যোগ অর্থে কর্ম্মমার্গই এস্থলে ধরিতে হইবে। ইহা গীতার ৩. ৩ শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। এই দুই মার্গ স্বতন্ত্র, ইহাদের অনুগামীদিগকেও যথাক্রমে 'সাংখ্য' = সন্ন্যাসমার্গী, এবং 'যোগ' = কর্ম্মযোগমার্গী বলা যায় (গী ৫. ৫)। তন্মধ্যে সংখ্যনিষ্ঠাবান ব্যক্তি কখন-না-কখন শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন, এইজন্য এই মার্গের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে অর্জ্জুনের, যুদ্ধ কেন করিব, এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। অতএব যে কর্ম্মযোগনিষ্ঠার এই মত যে, সন্ন্যাস না লইয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও নিষ্কামবুদ্ধিতে সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে থাকাই প্রত্যেকের প্রকৃত পুরুষার্থ, সেই কর্ম্ম-যোগেরই (অথবা সংক্ষেপে যোগমার্গের) জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করা হইল এবং গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত, নানা কারণ দেখাইয়া, নানা সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া, এই মার্গেরই স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে। গীতার বিষয়নিরূপণের, স্বয়ং ভগবানের কৃত, এই স্পষ্টীকরণ দৃষ্টিতে রাখিলে এই বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না যে, কর্ম্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য। কর্ম্মযোগের মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রথমে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪০) এস্থলে অর্থাৎ এই কর্ম্মযোগমার্গে (একবার) আরব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না এবং (পরে) বিঘ্নও হয় না। এই ধর্ম্মের অল্পও (আচরণ) মহান ভয় হইতে রক্ষা করে।

রহস্য ঃ এই সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃ. ১৬০) প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পরে গীতাতেও বেশী খুলিয়া বলা হইয়াছে (গী ৬. ৪০-৪৬)। ইহার অর্থ এই যে, কর্ম্মযোগমার্গে যদি একজন্মে সিদ্ধিলাভ না হয়, তবে কৃত কর্ম্ম ব্যর্থ না হইয়া পরজন্মে কাজে আসে এবং প্রত্যেক জন্মে ইহা বাড়িতে থাকায় শেষে কখন-না-কখন প্রকৃত সদ্গতি পাওয়া যায়। এখন কর্ম্মযোগমার্গের দ্বিতীয় মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ ঃ (৪১) হে কুরুনন্দন! এই মার্গে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণায়ক (ইন্দ্রিয়রূপী) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয় ; কারণ যাঁহার বুদ্ধি (এই প্রকার এক) স্থির না হয়, তাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনাসকল নানা শাখাতে যুক্ত ও অনন্ত (প্রকারের) হয়।

রহস্য ঃ সংস্কৃতে বুদ্ধি শব্দের নানা অর্থ। ৩৯তম শ্লোকে এই শব্দজ্ঞান অর্থে বসিয়াছে এবং পরে ৪৯তম শ্লোকে এই 'বুদ্ধি' শব্দেরই "বুঝা, ইচ্ছা, বাসনা, বা হেতু" অর্থ হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধির পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মিকা' বিশেষণ থাকায় এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে ঐ শব্দেরই অর্থ ব্যবসায় অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় (গীতার প্র. ৬ পৃ. ১১৬-১২১ দেখুন) হইতেছে। প্রথমে এই বুদ্ধিইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া লইলে ফের তদনুসারে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বা বাসনা মনে আসে ; অতএব এই ইচ্ছা বা বাসনাকেও বুদ্ধিই বলা হয়। কিন্তু সে সময় 'ব্যসায়াত্মকা' এই বিশেষণ উহার পূর্ব্বে দেওয়া যায় না। ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক হইলে 'বাসনাত্মক' বুদ্ধি বলা হয়। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কেবল 'বুদ্ধি' শব্দ আছে, উহার পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মক' এই বিশেষণ নাই। এই জন্য বহুবচনান্ত 'বুদ্ধয়ঃ' শব্দের 'বাসনা, কল্পনাতরঙ্গ' অর্থ হইয়া সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, "যাঁহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়কর্ত্তা বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় স্থির না হয়, তাঁহার মনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন তরঙ্গসকল বা বাসনাসকল উৎপন্ন হয়"। বুদ্ধিশব্দের 'নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়' এবং 'বাসনা' এই দুই অর্থ মনে না রাখিলে কর্ম্মযোগের বুদ্ধিবিষয়ক বিচারের মর্ম্ম ভালরূপ বুঝা যাইবে না। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি স্থির বা একাগ্র না থাকিলে প্রতিদিন বিভিন্ন বাসনাসকল মনকে ব্যস্ত করে এবং মনুষ্য এমনই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যে আজ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যদি অমুক কর্ম্ম করে, তো কাল স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অমুক কর্ম্ম করে। ব্যস, এখন ইহারই বর্ণন করিতেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাং
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৪২) হে পার্থ ! (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদসমূহের (ফলশ্রুতিযুক্ত) বাক্যসকলে ভুলিয়া মূর্খ লোকেরা বলে যে ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এবং বাড়াইয়া বলে যে, (৪৩) "অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্মের দ্বারাই (আবার) জন্মরূপ ফল লাভ হয় এবং (জন্মজন্মান্তরে) ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়"—স্বর্গের পশ্চাতে পতিত ঐ কাম্য বুদ্ধিবিশিষ্ট (লোক), (৪৪) উক্ত উক্তির দিকেই উহাদের মন আকৃষ্ট হইলে, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যেই ডুবিয়া থাকে ; এই কারণে উহাদের ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি (কখনও) সমাধিস্থ অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না ।

রহস্য ঃ উপরের তিন শ্লোক মিলিয়া একটি বাক্য । উহাতে জ্ঞানরহিত কর্ম্মাসক্ত মীমাংসামার্গীর এই বর্ণনা আছে যে, তাহারা শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে আজ অমুক হেতুর সিদ্ধির জন্য কাল অন্য কোন কারণে সর্ব্বদাই স্বার্থের জন্যই, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে নিমগ্ন থাকে । এই বর্ণনা উপনিষদের ভিত্তিতে করা হইয়াছে । উদাহরণার্থ, মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

> ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।
> নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

"ইষ্টাপূর্ত্তই শ্রেষ্ঠ, অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে—যে মূঢ় লোক ইহা স্বীকার করে, সে স্বর্গে পুণ্য উপভোগ করিলে পর ফের নীচে এই মনুষ্যলোক আসে" (মুণ্ড.) ১. ২. ১০) । জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মের এই প্রকার নিন্দা ঈশাবাস্য এবং কঠোপনিষদেও করা হইয়াছে (কঠ ২. ৫ ; ঈশ ৯. ১২) । পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল কর্ম্মেতেই আবদ্ধ এই লোকেরা (গী. ৯. ২১ দেখুন) নিজ নিজ কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল তো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহাদের বাসনা আজ এক কর্ম্মে, আবার কাল আর এক কর্ম্মে রত হইয়া চারিদিকে দৌড়দৌড়ের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ; এই কারণে উহাদিগের স্বর্গে যাতায়াত অদৃষ্টে ঘটিলেও মোক্ষলাভ হয় না । মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির বা একাগ্র রাখিতে হইবে । পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ইহাকে একাগ্র কি প্রকারে করিতে হইবে । এখন তো এইটুকুই বলিতেছেন যে,—

> ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
> নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৪৫) হে অর্জ্জুন ! (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদ (এই রীতিতে) ত্রৈগুণ্যের বিষয়ে পূর্ণ, এইজন্য তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, নিত্যসত্ত্বস্থ ও সুখদুঃখ আদি দ্বন্দ্ব হইতে অলিপ্ত হও এবং যোগ ক্ষেম প্রভৃতি স্বার্থে না পড়িয়া আত্মনিষ্ঠ হও !

রহস্য ঃ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ মিশ্রিত প্রকৃতির সৃষ্টিকে ত্রৈগুণ্য বলে ; এই সৃষ্টি সুখদুঃখ প্রভৃতি অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নশ্বর দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং সত্য ব্রহ্ম ইহার অতীত—এই বিষয় গীতারহস্যে (পৃ. ১১৪ ও ২২২) স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই অধ্যায়েরই ৪৩তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার, এই সংসারের সুখপ্রাপ্তির জন্য মীমাংসক-মার্গাবলম্বী লোক শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি

করে এবং তাহারা এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়া যায় । কেহ পুত্রলাভের জন্য এক বিশেষ যজ্ঞ করে, কেহ বা বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে । এই সমস্ত কর্ম্ম এই লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের যোগক্ষেমের জন্য কৃত হয় । অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, যে মোক্ষলাভ করিবে, সে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের এই ত্রিগুণাত্মক এবং শুধু যোগক্ষেম-সম্পাদক কর্ম্ম ছাড়িয়া নিজের চিত্তকে ইহার অতীত পরব্রহ্মের প্রতি লাগাইবে । এই অর্থেই নির্দ্বন্দ্ব ও নির্যোগক্ষেমবান্ শব্দ উপরে আসিয়াছে । এখানে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের এই কাম্য কর্ম্মসকল ছাড়িয়া দিলে যোগক্ষেম (নির্ব্বাহ) কি প্রকারে হইবে (গী. র. পৃ. ২৫৩ ও ৩৩২ দেখুন) । কিন্তু ইহার উত্তর এখানে দেওয়া হয় নাই, এই বিষয় পরে আবার নবম অধ্যায়ে আসিয়াছে ; সেখানে বলা হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন , এবং এই দুই স্থানেই গীতাতে 'যোগক্ষেম' শব্দ আসিয়াছে (গী. ৯. ২২ এবং উহার উপর আমার রহস্য দেখুন) । নিত্যসত্ত্বস্থ পদেরই অর্থ ত্রিগুণাতীত হইতেছে । কারণ পরে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা (গী. ১৪. ১৪. ও ২০, গী. র. পৃ. ১৪৪ ও ১৪৫ দেখুন) । তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসকদিগের যোগক্ষেমকারক ত্রিগুণাত্মক কাম্য কর্ম্ম ছাড়িয়া এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ হইবার বিষয়ে এখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু আবার এই বিষয়ের উপরেও দৃষ্টি দিতে হইবে যে, আত্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত কর্ম্ম বস্তুতঃ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া নহে । উপরের শ্লোকে বৈদিক কাম্য কর্ম্মের যে নিন্দা করা হইয়াছে বা যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা কর্ম্মের নহে, কিন্তু ঐ কর্ম্ম বিষয়ে যদি কাম্যবুদ্ধি মনে না থাকে, তবে শুধু যাগযজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. র. পৃ. ২৫৩-২৫৫) । পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন যে, মীমাংসকদিগের এই সকল যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত (গী. ১৮. ৬) । গীতার এই দুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের শ্লোকে মীমাংসকদিগের কর্ম্মকাণ্ডের যে ন্যূনতা দেখানো হইয়াছে, তাহা উহার কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে—কর্ম্মের জন্য নয় । এই অভিপ্রায়কেই মনে আনিয়া ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

> বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে ।
> নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥

"বেদোক্ত কর্ম্মের বেদে যে ফলশ্রুতি হইয়াছে, তাহা রোচনার্থ, অর্থাৎ যাহাতে কর্ত্তার এই কর্ম্ম ভাল লাগে । অতএব এই কর্ম্মসমূহ ঐ ফলপ্রাপ্তির জন্য করিবে না, কিন্তু নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলের আশা ছাড়িয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রকার করে, নৈষ্কর্ম্ম্যজনিত সিদ্ধি তাহার প্রাপ্তি হয়" (ভাগ. ১১. ৩. ৪৬) । সারকথা, অমুক অমুক কারণের জন্য যজ্ঞ করিবে, ইহা বেদে উক্ত হইলেও, ইহাতে না ভুলিয়া যজ্ঞ করা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়াই যজ্ঞ করিবে ; কাম্যবুদ্ধিকে তো ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু যজ্ঞকে ছাড়িবে না (গী. ১৭. ১১.) ; এবং এইভাবে অন্যান্য

কর্ম্মও করিবে— ইহা গীতোক্ত উপদেশের সার এবং এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ : (৪৬) চারিদিকে জলবৃদ্ধি হইলে কূপের যেটুকু অর্থ বা প্রয়োজন বাকী থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন থাকে না), সেইটুকু প্রয়োজনই লব্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে সমস্ত (কর্ম্মকাণ্ডাত্মক) বেদে থাকে (অর্থাৎ তাহার পক্ষে কেবল কাম্যকর্ম্মরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না)।

রহস্য : এই শ্লোকের ফলিতার্থ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু টীকাকারগণ ইহার শব্দগুলোকে লইয়া অন্যায়রূপে টানাবুনা করেন। সর্বতঃ 'সংপ্লুতোদকে' ইহা সপ্তম্যন্ত সামাসিক পদ। কিন্তু ইহাকে কেবল সপ্তমী বা উদপানের বিশেষণও মনে না করিয়া 'সতি সপ্তমী' মানিয়া লইলে "সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ (ন স্বল্পমপি প্রয়োজনং বিদ্যতে) তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু অর্থঃ"— এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যাহৃত মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া যায় এবং উহার এই সরল অর্থও হইয়া যায় যে, "চারিদিকে জলময় হইলে পর (পানের জন্য কোথাও বিনা চেষ্টায় যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে থাকিলে) যে প্রকার কূপের বিষয় কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শুধু যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন থাকে না"। কারণ, বৈদিক কর্ম্ম কেবল স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্যই নহে, কিন্তু শেষে মোক্ষসাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, এবং এই ব্যক্তির তো জ্ঞানপ্রাপ্তি পূর্ব্বেই হইয়া যায়, এই কারণে বৈদিক কর্ম্ম করিয়া ইঁহার কোন নূতন বস্তু পাওয়া বাকী থাকে না। এই হেতুই পরে তৃতীয় অধ্যায়ে (৩.১৭) উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি জ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই জগতে কর্ত্তব্য বাকী থাকে না"। খুব বড় পুষ্করিণী বা নদীতে অনায়াসেই, যত চাও তত, জল পান করিবার সুবিধা থাকিলে কূপের দিকে কে ঝুঁকিবে? সে সময়ে কেহই কূপের অপেক্ষা রাখে না। সনৎসুজাতীয়ের শেষ অধ্যায়ে (মভা. উদ্যো. ৪৫. ২৬) এই শ্লোকই অল্পস্বল্প শব্দের হেরফেরে আসিয়াছে। মাধবাচার্য্য ইহার টীকায়, উপরে আমি যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই করিয়াছেন; এবং শুকানুপ্রশ্নে জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য বিচার করিবার সময় স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—"ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্ম প্রশংসন্তি কূপং নদ্যাং পিবন্নিব"— অর্থাৎ নদীতে যে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোয়া করে না, সেইরূপই 'তে' অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মের কোন পরোয়া করেন না (মভা. শা. ২৪০. ১০)। এইরূপই পাণ্ডবগীতার সপ্তদশ শ্লোকে কূপের দৃষ্টান্ত এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে —যে বাসুদেবকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে "তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছতি দুর্মতিঃ" ভাগীরথীকূলে পানার্থ জল পাইলেও কূপান্বেষী পিপাসু পুরুষের ন্যায় মূর্খ। এই দৃষ্টান্ত কেবল বৈদিক সংস্কৃত গ্রন্থেই নাই, প্রত্যুত পালিভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থেও ইহার প্রয়োগ আছে। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্মেরও মান্য যে, যে ব্যক্তি নিজের তৃষ্ণা সমূলে নষ্ট করিয়াছে, সে পরে আরও কিছু পাইবার জন্য পড়িয়া থাকে না; এবং এই সিদ্ধান্ত বলিতে গিয়া উদান নামক পালিগ্রন্থের (৭. ৯) এই শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—"কিং কয়িরা উদপানেন আপা চে সব্বদা সিয়ুং" —সর্ব্বদা জল পাইবার ব্যবস্থা হইলে কূপ লইয়া কি করিবে। আজ-কাল বড় বড় শহরে ইহা দেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের কেহ কূপের পরোয়া করে না। ইহা হইতে আরও বিশেষ ভাবে শুকানুপ্রশ্নের আলোচনা হইতে গীতার দৃষ্টান্তের স্বারস্য জানা যাইবে এবং দেখা যাইবে যে, আমি এই এই শ্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছে, তাহাই সরল ও ঠিক কিন্তু, এইরূপ অর্থ দ্বারা বেদের কিছু গৌণতা আসে বলিয়াই হউক, অথবা জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের সমাবেশ হইবার কারণে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কারণেই হউক, গীতার টীকাকার এই শ্লোকের পদসমূহের অন্বয় কিছু বিভিন্ন রীতিতে লাগান। তিনি এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'তাবান্' এবং দ্বিতীয় চরণে 'যাবান্' পদগুলিকে অধ্যাহৃত মানিয়া এই প্রকার অর্থ করেন "উদপানে যাবানর্থঃ তাবানেব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে যথা সম্পদ্যতে তথা যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ তাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সম্পদ্যতে" অর্থাৎ স্নানপান প্রভৃতি কর্ম্মের জন্য কূপের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকু বৃহৎ পুষ্করিণীতেও (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) হইতে পারে; এই প্রকারই বেদসমূহের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু এই অন্বয়ে প্রথম শ্লোকপংক্তিতে 'তাবান্' এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'যাবান্' এই দুই পদের অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন বশত আমি ঐ অন্বয় ও অর্থ স্বীকার করি নাই। আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার না করিয়াই লাগিয়া যায় এবং পূর্ব্বের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রতিপাদিত বেদসমূহের নিছক (অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত) কর্ম্ম কাণ্ডের গৌণত্ব এই স্থলে বিবক্ষিত। এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন—এই কথা গীতার সম্মত নহে। কারণ, এই সকল কর্ম্মের ফল জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট না হইলেও ফলের জন্য নহে, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিজের শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য বুঝিয়া তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের নিশ্চিত মত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ফলাশা না থাকিলেও অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও জ্ঞানী ব্যক্তির অনাসক্ত বুদ্ধিতে করাই উচিত (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের উপর এবং গী. ৩. ১৯ উপর আমার রহস্য দেখুন)। এই নিষ্কামবিষয়ক অর্থই এখন পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া দেখাইতেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ : (৪৭) কর্ম্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার; ফল (পাওয়া বা না পাওয়া) কখনও তোমার অধিকার অর্থাৎ আয়ত্ত নহে; (এইজন্য আমার কর্ম্মের) অমুক ফল মিলিবে, এই হেতু (মনে) রাখিয়া কর্ম্ম করিও না; এবং কর্ম্ম না করিবারও আগ্রহ তুমি করিও না।

রহস্য : এই শ্লোকের চারি চরণ পরস্পর পরস্পরের অর্থের পূরক, এই কারণে অতিব্যাপ্তি না হইয়া কর্ম্মযোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে ব্যাখ্যাত

হইয়াছে। অধিক কি, ইহা বলিতেও কোন ক্ষতি নাই যে, এই চারি চরণ কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রীই। ইহা প্রথমে বলা হইল যে, "কর্ম্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার"। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ হয় এই যে, কর্ম্মের ফল কর্ম্মের দ্বারাই সংযুক্ত হইবার কারণে 'যাহার গাছ, তাহারই ফল' এই ন্যায়ে যে, কর্ম্ম করিবার অধিকারী, সে-ই ফলেরও অধিকারী হইবে। অতএব এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট বলা হইল যে, "ফলে তোমার অধিকার নাই"। অবার ইহা হইতে নিষ্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধান্ত বলা হইল যে, "মনে ফলাশা রাখিয়া কর্ম্ম করিও না"। (কর্ম্মফলহেতুঃ কর্ম্মফলে হেতুর্যস্য স কর্ম্মফলহেতুঃ, এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইতেছে)। কিন্তু কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়ে সংলগ্ন হইতেছে, এই কারণে যদি কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকেও ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত, তবে ইহাও ঠিক নহে বুঝাইবার জন্য শেষে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে, "ফলাশাকে তো ছাড়িয়া দাও আবার ইহার সঙ্গেই কর্ম্ম না করিবার অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগের আগ্রহ করিও না"। সারকথা 'কর্ম্ম কর' বলিলে কিছু এই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ; এবং 'ফলের আশা ছাড়' বলিলে এই অর্থ হইয়া যায় না যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও। অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ যে, ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু না কর্ম্মে আসক্ত হইবে আর না কর্ম্মই ছাড়িবে—ত্যাগো ন যুক্ত ইহ কর্ম্মসু নাপি রাগঃ (যোগ. ৫. ৫. ৫৪)। এবং ফললাভ নিজের বশে নাই, কিন্তু উহার জন্য আরও অনেক বিষয়ের আনুকূল্য আবশ্যক, ইহা দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অর্থই আরও দৃঢ় করা হইয়াছে (গী. ১৮. ১৪-১৬ এবং রহস্য পৃ. ১০১ এবং প্র ১২ দেখুন)। এক্ষণে কর্ম্মযোগের স্পষ্ট লক্ষণ বলিতেছেন যে, ইহাকেই যোগ অথবা কর্ম্মযোগ বলে—

> যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
> দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
> বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
> বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
> তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪৮) হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মের সিদ্ধি হৌক বা অসিদ্ধি হোক উভয়ের সমানই মনে করিয়া 'যোগস্থ' হইয়া কর্ম্ম কর; (কর্ম্মের সিদ্ধি হইলে বা নিষ্ফল অবস্থায় স্থিত) সমতার (মনো-) বৃত্তিকেই (কর্ম্ম-) যোগ বলে। (৪৯) কারণ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধির (সাম্য-) যোগ অপেক্ষা (বাহ্য) কর্ম্ম খুবই কনিষ্ঠ। (অতএব এই সাম্য-) বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলহেতুক অর্থাৎ ফলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে কৃপণ অর্থাৎ দীন বা নিম্ন স্তরের। (৫০) যে (সাম্য-) বুদ্ধিযুক্ত হয়, সে এই লোকে পাপ ও পুণ্য উভয় হইতে নির্লিপ্ত থাকে, অতএব যোগ অবলম্বন কর। (পাপপুণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া) কর্ম্ম করিবার চাতুর্য্যকেই (কুশলতা বা যুক্তিকেই) (কর্ম্মযোগ) বলে।

রহস্য ঃ এই শ্লোকসমূহের কর্ম্মযোগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ; এই সম্বন্ধে গীতারহস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ. ৫০-৫৭) যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দেখুন। কিন্তু ইহাতেও কর্ম্মযোগের যে তত্ত্ব—'কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ'—৪৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বুদ্ধি' শব্দের পূর্ব্বে 'ব্যবসায়াত্মিকা' বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ 'বাসনা' বা 'বুঝা' হইবে। কেহ কেহ বুদ্ধির 'জ্ঞান' অর্থ করিয়া এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম লঘুশ্রেণীর; কিন্তু ইহা ঠিক অর্থ নহে। কারণ পূর্ব্বে ৪৮শ শ্লোকে সমত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ৪৯শ ও পরবর্ত্তী শ্লোকেও উহাই বর্ণিত আছে। এই কারণে এখানে বুদ্ধির অর্থ সমত্ববুদ্ধিই করিতে হইবে। কোনও কর্ম্মের ভালমন্দ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে না; কর্ম্ম একই হৌক না কেন, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার ভালমন্দ বা মন্দ বুদ্ধি অনুসারে তাহা শুভ অথবা অশুভ হয়; অতএব কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ; ইত্যাদি নীতিতত্ত্বের বিচার গীতারহস্যের চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ প্রকরণে (পৃ. ৭৮, ৩২৭-৩২৯ এবং ৪০৬-৪১২) করা হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর অধিক চর্চ্চা করিব না। ৪১শ শ্লোকে বলাই হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে সম ও শুদ্ধ রাখিবার জন্য কার্য্য-অকার্য্যের নির্ণায়ক ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে প্রথমেই স্থির করিতে হইবে। এইজন্য 'সাম্যবুদ্ধি' এই এক শব্দের দ্বারাই স্থির ব্যবসায়ত্মক বুদ্ধি ও শুদ্ধবাসনা (বাসনাত্মক বুদ্ধি) এই উভয়েরই বোধ হইয়া যাইতেছে। এই সাম্যবুদ্ধিই শুদ্ধ আচরণ অথবা কর্ম্মযোগের মূল, এই জন্য ৩৯শ শ্লোকে ভগবান প্রথমে এই যে বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের বাধা হইবে না এমন যুক্তি অথবা যোগ তোমাকে বলিতেছি, তদনুসারেই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "কর্ম্ম করিবার সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই" সেই 'যুক্তি' বা 'কৌশল' এবং ইহাকেই 'যোগ' বলে—এই প্রকার যোগ শব্দের দুইবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৫০শ শ্লোকের "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" এই পদের এই প্রকার সরল অর্থ লাগিবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানাবুনা করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "কর্ম্মসু যোগঃ কৌশলং"—কর্ম্মে যে যোগ আছে, তাহাকে কৌশল বলেন। কিন্তু "কৌশল" শব্দের ব্যাখ্যা করিবার এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, 'যোগ' শব্দের লক্ষণ বলাই উদ্দেশ্য, এইজন্য এই অর্থ ঠিক বলিয়া মানা যায় না। ইহা ব্যতীত যখন 'কর্ম্মসু কৌশলং' এই প্রকার সরল অন্বয় লাগিতে পারে, তখন "কর্ম্মসু যোগঃ" এইরূপ উল্টা-সোজা অন্বয় করা ঠিকও নহে। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকার সাম্যবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না এবং পূর্ণসিদ্ধি অথবা মোক্ষ প্রাপ্তি না হইয়া থাকে না—

> কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
> জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥
> যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
> তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ ঃ (৫১) (সমত্ব) বুদ্ধিযুক্ত (যে) জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মফল ত্যাগ করেন,

তিনি জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া (পরমেশ্বরের) দুঃখবিরহিত পদে গিয়া পৌঁছান, (৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহের পঙ্কিল আবরণ অতিক্রম করিবে, তখন যে সকল বিষয় শুনিয়াছ এবং শুনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হইবে।

রহস্য : অর্থাৎ তোমার কিছু বেশী শুনিবার ইচ্ছা হইবে না ; কারণ এই বিষয়-সমূহ শুনিলে যে ফল হয়, তাহা পূর্ব্বেই তোমার লাভ হইয়া গিয়াছে। 'নির্বেদ' শব্দের উপযোগ প্রায় সংসারপ্রপঞ্চ হইতে পালায়ন বা বৈরাগ্য অর্থে করা হয়। এই শ্লোকে উহার সাধারণ অর্থ "ছাড়িয়া যাওয়া" বা "বাসনা না থাকা"ই। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেষভাবে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত, ত্রৈগুণ্যবিষয়ক শ্রৌতকর্ম্মসম্বন্ধীয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ : (৫৩) (নানা প্রকারের) বেদবাক্যে তোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমাধি বৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে, তখন (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হইবে।

রহস্য : সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে, যে ব্যক্তি বেদ-বাক্যের ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া আছে, এবং যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন-না-কোন কর্ম্ম করিবার হ্যাপায় লাগিয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থির হয় না—আরও বেশী বিভ্রান্ত হইয়া যায়। এইজন্য নানা উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়া দিয়া চিত্তকে নিশ্চল সমাধির অবস্থায় রাখ ; এইরূপ করিলে সাম্যবুদ্ধিরূপ কর্ম্মযোগ তোমার লাভ হইবে এবং বেশী উপদেশের প্রয়োজন থাকিবে না ; এবং কর্ম্ম করিলেও তাহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এই ভাবে যে কর্ম্মযোগীর বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা স্থির হইয়া যায়, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। এখন অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, তাঁহার ব্যবহার কি প্রকার হয়।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ : অর্জ্জুন বলিলেন (৫৪) হে কেশব ! (আমাকে বুঝাও যেত) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে বলে ? ঐ স্থিতপ্রজ্ঞের বলা বসা ও চলা কি প্রকার হয় ?

রহস্য : এই শ্লোকে 'ভাষা' শব্দ 'লক্ষণ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমি উহার ভাষান্তর, উহার ভাষ্ ধাতু অনুসারে "কাহাকে বলে" করিয়াছি। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ. ৩১৭-৩২৬) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহার কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ভিত্তি এবং ইহা হইতে পরবর্ত্তী বর্ণনার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ : শ্রীভগবান বলিলেন—(৫৫) হে পার্থ ! যখন (কোন মনুষ্য নিজের) মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করেন, এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। (৫৬) দুঃখে যাঁহার মন খিন্ন হয় না, সুখে যাঁহার আসক্তি নাই এবং প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলে। (৫৭) সকল বিষয়ে যাঁহার মন নিঃসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এবং যথাপ্রাপ্ত শুভাশুভে যাঁহার আনন্দ বা বিষাদও হয় না, (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। (৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের (হস্তপদাদি) অবয়ব সকল দিক হইতে টানিয়া লয়, সেই প্রকারই যখন কোন পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয় হইতে (নিজের) ইন্দ্রিয়সকলকে টানিয়া লয়, তখন (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। (৫৯) নিরাহারী পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও (তাহার) রস অর্থাৎ বাসনা চলিয়া যায় না। কিন্তু পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিলে বাসনাও চলিয়া যায়, অর্থাৎ বিষয় ও তাহার বাসনা উভয়ই চলিয়া যায়।

রহস্য : অন্নের দ্বারা ইন্দ্রিয় পোষণ হয়। অতএব নিরাহার বা উপবাস করিলে ইন্দ্রিয়সকল অশক্ত হইয়া নিজ নিজ বিষয়সমূহ সেবন করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু এই ভাবে বিষয়োপভোগ দূর হওয়া কেবল জবরদস্তির, অক্ষমতার, বাহিঃক্রিয়া হইল। ইহা দ্বারা মনের বিষয়বাসনা (রস) কিছু কম হয় না, এইজন্য এই বাসনা যাহা দ্বারা নষ্ট হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; এই প্রকার ব্রহ্মানুভূতি হইলে পর মন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-সকলও আপনাপনিই আয়ত্ত থাকে ; ইন্দ্রিয়সকলকে অধীন রাখিবার জন্য উপবাস প্রভৃতি উপায় আবশ্যক নহে,—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। এবং এই অর্থই পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে (গী ৬. ১৬. ১৭ এবং ৩. ৬. ৭ দেখুন) যে, যোগীর আহার নিয়মিত রহিবে, তিনি আহার বিহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে দিবেন না। সারকথা, গীতার এই সিদ্ধান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় উপবাস প্রভৃতি সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যাজ্য ; নিয়মিত আহার-বিহার এবং ব্রহ্মজ্ঞানই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উত্তম সাধন। এই শ্লোকে রস শব্দের 'জিহ্বা দ্বারা অনুভব-যোগ্য মিষ্ট, ঝাল, ইত্যাদি রস' এই প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন ব্যক্তি এই অর্থ করেন যে, উপবাসের দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় যদি চলিয়াও যায়, তথাপি জিহ্বার রস অর্থাৎ পানাহারের ইচ্ছা হ্রাস না হইয়া অনেক দিনের উপবাসের ফলে আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠে। এবং ভাগবতে এই

অর্থের এক শ্লোকও আছে (ভাগ. ১১. ৮. ২০)। কিন্তু আমার মতে গীতার এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক নহে। কারণ, দ্বিতীয় চরণেরসঙ্গে উহার মিল খায় না। ইহা ব্যতীত ভাগবতে 'রস শব্দ' নাই 'রসনং' শব্দ আছে এবং গীতার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণও সেখানে নাই। অতএব ভাগবত ও গীতার শ্লোককে একার্থক মানিয়া লওয়া উচিত নহে। এখন পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে আরও বেশী স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইতে পারে না—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ: (৬০) কারণ এই যে, কেবল (ইন্দ্রিয়সকল দমন করিবার জন্য,) প্রযত্নকারী বিদ্বানেরও মনকে, হে কুন্তীপুত্র! এই প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্বক নিজের অভিপ্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৬১) (অতএব) এই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে। এই প্রকার যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল নিজের স্বাধীন হইয়া যায়, (বলিতে হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে।

রহস্য: এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নিয়মিত আহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া সংগে সংগেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য মৎপরায়ণ হইতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে চিত্ত লাগাইতে হইবে; এবং ৫৯শ শ্লোকের আমি যে অর্থ করিয়াছি, উহা হইতে প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মনুও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী পুরুষকে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" (মনু ২. ২১৫) এবং উহারই অনুবাদ উপরের ৬০শ শ্লোকে করা হইয়াছে। সারকথা, এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যিনি স্থিত প্রজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে নিজের আহার-বিহার নিয়মিত রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মন নির্বিষয় হয়, শরীর-ক্লেশের উপায় তো অতিরিক্ত—প্রকৃত নহে। 'মৎপরায়ণ' পদে এস্থলে ভক্তিমার্গেরও আরম্ভ হইল (গী. ৯. ৩৪ দেখুন)। উপরের শ্লোকে যে 'যুক্ত' শব্দ আছে, উহার অর্থ 'যোগের দ্বারা প্রস্তুত'। গীতা. ৬. ১৭ তে 'যুক্ত' শব্দের অর্থ 'নিয়মিত'। কিন্তু গীতাতে এই শব্দের সর্বদা ব্যবহৃত অর্থ হইতেছে—সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গীতাতে কথিত হইয়াছে উহার উপযোগ করিয়া অদনুসারে সমস্ত সুখ-দুঃখ শান্তভাবে সহ্য করিয়া ব্যবহার-কার্য্যে চতুর পুরুষ" (গী ৫. ২৩ দেখুন) এই রীতিতে নিষ্ণাত ব্যক্তিকেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে। তাঁহার অবস্থাকেই সিদ্ধাবস্থা বলে এবং এই অধ্যায়ের এবং পঞ্চম ও দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে ইহারই বর্ণনা আছে। ইহা বলা হইয়াছে যে, বিষয়সমূহের বাসনা ত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার জন্য কি আবশ্যক। এখন পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইতেছে যে, বিষয়সমূহে বাসনা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এই বাসনা হইতেই পরে কামক্রোধ প্রভৃতি বিকার কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং শেষে উহা দ্বারা মনুষ্যের বিনাশ কিরূপে সাধিত হয়, এবং ইহা হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ হইতে পারে—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ: (৬২) বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি বাড়িয়া যায়। আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসনা উৎপন্ন হয় যে, আমার কাম (অর্থাৎ ঐ বিষয়) লাভ করিতে হইবে। এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বিঘ্ন হইলে) ঐ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়; (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অবিবেক আসে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে (পুরুষের) সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। (৬৪) কিন্তু নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাঁহার অধীনে থাকে, সেই (ব্যক্তি) প্রীতি ও দ্বেষ হইতে মুক্ত নিজের স্বাধীন ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও (চিত্তে) প্রসন্ন থাকেন। (৬৫) চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ নাশ হয়, কারণ যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন তাঁহার বুদ্ধিও তৎকালে স্থির থাকে।

রহস্য: এই দুই শ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, বিষয় বা কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কেবল উহাতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষয়েই অনাসক্ত বুদ্ধিতে বিচরণ করেন এবং তিনি যে শান্তি লাভ করেন, তাহা কর্ম্মত্যাগের ফলে নহে, কিন্তু ফলাশাত্যাগের ফলে প্রাপ্ত হয়েন। কারণ ইহা ব্যতীত. অন্য বিষয়ে এই স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্ন্যাসমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয়সংযম, নিরিচ্ছা ও শান্তি, এই গুণ উভয়েরই আবশ্যক; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিত-প্রজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন এবং সন্ন্যাসমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞ করেনই না (গী. ৩. ২৫ দেখুন)। কিন্তু গীতার সন্ন্যাসমার্গী টীকাকার এই প্রভেদকে গৌণ বুঝিয়া সাম্প্রদায়িক আগ্রহে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের উক্ত বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গসম্বন্ধীয়ই। এক্ষণে যাহার চিত্ত এই প্রকার প্রসন্ন নহে, তাহার বর্ণনা করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ আরও বিস্তৃত-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ ঃ (৬৬) যে ব্যক্তি উক্ত প্রণালীতে যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হয় নাই, তাহার (স্থির) বুদ্ধি ও ভাবনা অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠাও থাকে না। যাহার ভাবনা নাই, তাঁহার শান্তি নাই এবং যাহার শান্তি নাই তাহার কোথা হইতে সুখলাভ হইবে ? (৬৭) (বিষয়সমূহে) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্দ্রিয়সমূহের পশ্চাতে পশ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়ু যেমন আকর্ষণ করে, পুরুষের বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়সকল হইতে যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল চারি দিক হইতে সরিয়া আসিয়াছে, (বলিতে হয় যে), তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে।

রহস্য ঃ সারকথা, মনের নিগ্রহের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ করা সকল সাধনের মূল। বিষয়সমূহে লিপ্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকল এদিকে-ওদিকে যদি দৌড়াইতে থাকে তবে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার (বাসনাত্মক) বুদ্ধিই হইতে পারে না। অর্থ এই যে, বুদ্ধি না হইলে তাহার বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও সুখও লাভ হয় না। গীতারহস্যের চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে একেবারে চাপিয়া সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু গীতার অভিপ্রায় এই যে, ৬৪শ শ্লোকে যে বর্ণনা আছে তদনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৬৯) সকল লোকের যাহা রাত্রি, তাহাতে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন এবং যখন সমস্ত প্রাণী জাগিয়া থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রাত্রি মনে হয়।

রহস্য ঃ এই বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা আলঙ্কারিক। অজ্ঞান অন্ধকারকে এবং প্রকাশকে জ্ঞান বলা হয় (গী. ১৪. ১১)। অর্থ এই যে, অজ্ঞানী লোকের নিকট যে বস্তু অনাবশ্যক মনে হয় (অর্থাৎ উহাদের নিকট যাহা অন্ধকার) তাহাই জ্ঞানী লোকের নিকট আবশ্যক ; এবং যাহাতে অজ্ঞানী লোক মগ্ন থাকে—উহাদের নিকট যেখানে উজ্জ্বল মনে হয় –সেইখানেই জ্ঞানীব্যক্তি অন্ধকার দেখেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানীর অভীষ্ট নহে। উদাহরণ যথা, জ্ঞানী ব্যক্তি কাম্য কর্ম্মকে তুচ্ছ মনে করেন, আর সাধারণ লোক উহাতে ডুবিয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যে নিষ্কাম কর্ম্ম চাহেন, অন্যান্য লোক তাহা চাহে না।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ ঃ (৭০) চারিদিক হইতে (জল) পূর্ণ হইলেও যাহার মর্য্যাদা অতিক্রান্ত হয় না, সেই সমুদ্রে যে প্রকার সমস্ত জল চলিয়া যায়, সেই প্রকার যে ব্যক্তিতে সমস্ত বিষয় (তাঁহার শান্তিভঙ্গ না করিয়াই) প্রবেশ করে, তাঁহারই (প্রকৃত) শান্তিলাভ হয়। বিষয়-অভিলাষী ব্যক্তির (এই শান্তি) (লাভ হয়) না।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, শান্তিলাভের জন্য কর্ম্ম করিবে না, প্রত্যুত ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকের মন ফলাশা ও কাম্যবাসনার কারণে বিমূঢ় হইয়া যায় এবং উহাদের কর্ম্মের দ্বারা উহাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় ; কিন্তু যিনি সিদ্ধাবস্থায় পেঁছিয়াছেন, তাঁহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হয় না, যতই কর্ম্ম করিতে হোক না কেন, তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যায় শান্ত থাকেন এবং সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন ; অতএব তাঁহার সুখদুঃখের ব্যথা হয় না। (উক্ত ৬৪শ শ্লোক এবং গী. ৪. ১৯ দেখুন)। এখন এই বিষয়ের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার নাম কি—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ঃ (৭১) যে ব্যক্তি সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসক্তি, ছাড়িয়া এবং নিস্পৃহ হইয়া (ব্যবহারে) বিচরণ করেন এবং যাঁহার মমত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

রহস্য ঃ সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার এই ‘চরতি’ (বিচরণ করেন) পদের “ভিক্ষা মাগিয়া ফেরেন” এইরূপ অর্থ করেন ; কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্ব্বের ৬৪শ ও ৬৭শ শ্লোকে ‘চরন্’ এবং ‘চরতাং’এর যে অর্থ, সেই অর্থই এখানেও করিতে হইবে। গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা মাগিবেন। হাঁ, ইহার বিপরীতে ৬৪শ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রিয়সকলকে নিজের আয়ত্ত রাখিয়া “বিষয়ে বিচরণ করিবেন’। অতএব ‘চরতি’র বিচরণ করেন’ অর্থাৎ ‘জগতের ব্যবহার করেন’ এই অর্থই করিতে হইবে। শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের উত্তরার্দ্ধে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘নিস্পৃহ’ চতুর পুরুষ (স্থিতপ্রজ্ঞ) ব্যবহারে কি প্রকার চলেন ; এবং উহাই গীতারহস্যের চতুর্দ্দশ প্রকরণের বিষয়।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ ঃ (৭২) হে পার্থ ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা পাইলে পর কেহই মোহে পতিত হয় না ; এবং অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালেও এই স্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করে।

রহস্য ঃ এই ব্রাহ্মী স্থিতি কর্ম্মযোগের চরম ও অত্যুত্তম অবস্থা (গী. র. প্র. পৃ. ২৪৪ ও ২১৬ দেখুন) ; এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় না। এস্থলে এই বিশেষত্ব বলিবার কোন কারণ আছে। তাহা এই যে, যদি কোন দিন দৈবযোগে দু’এক ঘণ্টার জন্য এই ব্রাহ্মী স্থিতি অনুভূত হয়, তবে তাহাতে কিছু চিরন্তন লাভ হয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যদি কোন মনুষ্যের এই স্থিতি না থাকে, তবে মরণকালে যেমন বাসনা রহিবে তদনুসারেই পুনর্জন্ম হইবে (গীতারহস্য পৃ. ২৪৮ দেখুন)। এই কারণেই ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণনা করিতে গিয়া এই শ্লোকে স্পষ্ট

উক্ত হইয়াছে যে, 'অন্তকালেঽপি=অন্তকালেও স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থা স্থির থাকে। অন্তকালে মনকে শুদ্ধ রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতা উপনিষদে (ছা. ৩. ১৪. ; প্র. ৩. ১০) এবং গীতাতেও (গী. ৮. ৫. ১০) বর্ণিত হইয়াছে। এই বাসনাত্মক কর্ম্ম পরবর্ত্তী অনেক জন্মলাভের কারণ, এইজন্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, অন্ততঃ মৃত্যুসময়ে বাসনাশূন্য হইতে হইবে। আবার ইহাও বলিতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসনাশূন্য হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ বাসনাশূন্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কাহারও উহা প্রাপ্ত হওয়া কেবল কঠিন নহে, অসম্ভবও বটে। মৃত্যুকালে বাসনা শুদ্ধ রাখিতে হইবে, এই তত্ত্ব কেবল বৈদিক ধর্ম্মেই নাই, অন্যান্য ধর্ম্মেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতারহস্য পৃ. ৩৭৮ দেখুন।

এই অধ্যায়ে, আরম্ভে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গের আলোচনা আছে, এই কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে ঐ বিষয়ই আছে। একই অধ্যায়ে প্রায় অনেক বিষয় বর্ণিত হয়। যে অধ্যায়ে, যে বিষয় আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে, কিম্বা যে বিষয় উহাতে মুখ্য, তদনুসারেই ঐ অধ্যায়ের নাম রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতারহস্য প্রকরণ ১৪. পৃ. ৩৮৪ দেখুন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুনের এই ভয় হইয়াছিল যে, ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতিকে আমার মারিতে হইবে। অতএব সাংখ্যমার্গ অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও অশোচ্যত্ব হইতে ইহা সিদ্ধ করা হইল যে, অর্জ্জুনের ভয় বৃথা। আবার স্বধর্ম্মের সামান্য আলোচনা করিয়া গীতার মুখ্য বিষয়, কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আরম্ভ করা গিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম করিলেও উহার পাপপুণ্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ কর্ম্ম সাম্য-বুদ্ধিতে করিয়া যাইবে, কেবল ইহাই এক যুক্তি বা যোগ। ইহার পরে শেষে, যাহার বুদ্ধি এই প্রকার সম হইয়া গিয়াছে, সেই কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাও করা হইয়াছে। কিন্তু এইটুকুতেই কর্ম্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা সত্য যে, কোনও কাজ সমবুদ্ধিতে কৃত হইলে উহার পাপ লাগে না; কিন্তু যখন কর্ম্ম অপেক্ষা সমবুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ হইতেছে (গী. ২. ৪৯), তখন ফের স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়া লইলেই কাজ চলিয়া যায়—ইহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে কর্ম্ম করিতেই হইবে। অতএব যখন অর্জ্জুন এই সন্দেহই প্রশ্নরূপে উপস্থিত করিলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে "কর্ম্ম করিতেই হইবে"।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ অর্জ্জুন বলিলেন (১) হে জনার্দ্দন! যদি তোমার এই মতই হয় যে, কর্ম্ম অপেক্ষা (সাম্য-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে (যুদ্ধের) নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেন লাগাইতেছ? (২) (দেখিতে) ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দিগ্ধ কথা বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধিকে ভ্রমে ফেলিতেছ। এই জন্য তুমি এমন একই কথা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বল, যাহাতে আমার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন—(৩) হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! পূর্ব্বে (অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আমি ইহা বলিয়াছি যে, এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে—অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগীদিগের।

রহস্যঃ আমি 'পুরা' শব্দের অর্থ "পূর্ব্বে" অর্থাৎ "দ্বিতীয় অধ্যায়ে" করিয়াছি। ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে জ্ঞানের বর্ণনা করিয়া আবার কর্ম্মযোগনিষ্ঠা আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু 'পুরা' শব্দের অর্থ "সৃষ্টির আরম্ভে"ও হইতে পারে। কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় বা ভগবত ধর্ম্মের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ (নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি) উভয়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্ভেই উৎপন্ন করিয়াছেন (শাং ৩৪০ ও ৩৪৭ দেখুন)। 'নিষ্ঠা' শব্দের পূর্ব্বে 'মোক্ষ' শব্দ অধ্যাহৃত আছে, 'নিষ্ঠা' শব্দের অর্থে যে মার্গে চলিলে শেষে মোক্ষ লাভ হয় সেই মার্গ বুঝায়; গীতা অনুসারে এই প্রকার নিষ্ঠা দুইটিই আছে, এবং সেই দুইটি স্বতন্ত্র, কোনটি কোনটির অঙ্গ নহে—ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (২৬২-২৭৩) করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে তাহা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। একাদশ প্রকরণের শেষে (পৃঃ ৩০৫) নিষ্ঠাদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহাও নক্সা সহ বর্ণনা করা হইয়াছে। মোক্ষের দুই নিষ্ঠা ব্যাখ্যাত হইল; এখন তাহার অঙ্গভূত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—

ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ (৪) (কিন্তু) কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তি হয় না, এবং কর্ম্মসন্ন্যাস (ত্যাগ) করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। (৫) কারণ কোন মনুষ্য (কোন-না-কোন) কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণ প্রত্যেক পরতন্ত্র মনুষ্যকে (সর্ব্বদা কোন-না-কোন) কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করেই।

রহস্যঃ চতুর্থ শ্লোকের প্রথম চরণে যে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' পদ আছে, তাহার 'জ্ঞান' অর্থ মানিয়া লইয়া সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারগণ এই শ্লোকের অর্থ নিজেদের সম্প্রদায়ের এই ভাবে অনুকূল করিয়া লয়েন—"কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম্ম জ্ঞানলাভের সাধন।" কিন্তু এই অর্থ সরলও নহে আর ঠিকও নহে। নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের উপযোগ বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রদ্বয়ে বহুবার করা হইয়াছে এবং সুরেশ্বরাচার্য্যের 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' নামে এই বিষয়ক এক গ্রন্থও আছে। তথাপি নৈষ্কর্ম্ম্যের এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। কেবল সুরেশ্বরাচার্য্যই নহে, কিন্তু মীমাংসা ও বেদান্তের সূত্র রচিত হইবারও পূর্ব্বাবধিই উহার প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা বলা আবশ্যক নাই যে, কর্ম্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য পারা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উহাকে মারিয়া যেমন বৈদ্যগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেই রূপই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ব বা দোষ কাটিয়া যায়। এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিবার অবস্থাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলে। এই প্রকার বন্ধকত্বরহিত কর্ম্ম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশাস্ত্রের এই এক বড়

প্রশ্ন আছে যে, এই অবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়? মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, নিত্য ও (নিমিত্ত হইলে পর) নৈমিত্তিক কর্ম্ম তো করা চাই, আর কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করাই চাই। ইহা দ্বারা কর্ম্মের বন্ধকত্ব থাকে না এবং নৈষ্কর্ম্ম্যবস্থা সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মীমাংসকদিগের এই যুক্তি ভুল; এবং এই বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃঃ ২৩৭) করা গিয়াছে। অপর কতকগুলি লোক বলেন যে, যদি কর্ম্ম না-ই করা হইবে, তবে উহার দ্বারা বন্ধন কি প্রকারে হইতে পারে? এই জন্য তাঁহাদের মতে নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্মই ছাড়া উচিত। ইঁহাদের মতে কর্ম্মশূন্যতাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম' বলে। চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই মত ঠিক নহে, ইহা দ্বারা তো সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষও লাভ হয় না; এবং পঞ্চম শ্লোকে ইহার কারণও উক্ত হইয়াছে। যদি আমি কর্ম্মত্যাগের বিচার করি, তবে যে পর্য্যন্ত এই দেহ আছে সে পর্য্যন্ত শোয়া বসা প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই বন্ধ হইতেই পারে না। (গী ৫. ৯ ও ১৮. ১১), এই জন্য কোনও মনুষ্য কর্ম্মশূন্য কখনও হইতে পারে না। ফলত কর্ম্মশূন্যরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য অসম্ভব। সার কথা, কর্ম্মরূপ বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহির করা উচিৎ যাহা দ্বারা উহা বিষরহিত হইয়া যায়। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মের মধ্য হইতে নিজের আসক্তি উঠাইয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উপায়। পরে অনেক স্থানে এই উপায়ই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরেও সন্দেহ হইতে পারে যে, যদিও কর্ম্মত্যাগ নৈষ্কর্ম্ম্য নহে, তথাপি সন্ন্যাসমার্গী তো সকল কর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াই মোক্ষ লাভ করে, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মত্যাগ আবশ্যক। ইহার উত্তর গীতা দেন যে, সন্ন্যাসমার্গীর মোক্ষ তো লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগের কারণে লাভ হয় না, কিন্তু মোক্ষসিদ্ধি তাঁহাদের জ্ঞানের ফল। যদি কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই মোক্ষসিদ্ধি হইত, তবে পাথরসমূহেরও মুক্তিলাভ হওয়া চাই! ইহা হইতে এই তিন বিষয় সিদ্ধি হইতেছে—(১) নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মশূন্যতা নহে, (২) কর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু তাহা দূর হইতে পারে না, এবং (৩) কর্ম্মত্যাগ সিদ্ধি প্রাপ্তির উপায় নহে; এই বিষয়ই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। যখন এই তিন বিষয় সিদ্ধ হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' (গী. ১৮ ৪৮. ও ৪৯) প্রাপ্তির জন্য এই এক মার্গই অবশিষ্ট থাকে যে কর্ম্ম করা তো ছাড়িবে না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আসক্তি ক্ষয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকিবে। কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তো বটে, কিন্তু কর্ম্মশূন্য থাকাও কখনো সম্ভব নহে, এইজন্য কর্ম্মের বন্ধকত্ব (বন্ধন) নষ্ট করিবার জন্য আসক্তি ছাড়িয়া সেই সকল করা আবশ্যক। ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলে; এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গই বিশেষ যোগ্যতাপূর্ণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ঃ (৬) যে মূঢ় (হাত পা প্রভৃতি) কর্ম্মেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া মনেতে ইন্দ্রিয়বিষয়সকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দাম্ভিক বলে। (৭) কিন্তু হে অর্জুন! যে মনেতে ইন্দ্রিয়সকলকে সংহরণ করিয়া, (কেবল) কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত বুদ্ধিতে 'কর্ম্মযোগের' আরম্ভ করে, তাহারই যোগ্যতা বিশেষ, অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠ।

রহস্য ঃ পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (গী. ২. ৪৯), এই দুই শ্লোকে তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, যে মনুষ্যের মন শুদ্ধ নয়, কেবল অন্যের ভয়ে বা অপরে আমাকে ভাল বলিবে এই মতলবে, কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারকে নিরুদ্ধ করে, সে প্রকৃত সদাচারী নহে, সে কপট। "কলৌ কর্ত্তা চ লিপ্যতে"—কলিযুগে দোষ বুদ্ধিতে নহে, কিন্তু কর্ম্মেতে থাকে—এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যক্তি ইহা প্রতিপাদন করে যে বুদ্ধি যেরূপই হোক না কেন, কর্ম্ম মন্দ না হইলেই হইল; তাহার এই শ্লোকে বর্ণিত গীতার তত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সপ্তম শ্লোকে ইহা প্রকট হইতেছে যে, নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার যোগকেই গীতাতে 'কর্ম্মযোগ' বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসমার্গী কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করেন যে, এই কর্ম্মযোগ ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত দাম্ভিক মার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও সন্ন্যাসমার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যুক্তি সাম্প্রদায়িক আগ্রহের কথা, কারণ কেবল এই শ্লোকেই নহে, কিন্তু আবার পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভে এবং অন্যত্রও, ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষাও কর্ম্মযোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ (গী. র. পৃ. ২৬৫-২৬৬)। এই প্রকারে যখন কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, তখন অর্জুনকে এই মার্গেরই আচরণ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ (৮) (নিজের ধর্ম্মানুসারে) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত কর্ম্ম তুমি কর, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই কোন স্থলে অধিক ভাল। ইহা ব্যতীত, (ইহা বুঝিয়া লও যে, যদি) তুমি কর্ম্ম না কর, তবে (আহারও না পাইলে) তোমার শরীরনির্ব্বাহ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে না।

রহস্য ঃ 'ব্যতীত' এবং পর্য্যন্ত' (অপি চ) পদের দ্বারা শরীরযাত্রাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প কারণ বলা হইয়াছে। এখন 'নিয়ত' অর্থাৎ 'নিয়ত কৃত-কর্ম্ম' কি প্রকার এবং অন্য কোন্ গুরুতর কারণে উহার আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝাইবার জন্য যজ্ঞপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। আজকাল যাগযজ্ঞ প্রভৃতি শ্রৌতধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আধুনিক পাঠকগণের নিকট এই বিষয়ের কোন বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গীতার সময়ে এই সকল যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল এবং 'কর্ম্ম' শব্দে প্রধানত এই সকলই বুঝাইত; অতএব গীতাধর্ম্মে ইহা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক ছিল যে, এই ধর্ম্মকৃত্য করা হইবে কি না, আর যদি করিতে হয় তো কি প্রকারে। ইহা ব্যতীত, ইহাও মনে থাকে যেন, যজ্ঞ-শব্দের অর্থ কেবল জ্যোতিষ্টোম

প্রভৃতি শ্রৌত যজ্ঞ বা অগ্নিতে কোনও বস্তুর হোম করাই নহে (গী. ৪. ৩২ দেখুন)। সৃষ্টিনির্ম্মাণ করিয়া উহার কাজ ঠিক ঠিক চলিবার জন্য, অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থ, ব্রহ্মা প্রজাগণের চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত যে যে কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন, সে সমস্তই 'যজ্ঞ' শব্দে সমাবেশ হয় (মভা. অনু. ৪৮. ৩ ; গী. র. পৃ. ২৪৯-২৫৫)। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে এই সকল কর্ম্মেরই উল্লেখ আছে এবং এই 'নিয়ত' শব্দে উহাই বিবক্ষিত। এইজন্য বলিতে হয় যে, আজকাল যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায় হইলেও যজ্ঞচক্রের এই আলোচনা এখনও নিরর্থক নহে। শাস্ত্রানুসারে এই সকল কর্ম্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই জগতে মনুষ্যের কল্যাণ হইবে এবং তাহার সুখলাভ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ৪১-৪৪) এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মীমাংসকদিগের এই সহেতুক বা কাম্যকর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহা নিম্নশ্রেণীর। এবং মানিতে হয় যে, এখন তো ঐ সকল কর্ম্মই করিতে হয়; এইজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে যে, কর্ম্মের শুভাশুভলেপ বা বন্ধকত্ব কি প্রকারে কাটিয়া যায় এবং ঐ সকল করিতে থাকিলেও নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়। এই সমগ্র আলোচনা ভারতে বর্ণিত নারায়ণীয় বা ভাগবতধর্ম্মের অনুসারেই হইয়াছে (মভা. শা. ৩৪০ দেখুন)।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৯) যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ (কৃত) কর্ম্ম (ও) তুমি আসক্তি বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের প্রথম চরণে মীমাংসকদিগের এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। মীমাংসকদিগের কথা এই যে, যখন বেদসকলই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম মনুষ্যের জন্য নিয়ত করিয়া দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বরনির্ম্মিত সৃষ্টির ব্যবহার ঠিক ঠিক চলিবার জন্য এই যজ্ঞচক্র আবশ্যক তখন কেহই এই কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না; যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে শ্রৌতধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কর্ম্মের ফল মনুষ্যকে ভোগ করিতেই হয়; এই অনুসারে বলিতে হয় যে, যজ্ঞের জন্য মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিষয়ে মীমাংসকদিগের উত্তর এই যে, 'যজ্ঞ' করিতে হইবে, ইহা বেদেরই আদেশ, এইজন্য যজ্ঞার্থ যে যে কর্ম্ম করা হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরসম্মত হইবে; অতএব ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা কর্ত্তা বদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কার্য্যের জন্য—উদাহরণার্থ কেবল নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য,—মনুষ্য যাহা কিছু করে, তাহা যজ্ঞার্থ হইতে পারে না; উহাতে তো কেবল মনুষ্যেরই নিজের লাভ। এই কারণেই মীমাংসক উহাকে 'পুরুষার্থ' কর্ম্ম বলেন, এবং উঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ যজ্ঞার্থের অতিরিক্ত অন্য কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষার্থ কর্ম্মের যাহা কিছু ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহা মনুষ্যের ভোগ করিতে হয়—এই সিদ্ধান্তই উক্ত শ্লোকের

প্রথম পংক্তিতে আছে (গী. র. প্র. ৩. পৃ. ৪৬-৫০) কোন কোন টীকাকার যজ্ঞ = বিষ্ণু এইরূপ গৌণ অর্থ করিয়া বলেন যে, যজ্ঞার্থ শব্দের অর্থ বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ বা পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক ; কিন্তু আমার মতে এই অর্থ টানাবুনা ও ক্লিষ্ট। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা ব্যতীত যদি মনুষ্য অন্য কোন কর্ম্মই না করে, তবে কি তাহার কর্ম্মবন্ধন দূর হয়? কারণ যজ্ঞও তো কর্ম্মই উহার স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ যে ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, এই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তি বিরোধী (গী. ২. ৪০-৪৪ ; ও ৯. ২০. ২১ দেখুন)। এইজন্যই উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের যজ্ঞার্থ যাহা কিছু নিয়ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও সে ফলাশা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়া করিবে এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাত্ত্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা হইয়াছে (গী. ১৭. ১১ ও ১৮. ৬)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম যজ্ঞার্থ এবং তাহাও ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিলে (১) ঐ মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারেই কোনও প্রকারে মনুষ্যকে বন্ধ করে না, কারণ তাহা তো যজ্ঞার্থ কৃত হয়, এবং (২) উহার স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ শাস্ত্রোক্ত ও অনিত্য ফল মিলিবার পরিবর্ত্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় কারণ তাহা ফলাশা ছাড়িয়া কৃত হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এই অর্থই দুইবার প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসকদিগের "যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করা উচিত, কারণ তাহা বন্ধক হয় না"— এই সিদ্ধান্তে ভগবদ্গীতা আরও এই সংস্কার আনিয়া দিয়াছেন যে, "যে কর্ম্ম যজ্ঞার্থ কৃত হয়, তাহাও ফলাশা ছাড়িয়া করিতে হইবে"। কিন্তু ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কৃত করিবার প্রযত্ন করিয়া যাগযজ্ঞাদি গার্হস্থ্য বৃত্তি বজায় রাখিবার অপেক্ষা, কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া ছুড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেয়স্কর নহে? ভগবদ্গীতা এই প্রশ্নের এই স্পষ্ট উত্তরই দেন যে 'তাহা নহে'। কারণ যজ্ঞচক্র বিনা এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না। অধিক কি বলিব, জগতের ধারণপোষণের জন্য ব্রহ্মা এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন করিলেন ; এবং যখন জগতের সুস্থিতি বা সংগ্রহই ভগবানের অভীষ্ট, তখন কেহই এই যজ্ঞচক্র ছাড়িতে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে, পাঠকদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'যজ্ঞ' শব্দ এখানে কেবল শ্রৌতযজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহাতে স্মার্ত্ত যজ্ঞের এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যাদির যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্মের সমাবেশ আছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ (১০) প্রারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মা (উহাকে) বলিলেন, "এই (যজ্ঞের দ্বারা তোমার বৃদ্ধি হৌক ; এই (যজ্ঞ) তোমার কামধেনু

হইবে অর্থাৎ, ইহা তোমার, অভীপ্সিত ফলদাতা হইবে। (১১) তুমি এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে থাক, (এবং) সেই দেবতা তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে থাকুন। (এই প্রকারে) পরস্পর এক অপরকে সন্তুষ্ট করিতে থাকিয়া (উভয়ে) পরম শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে থাক"। (১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বারা সন্তোষপ্রাপ্ত দেবতারা তোমার অভীপ্সিত (সমস্ত) ভোগ তোমাকে দিবেন। উঁহাদেরই প্রদত্ত উঁহাদিগকে (ফিরাইয়া) না দিয়া যে (কেবল স্বয়ং) উপভোগ করে, সে সত্যই চোর।

রহস্য ঃ যখন ব্রহ্মা এই সৃষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন করিলেন, তখন তাঁহার চিন্তা হইল যে, এই লোকসকলের ধারণ-পোষণ কি প্রকার হইবে। মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ইহার পর সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন ; তখন ভগবান লোকসকলের নির্ব্বাহের জন্য প্রবৃত্তিপ্রধান যজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্য উভয়কে কহিলেন যে, এই প্রকার ব্যবহার পূর্ব্বক একে অপরের রক্ষাসাধন কর। উক্ত শ্লোকে এই কথারই কিছু শব্দভেদে অনুবাদ করা হইয়াছে (মভা. শা, ৩৪০, ৩৮ হইতে ৬২ দেখুন)। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আরও অধিক দৃঢ় হইতেছে যে, প্রবৃত্তি-প্রধান ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্বই গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মে যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (মভা. শা. ৩৩৬ ও ৩৩৭), এইজন্য পশুযজ্ঞের স্থানে প্রথম দ্রব্যময় যজ্ঞ সুরু হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া গেল যে, জপময় যজ্ঞ অথবা জ্ঞানময় যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (গী. ৪. ২৩-৩০)। যজ্ঞশব্দের অর্থে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সকল কর্ম্ম ; এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, সমাজের যথোচিতভাবে ধারণ-পোষণ হইবার জন্য এই যজ্ঞ-কর্ম্ম বা যজ্ঞ-চক্র ভালরূপ বজায় রাখিতে হইবে (মনু ১. ৮৭)। অধিক বলিব কি ; এই যজ্ঞচক্র পরে বিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত লোকসংগ্রহেরই এক আকার (গীতার. প্র. ১১ দেখুন)। এইজন্যই স্মৃতিসমূহেও লিখিত আছে যে, দেবলোক ও মনুষ্যলোক, উভয়ের সংগ্রহার্থ ভগবানই প্রথমে যে লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম রচনা করিলেন, তাহা পরে ভালরূপ প্রচলিত রাখা মনুষ্যের কর্ত্তব্য ; এবং এই অর্থই এখন পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ (১৩) যজ্ঞ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণকর্ত্তা সাধুব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু (যজ্ঞ না করিয়া কেবল) নিজেরই জন্য যে (অন্ন) প্রস্তুত করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে।

রহস্য ঃ ঋগ্বেদের ১০. ১১৭. ৬ মন্ত্রেরও ইহাই অর্থ। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, "নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী"—অর্থাৎ যে মনুষ্য অর্য্যমা বা সখার পোষণ না করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল পাপী বুঝিতে হইবে। এই প্রকারই মনুস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "অঘং স কেবলং ভুংক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ। যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।" (৩. ১১৮)—অর্থাৎ যে মনুষ্য নিজেরই জন্য (অন্ন) প্রস্তুত করে সে কেবল পাপ ভক্ষণ করে। যজ্ঞ করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'অমৃত' এবং অপরের ভোজন হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে (ভুক্তাবশিষ্ট) তাহা 'বিঘস' উক্ত হয় (মনু ৩. ২৮৫)। এবং সজ্জনের পক্ষে এই অন্নই বিহিত উক্ত হইয়াছে (গী. ৪. ৩১

দেখুন)। এক্ষণে এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার জন্যই নহে, আর স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই নহে ; বরঞ্চ জগতের ধারণপোষণ হইবার জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত অবলম্বিত—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ (১৪) প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, পর্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয় ; এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

রহস্য ঃ মনুস্মৃতিতেও মনুষ্যের এবং তাহার ধারণার্থ আবশ্যক অন্নের উৎপত্তির বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণনা আছে। মনুর শ্লোকের ভাব এই যে, "যজ্ঞের অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে পৌঁছায় এবং পরে সূর্য্য হইতে (অর্থাৎ পরম্পরাসূত্রে যজ্ঞ হইতেই) পর্জন্য উৎপন্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়" (মনু. ৩. ৭৬)। এই শ্লোকই মহাভারতেও আছে (মভা. শা. ২৬২. ১১ দেখুন)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২. ১) এই পূর্ব্বপরম্পরা ইহা হইতেও পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে—"প্রথম পরমাত্মা হইতে আকাশ হইল এবং পরে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হইল ; পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।" অতএব এই পরম্পরা অনুসারে, প্রাণীমাত্রের কর্ম্মপর্য্যন্ত কথিত পূর্ব্বপরম্পরাকে এক্ষণে কর্ম্মের পূর্ব্বে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পূর্ব্বে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া সম্পূর্ণ করিতেছেন—

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ (১৫) কর্ম্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, এবং এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন। অতএব (ইহা বুঝ যে,) সর্ব্বগত ব্রহ্মই যজ্ঞে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

রহস্য ঃ কেহ কেহ এই শ্লোকের 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থে 'প্রকৃতি' ধরেন না, তাঁহারা বলেন যে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে 'বেদ'। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ' অর্থ করিলে "ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন" এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও এইরূপ অর্থ করিলে "সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেতে আছেন" ইহার অর্থ যথাযথ লাগে না। এইজন্য "মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম" (গী. ১৪. ৩) শ্লোকে "ব্রহ্ম" পদের যে প্রকৃতি অর্থ আছে, তদনুসারে রামানুজভাষ্যে এই অর্থ করা হইয়াছে যে এই স্থানেও 'ব্রহ্ম' শব্দে জগতের মূল প্রকৃতি বিবক্ষিত ; এবং এই অর্থই আমারও ঠিক মনে হইতেছে। ইহা ব্যতীত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, যজ্ঞপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, "অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ব্বং যজ্ঞশ্চানুজগৎ সদা।" (শা. ২৬৭. ৩৪)—অর্থাৎ যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ এবং জগতের পশ্চাতে যজ্ঞ। ব্রহ্মের অর্থ 'প্রকৃতি' করিলে এই বর্ণনারও আলোচ্য শ্লোকের সহিত মিল হইয়া যায়, কারণ জগতই প্রকৃতি। গীতারহস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতে জগতের সমস্ত কর্ম্ম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকারই পুরুষসূক্তেও বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবতারা প্রথম যজ্ঞ করিয়াই সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ (১৬) হে পার্থ ! এই প্রকার (জগতের ধারণার্থ) প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম বা যজ্ঞের চক্রকে যে এই জগতে পরে না চালায়, তাহার জীবন পাপরূপ ; ঐ ইন্দ্রিয়লম্পটের (অর্থাৎ দেবতাদিগকে না দিয়া স্বয়ং উপভোগকারীর) জীবন ব্যর্থ।

রহস্য ঃ স্বয়ং ব্রহ্মাই—মনুষ্যেরা নহে—লোকসকলের ধারণপোষণের জন্য যজ্ঞময় কর্ম্ম বা চাতুর্বর্ণ্যবৃত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। এই সৃষ্টির ক্রম চলিতে থাকিবার জন্য (শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্ব্বাহ হইবার জন্য (শ্লোক ৮), এই দুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে ; ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞচক্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে সর্ব্বদা চালাইয়া রাখা উচিত। এখন ইহা জানা গেল যে, মীমাংসকদিগের বা ত্রয়ীধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড (যজ্ঞচক্র) গীতাধর্ম্মে অনাসক্ত বুদ্ধির যুক্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হইয়াছে (গীতার. প্র. ১১ পৃ. ২৯৮-৩১৯ দেখুন)। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদান্তী সন্দেহ করেন যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষের যখন এইখানে মোক্ষলাভ হয়, এবং তাঁহার যাহা কিছু পাইবার থাকে, সে সমস্তই তিনি এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার কোনও কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই—এবং তাঁহার কর্ম্ম করাও উচিত নহে। ইহার উত্তর পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে দেওয়া যাইতেছে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১৭) কিন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার জন্য (কেবল নিজের) কোনও কার্য্য (অবশিষ্ট) থাকে না ; (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে (কোনও কাজ) করিলে বা না করিলেও তাঁহার কোনও লাভ হয় না ; এবং সকল প্রাণীতে তাঁহার কোনও (নিজের) অভীষ্ট রুদ্ধ থাকে না। (১৯) অতএব অর্থাৎ যখন জ্ঞানীপুরুষ এই প্রকার কোনও অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমিও (ফলের) আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতে থাক ; কারণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার পরমগতি লাভ হয়।

রহস্য ঃ ১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির টীকাকারগণ অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল ভাবার্থই বলিতেছি। তিন শ্লোক মিলিয়া হেতু-অনুমানযুক্ত একই বাক্য। তন্মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকে প্রথমে সাধারণ রীতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্ম না করিবার বিষয়ে যে সকল কারণ বলা হয়, সেই সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং এই কারণসমূহ হইতেই গীতা যে অনুমান বাহির করিয়াছেন তাহা ১৯শ শ্লোকে কারণ-বোধক 'তস্মাৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জগতে শোওয়া, বসা, উঠা বা জীবিত থাকা প্রভৃতি সকল কর্ম্ম, কেহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেও, ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মত্যাগ করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যও হয় না, আর না তাহা সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়ই হয়।

কিন্তু ইহার উপর সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে, "আমি কিছু সিদ্ধিলাভের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি না। প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে যাহা কিছু করে, তাহা নিজের বা অপরের লাভেরই জন্য করে, কিন্তু মনুষ্যের স্বকীয় পরম সাধ্য হইতেছে সিদ্ধাবস্থা অথবা মোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহা লাভ করেন, এই জন্য তাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে পর লাভ করিবার কিছু থাকে না (১৭ শ্লোক)। এই অবস্থাতেই, চাই তিনি কর্ম্ম করুন বা নাই করুন—তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান। ভাল; যদি বল যে, লোকের উপযোগের জন্য তাঁহার কর্ম্ম করা উচিত, তবে লোকদের নিকটেও তাঁহার কোন লেন-দেন নাই (শ্লো, ১৮)। তবে ঐ কর্ম্ম করিবেই বা কেন"? ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, যখন কর্ম্ম করা আর না করা উভয়ই তোমার পক্ষে সমান, তখন কর্ম্ম না করিবার দিকেই তোমার এত ঝোঁক কেন? শাস্ত্র অনুসারে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আগ্রহবিহীন বুদ্ধিতে করিয়া ছুটী লও। এই জগতে কর্ম্ম জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই এড়াইতে পারে না। আপাতত দেখিতে ইহা বড়ই জটিল সমস্যা মনে হয় যে, কর্ম্ম চলিয়া গিয়া থাকিয়া যায়, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের জন্য উহা আবশ্যক নহে! কিন্তু গীতার নিকট এই সমস্যা কিছু কঠিন লাগে না। গীতা বলেন যে, যখন কর্ম্ম ছাড়েই না, তখন তাহা করাই চাই। কিন্তু এখন স্বার্থবুদ্ধি না রাখিয়া তাহা নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। ১৯শ শ্লোকে 'তস্মাৎ' পদের প্রয়োগ করিয়া এই উপদেশই অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে; এবং ইহারই পোষণে পরে ২২শ শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভগবান স্বয়ং নিজের কোনও কর্ত্তব্য না থাকিলেও কর্ম্মই করেন। সারকথা, সন্ন্যাসমার্গের লোক জ্ঞানী ব্যক্তির যে অবস্থা বর্ণন করেন, তাহা ঠিক মানিয়া লইলেও গীতার বক্তব্য এই যে, সেই অবস্থা হইতেই কর্ম্মসন্ন্যাসপক্ষ সিদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে, সর্ব্বদা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার পক্ষই আরও দৃঢ় হইতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের কর্ম্মযোগের উক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত (৭. ৮. ৯) মান্য নহে; এইজন্য তাঁহারা উক্তকার্য্য-কারণভাবকে অথবা সমুদয় অর্থপ্রবাহকে, বা পরে ব্যাখ্যাত ভগবানের দৃষ্টান্তকেও মানেন না (২২. ২৫ ও ৩০)। তাঁহারা তিন শ্লোককে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে প্রথম দুই শ্লোকে এই যে নির্দ্দেশ আছে যে, "জ্ঞানী পুরুষের নিজের কোনই কর্ত্তব্য থাকে না" ইহাকেই গীতার চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া এই ভিত্তিতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভগবান জ্ঞানীপুরুষকে বলিতেছেন যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও! কিন্তু এই প্রকার করিলে তৃতীয় অর্থাৎ ১৯শ শ্লোকে অর্জ্জুনকে যে সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ দিয়াছেন যে "আসক্তি ছাড়িয়া কর্ম্ম কর" ইহা পৃথক হইয়া যায় এবং ইহার উপপত্তিও লাগে না। এই প্যাঁচ হইতে বাঁচিবার জন্য এই টীকাকারগণ এই অর্থ করিয়া নিজেদের সমাধান করিয়া লইয়াছেন যে, অর্জ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন বলিয়াই তো অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার পরেও ১৯শ শ্লোকের 'তস্মাৎ' পদ নিরর্থক থাকিয়া যায়। এবং সন্ন্যাসমার্গীদের কৃত এই অর্থ এই অধ্যায়েরই পূর্ব্বাপর সন্দর্ভেরও বিরুদ্ধ হয় এবং গীতার অন্যান্য স্থলের এই উল্লেখেরও বিরুদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা উচিত; আবার পরে ভগবান যে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এই অর্থ তাহারও বিরুদ্ধ হইয়া যায় (গী. ২. ৪৭; ৩. ৭. ২৫; ৪. ২৩; ৬. ১; ১৮. ৬-৯; এবং গী. র. প্র. ১১ পৃ. ৩৭৭-৩৮০)। ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে এই যে, এই অধ্যায়ে, যে কর্ম্মযোগের ফলে কর্ম্ম করিলেও তাহা বন্ধনকারণ হয় না, সেই কর্ম্মযোগেরই বিচার চলিয়া আসিতেছে (গী. ২. ৩৯);

এই বিচারের মধ্যেই কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই "কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল" এই অসম্বন্ধ কথা বলিবে না। তবে ভাল, ভগবান এই কথা কেন কহিতে লাগিলেন? অতএব নিছক সাম্প্রদায়িক ভাবের এবং টানাবুনা করা এই অর্থ স্বীকার করা যায় না। যোগবাসিষ্ঠে লিখিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম্ম করা উচিত এবং যখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাকে বল মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম কেন করিবে' তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন—.

জ্ঞস্য নার্থঃ কর্ম্মত্যাগৈঃ নার্থঃ কর্মসমাশ্রয়ৈঃ।
তেন স্থিতং যথা যদ্‌যৎ তত্তথৈব করোত্যসৌ ॥

"জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও লাভের উদ্দেশ্য কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম্ম করা হয় না, অতএব তিনি যখন যাহা পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকেন" (যোগ. ৬. উ. ১৯৯. ৪)। এই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গীতারই কথায় পূর্ব্বে কারণ দেখাইয়াছি।

মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথা প্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥

"কোন বিষয় করা বা না করা আমার পক্ষে একই"; এবং দ্বিতীয় পংক্তিতেই বলা হইল যে, যখন উভয় ব্যাপার একই প্রকার, তখন আবার "কর্ম্ম না করিবার আগ্রহই বা কেন? যাহা যাহা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই করিতে থাকি" (যো ৬. উ, ২১৬. ১৪)। এই প্রকার ইহার পূর্ব্বে, যোগবাসিষ্ঠে "নৈব তস্য কৃতেনার্থো" প্রভৃতি গীতার শ্লোকই শব্দশ গৃহীত হইয়াছে, এবং পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "যদ্‌যথা নাম সম্পন্নং তত্তথাঽস্ত্বিতরেণ কিং"—যাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই (জীবন্মুক্ত) করিতে থাকেন, এবং কিছু প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না (যো. ৬. উ. ১২৫. ৪৯. ৫০)। শুধু যোগবাসিষ্ঠেই নহে, গণেশগীতাতেও এই অর্থেরই প্রতিপাদক এই শ্লোক আসিয়াছে—

কিঞ্চিদস্য ন সাধ্যং স্যাৎ সর্বজন্তুষু সর্বদা।
অতোঽসক্ততয়া ভূপ কর্ত্তব্যং কর্ম জন্তুভিঃ ॥

উঁহার অপর প্রাণীগণে কোনই সাধ্য (প্রয়োজন) বাকী থাকে না, অতএব 'হে রাজন্! লোকদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য অসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকা চাই' (গণেশগীতা ২. ১৮)। এই সকল উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে, এই স্থলে গীতার তিন শ্লোকের যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আমি উপরে দেখাইয়াছি, তাহাই ঠিক। এবং গীতার তিন শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যোগবাসিষ্ঠের একটি শ্লোকেই আসিয়া গিয়াছে, অতএব উহার কার্য্যকারণভাবের বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসরই থাকে না। গীতার এই সকল যুক্তি মহাযানপন্থার বৌদ্ধগ্রন্থকারগণও পরে লইয়াছেন (গী. র. পৃ. ৪৭৮-৪৭৯ এবং ৪৯৮)। উপরে এই যে বলা হইয়াছে যে স্বার্থ না থাকার কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তির নিজ কর্ত্তব্য নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হয়, এবং এই প্রকারে কৃত নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের বাধক হওয়া তো দূরের কথা, উহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়—ইহারই সমর্থনে এখন দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ: (২০) জনকাদিও এই প্রকার কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ লোকসংগ্রহেরও উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করাই উচিত।

রহস্য ঃ প্রথম চরণে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহার উদাহরণ দিলেন এবং দ্বিতীয় চরণে ভিন্ন রীতির প্রতিপাদন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহা তো সিদ্ধ করা হইল যে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের লোকসমূহে কোন বাধা থাকে না ; তথাপি যখন তাঁহারা কর্ম্ম ছাড়িতেই পারেন না, তখন তাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মই করা উচিত। কিন্তু, যদিও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কর্ম্ম যখন ছাড়াই যায় না, তখন উহা করাই উচিত ; তথাপি কেবল ইহা হইতেই সাধারণ মনুষ্যের ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। মনে সংশয় হয় যে, কর্ম্ম ছাড়িলেও ছাড়ে না বলিয়াই কি কর্ম্ম করা উচিত, উহাতে অন্য কোন সাধ্য কি নাই? অতএব এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ইহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন যে, এই জগতে নিজ কর্ম্মের দ্বারা লোক সংগ্রহ করা জ্ঞানী ব্যক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। "লোকসংগ্রমেবাপি"র 'এবাপি' পদের ইহাই তাৎপর্য্য, এবং ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হইতেছে যে এখন ভিন্ন প্রণালীর প্রতিপাদন আরম্ভ হইয়াছে। 'লোকসংগ্রহ' শব্দে 'লোক'এর অর্থ ব্যাপক ; অতএব এই শব্দে কেবল মনুষ্যজাতিকেই নহে, বরঞ্চ সমস্ত জগতকে সৎমার্গে আনিয়া উহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভালরূপ ধারণ, পোষণ, পালন বা রক্ষা করা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই সমাবেশ হয়। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (পৃ. ২৮৪-২৯০) এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে, তাই আমি এখানে উহার পুনরুক্তি করিলাম না। এক্ষণে প্রথমে ইহা বলিতেছেন যে, লোকসংগ্রহ করিবার এই কর্ত্তব্য বা অধিকার শুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিরই কেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১॥

অনুবাদ ঃ (২১) শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী কর্ম্মযোগী) পুরুষ যাহা কিছু করেন, তাহাই অন্য অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যও করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুকরণ করে।

রহস্য ঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদেও প্রথমে 'সত্যং বদ' 'ধর্ম্মং চর' ইত্যাদি উপদেশ করা হইয়াছে এবং ফের শেষে বলা হইয়াছে যে "যখন সংসারে তোমার সন্দেহ হইবে যে এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবহারই করিবে" (তৈঃ. ১. ১১. ৪)। এই অর্থেরই এক শ্লোক নারায়ণীয় ধর্ম্মেও আছে (মভা. শা. ৩৪১. ২৫) ; এবং এই ভাবেরই মরাঠীতে এই শ্লোক আছে, যাহা ইহারই অনুবাদ এবং যাহার সারমর্ম্ম এই যে, "লোকের কল্যাণকারী মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার করেন ঐ প্রকারই, এই সংসারে, সকল লোকই করিয়া থাকে।" এই ভাবই এই প্রকারে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে— "দেখ, ভাল লোকেরই চালচলনে সমস্ত সংসার চলে।" এই লোককল্যাণকারী পুরুষই গীতার 'শ্রেষ্ঠ' কর্ম্মযোগী। শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী' নহে (গী. ৫. ২)। এখন ভগবান স্বয়ং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই অর্থই আরও দৃঢ় করিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধি চলিয়া গেলেও, লোকহিতকর কর্ম্ম তাঁহাকে ছাড়ে না—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং।
সংকরস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ ঃ (২২) হে পার্থ! (দেখ যে,) ত্রিভুবনে আমার কোনও কর্ত্তব্যই (অবশিষ্ট) নাই, (আর) কোন অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবারও বাকী নাই ; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই চলিয়াছি। (২৩) কারণ যদি আমি কদাচিৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিবে। (২৪) যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি সঙ্করকর্ত্তা হইব এবং আমার হস্তে এই প্রজাগণের ধ্বংস হইবে।

রহস্য ঃ ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্লোকে সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে লোকসংগ্রহ কিছু অন্যায় নহে। এইরূপ আমি উপরে ১৭ হইতে ১৯শ পর্য্যন্ত শ্লোকের এই যে অর্থ করিয়াছি যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও জ্ঞানীর নিষ্কাম বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা উচিত ; তাহাও স্বয়ং ভগবানের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে। যদি না হয়, তবে এই দৃষ্টান্তও নিরর্থক হইবে (গী. র. পৃঃ ২৭৯-২৮০। সাংখ্যমার্গ ও কর্ম্মমার্গের মধ্যে এই একটি খুব বড় পার্থক্য আছে যে, সাংখ্যমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া বসেন, চাই এই কর্ম্মত্যাগের ফলে যজ্ঞচক্র ডুবিয়া যাউক অথবা জগতের কিছু হউক—উনি তাহার কোন পরোয়া করেন না ; এবং কর্ম্মমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি, শুদ্ধ নিজের জন্য আবশ্যক না হইলেও লোকসংগ্রহকে মহত্বপূর্ণ আবশ্যক কার্য্য জানিয়া, তজ্জন্য নিজ ধর্ম্মানুসারে সমস্ত কাজ করিতে থাকেন (গী. র. ১১ প্র. পৃ. ৩০৫-৩০৭)। ইহা বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান কি করেন। এখন জ্ঞানীগণের ও অজ্ঞানীগণের কর্ম্মের ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন যে, অজ্ঞানীদিগকে ভাল করিবার জন্য জ্ঞানীর আবশ্যক কর্ত্তব্য কি—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাহসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥ ২৫॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসংগিনাং।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌॥ ২৬॥

অনুবাদ ঃ (২৫) হে অর্জ্জুন! যে প্রকার (ব্যবহারিক) কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী লোক ব্যবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছু জ্ঞানী ব্যক্তির আসক্তি ছাড়িয়া সেই প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। (২৬) কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে জ্ঞানী ব্যক্তি ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না ; (নিজে) যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মই করিবেন এবং লোকদিগকে সানন্দে করাইবেন।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে ভেদভাব উৎপন্ন করিবে না এবং পরে ২৯শ শ্লোকেও এই কথাই আবার বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে, লোকদিগকে অজ্ঞানী করিয়া রাখিবে। ২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির লোকসংগ্রহ করিতে হইবে, এবং লোকদিগকে চতুর করাই হইল লোকসংগ্রহের অর্থ। ইহার উপর সংশয় হয় এই যে, লোকসংগ্রহই যদি করিতে হয়, তবে জ্ঞানীপুরুষের স্বয়ং কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই ; লোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেই—জ্ঞানের উপদেশ করিলেই—কাজ চলিয়া যায়। ভগবান তাহার এই উত্তর দেন যে, সদাচরণের দৃঢ় অভ্যাস যাহার হয় নাই, (এবং সাধারণ লোক এই প্রকারই হয়) তাহাকে যদি কেবল মুখে উপদেশ দেওয়া যায়—কেবল জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়—তবে সে নিজের অনুচিত ব্যবহারের সমর্থনেই এই ব্রহ্মজ্ঞানের অপপ্রয়োগ

করে ; এবং "অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি তো এই প্রকার বলেন" এই প্রকার নিরর্থক কথা তাহাকে বলিতে-শুনিতে দেখা যায়। এইরূপে যদি জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি অজ্ঞানী লোকদিগের নিরুদ্যোগী হইবার পক্ষে এক দৃষ্টান্তই হইয়া পড়িবেন। মনুষ্যের এই প্রকার বাকচতুর, কথাচালাচালি দ্বারা ভেদসাধক অথবা উদ্যোগহীন হওয়াই বুদ্ধিভেদ ; এবং মনুষ্যের বুদ্ধিতে এই প্রকারের ভেদভাব উৎপন্ন করিয়া দেওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অতএব গীতা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য—লোকদিগকে কর্ম্মকুশল ও সদাচরণশীল করিবার জন্য—স্বয়ং সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থাৎ সদাচরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লোকদিগকে দেখাইবেন এবং তদনুসারে আচরণ করাইবেন। এই জগতে উঁহার ইহাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য (গী.র. পৃ. ৩৪৬)। কিন্তু গীতার এই অভিপ্রায় না বুঝিয়া কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের যদি বিপরীত অর্থ করেন যে "জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীদিগের সম্মুখেই কর্ম্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে অজ্ঞানী লোক বালক থাকিয়াই নিজ কর্ম্ম করিতে থাকে"! তবে বল যে, দাম্ভিক আচরণ শিক্ষা দিয়া অথবা লোকসকলকে অজ্ঞানী থাকিতে দিয়া জানোয়ারদিগের ন্যায় উহাদিগের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লইবার জন্যই গীতা প্রবৃত্ত হইয়াছে! যাঁহার ইহা দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে না, সম্ভবত তাঁহার নিকট লোকসংগ্রহ একটা ঢং বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মসমূহের মধ্যে লোকসংগ্রহ এক মহত্বপূর্ণ কর্ম্ম ; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের উত্তম আদর্শের দ্বারা উহাদিগকে শোধরাইবার জন্য—বালক প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য নহে—কর্ম্মই করিবে (গী. র. প্র. ১১. ১২)। এখন এই সংশয় হইতে পারে যে, যদি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে থাকেন, তবে তিনিও অজ্ঞানীই হইয়া যাইবেন ; অতএব স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, যদিও জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই সংসারী হয়, তথাপি ইহাদের ব্যবহারে প্রভেদ কি এবং জ্ঞানীর নিকটে অজ্ঞানীর কোন্ বিষয়ে শিক্ষা লইতে হইবে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ : (২৭) প্রকৃতির (সত্ত্ব-রজ-তম) গুণসমূহ হইতেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম উৎপন্ন হয় ; কিন্তু অহঙ্কারমুগ্ধ (অজ্ঞানী ব্যক্তি) মনে করে যে আমি কর্ত্তা ; (২৮) কিন্তু হে মাহাবাহু অর্জ্জুন! "গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই আমা হইতে ভিন্ন" এই তত্ত্ব যিনি জানেন, সেই (জ্ঞানী ব্যক্তি) গুণসমূহের নিজেদের মধ্যে এই খেলা চলিতেছে ইহা বুঝিয়া ইহাতে আসক্ত হন না। (২৯) প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সংমূঢ় লোক গুণ ও কর্ম্মেই আসক্ত থাকে ; এই অসর্ব্বজ্ঞ মন্দ ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি (নিজের কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কোন অনুচিত মার্গে লাগাইয়া) বিচলিত করিবেন না।

রহস্য : এখানে ২৬শ শ্লোকের অর্থেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে এই যে সিদ্ধান্ত আছে যে, প্রকৃতি ভিন্ন এবং আত্মা ভিন্ন, প্রকৃতি অথবা

মায়াই যাহা কিছু করিতেছে, আত্মা কিছু ধরে না করে না, এই তত্ত্ব যিনি জানিয়া লয়েন, তিনিই বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী হইয়া যান, কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হয় না, ইত্যাদি—উহা মূলে কাপিল-সাংখ্যশাস্ত্রের। গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে (পৃ. ১৪২-১৪৩) ইহার পূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দেখুন। ২৮শ শ্লোকের কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গুণসমূহে অর্থাৎ বিষয়সমূহে বিচরণ করে। এই অর্থ শুদ্ধ নহে ; কারণ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এগারো ইন্দ্রিয় এবং শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচ বিষয় মূল-প্রকৃতির ২৩ গুণেরই অন্তর্গত গুণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল অর্থ তো এই যে, প্রকৃতির সমস্ত অর্থাৎ চব্বিশ গুণকে লক্ষ্য করিয়াই এই "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে"র সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে (গী. ১৩. ১৯-২২ ; এবং ১৪. ২৩)। আমি উহার শব্দশ ও ব্যাপকভাবে অনুবাদ করিয়াছি। ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী একই কর্ম্ম করিলেও উহাতে বুদ্ধির দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য থাকে (গী. র. পৃ. ২৬৮ ও ২৮৪) এখন এই সম্পূর্ণ আলোচনার সারস্বরূপ এই উপদেশ করিতেছেন—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : (৩০) (এইজন্য হে অর্জ্জুন!) আমাতে অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম সংন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়া এবং (ফলের) আশা ও মমতা ছাড়িয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর!

রহস্য : এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিলে কি ফল লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি হয়—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ : (৩১) যে শ্রদ্ধাবান (ব্যক্তি) দোষ অন্বেষণ না করিয়া আমার এই মতানুসারে নিত্য চলেন, তিনিও কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। (৩২) কিন্তু যে দোষদৃষ্টিতে সন্দেহ করিয়া আমার এই মতানুসারে না চলে, সেই সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অর্থাৎ নিরেট মূর্খ অবিবেকীদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও।

রহস্য : কর্ম্মযোগ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার জন্য বলিতেছে। উহার শ্রেয়স্করতা সম্বন্ধে উপরে অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা যে ফলশ্রুতি বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতেছে যে, গীতাতে কোন্ প্রকারের বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ-নিরূপণেরই পরিপোষণের জন্য ভগবান প্রকৃতির প্রবল ভাব এবং উহার প্রতিরোধের জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিতেছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ : (৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলেন। সমস্ত প্রাণীই (নিজ-নিজ) প্রকৃতি অনুসারে থাকে, (সেখানে) নিগ্রহ (জবরদস্তি) কি করিবে? (৩৪) ইন্দ্রিয় এবং উহার (শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়সমূহে প্রীতি ও

দ্বেষ (দুই-ই) ব্যবস্থিত অর্থাৎ স্বভাবতই আছে। প্রীতি ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে (কারণ) ইহারা মনুষ্যের শত্রু।

রহস্য : ৩৩শ শ্লোকের 'নিগ্রহ' শব্দের অর্থে 'নিছক সংযমন'ই নহে, কিন্তু উহার অর্থ 'জবরদস্তি' অথবা 'হঠ'। ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযুক্ত সংযম তো গীতার অভিপ্রেত, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপূর্ব্বক বা জবরদস্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক বৃত্তিকেই একেবারে মারিয়া ফেলা সম্ভব নহে। উদাহরণ ধর, যে পর্য্যন্ত দেহ আছে সে পর্য্যন্ত ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি ধর্ম্ম, প্রকৃতিসিদ্ধ হইবার কারণে, দূর হইতে পারে না ; মনুষ্য যতই কেন জ্ঞানী হউক না, ক্ষুধা লাগিলেই ভিক্ষা করিতে উহাকে বাহির হইতে হয়, এইজন্য চতুর ব্যক্তিদিগের জবরদস্তি করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিবার বৃথা হঠ করা কর্ত্তব্য নহে ; এবং যথাযুক্ত সংযমের দ্বারা উহাদিগকে নিজের বশে আনিয়া উহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিসকলকে লোকসংগ্রহার্থে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ৩৪শ শ্লোকের 'ব্যবস্থিত' পদে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে সুখ ও দুঃখ দুই বিকার স্বতন্ত্র ; এক অপরের অভাব নহে (গী. র. প্র. ৫. পৃ. ৮৮ ও ৯৯)। প্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অখণ্ডিত ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল বিষয়ও করিতে হয়, যাহা আমার নিজের পছন্দসই নহে (গী. ১৮. ৫৯) ; এবং যদি না করি, তবে নির্ব্বাহ হয় না। এইরূপ সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এই কর্ম্মসকলকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিয়া যান, অতএব পাপ-পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকেন ; এবং অজ্ঞানী উহাতেই আসক্তি রাখিয়া দুঃখ পায় ; ভাস কবির বর্ণনানুসারে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ইহাই এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ। কিন্তু এখন আর এক সংশয় আসিতেছে এই যে, যদিও ইহা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সকলকে বলপূর্ব্বক মারিয়া ফেলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে না, কিন্তু অনাসক্ত বুদ্ধিতে সকল কর্ম্মই করিতে থাকিবে ; কিন্তু যদি জ্ঞানী ব্যক্তি যুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্রূর কর্ম্ম করা অপেক্ষা কৃষি, ব্যবসায় বা ভিক্ষা প্রভৃতি কোন অহিংসামূলক ও সৌম্যভাবের কর্ম্ম করে তবে তাহা কি প্রশস্ততর নহে ? ভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ : (৩৫) পরধর্ম্মের আচরণ সুখে করিতে পারিলেও তদপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত কর্ম্মই অধিক শ্রেয়স্কর ; (ফের চাই) তাহা বিগুণ অর্থাৎ দোষযুক্ত হইলেই বা। স্বধর্ম্ম অনুসারে (চলিয়া) মৃত্যু ঘটিলেও তাহাতে মঙ্গল হয়, (কিন্তু) পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর !

রহস্য : স্বধর্ম্ম অর্থে স্মৃতিকারেরা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য শাস্ত্রের দ্বারা যে ব্যাপার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন তাহা ; স্বধর্ম্মের অর্থ মোক্ষধর্ম্ম নহে। সকল লোকের কল্যাণের জন্যই গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা (গী. ১৮. ৪১) শাস্ত্রকারগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অতএব ভগবান বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানী হইয়া গেলেও নিজ নিজ ব্যবসায় করিতে থাকিবে, ইহাতেই উহাদের এবং সমাজের কল্যাণ, এই ব্যবস্থার বারম্বার গোলমাল করা উচিত নহে (গী. র. পৃঃ ২৮৯ ও ৪২৬-৪২৮)। "তেলীর কর্ম্ম যদি তাম্বুলী করে, দৈব তারে নাহি মারে, আপনি সে মরে" এই প্রচলিত প্রবাদেরও ইহাই ভাবার্থ। যেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার চলন নাই সেখানেও, যে সমস্ত জীবন সৈনিকের কার্য্যে কাটাইল, তাহার যদি কোন কাজ করিতে হয়, তবে সিপাহির

ব্যবসায়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে শ্রেয়স্কর মনে করিবে ; দর্জির ব্যবসায় তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না ; এবং এই যুক্তিই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার জন্যও উপযোগী। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন ভিন্ন ; এবং তাহা এখানে উপস্থিতও হইতেছে না। এ বিষয় তো নির্ব্বিবাদ যে, সমাজের সমুচিত ধারণপোষণ হইবার জন্য কৃষির ন্যায় নিরুপদ্রব ও সৌম্যভাবের ব্যবসায়েরই ন্যায় অন্যান্য কর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে। অতএব যখন একবার কোন উদ্যোগকে—চাই তাহা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারেই স্বীকার কর বা স্বেচ্ছাক্রমেই স্বীকার কর—ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরবিশেষে উহাতে ফাঁক বাহির করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়া বসা ভাল নহে ; আবশ্যক হইলে ঐ ব্যবসায়েই প্রাণ দিতে হইবে। বস্, এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যে কোন ব্যাপার বা লাভের কর্ম্ম হউক না কেন, তাহাতে কোন-না-কোন দোষ সহজেই বাহির করা যায় (গী. ১৮. ৪৮)। কিন্তু এই একটুখানি খুঁতের জন্য নিজের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যই ছাড়িয়া দেওয়া কোন ধর্ম্ম নহে। মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে এবং তুলাধার-জাজলিসংবাদে এই তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে, এবং তথাকার ৩৫শ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ মনুস্মৃতিতে (১০. ৯৭) এবং গীতাতেও (১৮. ৪৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবান ৩৩শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "ইন্দ্রিয়-সমূহকে মারিবার হঠ চলে না" ; এই সম্বন্ধে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে মারিবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুষ্য নিজে ইচ্ছা না করিলেও মন্দ কর্ম্মের দিকে কেন ঝুঁকিয়া পড়ে ?

অর্জ্জুন উবাচ
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ : অর্জ্জুন বলিলেন—(৩৬) হে বার্ষ্ণেয় (শ্রীকৃষ্ণ) ! এখন (ইহা বুঝাও যে) মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কিসের প্রেরণায় পাপ করে, বল কোন প্রকার জবরদস্তিতে করিয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিলেন—(৩৭) এই বিষয়ে ইহা বুঝ যে, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাপী এই কাম ও এই ক্রোধই শত্রু। (৩৮) যে প্রকার ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি, ধূলি দ্বারা দর্পণ এবং কেদের দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, সেই প্রকারই ইহা দ্বারা এই সমস্ত ঢাকা আছে। (৩৯) হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কামরূপ নিত্যবৈরী সর্ব্বদাই অতৃপ্ত অগ্নিই ; ইহা জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

রহস্য : ইহা মনুর উক্তিরই অনুবাদ ; মনু বলিয়াছেন যে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" (মনু ২. ৯৪)—কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরঞ্চ ইন্ধন দিলে অগ্নি যেমন বাড়িয়া যায়, সেই প্রকারই ইহাও অধিকাধিক বাড়িতে থাকে (গী. র. পৃ. ৯৪)।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ : (৪০) ইন্দ্রিয়গণকে, মনকে, এবং বুদ্ধিকে, ইহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঘর বা গড় বলে। ইহার আশ্রয়ে জ্ঞানকে জড়াইয়া (ঢাকিয়া) ইহা মনুষ্যকে ভুলের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। (৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান (অধ্যাত্ম) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান)-নাশক এই পাপীকে তুমি মারিয়া ফেল।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ : (৪২) বলিয়াছেন যে (স্থূল বাহ্য পদার্থসমূহের পরিমাপে উহাদিগের জ্ঞাতা) ইন্দ্রিয়সকল উপরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও শ্রেষ্ঠ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা। (৪৩) হে মহাবাহু অর্জ্জুন! এই প্রকারে (যিনি) বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জানিয়া এবং নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া দুরাসদ্য কামরূপ শত্রুকে তুমি মারিয়া ফেল।

রহস্য : কামরূপ আসক্তিকে ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের উপরে নিজেকে দাঁড়াইতে হইবে, উহা নিজের অধীনে থাকিবে; বস্, এখানে এইটুকু ইন্দ্রিয়নিগ্রহই বিবক্ষিত। ইহা অর্থ নহে যে ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মারিয়া সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে (গী. র. পৃঃ ১০১)। গীতারহস্যে (পরি. পৃঃ ৪৫১) দেখানো হইয়াছে যে, "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" ইত্যাদি ৪২শ শ্লোক কঠোপনিষদের এবং উপনিষদের অন্য চার-পাঁচ শ্লোকও গীতাতে গৃহীত হইয়াছে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য পদার্থ সমূহের সংস্কার গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, মনের কার্য্য ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বুদ্ধি ইহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, এবং আত্মা এই সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত হইতে ভিন্ন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্যের ষষ্ঠ প্রকরণের শেষে (পৃঃ ১১৫-১২৯) করা হইয়াছে। কর্ম্মবিপাকের এই প্রকার অনেক গূঢ় প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃঃ ২৩৯-২৪৬) করা হইয়াছে যে, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য কামক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিধর্ম্মের কারণে কোনও কার্য্য করিতে কেন প্রবৃত্ত হইয়া যায়; এবং আত্ম-স্বতন্ত্রতার কারণে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ সাধনের দ্বারা ইহা হইতে মুক্তিলাভের পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

কর্ম্ম কাহারও দূর হয় না, এইজন্য নিষ্কামবুদ্ধি হইলেও কর্ম্ম করাই উচিত। কর্ম্ম অর্থেই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম; কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে এই কর্ম্ম স্বর্গপ্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া করিতে হইবে; জ্ঞানের দ্বারা স্বার্থবুদ্ধি দূর হইলেও কর্ম্ম দূর হয় না, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরও নিষ্কাম কর্ম্ম করাই উচিত; লোকসংগ্রহার্থ ইহা আবশ্যক;—ইত্যাদি প্রকারের এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগের যে আলোচনা করা হইয়াছে, উহাই এই অধ্যায়ে দৃঢ় করা হইয়াছে। কোনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, জীবনযাপনের এই মার্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলা হয় নাই; এইজন্য এই মার্গের প্রাচীন গুরুপরম্পরা প্রথমে বলিতেছেন—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : শ্রীভগবান বলিলেন—(১) অব্যয় অর্থাৎ কখনও যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অথবা ত্রিকালেও বাধারহিত ও নিত্য এই (কর্ম্ম-) যোগ (-মার্গ) আমি বিবস্বান অর্থাৎ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম; বিবস্বান (নিজের পুত্র) মনুকে, এবং মনু (নিজের পুত্র) ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন। (২) এই প্রকার পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত এই (যোগ)কে রাজর্ষিগণ জানেন। কিন্তু হে শত্রুতাপন (অর্জ্জুন)! দীর্ঘকাল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (৩) (সকল রহস্য মধ্যে) উত্তম রহস্য জানিয়া এই পুরাতন যোগ (কর্ম্মযোগমার্গ) আমি তোমাকে আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার ভক্ত ও সখা।

রহস্য : গীতারহস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ ৫০-৫৮) আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, এই তিন শ্লোকে 'যোগ' শব্দ জীবনযাপনের সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গের মধ্যে যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অর্থাৎ সাম্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার মার্গই অভিপ্রেত। গীতোক্ত ঐ মার্গের যে পরম্পরা উপরের শ্লোকে উক্ত হইল, তাহা যদিও এই মার্গের মূল বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি টীকাকারগণ উহার বিশেষ বিচার করেন নাই। মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভাগবত-ধর্ম্মের যে সিদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন যে, এই ধর্ম্ম প্রথমে শ্বেতদ্বীপে ভগবান হইতেই—

নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণান্নৃপ ॥
এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥

"নারদ প্রাপ্ত হন, হে রাজা! সেই মহান্ ধর্ম্মই তোমাকে পূর্ব্বে হরিগীতা অর্থাৎ ভাগবদ্গীতাতে সমাসবিধিসহ বলিয়াছি"—মভা. শা. ৩৪৬. ৯. ১০)। এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, "যুদ্ধে অমনোযোগী অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে" (মভা. শা. ৩৪৮. ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ভাগবত ধর্ম্মের (গী. র. পৃ. ৮-১০)। বিস্তৃত হইবার ভয়ে গীতাতে উহার সম্প্রদায়পরম্পরা সৃষ্টির মূল আরম্ভ হইতে দেন নাই; বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু এই তিন জনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ নারায়ণীয় ধর্ম্মের সমস্ত পরম্পরা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ব্রহ্মার মোটে সাত জন্ম। তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন্মের, নারায়ণীয় ধর্ম্মে কথিত, পরম্পরার বর্ণনা হইয়া গেলে, যখন ব্রহ্মার সপ্তম, অর্থাৎ বর্ত্তমান, জন্মের কৃতযুগ সমাপ্ত হইল, তখন—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ॥
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ॥
যতীনাং চাপি যো ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

"ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান মনুকে (এই ধর্ম্ম) দেন, মনু লোকধারণার্থ ইহা নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন, এবং ইক্ষ্বাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত হইয়াছে। হে রাজা! সৃষ্টির ক্ষয় হইলে পর (এই ধর্ম্ম) আবার নারায়ণের এখানে চলিয়া যাইবে। এই ধর্ম্ম এবং 'যতীনাং চাপি' অর্থাৎ ইহার সঙ্গেই সন্ন্যাস ধর্ম্মও তোমাকে পূর্ব্বে ভগবদ্গীতায় বলিয়া দিয়াছি"—ইহা নারায়ণীয় ধর্ম্মেই বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন (মভা. শা. ৩৪৮. ৫১-৫৩)। ইহা হইতে দেখা যায় যে যে দ্বাপরযুগের শেষে ভারতীয় যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ত্রেতাযুগেরই ভাগবতধর্ম্মের পরম্পরা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অধিক বর্ণনা করেন নাই। এই ভাগবতধর্ম্মই যোগ বা কর্ম্মযোগ; এবং মনুকে এই কর্ম্মযোগের উপদেশ করিবার কথা কেবল গীতাতে নহে, প্রত্যুত ভাগবত পুরাণেও (৮. ২৪. ৫৫) এই কথার উল্লেখ আছে এবং মৎস্যপুরাণের ৫২শ অধ্যায়ে মনুকে উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের মহত্ত্বও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বর্ণনাই নারায়ণীয় উপাখ্যানে কৃত বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ নহে। বিবস্বান্-মনু এবং ইক্ষ্বাকুর পরম্পরা সাংখ্যমার্গের মোটেই উপযোগী নহে এবং সাংখ্য ও যোগ এই দুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় নিষ্ঠা গীতাতে বর্ণিতই হয় নাই, এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে অন্য প্রণালীতেও সিদ্ধ হয় যে, এই পরম্পরা কর্ম্মযোগেরই (গী. ২. ৩৯)। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ, এই দুই নিষ্ঠার পরম্পরা এক না হইলেও কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মের সিদ্ধান্তেই সাংখ্য বা সন্ন্যাসনিষ্ঠার সিদ্ধান্তের পর্য্যায়ক্রমে সমাবেশ হইয়া যায় (গী. র. পৃ. ৪৭৫)। এই কারণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতাতে যতিধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মও বর্ণিত আছে। মনুস্মৃতিতে চারি আশ্রমধর্ম্মের যে বর্ণনা আছে, তাহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমে যতি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের ধর্ম্ম বলিবার পর বিকল্প হিসাবে "বেদসন্ন্যাসীদিগের কর্ম্মযোগ" এই নামে গীতা বা ভাগবতধর্ম্মের কর্ম্মযোগের বর্ণনা আছে এবং স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "নিস্পৃহতা দ্বারা নিজের কার্য্য করিতে থাকিলেই শেষে পরম সিদ্ধি লাভ হয়" (মনু ৬. ৯৬)।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে কর্ম্মযোগ মনুরও গ্রাহ্য ছিল। এই প্রকারই অন্য স্মৃতিকারদিগেরও ইহা মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীতারহস্যের ১১শ প্রকরণের শেষে (পৃ. ৩১২-৩১৬) দেওয়া হইয়াছে। এখন এই পরম্পরা সম্বন্ধে অর্জ্জুনের এই সংশয় হইতেছে যে—

অর্জ্জুন উবাচ
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(৪) তোমার জন্ম তো ইদানীং হইয়াছে এবং বিবস্বানের ইহার অনেক পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে; (এই অবস্থায়) আমি ইহা কি প্রকারে জানিব যে, তুমি (এই যোগ) পূর্ব্বে বলিয়াছ?

রহস্য ঃ অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতারসমূহের কার্য্য বর্ণন করিয়া আসক্তিবিরহিত কর্ম্মযোগ বা ভাগবতধর্ম্মেরই পুনরায় সমর্থন করিতেছেন যে, "এই প্রকার আমিও কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি"—

শ্রীভগবানুবাচ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—(৫) হে অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সেই সকল আমি জানি (এবং) হে পরন্তপ! তুমি জান না (ইহাই প্রভেদ)। (৬) আমি (সমস্ত) প্রাণিগণের প্রভু ও জন্মরহিত, যদিও আমার আত্মস্বরূপের কখনও ব্যয় অর্থাৎ বিকার হয় না তথাপি নিজেরই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজের মায়া দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের অধ্যাত্মজ্ঞানে কাপিল সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই মতের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি রচনা করে; কিন্তু বেদান্তী লোক প্রকৃতিকে পরমেশ্বরেরই এক স্বরূপ জানিয়া ইহা স্বীকার করেন যে, প্রকৃতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সমস্ত জগত নির্ম্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 'মায়া' বলা হইয়াছে। এবং এইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই প্রকার বর্ণনা আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং" অর্থাৎ প্রকৃতিই মায়া এবং সেই মায়ার অধিপতি পরমেশ্বর (শ্বে. ৪. ১০.), এবং 'অস্মান্মায়ী সৃজ্যতে বিশ্বমেতৎ'—ইহা হইতে মায়ার অধিপতি সৃষ্টি উৎপন্ন করেন (শ্বে. ৪. ৯)। প্রকৃতিকে মায়া কেন বলে, এই মায়ার স্বরূপ কি; এবং এই উক্তির অর্থ কি এই যে, মায়া হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়?—ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে করা হইয়াছে। ইহা বলিয়াছি যে, অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত কি প্রকারে হয়েন অর্থাৎ কর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে দেখা যায়; এখন খুলিয়া বলিতেছি যে, তিনি এইরূপ কখন্ এবং কি কারণে করেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) হে ভারত! যখন-যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্ম প্রবলরূপে বিস্তৃত হয়, তখন (তখন) আমি স্বয়ংই জন্ম (অবতার) গ্রহণ করি। (৮) সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ এবং দুষ্টদিগের নাশ করিবার জন্য, যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি।

রহস্য ঃ এই দুই শ্লোকে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল পারলৌকিক বৈদিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু চারি বর্ণের ধর্ম্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও উহাতে মুখ্য-রূপে সমাবেশ হয়। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যখন অন্যায়, দুর্নীতি দুষ্টতা ও অন্ধকার প্রবল হইয়া সাধুদিগের কষ্টদায়ক হয় এবং যখন দুষ্টদিগের প্রভাব অধিক হয়, তখন স্বরচিত জগতের সুস্থিতি বজায় রাখিয়া তাহার কল্যাণ-সাধনার্থ তেজস্বী ও পরাক্রান্ত পুরুষের রূপে (গী. ১০. ৪১) অবতার হইয়া ভগবান, সমাজের যে ব্যবস্থা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঠিক করিয়া দেন। এই রীতিতে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান যে কার্য্য করেন, তাহাকেই 'লোকসংগ্রহ'ও বলা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, এই কার্য্যই নিজ শক্তি ও অধিকার অনুসারে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরও করা উচিত (গী. ৩. ২০)। ইহা বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা যাইতেছে যে, এই তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করেন তিনি কোন্ গতি লাভ করেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ (৯) হে অর্জ্জুন! এবম্বিধ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ না করিয়া আমার সহিত মিলিত হয়েন। (১০) প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, মৎপরায়ণ এবং আমার আশ্রয়ে উপনীত অনেক লোক (এই প্রকার) জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আমার স্বরূপে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছেন।

রহস্য ঃ ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্যক যে, অব্যক্ত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা সগুণ কিরূপে হয়েন; এবং ইহা জানিলে অধ্যাত্মজ্ঞান হয় এবং দিব্য কর্ম্ম জানিয়া লইলে কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সারকথা, পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচয় হইয়া যায়; এবং মোক্ষলাভের জন্য ইহার প্রয়োজন থাকায় এই প্রকার মনুষ্যের শেষে ভগবৎ-প্রাপ্তি না হইয়া যায় না। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম জন্মগ্রহণে সমস্তই আসিল; আবার অধ্যাত্মজ্ঞান অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করিতে হয় না। অতএব বক্তব্য এই যে, ভগবানের জন্ম ও কার্য্য আলোচনা কর, এবং উহার তত্ত্ব বুঝিয়া আচরণ কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাধনেরই অপেক্ষা নাই। ভগবানের ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এখন ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের উপাসনার ফল ও উপযোগিতা বলা হইতেছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ (১১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাকে আমি সেই প্রকারেরই ফল দিই। হে পার্থ! যেদিক দিয়াই হোক, সকল দিক দিয়াই মনুষ্য আমারই পথে আসিয়া মিলিত হয়।

রহস্য ঃ 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি উত্তরার্ধ প্রথমে (৩. ২৩) কিছু বিশেষ অর্থে আসিয়াছে, এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গীতাতে পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে অর্থ কিপ্রকার বদলাইয়া যায়। ইহা সত্য বটে যে, যে কোন মার্গ ধরিয়া চলিলেও মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই যায়, তথাপি ইহা জানা উচিত যে অনেক ব্যক্তি অনেক মার্গে কেন যায়? এখন ইহার কারণ বলা হইতেছে—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ (১২) (কর্ম্মবন্ধনের নাশের নহে, কেবল) কর্ম্মফলের অভিলাষী ব্যক্তি এই লোকে দেবতাদিগের পূজা এই অভিপ্রায়ে করে যে, (এই) কর্ম্মফল (এই) মনুষ্যলোকেই শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে।

রহস্য ঃ এই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ে (১২. ২২) পুনরায় আসিয়াছে। পরমেশ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহা তখনই পাওয়া যায়, যখন দীর্ঘ-কাল ধরিয়া একান্ত উপাসনার ফলে কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়; এই প্রকার দূরদর্শী ও দীর্ঘ-উদ্যোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, অনেকে তো নিজের উদ্যোগে অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা এই লোকেই কিছু-না কিছু প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার লোকই দেবতাদিগের পূজা করে (গীতার. পৃ ৩৬৩)। গীতা ইহাও বলেন যে, পরোক্ষভাবে ইহাও তো পরমেশ্বরেরই পূজা এবং বাড়িতে বাড়িতে এই যোগ পরিণামে নিষ্কাম ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া শেষে মোক্ষপ্রদ হয় (গী. ৭-১৯)। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কি করিতে হয়—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ (১৩) (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকার) চারি বর্ণের ব্যবস্থা গুণ ও কর্ম্মভেদে আমি করিয়াছি। ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি উহার কর্ত্তাও বটে আবার অকর্ত্তা অর্থাৎ উহা করি না, অব্যয় (আমিই)।

রহস্য ঃ অর্থ এই যে, পরমেশ্বর কর্ত্তা হইলেনই বা, কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকের বর্ণনানুসারে তিনি সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্ত্তাই (গী. ৫. ১৪)। পরমেশ্বরের স্বরূপের 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং' এই প্রকার বিরোধভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে (গী. ১৩. ১৪)। চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণ ও ভেদের নিরূপণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ৪১-৪৯) করা হইয়াছে; এক্ষণে ভগবান "করিয়া অকর্ত্তা" এইরূপ নিজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বলিতেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ (১৪) আমাতে কর্ম্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় না; (কারণ)

কর্ম্মের ফলে আমার ইচ্ছা নাই। যে আমাকে এই প্রকার জানে, তাহার কর্ম্ম বন্ধক হয় না।

রহস্য উপরে নবম শ্লোকে যে দুই বিষয় বলিয়াছি যে, আমার 'জন্ম' ও 'কর্ম্ম' যে জানে সে মুক্ত হইয়া যায়, তন্মধ্যে কর্ম্মের তত্ত্ব এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 'জানে' শব্দের দ্বারা এস্থলে "জানিয়া তদনুসারে আচরণে প্রবৃত্ত" এতটা অর্থ বিবক্ষিত। ভাবার্থ এই যে, ভগবানের কর্ম্ম তাঁহার বন্ধন হয় না, ইহার কারণ এই যে, তিনি ফলাশা রাখিয়া কর্ম্মই করেন না; এবং ইহা জানিয়া তদনুসারে যে চলে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয় না। এক্ষণে, এই শ্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ (১৫) ইহা জানিয়া প্রাচীনকালের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্ম্ম করিতেন। এইজন্য পুরাকালীন লোকদিগের কৃত অতি প্রাচীন কর্ম্মই তুমি কর।

রহস্য ঃ এই প্রকার মোক্ষ ও কর্ম্মের বিরোধ নাই, অতএব অর্জুনকে স্থির উপদেশ করিয়াছেন যে, তুমি কর্ম্ম কর। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে, "কর্ম্ম ছাড়িলে অর্থাৎ অকর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়"; ইহার উপর এই সংশয় আসে যে, এই প্রকার কথার মূল কি? অতএব এক্ষণে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া তেইশতম শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অকর্ম্ম কিছু কর্ম্মত্যাগ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মকেই অকর্ম্ম বলা উচিত।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ (১৬) কর্ম্ম কি আর অকর্ম্ম কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানদিগেরও ভ্রম হয়; (অতএব) এরূপ কর্ম্ম তোমাকে শিখাইতেছি, যাহা জানিলে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

রহস্য 'অকর্ম্ম' নঞ্‌ সমাস। ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ=নঞ্‌ শব্দের 'অভাব' অথবা 'অপ্রাশস্ত্য' দুই অর্থ হইতে পারে; এবং ইহা বলা যায় না যে, এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবক্ষিত হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'বিকর্ম্ম' নামে কর্ম্মের তৃতীয় এক ভেদ করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে 'অকর্ম্ম' শব্দের দ্বারা, সন্ন্যাসমার্গী লোক যাহাকে 'কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ' বলে সেই কর্ম্মত্যাগই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইতেছে। সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী বলে, যে 'সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও'; কিন্তু ১৮শ শ্লোকের রহস্য হইতে দেখা যাইবে যে, এই বিষয় দেখাইবার জন্যই ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাসপন্থীদিগের কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত 'অকর্ম্ম' নহে, অকর্ম্মের মর্ম্মই আর কিছু।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ (১৭) কর্ম্মের গতি গহন; (অতএব) ইহা জানা আবশ্যক যে, কর্ম্ম কি এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকর্ম্ম (বিপরীত কর্ম্ম) কি এবং ইহাও জানিয়া লইতে হইবে যে অকর্ম্ম (কর্ম্ম না করা) কি। (১৮) কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে

কর্ম্ম যিনি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত এবং সমস্ত কর্ম্ম-কর্ত্তা।

রহস্য ইহাতে এবং পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম খুলিয়া বলা হইয়াছে; ইহাতে যাহা কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধ ভেদবর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (গী. ১৮. ৪-৭; ১৮. ২৩-২৫; ১৮. ২৬-২৮)। এখানে সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, দুইস্থলের কর্ম্ম-বিচারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দাঁড়াইল। কারণ টীকাকারেরা এই সম্বন্ধে বড়ই গণ্ডগোল বাধাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করাই সন্ন্যাসপন্থীদিগের অভিপ্রেত, এই জন্য তাঁহারা গীতার 'অকর্ম্ম' পদের অর্থ টানাবুনা করিয়া নিজ পন্থার দিকে আনিতে চাহেন। মীমাংসকদিগের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম ইষ্ট, এই জন্য তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত আর সমস্ত কর্ম্মকেই 'বিকর্ম্ম' বলেন। ইহা ব্যতীত মীমাংসকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম-ভেদও ইহারই ভিতর আসিয়া যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রী নিজের আড়াই চাউলের খিচুড়ী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা রাখেন। সার কথা, চারিদিক হইতে এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে ইহা জানিয়া লওয়া কঠিন হয় যে, গীতা 'অকর্ম্ম' কাহাকে এবং 'কর্ম্ম' কাহাকে বলেন; অতএব প্রথম হইতেই এই বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গীতায় যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্ম-যোগীরই; কাম্য কর্ম্ম-কর্ত্তা মীমাংসকদিগের বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসপন্থীদিগের নহে। গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার করিয়া লইলে প্রথমে তো ইহাই বলিতে হয় যে, 'কর্ম্মশূন্যতা'র অর্থে 'অকর্ম্ম' এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে না অথবা কোন মনুষ্যই কখনও কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না (গী. ৩. ৫; ১৮. ১১); কারণ শোওয়া, ওঠা-বসা এবং জীবিত থাকা পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম এড়াইতে পারে না। এবং যদি কর্ম্মশূন্যতা হওয়া সম্ভব না হয় তবে অকর্ম্ম কাহাকে বলিব তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার উত্তরে গীতা বলেন যে, কর্ম্মের অর্থ নিছক ক্রিয়া না বুঝিয়া উহা হইতে উৎপন্ন শুভ-অশুভ প্রভৃতি পরিণামের বিচার করিয়া কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বা অকর্ম্মত্ব স্থির কর। সৃষ্টির অর্থই যদি কর্ম্ম হয়, তবে মনুষ্য যে অবধি সৃষ্টিতে আছে, সেই অবধি তাহার কর্ম্ম দূর হয় না। অতএব কর্ম্ম ও অকর্ম্মের যে বিচার করিতে হইবে তাহা এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে যে, মনুষ্যকে ঐ কর্ম্ম কতদূর বদ্ধ করিবে। করিলেও যে কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বলিতে হয় যে, উহার কর্ম্মত্ব অর্থাৎ বন্ধকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং যদি কোনও কর্ম্মের বন্ধকত্ব এই প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে তো সেই কর্ম্ম 'অকর্ম্ম'ই হইল। অকর্ম্মের প্রচলিত সাংসারিক অর্থ কর্ম্মশূন্যতা ঠিকই; কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে এস্থলে উহা ঠিক খাপ খায় না। কারণ আমি দেখিতেছি যে, চুপচাপ বসা অর্থাৎ কর্ম্ম না করাও অনেক সময়ে কর্ম্মই হইয়া যায়। উদাহরণ যথা, নিজের মা-বাপকে কেহ যদি মারপিট করে, তবে উহাকে বাধা না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, সে সময়ে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অকর্ম্মই অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যত হইলেও কর্ম্মই—অধিক কি বলিব, বিকর্ম্ম; এবং কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে উহার অশুভ পরিণাম আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। অতএব গীতা এই শ্লোকে বিরোধাভাসের রীতিতে বড় জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, যিনি জানিয়াছেন যে অকর্ম্মেও (কখনো কখনো ভয়ানক) কর্ম্ম হইয়া যায়, এবং কর্ম্ম করিয়াও তাহা কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে মৃতবৎ, অর্থাৎ অকর্ম্ম হয়, তিনিই জ্ঞানী; এবং এই অর্থই

পরবর্ত্তী শ্লোকে বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের বন্ধন না লাগিবার পক্ষে গীতাশাস্ত্র অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে, নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যাইবে (গী. র. পৃ. ১৯৮-২০১ ; ২৪৭)। অতএব এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই গীতার মতে প্রশস্ত—সাত্ত্বিক—কর্ম্ম (গী. ১৮. ৯) ; এবং গীতার মতে তাহাই প্রকৃত 'অকর্ম্ম'। কারণ উহার কর্ম্মত্ব, অর্থাৎ কর্ম্মবিপাকের ক্রিয়া অনুসারে বন্ধকত্ব ঘুচিয়া যায়। মনুষ্য যে কিছু কর্ম্ম করে (এবং 'করে' পদে চুপচাপ নিরিবিলি বসিয়া থাকারও সমাবেশ করিতে হইবে) তন্মধ্যে উক্ত প্রকারের অর্থাৎ 'সাত্ত্বিক কর্ম্ম' অথবা গীতা অনুসারে অকর্ম্ম সরাইয়া দিলে বাকী যে কর্ম্ম থাকিয়া যায় তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাজস ও তামস। তন্মধ্যে তামস কর্ম্ম মোহ ও অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য উহাকে বিকর্ম্ম বলে—আর যদি কোন কর্ম্ম মোহবশতঃ ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাহা বিকর্ম্মই, অকর্ম্ম নহে (গী. ১৮. ৭)। এখন রহিল রাজস কর্ম্ম। এই কর্ম্ম প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাত্ত্বিক নহে অথবা গীতা যাহাকে সত্যসত্য 'অকর্ম্ম' বলেন, ইহা সে কর্ম্মও নহে। গীতা ইহাকে 'রাজস' কর্ম্ম বলেন ; কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে এই প্রকার রাজস কর্ম্মকে কেবল 'কর্ম্ম'ও বলিতে পারেন। তাৎপর্য্য, ক্রিয়াত্মক স্বরূপ অথবা খাঁটি ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা কর্ম্মঅকর্ম্মের নির্দ্ধারণ হয় না ; কিন্তু কর্ম্মের বন্ধকত্ব দ্বারা স্থির করা যায় যে ইহা কর্ম্ম বা অকর্ম্ম। অষ্টাবক্রগীতা সন্ন্যাসমার্গের, তথাপি উহাতেও উক্ত হইয়াছে—

নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী॥

অর্থাৎ মূর্খদিগের নিবৃত্তি (অথবা হঠবশত বা মোহবশত কর্ম্মের প্রতি বিমুখতা)ই প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম এবং পণ্ডিত লোকদিগের প্রবৃত্তি (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম) দ্বারাই নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের ফললাভ হয় (অষ্টা. ১৮. ৬১)। গীতার উক্ত শ্লোকে এই অর্থই বিরোধাভাসরূপ অলঙ্কারের রীতিতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। গীতোক্ত অকর্ম্মের এই লক্ষণ ভালরূপে না বুঝিলে, গীতোক্ত কর্ম্ম-অকর্ম্মের বিচারের মর্ম্মও কখনও বুঝা যাইবে না। এখন এই অর্থকেই পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অধিক ব্যক্ত করা হইতেছে—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ ঃ (১৯) যাঁহার সমস্ত সমারম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন।

রহস্য ঃ 'জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়' ইহার অর্থ কর্ম্মত্যাগ করা নহে, কিন্তু এই শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, 'ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা', এই অর্থই এস্থলে লইতে হইবে (গী. র. পৃ. ২৪৬-২৪৯)। এইপ্রকারই পরে ভগবদ্ভক্তের বর্ণনায় যে "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী"—সমস্ত আরম্ভ বা উদ্যোগত্যাগী—পদ আসিয়াছে (গী. ১২. ১৬ ; ১৪. ২৫) উহার অর্থের নির্ণয়ও ইহা দ্বারা হইয়া যাইতেছে। এখন এই অর্থকেই অধিক স্পষ্ট করিতেছেন—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥

অনুবাদ ঃ (২০) কর্ম্মফলের আসক্তি ছাড়িয়া যিনি সদাতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মফলসাধনের আশ্রয়ভূত এ প্রকার বুদ্ধি রাখেন না যে ; অমুক কার্য্যের সিদ্ধির জন্য অমুক কাজ করিতেছি)—বলিতে হয় যে—তিনি কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও কিছুই করেন না। (২১) নিঃ+আশীঃ অর্থাৎ ফলের বাসনাত্যাগী, চিত্তের সংযমকারী এবং সর্ব্বসঙ্গ হইতে মুক্ত পুরুষ কেবল শারীর অর্থাৎ শরীর বা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই কর্ম্ম করিবার কালে পাপের ভাগী হন না।

রহস্য ঃ কেহ কেহ বিংশ শ্লোকের নিরাশ্রয় শব্দের অর্থ 'গৃহ-সংসারত্যাগী' (সন্ন্যাসী) করেন ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আশ্রয় অর্থে গৃহ বা ঘর বলা যায় ; কিন্তু এস্থলে কর্ত্তার স্বয়ং থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ বিবক্ষিত নহে ; অর্থ এই যে, তিনি যে কার্য্য করেন, তাহার হেতুরূপ ঠিকানা (আশ্রয়) কোথাও থাকে না। এই অর্থই গীতার ৬. ১ শ্লোকে 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং' এই শব্দগুলির দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং বামন পণ্ডিত গীতার যথার্থদীপিকা নামক স্বকৃত মহারাষ্ট্রীয় টীকাতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকারই ২১শ শ্লোকে 'শারীর' অর্থে কেবল শরীর পোষণের জন্য ভিক্ষাটন প্রভৃতি কর্ম্ম নহে। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে "যোগী" অর্থাৎ কর্ম্মযোগী লোক আসক্তি অথবা কাম্যবুদ্ধি মনে না রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা কর্ম্ম করেন" (৫. ১১) এই যে বর্ণনা আছে, উহার সমানার্থকই "কেবলং শারীরং কর্ম্ম" এই পদসমূহের প্রকৃত অর্থ। ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম্ম তো করে ; কিন্তু বুদ্ধি সম থাকিবার কারণে ঐ কর্ম্মসমূহের পাপপুণ্য কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

অনুবাদ ঃ (২২) যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট, (হর্ষশোক প্রভৃতি) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, নির্ম্মৎসর, এবং (কর্ম্মের) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিকে যিনি একই মনে করেন সেই ব্যক্তি (কর্ম্ম) করিয়াও (তাহার পাপপুণ্যের দ্বারা) বদ্ধ হন না। (২৩) আসঙ্গরহিত, (রাগদ্বেষ হইতে) মুক্ত, (সাম্যবুদ্ধিরূপ) জ্ঞানে স্থিরচিত্ত এবং (কেবল) যজ্ঞের জন্যই (কর্ম্ম) করেন যে ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম বিলীন হইয়া যায়।

রহস্য ঃ তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই যে ভাব আছে, যে মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং আসক্তি ছাড়িয়া করিলে সেই কর্ম্মই স্বর্গপ্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। "সমগ্র বিলীন হইয়া যায়" ইহাতে 'সমগ্র' পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংসকগণ স্বর্গসুখকেই পরম সাধ্য মনে করেন এবং উঁহারই দৃষ্টিতে স্বর্গসুখের প্রাপ্তিকারক কর্ম্ম বন্ধক হয় না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি স্বর্গ ছাড়িয়া অর্থাৎ মোক্ষের উপর আছে এবং এই দৃষ্টিতে স্বর্গপ্রদ কর্ম্মও বন্ধকই হয়। অতএব বলা হইয়াছে যে,যথার্থ কর্ম্মও অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে 'সমগ্র' লয় পায় অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ না হইয়া মোক্ষপ্রদ হয়। তথাপি এই অধ্যায়ের যজ্ঞপ্রকরণ প্রতিপাদনে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের যজ্ঞপ্রকরণ প্রতিপাদনে এক গুরুতর ভেদ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শ্রৌত-স্মার্ত্ত অনাদি যজ্ঞচক্র

স্থির রাখা উচিত। কিন্তু এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, যজ্ঞের এরূপ সঙ্কুচিত অর্থই ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে তিলতণ্ডুল বা পশু আহুতি দিবে অথবা চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসারে কাম্যবুদ্ধিতে করিবে। অগ্নিতে আহুতি ছাড়িবার সময় শেষে 'ইদং ন মম'—ইহা আমার নহে—এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয়; ইহাতে স্বার্থত্যাগরূপ নির্ম্মমত্বের যে তত্ত্ব আছে, তাহাই যজ্ঞের প্রধান অংশ। এই প্রকারে "ন মম" বলিয়া অর্থাৎ মমতাযুক্ত বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ যজ্ঞ বা হোমই হইয়া যায়; এই যজ্ঞ দ্বারা দেবাধিদেব পরমেশ্বর অথবা ব্রহ্মের যজন করা হয়। সারকথা, মীমাংসকদিগের দ্রব্যযজ্ঞসম্বন্ধীয় যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহা এই বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী; এবং লোকসংগ্রহের জন্য জগতের আসক্তিরহিত কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ কর্ম্মের 'সমগ্র' ফল হইতে মুক্ত হইয়া শেষে মোক্ষ লাভ করেন (গী. র. পৃ. ২৯৮-৩০২)। এই ব্রহ্মার্পণরূপ বৃহৎ যজ্ঞেরই বর্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা হইয়াছে এবং পুনরায় ইহা অপেক্ষা স্বল্পযোগ্য অনেক লাক্ষণিক যজ্ঞের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ২৩শ শ্লোকে সমগ্র প্রকরণের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে এইপ্রকার 'জ্ঞানযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ : (২৪) অর্পণ অর্থাৎ হোম করিবার ক্রিয়া ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ অর্পণ করিবার দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্ম হোম করিয়াছেন—(এই প্রকার) যাঁহার বুদ্ধিতে (সমস্ত) কর্ম্মই ব্রহ্মময়, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন।

রহস্য : শাঙ্করভাষ্যে 'অর্পণ' শব্দের অর্থ 'অর্পণ করিবার সাধন অর্থাৎ আচমনপাত্র ইত্যাদি' আছে; কিন্তু ইহা কিছু কঠিন। ইহা অপেক্ষা, অর্পণ= অর্পণ করিবার বা হবন করিবার ক্রিয়া, এই অর্থ অধিক সরল। ইহা ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যজ্ঞকর্ত্তার বর্ণনা হইল। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিতে কৃতযজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ : (২৫) কোন কোন (কর্ম্ম-) যোগী (ব্রহ্মবুদ্ধির বদলে) দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশে যজ্ঞ করেন; এবং কেহ ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের যজন করেন।

রহস্য : পুরুষসূক্তে বিরাটরূপী যজ্ঞপুরুষের, দেবতাদের দ্বারা, যজন হইবার যে বর্ণনা আছে—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" (ঋ. ১০. ৯০. ১৬) তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ উক্ত হইয়াছে। 'যজ্ঞং যজ্ঞেনোপজুহ্বতি' এই পদ ঋগ্বেদের 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত' এই পদের সহিত সমানার্থকই দেখা যাইতেছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টির আরম্ভে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যে বিরাটরূপী পশুর হবন করা হইয়াছিল সেই পশু, এবং যে দেবতার যজন করা হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ হইবে। সারকথা, ২৪শ শ্লোকের এই বর্ণনাই তত্ত্বদৃষ্টিতে ঠিক যে, সৃষ্টির সকল পদার্থে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ভরিয়া আছেন, এই কারণে ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহার করিতে করিতে ব্রহ্মের দ্বারাই সর্ব্বদা ব্রহ্মের যজন হইতে থাকে, কেবল বুদ্ধি ঐ প্রকারই হওয়া চাই। পুরুষসূক্তকে লক্ষ্য করিয়া গীতাতে ইহাই একমাত্র শ্লোক নহে, প্রত্যুত পরে দশম অধ্যায়েও (১০. ৪২) এই সূক্ত অনুযায়ী বর্ণনা আছে। দেবতার উদ্দেশে কৃত যজ্ঞের বর্ণনা শেষ হইল; এখন অগ্নি হবি ইত্যাদি শব্দের

লাক্ষণিক অর্থ লইয়া বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া অথবা তপশ্চরণও এক প্রকার যজ্ঞ—

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

(২৬) এবং কেহ শ্রোত্র প্রভৃতি (কান, চোখ প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন এবং কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে (ইন্দ্রিয়সমূহের) শব্দ আদি বিষয়সমূহের হবন করেন। (২৭) এবং কেহ কেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে হবন করেন।

রহস্য : এই শ্লোক গুলিতে দুই তিন প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা আছে; যথা (১) ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম করা অর্থাৎ উহাদিগকে যথাযুক্ত সীমার ভিতরে নিজ নিজ ব্যবহার করিতে দেওয়া; (২) ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় অর্থাৎ উপভোগের পদার্থ সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা; (৩) কেবল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ব্যাপার বন্ধ করিয়া পূর্ণসমাধি লাগাইয়া কেবল আত্মানন্দেই মগ্ন থাকা। এখন এগুলিকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করিলে, প্রথম ভেদে ইন্দ্রিয়সমূহকে মর্য্যাদাবদ্ধ করিবার ক্রিয়া (সংযমন) অগ্নি হইল, কারণ দৃষ্টান্তস্বরূপে ইহা বলা যায় যে, এই মর্য্যাদার ভিতরে যাহা কিছু আসে, তাহার উহাতে হবন হইয়া গেল। এই প্রকারই দ্বিতীয় ভেদে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গণ হোমদ্রব্য এবং তৃতীয় ভেদে ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ উভয়ে মিলিত হইয়া হোম করিবার দ্রব্য হইয়া যায় এবং আত্মসংযমন অগ্নি হয়। ইহা ব্যতীত এমনও লোক আছেন, যাঁহারা কেবল প্রাণায়াম ক্রিয়া করেন, উঁহাদের বর্ণনা উনত্রিংশৎ শ্লোকে আছে। 'যজ্ঞ' শব্দের মূল অর্থ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকে লক্ষণা দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার সাধনের এক 'যজ্ঞ' শীর্ষেই সমাবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্গীতার এই কল্পনা কিছু নূতন নহে। মনুস্মৃতির চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—এই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ কোন গৃহস্থই ছাড়িবে না; এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, ইহার বদলে কেহ কেহ "ইন্দ্রিয়সমূহে বাণীর হবন করিয়া, বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাও পরমেশ্বরের যজন করে (মনু. ৪. ২১-২৪)। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যাইবে যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ শ্রৌত গ্রন্থসমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়াছিল; এবং যখন পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা, সন্ন্যাসের দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মার্গ অধিকাধিক প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিয়া উহাতেই মোক্ষের সমগ্র উপায়সমূহের লক্ষণা দ্বারা সমাবেশ করা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। ইহার মর্ম্ম ইহাই যে, পূর্ব্বে যে শব্দ ধর্ম্মের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, তাহারই উপযোগ পরবর্ত্তী ধর্ম্মমার্গের জন্যও করা যাইবে। যাহাই হোক; মনুস্মৃতির আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, গীতার পূর্ব্বে, অন্ততঃ তাহার সমসময়ে, উক্ত কল্পনা সর্ব্বমান্য হইয়া গিয়াছিল।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

(২৮) এই প্রকার তীব্র ব্রত আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষদের কেহ দ্রব্যরূপ, কেহ তপোরূপ, কেহ যোগরূপ, কেহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য স্বকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ, এবং কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। (২৯) প্রাণায়ামে তৎপর হইয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাণবায়ুকে অপানে (হবন করেন) এবং কেহ অপান বায়ুকে প্রাণে হবন করেন।

রহস্য : এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে প্রাণায়াম করাও এক যজ্ঞই। এই পাতঞ্জলযোগ যজ্ঞ ২৯শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব ২৮শ শ্লোকের "যোগরূপ যজ্ঞ" পদের অর্থ কর্ম্মযোগরূপ যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস, উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণ=বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছ্বাস বায়ু, এবং আপন=অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওয়া হয় (বে সূ. শাং ভা. ২. ৪. ১২ ; এবং ছান্দোগ্য, শাং ভা. ১. ৩. ৩)। মনে রেখো যে, প্রাণ ও অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। এই অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের—উচ্ছ্বাসের—হোম করিলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয় ; এবং ইহার বিপরীত প্রাণে অপানের হোম করিলে রেচক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ ও অপান উভয়কেই নিরুদ্ধ করিলে সেই প্রাণায়ামই কুম্ভক হইয়া যায়। এখন ইহা ব্যতীত ব্যান, উদান, ও সমান এই তিনটী বাকী থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থলে থাকে, যাহা ধনুক টানা, ওজন উঠানো প্রভৃতি দম টানিয়া বা অর্দ্ধেক শ্বাস ছাড়িয়া জোর লাগিবার কার্য্যে ব্যক্ত হয় (ছাং ১. ৩. ৫)। মৃত্যুকালে যে বায়ু বহির্গত হয় তাহাকে উদান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৭), এবং সমস্ত শরীরে সর্ব্বস্থানে একভাবে অন্নরস লইয়া যায় যে বায়ু তাহাকে সমান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৫)। এই প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রে এই শব্দগুলির সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা ব্যতীত বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয়। উদাহরণ যথা, মহাভারতের (বন পর্ব্বে) ২১২শ অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বায়ুর বিশেষ লক্ষণই আছে ; উহাতে প্রাণের অর্থ মস্তকের বায়ু এবং অপানের অর্থ নিম্নে বহির্গমনশীল বায়ু হইতেছে (প্রশ্ন ৩. ৫ এবং মৈত্র্যু ২. ৬)। উপরের শ্লোকে যে বর্ণনা আছে, তাহার এই অর্থ যে, ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ করা হয়, তাহার অন্য বায়ুতে হোম হয়।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ : (৩০-৩১) এবং কেহ কেহ আহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণেরই হোম করেন। যে ব্যক্তি যজ্ঞ জানেন, যাঁহার পাপ যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত (এবং যে ব্যক্তি) অমৃত (অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট) উপভোগ করেন, তাঁহারা সকলেই সনাতন ব্রহ্মে যাইয়া মিলিত হন। যে যজ্ঞ করে না তাহার (যখন) এই লোকে সফলতা হয় না, (তখন) ফের হে কুরুশ্রেষ্ঠ! (সে) পরলোক কোথা হইতে (পাইবে)?

রহস্য : সার কথা, যজ্ঞ করা যদিও বেদের আদেশ অনুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য,

তথাপি এই যজ্ঞ একই প্রকারের হয় না। প্রাণায়াম কর, তপস্যা কর, বেদ অধ্যয়ন কর, অগ্নিষ্টোম কর, পশুযজ্ঞ কর, তিলতণ্ডুল অথবা ঘিয়ের হবন কর, পূজা-পাঠ কর বা নৈবেদ্য-বৈশ্বদেব প্রভৃতি পঞ্চ গৃহযজ্ঞ কর ; ফলাসক্তি দূর হইলে এই সকল ব্যাপক অর্থে যজ্ঞই এবং ফের যজ্ঞ-শেষ ভক্ষণের বিষয়ে মীমাংসকদিগের যে সিদ্ধান্ত আছে, সে সমস্ত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক যজ্ঞের পক্ষে উপযোগী হইয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই যে, "যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না" এবং ইহার বর্ণনা ২৩শ শ্লোকে করা হইয়াছে (গী. ৩· ৯ এর উপর রহস্য দেখুন)। এখন দ্বিতীয় নিয়ম এই যে প্রত্যেক গৃহস্থ পঞ্চমহাযজ্ঞের পর অতিথি প্রভৃতির ভোজন করানো শেষ হইলে পরে নিজের পত্নীসহ ভোজন করিবে ; এবং এইপ্রকার ব্যবহার করিলে গৃহস্থাশ্রম সফল হইয়া সদ্‌গতি দেয়। "বিঘসং ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতং" (মনু. ৩. ২৮৫) অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহা বাকী থাকে তাহা 'বিঘস' এবং যজ্ঞ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা 'অমৃত' উক্ত হয় ; এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া মনুস্মৃতি ও অন্য স্মৃতিগুলিতেও উক্ত হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য বিঘসাশী ও অমৃতাশী হওয়া উচিত (গী. ৩. ১৩ ও গী. র পৃ. ১৬৪ দেখুন)। এখন ভগবান বলিতেছেন যে সাধারণ গৃহযজ্ঞের উপযোগী এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বপ্রকার উক্ত যজ্ঞসমূহের উপযোগী হয়। যজ্ঞার্থে কৃত কোন কর্ম্মই বন্ধক হয় না, কেবল ইহাই নহে, কিন্তু ঐ কর্ম্মসমূহের মধ্যে অবশিষ্ট কর্ম্ম যদি স্বয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাহা বন্ধক হয় না (গীতার. পৃ. ৩২৯)। "যজ্ঞ বিনা ইহলোকও সিদ্ধ হয় না" এই বাক্য তত্ত্ব ও মহত্ত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ এইটুকুই নহে যে, যজ্ঞ ব্যতীত বৃষ্টি হয় না এবং বৃষ্টি না হইলে এই লোকের জীবন নির্ব্বাহ হয় না ; কিন্তু 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া, এই সামাজিক তত্ত্বেরও ইহাতে পরোক্ষভাবে সমাবেশ হইয়াছে যে, নিজের প্রিয় কোন কোন বিষয় না ছাড়িলে, না সকলের একই প্রকার সুবিধা ঘটে, আর, না জগতের ব্যবহারই চলিতে পারে। উদাহরণ যথা—পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রপ্রণেতা এই সিদ্ধান্ত বলেন যে, নিজ নিজ স্বতন্ত্রতাকে পরিমিত না করিলে অন্যদের এক প্রকার স্বতন্ত্রতা লাভ হয় না, উহাই এই তত্ত্বের এক উদাহরণ। এবং যদি গীতার পরিভাষায় এই অর্থই বলিতে হয় তবে এইস্থলে এইপ্রকার যজ্ঞপ্রধান ভাষারই প্রয়োগ করিতে হইবে যে, "যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্রতার কোন অংশেরও যজ্ঞ না করে, সে পর্য্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চলিতে পারে না"। এইপ্রকার ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ দ্বারা যখন ইহা স্থির হইল যে, যজ্ঞই সমস্ত সমাজরচনার আধার ; তখন বলা বাহুল্য যে, কেবল কর্ত্তব্যদৃষ্টিতে 'যজ্ঞ' করা যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত সমাজের ব্যবস্থা ঠিক থাকিবে না।

এবং বহুবিধা যজ্ঞাবিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ : (৩২) এই প্রকার নানাবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের (ই) মুখে বজায় আছে। ইহা জান যে, সে সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

রহস্য : জ্যোতিষ্টোম আদি দ্রব্যময় শ্রৌত যজ্ঞ অগ্নিতে হবন করিয়া করা হয় এবং শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্নি ; এই কারণে এই যজ্ঞ ঐ দেবতারা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে—অগ্নিতে—উক্ত লাক্ষণিক যজ্ঞ হয় না অতএব এই সকল লাক্ষণিক যজ্ঞের দ্বারা

শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে ; তবে তাহা দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই মুখে হয়। দ্বিতীয় চরণের ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞবিধির এই ব্যাপক স্বরূপ—কেবল মীমাংসকদিগের সঙ্কীর্ণ অর্থই নহে—জানিয়া লইয়াছেন ; তাঁহার বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ থাকে না, কিন্তু তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার অধিকারী হইয়া যান। এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কি—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৩) হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ হে পার্থ! সর্ব্ববিধ সমস্ত কর্ম্মের পর্য্যবসান জ্ঞানেতে হয়।

রহস্য ঃ গীতায় 'জ্ঞানযজ্ঞ' শব্দ দুইবার পরেও আসিয়াছে (গী. ৯. ১৫ ও ১৮. ৭০)। আমি যে দ্রব্যময় যজ্ঞ করি, তাহা পরমেশ্বরকে পাইবারজন্য করি। কিন্তু পরমেশ্বর প্রাপ্তি তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান লাভের পর ঐ জ্ঞান অনুসারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিবার এই মার্গ বা সাধনকে 'জ্ঞানময়' বলে। এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধিসাধ্য, অতএব দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। মোক্ষশাস্ত্রে জ্ঞানযজ্ঞের এই জ্ঞানই মুখ্য এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। যাহাই হোক, গীতার ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। তথাপি "কর্ম্মের পর্য্যবসান জ্ঞানে হয়" এই বচনের ইহা অর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে—এই বিষয় গীতারহস্যের দশম ও একাদশ প্রকরণে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আপনার জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কর্ম্মই করিতে হইবে, এবং যখন তাহা জ্ঞান ও সমবুদ্ধি সহকারে করা হয়, তখন উহার পাপপুণ্যের বন্ধন কর্ত্তাকে লাগে না (পরে ৩৭শ শ্লোক দেখুন) এবং এই জ্ঞানযজ্ঞ মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব গীতার সকল লোকের প্রতি ইহাই উপদেশ যে, যজ্ঞ কর, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৪) মনে রেখো যে, প্রণিপাতের দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা দ্বারা তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে ঐ জ্ঞানের উপদেশ করিবেন ; (৩৫) যে জ্ঞান পাইয়া হে পাণ্ডব! ফের তোমার এই প্রকার মোহ হইবে না এবং যে জ্ঞানযোগে সমস্ত প্রাণিগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে।

রহস্য ঃ সমস্ত প্রাণিগণকে আপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখিবার, সমস্ত প্রাণীমাত্রে যে ঐক্যজ্ঞান পরে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ২৯), তাহারই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলে আত্মা ও ভগবান উভয়ে একরূপ, অতএব আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর সমাবেশ হয়, অর্থাৎ ভগবানেও উহার সমাবেশ হইয়া আত্মা (তে), অন্য প্রাণী ও ভগবান এই ত্রিবিধ ভেদ নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই ভাগবতপুরাণে ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ দিবার কালে বলা হইয়াছে, "সমস্ত প্রাণীকে ভগবানে এবং আপনাতে যিনি দেখেন, তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলিতে হইবে" (ভাগ. ১১. ২. ৪৫)। এই মহত্বপূর্ণ নীতিতত্ত্বের বেশী খুলিয়া ব্যাখ্যা

গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ. ৩৩৪-৩৪০) এবং ভক্তিদৃষ্টিতে ত্রয়োদশ প্রকরণে (পৃ. ৩৬৮. ৩৭০) করা হইয়াছে।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৬) সকল পাপী অপেক্ষা যদি অধিক পাপী হও, তথাপি (এই) জ্ঞান-নৌকা দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার হইয়া যাইবে। (৩৭) যে প্রকার প্রজ্বলিত অগ্নি (সমস্ত) ইন্ধন ভস্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকারই হে অর্জ্জুন (এই) জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে (শুভ-অশুভ বন্ধনকে) জ্বালাইয়া দেয়।

রহস্য ঃ জ্ঞানের মহত্ব বলিলেন। এখন বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান কি উপায়ে লাভ হয়—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্য-সত্যই আর কিছুই নাই। যাহার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি সময় পাইয়া স্বয়ংই আপনাতে ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত করায়।

রহস্য ঃ ৩৭শ শ্লোকে 'কর্ম্মের' অর্থ 'কর্ম্মের বন্ধন' (গী. ৪ ১৯ দেখুন)। নিজের বুদ্ধিতে আরব্ধ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করা, জ্ঞানপ্রাপ্তির মুখ্য বা বুদ্ধিগম্য মার্গ। কিন্তু যে নিজে এই প্রকার নিজের বুদ্ধিতে জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্য এখন শ্রদ্ধার দ্বিতীয় মার্গ বলিতেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৯) যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া উহারই পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন তিনি (ও) এই জ্ঞান লাভ করেন ; এবং জ্ঞান লাভ করিলে শীঘ্রই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

রহস্য ঃ সারকথা, বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও তাহাই পাওয়া যায় (গী. ১৩, ২৫ দেখুন)।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪০) কিন্তু যাহার স্বয়ং জ্ঞানও নাই আর শ্রদ্ধাও নাই, সেই সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহলোক আছে (আর) না পরলোক, এবং সুখও নাই।

রহস্য ঃ জ্ঞানলাভের এই দুই মার্গ বলিয়া আসিয়াছেন, এক বুদ্ধির এবং দ্বিতীয় শ্রদ্ধার। এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের পৃথক্ উপযোগ দেখাইয়া সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসংভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ঃ (৪১) হে ধনঞ্জয়! যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি (কর্ম্ম-) যোগের আশ্রয়ে কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার (সমস্ত) সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম বদ্ধ করিতে পারে না। (৪২) এই জন্য নিজের হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা কাটিয়া (কর্ম্ম) যোগকে অবলম্বন কর। (এবং) হে ভারত! (যুদ্ধের জন্য) দাঁড়াও!

রহস্য ঃ ঈশাবাস্য উপনিষদে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'র পৃথক উপযোগ দেখাইয়া যে প্রকার উভয়কে ত্যাগ না করিয়াই আচরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে (ঈশ ১১; গী. র. পৃঃ ৩১১); সেই প্রকারই গীতার এই দুই শ্লোকে জ্ঞান ও (কর্ম্ম-) যোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া উহাদের অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগের সমুচ্চয়েই কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই দুইয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপযোগ এই যে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম করিলে পর উহাদের বন্ধন টুটিয়া যায়, এবং উহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না এবং জ্ঞানের দ্বারা মনের সন্দেহ দূর হইয়া মোক্ষলাভ হয়। অতএব শেষ উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞানকে স্বীকার করিও না, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় করিয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, এই কারণে গীতারহস্যের ৫২ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে যে, যোগ শব্দের অর্থ এখানে 'কর্ম্মযোগ'ই ধরিতে হইবে। জ্ঞান ও যোগের এই মিলনই "জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ" পদের দ্বারা দৈবী সম্পত্তির লক্ষণে (গী. ১৬. ১) আবার বলা হইয়াছে।

মনে থাকে যেন, 'জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস' পদে 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ স্বরূপতঃ 'কর্ম্মত্যাগ' নহে, কিন্তু নিষ্কামবুদ্ধিতে পরমেশ্বরে কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ 'অর্পণ করা'। এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে উহাই খুলিয়া বলা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

চতুর্থ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্ন্যাসমার্গীদের যে সংশয় হইতে পারে, তাহাই অর্জ্জুনের মুখে প্রশ্নরূপে বলাইয়া এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। যদি সমস্ত কর্ম্মের পর্য্যবসান জ্ঞান হয় (৪. ৩৩), যদি জ্ঞানের দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায় (৪. ৩৭), এবং যদি দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ হয় (৪. ৩৩); তবে দ্বিতীয় অধ্যায়েই "ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর" (২. ৩১) বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথা কেন বলা হইল যে "অতএব তুমি কর্ম্মযোগের আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও" (৪. ৪২)? এই প্রশ্নের গীতা এই উত্তর দিতেছেন যে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; এবং যদি মোক্ষের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক না হয়, তথাপি কখনও না ছাড়িবার কারণে উহা লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক; এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সমুচ্চয়ের নিত্য অপেক্ষা আছে (৪. ৪১)। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আসে যে, যদি কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য উভয় মার্গই শাস্ত্রবিহিত হয়, তবে, এই উভয়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় সাংখ্যমার্গ স্বীকার করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলে হানিই বা কি? অর্থাৎ এই উভয়মার্গের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণয় হইয়া যাওয়া উচিত। এবং অর্জ্জুনের মনে এই সংশয়ই আসিল। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে যে প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেই প্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে,—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ
সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ
সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ (১) অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! (তুমি) একবার সন্ন্যাসকে এবং আর একবার কর্ম্মসমূহের যোগকে (অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবার মার্গকেই) উত্তম বলিতেছ; এখন নিশ্চয় করিয়া আমাকে একই (মার্গ) বল, যাহা এই উভয়ের মধ্যে যথার্থই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত। (২) শ্রীভগবান বলিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ; কিন্তু (অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের যোগ্যতা সমান হইলেও) এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের বিশেষ যোগ্যতা আছে।

রহস্য ঃ উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর উভয় নিঃসন্দিগ্ধ ও স্পষ্ট। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে প্রথম শ্লোকের 'শ্রেয়ঃ' শব্দের অর্থ অধিক প্রশস্ত বা খুব ভাল, দুই মার্গের তারতম্য-ভাববিষয়ক অর্জ্জুনের প্রশ্নেরই এই উত্তর যে, 'কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে'—কর্ম্মযোগের যোগ্যতা অধিক। তথাপি এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যমার্গের ইষ্ট নহে, কারণ উহার কথা এই যে, জ্ঞানের পরে সমস্ত কর্ম্মের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস করাই উচিত; এই কারণে এই স্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট প্রশ্নোত্তরের ব্যর্থ টানাবুনা কেহ কেহ করিয়াছেন। যখন এই

টানাবুনা করিয়াও সমাধান হইল না, তখন তাঁহারা এই তুড়ী বাজাইয়া কোন প্রকারে নিজেদের সমাধান করিয়া লইলেন যে, 'বিশিষ্যতে' (যোগ্যতা বা বিশেষত্ব) পদের দ্বারা ভগবান কর্ম্মযোগের অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবলমাত্র স্তুতি করিয়া দিয়াছেন—আসলে ভগবানের ঠিক অভিপ্রায় ঐরূপ নহে ! যদি ভগবানের এই মত হইত যে, জ্ঞানের পরে কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তবে কি তিনি অর্জ্জুনকে এই উত্তর দিতে পারিতেন না যে "এই উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ" ? কিন্তু এরূপ না করিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে বলিলেন যে, "কর্ম্ম করা ও ত্যাগ করা, এই উভয় মার্গ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ" ; এবং পরে 'তু' অথাৎ 'কিন্তু' পদের প্রয়োগ করিয়া যখন ভগবান নিঃসন্দিগ্ধ বিধান করিলেন যে, 'তয়োঃ' অর্থাৎ এই উভয় মার্গের মধ্যে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার মার্গ অপেক্ষা কর্ম্ম করিবার পক্ষই অধিক প্রশস্ত (শ্রেয়) ; তখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতেছে যে ভগবানের এই মতই গ্রাহ্য যে, সাধনাবস্থায় জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কৃত নিষ্কাম কর্ম্মই, জ্ঞানী ব্যক্তি পরে সিদ্ধাবস্থাতেও লোকসংগ্রহের জন্য আমরণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া করিতে থাকিবেন। এই অর্থই গীতা ৩. ৭এ বর্ণিত হইয়াছে, এই 'বিশিষ্যতে' পদই সেখানেও আছে ; এবং উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে অর্থাৎ গীতা ৩. ৮এ আবারও এই স্পষ্ট শব্দ আছে যে, "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষদের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. ৪. ২২) বর্ণনা আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি লোকৈষণা ও পুত্রৈষণা প্রভৃতি না রাখিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু উপনিষদেও ইহা উক্ত হয় নাই যে, জ্ঞানের পরে এই একই মার্গ আছে—দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব কেবল উক্ত উপনিষদ্-বাক্য দ্বারাই গীতার একবাক্যতা করা উচিত নহে। গীতা ইহা বলেন না যে, উপনিষদে বর্ণিত এই সন্ন্যাসমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে ; কিন্তু যদিও কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস, দুই মার্গ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ, তথাপি (অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের ফল একই হইলেও) জগতের ব্যবহার বিচার করিবার উপর গীতার ইহা স্থির মত যে, জ্ঞানের পরেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিবার মার্গই অধিক প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ। মৎকৃত এই অর্থ গীতার অনেক টীকাকারের মান্য নহে ; তাঁহারা কর্ম্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে ; গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (বিশেষতঃ পৃ. ২৬৩-২৭০) ইহার কারণসকল সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে ; এই কারণে এখানে উহার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক নাই। এই প্রকারে উভয়ের মধ্যে অধিক প্রশস্ত মার্গ নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এখন ইহা সিদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই দুই মার্গ ব্যবহারে লোকের চক্ষে বিভিন্ন দৃষ্ট হইলেও তত্ত্বতঃ উহারা দুই নহে—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাংক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ (৩) যে (কাহাকেও) দ্বেষ করে না এবং (কোন কিছুরও) ইচ্ছা করে না, সেই ব্যক্তিকে (কর্ম্ম করিলেও) নিত্যসন্ন্যাসী বুঝিতে হইবে ; কারণ হে মহাবাহো অর্জ্জুন ! যে (সুখ-দুঃখ প্রভৃতি) দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া যায় সে অনায়াসেই (কর্ম্মের সমস্ত) বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। (৪) মূর্খ লোকে বলে যে, সাংখ্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্ম্মযোগ) ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বলেন না। কোন এক মার্গের ভালরূপ আচরণ করিলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়। (৫) যে (মোক্ষ-) স্থানে সাংখ্য (মার্গাবলম্বী ব্যক্তি) পৌঁছায়, সেইখানেই যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগীও যায়। (এই রীতিতে এই দুই মার্গ) সাংখ্য ও যোগ একই ; যে ইহা জানিয়াছে সে-ই (যথার্থ তত্ত্ব) জানিয়াছে। (৬) হে মহাবাহু ! যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাসপ্রাপ্তি কঠিন। যে মুনি কর্ম্মযোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হয় না।

রহস্য ঃ সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন করা হইয়াছে যে, সাংখ্যমার্গে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কর্ম্মযোগে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িলেও লাভ হয়। এস্থলে তো এইটুকুই বলা দরকার যে, মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাদি কাল হইতে আগত এই মার্গদ্বয়ের ভেদ-ভাব বাড়াইয়া বিবাদ করা উচিত নহে ; এবং পরেও এই যুক্তিগুলিই পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে (গী. ৬. ২. ও ১৮. ১, ২ এবং উহার টিপ্পনী দেখুন)। "একং সাখ্যং চ যোগং চয়ঃ পশ্যতি স পশ্যতি" এই শ্লোকই অল্প শব্দভেদে মহাভারতেও দুইবার আসিয়াছে (শাং. ৩০৫, ১৯ ; ৩১৬. ৪)। সন্ন্যাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মানিয়া লইলেও ঐ জ্ঞানের সিদ্ধি কর্ম্ম না করিলে হয় না, এবং কর্ম্মমার্গে কর্ম্ম করিতে হইলেও তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত হয়, এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গী. ৬. ২) ; তখন দুই মার্গ ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া ঝগড়া বাড়াইয়া লাভ কি ? কর্ম্ম করাই বন্ধনকারণ যদি বলা যায়, তাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই আপত্তিও নিষ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে করিতে পারা যায় না—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) যিনি (কর্ম্ম) যোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়সকল জয় করিয়াছেন এবং সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁহার আত্মা হইয়া গিয়াছে, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিলেও (কর্ম্মের পাপ-পুণ্যে) অলিপ্ত থাকেন। (৮) যোগযুক্ত তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির বুঝিতে হইবে যে, "আমি কিছুই করিতেছি না" ; (এবং) দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে, আঘ্রাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) বলিতে, বিসর্জ্জন করিতে, গ্রহণ করিতে, চক্ষের পলক খুলিতে ও বন্ধ করিতেও, (কেবল) ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়সমূহে বিচরণ করিতেছে, এই প্রকার বুদ্ধি রাখিয়াই ব্যবহার করিবে।

রহস্য ঃ শেষের দুই শেলাক মিলিত হইয়া এক বাক্য হইয়াছে এবং উহাতে উক্ত সমস্ত কর্ম্ম বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ; উদাহরণ যথা—বিসর্জ্জন করা উপস্থের, গ্রহণ করা হাতের, পলক ফেলা প্রাণবায়ুর, দেখা চক্ষুর ইত্যাদি। "আমি কিছুই করিতেছি না" ইহার ভাব ইহা নহে যে ইন্দ্রিয়সকলকে যাহা চায় তাহাই করিতে দাও ; কিন্তু ভাব এই যে, "আমি" এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে অচেতন ইন্দ্রিয় স্বতই কোন মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না—এবং উহারা আত্মার অধীনে থাকে। সার কথা, কোন ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ করিতেই থাকিবে। অধিক কি, ক্ষণকাল জীবিত থাকাও কর্ম্মই হইতেছে। তখন এই ভেদ কোথায় রহিল যে, সন্ন্যাসমার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ছাড়েন এবং কর্ম্মযোগী করেন ? কর্ম্ম তো উভয়ের করিতেই হয়। তবে অহঙ্কারযুক্ত আসক্তি দূর হইলে ঐ কর্ম্মই বন্ধন কারণ হয় না, এই কারণে আসক্তি ত্যাগই ইহার মুখ্য তত্ত্ব ; এবং এক্ষণে উহারই অধিক নিরূপণ করিতেছেন—

> ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
> লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
> কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
> যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ (১০) যিনি ব্রহ্মেতে অর্পণ করিয়া আসক্তিবিরহিত কর্ম্ম করেন, যেমন পদ্মপত্রে জল দাঁড়ায় না, সেইরূপই উঁহাতে পাপ সংলগ্ন হয় না। (১১) (অতএব) কর্ম্মযোগী (আমি করিতেছি এই প্রকার অহঙ্কারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল) শরীরের দ্বারা, (কেবল) মনের দ্বারা, (কেবল) বুদ্ধির দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও, আসক্তি ছাড়িয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন।

রহস্য ঃ কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভৃতি কর্ম্মের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এই শেলাকে শরীর, মন ও বুদ্ধির শব্দ আসিয়াছে। মূলে যদিও "কেবলৈঃ" বিশেষণ 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' শব্দের পূর্ব্বে আছে, তথাপি তাহা শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রতিও প্রযোজ্য (গী. ৪. ২১)। এই কারণেই অনুবাদে উহাকে 'শরীর' শব্দেরই ন্যায় অন্য শব্দের পূর্ব্বেও লাগাইয়া দিয়াছি। যেমন উপরের অষ্টম ও নবম শেলাকে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই এখানেও উক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার আসক্তি ছাড়িয়া কেবল কায়িক, কেবল বাচিক বা মানসিক কোনও কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না। গীতা, ৩. ২৭ ; ১৩. ২৯ এবং ১৮. ১৬ দেখুন। অহঙ্কার না থাকিয়া যে কর্ম্ম হয়, তাহা মাত্র ইন্দ্রিয়গণের এবং মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রকৃতিরই বিকার, অতএব এই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তার বন্ধন-কারণ হয় না। এখন এই অর্থকেই শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ করিতেছেন—

> যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
> অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
> সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
> নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ (১২) যিনি যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল ছাড়িয়া শেষের পূর্ণ শান্তিলাভ করেন ; এবং যে অযুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত নহে, সে কামের দ্বারা অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ফলের বিষয়ে আসক্ত হইয়া (পাপপুণ্যের দ্বারা) বদ্ধ হইয়া যায়। (১৩) সকল কর্ম্মের মনের দ্বারা (প্রত্যক্ষ নহে) সন্ন্যাস করিয়া জিতেন্দ্রিয় দেহী (ব্যক্তি) নবদ্বারের এই (দেহরূপ) নগরে না কিছু করেন আর না করান, আনন্দে পড়িয়া থাকেন।

রহস্য ঃ তিনি জানেন যে, আত্মা অকর্ত্তা, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতির এবং এই কারণে স্বস্থ বা উদাসীন পড়িয়া থাকেন (গীতা. ১৩. ২০ ও ১৮. ৫৯)। দুই চক্ষু, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র, মুখ, শিশ্ন ও উপস্থ—এই কয়টিকে শরীরের নব দ্বার বা নয়টি দুয়ার বলে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই উপপত্তিই বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও কি প্রকারে মুক্ত হইয়া থাকেন—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ (১৪) প্রভু অর্থাৎ আত্মা বা পরমেশ্বর লোকদের কর্ত্তৃত্বকে, উহাদের কর্ম্মকে, (বা উহাদের প্রাপ্য) কর্ম্মফলের সংযোগকেও নির্ম্মাণ করেন না। স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতিই (যাহা কিছু) করে। (১৫) বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না। জ্ঞানের উপর অজ্ঞানের পর্দ্দা পড়িয়া থাকিবার কারণে (অর্থাৎ মায়া দ্বারা) প্রাণী মোহিত হইয়া যায়।

রহস্য ঃ এই দুই শ্লোকের তত্ত্ব আসলে সাংখ্যশাস্ত্রের (গীতার. পৃ. ১৪২-১৪৪)। বেদান্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশ্বর, অতএব বেদান্তী লোক পরমেশ্বর সম্বন্ধেও 'আত্মা অকর্ত্তা' এই তত্ত্বের উপযোগ করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই প্রকার দুই মূল তত্ত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতবাদী সমগ্র কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির বলেন এবং আত্মাকে উদাসীন বলেন। কিন্তু বেদান্তী ইহার পরে আগাইয়া স্বীকার করেন যে, এই দুয়েরই মূল এক নির্গুণ পরমেশ্বর এবং তিনি সাংখ্যবাদীদের আত্মার ন্যায় উদাসীন ও অকর্ত্তা এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব মায়ার (অর্থাৎ প্রকৃতির) (গীতার. পৃ. ২৩১)। অজ্ঞানের কারণে সাধারণ মনুষ্য এই বিষয় জানিতে পারে না ; কিন্তু কর্ম্মযোগী কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বের প্রভেদ জানে ; এই কারণে সে কর্ম্ম করিয়াও অলিপ্তই থাকে, এক্ষণে ইহাই বলিতেছেন—

> জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
> তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥
> তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
> গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ (১৬) কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাহার এই অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার নিকট উহারই জ্ঞান পরমাত্মতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত করে। (১৭) এবং সেই পরমার্থতত্ত্বেই যাহার বুদ্ধি অনুরঞ্জিত হয়, উহাতেই যাহার অন্তঃকরণের রতি হয় এবং যে তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হয়, তাহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ ধুইয়া যায় এবং সে আর জন্মগ্রহণ করে না।

রহস্য ঃ এই প্রকারে যাহার অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সেই কর্ম্মযোগীর (সন্ন্যাসীর নহে) ব্রহ্মভূত বা জীবন্মুক্ত অবস্থা এক্ষণে আরও বর্ণন করিতেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১৮) পণ্ডিতদিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, সেইপ্রকারই কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে! (১৯) এই প্রকার যাহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়া যায়, সে এখানেই, অর্থাৎ মরণের প্রতীক্ষা না করিয়া, মৃত্যুলোককে জয় করে। কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম, অতএব এই (সাম্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট) পুরুষ (সর্ব্বদাই) ব্রহ্মেতে স্থিত, অর্থাৎ এইখানেই ব্রহ্মভূত হইয়া যায়।

রহস্য ঃ যে এই তত্ত্ব জানিয়া লইয়াছে যে, 'আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর অকর্ত্তা এবং সমস্ত খেলা প্রকৃতির', সে 'ব্রহ্মসংস্থ' হইয়া যায় এবং তাহারই মোক্ষলাভ হয়—'ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি' (ছা. ২. ২৩. ১), উক্ত বর্ণনা উপনিষদে আছে এবং উহারই অনুবাদ উপরের শ্লোকে করা হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের ১—১২ শ্লোক হইতে গীতার এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই অবস্থাতেও কর্ম্ম দূর হয় না। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে জানা যাইবে যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' হইবার পরেও তিন আশ্রমের কর্ম্ম-কর্ত্তার বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়া থাকিবে এবং এই উপনিষদের শেষে এই অর্থই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে (ছা. ৮. ২৫. ১)। ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেলে এই অবস্থা জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএই ইহাকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বলে (গীতার. পৃঃ ২৫৭ ২৫৯)। অধ্যাত্মবিদ্যার ইহাই পরাকাষ্ঠা। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগসাধনের দ্বারা এই অবস্থা পাওয়া যায়, তাহার সবিস্তার বর্ণনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে এখন কেবল এই অবস্থারই অধিক বর্ণনা হইয়াছে।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবঃ বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) যে প্রিয় অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু পাইয়া প্রসন্ন হইবে না, এবং অপ্রিয় পাইয়া খিন্নও হইবে না, (এই প্রকার) যাহার বুদ্ধি স্থির এবং যে মোহে আবদ্ধ না হয়, সেই ব্রহ্মবেত্তাকেই ব্রহ্মে অবস্থিত জানিবে। (২১) বাহ্য পদার্থের (ইন্দ্রিয়-সম্ভূত) সংযোগে অর্থাৎ বিষয়োপভোগে যাহার মন আসক্ত নহে, তাহার (ই) আত্ম-সুখ লাভ হয়; এবং সেই ব্রহ্মযুক্ত পুরুষ অক্ষয় সুখ অনুভব করেন। (২২) (বহিঃপদার্থের) সংযোগ হইতেই উৎপন্ন ভোগসমূহের আদি ও অন্ত আছে, অতএব তাহা দুঃখেরই কারণ; হে কৌন্তেয়! উহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি রত হয় না। (২৩) শরীর যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আমরণ কামক্রোধবেগ ইহলোকেই সহ্য করিতে (ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা) যে সমর্থ হয়, সে-ই যুক্ত এবং সে-ই (প্রকৃত) সুখী।

রহস্য ঃ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, তোমার সুখদুঃখ সহ্য করা উচিত (গী. ২. ১৪)। ইহা উহারই বিস্তার ও নিরূপণ। গীতা ২. ১৪তে সুখদুঃখের 'আগমাপায়িনঃ' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২২শ শ্লোকে উহাকে 'আদ্যন্তবন্তঃ' বলা হইয়াছে এবং 'মাত্রা' শব্দের বদলে 'বাহ্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতেই 'যুক্ত' শব্দের ব্যাখ্যাও আসিয়া গিয়াছে। সুখদুঃখ ত্যাগ না করিয়া সমবুদ্ধিতে উহা সহিতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ। গীতা ২. ৬১র রহস্য দেখুন।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৪) এই প্রকারে (বাহ্য সুখদুঃখের অপেক্ষা না করিয়া) যে অন্তঃসুখী অর্থাৎ অন্তঃকরণেই সুখী হয়, যে আপনি আপনাতেই আরাম পাইতে থাকে, এবং এইরূপেই যাহার (এই) অন্তঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই (কর্ম্ম-) যোগী ব্রহ্মরূপ হইয়া যায় এবং সে-ই ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হইয়া মোক্ষলাভ করে। (২৫) যে ঋষিদের দ্বন্দ্ববুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়াছেন যে, সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা আত্মসংযমের দ্বারা সকল প্রাণীর হিত-সাধনে রত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই

ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। (২৬) কামক্রোধবিরহিত, আত্মসংযমী ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যতিদিগের অভিতঃ অর্থাৎ আশেপাশে বা সম্মুখে রক্ষিতভাবে (বসিয়া বসিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়। (২৭) বাহ্য পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখপ্রদ) সংযোগ হইতে পৃথক্ থাকিয়া, উভয় ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া এবং নাকের দ্বারা চলনশীল প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া (২৮) যে-ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছে, এবং যাহার ভয়, ইচ্ছা ও ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছে, সেই মোক্ষপরায়ণ মুনি সদাসর্ব্বদা মুক্তই।

রহস্য ঃ গীতারহস্যের নবম (পৃঃ ২০২, ২১৬.) এবং দশম (পৃঃ ২৫৮ প্রকরণ হইতে জ্ঞাত হইবে যে, এই বর্ণনা জীবন্মুক্তাবস্থার। কিন্তু আমার মতে টীকাকারদের এই উক্তি ঠিক নহে যে, এই বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গী পুরুষসম্বন্ধীয়। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, উভয় মার্গে শান্তি তো একই প্রকার থাকে, এবং ঐটুকুর জন্য এই বর্ণনা সন্ন্যাসমার্গের উপযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায়ের আরম্ভে কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫শ শ্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্ন থাকে, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই, সমস্ত বর্ণনা কর্ম্মযোগী জীবন্মুক্তেরই—সন্ন্যাসীর নহে (গী. র পৃ.৩২২)। কর্ম্মমার্গেও সর্ব্বভূতান্তর্গত পরমেশ্বরকে জানাই পরম সাধ্য, অতএব ভগবান শেষে বলিতেছেন যে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) যে আমাকে (সমস্ত) যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, (স্বর্গ আদি) সমস্ত লোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু, এবং সকল প্রাণীর মিত্র জানে, সে-ই শান্তি লাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

এই পর্য্যন্ত তো সিদ্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা না থাকিলেও লোকসংগ্রহদৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরেও কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত : কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া তিনি সমবুদ্ধিতে এইজন্য করিবেন যে, সেগুলি বন্ধক হইবে না, ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলে এবং কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা ইহা অধিক শ্রেয়স্কর। তথাপি এইটুকু হইতেই কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন সমাপ্ত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়েই ; ভগবান অর্জ্জুনকে কামক্রোধ প্রভৃতির বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, এই শত্রু মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ে, মনে ও বুদ্ধিতে বাসা বাঁধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ধ্বংসসাধন করে (৩. ৪০), অতএব তুমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দ্বারা ইহাকে প্রথমে জয় কর। এই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য এন দুই প্রশ্ন খোলসা করা আবশ্যক ছিল যে, (১) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিবে, এবং (২) জ্ঞানবিজ্ঞান কাহাকে বলে ; কিন্তু মধ্যেই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইয়াছে যে, কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্ মার্গ বেশী ভাল ; আবার এই দুই মার্গের যথাসম্ভব একবাক্যতা করিয়া ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ কি প্রকারে হয়। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ কর্ম্মযোগেও উক্ত অনাসক্ত বা ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই সকলের নিরূপণ আরম্ভ করা হইল। তথাপি মনে থাকে যেন, এই নিরূপণও কোন স্বতন্ত্র প্রণালীতে পাতঞ্জলযোগের উপদেশ করিবার জন্য করা হয় নাই। এবং এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দৃষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহই প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তিকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী জানিতে হইবে—কর্ম্মত্যাগীকে নহে (৫. ৩) ইত্যাদি।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পান্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ (১) কর্ম্মফলের আশ্রয় না করিয়া (অর্থাৎ মনে ফলাশা থাকিতে না দিয়া যে (শাস্ত্রানুসারে নিজের বিহিত) কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সে-ই সন্ন্যাসী এবং সে-ই কর্ম্মযোগী। নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম-ত্যাগী অথবা অক্রিয় অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম না করিয়া নিছক উপবিষ্ট (প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী) নহে। (২) হে পাণ্ডব ! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই (কর্ম্ম-) যোগ জানিও। কারণ সংকল্প

অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরূপ ফলাশার সন্ন্যাস (=ত্যাগ) করা ব্যতীত কেহই (কর্ম্ম-) যোগী হয় না।

রহস্য : পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে যে, "একং সাংখ্যং চ যোগং চ" (৫. ৫) বা "যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না" (৫. ৬), অথবা "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" (৫. ৩), উহারই ইহা অনুবাদ এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২) সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে অগ্নিহোত্র রাখিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে হয় ; কিন্তু যে সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, উহার এইপ্রকার অগ্নি রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে সে 'নিরগ্নি' হইয়া যায় এবং অরণ্যে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিবে—জগতের ব্যবহারে পাড়িবে না (মনু. ৬. ২৫ ইত্যাদি)। প্রথম শ্লোকে মনুর এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইহার উপর ভগবানের উক্তি এই যে, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ নহে। কাম্যবুদ্ধি বা ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস বুদ্ধিতে ; অগ্নিত্যাগ অথবা কর্ম্মত্যাগের বাহ্য ক্রিয়াতে নহে। অতএব ফলাশা অথবা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে করে, তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলা উচিত। গীতার এই সিদ্ধান্ত স্মৃতিকারদিগের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্। গীতারহস্যের ১১শ প্রকরণের (পৃ. ২৯৯-৩৩২) স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গীতা স্মৃতিমার্গের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিয়াছেন। এইপ্রকারে প্রকৃত সন্ন্যাস ব্যাখ্যা করিয়া এখন বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা, এবং জ্ঞানোত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাতে ফলাশা ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : (৩) (কর্ম্ম-) যোগারূঢ় হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্ম্মকে (শমের) কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন ; এবং সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণ যোগী হইয়া গেলে তাহার পক্ষে (পরে) শম (কর্ম্মের) কারণ হয়।

রহস্য : টীকাকারেরা এই শ্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যোগ= কর্ম্মযোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য যে, উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্ম্মই কারণ হয়। কিন্তু "যোগারূঢ় হইবার পর উহারই জন্য শম কারণ হইয়া যায়" ইহার অর্থ টীকাকারেরা সন্ন্যাসমূলক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এস্থলে "শম" =কর্ম্মের 'উপশম' ; এবং যাহার যোগ সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহার কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত ! কারণ তাঁহাদের মতে কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসের অঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্বসাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, ইহা ঠিক নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ভগবান বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' যে ব্যক্তি করে, সে-ই প্রকৃত যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ়—কর্ম্ম যে না করে (অক্রিয়) সে প্রকৃত, যোগী নহে ; তখন ইহা স্বীকার করা সর্ব্বথা অন্যায় যে, তৃতীয় শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তিকে কর্ম্মের শম করিবার জন্য

বা কর্ম্ম ছাড়িবার জন্য ভগবান বলিবেন। শান্তিলাভের পর যোগারূঢ় পুরুষ কর্ম্ম করিবে না, সন্ন্যাস-মার্গের এই মত ভালই হউক, কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীতায় অনেকস্থলে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগী সিদ্ধাবস্থাতেও যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিতে থাকিবে (গী. ২. ৭১ ; ৩. ৭ ও ১৯ ; ৪. ১৯ ২১ ; ৫. ৭-১২ ; ১২. ১২ ; ১৮. ৫৬, ৫৭ এবং গীতার. প্র. ১১ ও ১২)। (২) দ্বিতীয় কারণ এই যে, 'শম' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মের শম' কোথা হইতে আসিল ? ভগবদ্গীতাতে 'শম' শব্দ দুই চারিবার আসিয়াছে (গী. ১০. ৪ ; ১৮. ৪২), সেস্থলে এবং ব্যবহারেও উহার অর্থ 'মনের শান্তি'। তবে এই শ্লোকেই 'কর্ম্মের শান্তি' অর্থ কেন লইবে ? এই সমস্যা দূর করিবার জন্য গীতার পৈশাচ ভাষ্যে 'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব' ইহার 'তস্যৈব' এই দর্শক-সর্ব্বনামের সম্বন্ধ 'যোগারূঢ়স্য' শব্দের সহিত না লাগাইয়া 'তস্য'কে নপুংসক লিঙ্গের ষষ্ঠী বিভক্তি স্থির করিয়া অর্থ করিয়াছে যে "তস্যৈব কর্ম্মণঃ শমঃ" (তস্য অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধের কর্ম্মের শম) ! কিন্তু এই অন্বয়ও সরল নহে। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যোগাভ্যাসকারী যে পুরুষের বর্ণনা এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে করা হইয়াছে, তাহার যে অবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, তাহা বলিবার জন্য উত্তরার্দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব 'তস্যৈব' পদ হইতে 'কর্ম্মণঃ এব' এই অর্থ লওয়া যাইতে পারে না ; অথবা যদি লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 'শমঃ'র সহিত না জুড়িয়া "কারণমুচ্যতে"র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বয় লাগে, "শমঃ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ কারণমুচ্যতে", এবং গীতার সম্পূর্ণ উপদেশ অনুসারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগিবে যে, "এখন যোগারূঢ়ের কর্ম্মেরই শম কারণ হইতেছে"। (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাজ্য বলিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ় পুরুষের কিছুই করিবার আবশ্যকতা থাকে না, উহার সকল কর্ম্মের শেষ শমেতেই হয় ; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'যোগারূঢ়ের শম কারণ হয়' এই বাক্যের 'কারণ' শব্দ সম্পূর্ণই নিরর্থক হইয়া যায়। 'কারণ' শব্দ সর্ব্বদাই সাপেক্ষ। 'কারণ' বলিলে উহার কোন-না-কোন 'কার্য্য' অবশ্য থাকিবে, এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ়ের তো কোনই 'কার্য্য' বাকী থাকে না। যদি শমকে মোক্ষের 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বলেন, তবে তাহা খাপ খাইবে না। কারণ মোক্ষের সাধন জ্ঞান, শম নহে। আচ্ছা, শমকে জ্ঞানপ্রাপ্তির 'কারণ' অর্থাৎ সাধন বলিলে, এই বর্ণনা যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণাবস্থাতে উপনীত পুরুষেরই খাটে, এই জন্য তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি তো কর্ম্মের সাধনের পূর্ব্বেই হইয়া যায়। তবে এই শম 'কারণই' বা কাহার ? সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্নের কোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু উঁহাদিগের এই অর্থ ছাড়িয়া বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্দ্ধের অর্থকরণে পূর্ব্বার্দ্ধের 'কর্ম্ম' পদ সান্নিধ্য সামর্থ্যবলে সহজেই মনে আসে ; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগারূঢ় পুরুষের লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম করিবার জন্য এক্ষণে 'শম' 'কারণ' বা সাধন হয়, কারণ যদিও তাহার কোন স্বার্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যায় নাই, তথাপি লোকসংগ্রহকারক কর্ম্ম কাহারও দূর হইতে পারে না (গী. ৩. ১৭-১৯)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই যে বচন আছে যে, "যুক্তং

কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং” (গী. ৫. ১২)—কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া যোগী পূর্ণ শান্তি লাভ করে—ইহা হইতেও এই অর্থই সিদ্ধ হইতেছে। কারণ উহাতে শান্তির সম্বন্ধ কর্ম্মত্যাগে যুক্ত না করিয়া কেবল ফলাশাত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে; সেস্থলেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যোগী যে কর্ম্ম সন্ন্যাস করিবে তাহা ‘মনসা’ অর্থাৎ মনের দ্বারা করিবে (গী. ৫. ১৩) শরীরের দ্বারা বা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার কর্ম্ম করাই চাই। আমার এই মত যে, অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যোন্যালঙ্কারের সদৃশ অর্থ-চমৎকার বা সৌরস্য এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বার্দ্ধে ‘শম’ এর কারণ ‘কর্ম্ম’ কখন্ হয় তাহা বলিয়া উত্তরার্দ্ধে ইহার বিপরীতে বর্ণিত হইয়াছে যে ‘কর্ম্মের’ কারণ ‘শম’ কখন্ হয়। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে ‘কর্ম্ম’ই শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির কারণ। ভাব এই যে, যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্ত শান্ত হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগসিদ্ধি হয়। কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থাতে পৌঁছিলে পর কর্ম্ম ও শমের উক্ত কার্য্যকারণভাব বদলাইয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু শমই কর্ম্মের কারণ হইয়া যায়, অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে কর্ত্তব্য বুঝিয়া, ফলের আশা না রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়া যান। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে, সিদ্ধাবস্থাতে কর্ম্ম দূর হয়: গীতার কথা এই যে, সাধনাবস্থাতে ‘কর্ম্ম’ ও ‘শম’ দুয়ের মধ্যে যে কার্য্যকারণভাব হয়, কেবল তাহাই সিদ্ধাবস্থাতে বদলাইয়া যায়। (গীতার. পৃঃ ২৭৮. ২৭৯)। গীতার কোথাও উক্ত হয় নাই যে, কর্ম্মযোগীর শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এরূপ বলিবার উদ্দেশও নাই। অতএব অবসর পাইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোনও শ্লোকেরই সন্ন্যাসমূলক অর্থ লাগানো উচিত নহে আজকাল গীতা অনেকের দুর্ব্বোধ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণও ইহাই। পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যখ্যাতে এই অর্থই ব্যক্ত হয় যে, যোগারূঢ় পুরুষের কর্ম্ম করা উচিত। সেই শ্লোক এই—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ: (৪) কারণ যখন সে ইন্দ্রিয়সমূহের (শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়ে এবং কর্ম্মে আসক্ত হয় না এবং সমস্ত সংকল্প অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরূপ ফলাশার (প্রত্যক্ষ কর্ম্মের নহে) সন্ন্যাস করে, তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়।

রহস্য: বলিতে পারা যায় যে, এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গে এবং প্রথম তিন শ্লোকের সঙ্গেও মিলিয়া গিয়াছে, ইহা হইতে গীতার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট দেখা যায় যে, যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলাশা বা কাম্যবুদ্ধি ছাড়িয়া শান্তচিত্তে নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত। ‘সংকল্পের সন্ন্যাস’ এই শব্দ উপরে দ্বিতীয় শ্লোকে আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে উহাই এই শ্লোকেও লইতে হইবে। কর্ম্মযোগেই ফলাশাত্যাগরূপ সন্ন্যাসের সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ় বলা উচিত। এখন ইহা বলিতেছেন

যে, এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ফলাশাসন্ন্যাসের সিদ্ধি লাভ করা প্রত্যেক মনুষ্যের অধিকারে আছে। যে স্বয়ং প্রযত্ন করিবে তাহারই ইহা লাভ করা কিছু অসম্ভব নহে—

উদ্ধরেদাত্মনাঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
বন্ধুরাত্মাঽত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ: (৫) (মনুষ্য) নিজের উদ্ধার নিজেই করিবে। নিজে নিজেকে (কখনও) পড়িতে দিবে না। কারণ (প্রত্যেক মনুষ্য) স্বয়ংই নিজের বন্ধু (অর্থাৎ সহায়), বা স্বয়ং নিজের শত্রু। (৬) যে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে স্বয়ং নিজের বন্ধু; কিন্তু যে নিজে নিজেকে জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে শত্রুর ন্যায় বৈরতা সাধন করে।

রহস্য: এই দুই শ্লোকে আত্ম-স্বতন্ত্রতা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রত্যেককে নিজের উদ্ধার নিজেরই করা উচিত; এবং প্রকৃতি যতই বলবান হউক না কেন, উহাকে জয় করিয়া আত্মোন্নতি করা প্রত্যেকের স্বায়ত্ত (গীতার. পৃঃ ২৩৮-২৪৩)। মনে এই তত্ত্ব ভালরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্যই একবার অন্বয়-ভাবে আর একবার ব্যতিরেকভাবে—দুই রীতিতে—বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা নিজেরই বন্ধু কখন্ হয় এবং আত্মা নিজের শত্রু কখন্ হয়, এবং এই তত্ত্বই আবার ১৩, ২৮ শ্লোকেও আসিয়াছে। সংস্কৃতে ‘আত্মা’ শব্দের এই তিন অর্থ হয় (১) অন্তরাত্মা, (২) আমি স্বয়ং, এবং (৩) অন্তঃকরণ বা মন। এই কারণেই এই আত্মা শব্দ ইহাতে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অনেকবার আসিয়াছে। এখন বলিতেছেন যে, আত্মাকে নিজের অধীন রাখিলে কি ফল হয়—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ: (৭) যে নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছে, এবং যে শান্তিলাভ করিয়াছে, তাহার ‘পরমাত্মা’ শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে।

রহস্য: এই শ্লোকে ‘পরমাত্মা’ শব্দ আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত। দেহের আত্মা সাধারণতঃ সুখ-দুঃখের উপাধিতে মগ্ন থাকে; কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা উপাধি সকলকে জয় করিলে এই আত্মাই প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মরূপ বা পরমেশ্বররূপ হইয়া যায়। পরমাত্মা কিছু আত্মা হইতে বিভিন্ন-স্বরূপ পদার্থ নহেন, পরে গীতাতেই (গী. ১৩. ও ৩১) উক্ত হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত আত্মাই তত্ত্বতঃ পরমাত্মা; মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে—

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্ম্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥

প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে (সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিকারে) বদ্ধ থাকিবার কারণে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাত্মা বলে ; এবং এই গুণ হইতে মুক্ত হইলে উহাই পরমাত্মা হইয়া যায়" (মভা. শা. ১৮৭. ২৪.)। গীতারহস্যের ৯ম প্রকরণ হইতে জানা যাইবে যে, অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তও ইহাই। যিনি বলেন যে, গীতাতে অদ্বৈতমত প্রতিপাদিত হয় নাই, বিশিষ্টাদ্বৈত বা শুদ্ধ দ্বৈতই গীতার গ্রাহ্য, তিনি 'পরমাত্মা'কে এক পদ না মানিয়া 'পরং' ও 'আত্মা' এইরূপে দুই করিয়া 'পরং'কে 'সমাহিতঃ'র ক্রিয়াবিশেষণ মনে করেন ! এই অর্থ ক্লিষ্ট ; কিন্তু এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানা-বুনো করেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : (৮) যাহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়, যে নিজের ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিয়াছে, যে কূটস্থ অর্থাৎ মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মাটি পাথর ও সোনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকে, সেই (কর্ম্ম-) যোগী পুরুষকেই 'যুক্ত' অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত বলে। (৯) সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের যোগ্য, বান্ধব, সাধু ও দুষ্ট লোকের বিষয়েও যাহার বুদ্ধি সম হইয়া গিয়াছে, সেই (পুরুষই) বিশেষ যোগ্য।

রহস্য : প্রত্যুপকারের ইচ্ছা না রাখিয়া সাহায্যকারী স্নেহশীল ব্যক্তিকে সুহৃৎ বলে ; যখন দুই দল হইয়া যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে না চায় তাহাকে উদাসীন বলে ; দুই দলের ভাগ যে চায় তাহাকে মধ্যস্থ বলে ; এবং সম্বন্ধীয়কে বন্ধু বলে। টীকাকারেরা এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ হইতে কিছু ভিন্ন অর্থও করা যাইতে পারে। কারণ এইগুলির প্রয়োগ প্রত্যেকেতে কিছু ভিন্ন অর্থ দেখাইবার জন্যই করা হয় নাই, কিন্তু অনেক শব্দের এই যোজনা কেবল এইজন্য করা হইয়াছে যে, সকলগুলি একত্র করিয়া একটা ব্যাপক অর্থ বোধ হয়--উহাতে কোনও ন্যূনতা না থাকিতে পায়। এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যোগী যোগারূঢ় বা যুক্ত কাহাকে বলে (গী. ২. ৬০ ; ৪. ১৮ ও ৫. ২৩)। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কর্ম্মযোগের সিদ্ধিলাভ করিবার বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র ; তাহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত সাধন নিরূপণ করিতেছেন—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : (১০) যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ও আত্মাকে সংযত করিবে কোন বিষয়েরই কাম্য বাসনা না রাখিয়া, পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ ছাড়িয়া নিরন্তর নিজের যোগাভ্যাসে রত থাকিবে।

রহস্য : পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, এ স্থলে 'যুঞ্জীত' পদে পাতঞ্জল সূত্রের যোগ বিবক্ষিত। তথাপি ইহার এই অর্থ নহে যে, কর্ম্মযোগপ্রাপ্তির অভিলাষী পুরুষ নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগে অতিবাহিত করিবে। কর্ম্মযোগের জন্য আবশ্যক সাম্যবুদ্ধি লাভ করিবার সাধনরূপে পাতঞ্জলযোগ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং এইটুকুরই জন্য একান্তবাসও আবশ্যক। প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে ইহা সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্জলযোগে সমাধি একই জন্মে সিদ্ধ হইবে। এই অধ্যায়েরই শেষে ভগবান বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির সমাধি সিদ্ধ হয় নাই, সে ব্যক্তি নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগেই কাটাইয়া দিবে না ; কিন্তু যতদূর সম্ভব ততটা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে থাকিবে, ইহা দ্বারাই অনেক জন্মে তাহার শেষে সিদ্ধি লাভ হইবে। গীতার পৃঃ ২৪৪-২৪৬ দেখুন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ : (১১) যোগাভ্যাসী পুরুষ বিশুদ্ধ স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করিবে ; তাহা অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু হইবে না ; উহার উপর প্রথমে দর্ভ, পরে মৃগচর্ম্ম এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে ; (১২) সেখানে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার রুদ্ধ করিয়া এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য আসনে বসিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। (১৩) কায় অর্থাৎ পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা সম করিয়া অর্থাৎ সোজা দাঁড়ানো রেখাতে নিশ্চল করিয়া স্থির হওত, দিকসকল অর্থাৎ এদিক ওদিক দেখিবে না ; এবং নিজের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, (১৪) ভয়হীন হইয়া, শান্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া ও মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত লাগাইয়া মৎপরায়ণ হইয়া যুক্ত হইয়া যাইবে।

রহস্য : 'শুদ্ধ স্থানে' এবং 'শরীর, গ্রীবা ও শির সমান করিয়া' এই শব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (শ্বে, ২. ৮ ও ১০) ; এবং উপরের সমুদয় বর্ণনাও হঠযোগের নহে, প্রত্যুত প্রাচীন উপনিষদে যে যোগের বর্ণনা আছে তাহারই সঙ্গে বেশী মিল হয়। হঠযোগ ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ বলপূর্ব্বক করা হয় ; কিন্তু পরে এই অধ্যায়েরই ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এইরূপ না করিয়া 'মনসৈব ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য" মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়সকলকে রোধ করিবে। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতাতে হঠযোগ বিবক্ষিত নহে। এইরূপই এই অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই বর্ণনার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, কেহ নিজের সমস্ত জীবন যোগাভ্যাসেই কাটাইয়া দিবে। এখন এই যোগাভ্যাসেরই ফলের অধিক নিরূপণ করিতেছেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাঽত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।। ১৫ ।।

অনুবাদ ঃ (১৫) এই প্রকারে সর্ব্বদা নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখিলে মন সংযত হইয়া (কর্ম্ম-) যোগীর আত্মাতে স্থিতিশীল এবং শেষে নির্বাণপ্রদ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে লয়প্রদ শান্তি লাভ হয়।

রহস্য ঃ এই শ্লোকে 'সদা' পদের দ্বারা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বলা উদ্দেশ্য নহে ; এইটুকু অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন যথাশক্তি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইহা অভ্যাস করিবে (১০ শ্লোকের রহস্য দেখুন)। বলিয়াছেন যে, এই প্রকার যোগাভ্যাস করিতে থাকিয়া 'মচ্চিত্ত' ও 'মৎপরায়ণ' হও। ইহার কারণ এই যে, পাতঞ্জল যোগ মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি বা ক্রিয়া ; এই কসরতের দ্বারা যদি মন স্বাধীন হইয়া গেল তো ঐ একাগ্র মন ভগবানে না লাগাইয়া অন্য কোন বিষয়েও লাগান যায়। কিন্তু গীতার কথা এই যে, চিত্তের একাগ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়া, এই একাগ্রতা বা সমাধির উপযোগ পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানপ্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইরূপ হইলেই এই যোগ সুখকর হয়, অন্যথা ইহা নিছক ক্লেশপ্রদ হয়। এই অর্থই পরে ২৯শ, ৩০শ এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭শ শ্লোকে আবার আসিয়াছে। পরমেশ্বরে নিষ্ঠা না রাখিয়া যে লোক কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের যোগ, বা ইন্দ্রিয়ের কসরত করে, সেই সব লোকেরা ক্লেশপ্রদ জারণ, মারণ বা বশীকরণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতেই প্রবীণ হইয়া যায়। এই অবস্থা কেবল গীতারই নহে, প্রত্যুত কোন মোক্ষমার্গেরই ইষ্ট নহে। এক্ষণে আবার এই যোগক্রিয়াই অধিক খুলিয়া বলিতেছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ।। ১৬ ।।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ।। ১৭ ।।

অনুবাদ ঃ (১৬) হে অর্জ্জুন ! অতিশয় পেটুক বা অনাহারী এবং অত্যন্ত নিদ্রালু অথবা জাগরণশীলের (এই) যোগ সিদ্ধ হয় না। (১৭) যাহার আহার-বিহার পরিমিত, কর্ম্মের আচরণ মাপা-জোঁকা এবং শোওয়া-জাগা পরিমিত, তাহার (এই) যোগ দুঃখঘাতক অর্থাৎ সুখাবহ হয়।

রহস্য ঃ এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দের পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া এবং 'যুক্ত' শব্দের নিয়মিত, মাপা-জোঁকা অথবা পরিমিত অর্থ। পরেও দুই-এক স্থানে যোগ শব্দের পাতঞ্জলযোগই অর্থ হইতেছে। তথাপি এইটুকু হইতেই এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলযোগই স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে। পূর্ব্বে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং উহার সাধনটুকুরই জন্য পাতঞ্জল-যোগের এই বর্ণনা। এই শ্লোকের "কর্ম্মের উচিত আচরণ" এই শব্দ হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্ম করিতে থাকিয়া এই যোগ অভ্যাস করা চাই। এখন যোগীর অল্প কিছু বর্ণনা করিয়া সমাধিসুখের স্বরূপ বলিতেছেন—

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ।। ১৮ ।।
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ।। ১৯ ।।

অনুবাদ ঃ (১৮) যখন সংযত মন আত্মাতেই স্থির হইয়া যায়, এবং কিছুরই উপভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে না, তখন বলিতেছেন যে, উহা 'যুক্ত' হইয়া গিয়াছে। (১৯) বায়ুরহিত স্থানে রক্ষিত দীপের জ্যোতি যেরূপ নিশ্চল হয়, সেই উপমাই চিত্ত সংযত করিয়া যোগাভ্যাসকারী যোগীকে দেওয়া যায়।

রহস্য ঃ এই উপমার অতিরিক্ত মহাভারতে (শান্তি ৩০০. ৩২. ৩৪) এই দৃষ্টান্ত আছে—, "তৈলপূর্ণ পাত্র সিঁড়িতে লইয়া যাইবার কালে অথবা তুফানের সময় নৌকা রক্ষার জন্য মানুষ যেরূপ 'যুক্ত' অথবা একাগ্র হয়, যোগীর মন সেইরূপই একাগ্র থাকে"। কঠোপনিষদের সারথি ও রথের অশ্বসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত তো প্রসিদ্ধই আছে ; আর যদিও ঐ দৃষ্টান্ত গীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬৮ এবং এই অধ্যায়েরই ২৫শ শ্লোক, এইগুলি ঐ দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়াই উক্ত হইয়াছে। যদিও গীতোক্ত যোগের পারিভাষিক অর্থ কর্ম্মযোগ, তথাপি ঐ শব্দের অন্য অর্থও গীতাতে আসিয়াছে। উদাহরণ যথা, ৯. ৫ এবং ১০. ৭ শ্লোকে যোগের অর্থ "অলৌকিক অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার শক্তি"। ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যোগ শব্দের অনেক অর্থ হওয়ার কারণেই গীতায় পাতঞ্জল যোগ এবং সাংখ্যমার্গকে প্রতিপাদ্য বলিবার সুবিধা ঐ-ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা পাইয়াছেন। ১৯শ শ্লোকে বর্ণিত চিত্ত-নিরোধরূপ পাতঞ্জল-যোগের সমাধির স্বরূপই এখন সবিস্তার বলিতেছেন—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ।। ২০ ।।
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ।। ২১ ।।
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।। ২২ ।।
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ।। ২৩ ।।

অনুবাদ ঃ (২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত যে স্থানে রত হইয়া যায়, এবং যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, (২১) যেখানে (কেবল) বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অত্যন্ত সুখ তাহার অনুভব হয়, এবং যেখানে সে (একবার) স্থির হইয়া তত্ত্ব হইতে কখনও টলে না, (২২) এইরূপ যে স্থিতি পাইলেই তাহা অপেক্ষা অন্য কোন লাভই সে অধিক ভাবে না, এবং যেখানে স্থির হইলে কোনও গুরুতর দুঃখও (তাহাকে) সেখান হইতে বিচলিত করিতে পারে না, (২৩) তাহাকে দুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ 'যোগ' নামক স্থিতি বলা হয় ; এবং এই 'যোগ' এর আচরণ মনকে ব্যস্ত হইতে না দিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক করা চাই।

রহস্য ঃ এই চারি শ্লোকের একই বাক্য। ২৪শ শ্লোকের আরম্ভের 'উহার' (তৎ) এই সর্ব্বনাম হইতে প্রথম তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিষ্ট; এবং চারি শ্লোকে 'সমাধি'র বর্ণনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগসূত্রে যোগের এই লক্ষণ আছে যে, **"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"**—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। ইহারই সদৃশ ২০শ শ্লোকের আরম্ভের শব্দ। এখন এই 'যোগ' শব্দের নূতন লক্ষণ জানিয়া বুঝিয়া দিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্তবৃত্তিনিরোধেরই পূর্ণাবস্থা এবং ইহাকেই 'যোগ' বলে। উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, নিগ্রহকর্ত্তা ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছয় মাসে সিদ্ধ হয় (মৈত্র্যু. ৬. ২৮; অমৃতনাদ. ২৯; মভা. অশ্ব. অনুগীতা ১৯. ৬৬)। কিন্তু পূর্ব্বে ২০শ ও ২৮শ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জল যোগের সমাধিপ্রাপ্ত সুখ কেবল চিত্তনিরোধের দ্বারা নহে, প্রত্যুত চিত্তনিরোধের দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই দুঃখরহিত স্থিতিকেই 'ব্রহ্মানন্দ' বা 'আত্মপ্রসাদজ সুখ' অথবা 'আত্মানন্দ' বলে (গী. ১৮. ৩৭ ও গীতার পৃ. ২০১ দেখুন। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমতা এক পাতঞ্জলযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির এই পরিণাম জ্ঞান ও ভক্তি হইতেও হয়। এই মার্গই অধিক প্রশস্ত ও সুলভ মনে হয়। সমাধির লক্ষণ বলা হইল; এখন বলিতেছেন যে, উহাকে কি প্রকারে লাগানো চাই—

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ঃ (২৪) সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংযত করিয়া (২৫) ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা ধীরে ধীরে শান্ত হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থির করিয়া মনে কোনও বিচার আনিতে দিবে না। (২৬) (এই রীতিতে চিত্তকে একাগ্র করিতে করিতে) চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই-সেই স্থান হইতে রোধ করিয়া উহাকে আত্মার অধীন করিবে।

রহস্য ঃ মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপনিষদে প্রদত্ত রথের উপমা দ্বারা (কঠ. ১. ৩. ৩) সুন্দর ব্যক্ত হয়। যেমন উত্তম সারথি রথের ঘোড়াকে এধারে ওধারে যাইতে না দিয়া সোজা রাস্তায় লইয়া যায়, সেইরূপ প্রযত্নই মনুষ্যকে সমাধির জন্য করিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন মনকে স্থির করিবার অভ্যাস যে করিয়াছে, উপরের শ্লোকের মর্ম্ম শীঘ্রই তাহার বোধগম্য হইবে। মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রযত্ন করিতে লাগ তো সে অন্য দিকে সরিয়া যায়; এবং এই স্বভাব না রোধ করিলে সমাধি লাভ হয় না। এখন, যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত স্থির হওয়ার যে ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাঽত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৭) এই প্রকার শান্তচিত্ত রজোগুণরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত (কর্ম্ম-) যোগীর উত্তম সুখপ্রাপ্তি হয়। (২৮) এই রীতিতে নিরন্তর নিজের যোগাভ্যাসকারী (কর্ম্ম-) যোগী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসংযোগ দ্বারা প্রাপ্ত অত্যন্ত সুখের আনন্দ উপভোগ করে।

রহস্য ঃ এই দুই শ্লোকে আমি যোগীর কর্ম্মযোগী অর্থ করিয়াছি। কারণ কর্ম্মযোগের সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণনা করা হইয়াছে; অতএব পাতঞ্জল-যোগের অভ্যাসকারী উক্ত পুরুষের দ্বারা কর্ম্মযোগীই বিবক্ষিত হইয়াছে। তথাপি যোগীর অর্থ 'সমাধি লাগাইয়া উপবিষ্ট পুরুষ'ও করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহা হইতেও ভিন্ন। এই নিয়মই পরবর্ত্তী দুই-তিন শ্লোকেও লাগিবে। এই প্রকার নির্ব্বাণ ব্রহ্মসুখের অনুভব হইলে পর সকল প্রাণীর বিষয়ে যে আত্মৌপম্যদৃষ্টি হয়, এখন তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) (এই প্রকার) যাহার আত্মা যোগযুক্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টি সম হইয়া যায় এবং সে সর্ব্বত্র দেখে যে আমি সকল প্রাণীর মধ্যে আছি এবং সকল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। (৩০) যে আমাকে (পরমেশ্বর পরমাত্মাকে) সকল স্থানে এবং সকলকে আমাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন হই না এবং সেও আমা হইতে কখনও দূরে যায় না।

রহস্য ঃ এই দুই শ্লোকে প্রথম বর্ণনা 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অব্যক্ত অর্থাৎ আত্মদৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা প্রথমপুরুষ দর্শক 'আমি' পদের প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত অর্থাৎ ভক্তিদৃষ্টিতে করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থ দুইয়ের একই (গীতার, পৃ. ৩৬৮-৩৭১)। মোক্ষ ও কর্ম্মযোগ এই দুয়েরই আধার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য-দৃষ্টিই। ২৯শ শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধাংশ কিছু পৃথক আকারে মনুস্মৃতি (১২. ৯১), মহাভারত (শা ২৩৮. ২১ ও ২৬৮. ২২) এবং উপনিষদেও (কৈব. ১. ১০; ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি গীতারহস্যের ১২শ প্রকরণে সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম ও কর্ম্মযোগের মূল (পৃ. ৩৩২ প্রভৃতি)। এই জ্ঞান ব্যতীত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সিদ্ধ হওয়াও ব্যর্থ এবং এইজন্যই পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান বলা আরম্ভ করিয়াছেন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ঃ (৩১) যে একত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মৈক্য-বুদ্ধিকে মনে রাখিয়া সকল প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে (পরমেশ্বরকে) ভজনা করে, সেই (কর্ম্ম-) যোগী সর্ব্ব-প্রকার ব্যবহার করিয়াও আমাতে থাকে। (৩২) হে অর্জ্জুন! সুখ হৌক্ বা দুঃখ হৌক্, নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার (আত্মৌপম্য) দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র দেখিতে থাকে, সেই (কর্ম্ম-) যোগীকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলা হয়।

রহস্য ঃ 'প্রাণীমাত্রে একই আত্মা' এই দৃষ্টি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ উভয় মার্গে একই প্রকার। এইরূপেই পাতঞ্জলযোগেও সমাধি লাগাইয়া পরমেশ্বরকে জানা হইলে পর এই সাম্যাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগী উভয়েরই সকল কর্ম্মের ত্যাগ ইষ্ট, অতএব তাহারা ব্যবহারে এই সাম্যবুদ্ধির উপযোগ করিবার অবসরই আসিতে দেয় না এবং গীতার কর্ম্মযোগী এরূপ না করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত এই সাম্য-বুদ্ধির ব্যবহারেও নিত্য উপযোগ করিয়া, জগতের সকল কার্য্যই লোকসংগ্রহের জন্য করে ; এই দুয়েতে ইহাই বড় গুরুতর প্রভেদ। এবং এই কারণেই এই অধ্যায়ের শেষে (শ্লোক ৪৬) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, তপস্বী অর্থাৎ পাতঞ্জলযোগী ও জ্ঞানী অর্থাৎ সাংখ্যমার্গী, এই দুইয়ের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা শুনিয়া এখন অর্জ্জুন এই সংশয় করিতেছেন—

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন কহিলেন—(৩৩) হে মধুসূদন! সাম্য অথবা সাম্যবুদ্ধিতে প্রাপ্ত এই যে (কর্ম্ম-) যোগ তুমি বলিয়াছ, আমি দেখিতেছি না যে, (মনের) চঞ্চলতার কারণে উহা স্থির থাকিবে। (৩৪) কারণ হে কৃষ্ণ! এই মন চঞ্চল, জেদী, বলবান ও দৃঢ় ; বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাওয়ার পুঁটলি বাঁধিবার ন্যায়, ইহার নিগ্রহ করা আমি অত্যন্ত দুষ্কর দেখিতেছি।

রহস্য ঃ ৩৩শ শ্লোকের 'সাম্য' অথবা 'সাম্যবুদ্ধি' হইতে প্রাপ্ত, এই বিশেষণ হইতে এস্থলে যোগশব্দের কর্ম্মযোগই অর্থ হইতেছে। যদিও পূর্ব্বে পাতঞ্জলযোগের সমাধির বর্ণনা আসিয়াছে, তথাপি এই শ্লোকে 'যোগ' শব্দে পাতঞ্জলযোগ বিবক্ষিত নহে। কারণ ভগবানই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (২. ৪৮)—"বুদ্ধির সমতা বা সমত্বকে যোগ বলে"। অর্জ্জুনের মুস্কিল স্বীকার করিয়া ভগবান কহিতেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(৩৫) হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মন চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন ; কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাসও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে স্বায়ত্ত করা যায়। (৩৬) আমার মতে, যাহার অন্তঃকরণ বশী-ভূত নহে, তাহার (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন ; কিন্তু অন্তঃ-করণকে বশে রাখিয়া প্রযত্ন করিতে থাকিলে উপায়ের দ্বারা (এই যোগ) প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

রহস্য ঃ তাৎপর্য্য, প্রথমে যে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে সিদ্ধ হইয়া যায়। কোনও কার্য্য বারবার করাকে 'অভ্যাস' বলা হয় এবং 'বৈরাগ্যে'র অভিপ্রায় রাগ বা প্রীতি না রাখা অর্থাৎ ইচ্ছাবিহীনতা। পাতাঞ্জল-যোগসূত্রে আরম্ভেই যোগের লক্ষণ বলাহইয়াছে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে। (এই অধ্যায়েরই ২০শ শ্লোক দেখুন) আবার পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে যে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এই শব্দই গীতাতে আসিয়াছে এবং অভিপ্রায়ও ইহাই ; কিন্তু ইহা হইতেই বলা যায় না যে, গীতাতে এই শব্দ পাতঞ্জলযোগসূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে (গীতার. পৃ ৪৫৪ দেখুন)। এই প্রকার, যদি মনের নিগ্রহ করিয়া সমাধি লাগানো সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের অভ্যাসে যদি এই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন আর একটি এই সংশয় আসে যে, প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে অনেক লোক দুই-এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে পেঁাছিতে পারে না—ফের এই প্রকার লোক এই সিদ্ধি কি করিয়া পাইবে? কারণ এক জন্মে, যতটা সম্ভব ততটা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অভ্যাস করিয়া কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে লাগিলে তো তাহা মৃত্যুকালে অর্দ্ধেকই থাকিয়া যাইবে, এবং পরজন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলে তো আবার পরবর্ত্তী জন্মেও ঐ অবস্থাই হইবে। অতএব অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এবম্বিধ পুরুষ কি করিবে—

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন কহিলেন—(৩৭) হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধা (তো) হউক, পরন্তু (প্রকৃতি-স্বভাবে) সম্পূর্ণ প্রযত্ন অথবা সংযম না হইবার কারণে যাহার মন (সাম্য-বুদ্ধিরূপ কর্ম্ম-) যোগ হইতে বিচলিত হইবে, সে যোগসিদ্ধি না পাইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ? (৩৮) হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! এই পুরুষ মোহগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গে স্থির না হইবার কারণে দুইদিক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় (মধ্য-পথেই) নষ্ট তো হয় না ? (৩৯) হে কৃষ্ণ ! আমার এই সন্দেহ তোমাকেই বিশেষরূপে দূর করিতে হইবে ; তুমি ছাড়া এই সন্দেহ মিটাইবার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া যাইবে না ।

রহস্য ঃ যদ্যপি নঞ্ সমাসে আরম্ভের নঞ্ (অ) পদের সাধারণ অর্থ 'অভাব', তথাপি অনেকবার অল্প অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়, এই কারণে ৩৭শ শ্লোকে 'অযতি' শব্দের অর্থ "অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযত্ন বা সংযমকারী" । ৩৮শ শ্লোকে যে বলা হইয়াছে যে, "দুইদিকের আশ্রয় বিরহিত" অথবা "ইতোভ্রষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ", উহার অর্থও কর্ম্মযোগপ্রধানই করা চাই । কর্ম্মের দুই প্রকার ফল ; (১) কাম্য বুদ্ধিতে কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করিলে তো স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে উহা বন্ধক না হইয়া মোক্ষদায়ক হইয়া যায় । পরন্তু মনুষ্যের এই অসম্পূর্ণ কর্ম্মের স্বর্গাদি কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইপ্রকার হেতুই থাকে না ; এবং সাম্য-বুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে না ; এই জন্য অর্জ্জুনের মনে এই শঙ্কা উৎপন্ন হইল যে, ঐ বেচারীর স্বর্গও লাভ হইল না এবং মোক্ষও লাভ হইল না—কোথাও উহার এইরূপ স্থিতি তো হয় না যে, দুই দিন হইতে পাঁড়ে চলিয়া গেল, কিন্তু হালুয়াও মিলিল না, মণ্ডও মিলিল না ? এই সংশয় কেবল পাতঞ্জল-যোগরূপ কর্ম্মযোগের সাধন সম্বন্ধেই করা হয় না । পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে, কর্ম্মযোগসিদ্ধির জন্য আবশ্যক সাম্যবুদ্ধি কখনো পাতঞ্জলযোগ দ্বারা, কখনো ভক্তি দ্বারা এবং কখনো জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং যেইপ্রকার পাতঞ্জলযোগরূপ এই সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভক্তি বা জ্ঞানরূপ সাধনও এক জন্মে অপূর্ণ থাকিতে পারে । অতএব বলিতে হয় যে, অর্জ্জুনের উক্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মযোগমার্গের সকল সাধনেরই পক্ষে সাধারণ রীতিতে উপযোগী হইতে পারে ।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(৪০) হে পার্থ ! কি এই লোকে এবং কি পরলোকে, এইরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না । কারণ হে তাত ! কল্যাণকর কর্ম্মকর্ত্তা কোনও ব্যক্তির দুর্গতি হয় না । (৪১) পুণ্যকর্ত্তা পুরুষের প্রাপ্য (স্বর্গাদি) লোকসমূহ পাইয়া এবং (সেখানে) বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়া পুনরায় এই যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট পুরুষ পবিত্র শ্রীমান লোকের ঘরে জন্ম লয় ; (৪২) অথবা বুদ্ধিমান (কর্ম্ম-) যোগীদিগেরই কুলে জন্ম লাভ করে । এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় দুর্লভ । (৪৩) উহাতে অর্থাৎ এই প্রকার প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায় ; এবং হে কুরুনন্দন ! সে উহা হইতে ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক (যোগ-) সিদ্ধি পাইবার প্রযত্ন করে । (৪৪) নিজের পূর্ব্বজন্মের ঐ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকিলেও সে (পূর্ণসিদ্ধির দিকে) আকৃষ্ট হয় । যাহার (কর্ম্ম-) যোগের জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়া লইবার ইচ্ছা, হইয়া গিয়াছে সে-ও শব্দব্রহ্মের উপরে চলিয়া যায় । (৪৫) (এইপ্রকার) প্রযত্নপূর্ব্বক উদ্যোগ করিতে করিতে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া (কর্ম্ম-) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া অন্তে উত্তম গতি লাভ করে ।

রহস্য ঃ এই শ্লোকগুলিতে যোগ, যোগভ্রষ্ট এবং যোগী শব্দ কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট এবং কর্ম্মযোগীর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শ্রীমান-কুলে জন্ম লইবার অবস্থা অন্যের ইষ্ট হওয়া সম্ভবই নহে । ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম হইতে, যতটা হওয়া সম্ভব ততটা, শুদ্ধবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগের আচরণ আরম্ভ করিবে । অল্পই কেন হউক না, কিন্তু এই রীতিতে যে কর্ম্ম করা যাইবে তাহাই এই জন্মে না হয় তো পরজন্মে, এই প্রকার অধিক অধিক সিদ্ধি পাইবার জন্য উত্তরোত্তর কারণ হইবে এবং উহা দ্বারাই অন্তে পূর্ণ সদ্গতি লাভ হয় । "এই ধর্ম্মের অল্পও আচরণ করিলে তাহা মহাভয় হইতে রক্ষা করে" (গী. ২. ৪০), এবং "অনেক জন্মের পর বাসুদেবপ্রাপ্তি হয়" (৭. ১৯), এই শ্লোকে এই সিদ্ধান্তেরই পূরক । অধিক বিচার গীতারহস্যের পৃ. ২৪৩-২৪৭ তে করা হইয়াছে । ৪৪শ শ্লোকের শব্দব্রহ্মের অর্থ 'বৈদিক যজ্ঞ-যাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম' । কারণ এই কর্ম্ম বেদবিহিত এবং বেদের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াই ইহা করা যায়, এবং বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম শব্দ অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম । প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব্ব প্রথম সকল কর্ম্মই কাম্য বুদ্ধিতে করে ; কিন্তু এই কর্ম্ম দ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে তেমনই তেমনি পরে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হয় । এই কারণেই উপনিষদে এবং মহাভারতেও (মৈত্রু্য ৬. ২২ ; অমৃতবিন্দু ১৭ ; মভা. শাং. ২৩১ ৬৩ ; ২৬৯. ১) এই বর্ণনা আছে যে—

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

"জানা আবশ্যক যে ব্রহ্ম দুই প্রকার; এক শব্দব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় উহার অতীত (নির্গুণ)। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলে পর আবার ইহার অতীত (নির্গুণ) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়"। শব্দব্রহ্মের কাম্য কর্ম্মের দ্বারা বিরক্ত হইয়া অন্তে লোকসংগ্রহের জন্য এই সকল কর্ম্মেরই প্রয়োজক কর্ম্মযোগের ইচ্ছা হয়, এবং তখন আবার এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কিছু কিছু আচরণ হইতে থাকে। অনন্তর 'স্বল্পারম্ভাঃ ক্ষেমকরাঃ'র ন্যায়েই অল্প আচরণ সেই মনুষ্যকে এই মার্গে ধীরে ধীরে টানিয়া লয় এবং অন্তে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি করাইয়া দেয়। ৪৪শ শ্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, "কর্ম্মযোগ জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইলেও সে শব্দব্রহ্মের উপরে যায়" উহার তাৎপর্য্যও ইহাই। কারণ এই জিজ্ঞাসা কর্ম্মযোগরূপ চরকার মুখ; এবং একবার এই চরকার মুখে লাগিয়া গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পরজন্মে, কখনও-না-কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয় এবং সে শব্দব্রহ্মের অতীত ব্রহ্ম পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া থাকে না। প্রথম প্রথম মনে হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদির একই জন্মে লাভ হইয়া থাকিবে; পরন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহাদেরও এই ফল জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ব্ব সংস্কার হইতেই লাভ হইয়া থাকিবে। হোক; কর্ম্মযোগের অল্প আচরণ, এমন কি, জিজ্ঞাসাও সর্ব্বদাই কল্যাণজনক, ইহার অতিরিক্ত অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিও নিঃসন্দেহে ইহা দ্বারাই হয়; অতএব এখন ভগবান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন যে—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদঃ (৪৬) তপস্বী লোকদিগের অপেক্ষা (কর্ম্ম-) যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী পুরুষদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মকাণ্ডীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধরা যায়; এইজন্য হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও।

রহস্যঃ অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের ক্লেশদায়ক ব্রত দ্বারা অথবা হঠযোগের সাধন দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকদিগকে এই শ্লোকে তপস্বী বলা হইয়াছে; এবং সাধারণত এই শব্দের ইহাই অর্থ। "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং"এ (গী. ৩.৩) বর্ণিত, জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যমার্গ দ্বারা কর্ম্ম ছাড়িয়া সিদ্ধি-প্রাপ্ত সাংখ্যনিষ্ঠ লোকদিগকে জ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার গী. ২. ৪২-৪৪ এবং ৯. ২০-২১এ বর্ণিত, নিছক কাম্যকর্ম্মকর্ত্তা স্বর্গপরায়ণ কর্ম্মঠ মীমাংসকদিগকে কর্ম্মী বলিয়াছেন। এই তিন পন্থার মধ্যে প্রত্যেকে ইহাই বলে যে, আমারই মার্গে সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু এখন গীতার কথা এই যে, তপস্বী হও, বা কর্ম্মঠ মীমাংসক হও বা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গও—শ্রেষ্ঠ। এবং প্রথমে এই সিদ্ধান্তই "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" (গী. ৩. ৮) এবং "কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট" (গী. ৫. ২) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে (গীতারহস্য প্রকরণ ১১. পৃ ২৬৫ ২৬৬)। অধিক কি, তপস্বী, মীমাংসক অথবা জ্ঞানমার্গী ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, 'ইহারই' জন্য পূর্ব্বে যে প্রকার অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, 'যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর' (গী. ২. ৪৮; গীতার পৃ. ৪৯) অথবা যোগ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াও (৪ ৪২), ঐ প্রকারই এখানেও পুনরায় স্পষ্ট

উপদেশ দিয়াছেন যে, "তুমি (কর্ম্ম-) যোগী হও"। যদি এই প্রকার কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ না মানা হয়, তবে "তস্মাৎ তুমি যোগী হও" এই উপদেশের 'তস্মাৎ=এইজন্যই' পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গের টীকাকারদিগের এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব উঁহারা 'জ্ঞানী' শব্দের অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানী শব্দের অর্থ শব্দ-জ্ঞানী অথবা যাহারা কেবল পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানের লম্বাচোড়া বাক্য বিস্তার করে তাহারা। কিন্তু এই অর্থ নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের। এই টীকাকার গীতার এই অর্থ চান না যে, কর্ম্মবিরহিত জ্ঞানমার্গকে গীতা নিম্নস্তরের মনে করেন। কারণ ইহাতে উঁহার সম্প্রদায়ের গৌণতা আসে। এবং এইজন্যই "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" (গী. ৫. ২ এরও অর্থ উঁহারা বদলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিচার গীতারহস্যের ১১শ প্রকরণে করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকের যে অর্থ আমি করিয়াছি, তাহার বিষয়ে এখানে অধিক চর্চ্চা করিতেছি না। আমার মতে ইহা নির্বিবাদ যে, গীতার মতে কর্ম্মযোগ-মার্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন পরের শ্লোকে বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগীদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তারতম্য ভাব দেখা যায়—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদঃ (৪৭) তথাপি সকল (কর্ম্ম-) যোগীর মধ্যেও আমি তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তম সিদ্ধ কর্ম্মযোগী বুঝি, যে আমাতে অন্তঃকরণ রাখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভজনা করে।

রহস্যঃ এই শ্লোকের এই ভাবার্থ যে, কর্ম্মযোগেও ভক্তির প্রেমপূর্ণ মিলন হইলো সেই যোগী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবানই স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (গী. ১২. ১২)। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভক্তির সমুচ্চয়কে শ্রেষ্ঠ বলা এক কথা এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে ব্যর্থ কহিয়া, ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা অন্য কথা। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম ধরণের এবং ভাগবতপুরাণের পক্ষ দ্বিতীয় ধরণের। ভাগবতে (১. ৫. ৩৪) সকলপ্রকার ক্রিয়াযোগকে আত্মজ্ঞানবিঘাতক নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছে—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।

নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মও (ভাগ. ১১, ৩, ৪৬) ভাগবদ্ভক্তি বিনা শোভা পায় না, তাহা ব্যর্থ (ভাগ. ১. ৫. ১২ ও ১২. ১২, ৫২)। ইহা হইতে ব্যক্ত হইবে যে, ভাগবতকারের ধ্যান কেবল ভক্তিরই উপর হইবার কারণে তিনি বিশেষ প্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতারও পরে কি প্রকার দৌড় মারেন। যে পুরাণের নিরূপণ এই বুদ্ধিতে করা হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা হইতে গীতাতেও ভক্তির যেরূপ বর্ণনা হওয়া আবশ্যক সেরূপ হয় নাই; উহাতে যদি উক্ত বচনের সমান আরও কোন বাক্য পাওয়া যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমার তো দেখিতে হইবে গীতার

তাৎপর্য্য, ভাগবতের কথা নহে। উভয়ের প্রয়োজন ও সময়ও বিভিন্ন ; এই কারণে সকল বিষয়ে উহাদের একবাক্যতা করা উচিত নহে। কর্ম্মযোগের সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্য যে সাধনসমূহ আবশ্যক, তন্মধ্যে পাতঞ্জলযোগের সাধনসমূহের এই অধ্যায়ে নিরূপণ করা গিয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিও অন্য সাধন ; পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে ইহার নিরূপণ আরম্ভ করা হইবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সম্বাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।। ৬ ।।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

পূর্ব্বে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগ সাংখ্যমার্গের সমানই মোক্ষপ্রদ কিন্তু স্বতন্ত্র এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং যদি এই মার্গের অল্পও আচরণ করা যায়, তো তাহা ব্যর্থ হয় না ; অনন্তর এই মার্গের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উদ্দেশ্য নিছক বাহ্য ক্রিয়া নহে, যাহার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের এই কসরত করিতে হয়, তাহার এখন পর্য্যন্ত বিচার হয় নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানই অর্জুনকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের এই প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, "কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রু ইন্দ্রিয়সমূহে আপনাদের ঘর প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে" (৩. ৪০, ৪১) এই জন্য প্রথমে তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া এই শত্রুদিগকে মারিয়া ফেল। এবং পূর্ব্ব অধ্যায়ে যোগযুক্ত পুরুষের এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা "জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত" (৬. ৮) যোগযুক্ত পুরুষ "সমস্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে এবং পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণীকে" দেখে (৬. ২৯)। অতএব যখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার বিধি বলিয়া চুকিলেন, তখন ইহা বলা আবশ্যক হইল যে, 'জ্ঞান ও 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে, এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও কর্ম্মযোগমার্গের কোন্ বিধি দ্বারা অন্তে নিঃসন্দিগ্ধ মোক্ষলাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অবধি সতেরো অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত—এগারো অধ্যায়ে—এই বিষয়ের বর্ণনা আছে এবং শেষের অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত কর্ম্মযোগের উপসংহার হইয়াছে। সৃষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেকবিনশ্বর পদার্থে একই অবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন—ইহা বুঝিবার নাম 'জ্ঞান' এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে 'বিজ্ঞান' বলে (গী. ১৩. ৩০), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা ব্যতীত নিজের শরীরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহাকে আত্মা বলে, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া লইলেও পরমেশ্বরের স্বরূপের বোধ হইয়া যায়। এই প্রকারের বিচারকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার বলে। তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর-অক্ষরের বিচার বর্ণনা করিয়া পুনরায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারের বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্যপি পরমেশ্বর এক, তথাপিউপাসনার দৃষ্টিতে উহাতে দুই ভেদ আছে, উহার অব্যক্ত স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য। অতএব এই দুই মার্গ বা বিধিকে এই নিরূপণেই বুঝাইতে হইয়াছে যে বুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বরকে কিরূপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা বা ভক্তি দ্বারা ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করিলে উহা দ্বারা অব্যক্তের জ্ঞান কিরূপে হয়। তখন এই সমুদয় বিচারে যদি এগার অধ্যায় লাগিয়া যায়, তো কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা ব্যতীত এই দুই মার্গে পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহও নিজেই হইয়া যায়, অতএব কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহসম্পাদক পাতঞ্জল যোগমার্গ অপেক্ষা মোক্ষধর্ম্মে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের যোগ্যতাও অধিক মানা যায়। তবুও মনে রাখিও যে, এই সমস্ত বিচার কর্ম্মযোগমার্গ উপপাদনের এক অংশ, উহা স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি এবং তৃতীয় ষড়ধ্যায়ীতে জ্ঞান, এই প্রকার গীতার যে তিন

স্বতন্ত্র বিভাগ করা হয় তাহা তত্ত্বতঃ ঠিক নহে। স্থূলভাবে দেখিলে এই তিন বিষয় গীতাতে আসিয়াছে সত্য, পরন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু কর্ম্মযোগের অঙ্গরূপেই উহার বিচার করা হইয়াছে, এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতারহস্যের চতুর্দ্দশ প্রকরণে (৩৯০-৩৯৫) করা হইয়াছে। এইজন্য এইখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না। এখন দেখিতে হইবে যে সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ ভগবান কি প্রকারে করিতেছেন।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(১) হে পার্থ! আমাতে চিত্ত লাগাইয়া এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া (কর্ম্ম-) যোগের আচরণ করিতে থাকিলে তোমার যে প্রকারে বা যে বিধি দ্বারা আমার পূর্ণ সংশয়বিহীন জ্ঞান হইবে, তাহা শোন। (২) বিজ্ঞানসহ এই পূর্ণ জ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিয়া লইলে এই লোকে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না।

রহস্যঃ প্রথম শ্লোকের "আমাকেই আশ্রয় করিয়া" এই শব্দে এবং বিশেষতঃ 'যোগ' শব্দে প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্যই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্ররূপে বলা হয় নাই (গীতার, পৃঃ ৩৯২-৩৯৩) কেবল এই শ্লোকেই নহে, প্রত্যুত গীতাতে অন্যত্রও কর্ম্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ আসিয়াছে 'মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ' (গী. ১২. ১১), 'মৎপরঃ' (গী. ১৮. ৫৭ এবং ১১. ৫৫); অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যে যোগের আচরণ করিতে গীতা কহিতেছেন, তাহা পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগই। কতকগুলি লোক বিজ্ঞানের অর্থ অনুভবিক ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, পরন্তু উপরের কথানুসারে আমি, জানিতেছি যে, পরমেশ্বর জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ (জ্ঞান) এবং ব্যষ্টিরূপ (বিজ্ঞান) এই দুই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান শব্দেও উহাই অভিপ্রেত (গীতা. ১৩. ৩ আর ১৮. ২০ দেখুন)। দ্বিতীয় শ্লোকের "আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না" এই শব্দ উপনিষদের ভিত্তিতে লওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "যেন··· অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি"—উহা কি, যাহার একটি জানিয়া লইলে সকলই জানিয়া লওয়া যায়? এবং পরে উহার এইরূপ খোলসা করিয়াছেন, "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" (ছাং. ৬. ১. ৪)—হে তাত! যে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ জানিয়া লইলে জানা যায় যে অবশিষ্ট মাটির পদার্থ ঐ মৃত্তিকারই বিভিন্ন নামরূপধারণকারী বিকার অন্য কিছু নহে; ঐ প্রকারই ব্রহ্মকে জানিয়া লইলে অন্য কিছুই জানিবার থাকে না। মুণ্ডক উপনিষদেও (১. ১. ৩) আরম্ভেই এই প্রশ্ন আছে যে, "কস্মিন্নু ভগবো

বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান হইয়া যায়? ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, অদ্বৈত বেদান্তের এই তত্ত্বই এখানে অভিপ্রেত যে, এক পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না; কারণ জগতের মূলতত্ত্ব তো একই, নাম ও রূপের ভেদ উহাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, উহা ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু জগতে নাই-ই। যদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় শ্লোকের প্রতিজ্ঞা সার্থক হয় না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদঃ (৩) হাজার মনুষ্যের মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধির দিকে যত্ন করে, এবং প্রযত্নকারী এই (অনেক) সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে এক-আধ জনই আমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে।

রহস্যঃ মনে রাখিবেন যে, এখানে প্রযত্নকারীকে যদ্যপি সিদ্ধ পুরুষ বলা হইয়াছে, তথাপি পরমেশ্বরে জ্ঞান হইয়া গেলেই উহার সিদ্ধিলাভ হয়, অন্যথা হয় না। পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষরবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এই দুই ভাগ। তন্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরম্ভ করিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ (৪) পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (এই পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত), মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। (৫) ইহা অপরা অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর (প্রকৃতি)। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! ইহা জান যে, ইহা হইতে ভিন্ন, জগতের ধারণশীল পরা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর জীবস্বরূপ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি আছে। (৬) বুঝিয়া রাখ যে, এই দুই হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মূল এবং প্রলয় অর্থাৎ অন্ত আমিই।) (৭) হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে বাঁধা মণিসমূহের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গাঁথা আছে।

রহস্য এই চারি শ্লোকে সমস্ত ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে; এবং পরের শ্লোকসমূহে ইহারই বিস্তার করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রে সমস্ত সৃষ্টির অচেতন অর্থাৎ জড় প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ এই দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই দুই তত্ত্ব হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন—এই দুই ভিন্ন তৃতীয় তত্ত্ব নাই।

পরন্তু গীতায় এই দ্বৈত সমর্থিত হয় নাই ; অতএব প্রকৃতি ও পুরুষকে একই পরমেশ্বর দুই বিভূতি ধরিয়া চতুর্থ পঞ্চম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে জড় প্রকৃতি নিম্ন শ্রেণীর বিভূতি এবং জীব অর্থাৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বিভূতি ; এবং বলিয়াছেন যে, এই দুই হইতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হয় (দেখুন গী. ১৩. ২৬)। তন্মধ্যে জীবভূত শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির সবিস্তার বিচার ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টিতে পূরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে করিয়াছেন। এখন রহিল জড় প্রকৃতি, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে, (দেখুন গীতা ৯. ১০) উহা স্বতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় উহা হইতে সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে। যদ্যপি গীতা প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র মানেন নাই, তথাপি সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির যে ভেদ আছে উহাই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গীতাতে গ্রাহ্য করা হইয়াছে (গীতার. পৃ. ১৫৫ -১৫৯) এবং পরমেশ্বর হইতে মায়া দ্বারা জড় প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর (গী. ৭. ১৪), প্রকৃতি হইতে সমস্ত পদার্থ কিরূপে নির্ম্মিত হয় সাংখ্যের এই বর্ণনা অর্থাৎ গুণোৎকর্ষের তত্ত্বও গীতার মান্য (গীতার. পৃ. ২১০ দেখুন)। সাংখ্যের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ তত্ত্ব হইতেছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি হইতেই তেইশ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই তেইশ তত্ত্ব মধ্যে পাঁচ স্থূল ভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোল তত্ত্ব, শেষ সাত তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অর্থাৎ উহাদের বিকার। অতএব "মূলতত্ত্ব" কতকগুলি, এই বিচার করিবার সময় এই ষোল তত্ত্বকে ছাড়িয়া দেয় ; এবং এইগুলি ছাড়িয়া দিলে বুদ্ধি (মহান্) অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূত) মিলিয়া সাতই মূলতত্ত্ব বাকী থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে এই সাতকেই "প্রকৃতি-বিকৃতি" বলে। এই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি এবং মূলপ্রকৃতি মিলিয়া এখন আট প্রকারেরই প্রকৃতি হইল ; এবং মহাভারতে (শা. ৩১০. ১০-১৫) ইহাকেই অষ্টধা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। পরন্তু সাত প্রকৃতি-বিকৃতির সঙ্গেই মূল প্রকৃতিকে গণনা করা গীতার যোগ্য হয় নাই মনে হয়। কারণ এইরূপ করিলে এই ভেদ দেখানো যায় না যে, এক মূল এবং উহার সাত বিকার। এই কারণেই সাত প্রকৃতি-বিকৃতি এবং মন মিলিয়া অষ্ট প্রকার মূল প্রকৃতি হইয়াছে, গীতার এই বর্গীকরণে এবং মহাভারতের বর্গীকরণে সামান্য ভেদ করা হইয়াছে (গীতার পৃঃ ১৫৯)। সার কথা, যদ্যপি সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতি গীতার স্বীকৃত নহে, তথাপি স্মরণ রাখিবেন যে উহার পরবর্ত্তী বিস্তারের নিরূপণ উভয়েই বস্তুতঃ সমানই করিয়াছেন। গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা আছে যে, সাধারণতঃ পরব্রহ্ম হইতেই—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

"এই (পর-পুরুষ) হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্বের ধাত্রী পৃথ্বী—এই (সমস্ত) উৎপন্ন হয়" (মুণ্ড. ২. ১. ৩ কৈ ১. ১৫ ; প্রশ্ন. ৬. ৪)। অধিক জানিতে হইলে গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণ দেখুন। চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পৃথ্বী, জল প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব আমিই ; এবং এখন এই সকল তত্ত্বে যে গুণ আছে তাহাও আমিই ইহা বলিয়া উপরের এই উক্তির স্পষ্টীকরণ করিতেছেন যে, এই সমস্ত পদার্থ একই সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় গাঁথা আছে—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ঃ (৮) হে কৌন্তেয় ! জলে রস আমি, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা আমি, সকল বেদের মধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার আমি, আকাশে শব্দ আমি এবং সকল পুরুষের পৌরুষ আমি। (৯) পৃথ্বীতে পুণ্য গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধি এবং অগ্নির তেজ আমি। সকল প্রাণীর জীবনশক্তি এবং তপস্বীর তপস্যা আমি। (১০) হে পার্থ ! আমাকে সকল প্রাণীর সনাতন বীজ অবগত হও। বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজও আমি। (১১) কাম-(বাসনা) এবং রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি (এই দুইকে) বর্জন করিয়া বলবান লোকের বল আমি ; এবং হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং ইহা জান যে, যা কিছু সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস ভাব অর্থাৎ পদার্থ আছে, সে সমস্ত আমা হইতেই হইয়াছে ; পরন্তু তাহারা আমাতে আছে, আমি ঐ সকলে নাই। (১৩) (সত্ত্ব, রজ ও তম) এই তিন গুণাত্মক ভাব অর্থাৎ পদার্থ দ্বারা মোহিত হইয়া এই সারা সংসার, ইহা হইতে অতীত (অর্থাৎ নির্গুণ) অব্যয় (পরমেশ্বর) আমাকে জানে না।

রহস্য ঃ "তাহারা আমাতে আছে, আমি ঐ সকলে নাই" ইহার অর্থ বড়ই গম্ভীর। প্রথম অর্থাৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য মণিসমূহে সূত্রের সমান এই পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মও যদ্যপি পরমেশ্বরই বটে, তথাপি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি ইহাতেই চুকিয়া যায় না ; বুঝা আবশ্যক যে, ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়া ইহার পরেও ঐ পরমেশ্বরই আছেন ; এবং এই অর্থই পরে "এই সমস্ত জগতকে আমি একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছি" (গী ১০. ৪২) এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত অন্য অর্থও সর্ব্বদাই বিবক্ষিত থাকে। উহা এই যে, ত্রিগুণাত্মক জগতের নানাত্ব যদিও নির্গুণ আমা হইতে উৎপন্ন দেখা যায়, তথাপি ঐ নানাত্ব আমার নির্গুণ স্বরূপে থাকে না এবং এই দ্বিতীয় অর্থকে মনে রাখিয়া "ভূত-ভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ" (৯. ৪ ও ৫) ইত্যাদি পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে (গী. ১৩. ১৪. ১৬)। এই প্রকারে যদি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি সমস্ত জগত হইতেও অধিক

হয়, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিবার জন্য এই মায়িক জগৎ হইতেও উপরে যাওয়া আবশ্যক, এবং এখন ঐ অর্থই স্পষ্ট প্রতিপাদন করিতেছেন।

মায়া সম্বন্ধে গীতারহস্যের নবম প্রকরণে এই সিদ্ধান্ত আছে যে, মায়া অথবা অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আত্মার নহে; আত্মা তো জ্ঞানময় ও নিত্য। ইন্দ্রিয়সকল উহাকে ভ্রমে ফেলে—ঐ অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। গীতা. ৭. ২৪ এবং গী. র. পৃ. ২০৬-২১৬ দেখুন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ: (১৪) আমার এই গুণাত্মক এবং দিব্য মায়া দুস্তর। অতএব যে আমারই শরণাগত হয়, সেই এই মায়া অতিক্রম করে।

রহস্য: ইহা হইতে প্রকট হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই গীতাতে ভগবান আপনার মায়া বলিতেছেন। মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া শেষে ভগবান বলিয়াছিলেন যে—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

"হে নারদ! তুমি যাহা দেখিতেছ, ইহা আমারই উৎপন্ন মায়া। তুমি আমাকে সকল প্রাণীর গুণের দ্বারা যুক্ত বুঝিও না" (শাং ৩৩৯. ৪৪)। ঐ সিদ্ধান্তই এখন এখানেও বলা হইয়াছে। গীতারহস্যের নবম ও দশম প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, মায়া কি জিনিস।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ: (১৫) মায়া যাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেই মূঢ় ও দুষ্কর্ম্মী নরাধম আসুরী বুদ্ধিতে পড়িয়া আমার শরণাগত হয় না।

রহস্য: ইহা বলা হইয়াছে যে, মায়াতে লিপ্ত লোক পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যায়। এখন এইরূপ যাহারা করে না অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়া তাঁহাতে ভক্তিমান লোকের বর্ণনা করিতেছেন।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ: (১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! চারি প্রকার পুণ্যাত্মা লোক আমাকে ভক্তি করিয়া থাকে—১—আর্ত্ত অর্থাৎ রোগে পীড়িত, ২—জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষী, ৩—অর্থার্থী অর্থাৎ দ্রব্য আদি কাম্য বাসনা মনে যে রাখে, এবং ৪—জ্ঞানী অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হওয়াতে পরে কিছুই প্রাপ্তব্য না থাকিলেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিশীল। (১৭) তন্মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ অনন্যভাবে আমাকে ভক্তিশীল এবং সর্ব্বদাই যুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে অবস্থিত জ্ঞানীর যোগ্যতা বেশী। জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। (১৮) এই সমস্ত ভক্তই উদার অর্থাৎ ভাল, কিন্তু আমার মত এই যে, (ইহাদের মধ্যে) জ্ঞানী তো আমার আত্মাই; কারণ যুক্তচিত্ত হইয়া (সকলের) উত্তমোত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই সে পৌঁছিয়া থাকে। (১৯) অনেক জন্মের পর এই অনুভব হইয়া গেলে যে, "যাহা কিছু আছে, সে সকল বাসুদেবই", জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে। এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

রহস্য: সম্পূর্ণ জগতের মূলীভূত ভগবান নিজ স্বরূপের এই জ্ঞান বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় আমারই স্বরূপ এবং চারিদিকে আমিই একভাবে পূর্ণ করিয়া আছি; ইহার সঙ্গেই ভগবান উপরে এই যে বলিয়াছেন যে, এই স্বরূপকে ভক্তি করিলে পরমেশ্বরকে জানা যায়, ইহার তাৎপর্য্য ভালরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক। উপাসনা সকলেরই আবশ্যক, যেমন চাই ব্যক্তের তেমন চাই অব্যক্তের; কিন্তু ব্যক্তের উপাসনা সুলভ হইবার কারণে এখানে উহারই বর্ণনা হইয়াছে এবং উহারই নাম ভক্তি। তথাপি স্বার্থবুদ্ধিকে মনে রাখিয়া কোনও বিশেষ হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে ভক্তি করা নিম্ন শ্রেণীর ভক্তি। পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইবার হেতুতে ভক্তিশীলকেও (জিজ্ঞাসুকেও) খাঁটি বুঝিতে হইবে; কারণ উহার জিজ্ঞাসুর অবস্থা হইতেই বাহির হয় যে, এখন পর্য্যন্ত উহার পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। তথাপি বলিয়াছেন যে, ইহারা সকলে ভক্তিশীল হইবার কারণে উদার অর্থাৎ ভাল মার্গে যাইতেছে (শ্লো. ১৮)। প্রথম তিন শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা কৃতার্থ হইয়া যাহাদের এই জগতে কিছু করিবার অথবা পাইবার বাকী থাকে না (গী. ৩. ১৭-১৯), এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে যে ভক্তি করে (ভাগ. ১. ৭. ১০) তাহাই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ নারদাদির ভক্তি এই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এবং এই কারণেই ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ "ভক্তিযোগ অর্থাৎ পরমেশ্বরের নির্হেতুক ও নিরন্তর ভক্তি" স্বীকৃত হইয়াছে (ভাগ. ৩. ২৯. ১২; এবং গীতার পৃ. ৫৫২-৫৫৩)। ১৭শ ও ১৯শ শ্লোকের 'একভক্তি' এবং 'বাসুদেব' পদ ভাগবতধর্ম্মের এবং ইহা বলিতেও কোনই ক্ষতি নাই যে, ভক্তের উক্ত সকল বর্ণনাই ভাগবত ধর্ম্মেরই। কারণ মহাভারতে (শাং ৩৪১. ৩৩-৩৫) এই ধর্ম্মের বর্ণনাতে চতুর্ব্বিধ ভক্তের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

চতুর্ব্বিধা মম জনা ভক্তা এবং হি মে শ্রুতম্।
তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈবানন্যদেবতাঃ ॥

অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্ম্মকারিণাম্ ।
যে চ শিষ্টাস্ত্রয়ো ভক্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ ॥
সর্ব্বে চ্যবনধর্ম্মাণস্তে প্রতিবুদ্ধস্তু শ্রেষ্ঠভাক্ ॥

অনন্যদৈবত এবং একান্তিক ভক্ত যে প্রকার নিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারহিত কর্ম্ম করে সেই প্রকার অন্য তিন ভক্ত করে না, তাহারা কোন-না-কোন হেতু মনে রাখিয়া ভক্তি করে, এই কারণেই ঐ চ্যবনশীল এবং একান্তী প্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানী)। এবং পরে বাসুদেব' শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি এই প্রকার আছে—"সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্"—আমি প্রাণীমাত্রে বাস করি এইজন্যই আমাকে বাসুদেব বলে (শাং, ৩৪১. ৪০) ; এখন এই বর্ণনা করিতেছেন যে, যদি সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর হন তবে লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের কি ফল লাভ হয় —

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) আপন-আপন প্রকৃতির নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন (স্বর্গাদি ফলের কাম-বাসনায় পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার) নিয়ম পালন করিয়া অন্য দেবতা-গণের ভজনাতে নিযুক্ত থাকে। (২১) যে ভক্ত যে রূপের অর্থাৎ দেবতার শ্রদ্ধা সহ-কারে উপাসনা করিতে চায় উহার ওই শ্রদ্ধাকেই আমি স্থির করিয়া দিই। (২১) আবার ঐ শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত হইয়া সে ঐ দেবতার আরাধনা করিতে থাকে এবং উহার আমারই নির্ম্মিত কামফল লাভ হয়। (২৩) কিন্তু (এই) অল্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রাপ্ত এই ফল নশ্বর (মোক্ষের ন্যায় স্থির থাকে না)। দেবতার ভজনশীল উহার নিকটে যায় এবং আমার ভক্ত আমার এখানে আসে।

রহস্য ঃ সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, যদ্যপি পরমেশ্বর মোক্ষদাতা তথাপি সংসারের জন্য আবশ্যক অনেক ঈপ্সিত বস্তু দিবার শক্তি দেবতাগণেই আছে এবং উহা প্রাপ্তির জন্য এই দেবতাদিগের উপাসনা করা আবশ্যক। এই প্রকারে যখন এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া যায় যে, দেবতাদের উপাসনা করা আবশ্যক, তখন নিজ নিজ স্বাভাবিক শ্রদ্ধা অনুসারে (গী. ১৭. ১-৬) কেহ বৃক্ষ পূজা করে, কেহ কোন বেদীর পূজা করে এবং কেহ কোন বৃহৎ শিলাকে সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া পূজা করিতে থাকে। এই বিষয়েরই বর্ণনা উক্ত শ্লোকসমূহে সুন্দররূপে করা হইয়াছে ইহার মধ্যে চিন্তাযোগ্য প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে যে, ঐ দেবতাই উহার দাতা ; কিন্তু পর্যায়ক্রমে উহা পরমেশ্বরের পূজা হইয়া যায় (গী. ৯. ২৩) এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঐ ফলও পরমেশ্বরই দিয়া থাকেন (শ্লো, ২২)। কেবল

ইহাই নহে, এই দেবতার আরাধনা করিবার বুদ্ধিও মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে পর-মেশ্বরই দেন (শ্লো. ২১)। কারণ এই জগতে পরমেশ্বরের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। বেদান্তসূত্র (৩. ২. ৩৮-৪১) এবং উপনিষদেও (কৌষী, ৩. ৮) এই সিদ্ধান্তই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অন্তে এক নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়—ইহাই এই ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার উপযোগ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে ফল লাভ হয়, সে সকলই অনিত্য। অতএব ভগবানের উপদেশ এই যে, এই ফলসমূহের আশাতে না ডুবিয়া 'জ্ঞান, ভক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানবের রাখা উচিত। মানিলাম যে, ভগবান সকল বিষয়ের কর্ত্তা ও ফলদাতা, কিন্তু তিনি যাহার যেরূপ কর্ম্ম হইবে তদনুসারেই তো ফল দিবেন (গী. ৪. ১১) ; অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও বলা যায় যে, তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না (গী. ৫. ১৪)। গীতারহস্যের ১০ম (পৃ. ২৩১) এবং ১৩শ প্রকরণে (পৃ. ৩৬৬-৩৬৭) এই বিষয়ের অধিক বিচার আছে, উহা দেখুন। কেহ কেহ ইহা ভুলিয়া যান যে, দেবতারাধনার ফলও ঈশ্বরই দেন এবং তাহারা প্রকৃতি স্বভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পূজায় লাগিয়া যায় ; এখন উপরের এই বর্ণনারই স্পষ্টীকরণ করিতেছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢোঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ (২৪) অবুদ্ধি অর্থাৎ মূঢ় লোক, আমার শ্রেষ্ঠ, উত্তমোত্তম এবং অব্যয় রূপে না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত মানিয়া লয়। (২৫) আমি নিজের যোগ-রূপ মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবার কারণে (আপন স্বরূপে) সকলে প্রকট দেখে না। মূঢ় ব্যক্তি জানেনা যে, আমি অজ ও অব্যয়।

রহস্য ঃ অব্যক্ত স্বরূপ ছাড়িয়া ব্যক্ত স্বরূপ ধারণ করিবার যুক্তিকে যোগ বলে (দেখুন গী. ৪. ৬ ; ৭. ১৫ ; ৯. ৭)। বৈদান্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন ; এই যোগমায়া দ্বারা আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত-স্বরূপধারী হন। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ব্যক্ত সৃষ্টি মায়িক অথবা অনিত্য এবং অব্যক্ত পরমেশ্বর যথার্থ বা নিত্য। কিন্তু কেহ কেহ এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও 'মায়া'র 'অলৌকিক' অথবা 'বিলক্ষণ' অর্থ মানিয়া প্রতি-পাদন করেন যে, এই মায়া মিথ্যা নহে—পরমেশ্বরের সমানই নিত্য। গীতারহস্যের নবম প্রকরণে মায়ার স্বরূপের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি, এই কারণে এখানে এইটুকুই কহিতেছি যে, এই বিষয় অদ্বৈত বেদান্তেরও মান্য যে, মায়া পরমেশ্বরেরই কোন বিলক্ষণ ও অনাদি লীলা। কারণ মায়া যদিও ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন দৃশ্য, তথাপি ইন্দ্রিয়সমূহও পরমেশ্বরেরই সত্তাতে এই কাজ করে, অতএব অন্তে এই মায়াকে পরমেশ্বরের লীলাই বলিতে হয়। বাকী কেবল ইহার তত্ত্বতঃ সত্য বা মিথ্যা হওয়া ; উক্ত শ্লোকসমূহে প্রকাশ হইতেছে এই যে, এ বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যে নামরূপাত্মক মায়া দ্বারা অব্যক্ত পরমেশ্বরকে ব্যক্ত ধরা যায়, সেই মায়া—ফের চাই উহাকে অলৌকিক শক্তি বলুন বা আর কিছু—'অজ্ঞান' হইতে উৎপন্ন দৃশ্য

বস্তু বা 'মোহ', সত্য পরমেশ্বর-তত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক। যদি এরূপ না হয় তবে 'অবুদ্ধি' ও 'মূঢ়' শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সার কথা, মায়া সত্য নহে—সত্য এক পরমেশ্বরই। কিন্তু গীতার কথা এই যে, এই মায়াতে ভুলিয়া থাকিলে লোক অনেক দেবতার ফাঁদে পড়িয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৪. ১০) এই প্রকারই বর্ণনা আছে; সেখানে বলা হইয়াছে যে, যে লোক আত্মা ব্রহ্মকে একই না জানিয়া ভেদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফাঁদে পড়িয়া থাকে, সে 'দেবতাদিগের পশু', অর্থাৎ গবাদি পশু হইতে যেরূপ মানবের লাভ হয়, সেইরূপই এই অজ্ঞানী ভক্ত হইতেও কেবল দেবতাদিগেরই লাভ হয়, তাঁহাদের ভক্তদের মোক্ষলাভ হয় না। মায়াতে মগ্ন হইয়া ভেদভাবে অনেক দেবতার উপাসকের বর্ণনা শেষ হইল। এখন বলিতেছেন যে, এই মায়া হইতে ধীরে ধীরে নিষ্কৃতি কি প্রকারে হয়—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ (২৬) হে অর্জ্জুন! ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ (যাহা হইয়া চুকিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে) সকল প্রাণীকেই আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। (২৭) কারণ হে ভারত! (ইন্দ্রিয়সমূহের) ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন (সুখ-দুঃখ আদি) দ্বন্দ্বের মোহে এই সৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী হে পরন্তপ! ভ্রমে আবদ্ধ হয়। (২৮) কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপের অন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা (সুখ-দুঃখ আদি) দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভক্তি করে।

রহস্য : এই প্রকারে মায়া হইতে মুক্তি হইলে পরে উহার যে স্থিতি হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ : (২৯) (এই প্রকারে) যে আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মরণ অর্থাৎ পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন করেন, সে (সকল) ব্রহ্ম, (সকল) অধ্যাত্ম এবং সকল কর্ম্ম জানিয়া লয়। (৩০) এবং অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহিত (অর্থাৎ এই প্রকার যে, আমিই সব) যে আমাকে জানে, সে যুক্তচিত্ত (হইবার কারণে) মরণকালেও আমাকে জানিয়া থাকে।

রহস্য : পরে অধ্যায়ে অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরণকালে মানুষের মনে যে বাসনা প্রবল থাকে, তদনুসারে উহার পরে জন্ম লাভ হয়; এই সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া অন্তিম শ্লোকে "মরণকালেও" শব্দ আছে; তথাপি উক্ত শ্লোকের 'ও' পদে স্পষ্ট হইতেছে যে, মরণের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান না হইলে কেবল অন্তকালেই এই জ্ঞান হইতে পারে না (গী. ২. ৭২ দেখুন)। বিশেষ বিবরণ পরের অধ্যায়ে আছে। বলা যাইতে পারে যে, এই দুই শ্লোকে অধিভূত আদি শব্দে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রস্তাবনাই করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর ব্রহ্মযোগ

এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত জ্ঞানবিজ্ঞানেরই নিরূপণ হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ, এই যে, পরমেশ্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ বলা হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়া বিচার করিয়াছেন যে উহাতে কি তথ্য আছে। পরন্তু এই বিচার এই শব্দগুলির কেবল ব্যাখ্যা করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে করা হইয়াছে, অতএব এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বাহ্য সৃষ্টি অবলোকন করিয়া, উহার কর্ত্তার কল্পনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া থাকেন। ১—কেহ কেহ বলেন যে সৃষ্টির সকল পদার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার, এবং এই পঞ্চমহাভূত ছাড়িয়া মূলে অন্য কোনও তত্ত্বই নাই। ২—অপর কেহ কেহ, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে, এই সমস্ত জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরমেশ্বর যজ্ঞনারায়ণরূপী, যজ্ঞ দ্বারাই তাঁহার পূজা হয়। ৩—অপর কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, স্বয়ং জড় পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপার করে না ; কিন্তু উহার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন সচেতন পুরুষ বা দেবতা থাকেন, যিনি এই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এই-জন্যই আমার ঐ সকল দেবতার আরাধনা করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের গোলকে সূর্য্য নামধারী যে পুরুষ আছেন তিনিই প্রকাশ করা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন অতএব তিনিই উপাস্য। ৪—চতুর্থ পক্ষের কথা এই যে, প্রত্যেক পদার্থে ঐ পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দেবতার নিবাস মানিয়া লওয়া ঠিক নহে। যেমন মানবশরীরে আত্মা আছে, সেইরূপই প্রত্যেক বস্তুতে ঐ বস্তুরই কোন-না-কোন সূক্ষ্মরূপ অর্থাৎ আত্মার সমান সূক্ষ্ম শক্তি বাস করে, তাহাই উহার মূল এবং প্রকৃত স্বরূপ। উদাহরণার্থ, পঞ্চ স্থূল মহাভূতে সূক্ষ্মতন্মাত্রা এবং হস্তপদাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি মূলভূত থাকে। এই চতুর্থ তত্ত্বেরই উপর সাংখ্যের এই মতও অবলম্বিত যে, প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক্-পৃথক্ এবং পুরুষ অসংখ্য ; পরন্তু জানা যায় যে, এখানে এই সাংখ্যমতের 'অধিদেহ' বর্গে সমাবেশ করা হইয়াছে। উক্ত চারি পক্ষকেই যথাক্রমে অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম বলা হয়। কোনও শব্দের পূর্ব্বে 'অধি' উপসর্গ থাকিলে অর্থ হয়—'তমধিকৃত্য', 'তদ্ বিষয়ক', 'ঐ সম্বন্ধের' বা 'উহাতে স্থিতিশীল'। এই অর্থ অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ত্ব। সাধারণতঃ সেই শাস্ত্রই অধ্যাত্ম উক্ত হয় যেই শাস্ত্র প্রতিপাদন করে যে, সর্ব্বত্র একই আত্মা আছে। কিন্তু এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের ; অর্থাৎ "অনেক বস্তুতে বা মানুষেও অনেক আত্মা আছে" পূর্ব্বপক্ষের এই বাক্যের বিচার করিয়া বেদান্তশাস্ত্র আত্মার একতার সিদ্ধান্তকেই নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বপক্ষের যখন বিচার করিতে হয় তখন স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক পদার্থের সূক্ষ্ম স্বরূপ বা আত্মা পৃথক্ পৃথক্, এবং এস্থলে অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত। মহাভারতে

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহের উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত এবং অধিভূত দৃষ্টিতে একই বিচারের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ কি প্রকারে হয় (দেখুন, মভা. শা. ৩১৩ ; অশ্ব ৪১)। মহাভারতকার কহিতেছেন যে, মানবের ইন্দ্রিয়সমূহের বিচার তিন প্রকারে করা যাইতে পারে, যথা অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত। এই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করা যায়—উদাহরণার্থ হাতের দ্বারা যাহা লওয়া যায়, কাণ দিয়া যাহা শোনা যায়, চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, এবং মন দ্বারা যাহা চিন্তা করা যায়—সে সমস্ত অধিভূত এবং হাত-পা আদির (সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত) সূক্ষ্ম স্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ, এই ইন্দ্রিয়সমূহের অধ্যাত্ম। পরন্তু এই দুই দৃষ্টি ছাড়িয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করিলে অর্থাৎ ইহা স্বীকার করিয়া যে, হাতের দেবতা ইন্দ্র, পায়ের বিষ্ণু, গুহ্যদেশের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, বাণীর অগ্নি, চক্ষুর সূর্য্য, কর্ণের আকাশ অথবা দিক, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃথ্বী, ত্বকের বায়ু, মনের চন্দ্রমা, অহংকারের বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির দেবতা পুরুষ—বলা যাইতে পারে যে, এই দেবতাগণই আপন-আপন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন। উপনিষদেও উপাসনার জন্য ব্রহ্মস্বরূপের যে প্রতীক বর্ণিত আছে, উহাতে মনকে অধ্যাত্ম এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে অধিদৈবত প্রতীক বলা হইয়াছে (ছা. ৩. ১৮. ১)। অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবতের এই ভেদ কেবল উপাসনার জন্যই করা হয় নাই ; কিন্তু এখন এই প্রশ্নের নির্ণয় করিতে হইতেছে যে, বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী, তখন উপনিষদেও (বৃ. ১. ৫. ২১-২৩ ; ছা. ১. ২-৩ ; কৌষী ৪. ১২. ১৩) একবার বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার ঐ ইন্দ্রিয়সমূহেরই দেবতা অগ্নি, সূর্য্য ও আকাশকে লইয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। সারাংশ এই যে, অধিদৈবত, অধিভূত ও অধ্যাত্ম প্রভৃতি ভেদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং পরমেশ্বরের স্বরূপের এই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনার মধ্যে যথার্থ কোনটি এবং উহার তথ্য কি এই প্রশ্নও সেই সময়েরই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩. ৭) যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণিকে বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণীতে, সকল দেবতাতে, সমগ্র অধ্যাত্মে, সকল লোকে, সকল যজ্ঞে এবং সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া উহারা বুঝিতে না পারিলেও, উহাদিগকে নাচাইতেছেন একই পরমাত্মা। উপনিষদের এই সিদ্ধান্তই বেদান্তসূত্রের অন্তর্যামী অধিকরণে আছে (বেসূ ১. ২. ১৮-২০)। সেখানেও সিদ্ধ করা হইয়াছে যে সকলের অন্তঃকরণে স্থিত এই তত্ত্ব সাংখ্যের প্রকৃতি বা জীবাত্মা নহে কিন্তু পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তেরই অনুরোধে ভগবান এখন অর্জ্জুনকে কহিতেছেন যে, মনুষ্যের দেহে, সকল প্রাণীতে (অধিভূত), সকল যজ্ঞে (অধিযজ্ঞ), সকল দেবতাতে (অধিদৈবত), সকল কর্ম্মে এবং সকল বস্তুর সূক্ষ্ম স্বরূপে (অর্থাৎ অধ্যাত্ম) একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন—যজ্ঞ ইত্যাদি নানাত্ব অথবা বিবিধ জ্ঞান প্রকৃত নহে। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অধিভূত আদি যে সকল শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন উহাদের অর্থ জানিবার জন্য অর্জ্জুনের ইচ্ছা হইল ; অতএব তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন কহিলেন—(১) হে পুরুষোত্তম। ঐ ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্মের অর্থ কি? অধিভূত কাহাকে বলা যায় এবং অধিদৈবত কাহাকে বলে? (২) অধিযজ্ঞ কিরূপ হয়? হে মধুসূদন। এই দেহে (অধিদেহ) কে আছেন? এবং অন্তকালে ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী লোক তোমাকে কিরূপে চিনিবে?

রহস্য ঃ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিযজ্ঞ শব্দ পূর্ব্ব অধ্যায়ে আসিয়াছে; ইহা ব্যতীত এখন অর্জ্জুন এই নূতন প্রশ্ন করিতেছেন যে, অধিদেহ কে। ইহার উপর মনোযোগ দিলে পরবর্ত্তী উত্তরের অর্থ বুঝিতে কোন বাধা হইবে না।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(৩) (সকল হইতে) পরম অক্ষর অর্থাৎ সর্ব্বথা অবিনশ্বর তত্ত্ব—ব্রহ্ম, (এবং) প্রত্যেক বস্তুর মূলভাবকে (স্বভাব) অধ্যাত্ম বলা হয়। (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) ভূতমাত্রাদি (চরাচর) পদার্থের উৎপত্তিকারক বিসর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিব্যাপার কর্ম্ম। (৪) উৎপন্ন সকল প্রাণীর ক্ষর অর্থাৎ নামরূপাত্মক নশ্বর স্থিতি অধিভূত; এবং (এই পদার্থে) যে পুরুষ অর্থাৎ সচেতন অধিষ্ঠাতা, তিনিই অধিদৈবত (যাঁহাকে) অধিযজ্ঞ (সকল) যজ্ঞের অধিপতি বলা হয়, তিনি) আমিই। হে দেহধারীদিগের শ্রেষ্ঠ! আমি এই দেহে (অধিদেহ) হইতেছি।

রহস্য ঃ তৃতীয় শ্লোকের 'পরম' শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণ নহে কিন্তু অক্ষরের বিশেষণ। সাংখ্যশাস্ত্রে অব্যক্ত প্রকৃতিকেও 'অক্ষর' বলা হইয়াছে (গী. ১৫. ১৬)। পরন্তু বৈদান্তিকের ব্রহ্ম এই অব্যক্ত এবং অক্ষর প্রকৃতিরও অতীত (এই অধ্যায়ের ২০শ ও ৩১শ শ্লোক দেখুন) এবং এই কারণেই এক 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগে সাংখ্যের প্রকৃতি অথবা দুই অর্থ হইতে পারে। এই সন্দেহ মিটাইবার জন্য 'অক্ষর' শব্দের পরে 'পরম' বিশেষণ রাখিয়া ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (গীতার, পৃ. ১৭৫-১৭৬ দেখুন। আমি 'স্বভাব' শব্দের অর্থ মহাভারতে প্রদত্ত উদাহরণের অনুসারে কোনও পদার্থের 'সূক্ষ্মস্বরূপ' করিয়াছি। নাসদীয় সূক্তে দৃশ্য জগতকে পরব্রহ্মের বিসৃষ্টি (বিসর্গ) বলা হইয়াছে (গী. র. পৃ. ২২০); এবং বিসর্গ শব্দের ঐ অর্থই এখানে লইতে হইবে। বিসর্গের

অর্থ 'যজ্ঞের হবি উৎসর্গ' করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। গীতারহস্যের ১০ম প্রকরণে (পৃ. ২২৮) বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে যে, এই দৃশ্য সৃষ্টিকেই কর্ম্ম কেন বলা হয়। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক বিনশ্বর স্বরূপকে 'ক্ষর' বলা হয়, এবং ইহার অতীত যে অক্ষর তত্ত্ব আছে তাহাকেই ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। 'পুরুষ' শব্দে সূর্য্যের পুরুষ, জলের দেবতা বা বরুণপুরুষ ইত্যাদি সচেতন সূক্ষ্ম দেহধারী দেবতা বিবক্ষিত, এবং হিরণ্যগর্ভেরও উহাতে সমাবেশ হয়। এখানে ভগবান 'অধিযজ্ঞ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, যজ্ঞের বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে যে, "সকল যজ্ঞের প্রভু এবং ভোক্তা আমিই" (দেখুন গী. ৯. ৪. ৫. ২৯; এবং মভা. শা, ৩৪০)। এই প্রকার অধ্যাত্ম আদির লক্ষণ বলিয়া শেষে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, এই দেহে 'অধিযজ্ঞ' আমিই অর্থাৎ মনুষ্যদেহে অধিদেব এবং অধিযজ্ঞ আমিই; প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা (পুরুষ) স্বীকার করিয়া সাংখ্যবাদী বলেন যে উহা অসংখ্য। পরন্তু এই মত বেদান্তশাস্ত্রের মান্য নহে; উহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদ্যপি দেহ অনেক তথাপি আত্মা সকলেতে একই (গীতার পৃ. ১৪৩-১৪৪) 'অধিদেহ আমিই হইতেছি' এই বাক্যে এই সিদ্ধান্তই দেখান হইয়াছে; তথাপি এই বাক্যে "আমিই হইতেছি" শব্দ কেবল অধিযজ্ঞ অথবা অধিদেহকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, উহার সম্বন্ধ অধ্যাত্ম আদি পূর্ব্বপদের সহিতও হইতেছে। অতএব সমগ্র অর্থ এইরূপ হইতেছে যে, অনেক প্রকার যজ্ঞ, অনেক পদার্থে অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহাভূত, পদার্থমাত্রের সূক্ষ্মভাগ অথবা বিভিন্ন আত্মা ব্রহ্ম, কর্ম্ম অথবা ভিন্ন-ভিন্ন মনুষ্যের দেহ—এই সকলেতে 'আমিই আছি', অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বরতত্ত্ব আছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখানে 'অধিদেহ'-স্বরূপের স্বতন্ত্র বর্ণনা হয় নাই, অধিযজ্ঞের ব্যাখ্যাকরণে অধিদেহের পর্য্যায়ক্রমে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি এই অর্থ ঠিক মনে করি না। কারণ কেবল গীতাতেই নহে, প্রত্যুত উপনিষদে এবং বেদান্তসূত্রেও (বৃ. ৩. ৭; বেসূ. ১. ২. ২০) যেখানে এই বিষয় আসিয়াছে, সেখানে অধিভূত আদি স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই শারীর আত্মারও বিচার করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সর্ব্বত্র একই পরমাত্মা আছেন। এইরূপেই গীতাতে যখন অধিদেহের বিষয়ে প্রথমেই প্রশ্ন হইয়া গেল, তখন এখানে উহারই পৃথক উল্লেখ বিবক্ষিত স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। যদি ইহা সত্য হয় যে, যাহা কিছু সমস্ত পরব্রহ্মই, তবে প্রথম-প্রথম এরূপ বোধ হওয়া সম্ভব যে, উহার অধিভূত আদি স্বরূপের বর্ণনা করিবার সময় উহাতে পরব্রহ্মকেও সামিল করিয়া লইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু নানাত্বপ্রদর্শক এই বর্ণনা সেই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে, যাহারা ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতা ও যজ্ঞনারায়ণাদি অনেক ভেদ করিয়া নানাপ্রকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে; অতএব প্রথমে সেই লক্ষণ বলা হইয়াছে, যাহা ঐ সকল লোকের বুদ্ধিগম্য হয় এবং পুনরায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, "এই সকল আমিই হইতেছি"। উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে কোনও সংশয় থাকে না। থাক্; এই ভেদের তত্ত্ব বলা হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য অধিভূত, অধিদৈবত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ এবং অধিদেহ প্রভৃতি অনেক ভেদ করিলেও এই নানাত্ব সত্য নহে; বস্তুত একই পরমেশ্বর

সকলেতে ব্যাপ্ত আছেন। এখন অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, অন্তকালে সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে কিরূপে জানা যায়—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।। ৫ ।।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ।। ৬।।

অনুবাদ : (৫) এবং অন্তকালে যে আমার স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে আমার স্বরূপে নিঃসন্দেহ মিলিয়া যায়। (৬) অথবা হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা জন্মভরই উহাতে আসক্ত থাকিলে মনুষ্য যে ভাবের স্মরণ করিয়া অন্তে শরীর ত্যাগ করে সে সেই ভাবেই মিলিয়া যায়।

রহস্য : পঞ্চম শ্লোকে মরণসময়ে পরমেশ্বরের স্মরণ করার আবশ্যকতা ও ফল বলিয়াছেন। সম্ভবত ইহা হইতে কেহ ইহা বুঝিবে যে, কেবল মরণকালে ইহা স্মরণ করিলেই কাজ চলিয়া যায়। এই হেতুই ষষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে জন্মভর মনে থাকে তাহা মরণকালেও দূর হয় না, অতএব কেবল মরণকালে নহে, প্রত্যুত জন্মভর পরমেশ্বরের স্মরণ এবং উপাসনা করিবার আবশ্যকতা আছে (গীতার. পৃ. ২৪৯)। এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে স্বতই সিদ্ধ হয় যে, অন্তকালে পরমেশ্বরের উপাসক পরমেশ্বরকে পায় এবং দেবতাকে স্মরণকারী দেবতাকে পায় (৭. ২৩ ; ৮. ১৩. এবং ৯. ২৫)। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের কথানুসারে "যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছাং. ৩. ১৪. ১)—এই শ্লোকেই মানবের যেরূপ ক্রতু অর্থাৎ সংকল্প হয়, মরণের পর সে সেইরূপ গতিই লাভ করে। ছান্দোগ্যের সমান অন্য উপনিষদেও এইরূপ বাক্যই আছে (প্র. ৩. ১০ ; মৈত্র্যু. ৪ ৬)। পরন্তু গীতা এখন কহিতেছেন যে, জন্মভর একই চিন্তায় মনকে নিমগ্ন না রাখিলে অন্তকালের যাতনার সময় ঐ চিন্তাই স্থির থাকিতে পারে না। অতএব আমরণান্ত, জীবনভর, পরমেশ্বরের ধ্যান করা আবশ্যক (বেসূ. ৪. ১. ১২)—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্জ্জুনকে ভগবান কহিতেছেন যে,

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।। ৭ ।।
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।। ৮ ।।

অনুবাদ : (৭) এই জন্য সর্ব্বকালে—সর্ব্বদাই—আমার স্মরণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে (যুদ্ধ করিলেও) আমাতেই নিঃসন্দেহ আসিয়া মিলিত হইবে। (৮) হে পার্থ! চিত্তকে অন্য দিকে না যাইতে দিয়া অভ্যাসের সহায়তায় উহাকে স্থির করিয়া দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে থাকিলে মনুষ্য সেই পুরুষেই যাইয়া মিলিত হয়।

রহস্য : যাঁহারা ভগবদ্গীতাতে এই বিষয় প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে

ছাড়িয়া দাও এবং কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন কর, তাঁহাদের সপ্তম শ্লোকের সিদ্ধান্তের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। মোক্ষ তো পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞানযুক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ হয় ; এবং ইহা নির্ব্বিবাদ যে, মরণ সময়েও ঐ ভক্তিকেই স্থির রাখিবার জন্য জন্মভর উহাই অভ্যাস করা চাই। গীতার ইহা অভিপ্রায় নহে যে এইজন্য কর্ম্মকে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক ; ইহার বিরুদ্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে স্বধর্ম্ম অনুসারে যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ভগবদ্ভক্তের সেই সমস্ত নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকা আবশ্যক. এবং ঐ সিদ্ধান্তেই এই শব্দসমূহের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, "আমাকে সর্ব্বদা চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর"। এখন বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে জন্মভর নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মযোগী অন্তকালেও দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা কি প্রকারে করিয়া থাকেন—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ : (৯—১০) যে (মনুষ্য) অন্তকালে (ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ) যোগের সামর্থ্য দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া মনকে স্থির করিয়া দুই ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে ভালরূপে রাখিয়া, কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন, শাস্তা, অণু হইতেও ক্ষুদ্র, সকলের ধাতা অর্থাৎ আধার বা কর্ত্তা, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং অন্ধকারের অতীত, সূর্য্যের সমান দেদীপ্যমান পুরুষকে স্মরণ করে, সেই (মনুষ্য) সেই দিব্য পরম পুরুষেই গিয়া মিলিত হয়। (১১) বেদজ্ঞ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ হইয়া যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করেন, সেই পদ অর্থাৎ ওঁকারব্রহ্ম তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (১২) সকল (ইন্দ্রিয়রূপী) দ্বার সংযত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া (এবং) মস্তকে প্রাণ লইয়া গিয়া সমাধিযোগে স্থিত ব্যক্তি, (১৩) এই একাক্ষর ব্রহ্ম 'ওঁ'এর জপ এবং আমার স্মরণ করিতে করিতে যে (মনুষ্য) দেহত্যাগ করিয়া যায়, তাহার উত্তম গতি লাভ হয়।

রহস্য : ৯—১১ শ্লোকে পরমেশ্বরের স্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা উপনিষদ হইতে গৃহীত। নবম শ্লোকের "অণোরণীয়ান্" পদ এবং শেষ চরণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (শ্বে. ৩. ৮ ও ৯), এবং ১১শ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থতঃ এবং উত্তরার্দ্ধ শব্দশঃ কঠ উপনিষদের (কঠ. ২. ১৫)। কঠ উপনিষদে "তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি" এই চরণের পরে "ওমিত্যেতৎ" স্পষ্ট বলা হইয়াছে ; ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে,

এখানে ১১শ শ্লোকের 'অক্ষর' এবং 'পদ' শব্দের অর্থে ওঁ বর্ণাক্ষররূপী ব্রহ্ম অথবা ওঁ শব্দ লইতে হইবে ; এবং ১৩শ শ্লোক হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, এখানে ওঁকারোপাসনাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (দেখুন প্রশ্ন. ৫)। তথাপি ইহা বলিতে পারি না যে, ভগবানের মনে 'অক্ষর' = অবিনাশী ব্রহ্ম, এবং 'পদ' = পরম স্থান, এই অর্থও হইবে না। কারণ, ওঁ বর্ণমালার এক অক্ষর ইহা ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে, উহা ব্রহ্মের প্রতীকসূত্রে অবিনাশীও বটে (২১শ শ্লোক দেখুন)। এই জন্য ১১শ শ্লোকের অনুবাদে 'অক্ষর' এবং 'পদ' এই দ্বিবিধ অর্থযুক্ত মূল শব্দই আমি রাখিয়া লইয়াছি। এখন এই উপাসনা দ্বারা প্রাপ্তব্য উত্তম গতি বিষয়ে আরও বেশী বলা যাইতেছে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
অস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ : (১৪) হে পার্থ ! অনন্যভাবে সদাসর্ব্বদা যে আমার নিত্য স্মরণ করিতে থাকে, সেই নিত্যযুক্ত (কর্ম্ম-) যোগী আমাকে সুলভ রীতিতে প্রাপ্ত হয়। (১৫) আমাতে মিলিত হইলে পর পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মা দুঃখের আলয় ও অশাশ্বত পুনর্জ্জন্ম পায় না। (১৬) হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত (স্বর্গাদি) যত লোক আছে তথা হইতে (কখন-না-কখন এই লোকে) পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ ফিরিয়া আসা (ঘটে) ; পরন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাতে মিলিত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

রহস্য : ষোড়শ শ্লোকের 'পুনরাবর্ত্তন' শব্দের অর্থ পুণ্য শেষ হইলে ভুলোকে ফিরিয়া আসা (দেখুন গী. ৯. ২১ ; মভা. বন. ২৬০)। যজ্ঞ, দেবতারাধন এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা যদিও ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, সূর্য্যলোক এবং বেশী হয় তো ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি পুণ্যাংশের সমাপ্তি হইলেই সে স্থান হইতে পুনরায় এই লোকে জন্ম লইতে হয় (বৃ. ৪. ৪. ৬), অথবা অন্ততঃ ব্রহ্মলোকের নাশ হইলে পর পুনর্জ্জন্মচক্রে তো নিশ্চয়ই পড়িতে হয়। অতএব উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, উপরে লিখিত সকল গতিই নিম্নস্তরের এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান দ্বারাই পুনর্জ্জন্ম নষ্ট হয়, এই কারণে ঐ গতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (গী. ৯. ২০, ২১)। অন্তে এই যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোকের প্রাপ্তিও অনিত্য, তাহার সমর্থনে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি ও লয় বারম্বার কিরূপে হইতে থাকে—

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ : (১৭) অহোরাত্রের (তত্ত্বতঃ) জ্ঞাতা পুরুষ জানেন যে, (কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ হইয়া থাকে এবং এইরূপ) হাজার (মহা-) যুগে ব্রহ্মদেবের এক দিন হয়, এবং (এইরূপই) হাজার যুগে (উঁহর) এক রাত্রি হয়।

রহস্য : এই শ্লোক ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগমানের হিসাব না দিয়া গীতাতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ অন্যত্র বলিতে হইলে হিসাব করিয়া করা আবশ্যক। এই হিসাব এবং গীতার এই শ্লোকও মহাভারতে (শাং. ২৩১. ৩১) এবং মনুস্মৃতিতে (১. ৭৩) আছে এবং যাস্কের নিরুক্তেও এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে (নিরুক্ত. ১৪. ৯)। ব্রহ্মদেবের দিনকেই কল্প বলে। পরবর্ত্তী শ্লোকে অব্যক্তের অর্থ সাংখ্যশাস্ত্রের অব্যক্ত প্রকৃতি, অব্যক্তের অর্থ পরব্রহ্ম নহে ; কারণ ২০শ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মরূপী অব্যক্ত ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত অব্যক্তের অতীত ও ভিন্ন। গীতারহস্যের ৮ম প্রকরণে (পৃ. ১৬৬) ইহা সম্পূর্ণ খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি কিরূপে হয় এবং কল্পের কালমানের হিসাবও সেখানেই লেখা হইয়াছে—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ : (১৮) (ব্রহ্মদেবের) দিন আরম্ভ হইলে পর অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত (পদার্থ) নির্ম্মিত হয় এবং রাত্রি হইলে পর ঐ পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তেই লীন হইয়া যায়। (১৯) হে পার্থ ! এই সমুদয় ভূতই (এইরূপ) বারবার উৎপন্ন হইয়া অবশ হইয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা হৌক, বা না হৌক, রাত্রি হইলেই লীন হইয়া যায় এবং দিন হইলে পর (পুনরায়) জন্ম গ্রহণ করে।

রহস্য : অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা নিত্য ব্রহ্মলোকবাস প্রাপ্ত হইলেও, প্রলয়কালে ব্রহ্মলোকেরই নাশ হইলে পুনরায় নূতন কল্পের আরম্ভে প্রাণীসকলের জন্মগ্রহণ দূর হয় না। ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য যে একই পথ আছে তাহা বলা হইতেছে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ : (২০) কিন্তু এই উপরে কথিত অব্যক্তেরও অতীত সনাতন অব্যক্ত অপর পদার্থ আছেন, যিনি সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও নষ্ট হন না, (২১) যে অব্যক্তকে 'অক্ষর' (ও) বলে, যাঁহাকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা চরম গতি বলা যায় ; (এবং), যাঁহাকে পাইলে পুনরায় (জন্মে) ফিরে না, (উহাই) আমার পরম স্থান। (২২) হে পার্থ ! যাঁহার মধ্যে (সমস্ত) ভূত আছে এবং যিনি এই সকলকে প্রকাশ করিয়াছেন অথবা ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যভক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হন।

রহস্য : ২০শ ও ২১শ শ্লোক মিলাইয়া একবাক্য করা হইয়াছে। ২০শ শ্লোকের

'অব্যক্ত' শব্দ প্রথমে সাংখ্যের প্রকৃতিকে, অর্থাৎ ১৮শ শ্লোকের অব্যক্ত দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরে ঐ শব্দই সাংখ্যের প্রকৃতির অতীত, পরব্রহ্মের পক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং ২১শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় অব্যক্তকেই 'অক্ষরও' বলা হয়। অধ্যায়ের আরম্ভেও "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" এই বর্ণনা আছে। সারাংশ, 'অব্যক্ত' শব্দের সমানই গীতাতে 'অক্ষর' শব্দেরও দুই প্রকার উপযোগ করা হইয়াছে। কিছু এই নহে যে, সাংখ্যের প্রকৃতিই অব্যক্ত ও অক্ষর : কিন্তু সেই পরমেশ্বর অথবা ব্রহ্মও অক্ষর ও অব্যক্ত যিনি "সকল ভূতের নাশ হইলেও নষ্ট হন না"। ১৫শ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের লক্ষণ বলিতে গিয়া এই যে বর্ণনা হইয়াছে যে, তিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, উহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ঐ স্থানের 'অক্ষর' শব্দ সাংখ্যের প্রকৃতির জন্য উদ্দিষ্ট (দেখুন গী ১৫. ১৬—১৮)। মনে রেখো যে, 'অব্যক্ত' ও 'অক্ষর' দুই বিশেষণের প্রয়োগ গীতাতে কখনও সাংখ্যের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনও প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মের উদ্দেশে করা হইয়াছে (দেখুন গীতার. পৃঃ ১৭৫ ও ১৭৬)। ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ গীতারহস্যের ৯ম প্রকরণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই 'অক্ষর ব্রহ্মের' বর্ণনা হইয়া চুকিয়াছে যে, যে স্থানে পেঁীছিলে মনুষ্য পুনর্জ্জন্মের কষ্ট হইতে মুক্তি পায়। এখন মরণের পর যাঁহাকে ফিরিতে হয় না। (অনাবৃত্তি), এবং যাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া জন্ম লইতে হয় (আবৃত্তি), উহার মধ্যবর্ত্তী সময়ের ও গতির ভেদ বলিতেছেন—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ : (২৩) হে ভারতশ্রেষ্ঠ! এখন তোমাকে আমি সেই কাল বলিতেছি, যে কালে (কর্ম্ম-) যোগী মরণের পর (এই লোকে জন্মিবার জন্য) ফিরিয়া আসে না, এবং (যে কালে মরণের পর) ফিরিয়া আসে। (২৪) অগ্নি, জ্যোতি অর্থাৎ জ্বালা, দিন, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসে মরিলে ব্রহ্মবেত্তা লোক ব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন (ফিরিয়া আসেন না)। (২৫) (অগ্নি) ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ (এবং) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে (মরিলে কর্ম্ম-) যোগী চন্দ্রের তেজে অর্থাৎ লোকে যাইয়া পুণ্যাংশ কমিয়া গেলে পর) ফিরিয়া আসে। (২৬) এই প্রকার জগতের শুক্ল এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রকাশময় এবং অন্ধকারময় দুইটি শাশ্বত গতি স্থির মার্গ আছে। এক মার্গে গমন করিলে পর ফিরিয়া আসিতে হয় না এবং অন্য মার্গে যাইলে ফিরিয়া আসিতে হয়।

রহস্য : উপনিষদে এই দুই গতিকে দেবযান (শুক্ল) এবং পিতৃযান (কৃষ্ণ), অথবা অর্চ্চিরাদি মার্গ এবং ধূম্রাদি মার্গ বলা হয় এবং ঋগ্বেদেও এই মার্গগুলির

উল্লেখ আছে। মৃত মানবের দেহ অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিলে পর, অগ্নি হইতেই এই মার্গের আরম্ভ হইয়া থাকে, অতএব ২৫শ শ্লোকে 'অগ্নি' পদের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইতে অধ্যাহার করিতে হইবে। প্রথম শ্লোকে বর্ণিত মার্গে এবং দ্বিতীয় মার্গে কোথায় ভেদ হইতেছে ইহাই বলা ২৫শ শ্লোকের হেতু ; এই কারণেই 'অগ্নি' শব্দের পুনরাবৃত্তি ইহাতে করা হয় নাই। গীতারহস্যের ১০ম প্রকরণের শেষে (পৃ. ২৫৪-২৫৯) এই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে ; উহা হইতে উল্লিখিত শ্লোকের ভাবার্থ খুলিয়া যাইবে। এখন বলিতেছেন যে এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানিয়া লইলে কি ফল লাভ হয়—

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ : হে পার্থ! এই দুই সৃতি অর্থাৎ মার্গের (তত্ত্বতঃ) জ্ঞাতা কোনও (কর্ম্ম-) যোগী মোহে পড়ে না ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সদা সর্ব্বদা (কর্ম্ম-) যোগযুক্ত হও। (২৮) ইহা (উক্ত তত্ত্বকে) জানিলে বেদ, যজ্ঞ, তপ এবং দানে যে পুণ্যফল বলা হয়, (কর্ম্ম-) যোগী ঐ সমস্ত অতিক্রম করে এবং উহার অতীত আদ্যস্থান প্রাপ্ত হয়।

রহস্য : যে মানুষ দেবযান এবং পিতৃযান দুই মার্গের তত্ত্বকে জানিয়েছেন— অর্থাৎ ইহা জানিয়াছেন যে, দেবযান মার্গে মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে পর পুনরায় পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং পিতৃযান মার্গ স্বর্গপ্রদ হইলেও মোক্ষপ্রদ হয় না— তিনি ইহাদের মধ্যে আপনার যথার্থ কল্যাণকর পথকেই স্বীকার করিবেন, তিনি মোহে নিম্ন শ্রেণীর মার্গ স্বীকার করিবেন না। এই বিষয়কেই লক্ষ্য করিয়া প্রথম শ্লোকে "এই দুই সৃতি অর্থাৎ মার্গের (তত্ত্বতঃ) জ্ঞাতা" এই শব্দ আসিয়াছে। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই :— কর্ম্মযোগী জানেন যে, দেবযান এবং পিতৃযান দুই মার্গের কোন্ মার্গ কোথায় চলিয়াছে এবং এই কারণেই যে মার্গ উত্তম উহাই তিনি স্বভাবতঃ স্বীকার করেন, এবং স্বর্গে যাতায়াত হইতে বাঁচিয়া ইহার অতীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। এবং ২৭শ শ্লোকে তদনুসারে ব্যবহার করিতে অর্জ্জুনকে উপদেশও করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

———

নবম অধ্যায়

রাজযোগ

সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ ইহা দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠাতা পুরুষের পরমেশ্বরবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হইয়া মনের শান্তি অথবা মুক্ত-অবস্থা কি প্রকারে লাভ হয়। অক্ষর ও অব্যক্ত পুরুষের স্বরূপও বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তকালেও ঐ স্বরূপকেই মনে স্থির রাখিবার জন্য পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা সমাধি লাগাইয়া শেষে ওঙ্কারের উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু প্রথমে তো অক্ষরব্রহ্মের জ্ঞান হওয়াই কঠিন, আর পুনরায় উহাতেও সমাধির প্রয়োজন হইলে সাধারণ লোকের এই মার্গই ছাড়িয়া দিতে হইবে! এই মুস্কিলের উপর দৃষ্টি দিয়া এক্ষণে ভগবান এপ্রকার রাজমার্গ বলিতেছেন, যাহা অবলম্বনে সকল লোকের পক্ষে পরমেশ্বরের জ্ঞান সুলভ হইবে। ইহাকেই ভক্তিমার্গ বলে। গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই মার্গে পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জানিবার যোগ্য হয়; এই ব্যক্ত স্বরূপেরই বিস্তৃত নির্দ্ধারণ নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। তথাপি মনে থাকে যেন, এই ভক্তিমার্গও স্বতন্ত্র নহে—কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করা হইয়াছে, উহারই ইহা অংশ। এবং এই অধ্যায়ের আরম্ভও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অঙ্গের দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে।

নবমোঽধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(১) এখন তুমি দোষদর্শী নও, এইজন্য গুহ্য হইতেও গুহ্য বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। (২) এই (জ্ঞান) সমস্ত গুহ্যবিষয়ের মধ্যে রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; ইহা রাজ-বিদ্যা, অর্থাৎ সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, উত্তম ও প্রত্যক্ষ বোধপ্রদ; ইহা আচরণ করিবার পক্ষে সুখজনক, অব্যয় ও ধর্ম্ম্য। (৩) হে পরন্তপ! ইহার উপর অশ্রদ্ধাবান পুরুষ আমাকে পায় না; সে মৃত্যুযুক্ত সংসারের মার্গে ফিরিয়া আসে; (অর্থাৎ তাহার মোক্ষলাভ হয় না)।

রহস্য ঃ গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে (পৃঃ ৩৫৩-৩৫৮) দ্বিতীয় শ্লোকের 'রাজ-বিদ্যা', 'রাজগুহ্য' ও 'প্রত্যক্ষাবগম' পদসমূহের অর্থের বিচার করা হইয়াছে। ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনসমূহকে উপনিষদে 'বিদ্যা' বলা হইয়াছে এবং এই বিদ্যা গুপ্ত রাখ হইত। বলিয়াছেন যে, ভক্তিমার্গ অথবা ব্যক্তের উপাসনারূপ বিদ্যা সকল গুহ্য বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথবা রাজা; ইহার অতিরিক্ত এই ধর্ম্ম চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষগম্য এবং এই কারণেই আচরণ করিবার পক্ষে সহজ। তথাপি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজাদিগের পরম্পরাক্রমেই এই যোগের প্রচার হইয়াছে (গী. ৪. ২), এই জন্য এই মার্গকে রাজাদিগের অর্থাৎ বড়লোকদিগের বিদ্যা—রাজবিদ্যা—বলিতে পার। যে কোন অর্থই গ্রহণ করুন না কেন, ইহা সুস্পষ্ট যে, অক্ষর বা অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হয় নাই কিন্তু রাজবিদ্যা শব্দে এস্থলে ভক্তিমার্গই বিবক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকার আরম্ভেই এই মার্গের প্রশংসা করিয়া ভগবান এক্ষণে উহার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি চ চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন ন ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ (৪) আমি নিজের অব্যক্ত স্বরূপে এই সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। আমাতে সমস্ত ভূত আছে, (পরন্তু) আমি ঐ সকলেতে নাই। (৫) এবং আমাতে সকল ভূতও নাই! দেখ, (ইহা কি প্রকার) আমার ঐশ্বরিক কার্য্য বা যোগসামর্থ্য! ভূতসকলের উৎপাদক আমার আত্মা, উহাদিগকে পালন করিয়াও (ফের) ঐ সকলে নাই! (৬) সর্ব্বত্র বহনশীল মহান বায়ু যে প্রকার সর্ব্বদা আকাশে থাকে, সেই প্রকারই সকল ভূত আমাতে জান।

রহস্য ঃ এই বিরোধাভাস এই জন্য হয় যে, পরমেশ্বর নির্গুণও বটে এবং সগুণও বটে (সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের রহস্য, এবং গীতারহস্য পৃঃ ১৭৯, ১৮২ ও ১৮৩ দেখুন)। এই প্রকারে নিজের স্বরূপের আশ্চর্য্যজনক বর্ণনা করিয়া অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা জাগৃত করিলে পর এক্ষণে ভগবান আবার কিছু ফের-ফারসহ যাহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে পূর্ব্বে করা হইয়াছে সেই বর্ণনাই প্রসঙ্গানুসারে করিতেছেন—অর্থাৎ আমা হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি কি প্রকারে হয় এবং আমার ব্যক্তরূপ কোন্‌টি (গী. ৭ ৪-১৮; ৮. ১৭-২০)। 'যোগ' শব্দের অর্থ যদিও অলৌকিক সামর্থ্য বা যুক্তি করা যায়, তথাপি মনে থাকে যেন, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার এই যোগ অথবা যুক্তিকেই মায়া বলে। এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতা ৭ ২৫ এর টিপ্পনীতে এবং রহস্যের নবম প্রকরণে (পৃ. ২০৫-২০৯) করা হইয়াছে। এই 'যোগ' পরমেশ্বরের অত্যন্ত সুলভ; অধিক কি, ইহা পরমেশ্বরের দাসই, এই জন্য পরমেশ্বরকে যোগেশ্বর (গী. ১৮. ৭৫) বলে। এখন বলিতেছেন যে, এই যোগ-সামর্থ্য দ্বারা জগতের উৎপত্তি ও নাশ কি প্রকারে হয়।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) হে কৌন্তেয় ! কল্পের শেষে সকল ভূত আমার প্রকৃতিতে আসিয়া যুক্ত হয় এবং কল্পের আরম্ভে (ব্রহ্মার দিনের আরম্ভে) ঐ সকল আমিই আবার নির্ম্মাণ করি। (৮) আমি নিজের প্রকৃতিকে হাতে লইয়া (নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ) ভূতসকলের এই সমগ্র সমুচ্চয়কে পুনঃ পুনঃ নির্ম্মাণ করি, যাহা (ঐ) প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া অবশ অর্থাৎ পরতন্ত্র হয়। (৯) (কিন্তু) হে ধনঞ্জয় ! এই (সৃষ্টিনির্ম্মাণের) কার্য্যে আমার আসক্তি নাই, আমি উদাসীনের ন্যায় থাকি, এই কারণে ঐ কর্ম্ম আমার পক্ষে বন্ধক হয় না। (১০) আমি অধ্যক্ষ হইয়া প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি উৎপন্ন করাই। হে কৌন্তেয় ! এই কারণে জগতের এই সৃষ্টি-প্রলয় হইয়া থাকে।

রহস্য ঃ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসয়াছি যে, ব্রহ্মদেবের দিনের (কল্পের) আরম্ভ হইতেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টির নির্ম্মাণ হইয়া থাকে (৮. ১৮)। এখানে ইহাই অধিক খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর প্রত্যেকের কর্ম্মানুসারে তাহাকে ভালমন্দ জন্ম দেন, অতএব তিনি স্বয়ং এই কর্ম্মসমূহে অলিপ্ত। শাস্ত্রীয় প্রতিপাদনে এই সমস্ত তত্ত্বই একই স্থানে বলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু গীতার পদ্ধতি সংবাদাত্মক, এই কারণে প্রসঙ্গ অনুসারে এক বিষয় এখানে একটু এবং ওখানে একটু, এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লোকের মত এই যে, দশম শ্লোকে 'জগদ্বিপরিবর্ত্ততে' পদ বিবর্ত্তবাদ সূচিত করে। কিন্তু 'জগতের সৃষ্টি-বিনাশ করেন,' অর্থাৎ 'ব্যক্ত অব্যক্ত এবং পুনরায় অব্যক্ত ব্যক্ত হইতে থাকে', আমি বুঝি না যে, ইহা অপেক্ষা 'বিপরিবর্ত্ততে' পদের বেশী কিছু অর্থ হইতে পারে। এবং শাঙ্করভাষ্যেও অন্য কোনও বিশেষ অর্থ ব্যাখ্যাত হয় নাই। গীতারহস্যের দশম প্রকরণে বিবেচিত হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা অবশ কি প্রকারে হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ (১১) আমার যে স্বরূপ সকল ভূতের মহান ঈশ্বর, সেই পরম স্বরূপকে মূঢ় লোকে জানে না ; তাহারা আমাকে মানব-তনুধারী মনে করিয়া আমাকে অবহেলা করে। (১২) উহাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক ও চিত্ত ভ্রষ্ট ; উহারা মোহাত্মক রাক্ষস ও আসুর স্বভাব আশ্রয় করিয়া থাকে।

রহস্য ঃ ইহা আসুর স্বভাবের বর্ণনা। এক্ষণে দৈব স্বভাবের বর্ণনা করিতেছেন

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ঃ (১৩) কিন্তু হে পার্থ ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে স্থিত মহাত্মা ব্যক্তি সকল ভূতের অব্যয় আদিস্থান আমাকে চিনিয়া অনন্যভাবে আমার ভজনা করে ; (১৪) এবং যত্নশীল দৃঢ়ব্রত, ও নিত্য যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন ও বন্দনা করিতে থাকিয়া ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করে। (১৫) এই প্রকারেই অপর কোন কোন লোক একত্বে অর্থাৎ অভেদভাবে, পৃথকত্বে অর্থাৎ ভেদভাবে বা নানাবিধ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া আমারই—যে আমি সর্ব্বতোমুখ—উপাসনা করে।

রহস্য ঃ সংসারে প্রাপ্ত দৈব ও রাক্ষসস্বভাব পুরুষের এখানে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তাহার বিস্তার পরে ষোড়শ অধ্যায়ে করা গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াই আসিয়াছি যে, জ্ঞানযজ্ঞের অর্থ "পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বিচার করিয়া, উহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা" (গী. ৪. ৩৩ এর রহস্য দেখুন)। কিন্তু পরমেশ্বরের এই জ্ঞানও দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকারের হইতে পারে ; এই কারণে জ্ঞানযজ্ঞও বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। এই প্রকারে যদিও জ্ঞানযজ্ঞ অনেক হয়, তথাপি ১৫শ শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর বিশ্বতোমুখ হইবার কারণে এই সমস্ত যজ্ঞ তাঁহাতেই পৌঁছায়। 'একত্ব', 'পৃথকত্ব' প্রভৃতি পদের দ্বারা সুস্পষ্ট যে, দ্বৈত-অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় যদিও আধুনিক, তথাপি এই কল্পনাসকল প্রাচীন। এই শ্লোকে পরমেশ্বরের একত্ব ও পৃথকত্ব বলা হইয়াছে, এখন উহারই বেশী আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে পৃথকত্বে একত্ব কি—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ (১৬) ক্রতু অর্থাৎ শ্রৌত যজ্ঞ আমি, যজ্ঞ অর্থাৎ স্মার্ত্ত যজ্ঞ আমি, স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে অর্পিত অন্ন আমি, ঔষধ অর্থাৎ বনস্পতি হইতে (যজ্ঞার্থে) উৎপন্ন অন্ন আমি, (যজ্ঞে হোম করিবার সময়ে পঠিত) মন্ত্র আমি, ঘৃত-অগ্নি এবং (অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত) আহুতি আমিই।

রহস্য ঃ মূলে ক্রতু ও যজ্ঞ দুইটি শব্দ সমানার্থকই। কিন্তু যে প্রকার 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ ব্যাপক হইয়া গিয়াছে এবং দেবপূজা, বৈশ্বদেব, অতিথিসৎকার, প্রাণায়াম ও জপ ইত্যাদি কর্ম্মকেও 'যজ্ঞ' কহিতে থাকে (গী. ৪. ২৩-৩০), সে প্রকার 'ক্রতু' শব্দের অর্থ বাড়িতে পায় নাই। শ্রৌতধর্ম্মে অশ্বমেধ প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞের অংশ

এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহাদের সেই অর্থই পরেও স্থির রহিয়াছে। অতএব শাঙ্কর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এইস্থলে 'ক্রতু' শব্দে 'শ্রৌত' যজ্ঞ এবং 'যজ্ঞ' শব্দে 'স্মার্ত্ত' যজ্ঞ বুঝিতে হইবে ; এবং উপরে আমি সেই অর্থই করিয়াছি। কারণ এইরূপ না করিলে 'ক্রতু' ও 'যজ্ঞ' শব্দ সমানার্থক হইয়া এই শ্লোকে উহাদের অকারণে দ্বিরুক্ত হইবার দোষ ঘটে।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ (১৭) এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (আধার), পিতামহ আমি, যাহা কিছু পবিত্র বা যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা এবং ওঙ্কার, ঋগেদ, সামবেদ, ও যজুর্ব্বেদও আমি, (১৮) (সকলের) গতি, (সকলের) পোষক, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সখা, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি, নিধন এবং অব্যয় বীজও আমি। (১৯) হে অর্জ্জুন। আমি উষ্ণতা প্রদান করি, আমি জলকে অবরোধ করি এবং বর্ষণ করি : অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎও আমি।

রহস্য : পরমেশ্বরের স্বরূপের এইরূপ বর্ণনাই আবার সবিস্তার ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায়ে আছে। তথাপি এস্থলে কেবল বিভূতি না বলিয়া বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন যে, পরমেশ্বর ও জগতের ভূতগণের সম্বন্ধ পিতামাতা ও মিত্র প্রভৃতির সমান ; এই দুই স্থলের বর্ণনায় ইহাই প্রভেদ। দৃষ্টি রেখো যে, জল বর্ষণ করিতে এবং রুদ্ধ করিতে এক ক্রিয়া চাই। আমার দৃষ্টিতেলাভজনকহউক এবং দ্বিতীয়টি ক্ষতিজনক হৌক, তথাপি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উভয় পরমেশ্বরই করেন। এই অভিপ্রায়কেই মনে রাখিয়া পূর্ব্বে (গী. ৭. ১২) ভগবান বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সকল পদার্থ আমিই উৎপন্ন করি ; এবং পরে ১৪শ অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুণত্রয়বিভাগের দ্বারা সৃষ্টিতে নানাত্ব উৎপন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে ২১শ শ্লোকের সৎ ও অসৎ পদের যথাক্রমে 'ভাল' ও 'মন্দ' অর্থ করা যাইতে পারিবে এবং পরে গীতাতে (১৭ ২৬-২৮) একবার এইরূপ অর্থ করাও গিয়াছে। কিন্তু জানা যায় যে, এই শব্দগুলির সৎ =অবিনাশী এবং অসৎ=বিনশ্বর বা নাশবান এই যে সাধারণ অর্থ (গী. ২ ১৬), তাহাই এই স্থানে অভীষ্ট হইবে ; এবং 'মৃত্যু ও অমৃতের' ন্যায় 'সৎ ও অসৎ' দ্বন্দাত্মক শব্দ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত হইতে মনে পড়িয়া থাকিবে। তথাপি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে ; নাসদীয় সূক্তে 'সৎ' শব্দের উপযোগ দৃশ্য সৃষ্টি উপলক্ষে করা হইয়াছে এবং গীতা 'সৎ' শব্দ পরব্রহ্মের প্রতি প্রয়োগ করেন, এবং দৃশ্য সৃষ্টিকে অসৎ বলেন (গীতার. পৃ ২১১-২১৭)। কিন্তু এই প্রকার পরিভাষা ভিন্ন হইলেও 'সং' ও 'অসং' উভয় শব্দের একসঙ্গে যোজনা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহাতে দৃশ্য সৃষ্টি এবং

ব্রহ্ম উভয়ের একত্র সমাবেশ হয়। অতএব এই ভাবার্থও বাহির করা যাইতে পারে পরিভাষাভেদে কাহাকেও 'সৎ' ও 'অসৎ' বলা গেলেও উভয়ই পরমেশ্বরেরই রূপ া দেখাইবার জন্য ভগবান 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের ব্যাখ্যা না দিয়া কেবল বলিয়া য়াছেন যে, 'সৎ' ও 'অসৎ' আমিই (গী. ১১. ৩৭ ও ১৩. ১৩)। এই প্রকারে রমেশ্বরের রূপ অনেক হইলেও এখন বলিতেছেন যে, ঐ সকলের একত্বে উপসনা করা বং অনেকত্বে উপাসনা করা, উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ : (২০) যে ত্রৈবিদ্য অর্থাৎ ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা, সোমপায়ী অর্থাৎ সোমযাজী, ও নিষ্পাপ (পুরুষ) যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে ইন্দ্রের পুণ্যলোকে পৌঁছিয়া স্বর্গে দেবতাদের অনেক দিব্য ভোগ উপভোগ করে। (২১) এবং ঐ বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া, পুণ্যের ক্ষয় হইলে পর (আবার জন্ম লইয়া) মৃত্যুলোকে আসে। এই প্রকারে ত্রয়ীধর্ম্ম অর্থাৎ তিন বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি শ্রৌতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও কাম্য উপভোগের অভিলাষী লোকদিগের (স্বর্গে) যাতায়াত প্রাপ্তি হয়।

রহস্য : এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়া চুকিয়াছে যে, যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম বা নানাপ্রকার দেবতাদিগের আরাধনা দ্বারা কিছুকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাস লাভ হইলেও পুণ্যাংশ শেষ হইলে তাহাদিগকে আবার জন্ম লইয়া ভূলোকে আসিতে হয় (গী. ২০, ৪২-৪৪ ; ৪. ৩৪ ; ৬, ৪১ ; ৭. ২৩ ; ৮. ১৬ ও ২৫)। কিন্তু মোক্ষবিষয়ে এই ঝঞ্ঝাট নাই, উহা নিত্য অর্থাৎ একবার পরমেশ্বরকে লাভ করিলে পুনরায় জন্মমরণের চক্রে আসিতে হয় না। মহাভারতে (বন. ২৬০) স্বর্গসুখের যে বর্ণনা আছে, তাহাও এইরূপই। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি হইতে মেঘ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, অতএব সংশয় হয় যে, ইহা ছাড়িয়া দিলে এই জগতের যোগ-ক্ষেম অর্থাৎ নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে (গী ২, ৪৫ এর রহস্য ও গীতার. ২৫৩ পৃঃ দেখুন) এইজন্য এক্ষণে উপরোক্ত শ্লোকগুলির সঙ্গে মিলাইয়াই ইহার উত্তর দিতেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ (২২) যে অনন্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আমায় চিন্তা করিয়া আমাকে ভজনা করে, সেই নিত্যযোগযুক্ত পুরুষের যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি।

রহস্য : যে বস্তু লাভ হয় নাই, তাহা লাভ করাইয়া দেওয়ার নাম যোগ, এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করা হইল ক্ষেম ; শাশ্বতকোষেও (১০০ ও ২৯২ শ্লোক) যোগক্ষেমের এইরূপই ব্যাখ্যা আছে এবং উহার সম্পূর্ণ অর্থ হইতেছে 'সাংসারিক নিত্য নির্ব্বাহ'। গীতা-রহস্যের ১২শ প্রকরণে (৩৩১-৩৩২ পৃঃ) বিচার করা হইয়াছে যে,

কর্ম্মযোগমার্গে এই শ্লোকের অর্থ কি। নারায়ণীয় ধর্ম্মেও (মভা. শাং. ৩৪৮. ৭২) এই প্রকারই বর্ণনা আছে—

মনীষিণো হি যে কেচিৎ যতয়ো মোক্ষধর্ম্মিণঃ।
তেষাং বিচ্ছিন্নতৃষ্ণানাং যোগ-ক্ষেমবহো হরিঃ ॥

এই পুরুষ একান্ত ভক্ত হইলেও প্রবৃত্তিমার্গীই অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া থাকে। এক্ষণে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের বহুত্ব ধরিয়া সেবাকারীর শেষে কোন্ গতি হয়—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ঃ (২৩) হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে অন্য দেবতাদের ভক্ত হইয়া যাহারা যজন করে, তাহারাও বিধিপূর্ব্বক না হইলেও (পর্য্যায়ভাবে) আমারই যজন করে ; (২৪) কারণ সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও স্বামী আমিই। কিন্তু তাহারা তত্ত্বত আমাকে জানে না, এই জন্য ঐ লোকদের পতন হয়।

রহস্য ঃ গীতারহস্যের ১৩শ প্রকরণে (পৃঃ ৩৬০-৩৬৪) এই বিচার আছে যে, এই দুই শ্লোকের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কি। বৈদিক ধর্ম্মে এই তত্ত্ব বহু পুরাকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে যে, যে কোন দেবতা হৌক, তাহা ভগবানেরই এক স্বরূপ। উদাহরণ যথা, ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬)—পরমেশ্বর এক, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) বলেন এবং এই অনুসারেই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার অনেক বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারই মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে চার প্রকার ভক্তের মধ্যে কর্ম্মী ঐকান্তিক ভক্তকে শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. ১৯এর রহস্য দেখুন) বলিয়া কহিয়াছেন—

ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠং চ যাশ্চান্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রবুদ্ধচর্য্যাঃ সেবন্তো মামেবৈষ্যন্তি যৎপরম্ ॥

"ব্রহ্মা, শিব, অথবা অপরাপর দেবতাদের ভজনশীল সাধু পুরুষও আমাতেই আসিয়া মিলিত হয়েন" (মভা শাং ৩৪১. ৩৫), এবং গীতার উক্ত শ্লোকসমূহের অনুবাদ ভাগবতপুরাণেও করা হইয়াছে (ভাগ. ১০. পূ. ৪০. ৮-১০)। এই প্রকারই নারায়ণীয় উপাখ্যানে পুনরপি উক্ত হইয়াছে—

যে যজন্তি পিতৃন্ দেবান্ গুরূংশ্চৈবাতিথীংস্তথা।
গাশ্চৈব দ্বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং তথা ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিষ্ণুমেব যজন্তি তে।

"দেব, পিতৃগণ, গুরু, অতিথি, ব্রাহ্মণ এবং গো, প্রভৃতির সেবাকারী পর্য্যায় ভাবে বিষ্ণুরই যজন করে" (মভা. শাং. ৩৪৫. ২৬, ২৭)। ভক্তি মুখ্য, দেবতারূপ প্রতীক গৌণ, ভাগবতধর্ম্মে এই প্রকার স্পষ্ট উক্ত হইলেও বিধিভেদ হইলেও উপাসনা তো একই

পরমেশ্বরের হয় ; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভাগবতধর্ম্মী শৈবদের সহিত ঝগড়া করে। যদিও ইহা সত্য যে, যে কোন দেবতার উপাসনা করি না কেন, কিন্তু তাহা পৌঁছায় ভগবানেই তথাপি সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিয়া যায় এবং বিভিন্ন দেবতাদের উপাসকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল দেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ (২৫) দেবতাদিগের ব্রতকর্ত্তা দেবতাদের নিকট, পিতৃদিগের ব্রতকর্ত্তা পিতৃগণের নিকটে, (ভিন্ন ভিন্ন) ভূতসকলের পূজক (ঐ) ভূতসকলের নিকটে যায় ; এবং আমার যজনকারী আমার নিকট আসে।

রহস্য ঃ সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও উপাসনার ফল, প্রত্যেকের ভাবের অনুরূপ ন্যূনাধিক যোগ্যতার উপযোগী পাওয়া যায়। আরও এই পূর্ব্বোক্ত উক্তি ভুলিলে চলিবে না যে, এই ফলদানের কার্য্য দেবতা করেন না—পরমেশ্বরই করেন (গী. ৭. ২০-২৩)। উপরে ২৪শ শ্লোকে ভগবান এই যে কহিয়াছেন "সকল যজ্ঞের ভোক্তা আমিই" উহার তাৎপর্য ইহাই। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্।
স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥

"যে ব্যক্তি যে ভাবে মতি স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলই পায়" (শাং. ৩৫২. ৩), এবং শ্রুতিও আছে "যং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" (গী. ৮. ৬ এর রহস্য দেখুন)। অনেক দেবতার উপাসক (নানাত্বের ভাবে), যে ফল লাভ করে তাহা প্রথম চরণে বলিয়া দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন যে, অনন্যভাবে ভগবানে ভক্তিমানেরই প্রকৃত ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে ভক্তিমার্গের মহত্ত্ববিষয়ক এই তত্ত্ব বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত আমাকে কি সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে না দেখিয়া, কেবল উহার ভাবেরই দিকে দৃষ্টি দিয়া উহার ভক্তি গ্রহণ করেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ঃ (২৬) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথবা (যথাশক্তি) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রযতাত্মা অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্তি-উপহার আমি (আনন্দের সহিত) গ্রহণ করি।

রহস্য ঃ কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (গী. ২. ৪৯)—ইহা কর্ম্মযোগের তত্ত্ব ; ইহার যে রূপান্তর ভক্তিমার্গে হয়, তাহারই বর্ণনা উক্ত শ্লোকে আছে (গীতার. ৪৮১-৪৮৩ দেখুন)। এই বিষয়ে সুদামার তণ্ডুলসমূহের কথা প্রসিদ্ধ এবং এই শ্লোক ভাগবতপুরাণে, সুদামাচরিতের উপাখ্যানেও আসিয়াছে (ভাগ. ১০০ উ. ৮১. ৪)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, পূজার অথবা সামগ্রী ন্যূনাধিক হওয়া সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা মনুষ্যের হাতে থাকে না। এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যথাশক্তি প্রাপ্ত, স্বল্প পূজাদ্রব্যের

দ্বারাই নহে, প্রত্যুত শুদ্ধভাবে সমর্পিত মানসিক পূজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। দেবতা ভাবের ভিখারী, পূজার সামগ্রীর নহে। মীমাংসক-মার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা ইহাই। যাগযজ্ঞ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয় এবং উদ্যোগও অনেক করিতে হয়; কিন্তু—ভক্তিযজ্ঞ এক তুলসীপত্রের দ্বারাও হইয়া যায়। মহাভারতে কথা আছে যে, যখন দুর্বাসা ঋষি ঘরে আসিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত যে প্রকার নিজের কর্ম্ম করেন, অর্জুনকে সেই প্রকারই করিবার উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, ইহা হইতে কি ফল লাভ হয়—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৭) হে কৌন্তেয়? তুমি যাহা (কিছু) করিতেছ, যাহা খাইতেছ, যাহা হোম-হবন করিতেছ, যাহা দান করিতেছ (এবং) যাহা তপস্যা করিতেছ, সে (সমস্ত) আমাতে অর্পণ কর। (২৮) এইভাবে চলিলে (কর্ম্ম করিয়াও) কর্ম্মের শুভ-অশুভ ফলরূপ বন্ধনসমূহ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং (কর্ম্মফলের) সন্ন্যাস করিবার এই যোগের দ্বারা যুক্তাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণ হইয়া মুক্ত হইয়া যাইবে এবং আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

রহস্য ঃ ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবদ্ভক্তও কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবে, উহা ছাড়িয়া দিবে না। এই দৃষ্টিতে এই দুইটি শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইহা জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ত্ব (গী. ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির পরিভাষা অনুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৩৬৮ ও ৩৬৯)। তৃতীয় অধ্যায়েই অর্জুনকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য" (গী. ৩. ৩০) —আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যস্ত করিয়া—যুদ্ধ কর; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত কর্ম্মকর্ত্তাতে কর্ম্মের লেপ লাগে না" (৫. ১০)। গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস (গী. ১৮. ২)। এই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মফলাশা ছাড়িয়া (সন্ন্যাস) সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষই 'নিত্যসন্ন্যাসী' (গী. ৫. ৩); কর্ম্ম-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গীতার সম্মত নহে। অনেকস্থলে বলিয়া চুকিয়াছি যে, এই রীতিতে কৃত কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী, ২. ৬৪ ৩. ১৯; ৪. ২৩; ৫ ১২; ৬. ১; ৮. ৭), এবং এই ২৮শ শ্লোকে ঐ বিষয়ই পুনরায় বলিয়াছেন। ভাগবতপুরাণেও প্রহ্লাদকে নৃসিংহরূপ ভগবান এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্ম্মাণি মৎপরঃ"—আমাতে চিত্ত লাগাইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া যাও (ভাগ, ৭. ১০. ২৩), এবং পরে একাদশ স্কন্ধে ভক্তিযোগের এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত কর্ম্ম নারায়ণার্পিত করিবে (ভাগ, ১১. ২. ৩৬ এবং ১১. ১১ ২৪)। এই অধ্যায়ের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিমার্গ সুখজনক ও সুলভ। এখন উহার সমান অন্য বৃহৎ বিশেষ গুণ বর্ণনা করিতেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) আমি সকলের নিকট এক। আমার (কেহ) দ্বেষ্য অর্থাৎ অপ্রিয় নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই। ভক্তিপূর্ব্বক যে আমার ভজনা করে, সে আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি। (৩০) অত্যন্ত দুরাচারীই হোক না কেন, যদি সে আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে তবে তাহাকে অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে। (৩১) সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি ভালরূপ জান যে, আমার ভক্ত (কখনও) নষ্ট হয় না।

রহস্য ঃ ৩০শ শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ বুঝিবে না যে, ভগবদ্ভক্ত দুরাচারী হইলেও সে ভগবানের প্রিয়ই থাকে। ভগবান এইটুকুই বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে কোন মনুষ্য দুরাচারী থাকিলেও, যখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের ভজনাকরণে দাঁড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও দুষ্কর্ম্ম হইতে পারে না; এবং সে ধীরে ধীরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া সিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকথা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৬. ৪৪.) এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কর্ম্মযোগ জানিবার কেবল ইচ্ছা হইলেই, নাচার হইয়া, মনুষ্য শব্দব্রহ্মের উপরে চলিয়া যায়, এখন উহাই ভক্তিমার্গের উপযোগী দেখাইয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়া বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥
কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ (৩২) কারণ হে পার্থ। আমার আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা (অন্ত্যজ প্রভৃতি) যাহারা পাপযোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে। (৩৩) তখন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও রাজর্ষি (ক্ষত্রিয়-) দের বিষয় কি আর বলিব? তুমি এই অনিত্য ও অসুখ অর্থাৎ দুঃখজনক (মৃত্যু-) লোকে আছ, এই কারণে আমার ভজনা কর।

রহস্য ঃ ৩২শ শ্লোকের 'পাপযোনি' শব্দকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া কোন কোন টীকাকার বলেন যে, উহা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ পূর্ব্বে কিছু-না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য বা শূদ্রজন্ম লাভ করে না। তাঁহাদের মতে পাপযোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলিবার জন্য স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র উদাহরণের জন্য দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। পাপযোনি

শব্দে আজকাল রাজদরবারে যাহাদিগকে "জরায়ম-পেশা কৌম" বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত ; এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে, এই জাতীয় লোকেরাও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র কিছু এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত নহে ; উহাদিগের মোক্ষলাভে এইটুকুই বাধা যে উহারা বেদ শুনিবার অধিকারী নহে। এই কারণে ভাগবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥

"স্ত্রীলোক, শূদ্র অথবা কলিযুগের নামেমাত্র ব্রাহ্মণ. ইহাদের কর্ণে বেদ পৌঁছায় না, এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাস মুনি কৃপাপরবশ হইয়া উহাদের কল্যাণার্থ মহাভারত—অর্থাৎ গীতাও—রচনা করিলেন" (ভাগ. ১. ৪. ২৫)। ভগবদ্গীতার এই শ্লোক কিছু পাঠভেদে অনুগীতাতেও পাওয়া যায় (মভা. অশ্ব. ১৯. ৬১, ৬২)। জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি, অথবা কৃষ্ণ-গৌর বর্ণ প্রভৃতি কোনও ভেদ না রাখিয়া সকলকে একই ভাবে সদ্গতিদানে সমর্থ ভগবদ্ভক্তির এই রাজমার্গের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব এই দেশের বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সন্তমণ্ডলীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে পারিবেন। উল্লিখিত শ্লোকের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহস্যের ৩৭৬-৩৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই প্রকার ধর্ম্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ তম শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই চলিয়াছে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৪) আমাতে মন লাগাও. আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে আমাকেই পাইবে।

রহস্য ঃ বস্তুতঃ এই উপদেশ ৩৩ তম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ৩৩ তম শ্লোকে 'অনিত্য' পদ অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রকৃতির বিস্তার অথবা নামরূপাত্মক দৃশ্য-সৃষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য ; এবং 'অসুখ' পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক। তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের। অতএব ভগবান পরব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'আমাকে ভজনা কর, আমাতে মন লাগাও, আমাকে নমস্কার কর', এইরূপ ব্যক্ত স্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের শেষ উক্তি এই যে, হে অর্জ্জুন ! এই প্রকার ভক্তি করিয়া মৎপরায়ণ হইবার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক তবে (গী. ৭. ১) তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে। এই উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে করা হইয়াছে। গীতার রহস্যও ইহাই। প্রভেদ এইটুকু যে, ঐ রহস্যকে একবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনার যে রাজমার্গ উক্ত হইয়াছে তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া চলিয়াছে ; এবং অর্জ্জুনের প্রশ্নের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথবা বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দর্শনের অভিলাষ হইল ; অতএব ১১শ অধ্যায়ে ভগবান তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—(১) হে মহাবাহু ! (আমার কথায়) সন্তুষ্ট তোমাকে, তোমার হিতার্থে আমি আমার (এক) ভাল কথা বলিতেছি, তাহা শোন। (২) দেবতারা এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না ; কারণ দেবতাদের এবং মহর্ষিদের সর্ব্বপ্রকারে আমিই আদি কারণ। (৩) যে জানে যে, আমি (পৃথিবী আদি সমস্ত) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই ; মনুষ্যমধ্যে সে-ই মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

রহস্য ঃ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে এই বিচার দেখা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্ম দেবতাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, দেবতা পরে হয়েন (গীতার, প্র, ৯, পৃঃ ২২০ দেখুন)। এই প্রকার প্রস্তাবনা হইয়া গিয়াছে। এখন ভগবান ইহার নিরূপণ করিতেছেন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে হইলাম—

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি) অভাব (নাশ) ভয়, অভয়, (৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি (সন্তোষ), তপ, দান, যশ ও অযশ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীমাত্রের ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়।

রহস্য ঃ 'ভাব' শব্দের অর্থ 'অবস্থা', 'স্থিতি', বা 'বৃত্তি' এবং সাংখ্যশাস্ত্রে 'বুদ্ধির ভাব এবং 'শারীরিক ভাব' এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে অকর্ত্তা এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন যে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অবস্থিত বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা অথবা ভাবই (গীতার ১৬৬ পৃঃ ও সা. কা. ৪০-৫৫) ; এবং উপরের দুই শ্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তীদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মারূপ এক নিত্য তত্ত্ব আছেন এবং (নাসদীয় সূক্তের উক্তি অনুসারে) তাঁহারই মনে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হয় ; এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির মায়াত্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রহ্মের মানসভাব (পরের শ্লোক দেখুন)। তপস্যা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তন্নিষ্ঠ বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান আরও বলিতেছেন যে—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ।। ৬ ।।

অনুবাদ ঃ (৬) সাত মহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি এবং মনু, আমারই মানস, অর্থাৎ মন হইতে নির্ম্মিত ভাব, যাঁহাদের হইতে (এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে।

রহস্য ঃ যদিও এই শ্লোকের শব্দ সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে টীকাকারদিগের মধ্যে অনেকরই মতভেদ আছে। বিশেষতঃ অনেকে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী' (পূর্বে) এবং 'চার' (চত্বারঃ) পদের অন্বয় কোন্ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণয় কয়েক প্রকারে করিয়াছেন। সাত মহর্ষি প্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বন্তর (গীতার ১৬৭ পৃঃ) হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বন্তরের মনু, দেবতা এবং সপ্তর্ষি বিভিন্ন (হরিবংশ ১. ৭ ; বিষ্ণু. ৩. ১ ; এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই 'পূর্ব্ববর্ত্তী' শব্দকে সাত মহর্ষির বিশেষণ মানিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী, চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি এখানে বিবক্ষিত। এই সপ্তর্ষির নাম ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষ্ণু। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকালকার—বৈবস্বত অথবা যে মন্বন্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার—পূর্ব্ববর্ত্তী মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদিগের বিষয়ে বলিবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব বর্ত্তমান মন্বন্তরেরই সপ্তর্ষিদিগকে লইতে হইবে। মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের নারায়ণীয় উপাখ্যানে ইঁহাদিগের এই নাম আছে,—মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বসিষ্ঠ (মভা. শা. ৩৩৫. ২৮, ২৯ ; ৩৪০. ৬৪ ও ৬৫) ; এবং আমার মতে এস্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীতাতে নারায়ণীয় অথবা ভাগবতধর্ম্মই বিধিসহ প্রতিপাদ্য (গীতার. পৃঃ ৭-৮ দেখুন)। তথাপি এখানে এটুকু বলা আবশ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে অঙ্গিরসের বদলে ভৃগুর নাম পাওয়া যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো বর্ণিত হইয়াছে যে কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং বসিষ্ঠ বর্ত্তমানযুগের সপ্তর্ষি (বিষ্ণু, ৩. ১. ৩২ ও ৩৩ ; মৎস্য, ৯. ২৭ ও ২৮ ;

মভা. অনু. ৯৩. ২১)। মরীচি প্রভৃতি উপরোক্ত সাত ঋষির মধ্যেই ভৃগু ও দক্ষকে যুক্ত করিয়া বিষ্ণুপুরাণে (১. ৭. ৫. ৬) নয় মানস পুত্র এবং ইঁহদেরই মধ্যে নারদকেও জুড়িয়া মনুস্মৃতিতে ব্রহ্মদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হইয়াছে (মনু. ১. ৩৪. ৩৫)। এই মরীচি প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ভারতে করা হইয়াছে (মভা. অনু. ৮৫)। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত মহর্ষি কে কে, এই কারণে এই নয়-দশ মানসপুত্রের, অথবা ইঁহাদের নামের ব্যুৎপত্তির বিচার করা এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী' এই পদের অর্থে 'পূর্ব্ব মন্বন্তরের সাত মহর্ষি' লাগানো যায় না। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' এই শব্দকে মনুর বিশেষণ ধরিয়া কয়েকজন যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। মোটে চৌদ্দ মন্বন্তর আছে এবং ইহাদের চৌদ্দ মনু আছে ; তন্মধ্যে সাত সাতটি ধরিয়া দুই বর্গ হয়। প্রথম সাতটির নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত, এবং এই স্বায়ম্ভুব প্রভৃতিকে মনু বলা হয় (মনু. ১. ৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে ছয় মনু হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনু চলিতেছে। ইহা শেষ হইলে পরে যে সাত মনু আসিবে (ভাগ. ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে সাবর্ণি মনু বলে ; তাহাদের নাম সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বিষ্ণু ৩. ২ ; ভাগ. ৮. ১৩ ; হরিবংশ ১. ৭)। এই প্রকার, প্রত্যেক মনুর সাত-সাত হইলে পর, কোন কারণ দেখানো যায় না যে, কোনও বর্গের 'পূর্ব্ববর্ত্তী 'চার'ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত হইবে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৪. ১) কথা আছে যে, সাবর্ণি মনুদিগের মধ্যে প্রথম মনুকে ছাড়িয়া পরবর্ত্তী চার অর্থাৎ দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম ও রুদ্রসাবর্ণি একই সময়ে উৎপন্ন হয় ; এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি মনুই গীতাতে বিবক্ষিত। কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল সাবর্ণি মনু ভবিষ্যতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূতকালদর্শক পরবর্ত্তী বাক্য "যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজা হইয়াছে" ভাবী সাবর্ণি মনুদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' শব্দের সম্বন্ধ 'মনু' পদের সহিত যুক্ত করা ঠিক নহে। অতএব বলিতে হয় যে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' এই দুই শব্দ স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রাচীনকালের কোন চার ঋষি অথবা পুরুষকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং এই প্রকার মানিয়া লইলে এই প্রশ্ন সহজেই উঠে যে, এই পূর্ব্ববর্ত্তী চার ঋষি বা পুরুষ কাহারা? যে টীকাকারেরা এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার (ভাগবত. ৩. ১২. ৪) ইহাঁরাই ঐ চার ঋষি। কিন্তু এই অর্থ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, যদিও এই চার ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তথাপি ইঁহারা সকলেই জন্মাবধিই সন্ন্যাসী হইবার কারণে প্রজা-বৃদ্ধি করেন নাই এবং এইজন্য ব্রহ্মা ইঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন (ভাগ. ৩. ১২ ; বিষ্ণু. ১. ৭) অর্থাৎ "যাঁহাদের হইতে এই লোকে এই প্রজা উৎপন্ন হয়—যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ এই বাক্য এই চারি ঋষিদের প্রতি মোটেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত কোন কোন পুরাণে যদিও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ঋষি চারজনই ছিলেন ; তথাপি ভারতের নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে যে, এই চারজনের সঙ্গে সন, কপিল ও সনৎসুজাতকে যুক্ত করিয়া লইলে যে সাত ঋষি

হন, উঁহারা সকলে ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং উহাঁরা প্রথমাবধিই নিবৃত্তিপন্থী ছিলেন (মভা. শা. ৩৪০. ৬৭. ৬৮)। এই প্রকারে সনক প্রভৃতি ঋষিদিগকে সাত ধরিয়া লইলে কোন কারণ দেখা যায় না যে, ইঁহাদের মধ্যে চারই কেন ধরা হইবে। আর, 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' কাহারা? আমার মতে এই প্রশ্নের উত্তর নারায়ণীয় অথবা ভাগবতধর্ম্মের পৌরাণিক কথা হইতেই দেওয়া উচিত। কারণ ইহা নির্ব্বিবাদ যে, গীতাতে ভাগবত-ধর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন যদি দেখি যে ভাগবতধর্ম্মে সৃষ্টির উৎপত্তির কল্পনা কিরূপ ছিল, তবে সন্ধান লাগিবে যে, মরীচি আদি সাত ঋষির পূর্ব্বে বাসুদেব (আত্মা), সঙ্কর্ষণ (জীব), প্রদ্যুম্ন (মন), এবং অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) এই চার মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল ; এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইঁহাদের মধ্যে পরবর্ত্তী অনিরুদ্ধ হইতে অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে বা ব্রহ্মদেব হইতে মরীচি প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয় (মভা. শা. ৩৩৯. ৩৪-৪০ এবং ৬০-৭২ ; ৩৪০২. ২৭-৩১)। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চার মূর্ত্তিকে 'চতুর্ব্যূহ' বলে ; এবং ভাগবতধর্ম্মের এক পন্থার মত এই যে, এই চার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র ছিল এবং অপর কোন কোন লোক ইহাদের মধ্যে তিন অথবা দুইকেই প্রধান বলেন। কিন্তু এই কল্পনা ভগবদ্গীতার মান্য নহে ; আমি গীতারহস্যে (পৃ. ১২৭ এবং ৪৬০-৪৬১) দেখাইয়াছি, যে গীতা একব্যূহপন্থী, অর্থাৎ একই পরমেশ্বর হইতে চতুর্ব্যূহ আদি যাহা কিছু সমস্তেরই উৎপত্তি স্বীকার করেন। অতএব ব্যূহাত্মক বাসুদেব প্রভৃতি মূর্ত্তিসমূহকে স্বতন্ত্র না মানিয়া এই শ্লোকে দেখাইয়াছেন যে, এই চার ব্যূহে একই পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের (গী. ৭. ১৯) 'ভাব'। এই দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যাইবে যে, ভগবতধর্ম্ম অনুসারে 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' এই শব্দের প্রয়োগ সপ্তর্ষির পূর্ব্বে উৎপন্ন বাসুদেব প্রভৃতি চতুর্ব্যূহের প্রতি করা হইয়াছে। ভারতেই লিখিত আছে যে, ভাগবতধর্ম্মের চতুর্ব্যূহ প্রভৃতি ভেদ পূর্ব্বাবধিই প্রচলিত ছিল (মভা. শা. ৩৪৮. ৫৭) ; এই কল্পনা কিছু আমারই নূতন নহে। সার কথা, ভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যান অনুসারে আমি এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ লাগাইয়াছি ঃ— 'সাত মহর্ষি' অর্থাৎ মরীচি প্রভৃতি, 'পূর্ব্ববর্ত্তী চার' অর্থাৎ বাসুদেব প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ, এবং 'মনু' যিনি ঐ সময়ের পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান, সমস্ত মিলাইয়া স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি সাত মনু। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার প্রভৃতি চার মূর্ত্তিকে পরমেশ্বরের পুত্র মানিবার কল্পনা ভারতে এবং অন্য স্থানেও পাওয়া যায় (মভা. শা. ৩১১. ৭. ৮)। পরমেশ্বরের ভাবসমূহের বর্ণনা হইয়া চুকিল ; এখন বলিতেছেন যে এই সমস্ত জানিয়া উপাসনা করিলে কি ফল লাভ হয়

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) যে আমার এই বিভূতি অর্থাৎ বিস্তার, এবং যোগ অর্থাৎ বিস্তার করিবার শক্তি বা সামর্থ্যের তত্ত্ব জানে, তাহার নিঃসন্দেহ স্থির (কর্ম্ম) যোগ লাভ হয়। (৮) আমি সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতে সকল বস্তুর প্রবৃত্তি হয়, ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে। (৯) সে আমাতে মন রাখিয়া এবং প্রাণ লাগাইয়া পরস্পরকে জ্ঞান দিতে থাকিয়া এবং আমার কথা কহিতে থাকিয়া (উহাতেই) সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে। (১০) এই প্রকারে সর্ব্বদাই যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমাহিত থাকিয়া যে ব্যক্তি আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহাকে আমিই এমনই (সমত্ব-) বুদ্ধির যোগ দিই যে, উহা দ্বারা সে আমাকে পাইতে পারে। (১১) এবং তাহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই আমি তাহার আত্মস্বভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণে অবস্থিত করিয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা (তাহার) অজ্ঞানমূলক অন্ধকার বিনষ্ট করি।

রহস্য ঃ সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পরমেশ্বরই দেন (৭. ২১)। সেইরূপই এক্ষণে উপরের দশম শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তি-মার্গে প্রবিষ্ট মনুষ্যের সমত্ববুদ্ধিকে উন্নত করিবার কার্য্যও পরমেশ্বরই করেন ; এবং পূর্ব্বে (গী. ৬. ৪৪) এই যে বর্ণনা আছে যে, যখন মনুষ্যের মনে একবার কর্ম্মযোগের জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া যায়, তখন সে আপনাআপনিই পূর্ণসিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলে, উহার সঙ্গে ভক্তিমার্গের এই সিদ্ধান্ত সমানার্থক। জ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়া অনুসারে বলা হইতেছে যে, এই কর্ত্তৃত্ব আত্মার স্বতন্ত্রতা হইতে আসে। কিন্তু আত্মাও তো পরমেশ্বরই ; এই কারণে ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা করা হয় যে, এই ফল অথবা বুদ্ধি পরমেশ্বরই প্রত্যেক মনুষ্যের পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারে দেন (গী. ৭. ২০ এবং গীতার. পৃঃ ৩৬৭)। এই প্রকারে ভগবান ভক্তিমার্গের তত্ত্ব বলা শেষ করিলে—

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বহ্নুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্তবং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(১২-১৩) তুমিই পরমব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ স্থান ও পরম পবিত্র বস্তু; সমস্ত ঋষি, এইরূপই দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে এবং শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ব্ববিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলেন; এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে উহাই বলিতেছ। (১৪) হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ, সে সমস্ত আমি সত্য মানিতেছি। হে ভগবান! তোমার ব্যক্তি অর্থাৎ তোমার মূল দেবতাদের বিদিত নহে এবং দানবদের বিদিত নহে। (১৫) সকল ভূতের উৎপাদক হে ভূতেশ! দেবদেব জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বয়ংই আপনাকে আপনি জান। (১৬ অতএব তোমার যে সকল দিব্য বিভূতি আছে, যে বিভূতি দ্বারা এই সমস্ত লোককে তুমি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তাহা নিজেই (কৃপা করিয়া) সম্পূর্ণরূপে বল।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮।

অনুবাদঃ (১৭) হে যোগিন্! (আমাকে বল যে) সর্ব্বদা তোমার চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনিব? এবং হে ভগবান! আমি কোন্ কোন্ পদার্থে তোমার চিন্তা করিব? (১৮) হে জনার্দ্দন! নিজের বিভূতি ও যোগ আমাকে আবার সবিস্তার বল; কারণ অমৃততুল্য (তোমার বাক্য) শুনিয়া শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

বিভূতি ও যোগ, এই দুই শব্দ এই অধ্যায়েরই সপ্তম শ্লোকে আসিয়াছে এবং এখানে অর্জ্জুন উহারই পুনর্ব্যবহার করিয়াছেন। 'যোগ' শব্দের অর্থ পূর্ব্বে (গী. ৭. ২৫) দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখুন। বিভিন্ন বিভূতির ধ্যান দেবতা ভাবিয়া করা যাইবে, এজন্য অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই; কিন্তু সপ্তদশ শ্লোকের এই উক্তি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্ত বিভূতিসমূহে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই মনে রাখিবার জন্য তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন। কারণ ভগবান ইহা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছেন (গী. ৭. ২০-২৫; ৯২২. -২৮) যে, একই পরমেশ্বরকে সকল স্থানে বিদ্যমান জানা এক কথা, এবং পরমেশ্বরের নানা বিভূতিকে বিভিন্ন দেবতা স্বীকার করা অন্য কথা; এই উভয়ের মধ্যে ভক্তিমার্গের দৃষ্টিতে মহান প্রভেদ।

শ্রীভগবানুবাচ
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ শ্রীভগবান বলিলেন—(১৯) আচ্ছা; এক্ষণে হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নিজের দিব্য বিভূতিসমূহের মধ্যে তোমাকে মুখ্য মুখ্য বলিতেছি, কারণ আমার বিস্তারের অন্ত নাই।

এই বিভূতিবর্ণনার মতই অনুশাসনপর্ব্বে (১৪. ৩১১-২১) এবং অনুগীতাতে (অশ্ব. ৪৩ ও ৪৪) পরমেশ্বরের রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু গীতার বর্ণনা উহা অপেক্ষা অধিক সরস, এই কারণে ইহার অনুকরণ অন্যান্য স্থলেও পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—ভাগবতপুরাণের একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে এই প্রকারেরই বিভূতিবর্ণনা ভগবান উদ্ধবের নিকট করিয়াছেন; এবং সেইখানেই আরম্ভে (ভাগ. ১১. ১৬. ৬-৮) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই বর্ণনা গীতার এই অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারেই হইয়াছে।

অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

অনুবাদঃ (২০) হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিত আত্মা আমি, এবং সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই। (২১) (দ্বাদশ) আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু আমি; তেজস্বীদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য, (সাত অথবা উনপঞ্চাশ) মরুদ্গণের মধ্যে মর এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা আমি। (২২) আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ; দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র; এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন; ভূতগণের মধ্যে চেতনা অর্থাৎ প্রাণের চলন-শক্তি আমি।

রহস্যঃ এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ, অর্থাৎ সামবেদ মুখ্য; ঠিক এই প্রকারই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বেও (১৪. ৩৩৭) "সামবেদশ্চ বেদানাং যজুষাং শতরুদ্রিয়ং" বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুগীতাতে 'ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদানাং' (অশ্ব. ৪৪. ৬) এই প্রকারে, সকল বেদের মধ্যে ওঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে গীতাতেও (৭. ৮) "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু" বলা হইয়াছে। গীতা ৯. ১৭র "ঋক্সামযজুরেব চ" এই বাক্যে সামবেদ অপেক্ষা ঋগ্বেদকে অগ্রস্থান দেওয়া গিয়াছে এবং সাধারণ লোকেও এইরূপই বুঝে। এই পরস্পরবিরোধী বর্ণনার উপরে কোন কোন লোকে নিজের কল্পনাকে খুব চটপট দৌড় করাইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঙ্কারেরই নাম উদ্গীথ আছে এবং লিখিত হইয়াছে যে "এই উদ্গীথ সামবেদের সার এবং সামবেদ ঋগ্বেদের সার" (ছাং ১. ১. ২)। সকল বেদের মধ্যে কোন্ বেদ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ের উক্ত বিভিন্ন বিধানসমূহের মিল ছান্দোগ্যের এই বাক্যের দ্বারা হইতে পারে। কারণ সামবেদের মন্ত্রও মূল ঋগ্বেদ হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া কেহ কেহ বলেন যে, গীতাতে সামবেদকে এস্থলে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ইহার কোন-না-কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। যদিও ছান্দোগ্য উপনিষদে সামবেদকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি মনু বলিয়াছেন যে, "সামবেদের ধ্বনি অশুচি" (মনু. ৪. ১২৪)। অতএব একজন অনুমান করিয়াছেন যে,

সামবেদকে প্রাধান্যদাতা গীতা মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে ; এবং অপরে বলেন যে, গীতা রচয়িতা সামবেদী হইবেন, এই কারণেই তিনি এস্থলে সামবেদকে প্রাধান্য দিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমার মতে "আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ" ইহার উপপত্তি লাগাইবার জন্য এতদূর যাইবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের গানযুক্ত স্তবকে সর্ব্বদাই প্রাধান্য দেওয়া হয়। উদাহরণ যথা—নারায়ণীয় ধর্ম্মে নারদ ভগবানের বর্ণনা করিয়াছেন যে, "বেদেষু সপুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে" (মভা. শাং. ৩৩৪. ২৩) ; এবং বসু রাজা "জপ্যং জগৌ"—জপ্য গান করিতেছিলেন (শাং, ৩৩৭. ২৭ ; এবং ৩৪২, ৭০ ও ৮১ দেখুন)—এই প্রকারে 'গৈ' ধাতুরই প্রয়োগ ফের করা গিয়াছে। অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াত্মক বেদ অপেক্ষা গানপ্রধান বেদ অর্থাৎ সামবেদকে মাহাত্ম্য দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই ; এবং "আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ" এই উক্তির আমার মতে সরল ও সহজ কারণ ইহাই।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানানীমহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ (২৩) (এগারো) রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর ; যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে কুবের ; (আট) বসুর মধ্যে পাবক ; (এবং সাত) পর্ব্বতের মধ্যে মেরু। (২৪) হে পার্থ ! পুরোহিতের মধ্যে আমাকে মুখ্য বৃহস্পতি জান। আমি সেনানায়কদের মধ্যে স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। (২৫) মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু ; বাক্যের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওঁকার ; যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ ; স্থাবর অর্থাৎ স্থির পদার্থের মধ্যে হিমালয়।

রহস্য ঃ "যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ" এই বাক্য গুরুত্বপূর্ণ। অনুগীতাতে (মভা. অশ্ব. ৪৪. ৮) উক্ত হইয়াছে যে, "যজ্ঞানাং হুতমুত্তমম্" অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে (অগ্নিতে) হবি সমর্পণ করিয়া সিদ্ধ হইবার যজ্ঞ উত্তম ; এবং উহাই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীদিগের মত। কিন্তু ভক্তিমার্গে হবির্যজ্ঞ অপেক্ষা নামযজ্ঞ বা জপযজ্ঞের বিশেষ মহত্ত্ব আছে, এই কারণেই গীতাতে "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" বলা হইয়াছে। মনুও একস্থানে (২. ৮৭) বলিয়াছেন যে, "আর কিছু করুক বা না করুক, কেবল জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করে"। ভাগবতে "যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং পাঠ আছে।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতঃ গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ঃ (২৬) আমি সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ অর্থাৎ পিপ্পল এবং দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি। (২৭) ঘোড়ার মধ্যে (অমৃতমন্থনের সময়ে আবির্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জান। আমি গজেন্দ্রদের মধ্যে ঐরাবত, এবং মনুষ্যদের মধ্যে রাজা। (২৮) আমি আয়ুধসকলের মধ্যে বজ্র, গাভীদের মধ্যে কামধেনু, এবং প্রজা-উৎপাদক কাম আমি ; আমি সর্পদের মধ্যে বাসুকি। (২৯) নাগসকলের মধ্যে আমি অনন্ত ; যাদস্ অর্থাৎ জলচর প্রাণীগণের মধ্যে বরুণ, এবং পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা ; আমি সংযমকারীদের মধ্যে যম।

রহস্য ঃ বাসুকি=সর্পদের রাজা এবং অনন্ত= 'শেষ' এই অর্থ স্থির এবং অমর-কোষ ও মহাভারতেও এই অর্থই দেওয়া হইয়াছে (মভা. আদি. ৩৫-৩৯)। কিন্তু চয়পূর্ব্বক বলা যায় না যে, নাগ ও সর্পের মধ্যে কি প্রভেদ। মহাভারতের আস্তীক উপাখ্যানে এই শব্দের প্রয়োগ একই অর্থে হইয়াছে। তথাপি জানা যায় যে, এ স্থলে সর্প ও নাগ শব্দে সাধারণ সর্পবর্গের দুই বিভিন্ন জাতি বিবক্ষিত হইয়াছে। শ্রীধরী টীকাতে সর্পকে বিষযুক্ত এবং নাগকে বিষহীন বলা হইয়াছে, রামানুজভাষ্যে সর্পকে একশির-বিশিষ্ট এবং নাগকে বহুশিরবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ভেদ ঠিক মনে হয় না। কারণ কোন কোন স্থলে, নাগদিগেরই প্রধান বংশ বলিতে গিয়া তন্মধ্যে অনন্ত ও বাসুকিকে প্রথমে গণনা করা হইয়াছে এবং বর্ণিত হইয়াছে যে উভয়ই বহুশিরযুক্ত ও বিষধর ; কিন্তু অনন্ত অগ্নিবর্ণের এবং বাসুকি হরিদ্রাবর্ণের। ভাগবতের পাঠ গীতার সমানই আছে।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ঃ ৩০) আমি দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ ; আমি গ্রাসকারীদের মধ্যে কাল, পশুদের মধ্যে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহ এবং পক্ষিদের মধ্যে গরুড় ; (৩১) আমি বেগবানদের মধ্যে বায়ু ; আমি শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মৎস্যদের মধ্যে মকর এবং নদীর মধ্যে ভাগীরথী। (৩২) হে অর্জ্জুন ! সৃষ্টিমাত্রের আদি, অন্ত ও মধ্যও আমি ; বিদ্যা-সমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদ-কর্ত্তাদের বাদ আমি।

রহস্য ঃ পূর্ব্বে ২০শ শ্লোকে বলিয়া দিয়াছেন যে, সচেতন ভূতসকলের আদি, মধ্য

ও অন্ত আমি এবং এখন বলিতেছেন যে সমস্ত চরাচর সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত আমি ; ইহাই ভেদ।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৩) আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং সমাসের মধ্যে (উভয়পদ-প্রধান) দ্বন্দ্ব ; (নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি) অক্ষয় কাল এবং সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা আমি ; (৩৪) সকলের ক্ষয়কর্ত্তা মৃত্যু, এবং পরে জন্মগ্রহণকর্ত্তাদের উৎপত্তিস্থান আমি ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, এবং বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি।

রহস্য ঃ কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিত। মহাভারতে (আদি. ৬৬. ১৩, ১০) বর্ণিত আছে যে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষমা ছাড়িয়া শেষ পাঁচ, এবং অপর পাঁচ (পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, লজ্জা ও মতি) উভয় মিলিয়া মোট দশ দক্ষের কন্যা। ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহ হইবার কারণে ইহাদিগকে ধর্ম্মপত্নী বলে।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৫) সাম অর্থাৎ গানের যোগ্য বৈদিক স্তোত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম, (এবং) ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমি ; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত।

রহস্য ঃ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষকে প্রথম স্থান এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে সময়ে বারো মাস মার্গশীর্ষ হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল,—আজকাল যেমন চৈত্রমাস হইতে হয়—(মভা. অনু. ১০৬ ও ১০৯ ; এবং বাল্মীকি-রামায়ণ ৩. ১৬)। ভাগবতেও (১১. ১৬. ২৭) এই প্রকারই উল্লেখ আছে। আমি আমার 'ওরায়ণ' গ্রন্থে লিখিয়াছি যে, মৃগশীর্ষ নক্ষত্রকে অগ্রহায়ণী অথবা বর্ষারম্ভের নক্ষত্র বলিত ; যখন মৃগাদি নক্ষত্রগণনার প্রচার ছিল তখন মৃগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান পাইয়াছিল, এবং এই কারণেই আবার মার্গশীর্ষ মাসও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকিবে। এই বিষয় এখানে বাহুল্য-ভয়ে বেশী দীর্ঘ করা উচিত নহে।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৬) আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যূত, তেজস্বীদের তেজ, (বিজয়ী পুরুষদের) বিজয়, (দৃঢ়নিশ্চয় পুরুষদের) নিশ্চয় এবং সত্ত্বশীলদের সত্ত্ব আমি। (৩৭) আমি যাদবদের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য্য। (৩৮) আমি শাসনকর্ত্তাদের দণ্ড, জয়েচ্ছুদের নীতি, এবং গুহ্যসমূহের মধ্যে মৌন। জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি। (৩৯) এই প্রকারেই হে অর্জুন। সকল ভূতের যাহা কিছু বীজ তাহা আমি ; এমন কোনও চর-অচর ভূত নাই যাহা আমাকে ছাড়িয়া আছে। (৪০) হে পরন্তপ ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই। বিভূতিসমূহের এই বিস্তার আমি (কেবল) দিগ্দর্শনস্বরূপে বলিয়াছি।

রহস্য ঃ এই প্রকারে মুখ্য মুখ্য বিভূতিসমূহ বলিয়া এক্ষণে এই প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—

যদ্‌যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ঃ (৪১) যে বস্তু বৈভব, লক্ষ্মী বা প্রভাবযুক্ত, তাহা তুমি আমার তেজের অংশে উৎপন্ন জান। (৪২) অথবা হে অর্জুন ! তুমি এই বিস্তার জানিয়া করিবে কি ? (সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি যে,) আমি নিজের এক(ই) অংশের দ্বারা এই সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।

রহস্য ঃ শেষের শ্লোক পুরুষসূক্তের এই ঋকের ভিত্তিতে উক্ত হইয়াছে—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ঋ. ১০. ৯০. ৩), এবং এই মন্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৩. ১২. ৬) আছে। 'অংশ' শব্দের অর্থ গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে (২১৪ ও ২১৫ পৃঃ) খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, যখন ভগবান নিজের একই অংশের দ্বারা এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তখন ইহা অপেক্ষা ভগবানের পূর্ণ মহিমা অনেক অধিক হইবেই ; এবং উহা বলিবার জন্যই শেষ শ্লোক বলা হইয়াছে। পুরুষসূক্তে তো স্পষ্টই বলা আছে যে "এতাবান্ অস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" —এইটুকু ইঁহার মহিমা, পুরুষ তো ইহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

———

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শযোগ

যখন পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূতিসমূহ বর্ণন করিলেন, তখন উহা শুনিয়া অর্জ্জুনের পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ভগবান উঁহাকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই অধ্যায়ে আছে। এই বর্ণনা এরূপ সরল যে, গীতার উত্তম অংশের মধ্যে ইহা পরিগণিত হয় এবং অন্যান্য গীতার রচয়িতাগণ ইহারই অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথমে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(১) আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তুমি অধ্যাত্মসংজ্ঞক যে পরম গুহ্য বিষয় বলিলে, তাহা দ্বারা আমার এই মোহ চলিয়া যাইতেছে। (২) এইরূপেই হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতসকলের উৎপত্তি, লয়, এবং (তোমার) অক্ষয় মাহাত্ম্যও আমি তোমার নিকট সবিস্তার শুনিয়াছি। (৩) (এখন) হে পরমেশ্বর। তুমি নিজের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐ প্রকার ঐশ্বরিক স্বরূপ (প্রত্যক্ষ) দেখিতে চাহি। (৪) হে প্রভো! যদি তুমি মনে কর যে, ঐ প্রকার রূপ আমি দেখিতে পারি, তবে হে যোগেশ্বর! তুমি নিজের অব্যয় স্বরূপ আমাকে দেখাও।

রহস্য ঃ সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশ্বরের অক্ষয় অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রূপের যে জ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাকেই অর্জ্জুন প্রথম শ্লোকে 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন। এক অব্যক্ত হইতে অনেক ব্যক্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইবার যে বর্ণনা সপ্তম (৪-১৫), অষ্টম (১৬-২১), এবং নবম (৪-৮) অধ্যায়ে আছে, তাহাই 'ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়' এই শব্দে দ্বিতীয় শ্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকের দুই অর্দ্ধাংশকে দুই বিভিন্ন বাক্য ধরিয়া কেহ কেহ উহার অর্থ করেন যে, "হে পরমেশ্বর! তুমি নিজের যেরূপ (স্বরূপের) বর্ণনা

করিলে, তাহা সত্য (অর্থাৎ আমি বুঝিয়া গিয়াছি); এখন হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐশ্বরিক স্বরূপ দেখিতে চাহি" (গীতা. ১০. ১৪)। কিন্তু উভয় পংক্তিকে মিলাইয়া একই বাক্য ধরিলে ঠিক জানা হয় এবং পরমার্থপ্রপা টীকাতে এইরূপ করাও হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে যে 'যোগেশ্বর' শব্দ আছে, উহার অর্থ যোগসমূহের (যোগীদিগের নহে) ঈশ্বর (১৮. ৭৫)। যোগের অর্থ পূর্ব্বে (গী. ৭. ২৫ এবং ৯. ৫) অব্যক্ত রূপ হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য অথবা যুক্তি করা হইয়াছে; এক্ষণে সেই সামর্থ্যের দ্বারাই বিশ্বরূপ দেখাইতে হইবে, এই কারণে এস্থলে 'যোগেশ্বর' সম্বোধনের প্রয়োগ হেতুগর্ভ।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(৫) হে পার্থ! আমার অনেক প্রকারের, অনেক রঙ্গের, এবং আকারের (এই) শত শত অথবা হাজার হাজার দিব্য রূপ দেখ। (৬) এই দেখ (বারো) আদিত্য, (আট) বসু, (এগারো) রুদ্র, (দুই) অশ্বিনীকুমার, এবং (৪৯) মরুদ্গণ। হে ভারত! এই অনেক আশ্চর্য্য দেখ, যাহা পূর্ব্বে কখনও না দেখিয়া থাকিবে।

রহস্য ঃ নারায়ণীয় ধর্ম্মে নারদকে যে বিশ্বরূপ দেখানো হইয়াছে, উহাতে এই বিশেষ বর্ণনা আছে যে বামদিকে বারো আদিত্য, সম্মুখে আট বসু, দক্ষিণ দিকে এগারো রুদ্র এবং পশ্চাতে দুই অশ্বিনীকুমার ছিলেন (শাং ৩৩৯. ৫০-৫২)। কিন্তু এই বর্ণনাই যে সর্ব্বত্র বিবক্ষিত হইবে, তাহার কোনই প্রয়োজন নাই (মভা. উ. ১৩০)। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার এবং মরুদ্গণ ইঁহারা বৈদিক দেবতা ; দেবতাদের চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদ মহাভারতে (শাং. ২০৮. ২৩. ২৪) এই বলা হইয়াছে যে, আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, এবং অশ্বিনীকুমার শূদ্র। শতপথব্রাহ্মণ ১৪. ৪. ২. ২৩ দেখুন।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) হে গুড়াকেশ! আজ এখানে সমাগত সমস্ত চর-অচর জগৎ দেখিয়া লও ; আরও যাহা কিছু তোমার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা আমারই (এই) দেহে দেখিয়া লও! (৮) কিন্তু তুমি নিজের এই দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে পারিবে না, তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি দিতেছি, (ইহা দ্বারা) আমার এই ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ যোগ-সামর্থ্য দেখ!

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—(৯) আবার হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ! এই প্রকার বলিয়া যোগসমূহের প্রভু হরি অর্জ্জুনকে (নিজের) শ্রেষ্ঠ ঐশ্বরিক রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। (১০) উহার অর্থাৎ বিশ্বরূপের অনেক মুখ ও চক্ষু ছিল, এবং উহাতে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, উহার উপরে নানাবিধ অলঙ্কার ছিল এবং উহাতে নানাবিধ দিব্য আয়ুধ সজ্জিত ছিল। (১১) ঐ অনন্ত, সর্ব্বতোমুখী এবং সকল আশ্চর্য্যের দ্বারা পূর্ণ দেবতার দিব্য সুগন্ধি রূপটান লাগানো ছিল এবং তিনি দিব্য পুষ্প ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (১২) যদি আকাশে এক হাজার সূর্য্যের জ্যোতি একত্র হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার কান্তির সমান (কতকটা) দেখিতে হয়। (১৩) তখন দেবাধিদেবের এই শরীরে নানাপ্রকারে বিভক্ত সমস্ত জগৎ অর্জ্জুনকে একত্র দেখাইলেন। (১৪) আবার আশ্চর্য্যে ডুবিয়া যাওয়ায় উঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং অবনত-মস্তকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে ঐ অর্জ্জুন দেবতাকে বলিলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(১৫) হে দেব ! তোমারই এই দেহে সকল দেবতাকে এবং নানাপ্রকার প্রাণীসমুদয়কে, এই প্রকার কমলাসনেই উপবিষ্ট (সকল দেবতার) প্রভু ব্রহ্মদেব, সকল ঋষি, এবং (বাসুকি প্রভৃতি) সমস্ত দিব্য সর্পকেও আমি দেখিতেছি। (১৬) অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রধারী অনন্তরূপ তোমাকেই আমি চারদিকে দেখিতেছি ; কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! তোমার না অন্ত, না মধ্য এবং না আদিই আমি (কোথাও) দেখিতেছি। (১৭) কিরীট, গদা ও চক্রধারী, চারিদিকে প্রভা-বিস্তারকারী, তেজোময়, দীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, নয়নের দ্বারা দেখিবারও অশক্য এবং অপার (ব্যাপ্ত) তোমাকেই যেখানে-সেখানে দেখিতে পাইতেছি। (১৮) তুমিই চরম জ্ঞেয় অক্ষর (ব্রহ্ম), তুমিই এই বিশ্বের চরম আশ্রয়, তুমিই অব্যয় এবং তুমিই শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষক ; আমি তোমাকেই সনাতন পুরুষ জানিতেছি। (১৯) যাঁহার না আদি, না মধ্য ও না অন্ত আছে, অনন্ত যাঁহার বাহু, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নি যাঁহার মুখ, এইরূপ অনন্তশক্তি তুমিই নিজের তেজে এই সমস্ত জগতকে তপ্ত করিতেছ ; তোমার এইপ্রকার রূপ আমি দেখিতেছি। (২০) কারণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এই (সমস্ত) ব্যবধান এবং সকল দিক একা তুমিই ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। হে মহাত্মন ! তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রৈলোক্য (ভয়ে) ব্যথিত হইতেছে। (২১) এই দেখ, দেবতাদের সকলে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে, (এবং) কেহ কেহ ভয়ে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছে, (এবং) 'স্বস্তি, স্বস্তি' বলিয়া মহর্ষি এবং সিদ্ধদিগের সকলে অনেক প্রকার স্তোত্রের দ্বারা তোমারই স্তুতি করিতেছে। (২২) রুদ্র ও আদিত্য, বসু ও সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব, (দুই) অশ্বিনী কুমার, মরুদ্গণ, উষ্মপা অর্থাৎ পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধদিগের দলকে-দল সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমারই দিকে দেখিতেছেন।

রহস্য ঃ শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে যে অন্ন দেওয়া যায়, তাঁহারা উহা যতক্ষণ গরম থাকে, ততক্ষণই উহা গ্রহণ করেন, এই কারণেই উঁহাদিগকে 'উষ্মপা' বলে (মনু. ৩. ২৩৭)। মনুস্মৃতিতে (৩. ১৯৪-২০০) এই পিতৃগণেরই সোমসদ্, অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সোমপা, হবিষ্মান্, আজ্যপা এবং সুকালিন, এই সাত প্রকার গণ বলা হইয়াছে। আদিত্য প্রভৃতি দেবতা বৈদিক। উপরের ষষ্ঠ শ্লোকে দেখুন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩. ৯. ২) বর্ণিত হইয়াছে যে, আট বসু, এগারো রুদ্র, বারো আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়া ৩৩ দেবতা ; এবং মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে এবং শান্তিপর্ব্ব ২০৮ অধ্যায়ে ইঁহাদিগের নাম ও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ।। ২৩ ।।
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ।। ২৪ ।।
দ্রংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।। ২৫ ।।
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ।। ২৬ ।।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ।। ২৭ ।।

অনুবাদ ঃ (২৩) হে মহাবাহু ! তোমার এই মহান, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক বাহু, অনেক উরু, অনেক পদ, অনেক উদর এবং অনেক বৃহৎ দন্তের জন্য ভয়ঙ্করদর্শন রূপ দেখিয়া সকল লোকের এবং আমারও ভয় হইতেছে। (২৪) গগণস্পর্শী, প্রকাশ-বান, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতমুখব্যাদান এবং বিশাল উজ্জ্বল নেত্রযুক্ত তোমাকে দেখিয়া অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে ; এই কারণে হে বিষ্ণু ! আমার ধৈর্য্য বিদূরিত হইয়াছে এবং শান্তিও যাইতে চলিয়াছে ! (২৫) বৃহৎ দন্তের জন্য করাল এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তোমার (এই) মুখ দেখিলেই আমি দিশাহারা হই এবং মনও স্থির হয় না। হে জগন্নিবাস, দেবাধিদেব ! প্রসন্ন হও ! এই দেখ ! রাজন্যবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং এই সূতপুত্র (কর্ণ), আমারও পক্ষের মুখ্য-মুখ্য যোদ্ধা-দের সঙ্গে, (২৭) তোমারই দংষ্ট্রাকরাল এই অনেক ভয়ঙ্কর মুখে ত্বরা সহকারে প্রবেশ করিতেছে ; এবং কেহ কেহ দাঁতের মধ্যে লাগিয়া থাকিয়া চূর্ণিতমস্তকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ।। ২৮ ।।
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ২৯ ।।
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ।। ৩০ ।।
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।। ৩১ ।।

অনুবাদ ঃ (২৮) তোমার অনেক প্রজ্জ্বলিত মুখে, নদীসকলের বৃহৎ বৃহৎ প্রবাহ যেমন সমুদ্রেরই দিকে চলিয়া যায়, মনষ্যলোকের ঐ বীরসকল সেইরূপই প্রবেশ করিতেছে। (২৯) জ্বলন্ত অগ্নিতে মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে যেমন পতঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইরূপই তোমারও অনেক বক্ত্র মধ্যে (এই) লোকেরা মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করিতেছে। (৩০) হে বিষ্ণু ! চারিদিক হইতে সকল লোককে নিজের জ্বলন্ত মুখসমূহ হইতে বাহির করিয়া তুমি জিভ চাটিতেছ ! এবং, তোমারই উগ্র প্রভাসমূহের তেজে সমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া (চারিদিক) চমকাইতেছে। (৩১) আমাকে বল যে, এই উগ্ররূপধারী তুমি কে ? হে দেবদেবশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি ! প্রসন্ন হও ! আমি জানিতে-চাহি যে, আদিপুরুষ তুমি কে। কারণ আমি তোমার এই কার্য্যপ্রবৃত্তি (মোটেই) জানি না।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ।। ৩২ ।।
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।। ৩৩ ।।
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুদ্ধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—(৩২) আমি লোকসমূহের ক্ষয়কর্ত্তা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 'কাল' ; এখানে লোকসমূহের সংহার করিতে আসিয়াছি। তুমি না হয়, তথাপি (অর্থাৎ তুমি কিছু না করিলেও (সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়মান এই সকল যোদ্ধা নষ্টোন্মুখ (মরণোন্মুখ) ; (৩৩) অতএব তুমি উঠ, যশ লাভ কর, এবং শত্রুদিগকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি ইঁহাদিগকে পূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি ; (এইজন্য এখন) হে সব্যসাচী (অর্জ্জুন) ! তুমি কেবল নিমিত্তের জন্য (সম্মুখবর্ত্তী) হও। (৩৪) আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং এইরূপই অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে (পূর্ব্বেই) মারিয়া রাখিয়াছি ; উহাদিগকে তুমি মার ; বিমূঢ় হইও না ! যুদ্ধ কর ! তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিবে।

রহস্য ঃ সার কথা, যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য গিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধনকে মিলনের কোনই বিষয় না শুনিতে দেখিয়া ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কথায় বলিয়াছিলেন যে, "কালপক্কমিদং মন্যে সর্ব্বং ক্ষত্রং জনার্দ্দন" (মভা. উ. ১২৭. ৩২)—এই সমস্ত ক্ষত্রিয় কালপক্ক হইয়া গিয়াছে। সেই উক্তিরই এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপের দ্বারা অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিলেন (উপর ২৬-৩১ শ্লোক দেখুন)। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার এই সিদ্ধান্তও ৩৩শ শ্লোকে আসিয়াছে যে, দুষ্ট মনুষ্য নিজের কর্ম্মের দ্বারাই মরে, উহাকে মারে যে, সে কেবল নিমিত্ত, এইজন্য হত্যাকারীকে উহার দোষ লাগে না।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি ।
নমস্কৃত্বা ভূয়এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ।। ৩৫ ।।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—(৩৫) কেশবের এই উক্তি শুনিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত ভয়ভীত হইয়া গেলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে নমস্কার করিয়া উনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নম্র হইয়া আবার বলিলেন—অর্জ্জুন বলিলেন (৩৬), হে হৃষিকেশ! (সমস্ত) জগত তোমার (গুণ-) কীর্ত্তন করিয়া প্রসন্ন হয়, এবং (উহাতে) অনুরক্ত থাকে, রাক্ষস তোমাকে ভয় করিয়া (দশ) দিকে পলায়ন করিতেছে, এবং সিদ্ধপুরুষদিগের সংঘ তোমাকেই নমস্কার করিতেছে, এই (সমস্ত) উচিতই হইতেছে। (৩৭) হে মহাত্মন্! তুমি ব্রহ্মদেবেরও আদিকারণ এবং তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; তোমার বন্দনা তাঁহারা কি প্রকারে না করিবেন? হে অনন্ত! হে দেবদেব! হে জগন্নিবাস! সৎ ও অসৎ তুমিই হইতেছ, এবং এই উভয়ের অতীত যে অক্ষর আছেন, তাহাও তুমিই।

রহস্য ঃ গীতা ৭. ২৪ ; ৮. ২০ ; এবং ১৫. ১৬ হইতে দেখা যায় যে, সৎ ও অসৎ শব্দের অর্থ এস্থলে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অথবা ক্ষর ও অক্ষর এই সকল শব্দের অর্থের সহিত সমান। সৎ ও অসতের অতীত যে তত্ত্ব আছে, তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম ; এই কারণেই গীতা ১৩. ১২তে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "আমি না সৎ না অসৎ"। গীতাতে 'অক্ষর' শব্দ কোথাও প্রকৃতি অর্থে এবং কোথাও ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। গীতা ৯. ১৯ ; ১৩. ১২ ; এবং ১৫. ১৬র রহস্য দেখুন।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাঽসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৮) তুমি আদিদেব, (তুমি) পুরাতন পুরুষ, তুমি এই জগতের পরমাধার, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান ; এবং হে অনন্তরূপ! তুমিই (এই) বিশ্বকে বিস্তৃত অথবা ব্যাপ্ত করিয়াছ। (৩৯) বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, এবং প্রপিতামহও তুমিই। তোমাকে হাজারবার নমস্কার! এবং আবারও তোমাকে নমস্কার!

রহস্য ঃ ব্রহ্মা হইতে মরীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয় এবং মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয় (মভা. আদি. ৬৫. ১১) ; এইজন্য এই মরীচি প্রভৃতিকেই প্রজাপতি বলে (শাং. ৩৪০. ৬৫)। এই কারণেই কেহ কেহ প্রজাপতি শব্দের অর্থ কশ্যপ আদি প্রজাপতি করেন। কিন্তু এখানে প্রজাপতি শব্দ একবচনান্ত, এই কারণে প্রজাপতির অর্থ ব্রহ্মদেবই অধিক ধর্ত্তব্য মনে হয়, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতির পিতা অর্থাৎ সকলের পিতামহ (দাদা), অতএব পরবর্ত্তী

'প্রপিতামহ' (বুড়াবাবা) পদও স্বতঃ প্রকাশ হইতেছে এবং উহার সার্থকতা ব্যক্ত হইতেছে।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪০) হে সর্ব্বাত্মক! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল দিক হইতেই তোমাকে নমস্কার। তোমার বীর্য্য অনন্ত এবং তোমার পরাক্রম অতুল, সকলের যথেষ্ট হইবার কারণে তুমিই 'সর্ব্ব'।

রহস্য ঃ সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার, এই শব্দ পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা দেখাইতেছে। উপনিষদে ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা আছে— "ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" (মু. ২. ২. ১১ ; ছাং. ৭. ২৫)। ঐ অনুসারেই ভক্তিমার্গের এই নতিপ্রবণ স্তুতি হইতেছে।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৪১) তোমার এই মহিমা না জানিয়া মিত্র মনে করিয়া প্রীতিবশত ভুলক্রমে 'ওরে কৃষ্ণ', 'ও যাদব', 'হে সখা', ইত্যাদি যাহা কিছু আমি বলিয়া ফেলিয়াছি, (৪২) এবং হে অচ্যুত! আহার-বিহারে অথবা শুইতে-বসিতে, একেলা থাকা কালে বা দশজনের সমক্ষে আমি হাসিউপহাসে তোমার যে অপমান করিয়াছি, তাহার জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। (৪৩) এই চরাচর জগতের পিতা তুমিই, তুমি পুজনীয় এবং গুরুরও গুরু। ত্রিভুবনে তোমার সমান কেহই নাই। তখন হে অতুলপ্রভাব! অধিক কোথা হইতে হইবে? (৪৪) তুমি স্তবনীয় এবং সমর্থ ; এইজন্য আমি অবনতশরীরে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, "প্রসন্ন হও"। যে প্রকার পিতা নিজের পুত্রের অথবা সখা নিজের সখার অপরাধ ক্ষমা করে, সেইপ্রকার হে দেব! প্রেমিককে (তোমাকে) প্রিয়জনের (নিজের প্রীতিভাজনের অর্থাৎ আমার সমস্ত) অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

রহস্য ঃ কেহ কেহ "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি" এই শব্দগুলির "প্রিয় পুরুষ যে প্রকার নিজের স্ত্রীর" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঠিক নহে। কারণ ব্যাকরণের রীতিতে 'প্রিয়ায়ার্হসি'র প্রিয়ায়াঃ+অর্হসি অথবা প্রিয়ায়ৈ+অর্হসি এই প্রকার পদবিচ্ছেদ হয় না, এবং উপমাদ্যোতক 'ইব' শব্দও এই শ্লোকে দুইবারই আসিয়াছে।

অতএব 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি'কে তৃতীয় উপমা না ধরিয়া উপমেয় ধরাই অধিক প্রশস্ত। 'পুত্রের' (পুত্রস্য), 'সখার' (সখ্যুঃ), এই দুই উপমানাত্মক ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সমান যদি উপমেয়তেও 'প্রিয়স্য' (প্রিয়ের) এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ হয়, তবে খুব ভাল হয়। কিন্তু এক্ষণে 'স্থিতস্য গতিশ্চিন্তনীয়া' এই ন্যায় অনুসারে এখানে ব্যবহার করিতে হইবে। আমার বুদ্ধিতে ইহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না যে, 'প্রিয়স্য' এই ষষ্ঠ্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদের অভাবে, ব্যাকরণের বিরুদ্ধ 'প্রিয়ায়াঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গের পদ করা যাইবে; এবং যখন ঐ পদ অর্জ্জুনের পক্ষে সঙ্গত না হইতে পারে, তখন 'ইব' শব্দকে অধ্যাহার ধরিয়া 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ'—প্রেমিক নিজের প্রিয় স্ত্রীর—এইরূপ তৃতীয় উপমা ধরিতে হইবে, এবং তাহাও শৃঙ্গারাত্মক অতএব অপ্রাসঙ্গিক হয়। ইহা ব্যতীত, আর এক কথা এই যে, পুত্রস্য, সখ্যুঃ, প্রিয়ায়াঃ, এই তিন পদ উপমানে চলিয়া গেলে উপমেয়ে ষষ্ঠ্যন্ত পদ মোটেই থাকে না, এবং 'মে অথবা মম' পদের পুনরায় অধ্যাহার করিতে হয়; এবং এতটা মাথা ঘামাইবার পর উপমান ও উপমেয়ে যেমন তেমনি বিভক্তির সমতা হইয়া গেল, তো দুইটিতে লিঙ্গের বৈষম্যের নূতন দোষ দাঁড়াইয়াই থাকে। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ প্রিয়ায় + অর্হসি এইরূপ ব্যাকরণের রীতিতে শুদ্ধ ও সরল পদ করা হইলে উপমেয়ে যেখানে ষষ্ঠী হওয়া উচিত, সেখানে 'প্রিয়ায়' এই চতুর্থী আসে,—বস্ এইটুকুই দোষ হয় এবং সেই দোষ গুরুতর দোষ নহে। কারণ ষষ্ঠীর অর্থ এখানে চতুর্থীর সমান এবং অন্যত্রও কয়েকবার এইপ্রকার হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থ আমি যেরূপ করিয়াছি পরমার্থপ্রপা টীকাতে সেইরূপই আছে।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ঃ (৪৫) কখনও যে রূপ দেখি নাই, তাহা দেখিয়া আমার হর্ষ হইয়াছে এবং ভয়ে আমার মন ব্যাকুলও হইয়া গিয়াছে। হে জগন্নিবাস, দেবাধিদেব! প্রসন্ন হও! এবং হে দেব! নিজের সেই পূর্ব্ব স্বরূপ দেখাও। (৪৬) আমি পূর্ব্বের কিরীট ও গদাধারী, চক্রহস্ত তোমাকে দেখিতে চাহি; (অতএব) হে সহস্রবাহু, বিশ্বমূর্ত্তি! ঐ চতুর্ভুজ রূপেই প্রকাশিত হও!

শ্রীভগবান বলিলেন—(৪৭) হে অর্জ্জুন! (তোমার প্রতি) প্রসন্ন হইয়া এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য ও পরম বিশ্বরূপ নিজের যোগ-সামর্থ্যের দ্বারা আমি তোমাকে দেখাইলাম; ইহা তোমা ব্যতীত অন্য কেহই পূর্ব্বে দেখে নাই।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪৮) হে কুরুবীরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যলোকে আমার এই প্রকার স্বরূপ কেহই বেদ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান, কর্ম্ম অথবা উগ্র তপস্যা দ্বারা দেখে নাই, যাহা তুমি দেখিয়াছ। (৪৯) আমার এইরূপ ঘোর রূপ দেখিয়া নিজের চিত্তকে ব্যথিত করিও না; এবং বিমূঢ় হইও না। ভয় ছাড়িয়া সন্তুষ্ট মনে আমার ঐ স্বরূপকেই আবার দেখিয়া লও। সঞ্জয় বলিলেন—(৫০) এই প্রকার বলিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনকে পুনরায় নিজের (পূর্ব্ব) স্বরূপ দেখাইলেন; এবং আবার সৌম্যরূপ ধারণ করিয়া ঐ মহাত্মা ভীত অর্জ্জুনের ধৈর্য্য আনয়ন করিলেন।

রহস্য ঃ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম ২০শ, ২২শ, ২৯শ এবং ৭০শ শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ২৮শ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ২০শ ও ২১শ শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২য় হইতে ৫ম ও ১৫শ শ্লোকের ছন্দ বিশ্বরূপবর্ণনের উক্ত ৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরূপ; অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেক চরণে এগারো অক্ষর আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে গণের কোন এক নিয়ম নাই, এই কারণে কালিদাস প্রভৃতির কাব্যের ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, দোধক, শালিনী প্রভৃতি ছন্দসমূহের ঢঙ্গের এই শ্লোক বলা যায় না। অর্থাৎ এই বৃত্তরচনা আর্য অর্থাৎ বেদসংহিতার ত্রিষ্টুপ বৃত্তের অনুকরণে করা হইয়াছে; এই কারণে গীতা খুব প্রাচীন এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হইতেছে। গীতারহস্য পরিশিষ্ট প্রকরণ ৪৪২ পৃঃ দেখুন।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(৫১) হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য ও মনুষ্য-দেহধারী রূপ দেখিয়া এখন মন স্বস্থানে আসিয়াছে এবং আমি পূর্ব্বের ন্যায় অবহিত হইয়া গিয়াছি।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ শ্রীভগবান বলিলেন—(৫২) আমার যে রূপ তুমি দেখিলে, তাহার দর্শনলাভ অত্যন্ত কঠিন। দেবতারাও এইরূপ দেখিবার সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন। (৫৩) যেমন তুমি আমাকে দেখিলে, ঐরূপ আমাকে বেদ, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞ দ্বারাও (কেহই) দেখিতে পায় না। (৫৪) হে অর্জ্জুন! কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এই প্রকার মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ, আমাকে দেখা এবং হে পরন্তপ! আমাতে তত্ত্বত প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

রহস্য ঃ ভক্তি করিলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং শেষে পরমেশ্বরের সঙ্গে উহার তাদাত্ম্য হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্তই পূর্ব্বে ৪. ২৯শ এ এবং পরে ১৮. ৫৫তে পুনরায় আসিয়াছে। গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে (৩৬৪-৩৬৬ পৃঃ) ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণ গীতার অর্থের সার বলিতেছেন—

মৎকর্মকৃন্ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৫৫) হে পাণ্ডব! যে এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে যে, সমস্ত কর্ম্ম আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের, যে মৎপরায়ণ ও সঙ্গবিরহিত, এবং যে সমস্ত প্রাণী সম্বন্ধে নির্বৈর, আমার সেই ভক্ত আমাতে মিলিত হয়।

রহস্য ঃ উক্ত শ্লোকের আশয় এই যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার ভগবদ্ভক্তের পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে হইবে (উপরে ৩৩শ শ্লোকে দেখুন), অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত ব্যবহার এই নিরভিমান বুদ্ধিতে করিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত কর্ম্মই পরমেশ্বরের, প্রকৃত কর্ত্তা ও কারয়িতা তিনিই; কিন্তু আমাকে নিমিত্ত করিয়া তিনি এই কর্ম্ম আমা দ্বারা করাইতেছেন; এই প্রকার করিলে ঐ কর্ম্ম শান্তি অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির বাধক হয় না। শাঙ্করভাষ্যেও ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, এই শ্লোকে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য আসিয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে ভক্তিমার্গ ইহা বলে না যে, আরামে 'রাম রাম' জপ কর; প্রত্যুত উহার কথা এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গেসঙ্গেই উৎসাহসহকারে সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাক। সন্ন্যাসমার্গী বলেন যে 'নির্বৈর'র অর্থ নিষ্ক্রিয়; কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, এই বিষয়ই প্রকাশ করিবার জন্য উহার সঙ্গে 'মৎকর্ম্মকৃৎ' অর্থাৎ 'সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের (নিজের নহে) জানিয়া পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ত্তা' বিশেষণ লাগানো হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিচার গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (৩৩৫-৩৩১ পৃঃ করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তি-যোগ

কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া অষ্টমে অক্ষর, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার নবম অধ্যায়ে ভক্তিরূপ প্রত্যক্ষ রাজমার্গের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া দশম ও একাদশে তদন্তর্গত 'বিভূতিবর্ণন' এবং 'বিশ্বরূপদর্শন' এই দুই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন; এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জ্জুনকে এই সার উপদেশ দিয়াছেন যে, ভক্তিসহকারে এবং অনাসক্ত বুদ্ধিতে সমস্ত কাজ করিতে থাক। এখন, ইহার উপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, কর্ম্ম-যোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর-বিচার পূর্ব্বক পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া অব্যক্তের অথবা অক্ষরের উপাসনার (৭. ১৯ ও ২৪; ৮. ২১) বিষয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, যুক্তচিত্তে যুদ্ধ কর (৮. ৭); এবং নবম অধ্যায়ে ব্যক্ত উপাসনারূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বলিয়া বলিলেন যে, পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্মই করিতে হইবে (৯. ২৭, ৩৪ এবং ১১. ৫৫); এখন এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টি? এই প্রশ্নে ব্যক্তোপাসনার অর্থ ভক্তি। কিন্তু এখানে ভক্তি দ্বারা নানা বিভিন্ন উপাস্য অর্থ বিবক্ষিত নহে; উপাস্য অথবা প্রতীক যাহাই কেন হউক না, উহাতে একই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের ভাবনা রাখিয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহাই প্রকৃত ব্যক্ত-উপাসনা এবং এই অধ্যায়ে তাহাই উদ্দিষ্ট।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : অর্জ্জুন বলিলেন — (১) এই প্রকার সর্ব্বদা যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া যে ভক্ত তোমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যক্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করে, উহাদের মধ্যে উত্তম (কর্ম্ম-) যোগবেত্তা কে ?

শ্রীভগবান বলিলেন—(২) আমাতে মন লাগাইয়া সর্ব্বদা যুক্তচিত্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে আমার উপাসনা করে, সে আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যুক্ত অর্থাৎ যোগী। (৩-৪) কিন্তু যে অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-গোচর, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য ও কূটস্থ অর্থাৎ সকলের মূলে অবস্থিত, অচল ও নিত্য অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি রাখিয়া করে, সেই সকল ভূতের হিতে নিমগ্ন (লোকও) আমাকেই পায় ; (৫) (তথাপি উহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত থাকিবার কারণে ক্লেশ অধিক হয়। কারণ (ব্যক্ত দেহধারী মনুষ্যদের) অব্যক্ত উপাসনার মার্গ কষ্টে সিদ্ধ হয়। (৬) কিন্তু যে আমাতে সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমার ধ্যান করিয়া আমাকে ভজনা করে, (৭) হে পার্থ ! আমাতে সংলগ্নচিত্ত ঐ সকল লোকের, আমি এই মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে অবিলম্বে উদ্ধার সাধন করি। (৮) (অতএব) আমাতেই মন লাগাও, আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এইরূপে তুমি নিঃসন্দেহ আমাতেই বাস করিবে।

রহস্য : ইহাতে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্ত উত্তম যোগী ; আর তৃতীয় শ্লোকে পক্ষান্তরবোধক 'তু' অব্যয় প্রয়োগ করিয়া, ইহাতে এবং চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অব্যক্তের উপাসনা যে করে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও পঞ্চম শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত উপাসকদিগের মার্গ অধিক ক্লেশদায়ক হয় ; ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা সুলভ ; এবং অষ্টম শ্লোকে এই অনুসারে ব্যবহার করিবার উপদেশ অর্জ্জুনকে দিয়াছেন। সার কথা, একাদশ অধ্যায়ের শেষে (গী. ১১. ১৫) যে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, এস্থলে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে পর তাহাকেই দৃঢ় করিয়াছেন। ভক্তিমার্গে সুলভতা কি, ইহার সবিস্তার বিচার গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে আমি উহার পুনরুক্তি করিতেছি না। এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে, অব্যক্তের উপাসনা কষ্টকর হইলেও মোক্ষপ্রদই ; এবং ভক্তিমার্গীর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভক্তিমার্গেও কর্ম্ম না ছাড়িয়া ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক অবশ্য করিতে হয়। এই হেতু ষষ্ঠ শ্লোকে "আমাতেই সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া" এই শব্দ রাখা হইয়াছে। ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, ভক্তিমার্গেও কর্ম্ম স্বরূপত ছাড়িবে না, কিন্তু পরমেশ্বরে উহা অর্থাৎ উহার ফল অর্পণ করিবে। ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে যে ভক্তিমান পুরুষকে নিজের প্রিয় বলিয়াছেন, উহাকেও ইহারই অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-মার্গেরই বুঝিতে হইবে ; সে স্বরূপত কর্ম্মসন্ন্যাসী নহে। এই প্রকারে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ও সুলভতা বলিয়া এক্ষণে পরমেশ্বরে এইরূপ ভক্তি করিবার উপায় অথবা সাধন বলিতে বলিতে উহার তারতম্যও খুলিয়া বলিতেছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ : (৯) এখন (এই প্রকারে) আমাতে ভালরূপে চিত্তকে স্থির করিতে না পার, তবে হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসের সহায়তায় অর্থাৎ বারম্বার প্রযত্ন করিয়া আমাকে লাভ করিবার আশা রাখ। (১০) যদি অভ্যাস করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে মদর্থ অর্থাৎ আমাকে লাভার্থ (শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান-ধ্যান-ভজন-পূজাপাঠ প্রভৃতি) কর্ম্ম করিয়া যাও ; মদর্থ (এই) কর্ম্ম করিলেও তুমি সিদ্ধি পাইবে (১১) কিন্তু যদি ইহা করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে উদ্যোগ—মদর্পণপূর্ব্বক যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ—আশ্রয় পূর্ব্বক যতাত্মা হইয়া অর্থাৎ ধীরে ধীরে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া, (শেষে) সকল কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর। (১২) কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান বেশী ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের যোগ্যতা অধিক, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এবং (এই কর্ম্মফল) ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্তি লাভ হয়।

রহস্য : কর্ম্মযোগের দৃষ্টিতে এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্লোক-সমূহে ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইবার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান-ভজন প্রভৃতি সাধন বলিয়া, ইহার এবং অন্য সাধনগুলির তারতম্য বিচার করিয়া শেষে অর্থাৎ ১২শ শ্লোকে, কর্ম্মফলত্যাগের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা কিছু এখানেই নাই ; কিন্তু তৃতীয় (৩. ৮) পঞ্চম (৫. ২) এবং ষষ্ঠ (৬. ৪৬) অধ্যায়গুলিতেও এই অর্থই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং তদনুসারে ফলত্যাগরূপ কর্ম্মযোগের আচরণ জন্য স্থানে স্থানে অর্জ্জুনকে উপদেশও করিয়াছেন (গীতার. পৃ. ২৬৫-২৬৬)। কিন্তু গীতাধর্ম্ম হইতে যাহাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাহাদের পক্ষে এই কথা প্রতিকূল ; এইজন্য উহারা উপরের শ্লোকগুলির এবং বিশেষত ১২শ শ্লোকের পদগুলির অর্থ বদলাইবার প্রযত্ন করিয়াছে। নিছক জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ সাংখ্যটীকাকারদিগের ইহা অভিপ্রেত নহে যে, জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ ধরা হউক। এইজন্য তাঁহারা বলিয়াছেন যে, হয় জ্ঞান শব্দে 'পুস্তকের জ্ঞান' ধরিতে হইবে, অথবা কর্ম্মফলত্যাগের এই প্রশংসাকে অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবল প্রশংসা বুঝিতে হইবে। এই প্রকারই পাতঞ্জল-যোগমার্গীদিগের নিকটে অভ্যাস অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয় না এবং নিছক ভক্তিমার্গীদিগের নিকটে—অর্থাৎ যাহারা বলে যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মই করিবে না, তাহাদের নিকটে—ধ্যান অপেক্ষা অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা মান্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে গীতার

ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগসম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে ; এই সম্প্রদায় পাতঞ্জলযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে পৃথক, এবং এই কারণেই ঐ সম্প্রদায়ের কোনও টীকাকারও পাওয়া যায় না। অতএব আজকাল গীতার উপর যত টীকা পাওয়া যায়, সেগুলিতে কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা অর্থবাদাত্মক বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে ইহা ভুল। গীতাতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য মানিয়া লইলে এই শ্লোকের অর্থসম্বন্ধে কোনই গোলমাল থাকে না। যদি মানা যায় যে কর্ম্ম ছাড়িলে নির্ব্বাহ হয় না, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই হয় ; তবে স্বরূপত কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানমার্গ কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিবেচিত হয়, শুধু ইন্দ্রিয়সমূহেরই কসরত-কারী পাতঞ্জলযোগ কর্ম্মযোগ অপেক্ষা লঘু মনে হয় এবং সকল কর্ম্মেরই পরিত্যাগকারী ভক্তিমার্গও কর্ম্মযোগ অপেক্ষা স্বল্পযোগ্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইলে পর এই প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, কর্ম্মযোগে আবশ্যক ভক্তিযুক্ত সাম্যবুদ্ধি পাইবার উপায় কি। উপায় তিনটি—অভ্যাস জ্ঞান ও ধ্যান। তন্মধ্যে যদি কেহ অভ্যাসের সাধনা না করে তবে সে জ্ঞান অথবা ধ্যানের মধ্যে কোনও উপায় স্বীকার করিয়া লউক। গীতার উক্তি এই যে, এই উপায়গুলির আচরণ করা, যথোক্ত ক্রমানুসারে সুলভ। ১২শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যদি ইহাদের মধ্যে একটী উপায়ও না সাধিত হয়, তবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সে কর্ম্মযোগের আচরণ করাই একেবারে আরম্ভ করুক। এখন এস্থলে এই এক সংশয় আসে যে, যে অভ্যাস সাধন করে না এবং যাহার জ্ঞান-ধ্যান আসে না, সে কর্ম্মযোগ করিবেই কি প্রকারে? কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বলাই নিরর্থক। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই আপত্তির ভিতরে কোন প্রাণ নাই। ১২শ শ্লোকে ইহা বলেন নাই যে, সকল কর্ম্মের ফল 'একদম ত্যাগ কর ; বরঞ্চ ইহা বলিয়াছেন যে, প্রথমে ভগবানের ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া, (ততঃ) তদনন্তর ধীরে ধীরে এই বিষয় শেষে সিদ্ধ করিয়া লও। এবং এইরূপ অর্থ করিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। পূর্ব্ব অধ্যায়সমূহে বলিয়া আসিয়াছেন যে, কর্ম্মফলের স্বল্প আচরণের দ্বারাই নহে (গী. ২. ৪০), কিন্তু জিজ্ঞাসা (গী. ৬. ৪৪ এবং আমার রহস্য দেখুন) হইয়া গেলেও মনুষ্য আপনাআপনিই অন্তিম সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। অতএব এই মার্গে সিদ্ধিলাভের প্রথম সাধন বা সিঁড়ি হইতেছে কর্ম্মযোগের আশ্রয়গ্রহণ অর্থাৎ এই মার্গে যাইবার ইচ্ছা মনে হওয়া। কে বলিতে পারে যে, এই সাধন অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান অপেক্ষা সুলভ নহে? এবং ১২শ শ্লোকের ভাবার্থও ইহাই। কেবল ভগবদ্গীতাতে নহে, সূর্য্যগীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞানাদুপাস্তিরুৎকৃষ্টা কর্ম্মোৎকৃষ্টমুপাসনাৎ ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ।

"জ্ঞান অপেক্ষা উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান বা ভক্তি উৎকৃষ্ট, এবং উপাসনা অপেক্ষা কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই বেদান্ততত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিইপুরুষোত্তম" (সূর্য্যগী ৪. ৭৭)। সার কথা, ভগবদ্গীতার স্থির মত এই যে, কর্ম্মফল-ত্যাগরূপ যোগ অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-যুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সকল মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এবং ইহার কেবল

অনুকূল নহে, প্রত্যুত পোষক যুক্তিবাদ ১২শ শ্লোকে আছে। যদি উহা অপর কোন সম্প্রদায়ের রুচিকর না হয়, তবে তাহারা উহা ছাড়িয়া দিক ; কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বৃথা টানাবুনা যেন না করে। এই প্রকারে কর্ম্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ মার্গগামী (স্বরূপত কর্ম্মত্যাগীর নহে) যে সম ও শান্ত স্থিতি শেষে লাভ হয়, তাহারই বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, এইরূপ ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১৩) যে কাহাকেও দ্বেষ করে না, যে সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, যে দয়ালু, যে মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার-বিরহিত, যে দুঃখ ও সুখে সমভাব এবং ক্ষমাশীল, (১৪) যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সংযমী এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী, যে নিজের মন ও বুদ্ধিকে আমাতে অর্পণ করিয়া দিয়াছে, সে আমার (কর্ম্ম-) যোগী ভক্ত আমার প্রিয়। (১৫) যাহা হইতে লোকে ক্লেশ পায় না, এবং যে লোকসকলের নিকটে ক্লেশ পায় না, এই ভাবেই যে হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদে অলিপ্ত থাকে, সে-ই আমার প্রিয় (১৬) আমার সেই ভক্তই আমার প্রিয়, যে নিরপেক্ষ, পবিত্র ও দক্ষ অর্থাৎ সকল কাজেই আলস্য ত্যাগ করিয়া করে, যে (ফলের বিষয়ে) উদাসীন, যাহাকে কোনও বিকার বাধা দিতে পারে না, এবং যে (কাম্যফলের) সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ছাড়িয়া দিয়াছে। (১৭) যে আনন্দ মানে না, যে দ্বেষ করে না, যে শোক করে না এবং ইচ্ছা রাখে না, যে (কর্ম্মের) শুভ ও অশুভ ফল ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। (১৮) যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ সমান, এবং যাহার (কোন বিষয়েই) আসক্তি নাই, (১৯) যাহার নিকটে নিন্দা ও স্তুতি দুই-ই একপ্রকার, যে মিতভাষী, যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই যে সন্তুষ্ট, এবং যাহার চিত্ত স্থির, যে অনিকেত অর্থাৎ যাহার (কর্ম্মফলাশারূপ) ঠিকানা কোথাও থাকিয়া যায় নাই, সেই ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়।

রহস্য ঃ যাহারা গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া, সন্ন্যাস ধারণ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে পরিভ্রমণ করে (মনু. ৬. ২৫) সেই সকল যতিদিগের বর্ণনাতেও 'অনিকেত' শব্দ অনেকবার আসে এবং ইহার ধাত্বর্থ 'গৃহহীন'। অতএব এই অধ্যায়ের 'নির্ম্মম', 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' এবং অনিকেত' শব্দের কারণ এবং অন্যত্র গীতাতে 'ত্যক্তসর্ব্ব-পরিগ্রহঃ' (৪. ২১), অথবা 'বিবিক্তসেবী' (১৮. ৫২) ইত্যাদি যে সকল শব্দ আছে, তাহাদের ভিত্তিতে, সন্ন্যাসমার্গী টীকাকার বলেন যে, আমার মার্গের এই পরম ধ্যেয় "ঘর-দ্বার ছাড়িয়া কোনও ইচ্ছা না করিয়া জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করাই" গীতার প্রতিপাদ্য ; এবং তাঁহারা ইহার জন্য স্মৃতিগ্রন্থসমূহের সন্ন্যাস-আশ্রম প্রকরণের শ্লোক-গুলিকে প্রমাণ দেন। গীতা-বাক্যসমূহের এই নিছক সন্ন্যাস-প্রতিপাদক অর্থ সন্ন্যাস-সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে। কারণ গীতা অনুসারে 'নিরগ্নি' অথবা 'নিষ্ক্রিয়' হওয়া প্রকৃত সন্ন্যাস নহে ; পূর্ব্বে কয়েকবার গীতার এই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে (গী. ৫. ২ এবং ৬. ১. ২) যে কেবল ফলাশা ত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম্ম নহে। অতএব 'অনিকেত' পদের ঘর-দ্বার ত্যাগ করা অর্থ না করিয়া এরূপ করা উচিত, গীতার কর্ম্মযোগের সঙ্গে যাহার মিল হইতে পারে। গী. ৪. ২০শ শ্লোকে কর্ম্মফলে আশাহীন পুরুষেরই প্রতি 'নিরাশ্রয়' বিশেষণ লাগানো হইয়াছে ; এবং গী. ৬. ১মে ঐ অর্থেই "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং" শব্দ আসিয়াছে। 'আশ্রয়' ও 'নিকেত' এই দুই শব্দের অর্থ একই। অতএব অনিকেতের গৃহত্যাগী অর্থ না করিয়া, এরূপ করা উচিত যে গৃহ প্রভৃতিতে যাহার মনের স্থান বন্ধ পড়ে নাই। এই প্রকারই উপরের ১৬শ শ্লোকে যে 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' শব্দ আছে, উহারও অর্থ "সমস্ত কর্ম্ম বা উদ্যোগ পরিত্যাগী" করা উচিত নহে ; কিন্তু গীতা ৪. ১৯এ এই যে বলা হইয়াছে যে, "যাহার সমারম্ভ ফলাশাবিরহিত তাহার কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়" এইরূপ অর্থই অর্থাৎ "কাম্য আরম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী" করা উচিত। এই বিষয় গী. ১৮. ২ এবং ১৮. ৪৮ ও ৪৯ হইতে সিদ্ধ হয়। সার কথা, যাহার চিত্ত ঘর সংসারে, সন্তানসন্ততিতে, অথবা সংসারের অন্যান্য কাজে ডুবিয়া থাকে, তাহারই পরে দুঃখ হয়। অতএব গীতার এইটুকুই বক্তব্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত হইতে দিও না। এবং মনের এই বৈরাগ্য স্থিতিকেই প্রকাশ করিবার জন্য গীতাতে 'অনিকেত' এবং 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী' প্রভৃতি শব্দ স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনায় আসিয়াছে। এই শব্দই যতিদিগের অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীদের বর্ণনাতেও স্মৃতিগ্রন্থসমূহে আসিয়াছে। কিন্তু কেবল এই বনিয়াদের উপরেই ইহা বলা যায় না যে, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসই গীতার প্রতিপাদ্য। কারণ ইহার সঙ্গেই গীতার আর একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার বুদ্ধিতে পূর্ণ বৈরাগ্য বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষেরও এই বিরক্ত বুদ্ধিতেই ফলাশা ছাড়িয়া শাস্ত্রপ্রাপ্ত সকল কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত। এই পূর্ব্বাপর সমগ্র সম্বন্ধ না বুঝিয়া গীতাতে যেখানেই 'অনিকেত' শব্দের অনুরূপ বৈরাগ্যবোধ শব্দ পাওয়া যায়, তাহার উপরেই সমস্ত ঝোঁক রাখিয়া বলিয়া দেওয়া ঠিক নহে যে, গীতাতে কর্ম্মসন্ন্যাস-প্রধান মার্গই প্রতিপাদ্য।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) উপরে কথিত এইঅমৃততুল্য ধর্ম্ম যে মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করে, সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

রহস্য ঃ ইহা বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ৪৭ ; ৭. ১৮) যে, ভক্তিমান জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ঐ বর্ণনা অনুসারেই ভগবান এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার অত্যন্ত প্রিয় কে অর্থাৎ এস্থলে পরম ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মযোগীর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানই গী. ৯. ২৯শ শ্লোকে বলিতেছেন যে, "আমার নিকট সমস্তই এক, কেহ বিশেষ প্রিয় অথবা দ্বেষ্য নাই।" দেখিতে ইহা বিরোধ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু ইহা জানিলে কোনই বিরোধ থাকিবে না যে, এক বর্ণনা সগুণ উপাসনার অথবা ভক্তিমার্গের এবং দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি অথবা কর্ম্মবিপাক-দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণের শেষে (৩৬৮-৩৬৯ পৃঃ) এই বিষয়ের বিচার আছে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই বিষয় সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, অনির্দ্দেশ্য ও অব্যক্ত পরমেশ্বরের (বুদ্ধি দ্বারা) চিন্তা করিলে অন্তে মোক্ষ তো লাভ হয়; কিন্তু উহা অপেক্ষা শ্রদ্ধাসহ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত স্বরূপের প্রতি ভক্তি করিয়া পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে, ঐ মোক্ষই সুলভ রীতিতে লাভ হয়। কিন্তু এইটুকু হইতেই জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সমাপ্ত হয় না। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইবার জন্য বহিঃসৃষ্টির ক্ষর-অক্ষর-বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যের শরীর ও আত্মার অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেরও বিচার করিতে হয়। এইরূপেই যদি সাধারণ ভাবে জানিয়া লইলে যে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রকৃতির কোন্ গুণ হইতে এই বিস্তার হয় এবং উহার ক্রম কি, ইহা না বলিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সম্পূর্ণ হয় না। অতএব ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচার, এবং পরবর্ত্তী চার অধ্যায়ে গুণত্রয়ের বিভাগ বলিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে। সার কথা, তৃতীয় ষড়ধ্যায়ী স্বতন্ত্র নহে; কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে উহারই পূর্ত্তি এই ষড়ধ্যায়ীতে করা হইয়াছে। গীতারহস্য ৩৯৪-৩৯৫ পৃঃ দেখুন। গীতার কয়েকটি পুঁথিতে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরম্ভে, এই শ্লোক পাওয়া যায় "অর্জ্জুন উবাচ —প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥" এবং উহার অর্থ এই—"অর্জ্জুন বলিলেন, আমার প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল।" কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার গীতাতে কিরূপে আসিল, তাহা না জানিয়া কেহ পশ্চাৎ হইতে এই শ্লোক গীতাতে ঢুকাইয়া দিয়াছে। টীকাকার এই শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত মানেন, এবং প্রক্ষিপ্ত না মানিলে গীতার শ্লোকের সংখ্যাও সাতশতের উপর এক বাড়িয়া যায়। অতএব এই শ্লোককে আমিও প্রক্ষিপ্ত মানিয়াই শাঙ্করভাষ্য অনুসারেই এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছি।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—(১) হে কৌন্তেয়! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলে। ইহাকে (শরীরকে) যে জানে তাহাকে তদ্বিদ অর্থাৎ এই শাস্ত্রজ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

(২) হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই বোঝ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে।

রহস্য ঃ প্রথম শ্লোকে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই দুই শব্দের অর্থ দিয়াছি; এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলিয়াছি যে ক্ষেত্রজ্ঞ আমি পরমেশ্বর হইতেছি, অথবা যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। দ্বিতীয় শ্লোকের চাপি—ও শব্দের অর্থ এই—কেবল ক্ষেত্রজ্ঞই নহে, প্রত্যুত ক্ষেত্রও আমিই। কারণ যে পঞ্চ মহাভূত হইতে ক্ষেত্র বা শরীর প্রস্তুত হয়, তাঁহা প্রকৃতি হইতে নির্ম্মিত হয়; এবং সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে, এই প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই কনিষ্ঠ বিভূতি (৭. ৪; ৮. ৪; ৯. ৮)। এই ভাবে ক্ষেত্র বা শরীর পঞ্চ মহাভূত হইতে প্রস্তুত হইতে থাকিবার কারণে ক্ষর-অক্ষর-বিচারে যাহাকে 'ক্ষর' বলে, সেই বর্গে ক্ষেত্রের সমাবেশ হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞই পরমেশ্বর। এই প্রকার ক্ষর-অক্ষর-বিচারের সমানই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারও পরমেশ্বরের জ্ঞানের এক ভাগ দাঁড়াইয়া যায় (গীতার, ১২৫-১২৯ পৃঃ)। এবং এই অভিপ্রায়কেই মনে আনিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে এই বাক্য আসিয়াছে যে, "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান।" যিনি অদ্বৈত বেদান্তকে মানেন না, তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ ও আমি" এই বাক্যের টানাবুনা করিতে হয় এবং প্রতিপাদন করিতে হয় যে, এই বাক্যের দ্বারা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এবং 'আমি পরমেশ্বর' এর অভেদভাব দেখানো হয় নাই। এবং কেহ কেহ 'আমার' (মম) এই পদের অন্বয় 'জ্ঞান' শব্দের সঙ্গে না করিয়া 'মতং' অর্থাৎ 'স্বীকৃত হইয়াছে' শব্দের সঙ্গে করিয়া এই অর্থ করেন যে "ইহার জ্ঞানকে আমি জ্ঞান মনে করি"। কিন্তু এই অর্থ সহজ নহে। অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে দেহে অবস্থিত আত্মা (অধিদেব) আমিই অথবা "যিনি পিণ্ডে আছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে আছেন"; এবং সপ্তমেও ভগবান 'জীব'কে নিজেরই শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বলিয়াছেন (৭. ৫)। এই অধ্যায়েরই ২২শ ও ৩১শ শ্লোকেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এখন বলিতেছেন যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কোথায় ও কে করিয়াছে—

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৩) ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, উহার বিকার কি কি, (উহার মধ্যেও) কি হইতে কি হয়; এই প্রকারই উহা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কে এবং তাঁহার প্রভাব কি—ইহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন। (৪) ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহেও এই বিষয় গীতা হইয়াছে, যাহা নানা প্রকারে বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক (অনেক) ঋষি (কার্য্যকারণরূপ) হেতু দেখাইয়া পূর্ণরূপে স্থির করিয়াছেন।

রহস্যঃ গীতারহস্যের পরিশিষ্ট প্রকরণে (৪৫৬-৪৬২ পৃঃ) আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, এই শ্লোকে ব্রহ্মসূত্র শব্দে বর্ত্তমান বেদান্তসূত্র উদ্দিষ্ট; উপনিষদ কোন এক ঋষির কোন একটী গ্রন্থ নহে। অনেক ঋষিদিগের বিভিন্ন কালে বা স্থানে যে অধ্যাত্মবিচারের স্ফুরণ হইয়াছিল, সেই বিচার কোনও পারস্পরিক সম্বন্ধ বিনা বিভিন্ন

উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উপনিষদ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক স্থানে উহাদিগকে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উপরের শ্লোকের প্রথম চরণে যে 'বিবিধ, ও 'পৃথক্' শব্দ আছে, সেগুলি উপনিষদসমূহের এই এই সঙ্কীর্ণ স্বরূপই জানাইয়া দিতেছে। এই উপনিষদসমূহ সঙ্কীর্ণ ও পরস্পরবিরুদ্ধ হইবার কারণে আচার্য্য বাদরায়ণ উহাদের সিদ্ধান্তসমূহের একবাক্যতা করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র রচনা করিলেন। এবং এই সূত্রগুলিতে উপনিষদসমূহের সকল বিষয় লইয়া প্রমাণসহ. অর্থাৎ কার্য্যকারণ প্রভৃতি হেতু দেখাইয়া পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের সম্বন্ধে সকল উপনিষদ হইতে একই সিদ্ধান্ত কিরূপে বাহির হয়; অর্থাৎ উপনিষদসমূহে রহস্য বুঝিবার জন্য বেদান্তসূত্রের সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়। অতএব এই শ্লোকে উভয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তৃতীয় পাদের প্রথম ১৬ সূত্রের ক্ষেত্রের বিচার এবং পুনরায় ঐ পাদের শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কারা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে এই বিচার আছে. এইজন্য উহাকে 'শারীরক সূত্র' অর্থাৎ শরীর বা ক্ষেত্রের বিচারকারী সূত্রও বলে। ইহা বলিয়া চুকিয়াছি যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কে কোথায় করিয়াছে; এখন বলিতেছেন যে ক্ষেত্র কি—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।। ৫ ।।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।। ৬ ।।

অনুবাদঃ (৫) (পৃথিবী আদি পাঁচ স্থূল) মহাভূত. অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহান), অব্যক্ত (প্রকৃতি), দশ (সূক্ষ্ম) ইন্দ্রিয় এবং এক (মন); এবং (পাঁচ) ইন্দ্রিয়ের পাঁচ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই সূক্ষ্ম) বিষয়, (৬) ইচ্ছা. দ্বেষ, সুখ, সংঘাত, চেতনা অর্থাৎ প্রাণ আদির ব্যক্ত ব্যাপার, এবং ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, এই (৩৭ তত্ত্বের) সমুদায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে।

রহস্যঃ এই হইল ক্ষেত্র এবং উহার বিকারের লক্ষণ। পরের শ্লোকে সাংখ্যবাদীর পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে, পুরুষকে ছাড়িয়া শেষ চব্বিশ তত্ত্ব আসিয়া গিয়াছে। এই চব্বিশ তত্ত্বেই মনের সমাবেশ হইবার কারণে ইচ্ছা. দ্বেষ প্রভৃতি মনোধর্ম্ম পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কণাদ-মতানুযায়ীদের মতে এই ধর্ম্ম আত্মার। এই মত মানিয়া লইলে সংশয় হয় যে, ক্ষেত্রেই এই গুণসমূহের সমাবেশ হয় কি না। অতএব ক্ষেত্র শব্দের ব্যাখ্যাকে নিঃসন্দিগ্ধ করিবার জন্য এখানে স্পষ্টরূপে ক্ষেত্রতেই ইচ্ছা-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বসমূহের সমাবেশ করিয়া লইয়াছেন এবং উহাতেই ভয়-অভয় আদি অন্য দ্বন্দ্বসমূহেরও লক্ষণ দ্বারা সমাবেশ হইয়া যায়। সকলের সংঘাত অর্থাৎ সমূহ ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে. ইহা দেখাইবার জন্য উহার গণনা ক্ষেত্রতেই করা গিয়াছে। কয়েকবার 'চেতনা' শব্দের 'চৈতন্য' অর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখানে চেতনা দ্বারা 'জড়দেহে প্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ব্যাপার, অথবা জীবিতাবস্থার চেষ্টা', এই অর্থই বিবক্ষিত এবং উপরের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে. জড় বস্তুতে এই চেতনা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা চিচ্ছক্তি অথবা চৈতন্য, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, ক্ষেত্র হইতে পৃথক থাকে।

'ধৃতি' শব্দের ব্যাখ্যা পরে গীতাতেই (১৮. ৩৩) করা হইয়াছে, তাহা দেখুন। ষষ্ঠ শ্লোকের 'সমাসেন' পদের অর্থ "এই সকলের সমুদয়।" বিস্তৃত বিবরণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণের শেষে (১২৫ ও ১২৬ পৃঃ) পাইবেন। প্রথমে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের ব্যাখ্যা করিয়া ফের খুলিয়া বলিতেছেন যে, 'ক্ষেত্র' কি। এখন মনুষ্যের স্বভাবের উপর জ্ঞানের যে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, জ্ঞান কাহাকে বলে; এবং পরে জ্ঞেয়ের স্বরূপ বলিয়াছেন। এই দুই বিষয় দেখিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বস্তুত উহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারেরই দুই ভাগ। কারণ আরম্ভেই ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থ পরমেশ্বর বলিয়া আসিয়াছেন। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান এবং উহারই স্বরূপ পরবর্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে—মধ্যেই কোনও মনগড়া বিষয় লিখিত হয় নাই।

অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ।। ৭ ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ।। ৮ ।।
অসক্তিরনভিষ্বংগঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।। ৯ ।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ।। ১০ ।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ।। ১১ ।।

অনুবাদঃ (৭) মানহীনতা, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, পবিত্রতা, স্থিরতা, মনোনিগ্রহ, (৮) ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ে বিরক্তি, অহঙ্কারহীনতা ও জন্ম-মৃত্যু-বার্দ্ধক্য ব্যাধি এবং দুঃখকে (নিজের পশ্চাতে সংলগ্ন) দোষ জানা; (৯) (কর্ম্মে) অনাসক্তি, সন্তানসন্ততি ও ঘরসংসার প্রভৃতিতে বেশী লিপ্ত না হওয়া, ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে চিত্তের সর্ব্বদা একই ভাব রাখা, (১০) এবং আমাতে অনন্যভাবে অটল ভক্তি, 'বিবিক্ত' অর্থাৎ পৃথক অথবা একান্ত স্থানে থাকা, সাধারণ লোকের জমায়েৎ পছন্দ না করা, (১১) অধ্যাত্ম জ্ঞানকে নিত্য জানা এবং তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পরিশীলন—এই সকলকে জ্ঞান বলে; ইহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু সে সমস্ত অজ্ঞান।

রহস্যঃ সাংখ্যমতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান; এবং তাহা এই অধ্যায়েই পরে বলা হইয়াছে (১৩. ১৯-২৩; ১৪. ১৯)। এই প্রকারেই অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২০) জ্ঞানের স্বরূপের এই ব্যাপক লক্ষণ বলিয়াছেন—"অবিভক্তং বিভক্তেষু"। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের অর্থ বুদ্ধি দ্বারা ইহাই জানিয়া লইতে হয় না যে অমুক অমুক বিষয় অমুক প্রকার করা হইয়াছে। অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, দেহ-স্বভাবের উপর ঐ জ্ঞানের সাম্যবুদ্ধিরূপ পরিণাম হওয়া চাই; অন্যথা ঐ জ্ঞান অপূর্ণ বা কাঁচা থাকে। অতএব ইহা বলেন নাই যে, বুদ্ধি দ্বারা অমুক অমুক জানিয়া লওয়াই জ্ঞান, বরঞ্চ উপরের পাঁচ শ্লোকে জ্ঞানের এই প্রকার

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যখন উক্ত কুড়ি গুণ (মান ও দম্ভ দূর হওয়া, অহিংসা, অনাসক্তি, সমবুদ্ধি ইত্যাদি) মনুষ্যের স্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহাকে জ্ঞান বলিতে হইবে ; (গীতার. ২১৫. ও ২১৬ পৃঃ) । দশম শ্লোকে "বিবিক্ত স্থানে থাকা এবং জমায়েৎ পছন্দ না করা"ও জ্ঞানের এক লক্ষণ বলিয়াছেন ; ইহা হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সন্ন্যাসমার্গই গীতার অভীষ্ট। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, এই মত ঠিক নহে এবং এইরূপ অর্থ করাও উচিত নহে (গী. ১২. ১৯ এর রহস্য এবং গীতার. ২৪৩ পৃঃ দেখুন) । এখানে এইটুকু বিচার করিয়াছেন যে, 'জ্ঞান' কি ; এবং ঐ জ্ঞান সন্তানসন্ততিতে, ঘরসংসারে অথবা লোকের জমায়েতে অনাসক্তি, এবং এ বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই । এখন পরবর্ত্তী প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান হইয়া গেলে, এই অনাসক্ত বুদ্ধিতেই সন্তানসন্ততির মধ্যে অথবা সংসারে থাকিয়া প্রাণীমাত্রের হিতার্থে জাগতিক ব্যবহার করা যায় অথবা যায় না ; এবং কেবল জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইতেই ইহার নির্ণয় করা উচিত নহে । কারণ গীতাতেই ভগবান অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া উহা অনাসক্ত-বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের জন্য করিতে থাকিবে এবং ইহারই সিদ্ধির জন্য জনকের আচরণ এবং নিজের ব্যবহারের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন (গী. ৩. ১৯-২৫ ; ৪. ১৪) । সমর্থ শ্রীরামদাস স্বামীর চরিত্র হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে, সহরে থাকিবার লালসা না থাকিলেও জাগতিক ব্যবহার কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়া কিরূপে করা যায় (দাসবোধ ১৯. ৬. ২৯ এবং ১৯. ৯. ১১) । ইহা জ্ঞানের লক্ষণ হইল, এখন জ্ঞেয়ের স্বরূপ বলিতেছেন—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ।। ১২ ।।
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।। ১৩ ।।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ।। ১৪ ।।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ।। ১৫ ।।
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্ত্তৃ চ যজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।। ১৬ ।।
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ।। ১৭ ।।

অনুবাদ : (১২) (এখন তোমাকে) যাঁহাকে জানিলে 'অমৃত' অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়, তাহা বলিতেছি । (তিনি) অনাদি (সকল হইতে) শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম । না তাঁহাকে 'সৎ' বলে, না তাঁহাকে 'অসৎ'ই বলে । (১৩) তাঁহার সকল দিকে হস্তপদ, সকল দিকে

চক্ষু, মস্তক ও মুখ ; সকল দিকে কান আছে ; এবং তিনিই এই লোকে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন । (১৪) (তাঁহাতে) সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস আছে ; কিন্তু তাঁহার কোনও ইন্দ্রিয় নাই ; তিনি (সকল হইতে) অসক্ত অর্থাৎ পৃথক্ হইয়াও সকলকে পালন করেন ; এবং নির্গুণ হইলেও গুণসমূহ উপভোগ করেন ।

অনুবাদ : (১৫) (তিনি) সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরেও আছেন ; অচর এবং চরও ; সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তিনি অবিজ্ঞেয় ; এবং দূরে থাকিয়াও নিকটে আছেন । (১৬) তিনি (তত্ত্বত) 'অবিভক্ত' অর্থাৎ অখণ্ডিত হইলেও সকল ভূতে (নানাভাবে) বিভক্ত হইয়া আছেন মনে হয় ; এবং (সকল) ভূতের পালনকর্ত্তা, গ্রাসকর্ত্তা এবং সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহাকেই জানিতে হইবে । (১৭) তাঁহাকেই তেজেরও তেজ, এবং অন্ধকারের অতীত বলে ; জ্ঞান, যাহা জানিবার যোগ্য সেই (জ্ঞেয়) এবং জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা (ই) জ্ঞাতব্যও (তিনিই) সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত ।

রহস্য : অচিন্ত্য ও অক্ষর পরব্রহ্মের—যাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা পরমাত্মাও বলে—(গী. ১৩. ২২) যে বর্ণনা উপরে আছে, তাহা অষ্টম অধ্যায়োক্ত অক্ষর ব্রহ্মের বর্ণনার ন্যায় (গী. ৮. ৯-১১) উপনিষদের ভিত্তিতে করা হইয়াছে । ত্রয়োদশ শ্লোক সম্পূর্ণ (শ্বে. ৩. ১৬) এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের এই অর্দ্ধাংশ "সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের অবভাসক, তথাপি সকল ইন্দ্রিয়বিরহিত" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩. ১৭) যেমনটী-তেমনটী আছে ; এবং "দূর হইলেও নিকটবর্ত্তী" এই শব্দ ঈশাবাস্য (৫) এবং মুণ্ডক (৩. ১. ৭) উপনিষদে পাওয়া যায় । এইরূপই তেজের তেজ" এই শব্দ বৃহদারণ্যকের (৪. ৪. ১৬) এবং "অন্ধকারের অতীত" এই শব্দ শ্বেতাশ্বতরের (৩. ৮) । এই প্রকারই "যাঁহাকে না সৎ বলা যায়, আর না অসৎ বলা যায়" এই বর্ণনা ঋগ্বেদের "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" এই ব্রহ্মবিষয়ক প্রসিদ্ধ সূক্তকে (ঋ. ১০. ১২৯) লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে । 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের অর্থের বিচার গীতারহস্য ২১১-২১২ পৃষ্ঠাতে সবিস্তার করা হইয়াছে; এবং ফের গীতা ৯০১৯শ শ্লোকের রহস্যতেও করা হইয়াছে । গীতা ৯. ১৯এ বলিয়াছেন যে, 'সৎ' ও 'অসৎ' আমিই এখন এই বর্ণনা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে প্রকৃত ব্রহ্ম না 'সৎ' এবং না 'অসৎ' । কিন্তু বস্তুত এই বিরোধ প্রকৃত নহে । কারণ 'ব্যক্ত' (ক্ষর) সৃষ্টি এবং 'অব্যক্ত' (অক্ষর) সৃষ্টি, এই দুই যদিও পরমেশ্বরেরই স্বরূপ ; তথাপি প্রকৃত পরমেশ্বরতত্ত্ব এই দুয়ের অতীত অর্থাৎ পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় । এই সিদ্ধান্ত গীতাতেই প্রথমে 'ভূতভৃন্ন চ' 'ভূতস্থঃ'-এ (গী. ৯. ৫) এবং পরে আবার (১৫. ১৬. ১৭) পুরুষোত্তম-লক্ষণে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে । নির্গুণ ব্রহ্ম কাহাকে বলে, এবং জগতে থাকিয়াও তিনি জগতের বাহিরে কিরূপে আছেন, অথবা তিনি 'বিভক্ত' নানারূপাত্মক প্রতীয়মান হইলেও মূলে অবিভক্ত অর্থাৎ একই কি প্রকারে থাকেন, ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের নবম প্রকরণে (১৮১ হইতে পরে) করা হইয়াছে । ষোড়শ শ্লোকে 'বিভক্তমিব'র অনুবাদ এই—"মনে কর বিভক্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে" । এই 'ইব' শব্দ উপনিষদে অনেকবার জগতের নানাত্ব ভ্রান্তিজনক এবং একত্বই সত্য, এই অর্থেই আসিয়াছে । উদাহরণ যথা, "দ্বৈতমিব ভবতি", "য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি (বৃ. ২. ৪. ১৪ ; ৪. ৪. ১৯ ; ৪. ৩. ৭) । অতএব ইহা সম্পষ্ট যে গীতাতে এই অদ্বৈত

সিদ্ধান্তই প্রতিপাদ্য. নানা নামরূপাত্মক মায়া ভ্রম এবং তন্মধ্যে অবিভক্তরূপে অবস্থিত ব্রহ্মই সত্য। গীতা ১৮. ২০তে আবার বলিয়াছেন যে, "অবিভক্তং বিভক্তেষু", অর্থাৎ নানাত্বে একত্ব দেখা সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। গীতারহস্যের অধ্যাত্মপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সাত্ত্বিক জ্ঞানই ব্রহ্ম। গীতার. পৃঃ ১৮৭. ১৮৮ ; পৃঃ ১১৫-১১৬ দেখুন।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ঃ (১৮) এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিলাম যে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কাহাকে বলে। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার স্বরূপ লাভ করে।

রহস্য ঃ অধ্যাত্ম বা বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিচার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'জ্ঞেয়'ই ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা পরব্রহ্ম এবং 'জ্ঞান' দ্বিতীয় শ্লোকে ব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান, এই কারণে ইহাই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের সমস্ত জ্ঞানের নিরূপণ হইল। ১৮শ শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত বলিয়া দিয়াছেন যে, যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তখন পরে ইহা স্বতই সিদ্ধ যে উহার ফলও মোক্ষই হইবে। বেদান্তশাস্ত্রের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এইখানে সমাপ্ত হইল। কিন্তু প্রকৃতি হইতেই পাঞ্চভৌতিক বিকারবান ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, এইজন্য এবং সাংখ্য যাহাকে 'পুরুষ' বলে তাহাকেই অধ্যাত্মশাস্ত্র 'আত্মা' বলে, এইজন্য সাংখ্যের দৃষ্টিতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই প্রকৃতিপুরুষের বিবেক হইতেছে। গীতাশাস্ত্র প্রকৃতি ও পুরুষকে সাংখ্যের ন্যায় দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন না ; সপ্তম অধ্যায়ে (৭. ৪. ৫) বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, দুই রূপ। কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈতের বদলে গীতাশাস্ত্রের এই অদ্বৈতকে একবার স্বীকার করিলে, তাহার পর প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক সাংখ্যের জ্ঞান গীতার অমান্য নহে। এবং ইহাও বলিতে পারি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানেরই রূপান্তর প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক (গীতার. প্র. ৭ দেখুন) এই জন্যই এ পর্য্যন্ত উপনিষদের ভিত্তিতে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহারই এখন সাংখ্যের পরিভাষাতে, কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈতকে অস্বীকার করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষবিবেকের রূপে বলিতেছেন—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি জান। বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জান।

রহস্য ঃ সাংখ্যশাস্ত্রের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ, দুই কেবল অনাদি নহে প্রত্যুত স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূও বটে। বেদান্তী বলেন যে, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা না স্বয়ম্ভূ এবং না স্বতন্ত্র (গী. ৪. ৫. ৬)। কিন্তু ইহা [illegible] না, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি কবে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং পুরুষ (জীব)

পরমেশ্বরেরই অংশ (গী. ১৫. ৭) ; এই কারণে বেদান্তীদের এইটুকু মান্য যে দুই-ই অনাদি। এই বিষয়ের অধিক আলোচনা গীতারহস্যের ৭ম প্রকরণে এবং বিশেষভাবে পৃঃ ১৪০-১৪৫ তে, এবং ১০ম প্রকরণের ২২৭-২২৯তে করা হইয়াছে।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) কার্য্য অর্থাৎ দেহের এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বের জন্য প্রকৃতি কারণ উক্ত হয় ; এবং (কর্ত্তা না হইলেও) সুখদুঃখের ভোগের জন্য পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) কারণ উক্ত হয়।

রহস্য ঃ এই শ্লোকে 'কার্য্যকরণের' স্থানে 'কার্য্যকারণ' পাঠও আছে, এবং তখন উহার এই অর্থ হয়—সাংখ্যের মহৎ আদি তেইশ তত্ত্ব একক হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় এই কার্য্যকারণক্রমে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত ব্যক্ত সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে প্রস্তুত হয়। এই অর্থও মন্দ নহে ; কিন্তু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারে ক্ষেত্রের উৎপত্তি বলা প্রাসঙ্গিক হয় না। প্রকৃতি হইতে জগত উৎপন্ন হইবার বর্ণনা তো পূর্ব্বেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে হইয়া গিয়াছে। অতএব 'কার্য্যকরণ' পাঠই এস্থলে অধিক প্রশস্ত দেখা যাইতেছে। শাঙ্করভাষ্যে এই 'কার্য্যকরণ' পাঠই আছে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ঃ (২১) কারণ পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ উপভোগ করে ; এবং (প্রকৃতির) গুণসমূহের এই সংযোগ পুরুষের ভালমন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।

রহস্য ঃ প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পারিক সম্বন্ধের ও ভেদের এই বর্ণনা সাংখ্যশাস্ত্রের (গীতার. পৃঃ ১৩৪-১৪১ দেখুন)। এখন, বেদান্তীগণ পুরুষকে পরমাত্মা বলেন, ইহা বলিয়া সাংখ্য ও বেদান্তের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং এইরূপ করিলে প্রকৃতি-পুরুষবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারের সম্পূর্ণ একবাক্যতা হইয়া যায়।

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ঃ (২২) (প্রকৃতির গুণসমূহের) উপদ্রষ্টা অর্থাৎ নিকটে বসিয়া দর্শক অনুমোদনকারী, ভর্ত্তা অর্থাৎ (প্রকৃতির গুণসমূহের) পরিবর্দ্ধক, এবং উপভোক্তাকেই এই দেহে পরমপুরুষ, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলে। (২৩) এই প্রকারে পুরুষ (নির্গুণ) এবং প্রকৃতিকেই যে গুণসহিত জানে, সে যে প্রকার আচরণ করুক না কেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

রহস্য ঃ ২২শ শ্লোকে যখন ইহা স্থির হইল যে পুরুষই দেহে পরমাত্মা, তখন সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে পুরুষের যে উদাসীনত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব তাহাই আত্মার অকর্ত্তৃত্ব হইয়া যায় এবং এই প্রকারে সাংখ্যের উপপত্তির সহিত বেদান্তের একবাক্যতা হইয়া যায়। কোন কোন বেদান্তী গ্রন্থকার মনে করেন যে, সাংখ্যবাদী বেদান্তের শত্রু; অতএব অনেক বেদান্তী সাংখ্য-উপপত্তিকে সর্ব্বথা ত্যাজ্য মনে করেন। কিন্তু গীতা এরূপ করেন নাই; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারের একই বিষয়, একবার বেদান্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয়বার (বেদান্তের অদ্বৈত মতকে না ছাড়িয়াই) সাংখ্য দৃষ্টিতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা হইতে গীতাশাস্ত্রের সমবুদ্ধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাও বলিতে পারি যে, উপনিষদের এবং গীতার বিচারে এই এক গুরুতর প্রভেদ আছে (গীতার. পরিশিষ্ট ৪৫২ পৃঃ দেখুন)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যদিও সাংখ্যের দ্বৈতবাদ গীতার মান্য নহে, তথাপি উহার প্রতিপাদনে যাহা কিছু যুক্তিসঙ্গত জানা যায় তাহা গীতার অমান্য নহে। দ্বিতীয় শ্লোকেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান। এখন প্রসঙ্গ অনুসারে সংক্ষেপে পিণ্ডের জ্ঞান ও দেহস্থিত পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্পাদন করিয়া মোক্ষলাভের মার্গ বলিতেছেন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে;
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ (২৪) কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে দেখে; কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা এবং কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা। (২৫) কিন্তু এই প্রকারে যাহার (আপনাপনিই) জ্ঞান হয় না, সে অপরের নিকট শুনিয়া (শ্রদ্ধা দ্বারা পরমেশ্বরের) ভজনা করে। শ্রুত বিষয়কে প্রমাণ মানিয়া আচরণকারী এই পুরুষও মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

রহস্য ঃ এই দুই শ্লোকে পাতঞ্জলযোগ অনুসারে ধ্যান, সাংখ্যমার্গ অনুসারে জ্ঞানোত্তর কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মযোগমার্গ অনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করা, এবং জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধা দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস রাখিয়া পরমেশ্বরের ভক্তি করা (গী. ৪. ৩৯), এই আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন মার্গ বলিয়া গিয়াছেন। যে কোন মার্গেই যে যাউক না কেন, অন্তে তাহার ভগবানের জ্ঞান হইয়া মোক্ষলাভ হয়ই। তথাপি প্রথমে এই যে সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে যে, লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, তাহা ইহা দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না। এই প্রকারে সাধন বলিয়া সাধারণভাবে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার পরের শ্লোকে করিয়াছেন এবং উহাতেও বেদান্তের সহিত কাপিল সাংখ্যকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মনে রাখিও যে, স্থাবর বা জঙ্গম যে কোন বস্তুর নির্ম্মাণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ দ্বারা হয়। (২৭) সর্ব্বভূতে একভাবে অবস্থিত, এবং সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও যাঁহার নাশ হয় না, এইরূপ পরমেশ্বরকে যিনি দেখিয়া লইয়াছেন, বলিতে হইবে যে তিনিই (সত্য তত্ত্বকে) জানিয়াছেন। (২৮) ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র একভাবে ব্যাপ্ত জানিয়া (যে পুরুষ) আপনি আপনাকে আঘাত করে না, অর্থাৎ নিজে নিজে ভাল মার্গে লাগিয়া যায়, সে-ই এই কারণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

রহস্য ঃ ২৭শ শ্লোকে পরমেশ্বরের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে গী. ৮. ২০শ শ্লোকে আসিয়াছে এবং উহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে করা গিয়াছে (গীতার. পৃঃ ১১০ ও ২২১)। এই প্রকারই ২৮ম শ্লোকে আবার সেই বিষয়ই বলা হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে (গী. ৬. ৫-৭) বলা হইয়াছিল যে, আত্মা নিজের বন্ধু এবং উহাই নিজের শত্রু। এই প্রকারে ২৬. ২৭ ও ২৮শ শ্লোকগুলিতে, সকল প্রাণীর বিষয়ে সাম্যবুদ্ধিরূপ ভাবের বর্ণনা শেষ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহা জানিলে কি হয়—

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) যে ইহা জানিয়াছে যে, (সমস্ত) কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতি হইতেই কৃত হয়, এবং আত্মা অকর্ত্তা অর্থাৎ কিছুই করে না, বলিতে হইবে যে, সে (সত্য তত্ত্বকে) জানিয়া লইয়াছে। (৩০) যখন সকল ভূতের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ নানাত্ব একতা হইতে (দেখিতে থাকে), এবং এই (একতা) হইতেই (সমস্ত) বিস্তার দেখিতে থাকে, তখন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

রহস্য ঃ এখন বলিতেছেন যে আত্মা নির্গুণ, অলিপ্ত ও অক্রিয় কি প্রকারে হয়—

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ (৩১) হে কৌন্তেয় ! অনাদি ও নির্গুণ হইবার কারণে এই অব্যক্ত পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও কোন কিছু করেন না, এবং তাঁহাতে (কোনও কর্ম্মের) লেপ অর্থাৎ বন্ধন লাগে না। (৩২) যেমন আকাশ চারিদিকে ভরিয়া আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম হইবার কারণে উহাতে (কোন কিছুর) লেপ লাগে না, সেইরূপই দেহে সর্ব্বত্র থাকিলেও আত্মাতে (কোন কিছুরই) লেপ লাগে না। (৩৩) হে ভারত ! যে প্রকার এক সূর্য্য সমস্ত জগত প্রকাশিত করে, সেইরূপই ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে প্রকাশিত করে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৪) এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানরূপনেত্রে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ, এবং সর্ব্বভূতের (মূল) প্রকৃতির মোক্ষ, যে জানে সে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

রহস্য ঃ ইহা সম্পূর্ণ প্রকরণের উপসংহার। 'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ' শব্দের অর্থ আমি সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে করিয়াছি। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, মোক্ষ পাওয়া বা না পাওয়া আত্মার অবস্থা নহে, কারণ উহা তো সর্ব্বদাই অকর্ত্তা ও অসঙ্গ ; কিন্তু প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গবশত উহা নিজেতে কর্ত্তৃত্বের আরোপ করে, এইজন্য যখন উহার এই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় তখন উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি ছাড়িয়া যায়, অর্থাৎ উহারই মোক্ষ হইয়া যায় এবং ইহার পিছনে উহার পুরুষের সম্মুখে নাচা বন্ধ হইয়া যায়। অতএব সাংখ্যমতবাদী প্রতিপাদন করেন যে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বন্ধ ও মোক্ষ উভয় অবস্থা প্রকৃতিরই হইতেছে (সাংখ্যকারিকা ৬২ এবং গীতারহস্য পৃঃ ১৪২-১৪৩ দেখুন)। আমি জানিতেছি যে, সাংখ্যের উপরি-লিখিত সিদ্ধান্তের অনুসারেই এই শ্লোকে 'প্রকৃতির মোক্ষ' এই শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ এই শব্দের এই অর্থও করেন যে, "ভূতেভ্যঃ প্রকৃতেশ্চ মোক্ষঃ"—পঞ্চমহাভূত ও প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ মায়াত্মক কর্ম্ম হইতে আত্মার মোক্ষ হয়। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিবেক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানা যায় (গী. ১৩. ৩৪) ; নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা জানা যায় (গী. ৯. ২) ; এবং বিশ্বরূপদর্শন পরম ভগবদ্ভক্তেরও কেবল দিব্য-চক্ষুরই গোচর (গী. ১১. ৮)। নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিরূপণের উক্ত প্রভেদ মনে রাখিবার যোগ্য।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগ যোগ

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার একবার বেদান্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় বার সাংখ্যের দৃষ্টিতে বলিয়াছেন ; এবং উহাতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই, পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উদাসীন থাকে। কিন্তু এই বিষয়ের বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই যে প্রকৃতির এই কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে চলিতেছে। অতএব এই অধ্যায়ে বলিতেছেন যে একই প্রকৃতি হইতে বিবিধ সৃষ্টি, বিশেষত সজীব সৃষ্টি, কিরূপে উৎপন্ন হয়। কেবল মানবসৃষ্টিরই বিচার যদি করা হয় তবে এই বিষয় ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় অর্থাৎ শরীরের হয়, এবং উহার সমাবেশ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে হইতে পারে। কিন্তু যখন স্থাবর সৃষ্টিও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরই বিস্তার, তখন প্রকৃতির গুণভেদের এই বিচার ক্ষর-অক্ষর বিচারেরও ভাগ হইতে পারে ; অতএব এই সঙ্কুচিত 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার' নাম ছাড়িয়া দিয়া সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান এই অধ্যায়ে আবার স্পষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সাংখ্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই বিষয়ের বিস্তৃত নিরূপণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে করা গিয়াছে। ত্রিগুণের বিস্তারের এই বর্ণনা অনুগীতা এবং মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়েও আছে।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—(১) এবং ফের সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিয়া সকল মুনি এই লোক হইতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (২) এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সারূপ্যপ্রাপ্ত লোক, সৃষ্টির উৎপত্তিকালেও জন্মায় না এবং প্রলয়কালেও ব্যথা পায় না (অর্থাৎ জন্মমরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পায়)।

রহস্য ঃ ইহাই হইল প্রস্তাবনা। এখন প্রথমে বলিতেছেন যে প্রকৃতি আমারই স্বরূপ, আবার সাংখ্যের দ্বৈতকে পৃথক করিয়া, বেদান্তশাস্ত্রের অনুকূল এই নিরূপণ করিতেছেন যে, প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে সৃষ্টির নানাবিধ ব্যক্ত পদার্থ কি প্রকারে নির্ম্মিত হয়—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : (৩) হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই যোনি, আমি উহাতে গর্ভ রাখি ; আবার উহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইতে থাকে। (৪) হে কৌন্তেয়! (পশুপক্ষী প্রভৃতি) সমস্ত যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করে, উহাদের যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম এবং আমি বীজদাতা পিতা।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : (৫) হে মহাবাহু! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ দেহে অবস্থিত অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার আত্মাকে দেহে বাঁধিয়া লয়। (৬) হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! এই গুণসমূহের মধ্যে নির্ম্মলতার কারণে প্রকাশকারক ও নির্দ্দোষ সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে (প্রাণীকে) বাঁধে। (৭) রজোগুণের স্বভাব রাগাত্মক, ইহা হইতে তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! উহা প্রাণীকে কর্ম্ম করিবার (প্রবৃত্তিরূপ) আসক্তিতে বাঁধিয়া ফেলে। (৮) কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা সমস্ত প্রাণীকে মোহে নিক্ষেপ করে। হে ভারত! ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা (প্রাণীকে) বাঁধিয়া ফেলে। (৯) সত্ত্বগুণ সুখে, এবং রজোগুণ কর্ম্মে, আসক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু হে ভারত! তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাকিয়া প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যমূঢ়তায় বা কর্ত্তব্যের বিস্মরণে আসক্তি উৎপন্ন করে।

রহস্য : সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণের এই পৃথক লক্ষণ বলা হইল। কিন্তু এই গুণ পৃথক পৃথক কখনও থাকে না, তিন সর্ব্বদাই একত্রে থাকে। উদাহরণ যথা, যে কোন ভাল কাজ করা যদিও সত্ত্বের লক্ষণ, তথাপি ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া রজের ধর্ম্ম, এই কারণে সাত্ত্বিক স্বভাবেও অল্প রজের মিশ্রণ সর্ব্বদাই থাকেই। এই জন্যই অনুগীতাতে এই গুণসমূহের এই প্রকার মিথুনাত্মক বর্ণনা আছে যে, তমের জোড়া সত্ত্ব, এবং সত্ত্বের জোড়া রজ (মভা. অশ্ব. ৩৬); এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইহাদের অন্যোন্য অর্থাৎ পারস্পরিক আশ্রয় হইতে অথবা ঝগড়া হইতে সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হয়। সাং. কা. ১২ এবং গীতার. পৃ. ১৩৬ ও ১৩৭ দেখুন এখন প্রথমে এই তত্ত্বই বলিয়া আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস স্বভাবের লক্ষণ বলিতেছেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ : (১০) রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব (অধিক হয় (তখন উহাকে সাত্ত্বিক বলিতে হইবে); এবং এই প্রকারেই সত্ত্ব ও তম অভিভূত করিয়া রজ, এবং সত্ত্ব ও রজকে হটাইয়া তম (অধিক হয়)। (১১) যখন এই দেহের সকল দ্বারে (ইন্দ্রিয়ে) প্রকাশ অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ অধিক হইয়াছে। (১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বাড়িলে লোভ, কর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি এবং উহার আরম্ভ, অতৃপ্তি এবং ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। (১৩) এবং হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে পর অন্ধকার, কিছু না করিবার ইচ্ছা, প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি এবং মোহও উৎপন্ন হয়।

রহস্য : মনুষ্যের জীবিতাবস্থাতে ত্রিগুণের কারণে উহার স্বভাবে কিসে কিসে পার্থক্য হয়, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। এখন বলিতেছেন যে, এই তিন প্রকার মনুষ্যের কোন্ প্রকার গতি লাভ হয়—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ : (১৪) সত্ত্বগুণের উৎকর্ষকালে যদি প্রাণী মরিয়া যায় তো উত্তম তত্ত্বজ্ঞানীদিগের, অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির, নির্ম্মল (স্বর্গ প্রভৃতি) লোক সে প্রাপ্ত হয়। (১৫) রজোগুণের প্রবলতায় মরিলে যাহারা কর্ম্মে আসক্ত থাকে, উহাদের (মনুষ্যের) মধ্যে জন্মগ্রহণ করে; এবং তমোগুণে মরিলে (পশু-পক্ষী প্রভৃতি) মূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হয়। (১৬) বলিয়াছেন যে, পুণ্য কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও সাত্ত্বিক হয়; কিন্তু রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ, এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। (১৭) সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, এবং রজোগুণ হইতে কেবল লোভ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে কেবল প্রমাদ

ও মোহই উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত অজ্ঞানেরও উৎপত্তি হয়। (১৮) সাত্ত্বিক পুরুষ উপরে, অর্থাৎ স্বর্গ প্রভৃতি লোকে যায়। রাজস মধ্যম লোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে থাকে এবং কনিষ্ঠগুণবৃত্তি তামস অধোগতি পায়।

রহস্য ঃ সাংখ্যকারিকাতেও এই বর্ণনা আছে যে, ধার্ম্মিক ও পুণ্যকর্ম্মকারী হইবার কারণে সত্ত্বস্থ মনুষ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম্মাচরণ করিয়া তামস পুরুষ অধোগতি পায় (সাং. কা. ৪৪)। এই প্রকারেই এই ১৮শ শ্লোক অনুগীতার ত্রিগুণবর্ণনাতেও যেমনটি তেমনটি আসিয়াছে (মভা. অশ্ব. ৩৯. ১০; এবং মনু. ১২. ৪০)। সাত্ত্বিক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গসুখও তো অনিত্যই; এই কারণে পরম পুরুষার্থের সিদ্ধি ইহা দ্বারা হয় না। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, এই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য উত্তম সাত্ত্বিক স্থিতি তো থাকেই; ইহা ব্যতীত এই জ্ঞান হওয়াও আবশ্যক যে প্রকৃতি পৃথক এবং আমি (পুরুষ) পৃথক। সাংখ্য ইহাকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলে। যদিও এই স্থিতি সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণ হইতেও অতীত তথাপি ইহা সাত্ত্বিক অবস্থারই পরাকাষ্ঠা; এর কারণে ইহার সমাবেশ সাধারণত সাত্ত্বিক বর্গেই করা হয়, ইহার জন্য এক নূতন চতুর্থ বর্গ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই (গীতার. ১৪৪-১৪৫)। কিন্তু গীতার এই প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যের দ্বৈত মান্য নহে এই জন্য সাংখ্যের উক্ত সিদ্ধান্তের গীতাতে এই প্রকার রূপান্তর হইয়া যায় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত যে এক আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম আছেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে যে চিনে, তাহাকেই ত্রিগুণাতীত বলিতে হয়। এই অর্থই পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ।। ১৯ ।।
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।। ২০ ।।

অনুবাদ ঃ (১৯) দ্রষ্টা অর্থাৎ উদাসীনরূপে দর্শক পুরুষ, যখন জানিয়া লয় যে (প্রকৃতির) গুণের অতিরিক্ত অপর কেহই কর্ত্তা নাই, এবং যখন (তিন) গুণের অতীত (তত্ত্বকে) চিনিয়া যায়; তখন সে আমার স্বরূপে মিলিয়া যায়। (২০) দেহধারী মনুষ্য দেহের উৎপত্তির কারণ-(স্বরূপ) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যের দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের অনুভব করে।

রহস্য ঃ বেদান্তে যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যমতবাদী ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বলে; এই জন্য ত্রিগুণাতীত হওয়াই মায়া হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে জানিয়া লওয়া (গী. ২. ৪৫); এবং ইহাকেই ব্রাহ্মী অবস্থা বলে (গী. ৭২; ১৮. ৫৩)। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে কথিত ত্রিগুণাতীতের এই লক্ষণ শুনিয়া উহার আরও অধিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অর্জ্জুনের ইচ্ছা হইল; এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৫৪) যেমন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপেই এখানেও ঐ প্রশ্নই করিতেছেন—

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ।। ২১ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাংক্ষতি ।। ২২ ।।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ।। ২৩ ।।
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ।। ২৪ ।।

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(২১) হে প্রভো! কোন্ লক্ষণের দ্বারা (জানা যায় যে, সে) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে? (আমাকে বল যে,) ঐ (ত্রিগুণাতীতের) আচার কি, এবং সে কি প্রকারে এই তিনগুণের অতীত হয়? শ্রীভগবান বলিলেন—(২২) হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (অর্থাৎ যথাক্রমে সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণগুলির কার্য্য অথবা ফল) হইলে যে উহাদের দ্বেষ করে না, এবং প্রাপ্ত না হইলেও উহাদের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; (২৩) যে (কর্ম্মফল সম্বন্ধে) উদাসীন-ভাবে থাকে; (সত্ত্ব, রজ ও তম) গুণ যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; যে ইহাই মনে করিয়া স্থির রহে যে, গুণ (নিজের নিজের) কার্য্য করিতেছে; যে টলে না অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হয় না; (২৪) যাহার নিকট সুখদুঃখ একই প্রকার; যে স্ব-স্থ অর্থাৎ আপনাতেই স্থির', মাটি, পাথর ও সোনা যাহার নিকট সমান; প্রিয় অপ্রিয়, নিন্দা ও নিজের স্তুতি যাহার নিকট একই সমান: সে সর্ব্বদা ধৈর্য্যযুক্ত।

রহস্য ঃ ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি, এবং আচার কিরূপ, এই দুই প্রশ্নের উত্তর হইল এই। এই লক্ষণ, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২. ৫৫-৭২), এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২. ১৩-২০) কথিত ভক্তিমান পুরুষের লক্ষণ সমস্ত একই প্রকারের। অধিক কি বলিব 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী,' তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ' এবং 'উদাসীনঃ' প্রভৃতি কোন কোন বিশেষণও দুই তিন স্থানে একই। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত (১৩. ২৪. ২৫) চার মার্গের মধ্যে কোন এক মার্গ স্বীকার করিয়া লইলে পর সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষের আচার, এবং তাহার লক্ষণ সকল মার্গে একই প্রকার হয়। তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে যখন এই দৃঢ় ও অটল সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্ম কেহই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না; তখন মনে রাখা উচিত যে স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত বা ত্রিগুণাতীত সমস্তই কর্ম্মযোগ-মার্গের। 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীর' অর্থ ১২শ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকের রহস্যতে বলিয়া আসিয়াছি। সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে স্বতন্ত্র মানিয়া সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার নিজের সম্প্রদায়কেই গীতার প্রতিপাদ্য বলেন। কিন্তু এই অর্থ পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের বিরুদ্ধ, অতএব ঠিক নহে। গীতারহস্যের ১১শ ও ১২শ প্রকরণে (২৮০-১৮১ও ৩২৩ পৃঃ) এই বিষয় আমি সবিস্তার প্রতিপাদন করিয়াছি। অর্জ্জুনের দুই প্রশ্নের উত্তর হইয়া

গেলে। এখন বলিতেছেন যে, এই পুরুষ এই তিন গুণ কি প্রকারে অতিক্রম করেন —

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদঃ (২৫) যাহার নিকট মান-অপমান বা মিত্র ও শত্রুদল তুল্য অর্থাৎ একই প্রকার; এবং (প্রকৃতি যাহা কিছু সমস্ত করিতেছে এই বুদ্ধিতে) যাহার সমস্ত (কাম্য) উদ্যোগ দূর হইয়া গিয়াছে;—সেই পুরুষকে গুণাতীত বলে। (২৬) এবং যে (আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া) অব্যভিচার, অর্থাৎ একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, সে এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয়।

রহস্যঃ ইহা সম্ভব যে, এই শ্লোক হইতে এই সংশয় হইতে পারে যে, যখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা সাংখ্যমার্গের, তখন সেই অবস্থার কর্ম্মপ্রধান ভক্তিযোগে কিরূপে পাওয়া যায়। এই কারণেই ভগবান বলিতেছেন,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদঃ (২৭) কারণ, অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের, শাশ্বত ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক অর্থাৎ পরমাবধি অত্যন্ত সুখের অন্তিম স্থান আমিই।

রহস্যঃ এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর থাকেন; এই কারণে তাঁহারই প্রতি ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। এবং একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে সাধনসম্বন্ধে গীতার কোনই আগ্রহ নাই (গী. ১৩. ২৪ ও ২৫)। গীতা ভক্তিমার্গকে সুলভ অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক; কিন্তু কোথাও অন্যান্য মার্গকে ত্যাজ্য বলেন নাই। গীতাতে কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান অথবা কেবল যোগই প্রতিপাদ্য—এই মত বিভিন্ন সম্প্রদায়-অভিমানীরা পূর্ব্ব হইতে গীতার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় তো পৃথক আছেই। মার্গ যাহাই হৌক, গীতার মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সংসারের কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে বা ছাড়া হইবে; এবং ইহার পরিষ্কার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারসূত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারেরই ন্যায় সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক বলিয়াছেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মানুষে-মানুষে স্বভাবভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে সাত্ত্বিক আদি গতিভেদ কি প্রকারে হয়; আবার এই বিচার করিয়াছেন যে, ত্রিগুণাতীত অবস্থা অথবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রাহ্মী স্থিতি কাহাকে বলে এবং উহা কিরূপে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নিরূপণ সাংখ্যের পরিভাষায় আছে ঠিক, কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈতকে স্বীকার না করিয়া যে একই পরমেশ্বরের বিভূতি হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই, সেই পরমেশ্বরের নিরূপণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দৃষ্টিতে করা গিয়াছে। পরমেশ্বরের স্বরূপের এই বর্ণনা অতিরিক্ত অষ্টম অধ্যায়ে অধিযজ্ঞ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত প্রভৃতি ভেদ দেখানো হইয়াছে। আর, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে সকল স্থানে একই পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন, এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও তিনিই। এখন এই অধ্যায়ে প্রথমে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের রচিত সৃষ্টি-বিস্তারের, অথবা পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক বিস্তারেরই কখনো-কখনো বৃক্ষরূপে বা বনরূপে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহার বীজ কি? অবার পরমেশ্বরের সকল রূপের শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ
ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ শ্রীভগবান কহিলেন—(১) যে অশ্বত্থ বৃক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিতেছি যে, মূল (এক) উপরে আছে এবং শাখাসকল (অনেক) নীচে আছে, (যাহা) অব্যয় অর্থাৎ কখনও বিনষ্ট হয় না, (এবং) ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ যাহার পাতা; উহাকে (বৃক্ষকে) সে জানিয়াছে সেই পুরুষ (প্রকৃত) বেদবেত্তা।

রহস্যঃ উক্ত বর্ণনা ব্রহ্মবৃক্ষের অর্থাৎ সংসারবৃক্ষের। এই সংসারকেই সাংখ্যবাদী "প্রকৃতির বিস্তার" এবং বেদান্তী "ভগবানের মায়ার বিস্তার" বলেন; এবং অনুগীতাতে ইহাকেই 'ব্রহ্মবৃক্ষ বা ব্রহ্মবন' (ব্রহ্মারণ্য) বলিয়াছেন (মভা. অশ্ব. ৩৫ ও ৪৭); এক নিতান্ত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন খুব বড় গগনচুম্বী বৃক্ষ নির্ম্মিত হয়, সেই প্রকারই এক অব্যক্ত পরমেশ্বর হইতে দৃশ্য সৃষ্টিরূপ কল্পনামূলক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; এই কল্পনা অথবা রূপক কেবল বৈদিক ধর্ম্মেই নহে, প্রত্যুত অন্য প্রাচীন ধর্ম্মেও পাওয়া যায়। য়ুরোপের পুরাতন ভাষাতে ইহার নাম 'বিশ্ববৃক্ষ' বা জগদ্বৃক্ষ আছে। ঋগ্বেদে (১. ২৪. ৭) বর্ণনা আছে যে বরুণলোকে এমন এক বৃক্ষ আছে যাহার কিরণের মূল উপরে (ঊর্দ্ধ্ব) এবং উহার কিরণ উপর হইতে নীচে (নিচীনাঃ) বিস্তৃত হয়।

(বিষ্ণুসহস্রনামে 'বারুণো বৃক্ষঃ'কে (বরুণের বৃক্ষ) পরমেশ্বরের হাজার নামের ভিতরেই এক নাম বলিয়াছেন যম ও পিতৃগণ যে "সুপলাশ বৃক্ষের" নীচে বসিয়া সহপান করেন (ঋ. ১০. ১৩৫. ১), অথবা যাহার "অগ্রভাগে স্বাদিষ্ট পিম্পল আছে এবং যাহার উপর দুই সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী থাকে"। (ঋ. ১. ১৬৪. ২২), বা "যে পিম্পলকে (পিপলকে) বায়ুদেবতা (মরুদ্গণ) কম্পিত করেন" (ঋ. ৫. ৫৪. ১২) সেই বৃক্ষও ইহাই। অথর্ব্ববেদে এই যে বর্ণনা আছে যে,"দেবসদন অশ্বথ বৃক্ষ তৃতীয় স্বর্গলোকে (বরুণলোকে) আছে" (অথর্ব্ব. ৫. ৪. ৩ ; এবং ১৯. ৩৯. ৬), তাহাও এই বৃক্ষ সম্বন্ধীয় মনে হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৮. ১২. ২) অশ্বথ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই প্রকার আছে,—পিতৃযান-কালে অগ্নি অথবা যজ্ঞ-প্রজাপতি দেবলোক হইতে নষ্ট হইয়া এই বৃক্ষে অশ্বের (ঘোড়ার) রূপ ধরিয়া এক বৎসর লুকাইয়া ছিলেন, এই কারণেই এই বৃক্ষের অশ্বথ নাম হইল (মভা অনু. ৮৫)। কোন কোন নৈরুক্তিকের ইহাও মত যে, পিতৃযানের দীর্ঘ রাত্রিতে সূর্য্যের ঘোড়া যমলোকে এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করে এইজন্য ইহার অশ্বথ (অর্থাৎ ঘোড়ার থান) নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে.। 'অ'=নহে, 'শ্ব,=কাল ও 'থ'=স্থির—এই আধ্যাত্মিক নিরুক্তি পরবর্ত্তী কল্পনা। নামরূপাত্মক মায়ার স্বরূপ যখন বিনাশবান্ অথবা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তখন উহাকে "কাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল নহে" তো বলিতে পারিত ; কিন্তু 'অব্যয়'—অর্থাৎ 'যাহার কখনও ব্যয় হয় না'—বিশেষণ স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, এই অর্থ এস্থলে অভিমত নহে। পূর্ব্বে পিম্পল বৃক্ষকেই অশ্বথ বলিত, কঠোপনিষদে (৬. ১) এই যে ব্রহ্মময় অমৃত অশ্বথবৃক্ষ বলা হইয়াছে—

> উর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বথঃ সনাতনঃ।
> তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥

উহাও ইহাই ; এবং "উর্ধ্বমূলমধঃশাখং" এই পদসাদৃশ্য হইতেই ব্যক্ত হইতেছে যে, ভগবদ্গীতার বর্ণনা কঠোপনিষদের বর্ণনা হইতেই লওয়া হইয়াছে। পরমেশ্বর স্বর্গে আছেন এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন জগদ্‌বৃক্ষ অর্থাৎ মনুষ্যলোকে আছে, অতএব বর্ণিত হইয়াছে যে এই বৃক্ষের মূল অর্থাৎ পরমেশ্বর উপরে আছেন এবং ইহার অনেক শাখা অর্থাৎ জগতের বিস্তার নীচে বিস্তৃত কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে আর এক কল্পনা পাওয়া যায় যে, এই সংসারবৃক্ষ, বটবৃক্ষ হইবে, পিপল হইবে না ; কারণ বটবৃক্ষের ঝুরি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে। উদাহরণের জন্য এই বর্ণনা আছে যে, অশ্বথ বৃক্ষ আদিত্যের বৃক্ষ এবং "ন্যগ্রোধো বারুণো বৃক্ষঃ"—ন্যগ্রোধ অর্থাৎ নীচে (ন্যক্) বর্দ্ধনশীল (রোধ) বটবৃক্ষ বরুণের বৃক্ষ (গোভিগৃহ. ৪. ৭. ২৪) মহাভারতে লিখিত আছে যে মার্কণ্ডের ঋষি প্রলয়কালে বালরূপী পরমেশ্বরকে এক (ঐ প্রলয়কালেও অবিনাশী, অতএব) অব্যয় ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র ডালের উপর দেখিয়াছিলেন (মভা. বন. ১৮৮. ৯১)। এই প্রকারেই অব্যক্ত পরমেশ্বর হইতে অপার দৃশ্য জগৎ কিরূপে নির্ম্মিত হয় দেখাইবার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও ন্যগ্রোধেরই বীজসংক্রান্ত (ছাং. ৬. ১২. ১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বিশ্ববৃক্ষের বর্ণনা আছে (শ্বে. ৬. ৬) ; কিন্তু এখানে খুলিয়া বলা হয় নাই যে ইহা

কোন্ প্রকার বৃক্ষ। মুণ্ডক উপনিষদে (৩. ১) ঋগ্বেদেরই এই বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে যে, বৃক্ষের উপর দুই পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) বসিয়া আছেন, ইহাঁদের মধ্যে একজন পিম্পল অর্থাৎ পিপলের ফল খান। পিপল ও বট ছাড়িয়া এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে তৃতীয় কল্পনা উদুম্বর লইয়া ; এবং পুরাণে ইহা দত্তাত্রেয়ের বৃক্ষ বলিয়া স্বীকৃত। সার কথা, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই তিনটি কল্পনা আছে যে, পরমেশ্বরের মায়া হইতে উৎপন্ন জগত এক বৃহৎ পিপল, বট বা উদুম্বর ; এবং এই কারণেই বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর এই তিন বৃক্ষাত্মক নাম দিয়াছে —"ন্যগ্রোধোদুম্বরোঽশ্বথঃ" (মভা. অনু. ১৪৯. ১০১), এবং সমাজেও এই তিন বৃক্ষ দেবতাত্মক ও পূজার যোগ্য মানা হয়। ইহা ব্যতীত বিষ্ণুসহস্রনাম ও গীতা, উভয়ই মহাভারতের অংশ ; যখন বিষ্ণুসহস্রনামে উদুম্বর; বরগদ (ন্যগ্রোধ) এবং অশ্বথ এই তিন পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে ; তখন গীতাতে 'অশ্বথ' শব্দের পিপলই (উদুম্বর বা ন্যগ্রোধ নহে) অর্থ লইতে হইবে, এবং মূলের অর্থও তাহাই। "ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ যাহার পাতা" এই বাক্যের 'ছন্দাংসি শব্দে ছদ্ =ঢাকা ধাতু ধরিয়া (ছাং. ১. ৪. ২) বৃক্ষের আচ্ছাদক পাতার সহিত বেদের সাম্য বর্ণিত হইয়াছে ; এবং অন্তে বলিয়াছেন যে, যখন এই সম্পূর্ণ বর্ণনা বৈদিক পরম্পরা অনুসারে হইতেছে তখন ইহা যে জানিয়া লইয়াছে তাহাকে বেদবেত্তা বলিতে হইবে। এই প্রকার বৈদিক বর্ণনা হইল : এখন এই বৃক্ষেরই দ্বিতীয় প্রকারে, অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে বর্ণনা করিতেছেন —

> অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
> অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ (২) (সত্ত্ব আদি তিন) গুণ হইতে যাহা পুষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা হইতে (শব্দস্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধরূপ) বিষয়সমূহের অঙ্কুর ফুটিয়াছে, তাহাদেরই শাখা সকল নীচে এবং উপরেও বিস্তৃত হইয়াছে ; এবং অন্তে কর্ম্মের রূপ প্রাপ্ত উহাদের মূল নীচে মনুষ্যলোকেও বাড়িতে বাড়িতে ভিতরে নামিয়া গিয়াছে।

রহস্য ঃ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে (পৃঃ ১৫৫) সবিস্তার নিরূপণ করিয়া দিয়াছি যে, সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটীই মূলতত্ত্ব ; এবং যখন পুরুষের পরে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নিজের টানাপোড়েন বিস্তার করিতে লাগে, তখন মহৎ আদি তেইশ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা পরমেশ্বরেরই এক অংশ, অতএব ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির এই বিস্তারকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ না মানিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শাখাসকল 'উর্দ্ধ্বমূল' পিপলেরই হইতেছে। এখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন পৃথক স্বরূপের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন যে, প্রথম শ্লোকে বর্ণিত বৈদিক 'অধঃশাখ' বৃক্ষের "ত্রিগুণ হইতে পুষ্ট" শাখা-সকল কেবল 'নীচে'ই নহে, প্রত্যুত 'উপরে' ও বিস্তৃত হইয়াছে ; এবং ইহাতে কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সূত্রও অন্তে পরাইয়া দিয়াছে। অনুগীতাকার ব্রহ্ম-বৃক্ষের বর্ণনায় কেবল সাংখ্যশাস্ত্রের চব্বিশ তত্ত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবৃক্ষই বলিয়া গিয়াছেন ; উহাতে এই বৃক্ষের বৈদিক ও সাংখ্য বর্ণনার মধ্যে মিল করিয়া দেন নাই (মভা. অশ্ব. ৩৫. ২২. ২৩ ; এবং গীতার. পৃঃ ১৫৫)। কিন্তু গীতা এরূপ করেন নাই ; দৃশ্য

সৃষ্টিরূপ বৃক্ষের সূত্রে বেদে প্রাপ্ত পরমেশ্বরের বর্ণনার এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির বিস্তার বা ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের বর্ণনার, এই দুই শ্লোকে মিলাইয়া দিয়াছেন। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ত্রিগুণাত্মক এবং ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষের এই বিস্তার হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই বৃক্ষ এত বড় যে, দিগ্‌বিদিকের আদ্যন্তের ঠিকানাই পাওয়া যায় না। অতএব এখন বলিতেছেন যে, এই অপার বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ইহার মূলে বর্ত্তমান অমৃততত্ত্ব জানিবার কোন্‌ মার্গ—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৩) কিন্তু এই লোকে (উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে) ঐরূপ উহার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না; অথবা অন্ত, আদি এবং আধারস্থানও পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গভীর মূল বিশিষ্ট এই অশ্বত্থ (বৃক্ষ) কে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় তরবারি দ্বারা ছিন্ন করিয়া, (৪) ফের যেখানে গেলে ফিরিয়া আসিতে হয় না সেই স্থানকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং এই সংকল্প করিতে হইবে যে (সৃষ্টিক্রমের এই) "পুরাতন প্রবৃত্তি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আদি পুরুষেরই দিকে আমি যাইতেছি।"

রহস্য ঃ গীতারহস্যের দশম প্রকরণে বিচার করিয়াছি যে, সৃষ্টির বিস্তারই নামরূপাত্মক কর্ম্ম এবং এই কর্ম্ম অনাদি; আসক্ত-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলে ইহার ক্ষয় হয়, আর অন্য কোন উপায়ের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হয় না কারণ ইহা স্বরূপত অনাদি ও অব্যয় (২৪৬-২৫০ দেখুন)। তৃতীয় শ্লোকের "উহার স্বরূপ বা আদি-অন্ত পাওয়া যায় না" এই শব্দের স্থানে এই সিদ্ধান্তই ব্যক্তীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম্ম অনাদি; এবং পরে চলিয়া কর্ম্মবৃক্ষের ক্ষয় করিবার জন্য এক অনাসক্তিকেই সাধন বলিয়াছেন। এইরূপই উপাসনা করিবার সময় যে ভাবনা মনে থাকে, তদনুসারেই পরে ফললাভ হয় (গী. ৮. ৬)। অতএব চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, বৃক্ষচ্ছেদনের এই ক্রিয়া হইবার সময় মনে কোন্‌ প্রকার ভাবনা থাকা উচিত। শাংকরভাষ্যে "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে" পাঠ আছে, ইহাতে বর্ত্তমানকাল প্রথম পুরুষের একবচনের 'প্রপদ্যে' ক্রিয়াপদ আছে যাহা হইতে এই অর্থ করিতে হয়; এবং ইহাতে 'ইতি'র ন্যায় কোন-না-কোন পদের অধ্যাহারও করিতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রামানুজভাষ্যে লিখিত "তমেব চাদ্য পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ" পাঠান্তর স্বীকার করিলেও এইরূপ অর্থ করা যায় যে, "যেখানে গেলে পরে ফের পশ্চাতে ফিরিতে হয় না, সেই স্থান খুঁজিতে হইবে, (এবং) যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহাতেই মিলিয়া যাইতে হইবে"। কিন্তু 'প্রপদ্‌' ধাতু নিত্য আত্মনেপদী, এই জন্য উহার বিধ্যর্থক অন্য পুরুষের রূপ 'প্রপদ্যেৎ' হইতে পারে না। 'প্রপদ্যেৎ' পরস্মৈপদের রূপ এবং উহা ব্যাকরণের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ। প্রায় এই কারণেই শাঙ্করভাষ্যে এই পাঠ স্বীকৃত হয় নাই, এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত। ছান্দোগ্য উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রে 'প্রপদ্যে' পদের 'ইতি' বিনা এই প্রকারেই উপযোগ করা হইয়াছে (ছাং. ৮. ১৪. ১)। 'প্রপদ্যে' ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষান্ত

হইলে তো বলিতে হইবে না যে, বক্তার সহিত অর্থাৎ উপদেশকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ যোগ করা যায় না। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকারে চলিলে কি ফল লাভ হয়—

নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ (৫) যে মান ও মোহ হইতে মুক্ত, যাহারা আসক্তিদোষ জয় করিয়াছে, যে অধ্যাত্মজ্ঞানে সর্ব্বদাই স্থির থাকে, যে নিষ্কাম ও সুখ দুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ঐ অব্যয় স্থানে গিয়া পৌঁছায়। (৬) যেখানে গিয়া আর ফিরিতে হয় না, (এইরূপ) সেই আমার পরম স্থান। উহাকে না সূর্য্য, না চন্দ্রমা (এবং) না অগ্নিই প্রকাশ করে।

রহস্য ঃ ইহার মধ্যে ষষ্ঠ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬. ১৪), মুণ্ডক (২. ২. ১০) এবং কঠ (৫. ১৫) এই তিন উপনিষদে পাওয়া যায়। সূর্য্য, চন্দ্র বা তারা, এ সকলই তো নামরূপের শ্রেণীতে আসে এবং পরব্রহ্ম এই সকল নামরূপের অতীত; এই কারণে পরব্রহ্মেরই তেজে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, আর ইহা সুস্পষ্টই যে, পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য কাহারও অপেক্ষাই নাই। উপরের শ্লোকে 'পরম স্থান' শব্দের অর্থ 'পরব্রহ্ম' এবং এই ব্রহ্মে মিলিত হওয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ মোক্ষ; বৃক্ষের রূপক লইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরব্রহ্মের যে জ্ঞান বলা হয়, উহার বিচার সমাপ্ত হইয়া গেল। এখন পুরুষোত্তম-স্বরূপের বর্ণনা করিতে হইবে; কিন্তু শেষে এই যে বলিয়াছেন যে, "যেখানে যাইয়া ফিরিতে হয় না" ইহা দ্বারা সূচিত জীবের উৎক্রান্তি এবং উহার সঙ্গেই জীবের স্বরূপ প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) জীবলোকে (কর্ম্মভূমিতে) আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মনের সহিত ছয়, অর্থাৎ মন ও পাঁচ (সূক্ষ্ম) ইন্দ্রিয়কে (নিজের দিকে) টানিয়া লয় (ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে)। (৮) ঈশ্বর অর্থাৎ জীব যখন (স্থূল) শরীর পায় এবং যখন সেই (স্থূল) শরীর হইতে বাহির হয়, তখন এই জীব, যেমন (পুষ্প আদি) আশ্রয় হইতে গন্ধকে বায়ু লইয়া যায়, সেইরূপই ইহাদিগকে (মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে) সঙ্গে লইয়া যায়। (৯) কান, চোখ, ত্বক, জিভ, নাক ও মনে অবস্থিতি করিয়া এই (জীব) বিষয়সমূহ ভোগ করে।

রহস্য ঃ এই তিন শ্লোকের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর কি ; পরে এই তিন অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন যে, লিঙ্গশরীর স্থূল দেহে কিরূপে প্রবেশ করে, ঐ লিঙ্গশরীর উহা হইতে বাহিরে কিরূপে নির্গত হয়, এবং উহাতে থাকিয়া বিষয় কিরূপে উপভোগ করে। সাংখ্যমত অনুসারে এই সূক্ষ্মশরীর মহান তত্ত্ব হইতে লইয়া সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা পর্য্যন্ত আঠারো তত্ত্বের দ্বারা প্রস্তুত হয় ; এবং বেদান্তসূত্রে (৩. ১. ১) বলিয়াছেন যে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের এবং প্রাণেরও উহাতে সমাবেশ হয় (গীতার. পৃ. ১৬২-১৬৬)। মৈত্র্যুপনিষদে (৬. ১০) বর্ণনা আছে যে, সূক্ষ্মশরীর আঠারো তত্ত্বে নির্ম্মিত হয়। এইজন্য বলিতে হয় যে, "মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়" এই শব্দ দ্বারা সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান অপর তত্ত্বসমূহের সংগ্রহও এখানে অভিপ্রেত। বেদান্তসূত্রেও (৩. ১৭ ও ৪৩) 'নিত্য' ও 'অংশ' দুই পদের উপযোগ করিয়াই এই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে বারম্বার নূতন করিয়া **উৎপন্ন** হয় না, উহা পরমেশ্বরের "সনাতন অংশ" (গী. ২. ২৪)। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. ৪) এই যে বলিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার ব্রহ্মসূত্র হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহা হইতে উহার দৃঢ়ীকরণ হইতেছে (গী. র. পরি. পৃ. ৪৬০-৪৬১)। গীতারহস্যে নবম প্রকরণে (পৃ. ২১৪) দেখাইয়াছি যে, 'অংশ' শব্দের অর্থ "ঘটাকাশাদির" ন্যায় অংশ বুঝিতে হইবে, খণ্ডিত 'অংশ' নহে। এই প্রকারে শরীর ধারণ করা, উহা ত্যাগ করা এবং উপভোগ করা— এই তিন ক্রিয়া বজায় থাকিলে—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ।। ১০ ।।
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ।। ১১ ।।

অনুবাদ ঃ (১০) (শরীর হইতে) বহির্গমনশীল, স্থিতিশীল, অথবা গুণের সহিত যুক্ত হইয়া (নিজেই নহে) উপভোক্তাকে মূর্খেরা জানে না। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দৃষ্টিশীল ব্যক্তি (উহাকে) জানে। (১১) এই প্রকারেই প্রযত্নকারী যোগী স্বয়ং আপনাতে স্থিত আত্মাকে জানে। কিন্তু যাহার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সংস্কৃত নহে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি প্রযত্ন করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

রহস্য ঃ ১০ম ও ১১শ শ্লোকে জ্ঞানচক্ষু বা কর্ম্মযোগমার্গ দ্বারা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া জীবের উৎক্রান্তি বর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে (৭. ৮-১২), ঐরূপই এখন আত্মার সর্ব্বব্যাপকতা প্রস্তাবনারূপে অল্প বর্ণনা করিয়া ষোড়শ শ্লোক হইতে পুরুষোত্তম স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ।। ১২ ।।
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ।। ১৩ ।।

অনুবাদ ঃ (১২) যে তেজ সূর্য্যে থাকিয়া সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে ; তাহা আমারই তেজ জান। (১৩) এই প্রকারই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া আমিই (সকল) ভূতদিগকে নিজের তেজে ধারণ করি, এবং রসাত্মক সোম (চন্দ্রমা) হইয়া সকল ওষধি অর্থাৎ বনস্পতিকে পোষণ করি।

রহস্য ঃ সোম শব্দের 'সোমবল্লী' ও 'চন্দ্র' অর্থ আছে ; এবং বেদে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্র যে প্রকার জলাত্মক, অংশুমান ও শুভ্র, সেইপ্রকারই সোমবল্লীও, উভয়কেই 'বনস্পতিগণের রাজা' বলিয়াছে। তথাপি পূর্ব্বাপর সন্দর্ভবলে এখানে চন্দ্রই বিবক্ষিত। এই শ্লোকে চন্দ্রের তেজ আমিই, ইহা বলিয়া আবার এই শ্লোকেই বলিতেছেন যে, বনস্পতিগণকে পোষণ করিবার যে গুণ চন্দ্রে আছে, তাহাও আমিই। অন্য স্থানেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, জলময় হইবার কারণে চন্দ্রে এই গুণ আছে, এইকারণেই বনস্পতিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ।। ১৪ ।।
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ।। ১৫ ।।

অনুবাদ ঃ (১৪) আমি বৈশ্বানররূপ অগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহে থাকি, এবং প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত হইয়া (ভক্ষ্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়) চার প্রকার অন্নকে পরিপাক করাই। (১৫) এই প্রকারেই আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি ; স্মৃতি ও জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহার নাশ আমা হইতেই হয় ; এবং সকল বেদ হইতে জানিবার যোগ্য আমিই। বেদান্তের কর্ত্তা এবং বেদবেত্তাও আমিই।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ কৈবল্য উপনিষদে (২. ৩.) আছে, উহাতে "বেদৈশ্চ সর্বৈঃ"র স্থানে "বেদৈরনেকৈঃ" এইটুকুই পাঠভেদ আছে। তখন যাঁহারা গীতা কালে 'বেদান্ত' শব্দ প্রচলিত থাকা অস্বীকার করিয়া এই প্রকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত হইবে বা উহার 'বেদান্ত' শব্দের অন্য কোন অর্থই ধরিতে হইবে ; ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত মূলহীন বনিয়াদবিশিষ্ট হইয়া যায়। 'বেদান্ত' শব্দ মুণ্ডক (৩. ২, ৬) এবং শ্বেতাশ্বতর (৬. ২২) উপনিষদে আসিয়াছে, এবং শ্বেতাশ্বতরেরও তো কতকগুলি মন্ত্রই গীতাতে হুবহু আসিয়াছে। এখন নিরুক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের লক্ষণ বলিতেছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ।। ১৬ ।।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ।। ১৭ ।।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।। ১৮ ।।

অনুবাদ ঃ (১৬) (এই) লোকে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' দুই পুরুষ আছে। সমস্ত

(নাশশীল) ভূতকে ক্ষর বলে এবং কূটস্থকে, অর্থাৎ এই সমস্ত ভূতের মূলে (কূটে) অবস্থিত (প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত তত্ত্ব) কে অক্ষর বলে। (১৭) কিন্তু উত্তম পুরুষ (এই) উভয় হইতে) ভিন্ন। উঁহাকে পরমাত্মা বলে। সেই অব্যয় ঈশ্বরই ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া (ত্রৈলোক্যের) পোষণ করেন। (১৮) যেহেতু আমি ক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (পুরুষ) হইতেছি, অতএব লোকব্যবহারে এবং বেদেও পুরুষোত্তম নামে আমি প্রসিদ্ধ হইতেছি।

রহস্য ঃ ষোড়শ শ্লোকে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত—অথবা ব্যক্ত সৃষ্টি ও অব্যক্ত প্রকৃতি—এই দুই শব্দের সহিত সমানার্থক। সুস্পষ্ট যে, ইহাদের মধ্যে ক্ষরই নশ্বর পঞ্চভূতাত্মক ব্যক্ত পদার্থ। স্মরণ থাকে যেন, 'অক্ষর' বিশেষণ পূর্ব্বে কয়েকবার যখন পরব্রহ্মেরও প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে (গী. ৮. ৩ ; ৮. ২১ ; ১১. ৩৭ : ১২. ৩), তখন পুরুষোত্তমের উল্লিখিত লক্ষণে 'অক্ষর' শব্দের অর্থ অক্ষর ব্রহ্ম নহে, কিন্তু উহার অর্থ সাংখ্যের অক্ষর প্রকৃতি ; এবং এই হট্টগোল বাঁচাইবার জন্যই ষোড়শ শ্লোকে 'অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ (প্রকৃতি)' এই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছি (গীতার পৃ. ১৭৩-১৭৭)! সার কথা, ব্যক্ত সৃষ্টি ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত অক্ষরব্রহ্ম (গী. ৮. ২০-২২ এর উপর আমার রহস্য দেখুন) এবং 'ক্ষর' (ব্যক্ত সৃষ্টি) এবং 'অক্ষর' (প্রকৃতি) হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, বস্তুত এই দুই একই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. ৩১) বলা হইয়াছে যে, ইহাঁকেই পরমাত্মা বলে এবং এই পরমাত্মাই শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে থাকেন। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্ষর-অক্ষর—বিচারে যে মূল তত্ত্ব অক্ষরব্রহ্ম শেষে নিষ্পন্ন হন, তিনিই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারেরও পর্য্যবসান হইতেছেন, অথবা "পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে" একই পুরুষোত্তম। এই প্রকারেই ইহাও বলা হইয়াছে যে, অধিভূত ও অধিযজ্ঞ প্রভৃতির অথবা প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের তত্ত্বও ইহাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকরণের চরম নিষ্কর্ষ এই যে, যে জগতের এই একতা জানিয়াছে যে, "সকল ভূতে এক আত্মা আছেন" (গী. ৬. ২৯) এবং যাহার মনে এই জ্ঞান জীবনভর স্থির হইয়া গিয়াছে (বেসূ. ৪. ১. ১২ ; গী. ৮. ৬), সে কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে করিতেই পরমেশ্বরকে লাভ করে। কর্ম্ম না করিয়া কেবল পরমেশ্বর-ভক্তি দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় ; কিন্তু গীতার জ্ঞানবিজ্ঞান-নিরূপণের ইহা তাৎপর্য্য নহে। সপ্তম অধ্যায়ের, আরম্ভেই বলিয়া দিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা অথবা ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ নিষ্কাম বুদ্ধি সহকারে সংসারের সমস্ত কর্ম্মই করিতে হইবে এবং ইহা করিতে করিতেই মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই দেখাইবার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন বলিতেছেন যে, ইহা জানিলে কি ফল লাভ হয়—

> যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
> স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥
> ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
> এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ঃ (১৯) হে ভারত! এই প্রকার বিনা মোহে যে আমাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করে। (২) হে নিষ্পাপ ভারত! এই গুহ্য হইতেও গুহ্য শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা জানিয়া (মনুষ্য) বুদ্ধিমান অর্থাৎ বুদ্ধ বা জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হইবে।

রহস্য ঃ এস্থলে বুদ্ধিমানেরই 'বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী' অর্থ হইতেছে ; কারণ ভারতে (শাং. ২৪৮. ১১) এই অর্থেই 'বুদ্ধ' ও 'কৃতকৃত্য' শব্দ আসিয়াছে। মহাভারতে 'বুদ্ধ' শব্দের রূঢ়ার্থ 'বুদ্ধাবতার' কোথাও আসে নাই। গীতার, পরি, ৫৭৬ পৃঃ দেখুন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

———

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ-যোগ

রহস্য ঃ পুরুষোত্তম যোগের দ্বারা ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের চরম শেষ হইয়া গেল ; কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে থাকিলেই পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় এবং উহা দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, ইহা দেখাইবার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ করা গিয়াছিল ; উহা এখানে সমাপ্ত হইল এবং এখন এখানেই উহার উপসংহার করিতে হইবে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে (৯. ১২) ভগবান খুব সংক্ষেপে এই যে বলিয়াছেন যে, রাক্ষস-ভাবের মনুষ্য আমার অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ জানে না, তাহারই স্পষ্টীকরণার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মানুষে-মানুষে প্রভেদ কেন হয় তাহার কারণ বলা হইয়াছে। এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপসংহার হইয়াছে—

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন – (১) অভয় (নির্ভীকতা), শুদ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তি, যোগ-ব্যবস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান (মার্গ) এবং (কর্ম্ম-) যোগের তারতম্যে ব্যবস্থা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বধর্ম অনুসারে আচরণ, তপ, সরলতা, (২) অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, কর্ম্মফলের ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র দৃষ্টি ছাড়িয়া উদার ভাব রাখা, সকল ভূতে দয়া তৃষ্ণা না রাখা, মৃদুতা, (মন্দ কর্ম্মে) লজ্জা, অচপলতা অর্থাৎ ফাজিল কাজ না করা, (৩) তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শুদ্ধতা, দ্রোহ না করা, অতিমান না রাখা—হে ভারত ! (এই) গুণ দৈবী সম্পদে জাত পুরুষ লাভ করে।

রহস্য ঃ দৈবী সম্পদের এই ছাব্বিশ গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত জ্ঞানের কুড়ি লক্ষণ (গী. ১৩. ৭-১১) বস্তুত একই ; এবং এইজন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে 'অজ্ঞানের' সমাবেশ আসুরী লক্ষণের ভিতর করা হইয়াছে। ইহা বলা যায় না যে, ছাব্বিশ গুণের এই ফিরিস্তির অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন হইবে ; এবং হেতুও এরূপ নাই। উদাহরণ যথা, কেহ কেহ অহিংসারই কায়িক, বাচিক

ও মানসিক ভেদ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক কাহারও মনে দুঃখ দেওয়াকেও একবিধ হিংসাই মনে করেন। এই প্রকারই শুদ্ধতাকেও ত্রিবিধ মানিলে, মনের শুদ্ধির ভিতরে অক্রোধ ও দ্রোহ না করা প্রভৃতি গুণও আসিতে পারে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৬০ অধ্যায় হইতে ১৬৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত যথাক্রমে দম, তপ, সত্য ও লোভের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে দমের ভিতরেই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সত্য, আর্জব ও লজ্জা প্রভৃতি পঁচিশ-ত্রিশ গুণের ব্যাপক অর্থে সমাবেশ করা হইয়াছে (শাং. ১৬০) ; এবং সত্যের নিরূপণে (শাং. ১৬২) বলা হইয়াছে যে, সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, যাগ, ধ্যান, আর্য্যতা (লোক-কল্যাণের ইচ্ছা), ধৃতি ও দয়া, এই তেরো গুণের এক সত্যেতেই সমাবেশ হয় ; এবং সেখানেই এই শব্দগুলির ব্যাখ্যাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রণালীতে একই গুণে অনেকের সমাবেশ করিয়া লওয়া পাণ্ডিত্যের কাজ এবং এইরূপ বিচার করিতে লাগিলে প্রত্যেক গুণের উপর এক-এক গ্রন্থ লিখিতে হয়। উপরের শ্লোকগুলিতে এই সমস্ত গুণের সমুচ্চয় এইজন্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ইহাতে দৈবী সম্পদের সাত্ত্বিক রূপের সম্পূর্ণ কল্পনা হইয়া যাইবে এবং যদি এক শব্দে কোন অর্থ বাদ পড়িয়া যায় তবু অপর শব্দে উহার সমাবেশ হইয়া যাইবে। হোক ; উপরের ফিরিস্তির 'জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতি' শব্দের অর্থ আমি গীতা ৪. ৪১ ও ৪২শ শ্লোকের ভিত্তিতে কর্ম্মযোগ প্রধান করিয়াছি। ত্যাগ ও ধৃতির ব্যাখ্যা স্বয়ং ভগবানই ১৮শ অধ্যায়ে করিয়া দিয়াছেন (১৮. ৪ ও ২৯)। ইহা বলিয়া চুকিয়াছি যে, দৈবী সম্পদে কোন্ গুণগুলির সমাবেশ হয় ; এখন ইহার বিপরীত আসুরী বা রাক্ষসী সম্পদের বর্ণনা করিতেছেন—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৪) হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান, আসুরী অর্থাৎ রাক্ষসী সম্পদে জাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়।

রহস্য ঃ মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের ১৬৪ ও ১৬৫ অধ্যায়ে এইগুলির মধ্যে কতকগুলি দোষের বর্ণনা আছে এবং শেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নৃশংস কাহাকে বলিবে। এই শ্লোকে 'অজ্ঞান'কে আসুরী সম্পদের লক্ষণ বলাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, 'জ্ঞান' দৈবী সম্পদের লক্ষণ। জগতে প্রত্যক্ষগোচর দুই প্রকার স্বভাবের এই প্রকার বর্ণনা হইলে পর—

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৫) (ইহাদের মধ্যে) দেবী সম্পদ (পরিণামে) মোক্ষদায়ক এবং আসুরী বন্ধনদায়ক বলিয়া স্বীকৃত হয়। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবী সম্পদে জন্মিয়াছ। শোক করিও না।

রহস্য ঃ সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে এই দ্বিবিধ পুরুষের কোন্ প্রকার গতি লাভ হয় ; এখন সবিস্তার আসুরী পুরুষের বর্ণনা করিতেছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : (৬) এই লোকে দুই প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয় ; (এক) দৈব এবং অপর আসুর। (ইহার মধ্যে) দৈব (শ্রেণীর) বর্ণনা সবিস্তার করিয়াছি ; (এক্ষণে) হে পার্থ ! আমি আসুর (শ্রেণীর) বর্ণনা করিতেছি, শোন।

রহস্য : পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগী কি প্রকার আচরণ করিবে এবং ব্রাহ্মী অবস্থা কি প্রকার বা স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত অথবা ত্রিগুণাতীত কাহাকে বলে ; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান কি। এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে দৈবী সম্পদের যে লক্ষণ আছে, তাহাই দৈব, প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনা ; এই জন্যই বলিয়াছেন যে, দৈবশ্রেণীর বর্ণনা পূর্ব্বে সবিস্তার করিয়া চুকিয়াছি। আসুর সম্পদের সামান্য উল্লেখ নবম অধ্যায়ে (৯. ১১ ও ১১) আসিয়াছে ; কিন্তু সেখানকার বর্ণনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, এই কারণে এই অধ্যায়ে উহাই সম্পূর্ণ করিতেছেন—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : (৭) আসুর ব্যক্তি জানে না যে প্রবৃত্তি কি, এবং নিবৃত্তি কি—অর্থাৎ সে জানে না যে, কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত। উহাতে শুদ্ধভাব থাকে না, না আচার ও সত্যই থাকে। (৮) এই (আসুর লোক) বলে যে,সমস্ত জগৎ অ-সত্য, অ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিরাধার, অনীশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরের নহে, অ-পরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ এক অপর ব্যতীতই হইয়াছে, (অতএব) কাম ছাড়িয়া অর্থৎ মনুষ্যের বিষয়বাসনার অতিরিক্ত ইহার আর কি হেতু হইতে পারে ?

রহস্য : যদিও এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট, তথাপি ইহার পদগুলির অর্থসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমি মনে করি যে, চার্বাক আদি নাস্তিকদিগের যে সকল মত বেদান্তশাস্ত্র বা কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের সৃষ্টিরচনাবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না, সেই সকল মতের উপরেই এই বর্ণনা হইয়াছে ; এবং এই কারণেই এই শ্লোকের পদসমূহের অর্থ সাংখ্য ও অধ্যাত্মশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। জগৎকে নশ্বর মনে করিয়া বেদান্তী উহার অবিনাশী সত্যকে—সত্যস্য সত্যং (বৃ. ২. ৩. ৬) সন্ধান করেন, এবং ঐ সত্য তত্ত্বকেই জগতের মূল আধার বা প্রতিষ্ঠা বলিয়া মানেন—ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈ. ২. ৫.)। কিন্তু আসুরী লোক বলে যে, এই জগৎ অ-সত্য, অর্থাৎ ইহাতে সত্য নাই ; এবং সেইজন্যই সে এই জগৎকে অ-প্রতিষ্ঠও বলে, অর্থাৎ ইহার প্রতিষ্ঠাও নাই এবং আধারও নাই। এখানে সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রকার অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রতিপাদিত অব্যক্ত পরব্রহ্ম যদি আসুরলোকদিগের সম্মত না হইলেও, তবে ভক্তিমার্গের ব্যক্ত ঈশ্বর তাহাদের মান্য হইবে। এই কারণেই অনীশ্বর (অন্ + ঈশ্বর) পদের প্রয়োগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, আসুর লোক জগতে ঈশ্বরকেও মানে না। এই প্রকারে জগতের কোনও মূল আধার না মানিলে উপনিষদে

বর্ণিত এই সৃষ্ট্যুৎপত্তি-ক্রম ছাড়িয়া দিতে হয়, যথা—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যঃ অন্নং। অন্নাৎ পুরুষঃ।" (তৈ. ২. ১) ; এক সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত এই সৃষ্ট্যুৎপত্তি-ক্রমকেও ছাড়িয়া দিতে হয় যে, প্রকৃত ও পুরুষ, এই দুই স্বতন্ত্র মূল তত্ত্ব আছে এবং সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অন্যোন্য আশ্রয়ে অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রণে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, এই শৃঙ্খলা বা পরম্পরা মানিয়া লইলে, দৃশ্য-সৃষ্টির পদার্থসমূহের অতীত এই জগতের কোন-না-কোন মূলতত্ত্ব মানিতে হয়। এই কারণেই আসুর লোক জাগতিক পদার্থকে অ-পরস্পরসম্ভূত বলে অর্থাৎ সে ইহা মানে না যে, এই সকল পদার্থ এক অপর হইতে কোনও ক্রমানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের রচনা সম্বন্ধে একবার এই প্রকার বুদ্ধি হইলে পর মনুষ্যপ্রাণীই প্রধান বলিয়া স্থির হয় এবং এই বিচার আপনাআপনিই হয় যে মনুষ্যের কামবাসনা তৃপ্ত করিবার জন্যই জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, উহাদের আর কোনও উপযোগ নাই। এবং এই অর্থই এই শ্লোকের শেষে "কিমন্যৎ কামহৈতুকং"—কাম ছাড়িয়া উহার আর কি হেতু হইবে ?—এই শব্দের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেও বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার "অপরস্পরসম্ভূত" পদের অন্বয় "কিমন্যৎ" এর সহিত লাগাইয়া এই অর্থ করেন যে, "এরূপ কোনও কিছু কি দেখা যায় যাহা পরস্পর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই ? না ; এবং যখন পদার্থই দেখা যায় না তখন এই জগত কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের কামেচ্ছা হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছে।" এবং কোন কোন লোক "অপরশ্চ পরশ্চ" অপরস্পরৌ এইরূপ অদ্ভুত বিগ্রহ করিয়া এই পদগুলির অর্থ করেন যে, "অপরস্পর'ই হইতেছে স্ত্রীপুরুষ, ইহা হইতেই এবং জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য স্ত্রীপুরুষের কামই হেতু, অন্য কোন কারণ নাই।" কিন্তু এই অন্বয় সরল নহে এবং 'অপরশ্চ পরশ্চ' সমাসে 'অপর-পর' হইবে ; মধ্যে স-কার আসিবে না। ইহার অতিরিক্ত অ-সত্য, অ-প্রতিষ্ঠ আদি প্রথম পদগুলি দেখিলেও ইহাই জানা যাইবে যে, অপরস্পরসম্ভূত নঞ্সমাসই হইবে ; এবং ফের বলিতে হয় যে সাংখ্যশাস্ত্রে 'পরস্পরসম্ভূত' শব্দে যে 'গুণসমূহ হইতে গুণসমূহের অন্যোন্যজনন' বর্ণিত হইয়াছে, উহাই এখানে বিবক্ষিত (গীতার. পৃ. ১৩৬ ও ১৭ দেখুন)। 'অন্যোন্য' ও 'পরস্পর' দুই শব্দ সমানার্থ, সাংখ্যশাস্ত্রে গুণসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া বর্ণনা করিবার সময় এই দুই শব্দ আসে (মভা. শাং, ৩০৫ ; সাং. কা. ১২ ও ১৩)। গীতার উপর যে মাধ্ব ভাষ্য আছে উহাতে এই অর্থই স্বীকার করিয়া জগতের বস্তুসকল এক অন্য হইতে কিরূপে উপজাত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য গীতার এই শ্লোকেই দেওয়া হইয়াছে—"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি ইত্যাদি—" (অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে পৌছায়, অতএব) যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় (গী. ৩. ১৪ ; মনু ৩. ৭৬ দেখুন)। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও ব্যাপক, এই কারণে উহাই আমি উপরে প্রমাণ স্বরূপে দিয়াছি। তথাপি আমার মতে গীতার এই 'অপরস্পরসম্ভূত' পদে উপনিষদের সৃষ্ট্যুৎপত্তি-ক্রম অপেক্ষা সাংখ্যের সৃষ্ট্যুৎপত্তিক্রমই অধিক বিবক্ষিত। জগতের রচনাবিষয়ে উপরে যে আসুরী মত বলা হইয়াছে, উহার এই লোকদের আচরণের উপর যে প্রভাব পড়ে, তাহার বর্ণনা

করিতেছেন। উপরের শ্লোকে, অন্তে, যে 'কামহৈতুক'পদ আছে উহারই ইহা অধিক স্পষ্টীকরণ হইতেছে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ (৯) এই প্রকারের দৃষ্টি স্বীকার করিয়া এই অল্পবুদ্ধি নষ্টাত্মা ও দুষ্ট লোক ক্রূর কর্ম্ম করিয়া জগতের ক্ষয় করিবার জন্য উৎপন্ন হয়, (১০) (এবং) যে কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবার নহে, তাহাই আশ্রয় করিয়া এই (আসুর লোক) দম্ভ, মান ও মদে পূর্ণ হইয়া মোহবশত মিথ্যা বিশ্বাস অর্থাৎ মনগড়া কল্পনা করিয়া নীচ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। (১১) এই প্রকারেই আমরণ (সুখভোগের) অসংখ্য চিন্তাগ্রস্ত, কামোপভোগে নিমগ্ন এবং নিশ্চয়পূর্ব্বক উহাকেই সর্ব্বস্বমানী, (১২) শতবিধ আশেপাশে আবদ্ধ, কামক্রোধপরায়ণ (এই আসুর লোক) সুখ লুটিবার জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অনেক অর্থ সঞ্চয় করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। (১৩) আজ আমি ইহা পাইয়াছি, (কাল) ঐ মনোরথ সিদ্ধ করিব ; এই ধন (আমার নিকট) আছে, আবার উহাও আমার হইবে ; (১৪) এই শত্রুকে আমি মারিয়াছি এবং অন্যান্যকেও মারিব ; আমি ঈশ্বর, আমি (ই) ভোগ কর্ত্তা, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী, (১৫) আমি সম্পত্তিশালী ও কুলীন, আমার সমান আর আছে কে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব মজা করিব—এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, (১৬) অনেকবিধ কল্পনায় বিভ্রান্ত, মোহের ফাঁদে জড়িত ও বিষয়ভোগে আসক্ত (এই আসুর লোক) অপবিত্র নরকে পতিত হয়! (১৭) আত্মপ্রশংসাকারী, গর্ব্বিত আচরণ বিশিষ্ট, ধন ও মানের মদে সংযুক্ত এই (আসুর লোক) দম্ভের কারণে, শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া কেবল নামের জন্য যজ্ঞ করে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ (১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধে ফুলিয়া নিজের ও অপরের দেহে বর্ত্তমান আমার (পরমেশ্বরের) দ্বেষ্টা, নিন্দুক, (১৯) এবং অশুভ-কর্ম্মকর্ত্তা এই দ্বেষী ও ক্রূর অধম মনুষ্যদিগকে আমি (এই) সংসারের আসুরী অর্থাৎ পাপ-যোনিতেই সর্ব্বদাই নিক্ষেপ করি। (২০) হে কৌন্তেয়! (এই প্রকার) জন্মে জন্মে আসুরী যোনিই পাইয়া, এই মূর্খ লোক আমাকে লাভ না করিয়াই শেষে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয়। (২১) কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রকার নরকের দ্বার আছে। ইহারা আমাদের নাশসাধন করে ; এই জন্য এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত। (২২) হে কৌন্তেয়! এই তিনি তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় সেই আচরণই করিতে লাগে ; এবং আবার উত্তম গতি পাইয়া যায়।

রহস্য ঃ আসুর লোকদিগের এবং উহাদের প্রাপ্য গতির বর্ণনা হইয়া গেল। এখন ইহা হইতে মুক্তি পাইবার যুক্তি বলিতেছেন—ইহা সুস্পষ্ট যে, নরকের তিন দরজা দূর হইলে পর সদ্গতি পাইতেই হইবে ; কিন্তু ইহা বলেন নাই যে কিরূপ আচরণ করিলে উহা দূর হয়। অতএব এক্ষণে উহার মার্গ বলিতেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদঃ (২৩) যে শাস্ত্রোক্ত বিধি ছাড়িয়া মনগড়া করিতে থাকে, তাহার না সিদ্ধি, না সুখ, না উত্তম গতিই লাভ হয়। (২৪) এই জন্য কার্য্য-অকার্য্যব্যবস্থিতির অর্থাৎ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নির্ণয় করিবার জন্য তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ মানিতে হইবে। এবং শাস্ত্রে যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা বুঝিয়া, তদনুসারে এই লোকে কর্ম্ম করা তোমার উচিত।

রহস্য ঃ এই শ্লোকের 'কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি' পদের দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে যে, কর্ত্তব্যশাস্ত্রের অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের কল্পনাকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া গীতার উপদেশ করা হইয়াছে। গীতারহস্যে (৪৪-৪৫ পৃঃ) স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছি যে ইহাকেই কর্ম্মযোগশাস্ত্র বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ

এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগশাস্ত্র অনুসারে সংসারের ধারণ-পোষণকারী পুরুষ কি প্রকারে হয়; এবং সংসারের নাশকারী মনুষ্য কোন্ ঢঙ্গের হয়। এখন এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, মানুষে-মানুষে এই প্রকার ভেদ হয় কেন। এই প্রশ্নের উত্তর সপ্তম অধ্যায়ের "প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া" পদে দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই যে ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিস্বভাব (৭. ২০)। কিন্তু সেখানে সত্ত্ব-রজ-তমোময় তিন গুণের বিচার করা হয় নাই; অতএব সেখানে এই প্রকৃতিজন্য ভেদের উপপত্তির সবিস্তার বর্ণনাও হইতে পারে নাই। এই কারণেই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণের বিচার করা হইয়াছে এবং এখন এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণ হইতে উৎপত্তিশীল শ্রদ্ধা আদির স্বভাবভেদ কি প্রকারে হয়; এবং আবার এই অধ্যায়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নিরূপণ সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই প্রকারেই নবম অধ্যায়ে ভক্তিমার্গের যে অনেক ভেদ বলা হইয়াছে, উহার কারণও এই অধ্যায়ের উপপত্তি হইতেছে বোঝা যাইতেছে (৯. ২৩. ২৪ দেখুন)। প্রথমে অর্জ্জুন ইহা প্রশ্ন করিতেছেন—

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ঃ অর্জ্জুন কহিলেন—(১) হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি ছাড়িয়া যজন করে, উহার নিষ্ঠা অর্থাৎ (মনের) স্থিতি কিরূপ—সাত্ত্বিক, বা রাজস, বা তামস?

রহস্য ঃ পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে এই যে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রের বিধি অথবা নিয়ম অবশ্য পালনীয়; তাহারই উপর অর্জ্জুন এই সংশয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াও মনুষ্য অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভুল করিয়া বসে। উদাহরণ যথা, শাস্ত্রবিধি আছে যে, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের ভজন-পূজন করা উচিত; কিন্তু সে ইহা ছাড়িয়া দেবতাদের পূজায় লাগিয়া যায় (গী. ৯. ২৩)। অতএব অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতেছে যে, এইরূপ পুরুষের নিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থা অথবা স্থিতি কোন্ প্রকারের বুঝা যাইবে। যাহারা শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিরস্কার করে, সেই আসুর লোকদের বিষয়ে এই প্রশ্ন নহে। তথাপি এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গানুসারে উহাদের কর্ম্মফলেরও বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন যে—(২) প্রাণীমাত্রের শ্রদ্ধা স্বভাবত তিন প্রকার হয়, এক সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় রাজস এবং তৃতীয় তামস; উহাদের বর্ণনা শোন। (৩) হে ভারত! সকল লোকের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্ব অনুসারে অর্থাৎ প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে হয়। মনুষ্য শ্রদ্ধাময়। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা থাকে, সে সেইরূপই হয়।

রহস্য ঃ দ্বিতীয় শ্লোকে 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ দেহস্বভাব, বুদ্ধি অথবা অন্তঃকরণ। উপনিষদে 'সত্ত্ব' শব্দ এই অর্থেই আসিয়াছে (কঠ. ৬. ৭), এবং বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যেও 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' পদের স্থানে 'সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞ' পদের উপযোগ করা হইয়াছে (বেসূ. শাংভা. ১. ২. ১২)। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিতীয় শ্লোকের 'স্বভাব' শব্দ এবং তৃতীয় শ্লোকের 'সত্ত্ব' শব্দ এখানে উভয়ই সমানার্থক। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিদ্ধান্ত মান্য যে, স্বভাবের অর্থ প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—এই তত্ত্ব "দেবতাদের প্রতি ভক্তিশীল দেবতা-দিগকেই লাভ করে" প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তগুলিরই সাধারণ অনুবাদ (৭. ২০-২৩; ৯. ২৫)। এই বিষয়ের বিচার আমি গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি (গীতার. পৃ. ৩৬৩-৩৭০ দেখুন)। তথাপি যখন ইহা বলিয়াছেন যে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি হয় সে সেইরূপ ফললাভ করে, এবং ঐরূপ বুদ্ধিই হওয়া বা না হওয়া প্রকৃতি-স্বভাবের অধীন; তখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঐ বুদ্ধি শোধরাইবে কি প্রকারে। ইহার উত্তর এই যে, আত্মা স্বতন্ত্র, অতএব দেহের এই স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ধীরে ধীরে বদলাইতে পারা যায়। এই বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের দশম প্রকরণে করা হইয়াছে (২৩৮-২৪৪ পৃঃ)। এখন তো ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রদ্ধাতে ভেদ কেন এবং কি প্রকারে হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধা বদলায়। এখন বলিতেছেন যে, যখন প্রকৃতিও সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে যুক্ত, তখন প্রত্যেক মনুষ্যে শ্রদ্ধারও ত্রিবিধ ভেদ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম কি—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ (৪) যে পুরুষ সাত্ত্বিক অর্থাৎ যাহার স্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান সে দেবতাদের যজন করে; রাজস পুরুষ যক্ষ ও রাক্ষসদিগের যজন করে এবং ইহার অতিরিক্ত যে তামস পুরুষ, সে প্রেত ও ভূতসকলের যজন করে।

রহস্য ঃ এই প্রকার শাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত মনুষ্যদিগেরও সত্ত্ব আদি প্রকৃতির গুণভেদে যে তিন ভেদ হয়, উহাদের এবং উহাদের স্বরূপের বর্ণনা হইল। এখন বলিতেছেন যে, শাস্ত্রে অশ্রদ্ধাবান কামপরায়ণ ও দাম্ভিক লোক কোন্ শ্রেণীতে আসে। ইহা তো স্পষ্ট যে, ইহারা সাত্ত্বিক নহে, কিন্তু ইহাদিগকে নিছক তামসও বলা যায় না; কারণ যদিও ইহাদের কর্ম্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় তথাপি ইহাদের মধ্যে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং ইহা রজো গুণের ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ মনুষ্যকে না সাত্ত্বিক বলা যায়, না রাজস, আর না তামস। অতএব দৈব ও আসুর নামক দুই কক্ষ প্রস্তুত করিয়া উক্ত

দুষ্ট পুরুষদিগকে আসুর কক্ষে সমাবেশ করা হয়। এই অর্থই পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে স্পষ্ট করা হইয়াছে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ: (৫) কিন্তু যে ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কারে যুক্ত হইয়া কাম ও আসক্তিবলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যা করে (৬) এবং যে কেবল শরীরস্থ পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিকেই নহে, কিন্তু শরীরে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, তাহাকে অবিবেকী ও আসুরবুদ্ধি জানিবে।

রহস্য: এই প্রকার অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর হইল। এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যের শ্রদ্ধা উহার প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামস হয়, এবং তদনুসারে উহাদের কর্ম্মে পার্থক্য হয় এবং ঐ কর্ম্মের অনুরূপই উহাদের পৃথক-পৃথক গতি হয়। কিন্তু কেবল এইটুকু হইতেই কাহাকেও আসুর শ্রেণীতে গণনা করা যায় না। নিজের স্বাধীনতার উপযোগ করিয়া এবং শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিয়া প্রকৃতিস্বভাবকে ধীরে ধীরে শোধরাইতে যাওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। হাঁ, যে এরূপ না করিয়া দুষ্ট প্রকৃতি-স্বভাবেরই অভিমান রাখিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করে, তাহাকে আসুরবুদ্ধি বলিতে হইবে। ইহাই এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ। এখন বর্ণনা করা হইতেছে যে, শ্রদ্ধার ন্যায়ই আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের সত্ত্ব-রজ-তমোময় প্রকৃতির গুণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভেদ কি প্রকারে হয়; এবং এই ভেদ হইতে স্বভাবের বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার বিচিত্রতাও কিরূপে উৎপন্ন হয়—

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতিবিবর্ধনঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ: (৭) প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ আহারও তিন প্রকার হয়। এবং যজ্ঞ, তপ ও দান সম্বন্ধেও এই কথাই। শোন, উহাদের ভেদ বলিতেছি। (৮) আয়ু, সাত্ত্বিক বৃত্তি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক, রসাল, স্নিগ্ধ, শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া চিরকাল স্থিতিশীল এবং মনের আনন্দদায়ক আহার সাত্ত্বিক মনুষ্যের প্রিয়। (৯) কটু অর্থাৎ ঝাল, অম্ল, লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ-শোক ও রোগ-উৎপাদক আহার রাজস মনুষ্যের প্রিয়।

রহস্য: সংস্কৃতে কটুশব্দের অর্থ ঝাল এবং তিক্তের অর্থ তিত হইতেছে। এই অনুসারেই সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে কাল মরিচ কটু এবং নিম তিক্ত উক্ত হইয়াছে (বাগ্‌ভট

সূত্র. অ. ১০ দেখুন)। হিন্দী কড়ুএ এবং তীখে শব্দ যথাক্রমে কটু ও তিক্ত শব্দেরই অপভ্রংশ।—

যাতযামং গতরসং পূতিপর্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ: (১০) অনেকক্ষণ রাখা অর্থাৎ ঠাণ্ডা, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজন তামস ব্যক্তির প্রিয়।

রহস্য: সাত্ত্বিক মনুষ্যের সাত্ত্বিক, রাজসের রাজস এবং তামসের ভোজন প্রিয় হয়। শুধু ইহাই নহে, আহার শুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইলে মনুষ্যের বৃত্তি ও ক্রমশ শুদ্ধ বা সাত্ত্বিক হইতে পারে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, 'আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' (ছাং ৭. ২৬. ২)। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির বিকার, এই জন্য যেখানে সাত্ত্বিক আহার হয় সেখানে বুদ্ধিও আপনাআপনি সাত্ত্বিক হইয়া যায়। আহারের এই ভেদ হইল। এই প্রকারই এখন যজ্ঞের তিন ভেদেরও বর্ণনা করিতেছেন—

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ: (১১) ফলাশার আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া নিজের কর্ত্তব্য বুঝিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে শান্ত চিত্তে যে যজ্ঞ করা হয় তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। (১২) কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলের আশায় অথবা দম্ভের কারণে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য কৃত যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে। (১৩) শাস্ত্রবিধিরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধা-শূন্য যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে।

রহস্য: আহার ও যজ্ঞের ন্যায় তপস্যারও তিন ভেদ আছে। প্রথমে, তপস্যার কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে; আবার এই তিনটির মধ্যে প্রত্যেকেতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা যে ত্রিবিধতা হয়, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে, তপ শব্দে এই সঙ্কুচিত অর্থ বিবক্ষিত নহে যে, জঙ্গলে যাইয়া পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে শরীরকে কষ্ট দিবে। কিন্তু মনুর কৃত 'তপ' শব্দের এই ব্যাপক অর্থই গীতার নিম্নলিখিত-শ্লোকসমূহের অভিপ্রেত যে, যাগযজ্ঞ আদি কর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, অথবা চাতুর্ব্বর্ণ্য অনুসারে যাহার যে কর্ত্তব্য—যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য যুদ্ধ করা এবং বৈশ্যের ব্যবসায় ইত্যাদি—তাহাই উহার তপস্যা (মনু. ১১. ২৩৬)।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদঃ (১৪) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তির পূজা, শুদ্ধতা, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে শারীর অর্থাৎ কায়িক তপস্যা বলে। (১৫) (মনের) অনুদ্বেগ জনক সত্য, প্রিয় ও হিতজনক সম্ভাষণ এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিজের কর্ম্মের অভ্যাসকে বাঙ্ময় (বাচিক) তপস্যা বলে। (১৬) মনকে প্রসন্ন রাখা, সৌম্যভাব, মৌন অর্থাৎ মুনিদিগের উপযুক্ত বৃত্তি রাখ, মনোনিগ্রহ ও শুদ্ধ ভাবনা—এই সকলকে মানস তপস্যা বলে।

রহস্যঃ জানা যাইতেছে যে, পঞ্চদশ শ্লোকে সত্য, প্রিয় ও হিত, তিন শব্দ মনুর এই বচনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যম্-প্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" (মনু ৪. ১৩৮)—ইহা সনাতন ধর্ম্ম যে, সত্য ও মধুর (তো) বলা উচিত, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নহে। তথাপি মহাভারতেই বিদুর দুর্য্যোধনকে বলিয়াছেন যে, অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ" (মভা. ৬৩. ১৭)। এখন কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার আরও যে ভেদ হয়, তাহা এই প্রকার—

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তস্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাংক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদঃ (১৭) এই তিন প্রকার তপস্যাকে যদি মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া উত্তম শ্রদ্ধার সহিত এবং যোগযুক্ত বুদ্ধিতে করে তবে তাহাকে সাত্ত্বিক বলে। (১৮) যে তপস্যা (নিজের) সৎকার, মান বা পূজার জন্য অথবা দম্ভের সহিত করা হয়, সেই চঞ্চল ও অস্থির তপস্যা শাস্ত্রে রাজস উক্ত হয়। (১৯) মূঢ় আগ্রহসহকারে, নিজেকে কষ্ট দিয়া, অথবা (জারণ-মারণ আদি কর্ম্মের দ্বারা) অপর লোকদিগের বিনাশের জন্য কৃত তপস্যা তামস উক্ত হয়।

রহস্যঃ ইহা তপস্যার ভেদ হইল। এখন দানের ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছেন—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদঃ (২০) যে দান কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করা হয়, যাহা (যোগ্য) স্থান-কাল এবং

পাত্র বিচার করিয়া করা হয় এবং নিজের প্রতি প্রত্যুপকার যে না করে তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সেই দানকে সাত্ত্বিক বলে। (২১) কিন্তু (কৃত) উপকারের বদলে, অথবা কোন ফলের আশা রাখিয়া, বড় কষ্টের সহিত, যে দান করা যায় তাহা রাজস দান। (২২) অযোগ্য স্থানে, অযোগ্য কালে, অপাত্র মনুষ্যকে সৎকার বিনা অথবা অবহেলা পূর্ব্বক যে দান করা যায় তাহাকে তামস দান বলে।

রহস্যঃ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের সমানই জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের ত্রিবিধতার বর্ণনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে (গী. ১৮ ২০-৩৯)। এই অধ্যায়ের গুণভেদ প্রকরণ এখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল। এখন ব্রহ্মনির্দ্দেশের ভিত্তিতে উক্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও সংগ্রাহ্যতা সিদ্ধ করা যাইবে। কারণ উপরোক্ত সম্পূর্ণ বিচারের উপর সাধারণতঃ এই সংশয় হইতে পারে যে, কর্ম্ম সাত্ত্বিক হউক বা রাজস, বা তামস, যেরূপই হোক না কেন, তাহা তো দুঃখজনক ও দোষময় আছেই; এই কারণে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না। আর এই কথা যদি সত্য হয়, তবে আবার কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজস আদি ভেদ করিয়া লাভই বা কি? এই আপত্তির উপর গীতার উত্তর এই যে, কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। যে সংকল্পে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, উহাতেই সাত্ত্বিক কর্ম্মের এবং সৎকর্ম্মের সমাবেশ হয়; ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হইতেছে যে, এই কর্ম্ম অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও ত্যাজ্য নহে (গীতার ২১২ পৃ.)। পরব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধে মনুষ্যের যে কিছু জ্ঞান হইয়াছে, সে সমস্ত "ওঁতৎসৎ" এই তিন শব্দের নির্দ্দেশে গ্রথিত আছে। ইহাদের মধ্যে ওঁ অক্ষর ব্রহ্ম, এবং উপনিষদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে (প্রশ্ন. ৫; কঠ. ২. ১৫-১৭; তৈ. ১. ৮; ছাং, ১. ১; মৈত্র্যু, ৬. ৩. ৪; মাণ্ডু. ১-১২)। আর যখন এই বর্ণাক্ষররূপ ব্রহ্মই জগতের আরম্ভে ছিলেন, তখন সকল ক্রিয়ার আরম্ভ সেখান হইতেই হইয়াছে। "তৎ=উহা" শব্দের অর্থ হইতেছে সাধারণ কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ফলাশা ছাড়িয়া কৃত সাত্ত্বিক কর্ম্ম; এবং 'সৎ' এর অর্থ হইতেছে, যে কর্ম্ম ফলাশারহিত হইলেও শাস্ত্রানুসারে কৃত ও শুদ্ধ। এই অর্থ অনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মেরই নহে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কৃত সৎকর্ম্মেরও পরব্রহ্মের সাধারণ ও সর্ব্বমান্য সংকল্পে সমাবেশ হয়; অতএব এই কর্ম্মকে ত্যাজ্য বলা অনুচিত। শেষে 'তৎ' ও 'সৎ' কর্ম্মের অতিরিক্ত এক 'অসৎ' অর্থাৎ মন্দকর্ম্ম বাকী রহিল। কিন্তু উহা উভয় লোকে নিন্দার্হ স্বীকৃত হইয়াছে, এই কারণে শেষ শ্লোকে সূচিত করিয়াছেন যে ঐ কর্ম্মের এই সঙ্কল্পে সমাবেশ হয় না। ভগবান বলিতেছেন যে—

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

অনুবাদঃ (২৩) (শাস্ত্রে) পরব্রহ্মের নির্দ্দেশ 'ওঁতৎসৎ' এই তিন প্রকারে করা যায়। এই নির্দ্দেশ হইতেই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ নির্মিত হয়।

রহস্যঃ পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছে যে, সম্পূর্ণ সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মদেবরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হয় (গী. ৩. ১০)। কিন্তু এই সমস্ত যে পরব্রহ্ম হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ "ওঁতৎসৎ" এই তিন শব্দে আছে। অতএব এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, 'ওঁতৎসৎ' সংকল্পই সমস্ত সৃষ্টির মূল। এখন এই সংকল্পের তিন পদের কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে পৃথক নিরূপণ করা যাইতেছে—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ঃ (২৪) তস্মাৎ, অর্থাৎ জগতের আরম্ভ এই সংকল্প হইতে হইয়াছে এই কারণে, ব্রহ্মবাদী লোকদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা ওঁএর উচ্চারণের সঙ্গে করা হয়। (২৫) 'তৎ' শব্দের উচ্চারণের দ্বারা, ফলাশা না রাখিয়া, মোক্ষার্থী লোক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি অনেক প্রকার ক্রিয়া করে। (২৬) অস্তিত্ব ও সাধুতা অর্থাৎ ভালর অর্থে 'সৎ' শব্দের উপযোগ করা হয়। এবং হে পার্থ! এই প্রকারেই প্রশস্ত অর্থাৎ ভাল কর্ম্মের জন্য 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। (২৭) যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে স্থিতি অর্থাৎ স্থির ভাবনা রাখাকেও 'সৎ' বলে; এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম্ম করিতে হয়, সেই কর্ম্মের নামও 'সৎ'-ই।

রহস্য ঃ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান হইতেছে মুখ্য ধর্ম্ম এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই মীমাংসকগণ সাধারণত যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলেন। এই কর্ম্ম করিবার সময় ফলাশা থাকিলেও উহা ধর্ম্মের অনুকূলই থাকে, এই কারণে এই কর্ম্ম 'সৎ' শ্রেণীতে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম তৎ (=উহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) শ্রেণীতে লিখিত হয়। প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভে এই যে 'ওঁতৎসৎ' ব্রহ্মসংকল্প বলা যায়, ইহাতে এই প্রকারে দ্বিবিধ কর্ম্মের সমাবেশ হয়; এইজন্য এই দুই কর্ম্মকে ব্রহ্মানুকূলই বুঝিতে হইবে। গীতার ২৪৮ পৃঃ দেখুন। এখন অসৎ কর্ম্মের বিষয়ে বলিতেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৮) অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে হবন করা হয়, (দান) দেওয়া হয়, তপস্যা করা হয়, বা যে কোন (কর্ম্ম) করা হয়, তাহাকে 'অসৎ' বলা হয়। হে পার্থ! সেই (কর্ম্ম) না মৃত্যুর পর (পরলোকে) আর না ইহলোকে হিতজনক হয়।

রহস্য ঃ তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মস্বরূপবোধক এই সর্ব্বমান্য সংকল্পেই নিষ্কাম-বুদ্ধিতে, অথবা কর্ত্তব্য জানিয়া, কৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের, এবং শাস্ত্রানুসারে সদ্বুদ্ধিতে কৃত প্রশস্ত কর্ম্ম অথবা সৎকর্ম্মের সমাবেশ হয়। অন্য সমস্ত কর্ম্ম বৃথা। ইহা হইতে

সিদ্ধ হইতেছে যে, যে কর্ম্মের ব্রহ্মনির্দ্দেশেই সমাবেশ হয়, এবং যাহা ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে (গী. ৩. ১০), এবং যাহা কেহই ছাড়িয়া থাকিতেও পারে না, সেই কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার উপদেশ করা অনুচিত। "ওঁতৎসৎ"-রূপ ব্রহ্মনির্দ্দেশের উক্ত কর্ম্মযোগ প্রধান অর্থকে, এই অধ্যায়েই কর্ম্মবিভাগের সঙ্গেই, ব্যাখ্যা করিবার হেতুও ইহাই। কারণ কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপের বর্ণনা তো ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং উহার পূর্ব্বেও হইয়া গিয়াছে। গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে (২৪৮ পৃঃ) বলিয়া চুকিয়াছি যে 'ওঁতৎসৎ' পদের প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত। আজকাল 'সচ্চিদানন্দ' পদে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া এখানে যখন ঐ 'ওঁতৎসৎ' ব্রহ্মনির্দ্দেশেরই উপযোগ করা হইয়াছে, তখন ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, 'সচ্চিদানন্দ' পদরূপ ব্রহ্মনির্দ্দেশ গীতাগ্রন্থ রচিত হইবার পর সাধারণ ব্রহ্মনির্দ্দেশরূপে সম্ভবত প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষসন্ন্যাসযোগ

অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপসংহার। অতএব এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, আমি এই স্থানে সংক্ষেপে তাহার সিংহাবলোকন করিতেছি (অধিক বিস্তার গীতারহস্যের ১৪শ প্রকরণে দেখুন)। প্রথম—অধ্যায় হইতে প্রকাশ হইতে যে, স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে অবতীর্ণ অর্জ্জুনকে নিজের কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের সংশয় ছিল যে গুরুহত্যা আদি সদোষ কর্ম্ম করিলে আত্মকল্যাণ কখনও হইবে না। অতএব আত্ম-জ্ঞানী পুরুষের স্বীকৃত জীবননির্ব্বাহের দুই প্রকার মার্গের—সাংখ্য (সন্ন্যাস) মার্গের এবং কর্ম্মযোগ (যোগ) মার্গের—বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে করা হইয়াছে। এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যদিও এই উভয় মার্গই মোক্ষপ্রদ তথাপি ইহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর (গী. ৫. ২)। পরে তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই যুক্তিগুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ ধরা হয়; বুদ্ধি স্থির ও সম হইলে কর্ম্মের বাধা হয় না; কর্ম্ম কাহারও দূর হয় না এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়াও কাহারও উচিত নহে, কেবল ফলাশা ত্যাগ করাই যথেষ্ট; নিজের জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক; বুদ্ধি ভাল হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ হয় না; এবং পূর্ব্বপরম্পরা দেখিলে জানা যাইবে যে, জনক আদি এই মার্গেরই আচরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন যে, কর্ম্ম-যোগের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির যে সমতা আবশ্যক হয়, তাহা কিরূপে পাইতে হইবে এবং এই কর্ম্মযোগের আচরণ করিয়া শেষে উহা দ্বারাই মোক্ষ কিরূপে পাওয়া যায়। বুদ্ধির এই সমতাপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ জানা আবশ্যক যে, একই পর-মেশ্বর সকল প্রাণীতে ব্যাপ্ত আছেন—ইহার অতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বিচার ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। আবার সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগের আচরণ করিতে থাকিয়াই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যায়, এবং সেই জ্ঞান কি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষরঅক্ষর অথবা ব্যক্ত-অব্যক্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নবম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যদিও পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই বুদ্ধিকে বিচলিত হইতে দিও না যে, পরমেশ্বর একই; এবং ব্যক্ত স্বরূপেরই উপাসনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রদান করে অতএব সকলের পক্ষে সুলভ। অনন্তর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করা হইয়াছে যে, ক্ষর-অক্ষরের বিবেকে যাহাকে অব্যক্ত বলে তাহাই মনুষ্যের শরীরে অন্তরাত্মা। ইহার পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত চার অধ্যায়ে, ক্ষর-অক্ষর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে যে, একই অব্যক্ত হইতে প্রকৃতির গুণের কারণে জগতে বিবিধ

স্বভাবের মনুষ্য কিরূপে উপজাত হয় অথবা আরও অনেক প্রকারের বিস্তার কিরূপে হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ সমাপ্ত করা হইয়াছে। তথাপি স্থানে স্থানে অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশই আছে যে তুমি কর্ম্ম কর; এবং এই কর্ম্মযোগপ্রধান জীবননির্ব্বাহের মার্গই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্বীকৃত হইয়াছে, যাহাতে শুদ্ধ অন্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভক্তি করিয়া 'পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম অনুসারে কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়া আমরণ কর্ম্ম করিতে থাকিবার' উপদেশ আছে। এই প্রকার জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগের সাঙ্গো-পাঙ্গ বিচার করা চুকিলে পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে ঐ ধর্ম্মেরই উপসংহার করিয়া অর্জ্জুনকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিয়াছেন। গীতার এই মার্গে—যাহা গীতাতে সর্ব্বোত্তম উক্ত হইয়াছে—অর্জ্জুনকে ইহা বলা হয় নাই যে 'তুমি চতুর্থ আশ্রম স্বীকার করিয়া সন্ন্যাসী হও।' হাঁ, ইহা অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই মার্গের আচরণশীল মনুষ্য 'নিত্যসন্ন্যাসী' (গী. ৫. ৩)। অতএব এক্ষণে অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, চতুর্থ আশ্রম-রূপ সন্ন্যাস লইয়া কোনও সময়ে সমস্ত কর্ম্ম সত্য-সত্য ত্যাগ করিবার তত্ত্ব এই কর্ম্ম-যোগমার্গে আছে কি নাই; আর যদি না থাকে তো, 'সন্ন্যাস' এবং 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ কি? গীতারহস্য পৃ. ৩০০-৩০৩ দেখুন।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ অর্জ্জুন বলিলেন—(১) হে মহাবাহু, হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস-তত্ত্ব এবং হে কেশিদৈত্য নিষূদন! ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক জানিতে চাহি।

রহস্যঃ সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থ অথবা ভেদ কোষকারেরা করিয়াছেন, সেই অর্থ অথবা সেই ভেদ জানিবার জন্য এই প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা মনে করিবে না যে, উভয়ের ধাত্বর্থ যে "ছাড়া" অর্জ্জুন তাহাও জানিতেন না। কিন্তু কথা এই যে, ভগবান কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই; বরঞ্চ চতুর্থ, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪. ৪১; ৫. ১৩; ৬. ১) বা অন্যত্র যে কোন স্থানে সন্ন্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, কেবল ফলাশা 'ত্যাগ' করিয়া (গী ১২. ১১) সকল কর্ম্মের 'সন্ন্যাস' কর অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ কর (৩. ৩০; ১২. ৬)। আর উপনিষদে দেখ তো, কর্ম্মত্যাগপ্রধান সন্ন্যাসধর্ম্মের এই বচন পাওয়া যায় যে, 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ' (কৈ. ১. ২; নারায়ণ. ১২. ৩)। সকল কর্ম্ম স্বরূপত 'ত্যাগ' করিয়াছ অনেক মোক্ষ পাইয়াছেন, অথবা "বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" (মুণ্ডক. ৩. ২. ৬)—কর্ম্মত্যাগরূপ 'সন্ন্যাস' যোগের দ্বারা শুদ্ধ 'যতি' বা "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" (বৃ. ৪. ৪. ২২)—আমার পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি প্রজাতে কি কাজ? অতএব অর্জ্জুন বুঝিলেন যে ভগবান স্মৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্নাস আশ্রমের জন্য 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দের উপযোগ করিতেছেন না, কিন্তু তিনি অন্য কোন অর্থে ঐ শব্দগুলির

উপযোগ করিতেছেন। এই জন্যই অর্জ্জুন চাহিলেন যে, ঐ অর্থের পূর্ণরূপে স্পষ্টীকরণ হইয়া যাক। এই হেতুতেই তিনি উক্ত প্রশ্ন করিলেন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (৩৫০-৩৫৩ পৃঃ) এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন— (২) (যত) কাম্য কর্ম্ম আছে, তাহার ন্যাস অর্থাৎ ছাড়াকেই জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ন্যাস বুঝেন (এবং) সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিতগণ ত্যাগ বলেন।

রহস্য ঃ এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগমার্গে সন্ন্যাস ও ত্যাগ কাহাকে বলে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের এই মত গ্রাহ্য নহে, এই কারণে তাঁহার এই শ্লোকের বড়ই টানাবুনা করিয়াছেন। শ্লোকে প্রথমেই 'কাম্য' শব্দ আসিয়াছে অতএব এই টীকাকারদের মত এই যে, এখানে মীমাংসকদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের বিবেচনায় ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, উহাদের মধ্যে কেবল কাম্য 'কর্ম্মকেই ছাড়িতে হইবে'। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী লোকদিগের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মও দরকার নাই এই জন্য তাঁহাদের এই প্রতিপাদন করিতে হইয়াছে যে, এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের সমাবেশ করা হইয়াছে। এতটা করিবার পরও এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে যাহা বলা হইয়াছে যে, ফলাশা ছাড়িতে হইবে কর্ম্ম নহে (পরে ষষ্ঠ শ্লোক দেখুন), তাহার সহিত মিলই হয় না; অতএব শেষে এই টীকাকারগণ নিজেদেরই মন হইতে এই প্রকার বলিয়া সমাধান করিয়া লইয়াছেন যে, ভগবান এখানে কর্ম্মযোগমার্গের কেবল প্রশংসা করিয়াছেন; তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় হইতেছে কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াই চাই! ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে সন্ন্যাস আদি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এই শ্লোকের অর্থ ঠিক লাগে না। বস্তুত ইহার অর্থ কর্ম্মযোগপ্রধানই করা চাই অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যাইবার যে তত্ত্ব গীতাতে পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তাহারই অনুরোধে এখানেও অর্থ করা চাই; এবং এই অর্থই সরল ও জমেও ঠিক ঠিক। প্রথমে এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া চাই যে, 'কাম্য' শব্দে এই স্থানে মীমাংসকদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মবিভাগ অভিপ্রেত নহে। কর্ম্মযোগমার্গে সকল কর্ম্মের দুই বিভাগই করা হয়; এক 'কাম্য' অর্থাৎ ফলাশায় কৃত কর্ম্ম এবং দ্বিতীয় 'নিষ্কাম' অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। মনুস্মৃতিতে ইহাদিগকেই যথাক্রমে 'প্রবৃত্ত' কর্ম্ম ও 'নিবৃত্ত' কর্ম্ম বলিয়াছে (মনু. ১২. ৮৮ ও ৮৯)। কর্ম্ম চাই নিত্য হৌক, নৈমিত্তিক হৌক, কাম্য হৌক, কায়িক হৌক, বাচিক হৌক, মানসিক হৌক, অথবা সাত্ত্বিক আদি ভেদ অনুসারে অন্য কোন প্রকারেরই হৌক; ঐ সকলকে 'কাম্য' অথবা 'নিষ্কাম' এই উভয়ের

মধ্যে কোন এক বিভাগে আনাই চাই। কারণ, কাম অর্থাৎ ফলাশা হওয়া, এই দুইয়ের অতিরিক্ত ফলাশাদৃষ্টিতে তৃতীয় ভেদ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে যে কর্ম্মের যে ফল বলা হইয়াছে—যথা পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি—সেই ফল প্রাপ্তির জন্য সেই কর্ম্ম করিলে তাহা 'কাম্য' এবং মনে ঐ ফলের ইচ্ছা না রাখিয়া ঐ কর্ম্মই কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিলে তাহা 'নিষ্কাম' হইয়া যায়। এই প্রকারে সকল কর্ম্মের 'কাম্য' ও 'নিষ্কাম' (অথবা মনুর পরিভাষা অনুসারে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত) এই দুই ভেদই সিদ্ধ হয়। এখন কর্ম্মযোগী সমস্ত 'কাম্য' কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাগ করে, অতএব সিদ্ধ হইল যে, কর্ম্মযোগেও কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস করিতে হয়। বাকী থাকে নিষ্কাম কর্ম্ম; গীতাতে কর্ম্মযোগীর নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার নিশ্চিত উপদেশ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতেও 'ফলাশা' সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে হয় (গী. ৬. ২)। অতএব ত্যাগের তত্ত্বও গীতাধর্ম্মে স্থিরই থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত কর্ম্ম না ছাড়িলেও কর্ম্মযোগমার্গে 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' দুই তত্ত্ব দাঁড়াইয়া থাকে। অর্জ্জুনকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোকে সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়ের ব্যাখ্যা এই প্রকার করা গিয়াছে যে, 'সন্ন্যাসের' অর্থ 'কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করা' এবং ত্যাগের ভাব এই যে, 'যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার ফলাশা রাখিবে না'। পূর্ব্বে যখন ইহা প্রতিপাদিত হইতেছিল যে, সন্ন্যাস (অথবা সাংখ্য) ও যোগ দুই তত্ত্বত একই, তখন 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ (গী ৫. ৩-৬ ও ৬. ১. ২) এবং এই অধ্যায়েই পরে 'ত্যাগী' শব্দের অর্থও (গী. ১৮. ১১) ইহারই অনুরূপ করা হইয়াছে এবং এই স্থানে ঐ অর্থই ইষ্ট। এ স্থলে স্মার্ত্তদের এই মত প্রতিপাদ্য নহে যে, "ক্রমশ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করিয়া শেষে প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বত্যাগরূপ সন্ন্যাস অথবা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ বিনা মোক্ষপ্রাপ্তি হইতেই পারে না"। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, কর্ম্মযোগী যদিও সন্ন্যাসীদের গেরুয়া ভেক ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করে না, তথাপি সে সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ত্ব পালন করে, এইজন্য কর্ম্মযোগের স্মৃতিগ্রন্থের সহিত কোনই বিরোধ হয় না। এখন সন্ন্যাসমার্গ ও মীমাংসকদিগের কর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ে শেষ নির্দ্ধারণ শুনাইতেছেন—

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ (৩) কোন কোন পণ্ডিতের কথা এই যে, কর্ম্ম দোষযুক্ত অতএব উহা (সর্ব্বথা) ত্যাগ করা চাই; এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান তপস্যা ও কর্ম্ম কখনও ছাড়া উচিত নহে। (৪) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ত্যাগের বিষয়ে

আমার নির্দ্ধারণ শোন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। (৫) যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; এই (কর্ম্মসকল) করাই চাই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বুদ্ধিমানদিগের জন্য (ও) পবিত্র অর্থাৎ চিত্ত-শুদ্ধি-কারক। (৬) অতএব এই (যজ্ঞ, দান প্রভৃতি) কর্ম্মসকলও আসক্তি না রাখিয়া, ফলত্যাগ করিয়া (অন্য নিষ্কাম কর্ম্মের সমানই লোকসংগ্রহার্থ) করিতে থাকা চাই। হে পার্থ! এই প্রকার আমার নিশ্চিত মত (হইতেছে, এবং উহাই) উত্তম।

রহস্য ঃ কর্ম্মের দোষ অর্থাৎ বন্ধকতা কর্ম্মে নাই, ফলাশাতে আছে। এইজন্য পূর্ব্বে অনেকবার কর্ম্মযোগের এই যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে যে, সমস্ত কর্ম্ম ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা চাই, তাহার এই উপসংহার। সন্ন্যাস মার্গের এই মত গীতার মান্য নহে যে, সমস্ত কর্ম্ম দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য (গী. ১৮. ৪৮ ও ৪৯)। গীতা কেবল কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস করিবার জন্য বলেন; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কর্ম্মসমূহের প্রতিপাদন আছে, সে সমস্তই কাম্যই (গী. ২. ৪২-৪৪), এইজন্য এখন বলিতে হয় যে, ঐ সকলেরও সন্ন্যাস করা চাই; এবং যদি এইরূপ করে তো যজ্ঞচক্র বন্ধ হইয়া যায় (৩. ১৬) এবং ইহার ফলে সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইবারও অবসর আসে। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তবে করিতে হইবে কি? গীতা ইহার এইপ্রকার উত্তর দেন যে, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির কারণে করিবার জন্য যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছে, তথাপি এইরূপ কথাই নহে যে, লোকসংগ্রহের জন্য, যজ্ঞ করা, দান করা এবং তপস্যা করা প্রভৃতি আমার কর্ত্তব্য, এই কর্ম্মই নিষ্কাম বুদ্ধিতে হইতে পারে না (গী. ১৭. ১১, ১৭ ও ২০)। অতএব লোকসংগ্রহার্থ স্বধর্ম্ম অনুসারে যেমন অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায়, সেইরূপই যজ্ঞ, দান আদি কর্ম্মও ফলাশা ও আসক্তি ছাড়িয়া করা চাই। কারণ উহা সর্ব্বদাই 'পাবন' অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি-কারক অথবা পরোপকারবুদ্ধিবর্দ্ধক। মূল শ্লোকে যে "এতান্যপি = এই সকলও" শব্দ আছে তাহার অর্থই এই যে "অন্য নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞ, দান আদি কর্ম্মও করা চাই", এই রীতিতে এই সমস্ত কর্ম্ম ফলাশা ছাড়িয়া অথবা ভক্তিদৃষ্টিতে কেবল পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিপূর্ব্বক করিলে সৃষ্টিচক্র চলিতে থাকিবে; এবং কর্ত্তার মনের ফলাশা দূর হইবার কারণে এই কর্ম্ম মোক্ষপ্রাপ্তিতে বাধাও দিতে পারে না। এই প্রকারে সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক মিল হইয়া যায়। কর্ম্মবিষয়ে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের ইহাই চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪৫ এর উপর আমার রহস্য দেখুন)। মীমাংসকদের কর্ম্মমার্গ ও গীতার কর্ম্মযোগের প্রভেদ গীতা-রহস্যে (পৃ. ২৫২-২৫৫ ও পৃ. ২৯৮-৩০০) অধিক স্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উপর সন্ন্যাস ও ত্যাগসম্বন্ধীয় অর্থের কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে এই প্রকার স্পষ্টীকরণ হইল। এখন সাত্ত্বিক আদি ভেদ অনুসারে কর্ম্ম করিবার বিভিন্ন রীতি বর্ণনা করিয়া ঐ অর্থই দৃঢ় করিতেছেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৭) যে কর্ম্ম (স্বধর্ম্ম অনুসারে) নিয়ত অর্থাৎ স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা (কাহারও) উচিত নহে। মোহবশত ইহাদের ত্যাগকে তামস বলে। (৮) শরীরের কষ্ট হইবার ভয়ে অর্থাৎ দুঃখজনক হইবার কারণেই যদি কেহ কর্ম্ম ছাড়িয়া দেয় তো উহাদের সেই ত্যাগ রাজস হইয়া যায়, (এবং) ত্যাগের ফল সে পায় না। হে অর্জ্জুন! (স্বধর্ম্ম অনুসারে) নিয়ত কর্ম্ম যখন কার্য্য অথবা কর্ত্তব্য বুঝিয়া এবং আসক্তি ও ফল ছাড়িয়া করা হয়, তখন তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ ধরা হয়।

রহস্য ঃ সপ্তম শ্লোকের 'নিয়ত' শব্দের অর্থ কেহ কেহ নিত্যনৈমিত্তিক আদি ভেদ-সমূহের মধ্যে 'নিত্য' কর্ম্ম মনে করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং' (গী, ৩. ৮) পদে 'নিয়ত' শব্দের যে অর্থ সেই অর্থ এখানেও করা চাই। আমি উপরে বলিয়া চুকিয়াছি যে, এখানে মীমাংসকদিগের পরিভাষা বিবক্ষিত নহে। গী. ৩. ১৯এ 'নিয়ত' শব্দের স্থানে 'কার্য্য' শব্দ আসিয়াছে এবং এখানে ৯ম শ্লোকে 'কার্য্য' এবং 'নিয়ত' দুই শব্দ একত্র আসিয়াছে। এই অধ্যায়ের আরম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত কোনও কর্ম্মই না ছাড়িয়া উহাকেই কর্ত্তব্য বুঝিয়া করিতে থাকা চাই (গী. ৩. ১৯), ইহাকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে; এবং কর্ম্মযোগশাস্ত্রে ইহাকেই 'ত্যাগ' অথবা 'সন্ন্যাস' বলে। এই সিদ্ধান্তই এই শ্লোকে সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রকারে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থের স্পষ্টীকরণ হইয়া চুকিল। এখন এই তত্ত্ব অনুসারেই বলিতেছেন যে, প্রকৃত ত্যাগী ও সন্ন্যাসী কে—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ঃ (১০) যে কোনও অকুশল অর্থাৎ অকল্যাণকর কর্ম্মের দ্বেষ করে না, এবং কল্যাণকর অথবা হিতকর কর্ম্মে অনুষক্ত হয় না, তাহাকেই সত্ত্বশীল বুদ্ধিমান ও সন্দেহবিরহিত ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী বলিতে হইবে। (১১) যে দেহ ধারণ করে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা অসম্ভব; অতএব যে (কর্ম্ম না ছাড়িয়া) কেবল কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াছে, সে-ই (প্রকৃত) ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী।

রহস্য ঃ এখন বলিতেছেন যে, উক্ত প্রকারে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িয়া কেবল ফলাশা ছাড়িয়া যে ত্যাগী হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার কর্ম্মের কোন ফলই বন্ধক হয় না—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ঃ (১২) মৃত্যুর পরে অত্যাগী মনুষ্যের অর্থাৎ ফলাশা যে ত্যাগ না করে তাহার তিন প্রকার ফললাভ হয়; অনিষ্ট, ইষ্ট ও (কতক ইষ্ট ও কতক অনিষ্ট

মিলিত) মিশ্র। কিন্তু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তার (এই ফল) লাভ হয় না, অর্থাৎ বাধা হইতে পারে না।

রহস্য ঃ ত্যাগ, ত্যাগী এবং সন্ন্যাসী-সম্বন্ধীয় উক্ত বিচার পূর্ব্বে (গী. ৩. ৪-৭; ৫. ২-১০ ; ৬. ১) কয়েক স্থানে আসিয়া গিয়াছে, তাহারই এখানে উপসংহার করা হইয়াছে। সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস গীতার কখনও অভিপ্রেত নহে। ফলাশাত্যাগী পুরুষই গীতা অনুসারে খাঁটি অর্থাৎ নিত্য-সন্ন্যাসী (গী. ৫, ৩)। মমতাযুক্ত ফলাশার অর্থাৎ অহঙ্কারবুদ্ধির ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিবার জন্য এখন অন্য কারণ দেখাইতেছেন—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারনানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হে তবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বা স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ঃ হে মহাবাহু ! কোনও কর্ম্ম হইতে গেলেই সাংখ্যের সিদ্ধান্তে পাঁচ কারণ উক্ত হইয়াছে ; তাহা আমি বলিতেছি শোন। (১৪) অধিষ্ঠান (স্থান) এবং কর্ত্তা বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ সাধন, (কর্ত্তার) অনেক প্রকারের পৃথক পৃথক চেষ্টা অর্থাৎ ব্যাপার, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চম (কারণ) দৈব। (১৫) শরীর, বাণী অথবা মনের দ্বারা মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে—চাই তাহা ন্যায্য হউক বা বিপরীত অর্থাৎ অন্যায্য হউক—তাহার উক্ত পাঁচ কারণ।

অনুবাদ ঃ (১৬) বাস্তবিক স্থিতি এই প্রকার হইলে পরও যে অসংস্কৃত বুদ্ধির কারণে মনে করে যে, আমিই একেলা কর্ত্তা (বুঝিতে হইবে যে), সেই দুর্ম্মতি কিছুই জানে না। (১৭) যাহার এই ভাবনাই নাই যে, 'আমি কর্ত্তা' এবং যাহার বুদ্ধি অলিপ্ত সে যদি এই লোকদিগকে মারিয়া ফেলে তথাপি (বুঝিতে হইবে যে) সে কাহাকেও মারে নাই এবং এই (কর্ম্ম) তাহার বন্ধকও হয় না।

রহস্য ঃ কোন কোন টীকাকার ত্রয়োদশ শ্লোকের 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ বেদান্তশাস্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শ্লোক নারায়ণীয়ধর্ম্মের মভা, শাং. ৩৪৭. ৪৭) অক্ষরশ আসিয়াছে, এবং সেখানে উহার পূর্ব্বে কাপিল সাংখ্যের তত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষের—উল্লেখ আছে। অতএব আমার মত এই যে, 'সাংখ্য' শব্দে এই স্থানে কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রই অভিপ্রেত। পূর্ব্বে গীতাতে এই সিদ্ধান্ত অনেকবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের না কর্ম্মফলের আশা করা চাই, আর না আমি অমুক করিব এরূপ অহঙ্কারবুদ্ধিই মনে রাখা চাই (গী, ২. ১৯ ; ২. ৪৭ ; ৩-২৭ ; ৫. ৮-১১ ; ১৩. ২৯)। এখানে "কর্ম্মের ফলের জন্য মনুষ্য একলাই কারণ নহে" ইহা বলিয়া ঐ সিদ্ধান্তই দৃঢ়

করা হইয়াছে (গীতার. প্র. ১১ দেখুন)। চতুর্দ্দশ শ্লোকের অর্থ এই যে, মনুষ্য এই জগতে থাকুক বা না থাক, প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে জগতের অখণ্ডিত ব্যাপার চলিতেই থাকে এবং যে কর্ম্ম মনুষ্য নিজের কৃত মনে করে, তাহা কেবল উহারই যত্নের ফল নহে, বরঞ্চ উহার যত্ন ও সংসারের অন্য ব্যাপার অথবা চেষ্টারাশির সহায়তার পরিণাম। যেমন কৃষি কেবল মনুষ্যেরই যত্নের উপর নির্ভর করে না, উহার সফলতার জন্য জমি, বীজ, জল, সার ও বলদ প্রভৃতির গুণধর্ম্ম অথবা ব্যাপারের সহায়তা আবশ্যক হয় ; এই প্রকারই মনুষ্যের প্রযত্নের সিদ্ধির জন্য জগতের যে বিবিধ ব্যাপারসমূহের সহায়তা আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার জানিয়া, উহাদের আনুকূল্য পাইয়াই মনুষ্য যত্ন করিতে থাকে। কিন্তু আমাদের প্রযত্নের অনুকূল বা প্রতিকূল, সৃষ্টির আরও কিছু ব্যাপার আছে, যাহার বিষয় আমরা জানি না। ইহাকেই দৈব বলে এবং কর্ম্মসংঘটনের ইহাই পঞ্চম কারণ উক্ত হইয়াছে। মনুষ্যের যত্ন সফল হইবার জন্য যখন এতগুলি বিষয়ের প্রয়োজন এবং যখন উহাদের মধ্যে কতকগুলি আমার আয়ত্ত নহে বা আমার জ্ঞানেরও বিষয় নহে ; তখন ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মনুষ্যের এরূপ অভিমান রাখা নিছক মূর্খতা যে, আমি অমুক কাজ করিব অথবা এরূপ ফলাশা রাখাও মূর্খতার লক্ষণ যে আমার কর্ম্মের ফল অমুক হইবেই (গীতার. পৃঃ. ২৮২-২৮৩)। তথাপি সপ্তদশ শ্লোকের অর্থ এরূপও বুঝিতে হইবে না যে, যাহার ফলাশা দূর হয় সে ইচ্ছামত কুকর্ম্ম করিতে পারে। সাধারণ মনুষ্য যাহা কিছু করে, তাহা স্বার্থের লোভে করে, এইজন্য উহাদের ব্যবহার অনুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহার স্বার্থ বা লোভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা ফলাশা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং যাহার নিকট প্রাণীমাত্র সমানই হইয়া গিয়াছে ; তাহা দ্বারা কাহারও অহিত হইতে পারে না। কারণ এই যে, দোষ বুদ্ধিতে থাকে, কর্ম্মে নহে। অতএব যাহার বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতে শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে ইহার কৃত কোন কর্ম্ম লৌকিক দৃষ্টিতে বিপরীত দৃষ্ট হইলেও ন্যায়তঃ বলিতে হয় যে উহার বীজ শুদ্ধই হইবে ; ফলতঃ ঐ কাজের জন্য ফের ঐ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যকে জবাবদিহির দায়ী মনে করা উচিত নহে। সপ্তদশ শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য। স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের নিষ্পাপ তার এই তত্ত্বের বর্ণনা উপনিষদেও আছে (কোষী, ৩. ১ এবং পঞ্চদশী, ১৪. ১৬ ও ১৭)। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণের (পৃঃ ৩২০-৩২৪) এই বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচার করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার অধিক বিস্তার আবশ্যক নাই। এই প্রকার অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে পর সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থমীমাংসা দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, স্বধর্ম্মানুসারে যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অহঙ্কার বুদ্ধি ও ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাকাই সাত্ত্বিক অথবা যথার্থ ত্যাগ, কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকা প্রকৃত ত্যাগ নহে। এখন সপ্তদশ অধ্যায়ে কর্ম্মের সাত্ত্বিক আদি ভেদের যে বিচার আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহাই এখানে কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিতেছেন—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
করণং কর্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ঃ (১৮) কর্ম্মচোদনা তিন প্রকার—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ; এবং কর্ম্মসংগ্রহ তিন প্রকার—কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা। (১৯) গুণসংখ্যানশাস্ত্রে অর্থাৎ কাপিল-সাংখ্যশাস্ত্রে বলিয়াছে যে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা (প্রত্যেক সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন) গুণভেদে তিন তিন প্রকার হয়। ঐ (প্রকারগুলি)কে যেমনটি-তেমন (তোমাকে বলিতেছি) শোন।

রহস্য ঃ কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কর্ম্ম ঘটিবার পূর্ব্বে, মনের দ্বারা উহার নিশ্চয় করিতে হয়। অতএব এই মানসিক বিচারকে 'কর্ম্মচোদনা' অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রাথমিক প্রেরণা বলে। আর, তাহা স্বভাবত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাভেদে তিন প্রকার হয়। এক উদাহরণ লও—প্রত্যক্ষ ঘড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কুমার (জ্ঞাতা) নিজের মনে স্থির করে যে, আমার অমুক বিষয় (জ্ঞেয়) করিতে হইবে, এবং তাহা অমুক রীতিতে (জ্ঞান) হইবে। এই ক্রিয়া হইল কর্ম্মচোদনা। এই প্রকারে মনের নিশ্চয় হইয়া গেলে ঐ কুমার (কর্ত্তা) মাটি, চাক ইত্যাদি সাধন (করণ) একত্র করিয়া প্রত্যক্ষ ঘড়া (কর্ম্ম) তৈয়ারি করে। ইহা হইল কর্ম্মসংগ্রহ। কুমারের কর্ম্ম তো ঘট ; কিন্তু উহাকেই মাটির কার্য্যও বলে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কর্ম্মচোদনা শব্দে মানসিক অথবা অন্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধ হইতেছে এবং কর্ম্মসংগ্রহ শব্দে ঐ মানসিক ক্রিয়ারই অনুষঙ্গী বাহ্য ক্রিয়ার বোধ হইতেছে। কোনও কর্ম্মের পূর্ণ বিচার করিতে হইলে 'চোদনা' ও 'সংগ্রহ' দুইয়ের বিচার করা চাই। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, এবং জ্ঞাতার (ক্ষেত্রজ্ঞের) লক্ষণ প্রথমেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. ১৮) অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ক্রিয়ারূপ জ্ঞানের লক্ষণ কিছু পৃথক হইবার কারণে এখন এই ত্রয়ীর মধ্যে জ্ঞানের, এবং দ্বিতীয় ত্রয়ীর মধ্যে কর্ম্ম ও কর্ত্তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ঃ (২০) যে জ্ঞানের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীসকলে একই অবিভক্ত ও অব্যয় ভাব অথবা তত্ত্ব উপলব্ধ হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান জান। (২১) যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীমাত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব আছে এই পৃথকত্ব বোধ হয় তাহাকেই রাজস জ্ঞান বুঝিবে। (২২) কিন্তু যে নিষ্কারণে ও তত্ত্বার্থজ্ঞান না জানিয়া বুঝিয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত, এইরূপ বুঝিয়া একই বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই অল্প জ্ঞানকে তামস বলা হয়।

রহস্য ঃ বিভিন্ন জ্ঞানের লক্ষণ অনেক ব্যাপক। নিজের পুত্রকন্যা ও স্ত্রীকেই সমস্ত সংসার মনে করা তামস জ্ঞান। ইহা হইতে কিছু উচু সিঁড়িতে পোঁছিলে দৃষ্টি অধিক ব্যাপক হইয়া যায় এবং নিজের গ্রামের অথবা দেশের মনুষ্যকেও নিজের মত ভাবিতে লাগে, তথাপি এই বুদ্ধি থাকিয়াই যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের অথবা দেশের লোক বিভিন্ন। এই জ্ঞানই রাজস উক্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতেও উচ্চে উঠিয়া প্রাণীমাত্রে একই আত্মাকে জানা পূর্ণ ও সাত্ত্বিক জ্ঞান। সার হইল এই যে, 'বিভক্তে অবিভক্ত' অথবা 'অনেকতায় একতা' জানাই জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ ; আর, বৃহদারণ্যক এবং কঠোপনিষদের বর্ণনা অনুসারে যে জানিয়া লয় যে, এই জগতে নানাত্ব নাই—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", সে মুক্ত হইয়া যায় ; কিন্তু যে এই জগতে অনেকতা দেখে, সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়িয়া থাকে—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃ. ৪. ৪. ১৯ ; কঠ. ৪. ১১)। এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিবার আছে, তাহা ইহাই (গী. ১৩. ১৬), এবং জ্ঞানের ইহাই পরম সীমা ; কারণ সমস্তই এক হইয়া গেলে ফের একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার পরে বাড়িবার অবকাশই থাকে না (গীতার. পৃ. ২০১-২০২)। একীকরণ করিবার এই জ্ঞানক্রিয়ার নিরূপণ গীতারহস্যের নবম প্রকরণে (পৃ. ১৮২-১৮৪) করা হইয়াছে। যখন এই সাত্ত্বিক জ্ঞান মনে ভালরূপ প্রতিবিম্বিত হয় তখন মনুষ্যের দেহস্বভাবের উপর উহার কিছু পরিণাম হয়। এই পরিণামেরই বর্ণনা দৈবী-সম্পত্তি গুণবর্ণনার নামে ষোড়শ অধ্যায়ের আরম্ভে করা হইয়াছে। এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. ৭-১১) এই প্রকার দেহস্বভাবের নামকেই 'জ্ঞান' বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, 'জ্ঞান' শব্দে (১) একীকরণের মানসিক ক্রিয়ার পূর্ণতা, এবং (২) ঐ পূর্ণতার দেহস্বভাবের উপর পরিণাম,—এই দুই অর্থ গীতাতে বিবক্ষিত। অতএব বিংশ শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণ যদিও বাহাত মানসিকক্রিয়াত্মক দৃষ্ট হয়, তথাপি উহাতেই এই জ্ঞানের কারণে দেহস্বভাবের উপর যে পরিণাম হয় তাহারও সমাবেশ করা চাই। এই বিষয় গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে (২১৪-২১৫ পৃঃ) স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। থাক্ ; জ্ঞানের ভেদ হইয়া গেল। এখন কর্ম্মের ভেদ বলা হইতেছে—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ঃ (২৩) ফলপ্রাপ্তির অনভিলাষী মনুষ্য, (মনে) না প্রেম আর না দ্বেষ রাখিয়া আসক্তি বিনা (স্বধর্ম্মানুসারে) যে নিয়ত অর্থাৎ নিযুক্ত কর্ম্ম করে, সেই (কর্ম্মকে) সাত্ত্বিক বলে। (২৪) কিন্তু কাম অর্থাৎ ফলাশার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অথবা অহংকারবুদ্ধিবিশিষ্ট (মনুষ্য) বড় পরিশ্রমসহ যে কর্ম্ম করে, তাহাকে রাজস বলে। (২৫) অনুবন্ধক অর্থাৎ পরে কি হইবে, পৌরুষ অর্থাৎ নিজের সামর্থ কতটা এবং

পরিণামে নাশ অথবা হিংসা হইবে কিনা মোহবশতঃ এই বিষয়ের বিচার না করিয়া যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয় তাহা তামস কর্ম্ম।

রহস্য ঃ এই তিন প্রকার কর্ম্মে সকল প্রকার কর্ম্মেরই সমাবেশ হইয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক অথবা উত্তম কেন বলিয়াছেন, তাহার বিচার গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে করা হইয়াছে, তাহা দেখুন ; এবং যথার্থ অকর্ম্মও ইহাই (গীতা. ৪. ১৬ উপর আমার রহস্য দেখুন)। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, অতএব কর্ম্মের উক্ত লক্ষণগুলির বর্ণনা করিবার সময় বারবার কর্ত্তার বুদ্ধির উল্লেখ করা হইয়াছে। স্মরণ রাখিও যে, কর্ম্মের সাত্ত্বিকতা বা তামসতা কেবল উহার বাহ্য পরিণামের দ্বারা স্থির করা হয় নাই (গীতার. পৃঃ ৩২৮-৩২৯)। এই প্রকারে ২৫শ শ্লোক হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, ফলাশা দূর হইলে এমন বুঝিতে হইবে না যে, অগ্রপশ্চাৎ বা সারাসার বিচার না করিয়াই মনুষ্য যদৃচ্ছা কর্ম্ম করিবার অবসর পাইল। কারণ ২৫শ শ্লোকে এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অনুবন্ধক ও ফলের বিচার না করিয়া কৃত কর্ম্ম তামস, সাত্ত্বিক নহে (গীতার. পৃঃ ৩২৮-৩২৯ দেখুন)। এখন এই তত্ত্ব অনুসারে কর্ত্তার ভেদ বলিতেছেন—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ঃ (২৬) যাহার আসক্তি থাকে না, যে 'আমি' ও 'আমার' বলে না, কার্য্যসিদ্ধি হোক বা না হোক (উভয় পরিণামের সময়) যে (মনে) বিকাররহিত হইয়া ধৃতি ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম্ম করে, তাহাকে সাত্ত্বিক (কর্ত্তা) বলে। (২৭) বিষয়াসক্ত, লোভী, (সিদ্ধি হইলে) হর্ষ এবং (অসিদ্ধি হইলে) শোকযুক্ত, কর্ম্মফলপ্রাপ্তির অভিলাষী, হিংসাত্মক ও অশুচি কর্ত্তা রাজস উক্ত হয়। (২৮) অযুক্ত অর্থাৎ চঞ্চল-বুদ্ধি, অসভ্য, গর্ব্বস্ফীত, ঠগ, নৈষ্কৃতিক অর্থাৎ অপরের হানিকারক, অলস, অপ্রসন্ন-চিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ বিলম্বকারী বা এক ঘণ্টার কাজ এক মাসে যে করে এরূপ কর্ত্তা তামস উক্ত হয়।

রহস্য ঃ ২৮শ শ্লোকে নৈষ্কৃতিক (নিস্ + কৃৎ = ছেদন করা, কাটা) শব্দের অর্থ অপরের কাজ ছেদনকারী অথবা নাশকারী। কিন্তু ইহার বদলে কেহ কেহ 'নৈকৃতিক' পাঠ করেন। অমরকোষে 'নিকৃত'-এর অর্থ শঠ লিখিত আছে। কিন্তু এই শ্লোকে শঠ বিশেষণ পূর্ব্বে আসিয়া গিয়াছে এইজন্য আমি নৈষ্কৃতিক পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। এই তিন প্রকার কর্ত্তার মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ত্তাই অকর্ত্তা, অলিপ্ত কর্ত্তা, অথবা কর্ম্মযোগী। উপরের শ্লোক হইতে প্রকট যে, ফলাশা ছাড়িলেও কর্ম্ম করিবার আশা, উৎসাহ ও সারাসার বিচার ঐ কর্ম্মযোগীতে থাকিয়াই যায়। জগতের ত্রিবিধ বিস্তারের এই বর্ণনাই এখন বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের বিষয়েও করা যাইতেছে। এই শ্লোকগুলিতে

যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অথবা নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৪১) হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধির সেই অর্থই অভিপ্রেত। ইহার স্পষ্টীকরণ গীতারহস্যের ষষ্ঠ প্রকরণে (১২০-১২৩ পৃঃ) করা হইয়াছে।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ঃ (২৯) হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধি ও ধৃতিরও গুণানুসারে যে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ হয়, সেই সমস্ত তোমাকে বলিতেছি ; শোন। (৩০) হে পার্থ ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি (অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করিবার) এবং নিবৃত্তিকে (অর্থাৎ না করিবার) জানে, এবং ইহা জানে যে, কার্য্য অর্থাৎ করিবার যোগ্য কি এবং অকার্য্য অর্থাৎ করিবার অযোগ্য কি, কাহাকে ভয় করিবে এবং কাহাকে নহে, কিসে বন্ধন হয় এবং কি সে মোক্ষ, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক। (৩১) হে পার্থ ! সেই বুদ্ধি রাজসী, যাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অথবা কার্য্য ও অকার্য্যের যথার্থ নির্ণয় হয় না। (৩২) হে পার্থ ! সেই বুদ্ধি তামসী, যাহা তমোব্যাপ্ত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উল্টা বুঝাইয়া দেয়।

রহস্য ঃ এই প্রকারে বুদ্ধির বিভাগ করিলে পর সদসদ্বিবেকবুদ্ধি কোন স্বতন্ত্র দেবতা থাকে না, কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেই উহার সমাবেশ হয়। এই বিচার গীতা-রহস্যের ১২৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। বুদ্ধির বিভাগ হইল ; এখন ধৃতির বিভাগ বলিতেছেন—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৩) হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ এদিকে ওদিকে যাহা বিচলিত না হয় এরূপ ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার, (কর্ম্মফল-ত্যাগরূপ) যোগের দ্বারা (পুরুষ) করে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিক। (৩৪) হে অর্জ্জুন ! প্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা নিজের ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ (পুরুষার্থ) সিদ্ধ করিয়া লয়, সেই ধৃতি রাজস। (৩৫) হে পার্থ ! যে ধৃতি

দ্বারা মনুষ্য দুর্বুদ্ধি হইয়া নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ ছাড়ে না, সেই ধৃতি তামস।

রহস্য ঃ ‘ধৃতি, শব্দের অর্থ ধৈর্য্য ; কিন্তু এ স্থলে শারীরিক ধৈর্য্য অভিপ্রেত নহে। এই প্রকরণে ধৃতি শব্দের অর্থ মনের দৃঢ় নিশ্চয়। নির্ণয় করা বুদ্ধির কাজ সত্য ; কিন্তু বুদ্ধি যাহা যোগ্য নির্ণয় করিবে তাহা সর্ব্বদাই স্থির থাকিবে, এ বিষয়েরও প্রয়োজন আছে। বুদ্ধির নির্ণয়কে এইরূপ স্থির বা দৃঢ় করা মনের ধর্ম্ম, অতএব বলিতে হয় যে, ধৃতি অথবা মানসিক ধৈর্য্যের গুণ মন ও বুদ্ধি দুইয়ের সহায়তায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইটুকু বলিলেই সাত্ত্বিক ধৃতির লক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যে, অব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা এদিকে ওদিকে বিচলিত হয় না এরূপ ধৈর্য্যের বলের উপর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার করা চাই। কিন্তু ইহাও বলা চাই যে, এই ব্যাপার কোন্ বস্তুর উপর হয় অথবা এই ব্যাপারসমূহের কর্ম্ম কি। ঐ ‘কর্ম্ম’ যোগ শব্দের দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। অতএব ‘যোগ্য’ শব্দের অর্থ কেবল ‘একাগ্র’ চিত্ত করিলে কাজ চলে না। এইজন্যই আমি এই শব্দের অর্থ, পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে, কর্ম্ম-ফলত্যাগরূপ যোগ করিয়াছি। সাত্ত্বিক কর্ম্মের এবং সাত্ত্বিক কর্ত্তা প্রভৃতির লক্ষণ বলিবার সময় যেমন ‘ফলের আসক্তি ছাড়া’কে প্রধান গুণ ধরিয়াছি সেইরূপই সাত্ত্বিক ধৃতির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেও ঐ গুণকেই প্রধান ধরিতে হয়। ইহা ব্যতীত পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজস ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, অতএব এই শ্লোক হইতেও সিদ্ধ হয় যে, সাত্ত্বিক ধৃতি, রাজস ধৃতির বিপরীত, অফলাকাঙ্ক্ষী হওয়া চাই। তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্চয়ের দৃঢ়তা তো নিছক মানসিক ক্রিয়া, উহার ভাল বা মন্দ হওয়ার বিচার করিবার অর্থে এই দেখা চাই যে, যে কার্য্যের জন্য ঐ ক্রিয়ার উপযোগ করা যায়, সেই কার্য্য কিরূপ। নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি কার্য্যেই দৃঢ়নিশ্চয় করা হইয়া থাকে তো উহা তামস ; ফলাশাপূর্ব্বক নিত্য ব্যবহারের কার্য্য করিতে লাগানো হইয়া থাকে তো সাত্ত্বিক। এই প্রকার এই ধৃতির ভেদ হইল ; এখন বলিতেছেন যে, গুণভেদ অনুসারে সুখের তিন প্রকার ভেদ কিরূপ হয়—

> সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
> অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
> যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
> তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥
> বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
> পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
> যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ;
> নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ঃ (৩৬) এখন হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি সুখেরও তিন ভেদ বলিতেছি ; শোন। অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ নিরন্তর পরিচয়ের দ্বারা (মনুষ্য) যাহাতে রত হয় এবং যেখানে দুঃখের শেষ হয়, (৩৭) যাহা আরম্ভে (তো) বিষের সমান মনে হয় কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মনিষ্ঠবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে পাওয়া যায় সেই (আধ্যাত্মিক) সুখকে সাত্ত্বিক বলে। (৩৮) ইন্দ্রিয়গণ ও উহাদের বিষয়সমূহের সংযোগে উৎপন্ন (অর্থাৎ আধিভৌতিক) সুখকে রাজস বলা হয়, যাহা প্রথমে তো অমৃতের সমান ; কিন্তু অন্তে বিষের ন্যায় হয়। (৩৯) এবং যাহা আরম্ভে এবং অনুবন্ধে অর্থাৎ পরিণামেও মনুষ্যকে মোহে আবদ্ধ করে এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যের ভুলে উপজাত হয় তাহাকে তামস সুখ বলে।

রহস্য ঃ ৩৭শ শ্লোকে আত্মবুদ্ধির অর্থ আমি ‘আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি’ করিয়াছি। কিন্তু ‘আত্মা’র অর্থ ‘নিজের’ করিয়া ঐ পদেরই অর্থ ‘নিজের বুদ্ধি’ও হইতে পারে। কারণ পূর্ব্বে (৬. ২১.) বলা হইয়াছে যে, অত্যন্ত সুখ কেবল ‘বুদ্ধিরই গ্রাহ্য’ ও ‘অতীন্দ্রিয়’ হইতেছে। কিন্তু অর্থ যেরূপই করা যাউক না কেন, তাৎপর্য্য একই। বলিয়াছি তো যে, প্রকৃত ও নিত্যসুখ ইন্দ্রিয়োপভোগে হয় নাই, কিন্তু তাহা কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য ; কিন্তু যখন বিচার করি যে, বুদ্ধির প্রকৃত ও অত্যন্ত সুখ পাইবার জন্য কি করিতে হয়, তখন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে (৬. ২১. ২২) প্রকট হয় যে, এই চরম সুখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি না হইলে পাওয়া যায় না। ‘বুদ্ধি’ এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে, তাহা একদিকে তো ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের দিকে দেখে, এবং অপরদিকে উহার এই প্রকৃতির বিস্তারের মূলে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রে যে আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহারও বোধ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা বুদ্ধিকে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তার হইতে সরাইয়া দিয়া যেখানে অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়াছে—আর পাতঞ্জলযোগের সাধনীয় বিষয় ইহাই—সেখানে ঐ বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়া যায় এবং মনুষ্যের সত্য ও অত্যন্ত সুখের অনুভব থাকে। গীতারহস্যের ৫ম প্রকরণে (পৃ. ১০০-১০৩) আধ্যাত্মিক সুখের শ্রেষ্ঠতা বিবৃত করা হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ বলিতেছেন যে, জগতে উক্ত ত্রিবিধ ভেদই সর্ব্বত্র পড়িয়া আছে—

> ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
> সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ঃ (৪০) এই পৃথিবীতে, আকাশে অথবা দেবগণের ভিতরে অর্থাৎ দেবলোকেও এমন কোনই বস্তু নাই যাহা প্রকৃতির এই তিন গুণ হইতে মুক্ত।

রহস্য ঃ অষ্টাদশ শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের ভেদ বলিয়া অর্জ্জুনের চক্ষের সম্মুখে এই বিষয়ের এক চিত্র ধরিলেন যে, সমস্ত জগতে প্রকৃতির গুণভেদে বিচিত্রতা কিরূপে উৎপন্ন হয় ; এবং ফের ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এই সমস্ত ভেদের মধ্যে সাত্ত্বিক ভেদ শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহ্য। এই সাত্ত্বিক ভেদের মধ্যেও যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থিতি তাহাকেই গীতাতে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়াছে। গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে (১৪৪-১৪৫ পৃঃ) আমি বলিয়া চুকিয়াছি যে, ত্রিগুণাতীত অথবা নির্গুণ অবস্থা গীতার মতে কোন স্বতন্ত্র বা চতুর্থ ভেদ নহে। এই ন্যায় অনুসারেই মনুস্মৃতিতেও সাত্ত্বিক গতিরই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন ভেদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তম সাত্ত্বিক গতি মোক্ষপ্রদ এবং মধ্যম সাত্ত্বিক গতি স্বর্গপ্রদ (মনু. ১২. ৪৮-৫০ ও ৮৯-৯১)। জগতে যে প্রকৃতি আছে উহারই বিভিন্নতা এ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। এখন এই গুণবিভাগ হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার উৎপত্তি

নিরূপিত হইতেছে। এই বিষয় পূর্ব্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে (১৮. ৭-৯, ২৩; ৩. ৮) যে স্বধর্ম্মানুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ 'নিয়ত' অর্থাৎ নিযুক্ত কর্ম্ম ফলাশা ছাড়িয়া, কিন্তু ধৃতি, উৎসাহ ও সারাসারবিচারপূর্ব্বক করিতে যাওয়াই সংসারে উহার কর্ত্তব্য। কিন্তু যে বিষয় হইতে কর্ম্ম 'নিয়ত' হয়, তাহার বীজ এ পর্য্যন্ত কোথাও বলা হয় নাই। পূর্ব্বে একবার চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থার যৎসামান্য উল্লেখ করিয়া (৪-১৩) বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের নির্ণয় শাস্ত্র অনুসারে করা চাই (গী. ১৬. ২৪)। কিন্তু জগতের ব্যবহার কোনও নিয়মানুসারে বজায় রাখিবার জন্য (গীতার.২৮৮, ৩৪০ এবং ৪২৪-৪২৫ পৃঃ দেখুন)। যে গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বের উপর চাতুর্ব্বর্ণ্যরূপ শাস্ত্রব্যবস্থা নির্ম্মিত করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ স্পষ্টীকরণ ঐ স্থানে করা হয় নাই। অতএব যে সংস্থা দ্বারা সমাজে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য নিয়ত হয় অর্থাৎ স্থির করা যায় সেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের, গুণত্রয়বিভাগ অনুসারে, উপপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এখন প্রত্যেক বর্ণের নিয়ত কর্ত্তব্যও বলা হইতেছে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদঃ (৪১) হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম উহাদের স্বভাব জন্য অর্থাৎ প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে (৪২) ব্রাহ্মণের স্বভাবজন্য কর্ম্ম শম, দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, সরলতা (আর্জব), জ্ঞান অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ ও আস্তিক্যবুদ্ধি। (৪৩) শৌর্য্য, তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, দান করা এবং (প্রজার উপর) হুকুম চালানো ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম্ম। (৪৪) কৃষি (অর্থাৎ চাষবাষ), গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালনের উদ্যম ও বাণিজ্য অর্থাৎ ব্যবসায় বৈশ্যের স্বভাবজন্য কর্ম্ম। এবং এইপ্রকারই সেবা করা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

রহস্যঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থা স্বভাবজন্য গুণভেদে রচিত হইয়াছে; এরূপ বুঝিও না যে, এই উপপত্তি সর্ব্বপ্রথম গীতাতেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নহুষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে এবং দ্বিজ-ব্যাধসংবাদে (বন. ১৮০ ও ২১১), শান্তিপর্ব্বের ভৃগু-ভরদ্বাজসম্বাদে (শাং. ১৮৮) অনুশাসন পর্ব্বের উমামহেশ্বর-সম্বাদে (অনু. ১৪৩), এবং অশ্বমেধ পর্ব্বের (৩৯. ১১) অনুগীতায় গুণভেদের এই উপপত্তিই কিছু প্রভেদসহ পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া চুকিয়াছি যে, জগতের বিবিধ ব্যবহার প্রকৃতির গুণভেদ হইতেই হইয়া আসিতেছে; আবার সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, কাহার প্রতি কি করা উচিত, মনুষ্যের এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে চাতুর্ব্বর্ণ্য-

ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ত করা যায় সেই ব্যবস্থাও প্রকৃতির গুণভেদের পরিণাম। এখন ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন যে, উক্ত কর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্যের নিষ্কাম বুদ্ধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা চাই. নচেৎ জগতের কারবার চলিতে পারে না; এবং মনুষ্য আচরণের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে, সিদ্ধিলাভের জন্য আর কোন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদঃ (৪৫) নিজ নিজ (স্বভাবজন্য গুণানুসারে প্রাপ্ত) কর্ম্মে নিত্য রত পুরুষ (উহা দ্বারাই) পরম সিদ্ধি লাভ করে। শোন, নিজ কর্ম্মে তৎপর থাকিলে সিদ্ধি কি প্রকারে লাভ হয়। (৪৬) প্রাণীমাত্রের যাঁহা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়াছে এবং যিনি সমস্ত জগতের বিস্তার করিয়াছেন অথবা যাঁহা দ্বারা সমস্ত জগত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাঁহাকে নিজের (স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত) কর্ম্ম দ্বারা (কেবল বাণী অথবা ফুলের দ্বারা নহে) পূজা করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে।

রহস্যঃ এই প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে অথবা পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করা বিরাটস্বরূপ পরমেশ্বরের এক প্রকার যজনপূজনই, এবং ইহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় (গীতা. ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ)। এখন উক্ত গুণভেদ অনুসারে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত কর্ত্তব্য অপর কোনও দৃষ্টিতে সদোষ, অশ্লাঘ্য, কঠিন অথবা অপ্রিয়ও হইতে পারে; উদাহরণ যথা, এই অবসরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করায় হত্যা হইবার কারণে উহা সদোষ দেখাইয়া দিবে। তো এইরূপ সময়ে মনুষ্যের কি করা উচিত? সে কি স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া, অন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইবে (গী. ৩. ৩৫); বা যাহাই হউক, স্বকর্ম্মই করিয়া চলিবে; যদি স্বকর্ম্মই করা চাই তো কিরূপে করিবে—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর ঐ ন্যায়ের অনুরোধেই বলা যাইতেছে, যাহা এই অধ্যায়ে প্রথমে (১৮. ৬) যাগযজ্ঞ আদি কর্ম্ম সম্বন্ধে বলা গিয়াছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদঃ (৪৭) যদিও পরধর্ম্মের আচরণ সহজ হয়, তথাপি উহা অপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত কর্ম্ম, বিগুণ অর্থাৎ সদোষ হইলেও অধিক কল্যাণজনক হয়। স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ গুণস্বভাব অনুসারে রচিত চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা

দ্বারা নিয়ত স্বীয় কর্ম্ম করিলে কোনই পাপ সংলগ্ন হয় না। (৪৮) হে কৌন্তেয়! যে কর্ম্ম সহজ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে নিয়ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সদোষ হইলেও উহা (কখনও) ছাড়া উচিত নহে। কারণ সম্পূর্ণ আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ (কোন-না-কোন) দোষে, ধোঁয়া যেমন অগ্নিকে ঘিরিয়া থাকে, সেইরূপই আবৃত থাকে। (৪৯) অতএব কোথাও আসক্তি না রাখিয়া, মনকে বশ করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে চলিলে (কর্ম্মফলের) সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়।

রহস্য : এই উপসংহারাত্মক অধ্যায়ে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত এই বিচারই এখন আবার ব্যক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম ভাল (গী. ৩. ৩৫), এবং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিলাভের জন্য কর্ম্ম ছাড়িবার প্রয়োজন নাই (গী. ৩. ৪) ইত্যাদি। আমি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ শ্লোকের রহস্যতে এইরূপ প্রশ্নসমূহের স্পষ্টীকরণ করিয়া চুকিয়াছি যে, নৈষ্কর্ম্ম্য কি বস্তু এবং প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কাহাকে বলা যায়। উক্ত সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, সন্ন্যাসমার্গীর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে এবং ভগবানের দৃষ্টি মোক্ষ ও লোকসংগ্রহ উভয়ের উপরে সমানই আছে। লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ সমাজের ধারণ ও পোষণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত পুরুষ, অথবা যুদ্ধে তরবারির কৌশল প্রদর্শক শূর ক্ষত্রিয়, এবং কৃষাণ, বৈশ্য, শ্রমজীবী, কামার, ছুতার, কুমার ও মাংসবিক্রেতা ব্যাধেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি কর্ম্ম না ছাড়িলে সত্যসত্য মোক্ষলাভ না হয়, তবে সমস্ত লোকেরই নিজ নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া উচিত! কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গী এই বিষয়ে এ প্রকার কোনই পরোয়া রাখে না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি এতটা সংকুচিত নহে, এইজন্য গীতা বলেন যে, নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া, অপরের ব্যবসায়কে ভাল ভাবিয়া করিতে যাওয়া উচিত নহে। কোনও এক ব্যবসায় ধর, উহাতে কোন-না-কোন ত্রুটী অবশ্য থাকেই। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষান্তি বিশেষভাবে বিহিত আছে (১৮. ৪২) উহাতেও এক বড় দোষ এই যে 'ক্ষমাশীল পুরুষকে দুর্ব্বল মনে হয়' (মভা. শাং. ১৬০. ৩৪); এবং ব্যাধের ব্যবসায়ে মাংস বেচাও এক বঞ্ঝাট হইতেছে (মভা. বন. ২০৬)। কিন্তু এই সমস্যার কারণে বিচলিত হইয়া কর্ম্মমাত্রই ছাড়িয়া বসা উচিত নহে। যে কোন কারণেই হৌক না কেন, যখন একবার কোনও কর্ম্মকে নিজে গ্রহণ করিলে, তখন উহার কঠিনতা বা অপ্রিয়তার পরোয়া না করিয়া, উহা আসক্তি ছাড়িয়া করাই উচিত। কারণ মনুষ্যের লঘুত্ব-মহত্ত্ব উহার ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু যে বুদ্ধিতে সে নিজের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করে, সেই বুদ্ধির উপরেই উহার যোগ্যতা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অবলম্বিত থাকে (গী ২. ৪৯)। যাহার মন শান্ত, এবং যে সমস্ত প্রাণীর অন্তঃস্থিত একতাকে জানিয়াছে, সেই মনুষ্য জাতি বা ব্যবসায়ে চাই ব্যাপারী হৌক, চাই কসাই হৌক; নিষ্কামবুদ্ধিতে ব্যবসায়কারী সেই মনুষ্য স্নান-সন্ধ্যাশী ব্রাহ্মণ, অথবা শূর ক্ষত্রিয়ের সমানই মাননীয় এবং মোক্ষলাভের অধিকারী। কেবল ইহাই নহে, বরং ৪৯শ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম ছাড়িলে যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাই নিষ্কামবুদ্ধিতে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্তদিগেরও লাভ হয়। ভাগবতধর্ম্মের

যাহা কিছু রহস্য তাহা ইহাই; এবং মহারাষ্ট্র দেশের সাধুসন্তের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট হইতেছে যে, উক্ত রীতিতে আচরণ করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধির তত্ত্বকে আমলে আনা কিছু অসম্ভব নহে (গীতার ৩৭৪ পৃঃ)। এখন বলিতেছেন যে, নিজ নিজ কর্ম্মে তৎপর থাকিলেই শেষে মোক্ষ কিরূপে লাভ হয়—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ : (৫০) হে কৌন্তেয়! (এই প্রকারে) সিদ্ধি লাভ হইলে (ঐ পুরুষের) জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা—ব্রহ্ম—যে রীতিতে লাভ হয়, তাহা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি; শোন। (৫১) শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্য্যসহ আত্ম-সংযমন করিয়া শব্দ আদি (ইন্দ্রিয়ের) বিষয়সমূহকে ছাড়িয়া এবং প্রীতি ও দ্বেষ দূর করিয়া, (৫২) 'বিবিক্ত' অর্থাৎ নিরালা অথবা একান্ত স্থলে অবস্থিত, মিতাহারী, কায়মনোবাক্যকে বশীভূতকারী, নিত্য ধ্যানযুক্ত ও বিরক্ত, (৫৩) (এবং) অহংকার, বল, দর্প কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ ত্যাগ করিয়া শান্ত ও মমতারহিত মনুষ্য ব্রহ্মভূত হইতে সমর্থ হয়। (৫৪) ব্রহ্মভূত হইলে পর প্রসন্নচিত্ত হইয়া সে না কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে, আর না কাহারও দ্বেষই করে; এবং সমস্ত প্রাণীতে সম হইয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। (৫৫) ভক্তি দ্বারা উহার মৎসম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ হয় যে, আমি কত এবং কে; এই প্রকারে আমাকেই তত্ত্বত জানিলে সে আমাতেই প্রবেশ করে; (৫৬) এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া, সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও সে আমার অনুগ্রহে শাশ্বত ও অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হয়।

রহস্য : মনে থাকে যেন, সিদ্ধাবস্থার উক্ত বর্ণনা কর্ম্মযোগীদেরই—কর্ম্মসন্ন্যাসী পুরুষদের সম্বন্ধে নহে। আরম্ভেই ৪৫শ ও ৪৯শ শ্লোকে বলিয়াছি যে, উক্ত বর্ণনা আসক্তি ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের, এবং শেষে ৫৬শ শ্লোকে "সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও" শব্দ আসিয়াছে। উক্ত বর্ণনা ভক্তদের অথবা ত্রিগুণাতীতদের বর্ণনারই সমান; এমন কি, কোন কোন শব্দও ঐ বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা,

৫৩শ শ্লোকের 'পরিগ্রহ' শব্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৬. ১০) যোগীর বর্ণনায় আসিয়াছে ; ৫৪শ শ্লোকের "ন শোচতি ন কাংক্ষতি" পদ দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২. ১৭) ভক্তিমার্গের বর্ণনায় আছে ; এবং বিবিক্ত (অর্থাৎ নিরালা, একান্ত স্থলে থাকা) শব্দ ১৩শ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে আসিয়া চুকিয়াছে। কর্ম্মযোগীর প্রাপ্ত উপরোক্ত চরম স্থিতি এবং কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গে প্রাপ্ত চরম স্থিতি দুই কেবল মানসিক দৃষ্টিতে একই ; এইজন্যই সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারেরা বলিবার অবসর পাইয়াছেন যে, উক্ত বর্ণনা আমাদেরই মার্গের। কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়া চুকিয়াছি যে, ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। হৌক ; এই অধ্যায়ের আরম্ভে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে, কিন্তু ফলাশাত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে । যখন সন্ন্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ হইল, তখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, যজ্ঞ দান আদি কর্ম্ম চাই কাম্যহৌক, চাই নিত্য বা নৈমিত্তিক হৌক ঐ সকল অন্য সকল কর্ম্মের ন্যায়ই ফলাশা ছাড়িয়া উৎসাহ ও সমতাসহকারে করিতে থাকা উচিত। তদনন্তর সংসারের কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধিআদি সকল বিষয়ের গুণভেদে অনেকতা দেখাইয়া উহাদের মধ্যে সাত্ত্বিককে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ; এবং গীতা-শাস্ত্রের ভাবার্থ এই বলিয়াছেন যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা দ্বারা স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ছাড়িয়া করিতে যাওয়াই পরমেশ্বরের যজনপূজন করা ; এবং ক্রমশঃ ইহা দ্বারাই শেষে পরব্রহ্ম অথবা মোক্ষ লাভ হয়—মোক্ষের জন্য অপর কোন অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই অথবা কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইবারও দরকার নাই ; কেবল এই কর্ম্মযোগেই মোক্ষসহিত সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন এই কর্ম্মযোগমার্গ স্বীকার করাইবার জন্যই অর্জ্জুনকে আবার একবার শেষ উপদেশ দিতেছেন—

চেতসা সর্ব্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ : (৫৭) মনের দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে 'সন্ন্যাস' অর্থাৎ সমর্পিত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া (সাম্য) বুদ্ধিযোগের আশ্রয়ে সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত রাখ।

রহস্য : বুদ্ধিযোগ শব্দ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (২. ৪৯) আসিয়া পড়িয়াছে ; এবং সেখানে উহার অর্থ ফলাশাতে বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম্ম করিবার যুক্তি অথবা সমত্ববুদ্ধি। এই অর্থই এখানেও বিবক্ষিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তেরই ইহা উপসংহার। ইহাতেই কর্ম্মসন্ন্যাসের অর্থও "মনের দ্বারা (অর্থাৎ কর্ম্ম প্রত্যক্ষ ত্যাগ না করিয়া, কেবল বুদ্ধি দ্বারা) আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পিত কর" এই শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং ঐ অর্থই পূর্ব্বে গীতা ৩. ৩০ এবং ৫. ১৩তেও বর্ণিত হইয়াছে।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনংক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ : (৫৮) আমাতে চিত্ত রাখিলে পর তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সংকট অর্থাৎ কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিবে। কিন্তু যদি অহঙ্কারের বশে আমার কথা না শোন তবে (নিশ্চয়ই) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

রহস্য : ৫৮শ শ্লোকের শেষে অহঙ্কারের পরিণাম বলিয়াছেন ; এখন এখানে উহারই অধিক স্পষ্টীকরণ করিতেছেন—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা ।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ : (৫৯) তুমি অহঙ্কারে এই যে মানিতেছ (বলিতেছ) যে, আমি যুদ্ধ করিব না, (সেই) তোমার এই নিশ্চয় ব্যর্থ। প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব তোমাকে উহা (যুদ্ধ) করাইবে। (৬০) হে কৌন্তেয় ! নিজের স্বভাবজন্য কর্ম্মে বদ্ধ হইবার কারণে, মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি যাহা না করিবার ইচ্ছা করিতেছ, পরাধীন (অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন) হইয়া তোমার উহাই করিতে হইবে। (৬১) হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া (নিজের) মায়া দ্বারা প্রাণীমাত্রকে (এইরূপ) ঘুরাইতেছেন, যেন সমস্তই (কোন) যন্ত্রের উপর চড়ানো হইয়াছে। (৬২) এইজন্য হে ভারত ! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। (৬৩) এই প্রকার আমি এই গুহ্য হইতেও গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। ইহার সম্পূর্ণ বিচার করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর।

রহস্য : এই শ্লোকগুলিতে কর্ম্ম-পরাধীনতার যে গূঢ় তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহার বিচার গীতারহস্যের ১০ম প্রকরণে সবিস্তার হইয়া গিয়াছে। যদিও আত্মা স্বয়ং স্বতন্ত্র, তথাপি জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যবহার দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যে কর্ম্মচক্র অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আত্মার কোনও অধিকার নাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি না, বরঞ্চ যাহা আমার ইচ্ছার বিপরীতও, এইরূপ শতসহস্র বিষয় সংসারে আসিয়া পড়ে ; এবং ঐ সকলের ব্যাপারের পরিণামও আমার উপর হইতে থাকে অথবা উক্ত ব্যাপারগুলিরই কতক অংশ আমাকে করিতে হয় ; যদি অস্বীকার করি তো চলে না। এইরূপ অবসরে জ্ঞানী পুরুষ নিজের বুদ্ধিকে নির্ম্মল রাখিয়া এবং সুখ বা দুঃখকে এক প্রকার বুঝিয়া সমস্ত কর্ম্ম করে ; কিন্তু মূর্খ মনুষ্য উহাদের ফাঁদে আবদ্ধ হয়। এই উভয়ের আচরণেই ইহাই গুরুতর প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই বলিয়া দিয়াছেন যে, "সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতি অনুসারে চলিতে থাকে, সেস্থলে নিগ্রহ কি করিবে ?" (গীতা. ৩. ৩৩)। এইরূপ স্থিতিতেই মোক্ষশাস্ত্র অথবা নীতিশাস্ত্র এই উপদেশ করিতে পারে যে, কর্ম্মে আসক্তি

রাখিও না। ইহার অধিক উহা কিছু বলিতে পারে না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বিচার হইল; কিন্তু ভক্তিদৃষ্টিতে প্রকৃতিও তো ঈশ্বরেরই অংশ। অতএব এই সিদ্ধান্তই ৬১শ ও ৬২শ শ্লোকে ঈশ্বরকে সমস্ত কর্তৃত্ব সমর্পণ করিয়া বলা হইয়াছে। জগতে যে কিছু ব্যবহার হইতেছে, সে সকল পরমেশ্বর যেমন চাহিতেছেন সেইরূপই করাইয়া চলিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষ্যের উচিত যে, অহংকার বুদ্ধি ছাড়িয়া নিজে নিজেকে সর্ব্বথা পরমেশ্বরেরই জিম্মা করিয়া দেয়। ৬৩শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন সত্য যে, "যেমন তোমার ইচ্ছা হয় তেমনই কর", কিন্তু উহার অর্থ অত্যন্ত গভীর। জ্ঞান অথবা ভক্তি দ্বারা যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবস্থাতে পেঁছায়. সেখানে মন্দ ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। অতএব এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' (ইচ্ছার স্বাধীনতা) উহার অথবা জগতের কখনও অহিতজনক হইতে পারে না। এইজন্য উক্ত শ্লোকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে, "যখনই তুমি এই জ্ঞানকে বুঝিয়া লইবে (বিমৃশ্য), তখনই তুমি স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া যাইবে; আবার (পূর্ব্ব হইতে নহে) তুমি নিজ ইচ্ছাতে যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই ধর্ম্ম্য ও প্রমাণ হইবে; এবং স্থিতপ্রজ্ঞের এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তোমার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই হইবে না।" হোক; গীতারহস্যের ১৪শ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, গীতাতে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই অধিক মহত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের ভক্তিপ্রধান উপসংহার করিতেছে—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।.
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ: (৬৪) (এখন) শেষের আর এক বিষয় শোন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য আমি তোমার হিতকর কথা বলিতেছি। (৬৫) আমাতে নিজের মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর এবং আমার বন্দনা কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তোমাকে বলিতেছি যে, (ইহা দ্বারা) তুমি আমাতেই আসিয়া মিলিত হইবে; (কারণ) তুমি আমার প্রিয় ভক্ত। (৬৬) সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি কেবল আমারই আশ্রয়ে আইস। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় করিও না!

রহস্য: কেবল জ্ঞানমার্গের টীকাকারদের নিকট এই ভক্তিপ্রধান উপসংহার প্রিয় বোধ হয় না। এই জন্য তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দেই অধর্ম্মের সমাবেশ করিয়া বলেন যে, এই শ্লোক কঠ উপনিষদের "ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, কৃত-অকৃত, এবং ভূত-ভব্য, সকল ছাড়িয়া ইহাদের অতীতরূপে অবস্থিত পরব্রহ্মকে জান' (কঠ ২. ১৪) এই উপদেশেরই সহিত সমানার্থক, এবং ইহাতে নিগুর্ণ ব্রহ্মের আশ্রয় লইবার উপদেশ আছে। নিগুর্ণ ব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় কঠোপনিষদের শ্লোক মহাভারতেও আসিয়াছে (শাং. ৩২৯. ৪০; ৩৩১.

৪৪)। কিন্তু দুই স্থলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দুই পদ যেমন স্পষ্ট পাওয়া যায় গীতাতে সেরূপ নহে। ইহা সত্য যে, গীতা নিগুর্ণ ব্রহ্মকে মানেন, এবং উহাতে এই নির্ণয়ও করা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের ঐ স্বরূপই শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. ২৪.); তথাপি গীতার ইহাও তো এক সিদ্ধান্ত যে, ব্যক্তোপাসনা সুলভ ও শ্রেষ্ঠ (১২. ৫)। এবং এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের ব্যক্ত স্বরূপের বিষয়েই বলিতেছেন; এই কারণে আমার দৃঢ় মত এই যে, এই উপসংহার ভক্তি প্রধানই। অর্থাৎ এখানে নিগুর্ণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে, কিন্তু বলিতে হয় যে এখানে ধর্ম্ম শব্দে পরমেশ্বরলাভের জন্য শাস্ত্রে যে অনেক মার্গ বলা হইয়াছে—যথা অহিংসা-ধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, মাতৃ পিতৃ-সেবাধর্ম্ম, গুরু-সেবাধর্ম্ম, যাগযজ্ঞধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম আদি—তাহাই অভিপ্রেত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩৫৪) এবং অনুগীতাতে (অশ্ব. ৪৯) যেখানে এই বিষয়ের চর্চা হইয়াছে, সেখানে ধর্ম্ম শব্দে মোক্ষের এই সকল উপায়েরই উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই স্থানে গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের অনুরোধে ভগবানের নিশ্চয়াত্মক উপদেশ এই যে. উক্ত নানা ধর্ম্মের গোলমালে না পড়িয়া "একমাত্র আমাকেই ভজনা কর, আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিব, ভয় করিও না" (গীতার. ৩৭৬ পৃঃ)। সার এই যে. শেষে অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান সকলকেই আশ্বাস দিতেছেন যে, আমাতে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া মৎপরায়ণ বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই তোমার কল্যাণ হইবে; ভয় করিও না ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলে এবং সমস্ত গীতাধর্ম্মের সারও ইহাই। এখন বলিতেছেন যে, এই গীতাধর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগের পরম্পরা পরে কিরূপে বজায় রাখা যাইবে—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ: (৬৭) যে তপস্যা করে না, ভক্তি করে না এবং শুনিবার ইচ্ছা রাখে না, এবং যে আমার নিন্দা করে, তাহাকে এই (গুহ্য) কখনও বলিবে না। (৬৮) যে এই পরম গুহ্য আমার ভক্তকে বলিবে. উহার আমার উপর পরম ভক্তি আসিবে এবং সে নিঃসন্দেহ আমাতে আসিয়াই মিলিত হইবে। (৬৯) সমগ্র মনুষ্য মধ্যে উহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী অপর কাহাকেও পাইবে না এবং এই ভূমিতে আমার উহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই হইবে না।

রহস্য: পরম্পরা-রক্ষার এই উপদেশের সঙ্গেই এখন ফল বলিতেছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদঃ (৭০) আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মসংবাদ যে কেহ অধ্যয়ন করিবে, আমি বুঝিব যে, সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই পূজা করিল। (৭১) এই প্রকারেই দোষ সন্ধান না করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কেহ ইহা শুনিবে, সেও (পাপ হইতে) মুক্ত হইয়া পুণ্যবান লোকদের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে।

রহস্যঃ এখানে উপদেশ সমাপ্ত হইল। এখন এই ধর্ম্ম অর্জ্জুনের বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক আসিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ভগবান তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন—

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥
অর্জ্জুন উবাচ
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদঃ (৭২) হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে ইহা শুনিয়াছ কি না? (এবং) হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ এখন সর্ব্বথা নষ্ট হইল কি না? অর্জ্জুন বলিলেন—(৭৩) হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং আমার (কর্ত্তব্য ধর্ম্মের) স্মৃতি আসিয়া গিয়াছে। আমি (এখন) নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছি। তোমার উপদেশ অনুসারে (যুদ্ধ) করিব।

রহস্যঃ যাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ধারণা এই যে, গীতাধর্ম্মেও সংসার ছাড়িয়া দিবার উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা এই অন্তিম অর্থাৎ ৭৩শ শ্লোকের অনেক ভিত্তিহীন টানাবুনা করিয়াছেন। যদি বিচার করা যায় যে, অর্জ্জুনের কোন্ বিষয়ের বিস্মৃতি হইয়াছিল, তবে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৭) তিনি বলিয়াছেন যে "নিজের ধর্ম্ম অথবা কর্ত্তব্য বুঝিতে আমার মন অসমর্থ হইয়া গিয়াছে" (ধর্ম্মসম্মূঢ়-চেতাঃ)। অতএব উক্ত শ্লোকে সরল অর্থ ইহাই যে, ঐ (বিস্মৃত) কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই এখন তাঁহার স্মৃতি আসিল। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেশ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই শব্দ বলা হইয়াছে যে, "অতএব তুমি যুদ্ধ কর" (গী. ২. ১৮; ২. ৩৭; ৩. ৩০; ৮. ৭; ১১. ৩৪); অতএব এই "তোমার আজ্ঞানুসারে করিব" পদের অর্থ 'যুদ্ধ করিতেছি'ই হইবে। থাক; শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বাদ সমাপ্ত হইল। এখন মহাভারতের কথার সন্দর্ভ অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইয়া উপসংহার করিতেছেন—

সঞ্জয় উবাচ
ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদঃ সঞ্জয় বলিলেন—(৭৪) এই প্রকারে শরীরের রোমাঞ্চকর বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিয়াছি। (৭৫) ব্যাসদেবের অনুগ্রহে আমি এই পরম গুহ্য, অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ হইতে শুনিয়াছি।

রহস্যঃ পূর্ব্বেই লিখিয়া আসিয়াছি যে, ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা তাঁহার ঘরে বসিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এবং সেই সকলেরই বিবরণ তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে 'যোগ' প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মযোগ (৪. ১-৩) এবং অর্জ্জুন প্রথমে উহাকে 'যোগ' (সাম্যযোগ) বলিয়াছিলেন। (গী. ৬. ৩৩); এবং এখন সঞ্জয়ও শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের সম্বাদকে এই শ্লোকে 'যোগ'ই বলিতেছেন। ইহা হইতে সুস্পষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সঞ্জয়, তিন জনের মতে 'যোগ' অর্থাৎ কর্ম্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং অধ্যায়সমাপ্তিসূচক সংকল্পেও উহাই, অর্থাৎ যোগশাস্ত্র, শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু যোগেশ্বর শব্দে 'যোগ' শব্দের অর্থ ইহা হইতে ব্যাপক আছে। যোগের সাধারণ অর্থ কর্ম্ম করিবার যুক্তি, কুশলতা বা শৈলী। এই অর্থ অনুসারেই বলা যায় যে, বহুরূপী যোগের দ্বারা অর্থাৎ কুশলতা দ্বারা নিজের সং প্রস্তুত করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম করিবার যুক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুক্তি খোঁজা হয়, তখন বলিতে হয় যে, যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর মূলে অব্যক্ত হইলেও তিনি নিজে নিজেকে ব্যক্ত সরূপ প্রদান করেন, সেই যুক্তিই অথবা যোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহাকেই 'ঈশ্বরী যোগ' (গী. ৯. ৪; ১১. ৮) বলিয়াছে; এবং বেদান্তে যাহাকে মায়া বলে, তাহাও ইহাই (গী. ৭. ২৫)। এই অলৌকিক অথবা অঘটিত যোগ যাহার সাধ্য হয়, তাহার অন্য সমস্ত যুক্তি তো হস্তগত। পরমেশ্বর এই যোগের অথবা মায়ার অধিপতি; অতএব তাঁহাকে যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগের স্বামী বলে। 'যোগেশ্বর' শব্দে যোগের অর্থ পাতঞ্জল যোগ নহে।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥
যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদঃ (৭৬) হে রাজা (ধৃতরাষ্ট্র)! কেশব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত ও পুণ্য-জনক সংবাদ স্মরণ হওয়ায় আমার বারম্বার হর্ষ হইতেছে; (৭৭) এবং হে রাজা! শ্রীহরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপেও স্মৃতি বারম্বার আসায় আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে এবং বারবার হর্ষ হইতেছে। (৭৮) আমার মত এই যে, যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর অর্জ্জুন আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, শাশ্বত ঐশ্বর্য্য ও নীতি আছে।

রহস্যঃ সিদ্ধান্তের সার এই যে, সেখানে যুক্তি ও শক্তি উভয় মিলিত হয়, সেখানে নিশ্চয়ই ঋদ্ধি-সিদ্ধি বসতি করে; কেবল শক্তি দ্বারা অথবা কেবল যুক্তি দ্বারা কাজ চলে না। যখন জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা হইতেছিল, তখন যুধিষ্ঠির

বিচক্ষণৈঃ" (সভা. ২০. ১৬)—শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, "অন্ধং বলং জড়ং প্রাহুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ" (সভা. ২০. ১৬)—বল অন্ধ ও জড়, বুদ্ধিমানদিগের উচিত যে উহাদিগকে পথপ্রদর্শন করে ; এবং শ্রীকৃষ্ণ "ময়ি নীতির্বলং ভীমে" (সভা. ২০. ৩ —আমাতে নীতি আছে এবং ভীমসেনের শরীরে বল আছে—ইহা বলিয়া ভীমসেনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহা দ্বারা জরাসন্ধের বধ বুদ্ধি দ্বারা করাইলেন। কেবল নীতিবক্তাকে অন্ধচতুর বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগ বা যুক্তির ঈশ্বর ও ধনুর্ধর অর্থাৎ যোদ্ধা, এই শ্লোকে হেতু-পূর্ব্বক দেওয়া হইয়াছে।

রহস্য ঃ দৃষ্টি থাকে যেন, মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ শব্দে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ 'কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস', যাহা অধ্যায়ের আরম্ভে বলা হইয়াছে ; চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্ন্যাস এখানে বিবক্ষিত নহে। এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, স্বকর্ম্ম না ছাড়িয়া, তাহা পরমেশ্বরে মনের দ্বারা সন্ন্যাস অর্থাৎ সমর্পিত করিয়া দিলে মোক্ষলাভ হয়, অতএব এই অধ্যায়ের মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ নাম রাখা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

এই প্রকারে বাল-গঙ্গাধর তিলক-কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার
রহস্যসঞ্জীবন নামক প্রাকৃত অনুবাদ রহস্য
সহিত সমাপ্ত হইল।

গঙ্গাধর-পুত্র, পুনাবাসী, মহারাষ্ট্রবিপ্র,
বৈদিক তিলক বাল বুধ স্ব-বিধীয়মান।
"গীতারহস্য" করিল শ্রীশে সমর্পিত করি',
৭ ০ ৪ ১
বার কাল যোগ ভূমি শকেতে সুযোগ জান ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

॥ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু ॥

